তী

১৩১২

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

পূর্ব্বার্দ্ধ।

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১১ই বৈশাখ সোমবার
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
মহানাটক	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ২৪১,৩১৭,৪০১,৫৩৮
মাতৃভূমিরপ্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত	৪৯৭
যশোহর (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২০৯
রায়-গৃহিণী	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১০৬
শিগো-মুভে	শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত	২৩৪
সাময়িক কথা	সম্পাদকীয়	৯৭,২০১, ৯৭,৩৯৫,৪৯৩,৬০০
সমর্পণ (কবিতা)	শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৩০৩
সর্ব্বজ্ঞমিত্র	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৩২৭
সংকল্প (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৪৫২
সুখ (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৫২৯

খেয়াল খাতা।

অস্ত্রের জন্মকথা	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭১
উদ্ভট (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুক সি, এস	৫৯৮
কণিকা	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	১৮২,৫৮১
কৃষক ও পলিটিসিয়ন্	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ	২৮৭
কলুষ ও কাল	শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক	১৯২
কবি ও কাব্য	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮১
খেয়াল খাতা	বীরবল	৮১
খেয়ালের চৌহদ্দি	সম্পাদিকা	৮৫
খেয়াল (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	২৭৮
ঐ	জ্যাঠা	২৭৯,৫৮৮

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
খেয়াল-পঞ্চক (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৪৭৫
চিত্র (ব্যঙ্গ কবিতা)	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু বি,এ	১৮৩
চুট্‌কী-সাহিত্য	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ	৪৭৭
জিজ্ঞাসা ও উত্তর	... ...	৯৪
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৯৫
"নিন্দন্ত নীতি-নিপুণা"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৮
পত্র (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭০
বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী-বিষ্ণু সংবাদ	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৫৯০
বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯১
বাঙ্গালীর পরীক্ষা	শ্রীমতী সরলা দেবী	৫৮৩
ভারতীর খেয়াল (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮১
মশা	শ্রীঅহিফেনানন্দ	৪৮৪
যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ	শ্রীঅহিফেনানন্দ	৫৯৩
রেণু	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮, ২৮৪, ৪৮৩
রায়-মহিষ-কাহিনী (কবিতা)	শ্রীবি, এল, গুপ্ত	৮৬
শিলাইদহের পদ্মা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭৯
সৌন্দর্য্য	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৭
ঐ	শ্রীলোকেন পালিত	
সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
স্বস্তি-বচন (কবিতা)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮১
সঙ্গীত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৫

মাঙ্গলিক।

ললিত—কাওয়ালি।

অসীমে মগন হয়ে
    শক্তি লভ সসীম সাধনে!
মহাকালে করি ভর
    বাঁধ আয়ু সফল বাঁধনে!

বর্ষ-শেখরে চাহ,
    নব ভানুতেজে কর স্নান!
জরা গ্লানি ঘুচে হোক্
    অক্ষয় বল-সমাধান!

আমার বাল্যজীবনী।*

আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিনবছরের আমি। সে সময়কার দুইটী ঘটনা মনে মুদ্রিত আছে। দাসীরা একটি দুরন্ত শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করাইতেছে। বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন ও ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধীরা বালিকা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া, তাহার অঙ্গধৌত সফেন জলের গতি অনুসরণ করিবার জন্য গৃহের নর্দ্দমার দিকে ছুটিতেছে। ফেণিল জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে কেমন এক কৌতুকরাজ্যে! নর্দ্দামার সামনেটিতে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, তার বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কেমন মজা দেখা যায়। রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারের পর সেখানে হঠাৎ কত আলো। আরও একটি কেমন আশ্চর্য্য জিনিষ সেখান হইতে দেখিবার রহিয়াছে। ঠিক্ সেই সময় তারই মত আর একটি শিশুর স্নানক্রিয়া চলিতেছে। একটা মেম্ তার বাড়ীর উঠানে একটা মোড়ার উপর বসিয়া একটা সাদা ধব্ধবে ছেলেকে টবের জলে চুবাইয়া চটকাইতেছে,—ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতেছে। পয়ঃপ্রণালীর অন্তরালবর্ত্তিনী দর্শকস্থানীয়া অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটির ঐ দিব্যি সাদা ছেলেটার আপত্তিসূচক ক্রন্দন ও চীৎকারই সবচেয়ে আমোদজনক লাগিত। তার তিন বছরের সুদীর্ঘ জীবনের বিজ্ঞতায় বুঝি মনে হইত—"কি ছেলেমানুষ! আমি ত কাঁদি না!"

* ইহা "বঙ্গবাসী" পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করি। তাঁহাদের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সমাপন করিয়া উঠিতে না পারায়, ভারতীতে পত্রস্থ করিতেছি।—ভাঃ সং।

নিজের সম্বন্ধে সব প্রথম স্মৃতি আমার ঐ কৌতুকময়ী। তিন বৎসর বয়সের আর একটি মাত্র ঘটনা মনে আছে। শেয়ালদহ ষ্টেসনের লাইনে কখানা খালি রেলগাড়ি পড়িয়া থাকিত। বিকাল বেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকররা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। এক দিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল—সেদিন সেই অকস্মাৎ চলন্ত রেলগাড়ীর গতিতে বিস্ময় আনন্দ ভয় ও আগ্রহমিশ্রিত একটা তীব্রভাবের প্রথম নবীন তরঙ্গ শিশুবক্ষে রেখা খেলিয়া গেল।

যখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর, আমার পিতার বিলাতগমন উপলক্ষ্যে, আমরা মাতুলালয়ে ছয় নম্বর যোড়াসাঁকোর বাটীতে দীর্ঘকালের জন্য বাস করি। আমার মামা ও মাসিদের ছেলেপিলে গণিয়া আমরা অনেক ভাই বোন। বয়সের ভিন্নতা অনুসারে আমাদের বয়স্যদলের ভিন্ন ভিন্ন থাক ছিল। খুব উঁচু থাকগুলির সবিশেষ খবর রাখি না, কিন্তু আমার দিদি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর বয়স্যদলটি ঠিক আমারই উপরের থাকে ছিল; আর আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথের দলটি যদিও ছেলের দল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের সখ্য বেশী, তাহা প্রায় আমাদেরই দলের আর একটা শাখা ছিল। দিদিদের দল আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেন, কিন্তু দাদাদের দলের সঙ্গে আমাদের চুলোচুলি কিলোকিলির অদলবদল প্রায়ই হইত।

দলগুলি প্রায়ই তিন তিনজনে গঠিত ছিল। আমার দলের আমি সব চেয়ে কনিষ্ঠা সুতরাং অন্ধভাবে পরিচালিতা ছিলাম। আমাদের দলের যিনি মেজো ছিলেন তাঁকে আমি বড় ভালবাসিতাম, আর যিনি বড় ছিলেন তাঁকে ভয় করিতাম। তিনিই আমাদের পাণ্ডা। তাঁর দাসীদের মহলে ভারি গতিবিধি ছিল, সেই জন্য অনেক বিষয়ে পণ্ডিতা

ছিলেন। প্রতিদিন অনেকটা সময় দাসীদের সঙ্গে যাপন করিয়া আসিয়া, নবনব জ্ঞানে পুরিত হইয়া তিনি আমাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। আর শুধু দাসীদের কাছে কেন? খুব বড় ভাইদের দল খুব বড় বোনদের দল—কোথায় কোথায় যে তিনি না ঘুরিতেন জানিনা, সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত গতি ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানসঞ্চয়ের আকর বহু ছিল। অশেষ বিষয়ে তিনি আমাদের নেত্রী ও শিক্ষাদাত্রী ছিলেন।

তাঁদের মহলে একটি ছোট কুঠরি ছিল। কোন কোন দিন আমরা তিনটিতে সেইখানে মধ্যাহ্ন যাপন করিতে যাইতাম। সেই কুঠুরীর তিন দিক্‌কার দরজা অর্গলবদ্ধ থাকিত, একদিকে শুধু একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখা হইত। সেদিকটা গোলাবাড়ীর দিক; গবাক্ষের নীচে অনেকখানি খোলা জমি, উপরে খোলা আকাশ।

তিন সখিতে এক দৌড়ে সেই ঘরে আসিয়া, তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া—কবাট বন্ধ করার কারণ, পাছে দিদিদের দল বা দাদাদের দল আমাদের বেদখল করিতে আসে—মেঝেয় পাতা ছোট বিছানার উপর যে-যার নিরূপিত স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া আসিলে, পণ্ডিতা-দিদি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেন। সে কতদিন কত অমূল্য তত্ত্ব! আমরা ছোট দুজনে ভক্তিভরে সবিস্ময়ে তাঁর সব কথা উৎকর্ণে শুনিতাম।

একদিন তিনি বলিলেন—"মরবার আগে কি হয় জানিস্?" আমরা বলিলাম—"না ভাই।"

তখন মরণ কি তাই জানিতাম না। আমাদের জ্ঞাতসারে কারও মৃত্যু তখনও সে বাড়ীতে হয় নাই।

তিনি বলিলেন—"মরবার একটু আগে আকাশথেকে দুজন যমদূত নেবে আসে। তারা দেখতে ভয়ঙ্কর, শরীর প্রকাণ্ড, রঙ ঘোর

কালো, গালপাট্টা দাড়ী। তারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যে মরবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।"

আমাদের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল! আমরা শ্রোত্রী দুটীতে সভয়ে আমাদের ছোট ঘরের একটিমাত্র খোলা জানালার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জানালা অতি ক্ষুদ্র, তার ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড-শরীর যমদূতের ঢুকিবার সম্ভাবনা নাই। কিছু আশ্বস্ত, তবুও অনেকটা ভীতভাবে আমার পাশের দিদির আর একটু গা ঘেঁষিয়া সরিয়া আমি বলিলাম—"এ রকম ছোট জানলা দিয়ে ত যমদূত ঢুক্‌তে পারবে না?"

আমাদের তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী বলিলেন—"তা কেন পারবে না? যমদূতেরা ইচ্ছে করলেই বড় শরীরকে ছোট ক'রে যেখান সেখান দিয়ে যে সে ঘরে ঢুকতে পারে। যখন ইচ্ছে যাকে তাকে নিয়ে যেতে পারে।"

একটা নিরুপায় অসহায়তার ভাবে আচ্ছন্ন হইলাম। সেদিন যে তারপর কি করিয়া সেই ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। নড়িতে চড়িতে ভয়, উঠিতে পড়িতে ভয়—জানলার দিকে কেবলই সচকিত চোরা দৃষ্টি—যদি দেখি জানলার ধারে যমদূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যদি আমরা এ ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলে!

একদিন বিকালে আমরা বাড়ীর ভিতরের বাগানে খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ খুব হাওয়া উঠিল। আমাদের আজ্ঞাকারিনী নেত্রী—ইনি এখন ডিপুটিগৃহিণী—আজ্ঞা করিলেন—"গুড়ি গুড়ি চল্! গুড়ি গুড়ি চল্! এখনি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—"কেমন করে জান্‌লে?" কিন্তু তখন প্রশ্নাত্মক বিদ্রোহের সময় নাই—কিজানি এখনি যদি হাওয়ায় উড়ে

যাই! সুতরাং আমরা ছোটছুটী আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া সারা বাগানটা গুড়িগুড়ি চলিলাম, খোলা বাগানের সীমা অতিক্রান্ত হইলে যেখানে আর বায়ু চলাচল নাই, সেখানে পৌঁছিয়া আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভাবী হাকিমগৃহিণী তাঁর হুকুমের পোষকতায়, হাওয়ায় মানুষ উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে দাসীদের কাছে শ্রুত নানা সত্যমূলক কাহিনী বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করিলেন।

পাপপুণ্য ও তার দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁর কাছে নানা তথ্য লাভ করিতাম। পুণ্যের কথা কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু কথায় কথায় পাপ করিতাম বোধ হয়, কারণ পাপের দণ্ড ভয়টা তিনি প্রায়ই দেখাইতেন। তিনি ঈশ্বরের হইয়া কতকগুলি নিজস্ব দণ্ডবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যার এক আধটির ভিতর বাস্তবিকই ভারি দক্ষতা ও ভয়ানকতা আছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার নিজের, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা লেখে না, যদিও মানবধর্ম্মের প্রতি তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন।

তিনি বলিতেন, কোন পাপ—যেমন বড়দের কথা না শোনা ঝগড়া করা বা মিথ্যা কথা বলা—একবার আচরিত হইলে তার জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যজীবনে প্রথমে স্থূল রকম অল্প শাস্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প শাস্তি—যেমন কিনা, সাধারণ শাস্ত্রে সচরাচর যাহা পাওয়া গিয়া থাকে,—নরকের আগুনে পোড়া, নরকের ভূতেদের দ্বারা প্রহারিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পাপ যত বেশী করিতে থাকিবে, শাস্তির মাত্রা তত বাড়িতে থাকিবে। পাপের চূড়ান্ত শাস্তির কথা তিনি আমাদের কাছে যা ব্যাখ্যা করিতেন সেইটিই তাঁর স্বকীয় বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তিনি শাসাইয়া বলিতেন,—"খুব যদি পাপ করিস্ তবে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি এই হবে যে ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধু সবাই মরে যাবে, তুই একা বেঁচে থাকবি।"

এই কথা বলিয়া আমাদের সবে-মাত্র সংসারে আসা কচি মনে একটা ভয়ানক শূন্যতাময় উদাস কল্পরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিতেন।

আমি এক দিন তাঁর কথা মনে করিয়া, তেতালার ছাদে উঠিয়া দিগন্তরেখার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই চরম শাস্তির দিন কল্পনায় দেখিলাম। যেন কেহ কোথাও নাই, আকাশে পাখী নাই, চিল নাই, বাহিরের তেতালায় বড়মামা নাই; বাড়ীভিতরের তেতালায় সেজ-মামীরা নাই, সেখানে আমার দিদি দাদা নাই, মঙ্গলা দাসী নাই রাজি দাই নাই;—বাড়ীর কোথাও কেহ নাই—নীচের অন্ধকার ঘরগুলার কোন কোণেও কেহ লুকাইয়া বাঁচিয়া নাই, ইঁদুরও নাই একটা পিঁপড়াও নাই; সামনে যে খোট্টাদের বাড়ী দেখা যায় তাদের ওখানেও কেহ নাই;—ব্রহ্মাণ্ড শূন্য, আমি একা রহিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে; আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল আমার যিনি শাস্তি-বিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কোন্ এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁর কাছে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সে জন্য কোন আগ্রহ অনুভব করিলাম না, শাস্তিদাতার প্রতি কিছুই হৃদ্যতা বোধ হয় নাই; তিনি আছেন ত আছেন! অথচ তন্মুহূর্ত্তের জন্য একটা এই উপলব্ধি হইয়াছিল তিনি আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ! শুধু আমার সত্তা আছে, আর তাঁর সত্তা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। ইহাতে তাঁর উপর রাগও হইয়াছিল, কেমন একটা একাত্মবোধও হইয়াছিল।

ঈশ্বর কিরাতবেশে অর্জ্জুনের পথরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁর স্বরূপ না জানিয়া তাঁকে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি ভাবি, অর্জ্জুন যদি প্রথমেই জানিতে পারিতেন তাঁর পথরোধক

কে, তবে কি করিতেন? কবি কি তাঁহার হস্তকে অপটু করিয়া ফেলিতেন, না তাহাতে বেশী বল দিতেন?

ছয় বৎসর বয়সে ব্রহ্মাণ্ডে একা অস্ত্র আমি, শত্রুরূপী ব্রহ্মাণ্ড-পতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহা হইতে ভীত হইলাম না, তাঁহার শরণাগতও হইলাম না। তাঁর তথাশ্রুত কঠোরতম বিধানকে ফাঁকি দিবার ফন্দিই আমার অনুদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে ঘুরিতে থাকিল। তাঁর পয়গম্বরস্বরূপিনীকে আমি এক দিন বলিলাম—"আমি কেমন করে একা বাঁচব? কি খেয়ে থাক্‌ব? আর কেউ যদি না বেঁচে থাকে আমাকে খাওয়াবে কে? তাহলে ত আমিও মরে যাব।"—ভাবটা ঈশ্বর ত তবে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িবেন! কিন্তু আমার সেই দিদিটির মুখে দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজীবের অগোচর, আমার ন্যায় পাপীর প্রতি দয়ালেশহীন বিধাতা বলিলেন—"তা হবে না। খাবার জিনিষ পত্তর সব থাকবে। তোকে রোজ নিজে রেঁধে বেড়ে খেতেই হবে। বাঁচতেই হবে।"

কি নিষ্ঠুর বিধান!

ভাবিতে ভাবিতে আর এক দিন আর একটা ফাঁকির পন্থা মনে মনে উদ্ভব করিলাম। স্বপ্রণীত উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে বিদুষী উক্ত দিদিরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম গোলাপজামের বীচি বিষে ভরা, খাইতে নাই, খেলেই লোকে মরিয়া যায়। আমি তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম—"ঈশ্বর যদি ব্রহ্মাণ্ডের সব্বাইকে মেরে ফেলে আমাকে একলা বাঁচিয়ে রেখে শাস্তি দেন, আমি সেদিন গোলাপজামের বীচি খাব, তাহলে ত আমিও মরে যাব।" আমাদেব ভয়ঙ্করী গুরু-ঠাকুরাণী ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিলেন—"সেদিন গোলাপজামের বীচিতে আর বিষ থাকবে না। তুই কিছুতেই মরতে পারবিনে।"

আমার উপায়কুশলতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত মানিল। এমন অমোঘতার সঙ্গে কে লড়িতে পারে?

৺ বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিতেছিলেন—"আমাদের দেশে শৈশব হইতে শিশুকে ভয়ের দ্বারা ও ঈশ্বর নামক এক কল্পনার প্রতি নির্ভরপরায়ণতায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভারি ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিবিধানেচ্ছু হইয়া বেদান্তবাদী একটি শ্বেতদম্পতী আলমোরায় বেদান্তাশ্রম খুলিয়া সেখানে হিন্দু শিশুদের বেদান্তসঙ্গত আত্মনির্ভরের ভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন"।

বিবেকানন্দের অভিযোগ শুনিয়া আমার নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়াছিল, মানিয়াছিলাম সত্যই আমাদের কেবলই ভয়সমাকুল করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু সেই অতি শৈশবে যে দিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণীশূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, যেদিন আমার মন যেন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
* * * *
দর্শম্ নু বিশ্বদর্শতম্!"

সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।

রামচন্দ্রের দৈবী অস্ত্রের ন্যায়, এই সহজ স্বাবলম্বন প্রয়োজনের সময় স্মরণমাত্র আজীবন আমার সহায়তা করিয়াছে। ইহা ভয়ে অভয়, শোকে সান্ত্বনা, দৈন্যে অভ্যুদয়, তাপে তাপহরণরূপে আমার সেবা করিয়াছে। যখনি লতার মত লুটাইয়া পড়িয়াছি, দলিত ধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনায় নিপতিত হইয়াছি, তখনি আবির্ভূত হইয়া আমায়

তুলিয়াছে, জড়াইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্ত যতই কেন বিক্ষুব্ধ হউক না, কেমন করিয়া অচিরে ধ্যানস্থ যোগযুক্ত করিয়া সকল ক্ষোভের প্রশান্তি করিয়া দিয়াছে। আমার এই ঐশ্বরী দানের অংশ যদি আমার দেশের সকল বালকবালিকার মধ্যে বণ্টন করিতে পারিতাম কৃতার্থ হইতাম।

আমাদের পরিবারের শিশুরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া নাড়াচাড়া করিত। সর্ব্বদাই যে ভীতিজনকতায় তাঁর সঙ্গে আড়ি করিয়া থাকিতাম তাহা নয়। কখন তাঁকে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখিতাম, আবার কখন কখন তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া যাইত, তাঁকে অন্তরঙ্গ সখাও মনে হইত।

শৈশবে স্বকৃত দুটী লজ্জারাঙা আচরণ আমার মনে ছাঁকা দিয়া দিয়াছিল। স্মৃতির গায়ে এখনও তাদের দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের দলটির মধ্যে যিনি মেজো, তাঁকে আমি ভারি ভাল বাসিতাম বলিয়াছি। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন—অর্থাৎ দুই এক বৎসরের মাত্র বড়, (দলপতি-দিদিটি বছর চারেকের বড় ছিলেন,) এঁরই সঙ্গে বেশী মিল ছিল। বাহির বাড়ীতে আমাদের পড়ার ঘর ও তাঁদের পড়ার ঘর পাশাপাশি ছিল, বাড়ীর ভিতরেও আমাদের ও তাঁদের মহল কাছাকাছি ছিল, তাঁর দাদারা আর আমার দাদা বয়স্য ছিলেন। আমরা অনেক সময় দাসীদের পাহারা এড়াইয়া এ-উহার ঘরে নিজেদের পাথরের রেকাবীভরা জলখাবার লইয়া গিয়া খাইতাম। আমাদের আলুভাজির সহিত উহাঁদের আখের গুড়ের সম্মিলন হইলেই উভয় রসনা বেশী তৃপ্তি লাভ করিত।

ভোর হইতে না হইতে সব ভাইবোনরা মিলিয়া ও-বাড়ীর বাগানে শিউলিফুল তুলিতে যাইতে হইবে। তাই যে যে দিন আগে উঠিত সে অপরদের জাগাইয়া দিত। আমি এক দিন আগে উঠিয়া উহাঁদের

তুলিতে গেলাম। লম্বা দুই তক্তপোষে উহাঁরা চারিটি ভাইবোনে শুইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে একজন দাসী আছে। তখনও ঘর অন্ধকার, সকলে নিদ্রিত। আমি মশারি খুলিয়া, বিছানায় ঢুকিয়া আন্দাজে আন্দাজে দিদির দিক্‌টাতে গেলাম। মনে মনে মৎলব করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁর গালে চুপিচুপি একটি চুমু খাইয়া তাঁকে জাগাইয়া দিব। অন্ধকারে আন্দাজে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিদিকে যখন পাইলাম, তাঁর গালে ধীরে ধীরে ভারি ভালবাসার সঙ্গে একটি চুমু খাইলাম।—"কে গা! কে গা!"—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। ওমা আমি করিয়াছি কি? দিদি ভাবিয়া বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিতচর্ম্ম, বলিত, অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু খাইয়াছি। সকলেই জাগিল, এবং সকলেই আমার এই কুকীর্ত্তি টের পাইয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যতটুকু ছিলাম লজ্জায় তার চেয়েও আরও ছোট হইয়া গেলাম। এমন গলদ! তিনকড়ি দাসীকে চুমু খাওয়া! সেই লোল শ্লথ মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর করা! বৃদ্ধা অতিশয় কর্কশ প্রকৃতির ছিল, তাকে আমরা শিশুরা কেহই ভালবাসিতাম না। কিন্তু সেদিন একটী ক্ষুদ্র বালিকার ভুলকৃত স্নেহব্যবহারে তার প্রাণের কোন্ একটি তন্ত্রীতে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য ঘা পড়িল, সে আমাকে কোলে টানিয়া—"কে? তুমি? এস মা এস"—বলিয়া আদর করিতে গেল। আমি তার এই আদরের জ্বালায় সকলের বিদ্রূপ ভয়ে আরও অস্থির হইলাম। তার পর সকাল হইতে না হইতে সব দলের মধ্যে রটিয়া গেল আমি আজ ভোরে তিনকড়িকে চুমু খাইয়াছিলাম। দাদাদের দল আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দিদিদের দল সময় অসময়ে তিনকড়িকে দেখাইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। আমি যে অনবধানতাবশতঃ কতবড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি হাড়ে হাড়ে বুঝিতে লাগিলাম। তার পর হইতে তিনকড়ি

বুড়ীটার যাবজ্জীবন তাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইত।

আর একবার একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। তখনও মৃত্যুতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে কারও বাপ মা মরিয়া যাওয়ার মানে এই যে সে বাপ মার কাছে না থাকিয়া আর কাহারও কাছে থাকে। তাই আমি এক দিন আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিলাম—"তোমার যদি ভাই বাপ মা মরে যান, আর তুমি আমাদের ঘরে সারাদিন থাক, সে বেশ হয়।"

আমাদের দলপতিদিদির কর্ণকুহরে আমার এই নির্ব্বোধ মন্তব্যটি যেমন পঁহুছিল, তিনি হুঙ্কারিয়া উঠিলেন—"কি বলছিস্? দাঁড়া বলে দিচ্ছি সবাইকে।"

তিনি করিলেন কি, তৎক্ষণাৎ গিয়া ঘরে ঘরে সব অভিভাবকদের জানাইয়া আসিলেন। ঘরে ঘরে বড়দের বিচারাসনের তলে আমার তলব পড়িল। সকলে আমাকে গঞ্জনা দিলেন, লজ্জা দিলেন, ভৎর্সনা করিলেন—এমন কথা মুখে আনে!—এমন দুষ্ট মেয়ে! আমি নিতান্ত লজ্জাপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইলাম। শিশুর অস্ফুট মনের কাতরতা বড়রা বুঝিতে পারিলেন না। দিদিকে ভারি ভালবাসি, সেই কথাটি প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, তাহাতে অন্যায়টা কোথায় হইয়াছে তাহা ঠিক তলাইতে না পারিলেও, যখন ভৎর্সিত হইতেছি তখন ভয়ানক একটা কিছু অন্যায় যে নিশ্চয়ই করিয়াছি তাহা বুঝিলাম। সেই পর্য্যন্ত নিজের অসাধুতা ও দীনতা সম্বন্ধে একটা তপ্ত জ্ঞানের অঙ্কুর বালিকার মনে উপ্ত হইয়া রহিল।

শ্রীসরলা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সার আলফ্রেড ক্রফ্ট্ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বলিয়াছিলেন—"The University which was set up in our midst a generation ago has only just touched the surface of society and has not yet created an atmosphere favourable to learning or research * * * What then has his University training done for him? [i. e., the student]? It has sharpened his faculties and given his greater aptitude for mastering whatever practical work he may set his hand to, it has made him perhaps a ready writer or a fluent speaker,—but as to the higher life, the divine spark, all that we mean by the flower and the fruit of liberal education,—of that there is but little trace"—

কথাগুলা বড় শক্ত কথা; এরূপ শক্ত কথা শুনিতে শুনিতে আজ কাল আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। এক এক বার অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর গাহিতে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমাদিগকে শিখাইয়াছ কি যে, আমাদের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা কর। তোমাদের এই যে একটা নির্জীব চালুনি-যন্ত্র—যাহার নাম দিয়াছ বিশ্ববিদ্যালয়—তাহা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কেবল মোটা বিদ্যা আর সরু বিদ্যা ছাঁকিয়া আসিতেছে মাত্র। ঐ জড় পদার্থ হইতে কি "divine spark" জন্মায়? আর জাপানের সহিত তুলনা করিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবার পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষায় জাপানী

কত টাকা খরচ করে ও কি বন্দোবস্ত খরচ করে, তাহার সঙ্গে একবার আমাদের খরচের ও বন্দোবস্তের তুলনা করিয়া দেখা উচিত হয় না কি ?

কিন্তু সে উত্তর গাহিয়া বিশেষ ফল নাই। পরে আমাদিগকে তুলিবে না বলিয়া আমরা চিরকাল শুইয়াই থাকিব, এরূপ প্রতিজ্ঞাটা আমাদের পক্ষে শুভ নহে। আর আমাদেরও কি লজ্জার কথা নাই ? আমাদের ক্ষমতা কম, হাতে পায়ে শিকল, বুকে জাঁতা, গলা টিপিয়া শ্বাসরোধের ব্যবস্থা ; তবু উহারই মধ্যে একটু রক্ত চলাচলের নিদর্শন দেখান না চলে এমন নহে। সার্ আলফ্রেডের পরবর্ত্তী অনুযোগের উত্তর দেওয়া কঠিন ঃ—

"In such subjects as general physics and mathematics, it is true, workers in India have no special advantages, indeed they are to that extent handicapped by the volume of scientific knowledge existing in the world and by the rate at which it progresses—a rate which they can hardly hope to overtake. But there are other subjects in which Indian students varying enjoy unique and ample opportunities. To take a single example. It has been said that on the fundamental question of the origin of the Indian people, European scholarship is at a standstill for want of local Indian research. * * * Europe waits for a body of Indian workers to enter this utmost limitless field but it looks for them as yet in vain."

একথাটাও সত্য কথা। আমার স্বদেশীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি আমাদের নিজের ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা এমন অক্ষম কেন ?

ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন রিজলি ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন বীম্‌স্, হর্‌নলী গ্রিয়ার্স। এখানে ভারতবাসীর নাম দেখি না কেন ?

উত্তর দেওয়া হইবে, সাহেবদের, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর, এই সকল সংগ্রহে যে সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই। ঠিক কথা। একজন মোটা সাহেব কল টিপিলেই ভারতগবর্ণমেণ্ট সিমলা হইতে মাথা নাড়া দেন। সমুদয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আন্দোলন উপস্থিত হয়। পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারগণ সমাজ তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, কন্‌ষ্টেবলেরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, ডেপুটিবর্গ comparative mythology বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিখিতে বসেন ; সদরের সেরেস্তায় সমুদয় সরঞ্জাম সংগৃহীত হইয়া সরকারি মুদ্রাযন্ত্রে সরকারী খরচে ভীমাকৃতি গ্রন্থে পরিণত হয়। আমাদের সে অর্থবল, লোকবল, তোড়জোড়, যন্ত্রতন্ত্র নাই। আমরা একায়েক এই বিপুল ভারতবর্ষের এক কোণে বসিয়া কতটুকু কাজ করিব ?

ঠিক্ কথা, সেই ক্ষুদ্র কতটুকুর বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কতটুকুই বা করি না কেন ? কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধার গল্প ত আমাদের মধ্যেই আছে। কাজটা যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে, এতটুকুর বেশী পারি না—অতএব কিছুই করি না—এই সাফাই গাহিলে ধর্ম্মের দুয়ারে খালাস পাইব না।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এ স্থলেও আমরা এতটুকুর বেশী কাজ পারি না ? সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নিজের ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাহা মোটা সাহেবদের নাই, তাহা সিমলাশৈল বাসী ভারতগবর্ণমেণ্টের নাই। অন্ততঃ চৌকিদারের ও ডেপুটির চেয়ে বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে। নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে—পাপ হইবে।

সাহেবেরা আমাদের ভাষা বোঝেন না, আমাদের চরিত্র বুঝেন না; লর্ড কর্জ্জনের ভাষায় এসিয়াটিকের চরিত্রই সাহেবের দুরধিগম্য। একপক্ষে আমাদের অসুবিধা সহস্র দিকে, অন্যপক্ষে সাহেবদের অসুবিধা লক্ষ দিকে। অতএব এ ওজর চলিবে না।

বলা হইবে, সাহেবেরা যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। ভুল হইবারই কথা। তাহাতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। সাহেবেরা এত উর্দ্ধে অবস্থান করেন, যে দূরবীণ যোগেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যকলাপ ঠিক্ দেখিতে পান না। তাহার উপর আমাদের গায়ের গন্ধ এত বিকট যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য বহু উর্দ্ধে থাকিতে বাধ্য। তথাপি তাঁহারা যে দুটা কথা লেখেন ও বলেন, তাহা তাঁহাদের অনুগ্রহ ও বাহাদুরি। তাহার নিন্দা করা উচিত নহে।

স্বীকার করিলাম, তাঁহারা ভুল বলেন। কিন্তু আমরাই বা সে ভুল সংশোধনের কি চেষ্টা করিলাম। কেবল ঘরে বসিয়া হাসিলে সে হাস্য শ্বেতশরীরে কলঙ্কলেপ করিবে না। আমরা আমাদের সম্বন্ধে কয়টা নির্ভুল কথা জানি বা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি?

অথচ কথা জানিবার আছে। এ যে অতুল বারিধি—ইহার পার নাই; ইহার জলতলে কত রত্ন আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কেহ কি একবার সেই রত্নের জন্য জাল ফেলিবে না? এই ঔদাস্য, এই অশ্রদ্ধা মার্জ্জনীয় নহে। ইহা মহাপাতক।

মাতর্জ্জন্মভূমি, তোমার কোলে শুইয়া, তোমার স্তন্যে লালিত হইয়া আমরা এই জড়দেহ ধারণ করিয়াছি, তোমাকে আমরা চিনিতে চাহি না—তুমি কে, তাহা জানিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কোন্ কালে তোমার কি মূর্ত্তি ছিল, আমরা তাহা দেখিতে চাহি না,—কবে তুমি কেমন ছিলে, কেন তুমি এমন হইলে, তাহা অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন বুঝি না। তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণ কেমন ছিল, কি করিয়াছিল, আমাদিগের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের ব্যাকুলতা নাই। ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়া আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; সেই ঋণশোধে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ধিক্ আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে! প্রাচীনেরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহারা দেশের ইতিহাস লেখিয়া যান নাই। আমরা বৎসর বৎসর ইতিহাসে পাণ্ডিত্যের উপাধি লাভ করিতেছি, আমরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছি!

এরূপ তর্কও শুনিয়াছি—ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবার কি আছে যে, তাহার আলোচনা করিব? অরে হতভাগ্য,—বিদেশী আসিয়া যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া দিবে, তখন তাহা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের উপাধি লইবে! অরে পাপিষ্ঠ!

আবার এমন তর্কও না শুনিয়াছি এমন নহে—শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেব যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার ফলভোগ করিতেছি, জীবনে তাহা কাজে লাগাইয়া জীবনকে উন্নত করিতেছি, তাঁহারা কোন্ তারিখে জন্মিয়াছিলেন, কোন্ তারিখে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া কি লাভ? অরে চতুর! কেবল ঋণ গ্রহণ করিব—তাহার পরিশোধের জন্য ভাবিব না! ইতিহাস আলোচনা—উহা অতীতের উপাসনা—উহা পিতৃপুরুষের নিকট ঋণমোচনের একটা উপায়।

প্রাচীনেরা ইতিহাস আলোচনা করেন নাই; তাঁহারা এই ঋণদায়ে বদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কি ধর্ম্মে পতিত হইয়া গিয়াছেন? সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের সমালোচনায় ফল নাই, সে অনেক কথা—তাহাতে পুঁথি বাড়িবে, তাঁহারা যদি ধর্ম্মে পতিত হইয়া থাকেন, তবে জ্ঞাতসারে হন নাই! আমরা জ্ঞানকৃত পাপে পাপী হইতেছি।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান—আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিব। যেনপদার্থ বিদ্যা আর রসায়ন শাস্ত্র আর দেহতত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান—যেন কলের গাড়ীতে আর টিনের কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ—মানবতত্ত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে—ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত !

বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়—তাহা বিজ্ঞানের—বিষয় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আমাদিগকেই লিখিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না—তাহার জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক—তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা আমরা আমাদিগকে চিনি না—আমাদের ধাতুতে, মজ্জায় কি বল আছে তাহা জানিব না—আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইব না। আমাদের স্নায়ুযন্ত্র শিথিল থাকিবে, আমরা ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া শবদেহ লইয়া পূতিগন্ধ উৎপাদন করিব।

নতুবা আমরা আমাদের জননী মাতৃভূমিকে চিনিব না—আমাদের মাতৃভক্তি জন্মিবে না—সেই ভক্তি মহাভাবে পরিণত হইবে না—যে মহাভাব আমাদিকে মহৎ কার্য্যে প্রেরিত করিবে—যাহার বলে আমরা জয়শীল হইব—যাহার বলে আমরা লজ্জা হইতে ও অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। একমাত্র পন্থা;—অনেক ভাবিয়া দেখিছি, অন্য পন্থা আমাদের নাই;—আর সকল পথ বিপথ ও কুপথ। ইহাই এখন আমাদের কর্ম্ম—ইহাই আমাদের যুগধর্ম্ম।

এতগুলা লম্বা চৌড়া কথায় অসংযত লেখনীর চালনা করিয়া ফেলিলাম; বর্ত্তমান প্রবন্ধের শীর্ষভাগে লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নামক ক্ষুদ্র সমাজটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, একটুকু বুঝিয়া বলা আবশ্যক। ঐ ক্ষুদ্র সমাজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য স্বদেশের তত্ত্বের আলোচনা, উহার ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল নিরতিশয় ক্ষুদ্র। উহা কাঠ-

বিড়ালীর সাগরবন্ধনচেষ্টার মত ক্ষুদ্র ফল উৎপাদন করিয়াছে ও সম্ভবতঃ করিবে; কিন্তু উহা কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছে, অথবা চলিবে আশা করি বলিয়াই আজ এই ক্ষুদ্র লেখনীর চালনা করিতে বসিয়াছি।

একটা কথা বলিয়া রাখি—ঐ সমাজের সহিত উপস্থিত লেখকের বর্ত্তমান বৎসরে একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে; উহা অস্থায়ী সম্পর্ক। ঐ সমাজের কৃত বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা আমার সম্পাদকীয় উক্তি বলিয়া যেন গণ্য না হয়। উহা আমার ব্যক্তিগত কথা; উহার ফলাফলের জন্য ঐ সমাজ বা সমাজের সংস্পৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি নহেন।

সাহিত্যপরিষদের জীবনের এগার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। উহা এই এগার বৎসরে কি করিয়াছে একবার দেখা আবশ্যক।

আমি যতদূর জানি, প্রথমে যখন উহার উৎপত্তি হয়, তখন উহার উদ্দেশ্য কি তাহার সম্বন্ধে অতি অস্ফুট ধারণা ছিল। পরিষৎ স্বয়ং ঠিক জানিতেন না, তিনি কি কাজের জন্য অকস্মাৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

"বঙ্গ ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন"—এইরূপ একটা দীর্ঘছন্দের কথা উহার নিয়মাবলীর প্রথমপৃষ্ঠে মুদ্রিত আছে, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ পদসমষ্টির তাৎপর্য্য কতটুকু, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না।

কেহ আশা করিয়াছিলেন যে, অসদ্গ্রন্থকে সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সাহিত্যপরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যচন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক শশধরে পরিণত করিবে। ভাগ্যে পরিষৎ সেই সম্মার্জ্জনী ধারণ করেন নাই। ইংরেজের রাজ্যে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের দিনে আবর্জ্জনা পরিষ্কার মনুষ্যের অসাধ্য; ইংরেজের আইনে অসৎকে অসৎ

বলিলে আইনের আমলে আসিতে হয়। ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এতদিন পরিষদের সভ্যগণের পরস্পর সম্মার্জ্জনী প্রহারে প্রভাস যজ্ঞের পুনরভিনয় হইত মাত্র।

কেহ আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটা রমণীয় ভীমকান্ত স্বরূপ সর্ব্বদোষবিমুক্ত বিশুদ্ধ আদর্শ বাঙ্গালা ভাষা গঠন করিয়া ফেলিবে; তাহতে গ্রাম্যতা দোষ থাকিবে না, তাহাতে শ্রুতিকটু শব্দ প্রয়োগ থাকিবে না, তাহাতে বিদেশী গন্ধ থাকিবেনা, তাহা পরমপবিত্র সর্ব্বজনসেব্য বাঙ্গালা ভাষা হইবে। সাহিত্যপরিষৎ তাহাও করিলেন না, বা করিবার চেষ্টা করিলেন না। কেননা দুষ্ট সরস্বতী মানবের রসনায় আবির্ভূত হইয়া মানবকে দুর্ভাষা ব্যবহার করান, সে দেবতাকে সংযত করিবার কোন উপায়ই সাহিত্য পরিষদের হস্তে নাই। আর যাঁহারা সাহিত্যপরিষদের নৌকাখানির কর্ণধার, তাঁহারাই বিজ্ঞজনের মতে দুষ্ট সরস্বতীর প্রধান সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগের উপর শাসনদণ্ড সঞ্চালনের কোন উপায় নাই।

কেহ মনে করিয়াছিলেন, সাহিত্যপরিষৎ রাশি রাশি সদ্গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যকে একবারে উন্নতর পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিবে। কিন্তু সদ্গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সদ্গ্রন্থ প্রণেতার আবশ্যক এবং সদ্গ্রন্থ প্রণেতার প্রসবের ভার সম্প্রতি বঙ্গমাতার উপর—সাহিত্যপরিষৎ এ বিষয়ে বঙ্গমাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্প্রতি অক্ষম। অতএব এই উদ্দেশ্যও চলিল না।

কেহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীদের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যসেবার সফলত্ববিধান পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাহিত্যপরিষৎ স্বয়ং ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; সেই ভিক্ষাজীবীর অন্নে সাহিত্যসেবীর পোষণ অসাধ্য।

একবার একজন সভ্য নীতিগ্রন্থ রচনা করিয়া সন্নীতির প্রচারের জন্য সাহিত্যপরিষৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্ট যাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, সাহিত্যপরিষৎ তাহাতে হস্তক্ষেপে সাহস করেন নাই।

এইরূপে নানাজনে সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানা কথা তুলিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্দেশ্য যে সাহিত্যপরিষদের লক্ষ্যের বহির্ভূত, তাহা বলিতে পারি না। প্রস্তাবমাত্রই সাধু এবং সাধুসঙ্কল্পের সিদ্ধিতে যত্নবান্ হওয়াই উচিত;—সাহিত্যপরিষদেরও উচিত।

প্রথমে যখন সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হয়, তখন সুবিখ্যাত ফরাসী আকাডেমির আদর্শ অনেকের মনে ছিল। এমন কি সাহিত্য পরিষদের ইংরেজি নাম—Bengal Acadamy of Literature—সেই আদর্শেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী আকাডেমি যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতদুর সফল হইয়াছেন, ঠিক্ জানি না। হইয়া থাকিলেও হাতীর অনুকরণ মূষিকের পক্ষে বিজ্ঞানুমোদিত নহে।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্যপরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত সভাকে নিম্নোক্তস্বরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতার সাহিত্যসেবীদিগের ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রধান সম্মিলন স্থান। এইখানে তাঁহারা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার উপস্থিত হইয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় করেন, কাব্য দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এইরূপ একটি সাহিত্যিক আড্ডা নানা কারণে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসেবীদের সমাজে পরস্পর প্রীতি-

বন্ধনের ইহা একটা সমীচীন উপায়। উদ্দেশ্য মহৎ। দ্বিতীয়, এ দেশের ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি নিকট। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাপ্রণালীর পরিচালক। সাহিত্য পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতির উপর চক্ষু রাখিয়া বসিয়া আছেন। সাহিত্যপরিষদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার কিঞ্চিৎ আদর হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষদের প্রার্থিত শিক্ষা সংস্কার অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে। তৃতীয়, সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালীর পরিচালিত একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা; এবং বর্ত্তমান কালে উহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সাধারণকে একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝান আবশ্যক।

একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা বলিলে প্রথমেই ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার কথা মনে আসে। উক্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। আলোচনা সম্প্রতি ছাত্রবর্গকে তত্তৎ বিষয়ে উপদেশদানে পরিণত, বিজ্ঞান চর্চ্চা বা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতার অভীপ্সিত থাকিলেও উহা অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সাহিত্যপরিষৎ পদার্থবিদ্যা বা তৎশ্রেণিস্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। কিন্তু স্বদেশের ভাষা স্বদেশের সাহিত্য ও স্বদেশের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুশীলন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের আদর্শ অনেকটা বাঙ্গলার এশিয়াটিক সোসাইটির মত। ঐ প্রাচীন সোসাইটি এশিয়ার ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিৎতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে এক আধটা রসায়ন শাস্ত্রের বা গণিত শাস্ত্রের প্রবন্ধ বাহির করিয়া আমোদ বোধ করেন, কিন্তু এশিয়া মহাদেশের এবং মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও ভাষার অনুশীলন করিয়

এশিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠা ও কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া-ছেন। সোসাইটির পত্রিকায় যে সকল ব্যাঙের ও ফড়িঙের কথা প্রকাশিত হয়, তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বড় একটা বিস্ময় উৎপাদন করে নাই; কিন্তু সার উইলিয়াম জোনস্ ও কোলব্রুক ও প্রিন্সেপ প্রভৃতির কীর্ত্তিকথা পৃথিবী ব্যাপিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের জন্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুখ্যতঃ বাঙ্গালার জন্য আপনার চেষ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্য ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বৃহৎ ব্যাপার; উহাতে হস্তক্ষেপে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা সাহিত্য পরিষদের নাই। কাজেই সাহিত্য পরিষদের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকা উচিত মনে করি। আবার এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার বৃহৎ কারখানা লইয়াই এত ব্যস্ত, যে ক্ষুদ্র বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার ভাষা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের মত একটা স্বতন্ত্র সমাজ ইহা লইয়া নিযুক্ত থাকেন, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালায় আলোচনার কি আছে? কি নাই? বাঙ্গলার ইতিহাসের আমরা কি জানি? বাঙ্গালীজাতির কিরূপে উৎপত্তি হইল, কে বলিতে পারে? ইহার কতটুকু আর্য্য, কতটুকু অনার্য্য, কে বলিতে পারে? বঙ্গে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার কবে আরম্ভ, কিরূপে আরম্ভ, কে বলিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কবে, কিরূপে হইল? লক্ষ্মণ সেনের সময় বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় আছে কি? বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য্য শব্দ কত প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যেসকল অনার্য্য জাতি এই শব্দসম্পত্তি ভাষায় দিয়াছে, তাহারা গেল কোথায়? তাহাদের বংশধর কোথায়? বাঙ্গালার আচার ব্যবহার পূজা পার্ব্বণ পশ্চিম হইতে

কতটুকু বিভিন্ন—কেন বিভিন্ন—কবে হইতে বিভিন্ন, ইহা কে বলিতে পারেন ?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। এখন আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে—এই পূজা কোন্ দিন কিরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হইল ? জরাসন্ধের সময়ে ছিল কি ? অশোকের সময়ে ইহা ছিল কি ? পালরাজার ও সেনরাজার সময়ে এই মহামহোৎসব কি সম্পাদিত হইত ? যাঁহারা 'রাবণস্য বধার্থায়' শ্লোক তুলিয়া দুর্গোৎসবকে ত্রেতাযুগের আবিষ্কৃত পূজা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই ত্রেতাযুগের পূজা সমস্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এই বাঙ্গালার কোণ আশ্রয় করিল কেন ?

ইতিহাস আলোচনার দিকে আমাদের মতি একটু আকৃষ্ট হইয়াছে আনন্দের বিষয়। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত স্বাধীনভাবে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস আরম্ভ করেন; তাঁহার সম্বল ছিল কিন্তু ইংরেজের লেখা বহি। তার পর অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু, কেবল ইংরেজের বহির উপর নির্ভর না করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই ইতিহাস ইংরেজ শাসনের ইতিহাস ও মুসলমানের শাসনের ইতিহাস। ইহার মূল্য আছে; কিন্তু উহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস নহে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস এখনও আলোচিত হয় নাই। নগেন্দ্র বাবু কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। আশা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সিদ্ধিলাভ করুন। দীনেশ বাবু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন বলিলে ভুল হয়, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। এখন সেই খনি হইতে বিবিধ মণিরত্ন, কয়লা প্রস্তর সংগৃহীত হইতেছে মাত্র। সাহিত্য-পরিষৎ এই সংগ্রহ কার্য্য প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহিত্যপরিষদের এই মহৎ ব্রতে কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক। সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউক। এই সাহিত্যের খনি হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিত হইবে।

বাঙ্গালা দেশের এই ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, আমোদের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলন সাহিত্য পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহাই আমার ধারণা। এ স্থানে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—এখানে এখন দাঁড়াইয়া সীমা দেখিতে পাই না। খাটিবার জন্য লোক চাই—উচিত সংখ্যক লোক দেখিতে পাই না। যাহা হউক, মজুর খাটা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার আবশ্যকতা অনেকে বুঝিয়াছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ বিবেচনা করি।

সাহিত্য পরিষৎ অন্য কাজ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। পদার্থ-বিদ্যা রসায়ন জ্যোতিষ বেদ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়া চিত্তবিনোদন করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্র সাহিত্যপরিষদের নিজের নহে। পরিষৎ যেন নিজের কাজ না ভুলিয়া যান, ইহাই প্রার্থনা করি।

চাই এখন বঙ্গবাসীর সহানুভূতি—লোকবল চাই, আর অর্থবল চাই। গরিবের দেশের গরিব সভা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া স্বদেশীর নিকট দাঁড়াইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহার অনুরাগ আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে তাঁহার মুষ্টিভিক্ষা অর্পণ করুন। পরিষৎ সকলকেই সমাদরে আহ্বান করিবে। ভিক্ষাভাণ্ডে মাসে মাসে আট আনা প্রদান করিয়া তাঁহারা সাহিত্যপরিষদের সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা করুন।

যাঁহারা এই ভিক্ষাদানে অসমর্থ, তাঁহারাও পরিশ্রম দিয়া সাহায্য

করিতে পারেন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিন ; প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া, ব্রতকথা, গ্রাম্য কবিতা, গ্রাম্য গান, ছেলেভুলান গল্প, গ্রাম নগর পীঠস্থান দেবস্থান প্রভৃতির বিবরণ দেবস্থানীয় ইতিহাসের টুকরা, কিংবদন্তীর ভগ্নাংশ, যাহা কিছু দুই চোখে দেখিতে পান, দুই হাতে কুড়াইয়া পান, পরিষদের কার্য্যালয় লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকুন। পরিষৎ ভিক্ষুক, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বেতন দিবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁহারা দয়া করিয়া পরিষৎকে ভিক্ষা দিন। ভারতীর আশীর্ব্বাণী তাঁহাদের পুরস্কার হইবে।

উপসংহারে একবার ক্ষণেকের মত সম্পাদকীয় সাজ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীকে বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি—নিতান্ত সম্পাদকোচিত ভাষায় তাঁহাকে জানাইতেছি যে, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কার্য্যস্থান ১৩৭।১ কর্ণোয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তত্র উপবিষ্ট সম্পাদক—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন।

কিছুকাল ধরিয়া দেশের সুসন্তানদের মনে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছে—কি যেন হওয়া উচিত, কি যেন হইতেছে না,—কি না জানি করা যায়, কি জানি করিতে পারি ?

“নিউ ইণ্ডিয়া” পত্রিকায় কয়েক মাস ধরিয়া প্রথমে এইরূপ একটা আবেগের, সন্দেহের ও দ্বিধার ধারা মৃদুস্বরে প্রবাহিত হইতে থাকে। মৃদুস্বরে বলিতেছি, কেন না বহুশ্রুত নহে ; “নিউ ইণ্ডিয়া”র কতিপয়

হক ও অনুগ্রাহকগণের মধ্যেই তাহা স্বল্প মাত্র ঝঙ্কার করিয়া লাইয়া গিয়াছিল। গতবৎসর বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি যুক্ত আশুতোষ চৌধুরী সেই ধারাটা সশব্দে বহুলোকের শ্রুতি-াচরে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন।

তার পর বহুলোকের পক্ষপাতিতায় বহুবাদবিতণ্ডায় পুষ্ট সেই রাটি পুনায় রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ”-এর রূপ ধারণ করিয়া রও প্রত্যক্ষভাবে দেশের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাপ্তাহিকের লেখক যাহা পারেন নাই, ব্যবহারজীবী যাহা পারেন নাই, কবির লিকা তাহা সাধন করিল। ভাষার লালিত্যে, বর্ণের বৈচিত্র্যে, ভাবের াচুর্য্যে বিষয়টি আবালবৃদ্ধবনিতার মর্ম্মস্পর্শ করিল—এতদিন যাহা ধু মস্তিষ্কের কোটরজাত ছিল, আজ তাহা হৃদয়কন্দরে নীড় রচনা রিল।

কবির কল্পনার বিরুদ্ধেও বাদি-বিবাদি-বিসম্বাদি-দলের অভাব হয় াই। কিন্তু সব কেজো তর্কযুক্তির পরেও একটুখান অবশেষ ভাব াকের মনে রহিয়া গিয়াছে যে কবির কল্পনাটার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে না গলদ থাকিলেও উহার ভিতর কিছু খাঁটি কথা আছে, সেটুকু াটি সোণার মত, ফেলা যায় না। সেটুকু কি ? ভাষার মোহন ূপ ভাঙ্গিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া সে সোনাটুকু তুলিয়া লইলে দেখা যায় উহা সেই পূর্ব্বেরই আবেগ—যেমনটি চলিতেছে তাহা অচল—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং—এই তত্ত্বটি।

দ্বিধার আবর্ত্তে তরঙ্গিত হইয়া নানা লোকে নানা তীর খুঁজিতে ছিলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে তীর্থ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার তিষ্ঠা তখনও অবাস্তবরাজ্যে—সে তীর্থের একখানি ইটও এপর্য্যন্ত স্তিত্ব নাই। মাটি ছাঁচে ঢালা হইবে, পাঁজায় ইট পুড়িবে, এক

একখানি করিয়া ইট গাঁথা হইবে, তবে ঘাট প্রস্তুত হইবে; এবং তবে সে ঘাট সকলের ব্যবহারে আসিবে।

জাতীয় জীবনে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে প্রয়োজন বুঝিয়া নতুন গাঁথনিতে শক্তি ও কালক্ষয় করিতে হইবে। যদি বুঝি পুরাতন কোন গাঁথনিকে গড়িয়া পিটিয়া লইলে একই কাজ এমন কি বেশী কাজ হইতে পারে—তবে নতুনে শক্তির শ্রাদ্ধ করিতে কাহারও মন উঠিবে না।

পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম আমার মতে কংগ্রেস আমাদের সেইরূপ একখানি পুরাতন গাঁথনি। ইহাকেই কাজে লাগাইয়া লওয়া হউক—ইহার উপর অনেকটা জাতীয় শক্তি উদ্যম ও প্রীতি ব্যয়িত হইয়াছে—সেটা বাজে খরচ করিতে পারা যায় না। শুধু নতুনত্বের খাতিরে নতুন পথে ছুটিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। কোন্ পথটা আমাদের জাতীয় জীবনের বিশবৎসরের শিক্ষা ও অভ্যাসের অনুকূল তাহাই দেখা যাউক—সেই পথে গেলেই আমরা অধিকতর সাফল্য লাভ করিব—প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিবে।

আমার মত অনেকেই এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ভারতের সকল জাতির রক্তেমাংসে গড়া কংগ্রেসের মায়া তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না, এবং তাহা ত্যাগ করা অব্যবহারিকের কাজ মনে করিতেছিলেন। এই দলীয় কোন বিজ্ঞ বন্ধুর সহিত আলোচনা ক্রমে, কংগ্রেস-রূপ তৈরি যন্ত্রটির দ্বারা আমরা দেশের কতটা কাজ বাহির করিয়া লইতে পারি, সে সম্বন্ধে একটি সাঙ্গ-কল্পনায় উপনীত হওয়া গেল। এ কল্পনাটির উদ্‌যাতা বন্ধুবর, আমি কেবল তাহা সাধারণ্যে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

এ সম্বন্ধে গত ভাদ্রের ভারতীতে আমি লিখিয়াছিলাম, "কনগ্রেসের সফলতা যেখানে, প্রকৃত হিসাবী হইয়া তাহারও প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে। কংগ্রেস আমাদের একটি অনেক দিনের অনেক আয়োজনে তৈরি রথ,—চলিতেছে পথে। ইহার উপর চড়িয়া সারথি হইয়া ইহাকে ঠিক পথে চালানর চেষ্টা হউক—রথখানা একবারে বিসর্জ্জন করা পাকা গৃহস্থের কাজ হইবে না।"

এখন সেই সারথ্য কিরূপে করিতে হইবে তাহাই আজিকার প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয়। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য দুইটি, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এক এই যে,—যেটা আমি বলি প্রধান—দেশের সমস্ত লোককে একত্রীকৃত করা, ভারতবর্ষের সকলকে একটা সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রে দাঁড় করান, ঐকমতের সূত্রে সকলকে বাঁধিয়া ফেলা। দ্বিতীয় এই যে, সেই ঐকমত্যের চাপে সরকারকে নূতন বিধির প্রবর্ত্তন, কিম্বা প্রাচীন বিধির পরিবর্ত্তন—অথবা কোন বিশেষ রাজনীতির হেরফেরে প্রবৃত্ত করান।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান পাণ্ডারা হয়ত দ্বিতীয়টিকেই তাঁহাদের মুখ্য কাজ বলিয়া ঘোষণা করিবেন, কিন্তু ফলের পরিচয়ে আমি উহাকে মুখ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে কংগ্রেসের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা নহে। অনেকে হয়ত বলিবেন, কতকগুলি রাজবিধি কংগ্রেসের চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন সিবিল সার্ব্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও লবণের ট্যাক্স কমান। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন প্রার্থনায় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আর এই দুইটা সম্বন্ধেও এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, কংগ্রেসের উত্তেজনাতেই গভর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আয় ব্যয়ের অবস্থা অনুকূল হইলে লবণের ট্যাক্স হ্রাস করা হইবে, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা একথা বলিয়া আসিয়াছেন। আর সিবিল সার্ব্বিসের বয়স কখনও বাড়িয়াছে, কখনও

কমিয়াছে—এ সম্বন্ধে এতবার এত অদলবদল হইয়াছে যে, তাহা কংগ্রেসের কোন হাত আছে মনে করার অপেক্ষা ভিতরে ভিতরে অন্য কোন গূঢ় কারণ ছিল তাহাই মনে করা সঙ্গত। সুতরাং দে যাইতেছে যে, কংগ্রেসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসকে অকৃতকার্য্য বলিতে হইবে।

আর এক কথা; এক এক করিয়া যদি ধরা যায় তা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, যতগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়া —তাহা দেশের সর্ব্বসাধারণেই করিয়াছে; কাগজ পত্রে ঘোরত আন্দোলন আগে হইয়া থাকে, পরে তাহার সারাংশটুকু কংগ্রেসে প্রস্তাবে প্রতিবিম্বিত হয়; আন্দোলনের কার্য্য কংগ্রেস কিছু করেন না, সেটা জনসাধারণেরই কার্য্য। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ, মিউনিসিপাল বিল প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে জনসাধারণের আন্দোলনে যেখানে কিছু হয় না, সেখানে কংগ্রেসে আন্দোলনে যে কিছু কখন হইয়াছে ইহা আমরা দেখি নাই। আ ইহাই স্বাভাবিক। কংগ্রেস বৎসরে তিনটি দিনমাত্র বসে, সেই তি দিনের মধ্যে সম্বৎসরের সাধারণ আলোচনার সারটুকু শুকনে কাট ছাঁটাভাবে রেজলুসনের ছাঁচে ফেলিতে হয়। কংগ্রেসের যেটু প্রাণ, তাহা যথার্থ এই তিন দিনের,—আশ্বিনের দুর্গাপ্রতিমার মত যদিও সেই তিন দিনের জন্য সমস্ত বৎসর ধরিয়া অনেকটা আয়োজ করিতে হয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের হাত পা প্রভৃতি যতগুলি অবয়ব— প্রাদেশিক সমিতির বৈঠক, জেনারেল মিটিং প্রভৃতি—তাহাদে একমাত্র কাজ—এই তিন দিনের জন্য কংগ্রেসকে জীবন্ত করা সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই যে দেশজোড়া কংগ্রেস যন্ত্রখানা খাড় রহিয়াছে, তার সার্থকতা অতি অল্প। কংগ্রেসের শাখাসমিতি সম্বন্ধে উপ রাক্ত কথাগুলি প্রযুজ্য।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের যে সকল অভিযোগ আছে— যথা ইহার আভ্যন্তরীণ প্রণালী ভাল নহে, প্রতিনিধি মনোনীত করিবার রীতি যথাযথ নহে, ইত্যাদি—সে সব সম্বন্ধে আমার এখানে কিছু বক্তব্য নাই। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, হয় এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, না হয় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাইতে পারে এবং করা হইবে। আমরা কেবল কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী যদি সম্পূর্ণ আদর্শানুযায়ীও হয়, তাহা হইলেও তাহার ফলাফল কতটুকু তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান লক্ষ্য এবং কার্য্যের রীতি বজায় রাখিলে ইহার যে আদর্শ অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির সমবেত চেষ্টা ও শক্তি গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করার জন্য নিয়োগ করা। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, সেইরূপ আবেদন এক প্রকার নিষ্ফল। তবে কি হতাশ-ভাবে কংগ্রেস উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করাই সঙ্গত? তাহা নহে। আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কংগ্রেসের দুইটি উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম; কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটির সম্বন্ধে—যেটি আমাদের মতে প্রধান উদ্দেশ্য— আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কংগ্রেস আশাতীত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসরের আগেকার লোকের কাছে শুনিতে পাই, এখন তাঁহারা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে যে ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কংগ্রেসের পূর্ব্বে তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও ভরসা পাইতেন না। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, দেশে একটা বিরাট শক্তির উদ্রেক হইয়াছে। এই কংগ্রেসের দরুণ অন্ততঃ এইটুকু হইয়াছে যে, আজ ভারতবর্ষের সমস্তজাতি এক সঙ্গে মিলিয়া এক উদ্দেশ্যে কাজ করিতে পারে,—ইহাই একটা মহাশক্তি। এই

শক্তি যখন আমাদের আসিয়াছে, তার দ্বারা কতকগুলি সাধনের সম্ভাবনাও জাগিয়াছে—কিন্তু কাজে কিছুই করা হইতেছে না, সুতরাং সেই শক্তিটা বাজে খরচে যাইতেছে। এখন কিরূপে এই শক্তিটা ব্যর্থ না হয়, কিরূপে তাহাকে ফলবতী করা যাইতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষ আছে যাহা আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মনির্ভর, উদ্যমশীলতা, উচ্চ লক্ষ্যে শক্তি নিয়োগ প্রভৃতি গুণ আদৌ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না; এবং নিজেদের ও নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য আমরা এসকল গুণ এমন অনেক বিষয়ে ব্যবহার করিতে পারি, যাহার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন যোগাযোগ নাই বা যোগাযোগ থাকিবার প্রয়োজন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমরা নিজেদের ইউনিভার্সিটি করিতে পারি, বিদেশে ছাত্র পাঠাইতে পারি, লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া জল কষ্ট, পথকষ্ট প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারি। আমরা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলেও ঘর হইতে bounty দিতে পারি, শিল্পশালা খুলিয়া শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। অনেক সময় সাধ্যানুসারে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এই সকল বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও থাকি। কিন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল জাতি; আমাদের অর্থবল, মনোবল, উদ্যমের বল এ সকলই নিতান্ত ক্ষীণ। আমরা আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটা কেন্দ্রস্থ করিয়া কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হওয়ার কতকটা সম্ভাবনা থাকে।—যেমন ছোট ছোট নদী বর্ষাকালে কিছু কালের জন্য স্ফীত হইয়া গ্রীষ্মের দিন পড়িলেই শুকাইয়া যায়, কিন্তু সেইরূপ

অনেকগুলি ছোট নদী মিলিত হইয়া যখন একটি বড় নদীতে পরিণত হয়, তখন সে বড় নদী চিরকালই স্রোতস্বতী থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বিশেষের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা তার প্রাণ বেশী দিন থাকে না, ইহা ক্রমাগতই দেখিয়া আসিতেছি;—এবং ইহাও দেখিতেছি যে, এইরূপে অনেকটা শক্তি ক্রমাগত বৃথা খরচ হইয়া যাইতেছে। আমরা প্রত্যেকেই দুই একবার আরম্ভ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেই স্বভাবতঃ নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু যদি আমাদের সকলের শক্তি একত্র মিলাইয়া কাজ আরম্ভ হয়, তবে শীঘ্র হাত গুটান যাইবে না।

এখন সকলকে মিলাইয়া কাজ করিবার একটা যন্ত্র আমাদের হাতের কাছেই আছে, সেই যন্ত্র কংগ্রেস। তবে কোন একটা যন্ত্রকে যেমন নূতন কাজে লাগাইতে হইলে কখনও তার দুই এক অংশ বদল করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, সেইরূপ হয়ত কংগ্রেসের উপর কোন নূতন কার্য্য চাপাইতে হইলে তাহারও দুই এক স্থানের একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে।

এখন দেখা যাউক কংগ্রেস কি প্রকারের কার্য্য হাতে লইতে পারে এবং তাহা কিরূপে চালাইতে পারে। প্রথমতঃ কোন কিছুতেই হাত দিলে টাকার দরকার, সেই টাকা কংগ্রেস কিরূপে পাইবে আর কি প্রকারে তাহা খাটাইবে? টাকা কি প্রকারে পাওয়া যাইবে তাহা পরে বলিব। এখন দেখা যাক্ টাকা যদি তাঁহাদের হস্তগত হয় তাহা হইলে তাঁহারা কি করিতে পারেন। আর যাহা করিতে পারেন তার কি পর্য্যন্ত সার্থকতা—অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনেক বিষয় আছে যাহা আমাদের নিজেদের আয়ত্তের অধীন। সেই সকল কাজ কংগ্রেসের যন্ত্রের দ্বারা করিতে পারিলে সবচেয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা। কংগ্রেস যদি

সেই সকল কাজ নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া চালান, তাহা হইলে আমাদের যথার্থ স্বায়ত্তশাসন হইবে, আত্মোন্নতি বিষয়ে তাহা হইলে আমরা একটি ছোট খাট রিপাব্লিক হইয়া দাঁড়াইব। এই স্বায়ত্ত-শাসনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোন যোগাযোগ থাকিবে না, কোন সংঘর্ষও থাকিবে না; এই সাধারণতন্ত্রের ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট হইবে কংগ্রেস; তার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সমিতিগুলি। প্রাদেশিক সমিতির অধীনে জেলা-সমিতি জেলার উন্নতি বিধানের ভার গ্রহণ করিবেন, এবং জেলা-সমিতির নীচে কতকগুলি পল্লী লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সমিতি গঠিত হইতে পারে, আরও যদি বিস্তৃত করা যায়, তবে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিব। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে স্বীয় ভাণ্ডার হইতে প্রাদেশিক অনুষ্ঠানের জন্য রাজস্বের অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কংগ্রেসও সেইরূপ প্রাদেশিক সমিতির হাতে তার ইম্পিরিয়াল ফণ্ড হইতে কিছু কিছু অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে, প্রাদেশিক সমিতি-গুলিও আবশ্যক অনুসারে অধীনস্থ শাখাগুলির প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে। সংক্ষেপে ইহাই কার্য্য প্রণালী। কিরূপ কার্য্য এই প্রণালীর দ্বারা চালিত হইবে, তাহার আভাসও পূর্ব্বে দিয়াছি। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে নয়।

এখন আমরা মোটামুটি পাইলাম, শাসনকর্ত্তা ও শাসনতন্ত্র। এখন প্রজা কোথায় আর রাজকোষ কোথায়? এইরূপ স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্বেচ্ছা প্রজা হইতে হইবে। প্রথমতঃ জেলায় জেলায় তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক—কাঁহারা কাঁহারা স্বেচ্ছায় এইরূপ সমাজের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। এই প্রজারা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা জেলাসমিতির সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলি প্রভিন্সল কাউন্সিল বা প্রাদেশিক সমিতির এবং প্রভিন্সল কাউন্সিলস-

গুলি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অথবা কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচনা করিবেন। এই সমস্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রজারা স্বীকার করিবেন যে, কংগ্রেস যে হারে আমাদের এই রিপাব্লিকের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা সেই হারে কর দিবেন। আয়ের উপর শতকরা মাত্র আট আনা করিয়া যদি কর নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলেও মোটের উপর যদি সমস্ত ভারতবর্ষে শুধু ত্রিশ হাজার মাত্র প্রজা থাকে এবং যদি গড়ে তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়াও আয় হয়, তাহা হইলেও কংগ্রেসের আয় হইবে বাৎসরিক ৯০,০০০৲ টাকা। কিন্তু যাহা ধরা গিয়াছে তাহা এত অল্প, যে আশা করা যায় ফলে ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী আয় দাঁড়াইবে, এবং এই আয় হইতে কংগ্রেস অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

এইত গেল কল্পনাটি। এখন অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে ইহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন হইবে, স্বেচ্ছানুগত প্রজাদের নিকট স্বেচ্ছাধীন কর আদায় করা দুঃসাধ্য হইবে, এবং অবশেষে এই ভাবের অন্যান্য প্রস্তাব যেরূপ কল্পিত হইয়া নিরর্থক হইয়া গিয়াছে এটিও সেইরূপ হইবে। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আমার শুধু এইটুকু মাত্র বলিবার আছে যে, এখন আমরা ছোট ছোট নানা কার্য্যে ক্রমাগত শক্তি ও অর্থ বিক্ষিপ্ত করিয়া বিরক্তি ছাড়া আর কোন লাভ পাই না। কখন্ কোথায় পাঁচ জন কি দশ জন মিলিয়া এক নূতন সভা স্থাপন করিয়া, আমাদের কাছে চাঁদার খাতা লইয়া উপস্থিত হয়, তার কিছু স্থিরতা নাই, কাজেই চাঁদার খাতা দেখিলে পলাইবার চেষ্টা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যখন একটা বড়, দেশব্যাপী অনুষ্ঠান—স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্যে উদ্যোগী দেখিতে পাইব, তখন যৎসামান্য কর দিতে বোধ হয় অনেকেই কুণ্ঠা অনুভব করিবেন না। এবং এরূপ একটা বৃহৎ কার্য্যের সহযোগিতায়—পুঞ্জীভূত শক্তির সহিত ব্যক্তিগত

উদ্যম ও শক্তিও যোগ দিতে আকাঙ্ক্ষিত হইবে। আর যদি এই ভাবের একটা বিরাট অনুষ্ঠানের দ্বারাও আমরা সফল না হই, তবে ছোট ছোট অনুষ্ঠানে সফলতার আশা আরো অল্প, অতএব একেবারে হতাশ হইয়া সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

অন্যদিকে দেখিতে হইবে, আমরা কৃতকার্য্য হইলে কতদূর ফল ফলিবে। প্রথমতঃ স্বায়ত্ত শাসন আমরা দানস্বরূপ না পাইয়া নিজের উদ্যমে নিজের জোরে যথার্থরূপে অধিকার করিব। এক রকমে গভর্ণমেণ্টের সহযোগী এবং সমকক্ষ হইব। আর ইহাতে যদি আমরা যথার্থ যোগ্যতা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে অন্যান্য বিষয়েও নূতন নূতন অধিকার আমরা সজোরে দাবী করিতে পারিব। অক্ষমতার অছিলা করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী আর উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। জোর যার মুলুক তার। যেদিন আমাদের একযোগে কাজের নৈতিক জোর পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন গভর্ণমেণ্টের একতরফা ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবে।

একটি কথা বলিতে বাকী রহিয়া গেল। এ শাসনতন্ত্রে দণ্ডের ব্যবস্থাটা কিরূপ? সামাজিক জীবের যাহা শাস্তি—নামকাটা, দলচ্যুতি এবং তাহার ঘোষণা ছাড়া আপাততঃ আর কিছু নহে। ক্রমে যদি এই রিপ্লাবিক গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হইয়া উঠিতে পারে, তবে স্বীয় অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বিধায়ে কতকগুলি বিশেষ বিধি প্রচলনের ব্যবস্থাও আদায় করিয়া লইবে।

শ্রীসরলা দেবী।

অমোঘ বজ্র।

(বৌদ্ধ প্রচারক—খৃঃ অব্দ ৭০৪-৭৭৪)

এ তমসাচ্ছন্ন সংসারে জ্ঞানালোক বিতরণ করাই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা এই লক্ষ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন এবং সময়ে সময়ে ভারতের বহিঃপ্রদেশে গমন করিয়া তথায় বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। উদ্যান, খোটান, খাসগড় তুরস্ক, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, যাব প্রভৃতি স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপেই প্রচারলাভ করিয়াছিল। কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ, অনুরুদ্ধ স্থবির, রামচন্দ্র কবিভারতী প্রভৃতির জীবনচরিতে ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্য যে মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র চীনদেশ। এই মহাত্মার নাম অমোঘবজ্র।

অমোঘবজ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৭০৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারতে* তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় গুরু বজ্রবোধির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ৭১৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে উপস্থিত হন। বজ্রবোধি চীনদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া আসন্নমৃত্যু হন। ইহাতে তদানীন্তন চীন সম্রাট সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। বজ্রবোধির মৃত্যু হইলে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া যাইবে, এই আশঙ্কা করিয়া চীন সম্রাট্ বৌদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্য অমোঘবজ্রকে ভারতবর্ষ ও সিংহলে প্রেরণ করেন। বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অমোঘবজ্র ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন-রাজধানীতে ফিরিয়া যান। ইহাতে চীনরাজ (হুয়েন্ চুঙ্) অতীব সন্তুষ্ট হইয়া

* Eitel ও Mayers বলেন অমোঘবজ্রের জন্মস্থান সিংহল। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

তাঁহাকে "প্রজ্ঞাকোশ" এই উপাধি প্রদান করেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি দক্ষিণসমুদ্রের সন্নিহিত প্রদেশে আগমন করিতে না করিতেই চীনরাজ তাঁহাকে আরও কিছুকাল চীনে অবস্থান করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে তাঁহাকে কয়েক বৎসর দক্ষিণ চীনে অপেক্ষা করিতে হয়। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের অদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে ফিরিয়া যান। ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন চীন সম্রাট্ তাইচুঙের জন্ম-মহোৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে অমোঘবজ্র সম্রাটের নিকট হইতে "ত্রিপিটকভদন্ত" এই উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বেই অমোঘবজ্র অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বানুবাদিত কতিপয় গ্রন্থ সম্রাটের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় অমোঘবজ্র নিম্নলিখিত ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ৭১৯ খৃষ্টাব্দে আমি চীনদেশে আগমন করিয়াছি। ৭১৯ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর কাল আমি স্বীয় গুরু বজ্রবোধির সেবা করিয়াছি। বজ্রবোধির সমীপে যোগসম্বন্ধে আমার অনেক শিক্ষালাভ হইয়াছে। তদনন্তর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে আমি ভারতে পঞ্চ প্রদেশে গমন করিয়া তথা হইতে অন্যূন ৫০০ বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ কখনও চীনদেশে আনীত হয় নাই। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে আমি চীনদেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কাল মধ্যে আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছি।

বস্তুতঃ ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর কাল মধ্যে অমোঘবজ্র ৭৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আরও অনেক পুস্তক অনুবাদিত করিয়া ৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি চীনরাজধানীতে দেহ

ত্যাগ করেন। এই বৎসর সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজমন্ত্রী" ও "পরিশুদ্ধ-বিপুল-প্রজ্ঞ মহাবক্তা" এই উপাধিদ্বয় প্রদান করেন। এইরূপে আঙ্ বংশের রাজত্বকালে তিনি চীন দেশে বহু সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে তান্ত্রিক মত সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে প্রচার লাভ করে।* চীন ত্রিপিটকে তাঁহার অনুবাদিত সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮ খানি পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

* ১। মহামায়ূরী বিদ্যারাজ্ঞী, ২। চুন্দীদেবী ধারণী, ৩। মারীচ দেবী পুষ্পমালা-সূত্র, ৪। মরীচীধারণী, ৫। জাতানন্তমুখধারণী, ৬। সর্ব্বতথাগতাধিষ্ঠানহৃদয় গুহ্যধাতুকরণ্ডমুদ্রাধরণী, ৭। মহাশ্রীসূত্র, ৮। মহাশ্রীদেবী-দ্বাদশবন্ধনাষ্টশতনাম বিমল মহাযানসূত্র, ৯। জঙ্গলী বিদ্যা, ১০। রত্নমেঘধারিণী, ১১। শালিসম্ভবসূত্র, ১২। রাষ্ট্রপালপ্রজ্ঞাপারমিতা, ১৩। মহামেঘসূত্র, ১৪। ঘনব্যূহসূত্র, ১৫। পর্ণশবরী-টারণী, ১৬। বৈশ্রবণ দিব্যরাজসূত্র, ১৭। মঞ্জুশ্রীপরিপৃচ্ছাসূত্র-অক্ষমমাতৃকাধ্যায়, ১৮। পঞ্চত্রিংশদ বদ্ধনাম পূজাস্বীকার লেখ, ১৯। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব নির্দেশ সমন্তভদ্রধারণী, ২০। অষ্টমণ্ডলক-সূত্র, ২১। চক্ষুর্বিশোধনবিদ্যাধারণী, ২২। সর্ব্বরোগপ্রশমনধারণী, ২৩। জ্বালাপ্রশমনধারণী, ২৪। যোগসংগ্রমহার্থ-আনন্দপরিত্রাণ-ধারণী-জ্বাল-বক্ত্-কল্প-সূত্র, ২৫। এক চূড়ার্য্যধারিণী, ২৬। আমোঘ-পাশবৈরোচন বুদ্ধ-মহাভিষিক্ত-প্রভাসমন্ত্র সূত্র, ২৭। নীতিশাস্ত্র সূত্র, ২৮। তেজঃ-প্রভা-মহাবলগুণাপদ্বিনাশশ্রীধারিণী, ২৯। বজ্রশেখর সর্ব্বতথাগত সত্যসংগ্রহ-সমাযান প্রত্যুৎপন্নাভিসম্বুদ্ধ মহাতন্ত্রসূত্র, ৩০। ও-লি তো-লো (?) ধারণী, ৩১। উষ্ণীষ চক্রাবধারণী, ৩২। বোধিমণ্ডনির্দেশৈকাক্ষরোষ্ণীষচক্রবর্ত্তিরাজ সূত্র, ৩৩। বোধি-মণ্ডবৃহ্যধারণী, ৩৪। মহামণিবিপুলবিমান-বিশ্বসুপ্রতিষ্ঠিত-গুহ্য-পরমরহস্য-কল্পরাজ-ধারণী, ৩৫। প্রজ্ঞাপারমিতা অর্দ্ধশতিকা, ৩৬। বজ্রশেখর যোগসূত্র, ৩৭। মহা-প্রতিসরা ধারণী, ৩৮। মহাযানযোগবজ্রপ্রকৃতি সাগর মঞ্জুশ্রী-সহস্রবাহ-সহস্রপাত্র-মহাতন্ত্ররাজসূত্র, ৩৯। বজ্রভরসন্নিপাত-বৈপুল্যকল্প-অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব-ত্রিভাবানুত্তরহৃদয়-বিদ্যারাজসূত্র, ৫০। মহাবৈপুল্য-মঞ্জুশ্রী সূত্র—অবলোকিতেশ্বর-তরবোধিসত্ত্ব কল্পসূত্র, ৪১। যোগবজ্রশেখর সূত্রাক্ষরমাতৃকা-ব্যাখ্যা-বর্গ, ৪২। গরুড়গর্ভরাজতন্ত্র, ৪৩। একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব হৃদয়মন্ত্র অধ্যায় কল্পসূত্র, ৪৪। ত্রিসময়চর্য্যা ক্রোধরাজদূতাধ্যায় ধর্ম্ম, ৪৫। বজ্রকুমারতন্ত্র, ৪৬। সমন্তভদ্রপ্রণিধানস্তোত্র, ৪৭। মহাযাননিদান শাস্ত্র, ৪৮। বজ্রশেখরযোগানুত্তর ...ক্রসম্বোধিচিত্তোৎপাদ শাস্ত্র, ৪৯। যোগেকাক্ষরোষ্ণীষ চক্রসম্ভ্রান্ত দানকল্পৈকাক্ষ-

রোষ্ণীষচক্ররাজযোগসূত্র, ৫০। বজ্রশেখরসর্ব্বধাগতসত্যসংগ্রহ মহাযানপ্রত্যুৎপন্নাভিসম্বুদ্ধ মহাতন্ত্ররাজসূত্র, ৫১। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব সর্ব্বর্ষিনির্দ্দেশ-পুণ্যাপুণ্যকাল-দিবস-নক্ষত্র-তারাসূত্র, ৫২। বজ্রশেখরযোগসহস্রবাহু-সহস্রাক্ষ-অব-লোকিতেশ্বর-বোধিসত্ত্ব-চর্য্যা-কল্পসূত্র, ৫৩। মহাসুখ বজ্রসত্ত্বচর্য্যা সিদ্ধ কল্প, ৫৪। তদ্ধপুণ্ডরীকসূত্ররাজসিদ্ধ-যোগ-ধ্যান-জ্ঞান-কল্প, ৫৫। বজ্রশেখরযোগত্রিভব-বিজয়সিদ্ধিমহাগুহ্যদ্বার, ৫৬। বজ্রশেখর যোগপরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তিসত্যতাপর্বৎসমস্তভদ্রচর্য্যাধ্যায় কল্প মহাযক্ষমাতৃপুরিয়-পুত্রসিদ্ধি কল্প, ৫৮। অবলোকিতেশ্বর চিন্তামণি-অধ্যায় কল্প, ৫৯। মহাবৈরোচন-সূত্রপাঠ ক্রম, ৬০। শীঘ্র ফলোদয়হেশ্বরদেবভাষিত অবিধ কল্প, ৬১। মহার্য্যমঞ্জুশ্রী কুমার পঞ্চাক্ষরযোগকল্প, ৬২। মহাবলক্রোধ-উষ্ম কল্প, ৬৩। মহামায়ুরী বিদ্যারাজ্ঞী চিত্রপ্রতিবিম্বমণ্ডলকল্প, ৬৪। বজ্রশেখর যোগবজ্র সত্ত্বকল্প, ৬৫। একাক্ষরসুবর্ণচক্ররাজ-বুদ্ধোষ্ণীষ মহার্থ সংক্ষেপাধ্যায় কল্প, ৬৬। অবলোকিতেশ্বর-চিন্তামণি যোগাধ্যায় কল্প, ৬৭। মহার্য্য মহাভিরতিদ্বিকায়বিনায়ক কল্প, ৬৮। মহাবৈরোচদসূত্রসংক্ষেপ, ৬৯। পঞ্চাক্ষরধারণী গাথা, ৭০। কারুণিকরাজ প্রজ্ঞাপারমিত ধারণী ব্যাখ্যা, ৭১। মহাসুখ বজ্রমোঘসত্যসময়সূত্রপ্রজ্ঞাপারমিত বুদ্ধি ব্যাখ্যা, ৭২। বজ্ররাজবোধিসত্ত্ব-গুহ্যাধ্যায় কল্প, ৭৩। বজ্রশেখরানুত্তর প্রথমমযোসমস্ত ভদ্রবোধিসত্ত্বাধ্যায় কল্প সূত্র, ৭৪। বজ্রশেখর যোগবজ্রসত্ত্বপঞ্চগুহ্যচর্য্যাধ্যায় কল্প, ৭৫। অমিতায়ুস্তথাগতধ্যান চর্য্যাপূজা কল্প, ৭৬। অমৃতকুণ্ডলীবোধিসত্ত্বপূজাধ্যায় সিদ্ধিকল্প ৭৭। অবলোকিতেশ্বর তারাযোগাধ্যায় কল্প, ৭৮। আর্য্যাবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব হৃদয়মন্ত্র-যোগ ধ্যান চর্য্যা কল্প, ৭৯। মহাকাশগর্ভ বোধিসত্ত্ব অধ্যায়কপ্প, ৮০। কারুণিকরাজপ্রজ্ঞাপারমিতধ্যায়-কল্প, ৮১। অক্ষোভ্যতথাগত্যাধ্যায়পূজাকল্প, ৮২। সর্ব্বদুর্গতিবুদ্ধোষ্ণীষবিজয়ধারণাধ্যায় কল্প, ৮৩। আর্য্যাক্রোধরাজমহর্দ্ধিফলোদয় সিদ্ধাধ্যায় কল্প, ৮৪। মহাযানবৈপুল্ব মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ব-বুদ্ধাবতংসক মূলতন্ত্র, ৮৫। মহাযানবৈপুল্য তন্ত্র, ৮৬। বজ্রশেখর যোগসূত্রমঞ্জুশ্রী বোধিত্বকল্পপূজাধর্ম্ম, ৮৭। যোগ পুণ্ডরীকবর্গধ্যায় কল্প, ৮৮। বজ্রশেখরসূত্রাবলোকিতেশ্বররাজতথাগতচর্য্যাকল্প, ৮৯। বজ্রপাণি-প্রভাসমূর্দ্ধাভিষিক্ত সূত্রানুত্তর মুদ্রার্য্যাচলমহাক্রোধরাজাধ্যায় কল্প, ৯০। বজ্রশেখরযোগ, ৯১। একাক্ষর-বুদ্ধোষ্ণীষচক্ররাজধ্যায় কল্প, ৯৩। বজ্রশেখরপুণ্ডরীকবর্গহৃদয়াধ্যায়কল্প, ৯৪। সমন্তভদ্র বজ্রসত্ত্বযোগাধ্যায়কল্প, ৯৫। বজ্রশেখরযোগহোলকল্প, ৯৬। মহাকারুণিক হৃদয়-ধারণীচর্য্যাধ্যায়সংক্ষেপকল্প, ৯৭। মঞ্জুশ্রীপঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ৯৮। বজ্রশেখরসূত্রযোগমঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বধর্ম্মৈকবর্গ, ৯৯। অষ্টাদশপরিষদবজ্রশেখর যোগসূত্র, ১০০। হারীতী মাত্রী মন্ত্রকল্প, ১০১। মহাবপূল্য বুদ্ধাবতংসকপত্রধর্ম্মধাত্বতারাধ্যায়দ্বাচত্বারিংশৎ অক্ষয় ধ্যান, ১০২। প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি সূত্র মহাসুখানোঘসজয় সত্য বজ্রবোধি সত্ত্বাদিসপ্ত-দশর্য্যমহামণ্ডলব্যাখ্যা, ১০৩। ধারণী নাম সংগ্রহ, ১০৪। বজ্রশেখরপোষসপ্তত্রিংশ-দার্য্য পূজা, ১০৫। বোধি-হৃদয় শীলচর্য্যা, ১০৬। মহার্য্যমঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ববুদ্ধিধর্ম্মকায় প্রশংসা পূজা, ১০৭। শত সাহস্রিকমহাসন্নিপাত সূত্র-ক্ষিতিগর্ভ-বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মকায়-পরিপৃচ্ছাস্তোত্র, ১০৮। যোগমহার্থ সংগ্রহ-জ্বালবক্ত্র-অন্নদ-কল্প।

মদন-ভস্ম।

গাহিছে অপ্সরাগণ গীতি মনোহর,
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর,
যোগিবর আপনি যে আপনার প্রভু—
বিঘ্নশত টলাতে না পারে তাঁরে কভু। ৪০
লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন,
বামকরে হেম বেত্র করিয়া ধারণ,
অধরে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে,
"থাম্ তোরা থাম্" বলি ভূতগণে শাসে। ৪১
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর,
বলিহারি প্রহরীর এমনি শাসন,
চিত্রলেখা সম ভায় সমস্ত কানন! ৪২
পান্থ যথা যাত্রাকালে শুক্রমুখ করয়ে বর্জ্জন,
নন্দীর দর্শন-পথ পরিহরি তেমনি মদন
মহেশের ধ্যানাশ্রমে সন্তর্পণে উত্তরিল গিয়া,
বিশাল নমেরু শাখা প্রান্তে যার রহে বিস্তারিয়া। ৪৩

কুমার সম্ভব—মদন দহনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেহস্মিন্ হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব,
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি। ৪০
লতাগৃহদ্বারগতোহথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ,
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈশীৎ। ৪১
নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং,
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে। ৪২
দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে,
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ। ৪৩

আসন্ন মরণ নাকি তাই স্মর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে.
দেবদারু বেদী পরে ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত,
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির বীরাসন-ধৃত,
নত দুই স্কন্ধমূল, পাতা করতল
অঙ্কমাঝে অবিকল ফুল্ল শতদল। ৪৪-৪৫
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ বন্ধন
অক্ষমালা দুই ফের কাণেতে বেষ্টন,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়। ৪৬
স্তিমিত নয়ন তারা কিঞ্চিত প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে কিছু নাহি বিকার আভাস,
পলক নাহিক নেত্রে, নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন। ৪৭
অন্তশ্চর প্রাণবায়ু নিরোধ কারণ
বৃষ্টি-পূর্ব্ব জলপূর্ণ জলদ যেমন,
কিম্বা নিস্তরঙ্গ সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর—
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা, দীপ সম স্থির। ৪৮

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাং,
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ। ৪৪
পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়ং ঋজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসং,
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে। ৪৫
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রং,
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্। ৪৬
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ,
নেত্রৈরবিস্পান্দিতপক্ষ্মমালৈঃ লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ। ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং,
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। ৪৮

মনেরও অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর,
অদূরে নিরখি তাঁরে ধ্যানে নিমগন,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থর থর,
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি,' না জানে কখন। ৫১
হেন কালে গিরি'সুতা আইলেন তথা,
পিছে পিছে সখীদ্বয়, অরণ্য-দেবতা,
কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভ নিভ প্রায়,
আবার উঠিল জ্বলি রূপের ছটায়। ৫২
"অশোক" সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
হেমকান্তি কাড়িয়া শোভয়ে "কর্ণিকার,"
"সিন্দুবার" মুক্তারূপে করেন ধারণ,
বসন্ত-কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ। ৫৩
স্তন ভারে চারু তনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত;
কুসুম-স্তবক-ভরে কিঞ্চিৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! ৫৪
যাঁর রূপরাশি হেরি লাজে মরে রতি,
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখিয়া তথি,
জিতেন্দ্রিয় শূলী পরে স্বকার্য্য সাধিতে—
ভরসা জনমে পুন মদনের চিতে। ৫৭

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যং,
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ। ৫১
নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন,
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যাং অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা। ৫২
অশোক নির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগম্ আকৃষ্ট হেমদ্যুতিকর্ণিকারম্,
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারম্ বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী। ৫৩
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্,
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। ৫৪
তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাং,
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস। ৫৭

এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যত পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইল পার্ব্বতী,
শম্ভুও পরম জ্যোতি পরম আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান ধারণায়। ৫৮

ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন,
ভুজঙ্গপতির সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার তাহে হল গুরুতর। ৫৯

হর-পদতলে নন্দী প্রণমি তখন
নিবেদিল, সেবার্থে গৌরীর আগমন,
ভ্রূক্ষেপ-ঈঙ্গিত মাত্রে বুঝি অনুমতি
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি। ৬০

উমার সে সখী দুটী প্রণমিয়া শঙ্কর চরণ,
বিছাইলা পুষ্পগুচ্ছ সপল্লব, স্বহস্ত-চয়ন,
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমে যেমতি ভক্তিভরে,
কর্ণ হ'তে পল্লব, অলক হ'তে কর্ণিকার ঝরে। ৬১-৬২

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্,
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম। ৫৮
ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ,
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ। ৫৯
তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্,
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্। ৬০
তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য,
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ। ৬১
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্,
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়। ৬২

"অনন্য-ভাজন পতি হোক্ তোর" হরের যে কথা—
অব্যর্থ আশীষ সেই—ঈশ বাক্য না হয় অন্যথা। ৬৩

বহ্নিমুখ-কামী কাম, পতঙ্গ সমান,
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান,
উমার সমক্ষে ধরি ফুল শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুর্গুণ করে আকর্ষণ। ৬৪

হেনকালে গিরিবালা, তাম্ররুচিপাণি,
মন্দাকিনী পদ্মবীজ মালাগাছি আনি,
(রবিকর-বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর করে অরপিলা বালা। ৬৫

ভকত বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালাগাছি করিয়া আদর,
অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে জুড়িল কুসুম-শরাসন। ৬৬

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
বিম্বাধরা উমা পানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ। ৬৭

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন,
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থং। ৬৩
কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ,
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ। ৬৪
অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ,
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্ম্মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালাং। ৬৫
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ,
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বাধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্। ৬৬
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ,
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি। ৬৭

উমাও রাখিতে নারে মনোভাব ঢাকি,
কদম্ব-পুলক-তনু, লজ্জানত আঁখি ;
ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর,
তাতে মুখখানি আহা! হল চারুতর। ৬৮
এ হেন ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ বশিত্ব প্রভাবে
মুহূর্ত্তে সম্বরি যতী মহাদেব এবে,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে,
করিলা নয়ন-পাত দিগ্দিগন্তরে। ৬৯
দেখিলেন কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার,
দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টিলগ্ন তার, স্কন্ধ নত আর,
আকুঞ্চিয়া বাম পদ স্থিরভাবে করে অবস্থান,
প্রহারে উদ্যত যেন কন্দর্প সদর্পে ফুলবাণ। ৭০
তপোভঙ্গ চেষ্টা হেরি হর-ক্রোধ বিবৃদ্ধ তখন,
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে তাঁর হল কিবা দুষ্প্রেক্ষ্য আনন,
তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা সহসা ছুটিল,
"ক্রোধ, প্রভু, সম্বর, সম্বর" বলি আরব উঠিল।
গগনে গগনে হোথা যেমনি উঠিল দৈববাণী,
হর নেত্রানলে হেথা ভস্মশেষ স্মর-তনুখানি। ৭১-৭২

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিবৃন্বতী শৈলসুতাপি ভাবং অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ,
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন। ৬৮
অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুঃ দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিং। ৬৯
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদং
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিং। ৭০
তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যো-ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য,
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়া-দক্ষ্নঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত। ৭১
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি,
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার। ৭২

ইম্পীরিয়লিজ্ম্।

বিলাতে ইম্পীরিয়ালিজ্মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীনদেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎসৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবল্-প্রথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে এইরূপ বড় বড় মৎলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এসকল মৎলব টেকেনা— কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জ্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সে দিনকার এক অলক্ষণে' বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ "এম্পায়ারে" অধিকার দাওনা।

কথার ছল ধরিয়া-ত কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্ব্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাঁহারা আমাদের উপরওয়ালা, তাঁহারা ইম্পীরিয়ালবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তিবোধ করি না।

পাঠকরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কি, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি ইম্পীরিয়ালিজমের বুলি আওড়াক্ বা নাই আওড়াক্ তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে ত অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে কারতে পারে না। কেন না হাজার হইলেও দয়ামায়া একেবারে ছাড়া কঠিন। কিন্তু একটা বড়গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাঁহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় "শিকার" তবে সে আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষ্যে যে ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙ্গিয়া দেয়, সে ব্যক্তি শিকারীর চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ, অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারীর দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্ব্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্ম্মম হইতে পারেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্য্যন্ত কখনই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ নামক একটা সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোলাণ্ড ফিন্‌ল্যাণ্ডরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কর্জ্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোল।

কোনো শক্তিমানের কাণে একথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেন না, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিসর্জ্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কাণে মন্ত্র আওড়াইতেছে "যদেতৎহৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়িত দূরে থাক্।

আমাদের বেলায় বিচার্য্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজমের পক্ষে প্রতিকূল, অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মত অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ

এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি!"

ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরাজসভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি বলা যায় "ইম্পীরিয়ুলিজম্" তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম্ম, কি প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্ম্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল্ রোডস্ একজন ইম্পীরিয়াল্ বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্যলোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কাজকে চৌর্য্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা এজম্-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই জন্য আমাদের কর্ত্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়ালিজ্মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড় রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্ম্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মের দোহাই

দিলে কাহারো কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্ম্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ান্‌গণ যখন দুর্ব্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটী অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস্ তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়ালিজ্মতত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে পলিটিক্সের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. * * And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেখ্য।

হিন্দুস্থানের বাদশা জাহান্‌গীর একদিন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের রাজদূত রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহেব, ফিরিঙ্গির মুল্লুক আমার হিন্দুস্থানের কাছে কোন্ বিষয়ে বড়" ?

সাহেব তখন অনেক দিন এদেশে কাটাইয়াছেন ; হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যে ভুল বিশ্বাসটুকু লইয়া তিনি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, দিল্লীর চাঁদনী চৌকে এবং বাদসাহের খাস্‌মজ্‌লিসে দুই একবার যাতায়াত করিয়াই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। এদেশের সোনার তঞ্জাম, হাতির হল্‌কা, শিকারী চিতাবাঘ প্রভৃতি দেখিয়া বাদশাহকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে একটা ফিটন্ গাড়ি এবং এক জোড়া ভাল কুত্তা উপহার দিতে তাঁহাকে যে সবিশেষ লজ্জা পাইতে হইয়াছিল, একথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তবু এদেশের কাছে বেলাত কিছুতেই হার মানিতে চাহিল না ! সাহেব কোটের পকেট হইতে একখানি মেমের ছবি বাদশার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "এমন তস্‌বীর হিন্দুস্থানে যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন বিলাতেরই জিৎ রহিল"।

খাস্ দরবারের এই ঘটনায় সমস্ত দিল্লীসহর যে প্রকার বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাবুল থেকে হঠাৎ একটা বিদ্রোহের সংবাদ আসিলেও সেরূপটা হইত কিনা সন্দেহ। আজ সহরে লোকের মুখে আর অন্য কথা নাই ! ঘরে বাহিরে, চৌরাস্তার মোড়ে, গলি ঘুঁজিতে সর্ব্বত্র সেই একই কথা। পানের দোকানের সামনে সৌখিন লোকেরা সেই বিলাতি ছবিরই কথা পেড়েছে, আমির ওমরাহের মজলীসে সেই কথারই তর্ক উঠেছে, রাস্তার চুড়িওয়ালী এক্কার গাড়ওয়ান এমন কি জলের ভিস্তিরা পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গীর এই স্পর্দ্ধার কথা নিয়ে বলাবলি করিতেছে। যে

দিল্লীর তস্‌বীর জগদবিখ্যাত, তার সঙ্গে ফিরিঙ্গী সাহেব টক্কর দিতে চায় ? মহাল থেকে মহল্লায় মহল্লায় জাহান্‌গীর বাদশার পেয়াদা ছুটিল ; দিল্লীর ছোট বড় নক্সাওয়ালা, ওস্তাদ, কারিগর, নামজাদা তস্‌বীরওয়ালা মিণা বাজারে একত্র হ'লে বাদশা তাদের মাঝে সেই বিলাতি ছবিখানা ফেলে দিয়ে নকল করিবার হুকুম দিলেন,—আসলের সঙ্গে যেন তিল তফাৎ না হয়—হিন্দুস্থানের পঁচিশ জন প্রসিদ্ধ কারিগর একমাস ধরে সেই তসবীরের নকল ওঠাইতে লাগিল। দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে বিলাতের সেই দুধে আল্‌তায় সুন্দর রং সোণার তারের মত চিকণ কেশ ফরাসী ছিটের লতাপাতা ওস্তাদের কলমের মুখে গজদন্তের পটের উপরে অবিকল ফুটে উঠিল, কেবল সমুদ্রের মত নীল চোখের তারা দুটির কাছে সমস্ত কারিগরের সব কৌশল ব্যর্থ হল ! তসবীরের চোখ কোনটার হল তামড়া আভা, কোনটার কালো, কোনটার বা ফিরোজার মত নীল। বাদশা মহা ক্ষাপ্পা হয়ে উঠিলেন, কারিগরদের উপর ধমক, সোরসরাবত চলিতে লাগিল। যে বিলাতী ছবির জন্যে এতটা কাণ্ড, জগতের জ্যোতি নূরজাহান বেগম সে বিলাতী ছবিটা একবার অন্দর মহলে আনিয়ে দেখিলেন, তার পরে বাদসাকে বলিলেন—"লাহোরে সরিফ ওস্তাদ বুলে এক তসবীরওয়ালা আছে, সে একদিন ইচ্ছা করলে এ ছবির অবিকল নকল ওঠাতে পারে।" বাদশার কাজে সরিফ ওস্তাদ দিল্লীর দরবারে হাজির হল ; বাদশা তাকে ডেকে বল্লেন—এ তসবীর তুমি কতদিনের মধ্যে নকল করে দিতে পার ;—ওস্তাদ বল্লে—জাঁহাপানা তিন রোজ, কিন্তু খোদাবন্দ বুড়ো হয়েছি চোখের আর তেজ নাই কিঁ জানি চুক্ হতে পারে ! উজীর সাহেবের ঘরে এক ছোকরী আমার কাছে তসবীরের কাম্ অনেক দিন ধরে শিখেছিল, এখন তার জোয়ান বয়েস, সেই অবিকল এই তসবীরের নকল ওঠাতে পারে। তার হাতও যেমন দোরস্ত, আঁখেরও তেমনি তেজ আছে।—বাদশা আবার নূরজা হানের শরণাপন্ন হইলেন। বেগম বলিলেন—আমার বাপের বাড়ির এক ছোকরী এই কাম জানে বটে ; কিন্তু এখন সে বড়লোকের

ঘরে বাঁদি হয়েছে। সে যে তসবীর ওঠাতে রাজি হয়, এমন তো বোধ হয় না, দেখি চেষ্টা করে।

বেগমের কাছে আশ্বাস পেয়ে জাহান্‌গীর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিন দিন পরে বাদশার হুকুম তামিল হল। ছবির নকল প্রস্তত, এবার নকলে আসলে একটুও প্রভেদ নাই। সেই চোখ, সেই রং। এবার সাহেবের হার হল, বাদসা যখন দরবারের মাঝে হাজার হাজার আমির ওমরাহ নক্সাওয়ালা কারিগর লোকলস্করের সামনে সাহেবের তুই হাতে তুইখানি ছবি দিয়ে বলিলেন "তোমার কোনটা চিনে লও" সাহেব উত্তর দিলেন, জগজ্জয়ী জাহান্‌গীর যখন আমার বিপক্ষে তখন জয়ের আশা তো ছিলই না, এখন জগজ্জ্যোতি নূরজাহানের কৃপা ভিন্ন আসলে নকলে ভেদ বুঝিবার সাধ্যইবা কাহার?" সাহেব এক ঢিলে তুই পাখি মারিলেন—বাদশা বেগম তুজনকেই খুসি করিয়া দিলেন—তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল বাদসাহের দরবারে কথার দাম কাঁচা মাথাটার চেয়ে অনেক বেশি—সাহেবকে রীতিমত খেলাত দিয়া জাহান্‌গীর দরবার ভঙ্গ করিলেন।

দিল্লীর ছোট বড় সকলেই যখন হিন্দুস্থানের জয়ে এবং সাহেবের চাটুবাদে উৎফুল্ল হইয়া ঘরে চলিয়াছে, কেল্লার ফটকে নাকরাখান নহবতের বাঁশিটা আজ যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু যখন জোরে জোরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন অন্দর মহলে বাদশার হুজুরে নূরজাহান বেগম দরবার জনাইলেন "খোদাবন্দ বাঁদীর জন্য কিছু বখ্‌শিসের হুকুম হয়"! বাদশা সেই দিনের ছাপা একটি নতুন মোহর বেগমের হাতে দিয়া বলিলেন "বিবি তোমার ইনাম্ এবার এই"! মোহরের একপিঠে অপূর্ব্ব সুন্দরী নূরজাহানের মূর্ত্তি লেখা আছে, আর এক পিঠে লেখা আছে—জগতের জ্যোতি নূরজাহানের সম্পর্কলাভে স্বর্ণের গুণ আজ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশী তাঁত।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। কোন বক্তা হয়তঃ সমস্ত জটিলতা দূর করিবার ভার গ্রহণ করিয়া অতি সহজ ও নিশ্চিন্ত পন্থা আবিষ্কারের বাহাতুরী লইতেছেন,—তাঁহাদের মতে সহসা সায় দেওয়া উচিত হইবে না; কারণ বিষয়টি এত জটিল যে, এক কথায় কেহ ইহার মীমাংসা করিতে চাহিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। "যাহা হইতেছে হউক," বলিয়া যাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পন্থাও-নিরাপদ নহে। এখন সাধারণের পক্ষে এইটি জানা উচিত কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, কি কুফল উৎপন্ন হইতে পারে। তাঁহারা এ বিষয়ে সাবধান হইলে শেষে বিশেষ বিশেষ উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত লইয়া কাজ করিতে পারিবেন।

কোন দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সেই দেশে কি কি সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সে দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক সংস্থান, রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধার কথা এবং তথাকার শিল্পিগণের ক্ষমত প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি কিরূপে হইল, তাহা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, ইংলণ্ডের প্রচুর পরিমাণে কয়লা, চিনে মাটি, লৌহ এবং অপরাপর উপকরণ প্রাপ্ত হইবার সুবিধা আছে। ইংরেজগণ সমস্ত জগতে স্বীয় শিল্প দ্রব্য চালাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, এবং শিল্পের নানারূপ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধেও তাঁহারা অগ্রগণ্য। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ও দেশজ উপকরণ সম্বন্ধে ভারতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। ইহার রাজনৈতিক অবস্থাও অনুকূল। কারণ, দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং

স্থায়ের অধিকার বিদ্যমান। এইরূপ শান্তির সময় স্বভাবতঃ দেশের শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গত দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষ শিল্প সম্বন্ধে ইহার জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে,—তাহার কারণ ভারতের শিল্পিগণ উদ্ভাবনী-শক্তির প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

এখনও শিল্পসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি ভারতীয় লোক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি সূত্র মুখস্থ করা ছাড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে হাতে খড়ি হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—যন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে সর্ব্বত্র একটু সময়ের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ সাধারণ সূত্রগুলি জানিয়া লোকের এই পথে আকৃষ্ট হওয়া দরকার, এখন তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকেরা বৈজ্ঞানিক ভাবে কারবার পরিচালনার জন্য মূলধন খাটাইতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন। এখনও তাঁহারা এ পথটি অর্থ লাভের নিশ্চিত উপায় মনে করেন না,—পূর্ব্বাপর যে সকল বিষয়ে মূলধন খাটাইতে তাঁহারা অভ্যস্ত, তদ্‌বহির্ভূত বিষয়ে অগ্রসর হইতে তাঁহারা সাহসী নহেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পাশ্চাত্য জগতের কারবারে বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথাকার লোকেরা এসম্বন্ধে স্বাবলম্বন ও উদ্যোগ অধ্যবসায়ে যতটা অভ্যস্ত হইয়াছেন, ভারতবাসীদের তাহা হইতে সময়সাপেক্ষ। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আর একটু অনুকূলতা প্রদর্শন করা উচিত; কারণ য়ুরোপীয় অধিকাংশ স্থানে এবং আমেরিকায় গবর্ণমেণ্টকে ব্যক্তিগত চেষ্টার সম্বন্ধে শিল্পবাণিজ্যের যতটা উৎসাহ দিতে দেখা যায়,—ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও ততটা অগ্রসর হন নাই।

বস্ত্রবয়নে ভারতীয় তন্তুবায়ের যে জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা গত দুই শত বৎসরে অনেকটা লোপ পাওয়ার মধ্যে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে বলসম্পন্ন বিদেশী প্রতিযোগিতাই ভারতীয় শিল্পের অবনতির

কারণ। এজন্য অধিকাংশ লোকে মনে করেন, জগদ্ব্যাপী বৈজ্ঞানিক্-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীদের একটা স্থান করিয়া দেওয়াই ইহাদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়; বহুযুগ-প্রতিষ্ঠিত স্বীয় জাতীয় ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া পল্লীগুলিকে মিলের ধূম্রে অন্ধকার করিয়া ফেলা এবং হাতের শিল্প বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠিত করাই ভারত-লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। তাঁহারা মনে করেন, য়ুরোপে যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, ভারতের ইতিহাসে তাহাই অনুকরণীয়। এই প্রথা অবলম্বিত হইলে ভারতের পল্লীগুলি উজার হইয়া যাইবে। নগরগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় লোকাকীর্ণ হইবে, এবং অর্থবান্ ও দরিদ্রের মধ্যে কলহ প্রধূমিত হইয়া উঠিবে। এই অসম প্রতিযোগিতার কুফল য়ুরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসীর প্রকৃতি এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুকূল নহে। জাপানের লোকেরা অনেকটা স্বাবলম্বনপ্রিয়; বিদেশীভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও শিল্প সম্বন্ধে উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিতে ইহারা অধিকতর দক্ষ,—এজন্য ভারতবাসীদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাহাদের তুলনা হয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণামে ভারতীয় শিল্পীকে জাপানী ও চিনের শিল্পী হইতেই অধিকতর বেগ পাইতে হইতে পারে।

কিন্তু বিদেশীয় ক্ষেত্রে ভারতশিল্প পুনরায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে স্বগৃহের অভাব পূরণকরা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিদেশীয় অভাব ও রুচি তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্যতা দূরপরাহত।—দেখা যাইতেছে ত্রিশ কোটি ক্রেতা ভারতের দ্বারস্থ, ইহাদের অভাব দূর করিবার চেষ্টাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রথমতঃ স্বদেশের নষ্ট-বাণিজ্যের উদ্ধার করা হউক, তৎপর বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, বিলাতী বৈজ্ঞানিক

কলকারখানার অনুকরণ না করিলে বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখ হইতে স্বীয় নষ্ট ব্যবসায় উদ্ধার করা কি সম্ভবপর হইতে পারে? এই বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে হস্তের প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদির উন্নতিও তদ্দ্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হওয়ার যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তাহা উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই সুসঙ্গত নহে। গত ৫০ বৎসরে বিলাতী কল কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা দেশীয় হস্ত-নির্ম্মিত শিল্পের কল্যাণে ব্যয় হইলে ঢের বেশী উপকার হইত।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে শিল্পীর সংখ্যা অসম্ভবরূপে প্রচুর, তাহাদিগের উপর যে ব্যয় হয়, অন্য দেশের তুলনায় তাহা অত্যল্প। এই দুইটি অনুকূল অবস্থার মধ্যে ভারতের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। কেহ কেহ বলেন, যন্ত্রাদির ব্যবহার না শিখাইয়া হস্তের কার্য্যে শিল্পীদিগকে নিযুক্ত রাখিলে তাহারা চিরকালই কুলী হইয়া থাকিবে। এরূপ আশঙ্কা কল্পনামূলক।

এখন দেখা যাইতেছে, হাতের তাঁত আবহমান কাল হইতে এদেশে একভাবেই আছে—কিন্তু ইহার উন্নতি-বিধান অতি সহজ। ধরুন, যদি ইহার উন্নতি করিয়া কার্য্যের শক্তি ১৫ গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তাহার অর্থ এই যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে ট্যাক্স স্থাপিত হইবে। এরূপ হইলে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পী অনেক পরিমাণে ইহার নষ্ট স্থান উদ্ধার করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতীয় হাতের তাঁতের কার্য্যশক্তি শুধু ১৫ গুণ নহে, চেষ্টা করিলে ১০০ শত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়,—এখনও এদেশে অতি সামান্য আদিম অবস্থোচিত তাঁত হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীর সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের পরিচায়ক তাঁতের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তাঁত গুলির উন্নতি সাধন অতি সহজ।

যুরোপে যদিও কলের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের জন্য অনেকদিন হাতের শিল্প একবারে উপেক্ষিত হইত, এখন ক্রমশঃ তথাকার উর্দ্ধতন সম্প্রদায় তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া হস্তের কর্ম্মের জন্য শিল্পীর সন্ধান করিতেছেন। কলের কাজ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পীর হাতের কাজ ঢের ভাল হয়; ইটালীতে রেসমের হাতের কাজ এখনও হইয়া থাকে, ও তাহা য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রশংসিত। স্কাণ্ডানেভিয়াতে স্ত্রীলোকেরা এখনও তাহাদের পরিবার কাপড় এমন কি সূতা পর্য্যন্ত নিজেরা বয়ন করিয়া থাকে। খাস্ ইংলণ্ডে যেখানে যন্ত্রের প্রতাপ দেশময় ছাইয়া পড়িয়াছে, তথায়ও এখন নানাস্থানে হাতের শিল্পের কারখানা খোলা হইতেছে,—লোকেরা কলের বস্ত্র হইতে হাতে তৈরি কাপড় বেশী পছন্দ করিয়া থাকে এবং অনেক স্থলে কল উঠাইয়া হাতের কাজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাজারে শিল্পীর যেরূপ সংখ্যায় প্রয়োজন, সেরূপ সংখ্যায় তাহারা জুটিতেছে না। এ সম্বন্ধে লণ্ডনের শিল্পসমিতিতে মিস্ ক্লাইভ বেলি যে বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—"রেশমের কারবারের জন্য শিল্পীর চতুর্দিক হইতে প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে—বহুলোকাকীর্ণ বড় বড় নগরী হইতে সুদূরে সাফোক্, এসেক্স, ইপস্‌উইচ, ব্রেনট্রি, সাদবাড়ী প্রভৃতি পল্লীর মুক্তবায়ুতে হস্তশিল্পের কেন্দ্রস্থান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তথায় ইহা অসামান্যরূপ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।"

যদি উৎকৃষ্ট তাঁতি পাওয়া যায়, তবে কলের কাপড় দ্বারা যে পরিমাণে লাভ পাওয়া যায়, হাতের তাঁতে তদপেক্ষা অল্প লাভ হয় না—কলে যেরূপ মূলধন খাটাইতে হয়, হাতের তাঁতের ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সে তুলনায় নগণ্য। কল আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সাজসজ্জা সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পূর্ণ করিতে বিস্তর সময় নষ্ট হয়,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সুদক্ষ শিল্পীর হস্তে যেরূপ হয়, কল হইতে সেরূপ

প্রত্যাশা করা যায় না। হাতের কলে কারবার ফেল হওয়ার আশঙ্কা খুব কম, কলে তাহা বেশী।"

ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষে ঢের বেশী পরিমাণে সুদক্ষ শিল্পী পাওয়া যাইতে পারে,—শিল্পীর বেতনও এদেশে ঢের অল্প, এমতাবস্থায় ইংলণ্ডের যখন হাতের শিল্প কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সফল হইতেছে—তখন ভারতবর্ষের এসম্বন্ধে কৃতকার্য্যতা বিষয়ে আর কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। দেশীয় শিল্পের নানা বিভাগে যে কতকটা উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে দেশীয় কাঁসার কাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন কাঁসার কোনরূপ দীপাধার বা পাত্র তৈরি করিতে হইলে কারিকরগণ ছাঁচ মোমে ঢালিয়া নির্ম্মাণ করে, মোমে ছাঁচে একটি বই জিনিষ তৈরি হয় না, এবং অনেক সময় ও সামগ্রী ক্ষতি হইয়া যায়, কিন্তু মোমের ছাঁচ নির্ম্মাণ না করিয়া কাঠ কিম্বা কোন ধাতুনির্ম্মিত বালুর ছাঁচ তৈরি করিবার একটি সহজ উপায় আছে। ইহাতে ছাঁচ নষ্ট হয় না, একটি ছাঁচ দ্বারা অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে এবং অনেক সময় বাঁচিয়া যায়।

আমি মাদ্রাজের শিল্প বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে—ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণ বিভাগে এই উপায়টির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শুনিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি আবার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক চ্যাটারটন সাহেব প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি প্রতি জেলার মিউনিসিপালিটি ও বোর্ড এই সকল বিষয়ে শিক্ষিত কারিগর দেশের শিল্পের কেন্দ্রস্থান গুলিতে পাঠাইয়া দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দান করেন, তবে প্রভূত উপকার হইতে পারে।

আর একটি কথা এই যে, এ দেশের লোকের শিল্প সম্বন্ধে রুচি অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণে বিদ্যার

উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল,—প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দির সমূহে এদেশে স্থাপত্য বিদ্যার বিচিত্র নিদর্শন রহিয়াছে। বিগত ১৫০ বৎসরে বিলাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণে একরূপ বিকৃত রুচি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এদেশে উজ্জল ও মহিমান্বিত স্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন অসংখ্য,—সেই গুলির ভালরূপ জ্ঞান হইলে জাতীয় শিল্প নূতন প্রাণ পাইবে। এদেশের সরকারী আফিস সমূহ বিকৃত বিলাতি শিল্পের আদর্শে রচিত হওয়াতে দেশীয় লোকের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, যদি এদেশীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে ভারতবাসীরা যত্ন করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবেন। দেশীয় কারিকরগণ দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইতেছে; কিন্তু স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষীয় কারিকরগণের দ্বারা তাঁহার অস্বারণের প্রাসাদ সজ্জিত করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট স্থাপত্যাদর্শ বিদ্যমান থাকিতে স্বীয় প্রাসাদগুলি কেন যে বিকৃত বিলাতী আদর্শের অনুকরণে শ্রীহীন করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

দেশীয় তাঁতের উৎকর্ষ সাধিত করিলে তাহা নিশ্চয়ই সুফল উৎপাদন করিবে। শিল্প-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন—ফরিদপুর এবং পাবনা সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত জেলা দুইটির অনেক স্থলে নূতন ধরণের হাতের তাঁত ব্যবহৃত হওয়াতে শিল্পিগণ পূর্ব্বে যেস্থলে মাসিক ২।৩ টাকা উপায় করিত, এখন সেইস্থলে ৪।৫, টাকা অর্জ্জন করিতেছে। কুষ্টিয়াতে পার্ব্বতী বাবু আরও সুফল দেখিয়াছেন, তথায় নবপ্রবর্ত্তিত তাঁতের দ্বারা কারিগরগণ মাসিক, ৫৲ টাকার স্থলে ১০৲ টাকা অর্জ্জন করিতেছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলে এখন হাতের তাঁত চলিতেছে,—শ্রীরাম

পুরের তাঁত পল্লীর তন্তুবায়গণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রচলি তাঁতকে একটু নূতনভাবে তৈরি করিয়া লইলে এখনকার আয় হইতে দ্বিগুণ আয় দাঁড়াইবে অথচ এই নূতন সংযোগকার্য্যে প্রতি তাঁতে ১২৲ হইতে ১৫৲ টাকার বেশী খরচ নাই। সূতা যত সূক্ষ্ম ব্যবহৃত হইবে শিল্পীর হস্ত সেই পরিমাণে নিপুণ হওয়ার আবশ্যক।

বিজাপুরে শ্রীরামপুরের তাঁত হাতের তৈরি সূতায় চলিতেছে—ইহাতে খুব সুফল দেখা গিয়াছে। বঙ্গদেশে যন্ত্রপ্রস্তুত সূতাই আজকা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিঃ পি, এন্, দের নিকট চিনসুরার এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দের নিক শ্রীরামপুরের তাঁতের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানী তাঁ অমৃতসরের মিঃ এস, এম, সাফি—তাঁহার কারখানায় ব্যবহার করিতে ছেন, ইহা হাতে না চালাইয়া পায়ে চালাইতে হয়,—ইহাতে অনে বেশী পরিমাণ বস্ত্র অল্প সময়ের মধ্যে বয়ন করা যায়। কিন্তু ব্যয় বে পড়ে। ইহা কাঠ এবং লৌহ নির্ম্মিত এবং তৈরি করিতে সরঞ্জাম মজুরী শুদ্ধ ৫০৲ টাকার মধ্যে পড়িবে। কলিকাতা ২৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স জেসোপ এণ্ড কোম্পানি এইরূপ তাঁত বহু সংখ্য বাজারে সস্তাদরে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এই তাঁত ৪৫ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীটস্থ মেসার্স ক্ষেত্রমোহন দে এবং ১ ন গার্ষ্টন প্লেসস্থ মেসার্স ষ্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জি স্মিথ জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকেন।

আর এক প্রকার নূতন ধরণের তাঁত আহম্মদনগরের শিল্পবিদ্যাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই তাঁতের ব্যবহার বোম্বা প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।

যাঁহাদের কিছু মূলধন আছে, তাঁহাদের পক্ষে অমৃতসরে মিঃ সাফি প্রবর্ত্তিত জাপানি তাঁতই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

মেসার্স রবার্ট হলের প্রবর্ত্তিত এক প্রকার হাতের তাঁত আয়র্লণ্ডের অনেক পর্ণকুটীরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেসার্স হ্যাটারস্‌লির তাঁত একটু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে উৎকৃষ্ট,—উহা য়ুরোপের রোমানিয়া প্রভৃতি স্থলে অত্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এই তাঁত কায়রো এবং আণ্ডামান প্রভৃতি স্থানেও ব্যবহৃত হইয়া আশাতীত সুফল উৎপন্ন করিয়াছে। ইংলণ্ডে মেসার্স হ্যাটরস্‌লির তাঁত ম্যাঞ্চেষ্টারের বার্লিন এবং কো এবং ভারতবর্ষে কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ডরোডের মেসার্স শ, ওয়ালেস এণ্ড কোং সরবরাহ করিয়া থাকেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের জলডন ষ্ট্রীটের র‍্যাফেল এণ্ড কোং নূতন একরূপ তাঁত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—তাঁহাদের তাঁত ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই তাঁত খুব সহজ উপায়ে নির্ম্মিত এবং খুব মজবুত।

তাঁতচালান শিক্ষার ব্যবস্থা।

শ্রীরামপুরের তাঁত পরিচালনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ চিন্‌সুরাতে শ্রীযুক্ত পি, এন্ দে দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রয়োজন হয়,—তিনি তাঁহার অধীনস্থ তন্তুবায় পাঠাইয়া তাঁত পরিচালনা করিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। জাপানি পদ-চালিত তাঁতের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ অমৃতসরে মিঃ সাফির নিকট পাওয়া যাইতে পারে। মহীশূরের রাজা স্বীয় অধিকারে তাঁতের ছোট ছোট কারখানা খুলিয়াছেন। নর্সিপুরের কারখানা খুব জাঁকালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ত্রিবন্দ্রাম সহরে সম্প্রতি একটি কারখানা খুলিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার সন্নিহিত কোন স্থানে তাঁত চালনা শিখাইবার বিদ্যালয় শীঘ্র খুলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তথায় সুদক্ষ ইংরেজ শিক্ষক তাঁতিদিগকে শিক্ষাদান

করিবেন। এই উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বরোদার মহারাজাও তাঁহার অধিকারে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে আহম্মদ নগরের শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁতের শিক্ষা পরিচালনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার শ, ওয়ালেস এণ্ড কোং হ্যাটার্সলির তাঁত চালাইতে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। জাপানে টোকিও নগরীর শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিলাতে এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ইয়র্কসায়ারের লিড্‌স নগরীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। *

ই, বি, হাভেল।

কর্ম্মফল।

(১)

বাল্যেই আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আমার পিতা দরিদ্র ছিলেন। আমার সেবার জন্য যে একজন দাসী নিযুক্ত করেন, এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা। গৃহে অপর আত্মীয়রও অভাব। বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই আমার পালনের ভার লইতে হয়।

তবে তাঁহার পালনটা আমার পক্ষে বড় প্রীতিকর হইল না। প্রকৃতির একটু অস্বাভাবিক উগ্রতা, তাঁহার অন্য সমস্ত গুণকে নিমজ্জিত করিয়াছিল। আমরা ভাল কুলীন—ফুলে বিষ্ণুঠাকুরের

* এই প্রবন্ধ হাভেল সাহেব "ভারতীর" জন্য ইংরাজীতে লেখেন। আমরা বঙ্গানুবাদ করিয়া লইয়াছি। ভাঃ সং।

সন্তান। সমস্ত গ্রামের মধ্যে আমাদের সমকক্ষ কুলীন কেহ ছিল না। পিতার এই কৌলীন্যগর্ব্ব অবস্থাহীনতার সহিত মিশিয়া এমনই বিকৃত-ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, গ্রামের মধ্যে কেহই তাঁহাকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিত না! বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া, পিতাও গ্রামস্থ সকলকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি গ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী বদান্য বাবু রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। জমীদার বাবুর অপরাধ, তিনি একদিন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক গললগ্নীকৃতবাসে আহূত, আনীত, ও বহুমানে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত, রামধন মুখোপাধ্যায়ের এই প্রপৌত্রকে লোকদিয়া নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন—নিজে আসিতে পারেন নাই। গ্রামবাসীর অপরাধ তাহারা সেই শিবহীন যজ্ঞে নিমন্ত্রন রক্ষা করিতে গিয়াছিল।

অবশ্য কাহার কি দোষ, আমার বুঝিবার তখন শক্তি ছিল না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে এখন এত শীঘ্র শীঘ্র সামাজিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে যে, পিতার কৌলীন্যগর্ব্ব সে সময়েও যে লোকের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নয়।

ফলে কিন্তু একা আমাকে, সেই অল্পবয়সেই, নিঃসঙ্গ উগ্রপ্রকৃতিক পিতার সমস্ত ক্রোধের ভার বহন করিয়া বহুদিন যাপন করিতে হইয়াছে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের মমতায় পুষ্ট হইয়াছিলাম এখন পিতৃতাড়নায় তাহা হৃদয়ের অন্তস্তম কক্ষে লুক্কায়িত ও ঘনীভূত হইয়া, নিষ্পীড়নে আমাকে দিন দিন ক্ষীণ করিতে লাগিল। এমন পিতার যে মমতা থাকিতে পারে, ইহা আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারি নাই।

(২)

আমাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ভৈরব নদ বহিয়া যাইত। মা যখন

জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভৈরবে স্নান করিতে যাইতাম। আমার বেশ মনে পড়ে মা যখন জলে নামিতেন, তখন আমি তীরে বসিয়া, পরপারের খেজুর বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম। নিদাঘে—তাহাদের পীতাভ হরিদ্বর্ণের মাথাগুলা যখন ভৈরবের স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন মনে করিতাম বুঝি তাহারাও স্নান করিতে জলে নামিয়াছে। সেই ছায়াগুলার অবিরাম কম্পন, জলকেলি মনে করিয়া, তাহাদের সঙ্গে খেলিবার আগ্রহে অন্যমনস্কে জলে নামিতাম। পৃষ্ঠদেশে মাতৃপ্রদত্ত চপেটাঘাত ও যখন শৈশব কল্পনা দূরে পলাইত, তখন জননীর অঞ্চলের সহিত কল করিতে করিতে গৃহে ফিরিতাম। এখন সে ভৈরবও নাই আমার সে মা নাই—সুতরাং ভৈরবতীরে বসিয়া, তাহার গভীর জলাভ্যন্তরে সেই মায়িক উত্থানের অনুসন্ধানে জলালোড়নেরও উপায় নাই। কয়েক বৎসর হইতে ভৈরবের মোহানা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে— ছোট ছোট নৌকাগুলি মাথায় লইয়া, সেই স্বচ্ছ শুভ্রসলিলপ্রবা উভয়তীরের শ্যামতরুচ্ছায়াকীর্ণ গ্রামগুলির মধ্য দিয়া, এখন আ গ্রামবধূর মেখলার ন্যায় পড়িয়া থাকে না। এখন ভৈরব শৈবা সমাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে শুষ্ক। সেখানে প্রতিসন্ধ্যায় একবার করি যাই বটে, কিন্তু শৈবালাচ্ছন্ন নদে আর অবগাহন করিতে সাহস ক না। পিতার পানার্থ কেবল এক কলসী জল লইয়া চলিয়া আসি।

(৩)

ক্রমে জল পঙ্কিল দুর্গন্ধময় কীটবহুল—সর্ব্বতোভাবে অপেয় হই উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে, এক সময়ের স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়া, কলেরা আবাসভূমি হইল। দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। চিতা নির্ব্বাপনের জল যোগাইতে ভৈরব বিশীর্ণ ও মলিন হইয়া গেল বিজ্ঞগণ বুঝিলেন, এরূপভাবে লোকক্ষয় হইলে, দুই চারিবৎসরের মধ্যে

গ্রাম জনশূন্য হইবে। রাধাপ্রসাদ বাবু এই বিষম বিপদে লোকরক্ষার জন্য একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। লোকে তাহার জলমাত্র ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইল। পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষার্থ রাধাপ্রসাদ বাবু আদেশ দিলেন যে, কেহ তাহাতে স্নানাদি কার্য্য করিতে পারিবে না। গ্রামবাসী সেই জলে বহু উপকার পাইল।

আমার ভাগ্যে কিন্তু সে জল লওয়া ঘটিয়া উঠিল না। সে সরোবর-তীরে যাইতে পিতার নিষেধ ছিল। কাজেই, গ্রামের মধ্যে আমি একাই ভৈরবের দুঃসময়ের সঙ্গী—প্রতি সন্ধ্যায় কলসীমুখপ্রেরিত তাহার দুই চারিটা ধন্যবাদ শুনিতে অবশিষ্ট রহিলাম।

কিন্তু এরূপ করিয়া কয়দিন যাইব? গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতার ব্যবহৃত, সেই সুপেয়সলিলের আধার পশ্চাতে রাখিয়া, একাকী সেই দুরস্থ ভৈরবের নিকট যাইতে আমার মন সরিত না। বিশেষতঃ প্রতিদিন এক সময়ে আমি সেখানে যাইতে পারিতাম না। কোন কোন দিন পৌঁছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সেদিন মৃত্যুচ্ছায়া-সমাকীর্ণ, অনতিদূরের, ক্ষুধিতচিতাভূমি জলশূন্য কলসীগুলার অন্ধকার-ময় কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুদিয়া আমার পানে যেন চাহিয়া থাকিত। আমি জল লইতে লইতে হস্তস্থিত কলসীমুখের শব্দে শিহরিয়া উঠিতাম।

(৪)

একদিন বৃহস্পতিবার। পিতার আদেশে বারবেলা অতিক্রম করিয়া, ভরাসন্ধ্যায় আমি জল আনিতে চলিয়াছি। পিতা একটু বেলা থাকিতে আমাকে এই নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পথে একটু খেলা করিয়া সময় নষ্ট করিয়া ছিলাম। তার ফলে এই শাস্তি।

ভীতিভরাবসন্নদেহে চলিতে চলিতে আমি বড়ালদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় রামরূপ বড়ালের মেয়ে ভাগীরথী, কোথা

হইতে আসিয়া আমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহারও কাঁকে একটী ছোট কলসী।

ভাগীরথী জিজ্ঞাসা করিল—"বাণীকণ্ঠ দাদা! কোথায় চলেছ?" এরূপ প্রশ্ন করা ভাগীরথীর সর্ব্বতোভাবেই অবিধেয় হইয়াছিল আমার কাঁধের কলসী, এই সন্ধ্যার আধা অন্ধকারেই সে যদি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার অতবড় দুইটা উজ্জ্বল চক্ষু থাকিয়া লাভ কি হইল! আর কলসী দেখিয়াও, বৃথাপ্রশ্নে পথ আগুলিয়া সে যদি আমার সময় নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার উপর ক্রোধ হইলে, কেহই তাহাতে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিতে পারেন না। নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, দশ এগার বৎসর বয়স হইতে চলিল, এই এতকাল তাহাদের বাড়ীর সুমুখদিয়া যাতায়াত করিতেছি, সেওত প্রায়ই দেখিতেছে, তাহার যে বুদ্ধি নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলিব।

মনে মনে আমার বড়ই রাগ হইল। মনে করিলাম বলি—"চুলোয় চলেছি—সঙ্গে যাবে?"

কিন্তু উত্তরাধিকার সুত্রে পিতার শুদ্ধমাত্র ক্রোধটা আয়ত্ত করিয়া, আমিও কি পিতার ন্যায় লোকের অপ্রিয় হইব! তাই আত্মসংযত হইয়া বলিলাম—"কোথায় যাইতেছি, তুমি কি জান না?"

ভাগীরথী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"জানি। সেই জন্যই এসেছি। তুমি এই অন্ধকারে জল আন্‌তে চলেছ দেখ্‌তে পেয়ে মা আমাকে দিয়ে তোমায় নিষেধ করতে পাঠিয়েছেন।"

"তার পর?"

"আমি তোমার হয়ে জল আনি। সেই জন্য কলসী এনেছি।"

"কোথাথেকে আন্‌বে?"

"যেখানথেকে বল। তোমার অতবড় কলসী আমি তুলতে পারবো না। বল আমার কলসী দিয়ে দুইবারে এনেদি।"

"আমি যদি ভৈরবতীরে এসময় যাবার যোগ্য নই, তুমি যাবে, কেমন করে?"

"কেন বাবুদের পুকুর থেকে জল আন্‌তে দোষ কি? তোমাকেত যেতে হবে না। তুমি পথে দাঁড়িয়ে থেকো।"

কি জানি কোন নীতিশাস্ত্রোপদেশে আমিও বুঝিলাম "দোষ কি?" আমি ভাগীরথীর সঙ্গে চলিলাম।

(৫)

যাহারা জল লইবার, তাহারা সকলেই লইয়া গিয়াছিল। বাবুদের ঘাট নির্জন, পথও নির্জন। আমি কেবল পথে একা দাঁড়াইয়া, ভাগীরথী আধ কলসী জল দিয়া গিয়াছে, আমি আর আধ কলসীর প্রতীক্ষা করিতেছি। যে সিপাই পুকুরটা পাহারা দেয়—সে পুকুরের পাড়ের পর্ণকুটীরে বসিয়া, একটা ঢোল লইয়া, চক্ষু মুদিয়া, বাদ্যের তালে বেতালে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—

"রামচঁদরপদ ভজত মূরত কাহে জাগিয়া বাঁশরি।
আখিকা গুরি, গুরিকা চেনি, চেনিকা মিছুরি বনাই দিয়ারে!
রামা-আ-আ"—

গান ধরিয়াছে। আমি বাধ্য হইয়া এই জলজ বৈতালিকের অলক্ষ্যে তৎপ্রেরিত, "রামার" সৃষ্ট এই মিছুরির চোটা কর্ণাধঃকরণ করিতেছি।

ভাগীরথী দ্বিতীয়বার ফিরিতে যে বড়ই বিলম্ব করিল! সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে সরোবরতীরে যাইতে হইল। গিয়া দেখি, বালিকা সরোবর সোপানে অধোমুখী, পায়ের উপর পা রাখিয়া—অর্দ্ধ-ধৌত অলক্তকরাগে বারম্বার অঞ্জলি পূর্ণ জলনিষেক করিতেছে। বুঝিলাম, আমার জন্যই আজ বালিকার পায়ের আল্‌তা ধুইয়া গেল।

কিন্তু রাত্রি হইতে চলিল, আর তাহার অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলেও চলিবে না! তাই ডাকিলাম—"ভাগীরথী!"

ভাগীরথী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় একবার চমকিয়া আমার পানে চাহিল। তার পর অনাধরসম্বদ্ধ হাস্যে আমাকে বলিল—"কেমন এনেছি ত ?"

বালিকার দুষ্টামি বুঝিয়া আমি অপ্রতিভ হইলাম। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতও সেই সঙ্গে আমার হৃদয় প্রদেশ দিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—তাতো আনলে, কিন্তু কলসী ? বিস্মৃত বালিকা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, কলসী মাঝ সরোবরে ভাসিতেছে।

"তাহলে কি হবে ?"

"কি আর হবে, আমি জলে নামিব।"

"এ জলে যে কাউকে নামিতে দেয় না।"

"এখন আর কে দেখিতে আসিতেছে।"

আমি জলে নামিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীর গানবাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। নিঃশব্দে সাঁতারিয়া কলসী ধরিলাম। ফিরিয়া দেখি, ভাগীরথী নাই। সর্ব্বোচ্চ সোপান মঞ্চে আরোহণ করিয়া চারিদিক চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভাগীরথী !"

মঞ্চপার্শ্বস্থ বেদীর অন্তরাল হইতে সিপাহী বাহির হইয়া, দেখিতে দেখিতে আমার কাণ ধরিল। আর অতি রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"ভাগীরথী মেরা পাশ্ হ্যায়।"

সবলে সে আমার কাণ আকর্ষণ করিয়া, কুটীরাভিমুখে লইয়া চলিল। অপমানে, কর্ণবেদনায় আমার চক্ষে জল ছুটিল।

আমাকে যাঁহার সম্মুখে লইয়া লইয়া গেল, তিনি রাধাপ্রসাদ বাবুর একমাত্র পুত্র মাধব বাবু। নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র, তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন—'এপুকুরে কাহারও নামিবার হুকুম নেই তা জান ?"

তখন সিপাহী কাণ ধরিয়াছিল। আমি মাথা তুলিয়া কথা কহিবার

সুবিধা পাইলাম না। মাথা হেঁট করিয়াই বলিলাম—"আমি আর কখনও আসি নাই।"

"তবে কি নিমিত্ত কুলীনপুত্রের, সহসা আজ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইল।" আমি আর উত্তর দিলাম না। তিনি দয়া করিয়া, সিপাহীকে দিয়া আমার কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আমার মর্ম্মটি যেন পিশিয়া গেল।

সিপাহী, প্রভুর আদেশে আমার হাত হইতে কলসীটা কাড়িয়া ভাগীরথীদের দিতে গেল।

আমি একবারমাত্র বলিলাম—আপনি নিজে আমাকে শাস্তি দিলেন না কেন ? একটা নীচ ভৃত্য আমার অপমান করিল ?

বাবু উত্তর দিল—"কি করিব—তোমার কর্ম্মফল।"

আমি আমার অর্দ্ধপূর্ণ কলসীটা এক হস্তে লইয়া, অপর হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিলাম।

(৬)

পিতা তখন স্বায়ংসন্ধ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নহিলে সিক্ত বস্ত্রে ফিরিতে দেখিলে, তখনই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। সদুত্তর দিতে কি আমার সাহস হইত ! আমি অবকাশ পাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। তৎপরে একটা প্রদীপ লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একখানা পুঁথি খুলিয়া নীরবে পড়িতে লাগিলাম। পিতার কাছে তিরস্কৃত হইবার ভয়ে, আমি মাধববাবু কৃত অপমান ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শতচেষ্টায়ও হৃদয়ের একটা দুর্দ্দম আবেগ আমার দীর্ঘ নিশ্বাস কম্পিত করিয়া বাহির হইতেছিল।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আমি পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—"বেশ, শাস্ত্রকে সহচর কর। তাহা হইলে তোমাকে আর ইহজীবনে

সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতে হইবে না। এই বলিয়া একটা শ্লোক আওড়াইলেন—

অনেক সংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

প্রতিদিন এই সময়ে, আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করি। আজ আর তাহা করিতে হইল না। তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতে আঁধার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে আমি পুঁথিখানা দেখিয়া লইলাম—হিতোপদেশ।

একটা শ্লোকে চক্ষুস্থাপিত করিলাম। দেখিলাম—"অনেক সংশয়চ্ছেদি—"ইত্যাদি। পিতা কি অন্তর্য্যামী! কি জানি কেন হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল।

সহসা গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন উঠিল—"জল আজ এত কম হইল কেন?" আমি উত্তর দিলাম না—নীরবে মধুসূদন স্মরণ করিলাম।

মুহূর্ত্ত পরেই পিতা রুদ্রমূর্ত্তিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অতি রুক্ষস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জল কোথা হইতে আনিলি?"

ভয়কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"ভৈরব—"

"মিথ্যাবাদী! আমার সমস্ত শাস্ত্র পণ্ড করিতেছ! ভৈরব হইলে তাঁহার চরণামৃতের পবিত্র গন্ধ অনুভব করিতেছিনা কেন?" বলিয়াই প্রহার করিবার জন্য সবলে সেই প্রহরিধৃত কর্ণটাকেই আকৃষ্ট করিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি আর আমার প্রতি এরূপ অসদাচরণ করেন নাই, দোষ দেখিলে, মুখেই তিরস্কার করিতেন।

কর্ণে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, পিতার কঠোর আকর্ষণে তাহা অসহ্য হইয়া হইয়া পড়িল। আমি তাঁহার পদধারণ করিয়া বলিলাম—"ক্ষমা করুন—আমি বলিতেছি।"

কর্ণ হইতে হস্ত লইয়াই পিতা বলিলেন—"তোর কি কাণে ঘা ছিল?" মাথা তুলিয়া দেখি তাঁহার আঙ্গুল রুধিরে রঞ্জিত।

সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

একটিমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পিতা বলিলেন—"মাধব ঠিক বলিয়াছে—তোমার কর্ম্মফল।"

(৭)

কর্ণবেদনায় সারারাত্রি আমার ঘুম হইল না। তথাপি সে দিন আমার সুখের দিন! আমার উগ্র প্রকৃতিক পিতার প্রাণে এত মমতা! সারা রাত্রি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তিনি আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। শুশ্রূষারত শীতল করের ক্ষণেক অপসারণে এক ফোঁটা উষ্ণ জল আমার গণ্ডে পতিত হইল। আমি বুঝিলাম পিতা রোদন করিতেছেন। মরুভূমি রীতিমত খনিত হইলে, তাহা হইতেও উৎস উৎসারিত হয়, প্রেমপ্লাবিনী-প্রসবিনী পাথরের হৃদয় ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বেদনায় আমি বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিলাম, আনন্দের আকস্মিক আবেগে, ভরা গাঙ্গে যেন বান ডাকিল। বহুদিন হইতে লুকায়িত অমৃতভাণ্ড হাতে পাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া পিপাসা মিটাইতে আমার সাহস হইল না।

বলিলাম—আপনি নিদ্রা যান্।

অশ্রুগদগদকণ্ঠে পিতা বলিলেন—"নিদ্রা!—বাণীকণ্ঠ! মাধব তোমার কর্ণে আঘাত করে নাই, সে আমার কর্ণমর্দ্দিত করিয়াছে। আমি বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু ইহা আমারও কর্ম্মফল। দরিদ্র আপনারই উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ—আমার সংসারী হইতে এত সাধ হইল কেন? সংসার করিলাম, কিন্তু রাখিতেই বা পারিলাম কই?

"আমার কর্ণে আর বেদনা নাই।"

"তোমার না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার আছে। তীব্র জ্বালায় জ্বলিতেছে। যতদিন ইহার ঔষধ না পাইব, ততদিন উত্তরোত্তর বাড়িবে।" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিবার চেষ্টায়, সমস্ত রাত্রির অনিদ্রামথিত চক্ষে, নানা জাতীয় স্বপ্ন আসিয়া, আমাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। আমি দেখিলাম—পিতা একটা অত্যুচ্চ অচলের শিখরে উঠিয়া, কি ভীষণ অন্ধকারময় গৃহমাঝে, কোন্ যক্ষ কর্ত্তৃক কত কাল হইতে রক্ষিত রত্নভাণ্ডারের অন্বেষণ করিতেছেন—তাঁর দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া অচলের বজ্র কঠোর বক্ষও কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। সেই কম্পিত হৃদয়চ্যুত রত্নধারা একটী স্নিগ্ধ সলিলরূপিণী স্রোতস্বিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রবল তরঙ্গে অচল পাদমূলে চলিয়া গ্রাম নগর দেশ ভাসাইয়া আমার কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি জানি কি অপূর্ব্ব আনন্দে আমি স্রোতজলে গা ঢালিতে গৃহ ত্যাগ করিলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি কোথায় স্রোতস্বিনী! মধুর কলতরঙ্গ কণ্ঠে নিবিষ্ট করিয়া গৃহ পার্শ্বস্থ কুঞ্জ হইতে কে বলিল—"কেমন এনেছিত'! চাহিয়া দেখিলাম ভাগীরথী।

মনের অতি আবেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখি, চালের ছিদ্র দিয়া মধ্যাহ্ন গগণের সূর্য্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের বাহিরে আসিয়া পিতাকে দেখিতে পাইলাম না। তৎপরিবর্ত্তে দেখিলাম পিতার বৃদ্ধ কৃষক প্রজা হরিহর, আমার স্নানও ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রাঙ্গণে বসিয়া আমার জাগরণের অপেক্ষা করিতেছে।

(৮)

তিন বৎসর আমি গ্রামান্তরে এক দূর সম্পর্কীয়া মাতৃস্বসার গৃহে মমতাময় পিতার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

মাসীমা নিঃসন্তান, পুত্রাধিক আদরে আমার প্রতিপালন করিতেছেন। মাঝে মাঝে হরিহর ফলটা পাকড়টা হাতে করিয়া আমার তত্ত্ব লইতে আসে।

আমাদের গ্রাম এ স্থান হইতে প্রায় এক দিবসের পথ। আসিলে হরিহরকে দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। সে যখনই আসিত তখনই গ্রামের কোন না কোন একটা নূতন সংবাদ আমাকে শুনাইত।

একবার শুনিলাম, মাধব বাবুর সঙ্গে ভাগীরথীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়বার শুনিলাম, বিবাহের বিশেষ আয়োজন। রাধাপ্রসাদ বাবু বহু সমারোহের আয়োজন করিতেছেন।

আগামী মাঘের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবসের সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া, আমি একটা অননুভূত বেদনার সহিত, মাধব বাবুর বিবাহের একটা ছবি দেখিতেছি, এমন সময় হরিহর আসিয়া সংবাদ দিল, নীলকুঠীর সাহেবে সঙ্গে রাধাপ্রসাদ বাবুর একটা বিষম ফৌজদারীমোকদ্দমা বাধিয়াছে। একটা দাঙ্গায় উভয় পক্ষের বহুলোক জখম হইয়াছে। সেইজন্য বিবাহ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিয়া গেল।

হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে কতকাল হইতে আবদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আমি যেন নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে হরিহর আর একদিনের জন্যও আমার তত্ত্ব লইতে আসিল না! প্রথম প্রথম কয়দিন আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা, পরে বর্ষশেষে তাহার অনাগমন কামনা করিয়া, আমি একদিন নিরুদ্দিষ্ট পিতার উদ্দেশে দুই একবিন্দু অশ্রুপাত করিতেছি, এমন সময় যোলটা বেহারা ও দুইখানা পাল্কী লইয়া এক দ্বারবান আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৯)

নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া, বাহকদিগের ঐক্যতান গানের সহিত আমার শতমুখী চিন্তার সুর মিলাইয়া রাত্রির অন্ধকারে, কত মাঠ, কত গ্রাম, কত জলা জঙ্গল অতিক্রম করিলাম!

নিশীথে মাতৃস্বসার সহিত এক নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"মাসীমা! এ কোথায় আসিলাম?"

মাসীমা পাল্কী হইতে অবরোহণ করিয়া, আমাকে বলিলেন "চল না দেখি।"

আমার অবরোহনের সঙ্গে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বাহির হইয়া দেখি, আমার সম্মুখে নববেশ পরিহিত, হুঁকা হাতে হাস্যময় হরিহর।

"এ কোথায় আসিয়াছি হরিহর?"

"কেন বাবু! তোমার বাড়ী!"

"হরিহর! রহস্য করিয়ো না।"

"তবে বাবু! আমার মায়ের বাড়ী। মা ঠাকরুণ একটী খানসামা চেয়েছেন, তাই আমি তোমাকে আনিয়াছি।"

চারি দিক চাহিয়া দেখিলাম। বিস্ময়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। "তাইত হরিহর! আমার কুটীর?"

"বাণীকণ্ঠ!"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম. পিতা। ছুটিয়া পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম।

সপ্তাহমধ্যে আমার সুসজ্জিত অট্টালিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। মহাসমারোহে পিতা, ভাগীরথীকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

(১০)

মর্ম্মাহত পিতা আমার জন্য ধন আনিতে বিদেশ গিয়াছিলেন। ফিরিতে তাঁহার প্রায় চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি

বৎসরে গ্রামের কতই না অবস্থান্তর ঘটিয়াছে! কুঠিয়ালদের সহিত মোকদ্দমায় রাধাপ্রসাদ বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছে। এদিকে এই চারি বৎসর মধ্যে, আমার পিতা ধনাঢ্য হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। দেশের মধ্যে আমরাই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

পাকস্পর্শের দিবসে দেখি রাধাপ্রসাদ বাবু মাধবকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছেন। অবগুণ্ঠনবতী ভাগীরথী অন্ন ব্যঞ্জনের থালা লইয়া যখন পিতাপুত্রের সম্মুখে ন্যস্ত করিল, সেই সঙ্গে একখানি দলিল রাধাপ্রসাদ বাবুর পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল।

ভোজনের পূর্ব্বে তিনি দলীলখানি একবার খুলিয়া পাঠ করিলেন। পিতা ভাগীরথীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাধাপ্রসাদ বাবু তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"না জানিয়া, তবে কি আমি আপনার কাছেই ঋণ করিয়াছি?"

পিতা উত্তর দিলেন—"আমরা আপনাদের কর্ত্তৃক আনীত। আপনাদের প্রদত্ত অন্নেই এতকাল প্রতিপালিত হইয়া আসতেছি। আমাদিগকে আপনারাই সম্পত্তি মনে করুন। ঋণ মনে করিতেছেন কেন?"

"কিন্তু এই এক লক্ষ টাকা আমি যে আজকাল দিতে পারি, এমন শক্তি ত আমার নাই।"

"নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ দান করুন। সুদে আসলে তাহাদের প্রাপ্য আদায় হইয়া যাইবে।"

পিতার আদেশে ভাগীরথী ও আমি রাধাপ্রসাদ বাবুকে প্রণাম করিলাম মাধব বাবু মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। রাধাপ্রসাদ বাবুর চক্ষু হইতে উৎস প্রবাহিত হইল। "মুখুয্যে মহাশয়! মূর্খ আমি, আভিজাত্যের মর্ম্ম কি বুঝিব আমার পিতৃপিতামহ বুঝিতেন, তাই

বহু সাধনায় এরূপ দেবতার আহ্বান করিয়াছিলেন।” পিতা উত্তর দিলেন—“আপনারা বনিয়াদী বংশ। অর্থ গৌরবেই কেবল আপনাদের প্রতিষ্ঠা নয়। আপনার এই পুত্রকে বুঝাইবেন—ধনের আভিজাত্য মাসের মধ্যে ত্রিশ দিন বিচলিত হয়, তার জন্য কোন যুগযুগান্তর হইতে আগত আভিজাত্য ত্যাগ করিব কেন? যাহাদের জন্য এই নব আভিজাত্যের সৃষ্টি, তাহারাও আমাদের সহিত একাসনে বসিতে ঘৃণা বোধ করে।”

মাধব বাবুর মস্তক ভাগীরথী প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনে সংলগ্নপ্রায় হইল। আমি মনে মনে বলিলাম—“তোমার কর্ম্মফল।”

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

খেয়াল খাতা।

ভারতীর খেয়াল।

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
শাদা কালো আসন মেলে,
পড়ে আছে আকাশটা খোষ্-খেয়ালি ;
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি।
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া ;
রং বেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুসি মোছে আবার লেখে।

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচ্‌কে হাসি হামেসা।
তাই বলে সব মিথ্যে না কি ?
বৃষ্টি সে ত নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা ত নিতান্ত নয় তামাসা।
শুধু আমরা থাকিনে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়াল খাতা।

(১)

শ্রীমতী ভারতীসম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটী খেয়াল খাতা খুল্‌বেন, এই অভিপ্রায়ে, যাঁরা লেখেন, কিম্বা লিখতে পারেন, কিম্বা াদের লেখা উচিত, কিম্বা লিখ্‌তে পারা উচিত, এমন অনেক লোকের কাছে দু' এক লম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কাথায় আছি তা জানিনে। তবুও ভারতীসম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা র্তব্য বিবেচনায় দু'চার ছত্র রচনা করতে উদ্যত হয়েছি। ভারতীসম্পাদিকা রসা দিয়েছেন যে, যা' খুসী লিখ্‌লেই হবে, কোন বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিম্বা ালোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বল্‌তে পারিনে, ামার ত ভরসার চাইতে ভয় বেশী হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে তটা বৈষয়িক, যে বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, ল্‌বার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হক্‌, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোন কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনি সূতার মালার ফরমাস দেওয়া যত সহজ, াঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতীসম্পাদিকার ইচ্ছা এই শেষোক্ত দলের একটু বক্‌বার সুবিধে করে' দেওয়া।

(২)

এ খেয়াল খাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন তা' াদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুয়ানি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না। কথা যতই ছোট হোক্‌, খাঁটি হওয়া চাই, তার উপর চক্‌চকে হ'লেত কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে' জিনিষটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে' যা' আর কারো নজরে পড়ে না, া ভাব এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরাণো চিন্তা পুরাণো ভাবের কাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় ন কোন ফল ধরে না, তখন বাজে কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি ? যখন মাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার কোন উপায় করতে পারছিনে, তখন দিন থাক্‌তে

৬

সথ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর একথা বলা বাহুল্য, যেখা
কেনাবেচার কোন সম্বন্ধ নেই, ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের, সে স্থলে কো
ভদ্র সন্তান, মসীজীবী হ'লেও, যে কথায় নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, কিম্বা ঝু
বলে' জানেন, তা' চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্য্য জগতে যখন সা
হতে পারিনে, তখন আশা করা যায় কল্পনাজগতে অলীকতার চর্চ্চা করব না। এ
কারণেই বল্‌ছি ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না।

(৩)

খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। কারণ সংসারে বদ্ খেয়ালী লোকের কি
কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা' করে
আয়াসসাধ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফ
মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃ উচ্ছ্বসিত চি
কিম্বা ভাব শুধু দু'এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা' আপনি হয় তা' এত
শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্য্যজনক, যে তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি।
জগতসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে গড়া জিনি
কষ্টসাধ্য বলেই এত সঙ্কীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও
নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু
ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প
সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়, কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অ
পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার থৈই খুঁজে পাইনে। যা নিজে ধরতে পারি
তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব, যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারিনে, তা
খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দ্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সু
সুসম্বন্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

(৪)

খেয়াল অভ্যাস কর্‌বার পূর্ব্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্ব
জান্‌লে অনধিকারীরা এ বিষয়ের বৃথা চর্চ্চা কর্‌বেন না। আমাদের লিখিত সা
খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সঙ্গীত শাস্ত্র হতে এর আদর্শ নি
হবে। এক কথায় বল্‌তে গেলে ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়া
উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভা

ষ্ঠ অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্ত্তি সকল আক্ষেপ
কাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা
াল গিট্‌কিরি ইত্যাদি, তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের
াধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দ্দানী করুন্ না
কন, তালচ্যুত কিম্বা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের
াধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও
লঙ্কার বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফে[illegible] নয়। খেয়ালের চাল
্রুপদের মত সরল নয় বলেই মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নর্ত্তকীর মত বিচিত্র।
খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক্ না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না, তার গতি
ময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলয় হ'লেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন,
লেখাও সেই নিয়মাধীন। যার মন নিয়ে পথ ভিন্ন চল্‌তে জানে না, যাঁর কল্পনা
াপনা হ'তেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে
লে আর নিজবশে রাখতে পারেন না, তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভাল।
া'তে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময়ে
র্থ হ'লেও কখনই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয়
াপন্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোক মাত্রেই উপরোক্ত কথা ক'টির সার্থকতা বুঝতে
ারবেন।

(৫)

আমার কথায় ভাবেই বুঝতে পারছেন, যে আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হাল্কা
ঙ্গের জিনিষের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর
াটি থাকে ও ঢং ওস্তাদি হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজ কাল প্রধান
ভাব গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমী। এসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ-স্বরূপে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন।
ান ব্যক্তি কিম্বা জাতিবিশেষ যখন অবস্থাবিপর্য্যয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত
, তখন তার দু'টি অধিকার অবশিষ্ট থাকে, কাঁদ্‌বার ও হাস্‌বার। আমরা
ামাদের সেই কাঁদ্‌বার অধিকার ষোল আনা বুঝে নিয়েছি, এবং নিত্য কাজে
াগাচ্ছি। আমরা কাঁদতে পেলে যত খুসী থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা
খায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকিনে, চাঁদা তুলে
দেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে যাঁরা স্থানে অস্থানে এমন কি

অরণ্যে পর্য্যন্ত রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমা ও প্রধান লোক বলে' গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস করা উচিত, সেখানে ফোঁস্ ফোঁস্ করলেই আমরা বলিহারি পাই। আমাদের এই কান্না দেখে কার মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ন্যাশনাল কংগ্রেস, অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না সুরু করে দিলে। আজ যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বৎসরে তিন দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তার পর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে, কোকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি! অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না,—তাহলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে উঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুক উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হ'লে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্না ব্যাপারটাকে একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করে বিকেলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে পা ছড়িয়ে যখন পুরাত মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে' ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকি, তখন পৃথিবীর পুরুষ মানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে কান্না ব্যাপাটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা, রোল কান্না, মড়া কান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলে ফুলে কান্না ইত্যাদি, কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে কান্না। এবং একথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে সদারঙ্গ বলে' গেছেন যে খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকী সুর লাগে না। এই সব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে. আমাদের সুখের জন্য না হোক্ স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে আমাদের এই দুর্দ্দিনে হাসি কি শোভা পায়? তার উত্তর ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও বিদ্যুৎ কি দেখা দেয় না, কিম্বা শোভা পায় না? আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা জন্মায়।

বীরবল।

খেয়ালের চৌহদ্দি।

সম্পাদিকার নিমন্ত্রণে 'ভারতীর' খেয়াল-খাতার দেউরিতে গুণীজনাগ্রগণ্য বীরবল মহাশয় সান্ত্রীর খেয়ালে চাপিয়া আসিয়া যজ্ঞের আয়োজনকারিণীকে সন্ত্রস্থ করিয়াছেন। তিনি কাকে রাখেন, কাকে মারেন! অতএব সম্পাদকীয় পরিমাপে "খেয়াল" এর চৌহদ্দির একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছে।

আলঙ্কারিকেরা বলেন, "কাব্যং হি রসাত্মকং বাক্যং"। আমি বলি, 'খেয়াল রসাত্মক কল্পনা'—শুধু বাক্যেই নহে, বিবিধ নামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; যেমন বড়লাটের "দরবারী খেয়াল," চেম্বার্লেনের "শাহী খেয়াল।"

খেয়াল আমিরী হইতে পারে, গরিবীও হইতে পারে; মজাদারী হইতে পারে, দুনিয়াদারীও হইতে পারে; চুটকি হালকিও হইতে পারে, জমাট ভারিক্কিও হইতে পারে। বাজে খেয়াল বিনোদন করে, কেজো খেয়াল কাজে উদ্রিক্ত করে। মানুষকে হাসির খেয়ালে যেমন পায়, কান্নার খেয়ালেও তেমন চাপে। প্রপঞ্চকে মনের কোন্ পরকলাখানা দিয়া কখন দেখা যায় তার উপর খেয়ালের রকম সকম আকার প্রকার নির্ভর করে। অতএব ভারতীর "খেয়াল খাতায়" সকল জাতীয় খেয়ালেরই আসন ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে। খেয়ালী গুণীসাধারণের প্রতি নিমন্ত্রণকারিণীর এই সবিনয় অভয় নিবেদন।

সম্পাদিকা।

রায়-মহিষ-কাহিনী।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

'দার্জ্জিলিং নামে পুরী পর্ব্বতশিখরে
মুকুতা মুকুট সম হিমাচল শিরে।
ত্যজি মর্ত্ত্য লোক যথা নরনারীগণ,
স্বর্গের সোপানে যেন করে বিচরণ।
সহসা মহিষ মত্ত কালরূপী প্রায়,
ছুটে আসি আক্রমিল স্পেন্সর বালায়!
ত্যজি অন্য সর্ব্ব লোক বজ্রসম শৃঙ্গে,
বিদারিল পরিচ্ছদ বালিকার অঙ্গে।
প্রাণে কি বধিতে চাস্?—আরে কি করিস্!
জানিস্ না কে আছে কাছে পাষণ্ড মহিষ?
সাপটি ধরিল তার বক্র শৃঙ্গ দ্বয়,
লম্ববাহু মহাবীর মিষ্টার রায়।
সুগঠিত দেহ তার—সুরূপও হ'লে—
বেলের মোরব্বা ভাত মৎস্যের ঝোলে।
মাথা-নাড়া দিল বীর, পড়ে শিরস্ত্রাণ,
রণে ভঙ্গ দিয়া পশু করিল প্রস্থান।
বাঁচিল বালিকা প্রাণ গগনে অমনি
দেব যক্ষ রক্ষ সবে দিল হুলুধ্বনি।
পালাল মহিষাসুর অবারিত গতি,
মারিল বিষম ঢুঁ "কেরী" ধাত্রী প্রতি
যত আক্রমণ তোর অবলা উপরে,
পাইলি পাপের শাস্তি খাদে পড়ে' মরে'॥

শ্রীবিহারী লাল গুপ্ত।

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য সকলকেই পাগল করিয়া তোলে, তাহার ভিতরকার নিগূঢ় …ত্ত্ব জানা বড়ই দরকার। পর্দ্দার আড়ালে কি আছে তাহা একবার …কি দিয়া দেখা আবশ্যক। লোকে বলে, আপনি না মাতিলে অন্যকে …তানো যায় না, কিন্তু গোলাপ ফুল তো অন্যকে বেশ মাতায়—…াপনি তো কখনও মাতে না; একজন সুন্দরী ললনা সভার মাঝখান …িয়া চলিয়া গেলে—ঠিক যেন একটা ষ্টীমার গঙ্গার মাঝখান দিয়া …লিয়া যায়—ক্ষণপরেই গঙ্গার দোধারি তরঙ্গে হুল স্থূল হইয়া উঠে; …কিন্তু ষ্টীমার তো একটুও হেলে না দোলে না। মাতানোটাই তো সর্ব্বদা …ক্ষে পড়ে; কিন্তু মাতা-কোন্ খানে? কোন সুরসিক ব্যক্তি ইহার …কটা সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথঠাকুর।

রেণু।

অতি শিশুকালে আমরা কিছু মনে করে রাখতে পারিনে, কিন্তু হাতের কাছে যে টুকু পাই সে টুকু এম্নি জোরে আঁকড়ে ধরি যে ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হয়। বড় হলে আমরা হাতের কাছের জিনিষ ছেড়ে বুকের কাছে যা পাওয়া যায় তাও ধরে রাখতে পারিনে, তখন কেবল সবই মনে করে রাখি।

সুখ চলে গেলে তার স্মৃতিটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু প্রিয়জন চলে গেলে শুধু স্মৃতি নিয়ে জীবন চলে না। সুখ আমাদের জীবনের অংশ মাত্র, প্রিয়জন জীবনের সর্ব্বস্ব।

নীলাকাশ শূন্য, কিন্তু তারি মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারকা লুকিয়ে আছে—শিশুর শূন্য দৃষ্টিটুকুও নীল, কিন্তু তারি মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কত চিন্তা কত লক্ষ্য কত প্রকাশ অপরিস্ফুট ভাবে সঙ্গোপনে নিহিত থাকে।

অমাবস্যার পরদিনকে প্রতিপদ বলা হয়, পূর্ণিমার পর দিনকেও প্রতিপদ বলি; সুখের হাসিও হাসি, দুঃখের হাসিও হাসি; কিন্তু দুয়ে প্রভেদ কত? একটি আশার বিকাশ, অপরটি আশার অবসান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা।

ইংরাজি Sympathyর প্রতিশব্দ "সহানুভূতি" আমাদের ভাষায় অনেকটা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দ প্রয়োগে কতকটা অসুবিধা হয়, Sympathiserএর অনুবাদ কি করিবে? সহানুভূতি-কারী? বড় বদ শুনায়। সহানুভূতির পরিবর্ত্তে আমরা যদি সহ-মর্ম্মিতা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে ওই অভাব ঘুচিতে পারে। এই শব্দের প্রসার অপেক্ষাকৃত বেশী। Sympathiserএর অনুবাদে আমরা সহমর্ম্মী বলিতে পারি,—শুনিতে খারাপ শুনায় না। যেমন সহধর্ম্মী, সেইরূপ সহমর্ম্মী, এই শব্দ প্রয়োগে ভাষার মর্ম্মও বজায় থাকে—তাহার বিরোধী হয় না। বিদ্যাপতির এক স্থানে আছে,—

"যদি বা না কহ লোকের লাজে,
মরমী জনার মরম বাজে।"

এখানে মরমী Sympatheticএর অর্থে ব্যবহৃত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর একটী কথা এই—Sympathise শব্দ যেমন কি ভাব কি বুদ্ধি উভয় সম্পর্কেই ব্যবহার হয়, সেইরূপ মর্ম্ম শব্দটীও আমাদের ভাষায় ব্যবহার হয়; "কথার মর্ম্ম বোঝা"—"প্রস্তাবের মর্ম্ম বোঝা" এইরূপ প্রয়োগও প্রচলিত আছে। ইংরাজিতে শুধু ব্যক্তি বিশেষের সহিত সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে গেলে Sympathise শব্দ ব্যবহার হয় না। কোন উদ্দেশ্যেরও—Object—সহিত Sympathise করা যায়,—উহাতে একটু বুদ্ধির উপকরণ আছে। কিন্তু অনুভূতি শব্দে কেবল ভাব অনুভব করা বুঝায়, অতএব আমরা কোন উদ্দেশ্যেরও মর্ম্মগ্রাহী হইয়া সহমর্ম্মিতা প্রকাশ করিতে পারি।

পুনশ্চ—কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে, সহানুভূতি শব্দ যে ত্যাগ করা যায় না—লিখিবার সময়, দেখা যায়, কোন কোন স্থলে সহানুভূতি ব্যতীত আর কোন শব্দ ঠিক্ উপযোগী হয় না—"মমতা" অনেক স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে—জীব সমাজে জীবনের যুঝা-যুঝিতে যোগ্যতমরাই যেরূপ উত্তরজীবিতা লাভ করে, সেইরূপ ভাষাতেও যোগ্য শব্দ গুলাই থাকিয়া যায়, দেখা যাক্ কে বাঁচে কে মরে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র।

অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় রূপান্তরিত হ'য়ে একপ্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্ব্বর আকার ধারণ করে। "ঘৃণা" শব্দের মধ্যে একটা মানসিক ভাব আছে। Aversion, indignation, contempt প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ বিভিন্ন স্থল অনুসারে "ঘৃণার" প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু "ঘেন্না" বল্লেই নাকের কাছে একটা দুর্গন্ধ, চোখের সাম্‌নে একটা বীভৎস দৃশ্য, গায়ের কাছাকাছি একটা মলিন অস্পৃশ্য বস্তু কল্পনায় উদিত হয়। সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দের মধ্যে একটা বিমল উদার মানসিক ভাব নিহিত আছে। কিন্তু বাঙ্গলা "পিরিতি" শব্দের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভাবটুকু নাই। বাঙ্গালায় "স্বামী" "স্ত্রী"র সাধারণ প্রচলিত প্রতিশব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। "ভর্ত্তা" এবং তাহার বাঙ্গালা রূপান্তর তুলনা করিয়া দেখিলেই একথা স্পষ্ট হইবে। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় "লজ্জা" বলিলে যতটা ভাব প্রকাশ করে, বাঙ্গলায় "লজ্জা" ততটা করে না। বাঙ্গলায় "লজ্জা" একপ্রকার প্রথাগত বাহ্যলজ্জা, তাহা modesty নহে। তাহা হ্রী নহে। লজ্জার সহিত শ্রীর একটা যোগ আছে বাঙ্গলা ভাষায় তাহা নাই। সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ্য থাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গীতে ভাষায় কণ্ঠস্বরে সাজসজ্জায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযম আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালায় লজ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাতে বরঞ্চ আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে, একটা বাড়াবাড়ি আসিয়া সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত করে। তাহা শরীর মনের সুশোভন সংযম নহে, তাহার অনেকটা কেবল মাত্র শারীরিক অভিভূতি।

গল্প আছে—বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন উলোয় শিব গড়িতে বাঁদর হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি বাঙ্গলার মাটির বাঁদর গড়িবার দিকে একটু বিশেষ প্রবণতা আছে। লক্ষ্য শিব এবং পরিণাম বাঁদর ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায়। উদার প্রেমের ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে দেখিতে দেখিতে কেমন হইয়া দাঁড়াইল। একটা বৃহৎ ভাবকে জন্ম দিতে যেমন প্রবল মানসিক বীর্য্যের আবশ্যক, তাহাকে পোষণ করিয়া রাখিতেও সেইরূপ বীর্য্যের আবশ্যক। আলস্য এবং জড়তা যেখানে জাতীয় স্বভাব, সেখানে বৃহৎ-ভাব দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাকে বুঝিবার তাহাকে রক্ষা করিবার এবং তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া দিবার উদ্যম নাই।

আমাদের দেশে সকল জিনিষই যেন একপ্রকার slang হইয়া আসে। আমার তাই এক একবার ভয় হয় পাছে ইংরাজদের বড় ভাব বড় কথা আমাদের দেশে ক্রমে সেইরূপ অনার্য্য ভাব ধারণ করে। দেখিয়াছি বাঙ্গালায় অনেকগুলি গানের সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্যদেশে যে যে সুর সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের national air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang syne —বাঙ্গলাদেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ—প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকতা নাই। সেই জন্য তাহার কোনটাকেই national air বলা যায় না। হিন্দুস্থানীতে যে সকল খাম্বাজ ঝিঁঝিট কাফি প্রভৃতি রাগিণীতে শোভন ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, বাঙ্গলায় সেই রাগিণীই কেমন কুৎসিৎ আকার ধারণ করিয়া "বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে" "কেন বল সখি বিধুমুখী" "একে অবলা সরলা" প্রভৃতি গানে পরিণত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে এক একবার মনে হয় হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গলার উচ্চারণের মধ্যে এই ভদ্র এবং বর্ব্বর ভাবের প্রভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী গান বাঙ্গলায় ভাঙ্গিতে গেলেই তাহা ধরা পড়ে। সুর তাল অবিকল রক্ষিত হইয়াও অনেক সময় বাঙ্গলা গান "রোথো" রকম শুনিতে হয়। হিন্দুস্থানীর polite "আ" উচ্চারণ বাঙ্গলায় vulgar "অ" উচ্চারণে পরিণত হইয়া এই ভাবান্তর সংঘটন করে। "আ" উচ্চারণের মধ্যে একটি বেশ নির্লিপ্ত ভদ্র Suggestive ভাব আছে, আর "অ" উচ্চারণ নিতান্ত গা-ঘেঁসা সঙ্কীর্ণ এবং দরিদ্র। কাশীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে এই প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়।

উপরের প্যারাগ্রাফে একস্থলে commonplace শব্দ বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতে গিয়া "রোথো" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিলাম। সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে। কিন্তু দেখিয়াছি বাঙ্গলায় বিশেষ ভাব-প্রকাশক শব্দ মাত্রই গ্রাম্য। তাহাতে ভাব ছবির মত ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেই শব্দে আরো একটা কি করে যাহা সঙ্কোচজনক। Smile শব্দ বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতে হইলে হয় "মুচ্‌কে হাসি" নয় "ঈষদ্ধাস্য" বলিতে হইবে। কিন্তু "মুচ্‌কে-হাসি" সাধারণতঃ মনের মধ্যে যে ছবি আনয়ন করে তাহা বিশুদ্ধ Smile নহে, ঈষদ্ধাস্য কোন ছবি আনয়ন করে কি না সন্দেহ। Peep শব্দকে বাঙ্গালায় "উঁকিমারা" বলিতে হয়। Creep শব্দকে "গুঁড়িমারা" বলিতে হয়। কিন্তু "গুঁড়িমারা" "উঁকিমারা" শব্দ ভাবপ্রকাশক হইলেও সর্ব্বত্র ব্যবহারযোগ্য নহে। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে আমাদের মনে এমন সকল ছবি আনয়ন করে যাহার সহিত কোন মহৎ বর্ণনার যোগসাধন করিতে পারা যায় না।

হিন্দুস্থানী বা মুসলমানদের ভিতর একটা আদব-কায়দা আছে। একজন হিন্দুস্থানী বা মুসলমান ভৃত্য দিনের মধ্যে প্রভুর সহিত প্রথম

সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই যে সেলাম অথবা নমস্কার করে তাহার কারণ এমন নহে যে তাহাদের মনে বাঙ্গালী ভৃত্যের অপেক্ষা অধিক দাস্যভাব আছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজের সহস্রবিধ সম্বন্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে তাহার নিরলস ও সতর্ক। প্রভুর নিকটে তাহারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকিবে, মাথায় পাগ্‌ড়ি পরিবে, বিনীত ভাব রক্ষা করিবে। স্বাভাবিক ভাবে থাকা অপেক্ষা ইহাতে অনেক আয়াস ও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে যাহাকে স্বাধীন ভাব মনে করি তাহা অশিক্ষিত অসভ্য ভাব। অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্ব্বর ভাব দেখিয়াই ইংরাজেরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, অথচ আমরা মনে মনে গর্ব্ব করি যেন প্রভুকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখাইয়া আমরা ভারি একটা কেল্লা ফতে করিয়া আসিলাম। এই অশিক্ষা ও অনাচারবশতঃ আমাদের দৈনিক ভাষা ও কাজের মধ্যে একটি সুমার্জ্জিত সুষমা একটি শ্রী লক্ষিত হয় না। আমরা কেমন যেন "আট-পোরে" "গায়েপড়া" "ফেলাছড়া" "ঢিলেঢালা" "নড়বোড়ে" রকমের জাত, পৃথিবীর কাজেও লাগি না, পৃথিবীর শোভাও সাধন করি না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জিজ্ঞাসা।

১। জ্যাঠা ছেলে ও আহ্লাদে ছেলে এই দুয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী সহ্য করা যায়? এবং কেন?

২। মাকড়সার জালে পতিত হইয়া মক্ষিকা যখন জড়িত বিজড়িত হয়, তখন মক্ষিকার কষ্ট এবং মাকড়সার সুখ এই দুয়ের মধ্যে কোনটার আধিক্য?

কাচিৎ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু।

উত্তর।

১। জ্যাঠাছেলে বুদ্ধিমানের নকল—আহ্লাদে ছেলে ভালমানুষের নকল। জ্যাঠাছেলে হাজার খারাপ হইলেও একটু দূরে দূরে থাকে কিন্তু আহ্লাদে ছেলের স্বভাবই হচ্ছে গায়ে পড়া। সেইজন্য জ্যাঠার চাইতে আহ্লাদে বেশী অসহ্য।

২। মাছি জালে পড়িয়া যে কষ্ট পায় সেটা শারীরিক, সে জালে পড়িবামাত্রই তাহার ভবিষ্যৎ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ও সেইজন্য মরিবার ভয়রূপ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মাকড়সার সুখটুকু সমস্তই মানসিক সেইজন্যও আমি মাকড়সার সুখকে মাছির কষ্টের চাইতে বেশী বলি।

জ্ঞাততত্ত্ব।

নববর্ষ।

এস নববর্ষরাজ, তোমারে সাজাব আজ
    যূথিকা বেলের হার দোলাব গলায়।
নিদাঘে তাপিত কায়, চন্দন মাখাব তায়,
    ব্যজনের তরে ধরে' রাখি মলয়ায় ॥
বসন্ত যায়নি দূরে উঁকি মারে এসে ঘুরে,
    সন্ধ্যায় সমীরে মিশে হেসে করে খেলা।
বৈশাখ সুখের মাস, বাতাস বিলায় বাস,
    কাননে কাননে বসে কুসুমের মেলা ॥
তরুতে লতাতে ফল, ফলের ভিতরে জল,
    প্রকৃতি প্রদত্ত নানা পানীয় মধুর।
দেবের সেবার যোগ্য, রসনার উপভোগ্য,
    সুরভি রসাল ফল ফলিছে প্রচুর ॥
ণ্যের প্রথম মাসে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন-আশে,
    যতনে ব্রাহ্মণে দীনে করে' আকিঞ্চন।
তী পুণ্যবান্, বৈশাখে বিতরে দান,
    ফল জল অন্নছত্র বসন কাঞ্চন ॥
দেখিয়া তোমার আসা, মনে মনে নানা আশা,
    পুষিতেছে জনে জনে কর দরশন।
দেখাবে কি খুলে খাতা, কি নিয়ে এসেছ দাতা,
    কার শিরে দেবে ছাতা কারে ধরাসন ॥
কাহার হিসাব শেষ, চিতা চড়ে' যাবে দেশ,
    কার বা আবার হবে সুরু কারবার।
ক'জন জীবন কূলে, প্রেমের দোকান খুলে,
    করে' পণ মূলধন নেবে অংশীদার ॥
কার বা ভাঙ্গিবে বাসা, ভেসে যাবে ভালবাসা,
    হতাশের শ্বাসে ভারি করিবে বাতাস।
প্রতিদিন কার পর্ব্ব, কার গর্ব্ব হবে খর্ব্ব,
    প্রভুপদে আরোহিবে কোন সেবাদাস ॥

খসিবে গলার হার, করের কঙ্কন কার,
অঙ্কের আলোক কার হইবে নির্ব্বাণ।
বল কে সোহাগ ভরে, চরণে ধরাবে বরে,
গোষাঘরে কে বসিবে কে ভাঙ্গিবে মান॥
কার চক্ষে দেখে জল, কেবা বক্ষে পাবে বল,
কে কিনিবে হলাহল সংসারে ঢালিতে।
হারায়ে সর্ব্বস্ব কেবা, ব্রত ধরে' পরসেবা,
অনাথ শিশুরে নেবে কোলেতে পালিতে॥
কে সুরু করিবে পাপ, কার হবে অনুতাপ,
কেবা পাপে ধাপে ধাপে যাবে অধঃপাতে।
হৃদে ধরে' লক্ষ্মীকান্ত কার প্রাণ হবে শান্ত,
শাপ দিতে হবে ক্ষান্ত আপন বরাতে॥
কেবা যাবে দূরদেশে, কে হাসিবে ঘরে এসে,
যাবার রবার কার থাকিবে না ঠাঁই।
সোদরে পাইয়ে জ্বালা, কেবা দিবে দোরে তালা,
পরে ধরে' ঘরে এনে কে বলিবে ভাই॥
দেখিয়া জ্ঞাতির সুখ, কার বা ফাটিবে বুক,
অপরের দুঃখে কেবা করিবে রোদন।
দিনে পরধন হরি', কে বলিবে রেতে হরি,
বসাবে গোবধ করি পূজার বোধন॥
বল বল নববর্ষ, এনেছ হে কত হর্ষ,
কি ভরসা কত আশা বিমর্ষ বেদন।
সবারে বিলায়ে আগে, যা রবে আমার ভাগে,
সুখ দুঃখ হরিপদে কোরো নিবেদন।
দু'য়ের বাঁধন মম হউক ছেদন॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাময়িক কথা।

"শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ স্বামী"র স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের নিকট আসে।

বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদ।

"প্রায় চারি বৎসর গত হইল, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষার রীতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে একটা বর্ণভেদ আছে, এ সংস্কার বোধ হয় অনেকেরই ছিল না, অন্ততঃ আমরা উহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলাম না। আমরা জানিতাম চট্টগ্রামের লোকের লিখিত ভাষা যখন বাঁকুড়ায় পঠিত হইতেছে, এবং বরিশালের লোকের লিখিত ভাষা যখন কোচবিহারের বিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে, তখন বাঙ্গালা ভাষা এক বই দুই বলিব কি করিয়া? অবশ্য কথিত ভাষায় প্রাদেশিক শব্দের বাহুল্যপ্রযুক্ত ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে কালক্রমে অপ শব্দ বা "শ্লাঙ"গুলি লয়প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালা ভাষার প্রদেশভেদে অণুমাত্রও পার্থক্য থাকিবে না। বিশেষ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের যে সকল ভদ্রলোক দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহাদের কথিত ভাষায়ও অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বাহুল্যই উহার একমাত্র কারণ।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষার রীতি পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের নেতা অথবা কর্ণধার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। ইহাঁদের মতের বিরুদ্ধেও কয়েক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, এবিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতীতে ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন সংস্কৃতের সাহায্য ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। আর একজন অপশব্দ বা "শ্লাঙে"র বিরোধী এবং সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

এই ভাষা বিরোধ অল্পে প্রসারিত হয় নাই, দীর্ঘকালের আন্দোলনে বহুলোকে জানিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের বার্ষিক রিপোর্টের সহিত উহা রাজারও কর্ণগোচর না হইয়াছিল, এমন নহে। কিসে কি হইল স্পষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব। সম্প্রতি রাজার আদেশ হইয়াছে, "বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের শিশুপাঠ্য রচনা করিতে হইবে"। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত অপশব্দ বা "স্লাঙ্" ত্যাগ করিলে সমস্তইত এক ভাষা হইয়া পড়ে। অতএব বিভিন্ন পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা কি ?

সুপণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরিষৎ পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন অপভাষা বা গ্রাম্য শব্দের তালিকা সংগ্রহ করিলেই যে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কারণ কি ? কিন্তু এখন তিনি দেখুন উহার ব্যবহারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি না ? এখন উহাঁরা সকলেই উল্টা সুর ধরিলেন বটে, কিন্তু উহাঁদের নিজেদের দোষেই কি আমাদের এই বিভ্রাট উপস্থিত নয় ? বঙ্গের সাহিত্যরথীগণই কি বঙ্গভাষার ঐক্যমূলে কুঠারাঘাতের সূচনা করেন নাই ?"

ঐ পত্র লিখিত অভিযোগের উত্তরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন স্বদলের হইয়া আমাদের নিকট এই উত্তরটি পাঠাইয়াছেন :—

জবাব।

"শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ স্বামী মহাশয় বলিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহের জন্য ও বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাদেশিকত্বে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা উল্টা গীতি গাহিতেছেন, যে প্রাদেশিকত্বের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহারা এতকাল ঝগড়া করিয়া আসিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট ত সেই প্রাদেশিকত্বই খাঁটিভাবে ভাষায় চালাইতে চান, গভর্ণমেণ্টও ত তাঁহাদের মতই সংস্কৃতের বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে প্রস্তুত, এখন সেই প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতীদল—চিরানুসৃত পন্থা ছাড়িয়া গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলরব করিতেছেন কেন ?

লিখিত ভাষা কথিত ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইলে তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়ে, লিখিত ভাষা ও কথিতভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ চিরদিন থাকিবে, কিন্তু

শিকড়ের সঙ্গে কাণ্ডের যে সম্বন্ধ উহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। শিকড় যেরূপ মৃত্তিকার নীচে গুপ্ত থাকিয়া কাণ্ডকে রস প্রদান পূর্ব্বক পুষ্ট রাখে,—কথিত ভাষাও সেইভাবে স্বয়ং অপ্রকাশিত থাকিয়া লিখিত ভাষাকে, পোষণ করে। স্বামীজি এই স্থানে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন,—কথিত প্রাদেশিক ভাষার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা—লিখিত ভাষাকে সমৃদ্ধ ও বলশালী করিবার জন্য হইয়াছিল। কথিত ভাষাকে উপেক্ষা করিতে গেলে, লিখিত ভাষার প্রকৃত শক্তি নষ্ট হইয়া পড়িবে,—এই কথা যাহারা প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে যে বাঙ্গলা ভাষারূপ প্রকাণ্ড কাচখণ্ডকে শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, বরং সমস্ত প্রদেশগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেই ভাষার একত্ব ও শক্তি সম্বর্দ্ধিত করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নানা প্রাদেশিক ভাষার বিচিত্র বিভক্তি ক্রিয়াপদ ও প্রচলিত কথা সংগ্রহ করিয়া—যাহা অসম তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাধারণ লক্ষণগুলি গ্রহণ করাই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী, তাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়াছিলে, ও চিরদিনই করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষাটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লিখিত সাধারণ ভাষাটাকে লোপ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি কখন উপস্থিত করিয়াছিলেন ?

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে; যুবকের অঙ্গাবরণ যেরূপ শিশুর গায়ে মানান সই হইতে পারে না, সংস্কৃতের নিয়মাবলী সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষার উপযোগী নহে, বাঙ্গলা ব্যাকরণের সূত্র কথিতভাষার মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিয়া আছে,—তাহা সেই স্থান হইতে আবিষ্কার করিতে হইবে। এই কথাটাই বারম্বার বলা হইয়াছে।"

ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ।

অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ শুধু বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ এই সংস্কারের সঙ্গে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। গত সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে, তালিকায় তাহাদের কথা উল্লেখ করা গেল। এখানে বলা আবশ্যক এই তালিকার সকল বিবাহ গুলিই স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯০১ সন।

১। মজঃফরপুরে লালা স্বরূপলাল আগরওয়ালার কন্যার সহিত লালা গোবিন্দ প্রসাদের পরিণয়।

২। লাহোরস্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি জিয়ালাল আগরওয়ালা জৈনির কন্যার সহিত লালা শীতলপ্রসাদ জৈনির বিবাহ (মিরাটে)।

৩। বিজনীর জেলা বহুপুর লালাভূপ সহায় বৈশ্যের কন্যার বিবাহ।

৪। আগরাতে একটি গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যা বাল-বিধবার বিবাহ।

৫। লাহোরে সর্দ্দার বাঘসিংহ বি, এর সহিত এক বাল-বিধবার বিবাহ।

৬। অমৃতসরে লালা নারায়ণ দাস কেরাণীর সহিত শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর বিবাহ।

৭। লাহোরে লালা বলরাম কেরাণীর সহিত এক ক্ষত্রী বিধবার।

৮। মুলতাননিবাসী একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থের সহিত ফুল্লোরবাসিনী এক কায়স্থ বিধবার।

৯। লাহোরের আর্য্য সমাজভুক্ত লালা রোসনলালের সহিত লাহোরবাসিনী এক বাল বিধবার।

১০। কোটা নিবাসী হাসপাতালের ডাক্তার গুরুদত্তের সহিত জলন্ধরের এক বাল বিধবার।

১৯০২ সন।

১১। গুজরাটের আহম্মদাবাদে এক ব্রাহ্মণবংশীয় বালবিধবার।

১২। লাহোরের শ্রীমতী ঠাকুর দেবী ক্ষত্রীর বিবাহ।

১৩। জেলা পুণ্ডরী করলালস্থ এক আগরাওয়ালা—বংশীয়া এক বিধবার তাঁহার দেবরের সহিত বিবাহ।

১৪। জেলা মজঃফরপুরে মীরাপুরে একটি সম্ভ্রান্ত বিধবার বিবাহ।

১৫। সাহারণপুরের ষ্টেশন মাষ্টার লালা গণপতরাও আগরওয়ালার কন্যার সহিত আলিগড়ের লালা রোসন সিংহের বিবাহ।

১৬। ফয়জাবাদে বাবু ভগবান দাস কায়স্থের আত্মীয়া বিধবার বিবাহ।

১৭। পেশওয়ারে এক বৈশ্যবংশীয়া একটি বিধবার লালা গোকুল চন্দের সহিত বিবাহ।

১৮। পেশওয়ারে লালা সেড়ুমলের সহিত এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার।

১৯। পেশওয়ারে ক্ষত্রী-বংশীয়া একটি বিধবার সহিত তাঁহার দেবর বসন্তরামের বিবাহ

২০। লাহোরে শ্রীমতী জানকী দেবীর পূর্ণানন্দের সহিত বিবাহ।

২১। ঝাঁসী বাসিনী এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার লালা গোবিন্দরামের সহিত বিবাহ।

২২। ঢাকায় একটি বাঙ্গালী বালবিধবার বিবাহ।

২৩। স্বালকোটের এক কুলীন ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার বিবাহ।

২৪। স্বলকোটের লালা ডুলিচাঁদ ক্ষত্রীর (মুন্সেফ) কন্যার সহিত লালা লক্ষ্মণদাস বি, এর বিবাহ।

২৫। রবিয়ালে লালা সাবনরাগ আগরওয়ালার ভগিনীর বিবাহ।

২৬। অহম্মদাবাদের এক জৈন বৈশ্যবংশীয়া বাল-বিধবার।

২৭। মান্দ্রাজে একটি বৈষ্ণব বালবিধবার।

২৮। মান্দ্রাজের রাজমহিন্দ্রীতে একটি ব্রাহ্মণ-বংশীয়া বাল বিধবার।

২৯। সাজাহানপুরের শ্রীমতী গোলাবসুন্দরী ক্ষত্রীর আলিগড়বাসী ডাক্তার কৃষ্ণানন্দ ক্ষত্রীর সহিত বিবাহ।

৩০। গড়ওয়ালের ভবানীদত্ত ক্ষত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ।

৩১। কলিকাতা কালিঘাটের যোগেন্দ্রনাথ ঘোষালের সহিত একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার।

৩২। মুকেরিয়াতে একটি সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার বিবাহ।

১৯০৩।

৩৩। শ্রীমতী বেগরা দেবী ক্ষত্রীর সহিত লালা হরনাম দাসের বিবাহ।

৩৪। অমৃতসরে সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর সহিত নারায়ণ দত্তের বিবাহ।

৩৫। রাউলপিণ্ডিতে পণ্ডিত দেবীদাসের কন্যার সহিত রবিওয়ালনিবাসী শিবপ্রসাদের বিবাহ।

৩৬। বোম্বাই নগরীতে প্রসিদ্ধ কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর সহিত চঞ্চল-দেবী ব্রাহ্মণীর বিবাহ।

৩৭। বিজনীর নিবাসিনী গৌড় ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী পূর্ণাদেবীর সহিত কোটার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীরাম পণ্ডিতের বিবাহ।

৩৮। লাহোরে শ্রীমতী যশোদা দেবীর বিবাহ।

৩৯। রাউলপিণ্ডীবাসী লালা মুরলীধর আগরওয়ালার কন্যার সহিত বিজনীর-বাসী লালা প্রসাদীলালের বিবাহ।

৪০। লক্ষ্ণৌ সহরে লালা প্রয়াগ প্রসাদ কায়স্থের সহিত জেলের কেরাণী লালা সমসের বাহাদুরের বিবাহ।

৪১। বড়াপুরে (জেলা বিজনৌর) লালা ফুলচন্দ বৈশ্যের কন্যার লালা নন্দ-লালের সহিত বিবাহ।

৪২। গুরুদাসপুরে রামনাথ ক্ষত্রীর ক্ষত্রীবংশীয়া এক বিধবার সহিত বিবাহ।

৪৩। লাহোরে শ্রীমতী তপতী দেবীর বিবাহ।

৪৪। অমৃতসরে এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রীবংশীয়া কুলীন বিধবার।

৪৫। নসিরাতে লালা জগদম্বা প্রসাদের সহিত এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার।

৪৬। লাহোরে ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী শ্যাম দেবীর সহিত রামজীদাসের বিবাহ।

৪৭। অহম্মদাবাদে এক ব্রাহ্মণবংশীয়া বিধবার।

৪৮। একটাবাদের এক ক্ষত্রী বিধবার হরভগবান কুতুরের সহিত।

৪৯। কলিকাতা মানিকতলা নিবাসিনী শ্রীমতী উমাশশী দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের।

৫০। গুজরাতে ডঙ্গাজেলায় ভগবত ইতরচন্দ্র ক্ষত্রীর শ্যালিকার সহিত ডাক্তার রোশনলালের।

৫১। তরণ তারণে শ্রীমতী কেশবী দেবীর লালা করকতরায় ক্ষত্রীর সহিত।

৫২। লাহোরে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর সহিত হাসপাতাল এ্যাসিষ্টাণ্ট গণেশদাস ক্ষত্রীর।

৫৩। লাহোরে শ্রীমতী পূর্ণ দেবীর সহিত লালচন্দের।

৫৪। দেরা ইস্মাইল খাঁতে একটি ক্ষত্রীবংশীয়া বালবিধবার।

৫৫। মুরদাবাদে বুলচন্দ গৌড় ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত শ্রোত্রীয় শঙ্করলালের।

৫৬। অমৃতসরে শ্রীমতী গুরুদেবীর বিবাহ।

১৯০৪।

৫৭। সেরকোটে শ্রীমতী চম্পদেবী ক্ষত্রীর সহিত লালা বলরাম সওদাগরের।

৫৮। ঝাঁসীবাসিনী শ্রীমতী যমুনা দেবীর সহিত পণ্ডিত ঘাসীরামের।

৫৯। উজ্জয়িনী প্রতাপগড়ে সূর্য্যভান তেওয়ারীর কন্যার বিবাহ।

৬০। অমৃতসরে লালা সুখরাম দাসের বিবাহ।

৬১। ভুমড জেলায় জবাহর সিংহ জমিদারের কন্যার বিবাহ।

৬২। কির্থলে (মিরাট) এক গৌড় ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার।

৬৩। অমৃতসরে পণ্ডিত রাজনারায়ণ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের সহিত তথাকার এক বিধবার।

৬৪। লাহোর শরকপুরে লালা জয়চন্দ্রের কন্যার বিবাহ।

৬৫। গাজীপুরে (লোহার) এক সারস্বত ব্রাহ্মণকন্যার।

৬৬। কাণপুরে মুরারিলাল বৈশ্যের (আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) ভগিনীর সহিত শিবচরণ লাল বি, এর।

৬৭। দিল্লীর এক সম্ভ্রান্তা আগোরওয়ালা বিধবার সহিত মজঃফরপুর নিবাসী লালা গোবিন্দ প্রসাদের।

৬৮। যোগপুরের শ্রীমতী বিমতা বাইএর বিবাহ।

৬৯। অমৃতসরে অবোধ সমাচারসম্পাদক দীননাথ চতুর্বেদীর সহিত শ্রীমতী সুশীলা দেবীর বিবাহ।

৭০। মজঃফরপুরে এক ক্ষত্রী বিধবার বিবাহ।

৭১। লাহোরে একটি সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার বিবাহ।

৭২। সাজাহানপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ ভবানীপ্রসাদের কন্যার তাঁহার দেবরের সহিত বিবাহ।

৭৩। লাহোরে এক ক্ষত্রী বাল বিধবার।

৭৪। অমৃতসরে ক্ষত্রীবংশীয়া কোন বড় ঘরের একটি বালবিধবার।

৭৫। মান্দ্রাজ গণ্টুরে এক ব্রাহ্মণ বালবিধবার।

৭৬। শরকোটে একটি ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার।

৭৭। অমৃতসরে একটি ক্ষত্রী বাল বিধবার।

৭৮। দেরাগাজি খাঁ জামপুরে শ্রীমতী দেবীবাই ক্ষত্রী বালবিধবার।

৭৯। কর্ণাল (পুণ্ডরী) ভোলানাথ পোষ্টমাষ্টারের কন্যার সহিত লালা শালিগ্রামের বিবাহ।

৮০। লাহোরে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ক্ষত্রাণীর সহিত লালা হরমুখরায় মলহোত্রীর।

৮১। বোম্বাই গিরিগামে অদিচ ভোলাকিয়া ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী মণিবাইএর সহিত গুজরাটের "সয়াজিবিজয়" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের বিবাহ।

•

ইংরাজীতে নিম্নলিখিত জাতীয় সংগীতটি সম্প্রতি কলেজস্কোয়ারে পাঁচ ছয় শত ছাত্রকর্তৃক কিছুদিন যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গীত হইয়া থাকে, ইহা একটা কৌতুহলোদ্দীপক দৃশ্য, সন্দেহ নাই।

গোলদাঘিতে জাতীয় সঙ্গীত।

আমরা শুনিয়াছি, এই গান-রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত টহলরাম গঙ্গারাম। কলেজস্কোয়ারে বক্তৃতা করার জন্য ইনি দুইবার গুণ্ডার দলের হাতে মার খাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি খৃষ্টীয় কিম্বা মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই, তথাপি কসম্প্রদায়ের গুণ্ডার দল ইহাকে কেন তাড়া করিল, তাহার সদুত্তর কেহই দিতে পারিতেছেন না।

ইংরেজী গানটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানের উপর
ভগবান আশীষ বর্ষণ করুন।
সাগর হইতে সিন্ধু, কুমারী হইতে কাশ্মীর
এই সুবিপুল ভূমি,—গৌরবদৃপ্ত প্রাচীন
হিন্দুস্থানে শান্তি বিরাজিত হউক।
ভগবান্ আমাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানের
উপর আশীষ বর্ষণ করুন।
ভারতের সন্ততিবর্গ প্রীতিতে ঐক্য
অনুভব করুন। তাঁহারা যেন
তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে শিথিল না হন।
তাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হউক
এবং তাঁহাদের গুণরাশি উজ্জ্বল হইয়া
প্রকাশিত হউক।
আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির উপর
ভগবৎকরুণা বর্ষিত হউক।
মাতৃভূমি আপনাদের
সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন,
তাঁহার প্রার্থনা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন,
পুনরায় এই দেশে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করুন,
দেশে তাঁহার জয় প্রচারিত করুন।
ভগবান্ এই শক্তিমান্ দেশের প্রতি
সদয় হউন।
যদিও ভারতবাসী নানা প্রকারে
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন,
তথাপি হে তেজপুঞ্জঃ প্রভাবশালী কৃষ্ণ!
হে বরেণ্য, অসমসাহসী রামচন্দ্র!
তোমরা এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীকে
ত্যাগ করিও না,
ভগবান এই নিরাশ্রয় দেশের
উপর সদয় হউন।

বিশ্ববিজয়ী।

স'রে যা' স'রে যা' স'রে যা' তুহারা
কে আছ দাঁড়ায়ে পথে,
বিশ্ব-বিজয়ে বীর বিক্রম
আসিছে ত্বরিত রথে
ঘন ঘোর রবে বাজিছে বিষাণ,
কাঁপিয়া উঠিছে বিশ্ব পরাণ,
পৃথ্বী পৃষ্ঠ হয় শত খান
তীব্র চক্র ঘাতে,
অশ্ব খুরের বিকট বিঘাত
বাজিয়া উঠেছে সাথে।

হিম হিমালয় তাহার শিখরে
ছুটাইছে রথ বীর,
দমিয়া সিন্ধু নাচে তুরঙ্গ
কাঁপিছে কৃষ্ণ নীর,
রসাতলে গিয়া জাগাইছে ত্রাস,
সকল রাজ্য করিতেছে গ্রাস,
তাহার করাল হস্ত আঘাতে
কেহই নাহিক থির,
সম্ভ্রম সাথে বিজয় পতাকা
বহিছে প্রাসাদ শির।

সুপ্ত সিংহ ছিল সে শয়নে
জাগাইলে তারে সবে,

শত শত শত ভল্ল আঘাতে,
কত সে সহিয়া রবে,
তারো আছে বল বুকে নাহি ভয়,
তাহারি আজি সে দেয় পরিচয়,
দলে ছিলে তারে চরণের তলে
দলিত হ'তেছ এবে,
প্রতিহিংসার বজ্র বহ্নি
জ্বলেছে জ্বালাতে সবে।

কে আছ দাঁড়ায়ে পথের মাঝারে
দূরে দূরে যাও সরি,
অবনত শিরে অবনতি বহি
রহ করযোড় করি,
নতুবা এখনি শাণিত শায়কে
বহাবে হৃদয় রক্ত ঝলকে,
লুটায়ে পড়িবি মুরছি ভূতলে
মরণ অঙ্কোপরি।
ছটায়েছে রথ বিশ্ববিজয়ী
সবার গর্ব্ব হরি'।

রায়-গৃহিণী।

(১)

"আচ্ছা মেজবৌ, পরের কথা না হলে তুই থাকতে পারিস না—কার গহনা হ'ল কার কাপড় হ'ল সে নিয়ে তোর কাজ কি, তোকে কি তারা কেউ দুএক খানা দেবে?" বোনপো-বৌকে এই বলিয়া ধমক দিয়া রায়-গিন্নি আবার ধুতুল কুটিতে আরম্ভ করিলেন। রায়-গিন্নির স্থূল শরীর একটু থল্‌থলে, গৌর বর্ণে বয়স ও পৈত্তিকের গুণে একটু হলদে ছোপ ধরিয়াছে, মেজবৌয়ের মাথা দেখে দেওয়াতো নয়—ধান গুলো অপ্‌চ করা, তা না হলে গিন্নির সামনের দিকে এখনও সাত আট গাছা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে কেন? তা যাক্‌ যে দাঁত চারটী ঠোঁঠে ঢাকা পড়ে নাই, তামাক পোড়ার রঙ্গে সে কয়টিই মিশ্‌মিশ কচ্ছে; কপালের মধ্যভাগে নাসামূল হতে সিঁথি পর্য্যন্ত লম্বালম্বি একটী সরু থাপ পড়াতে দুই পাশ উনুনের ঝিঁকের মত বেশ একটু উঁচু উঁচু দেখায়; ভ্রূদুটী অতি পরিষ্কার—যেন আঠা দিয়া দাগা হইয়াছিল, চুল বসান হয় নাই; চক্ষু দুটী গোল, কোলে অকৃত্রিম কাজল, উনুন-মাটীর রঙের তারাদুটী ঠিকরে বেরুবে, কি ধরে থাবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘুর পাক থাইতেছে; কাণ দুটীতে সারি দিয়া পনেরটী করে মাকড়ী মানিয়ে গিয়াও মধ্যে মধ্যে বাতাস খেলিবার স্থান আছে; নাকটী ঠিক টিয়া পাখীর মত-ই; কিন্তু আগা টুকু নীচের দিকে না নামিয়া উপর পানে ঈষৎ ঘুরিয়া গিয়াছে, তার নীচে ওষ্ঠের উপর যেরূপ ঘন রেখা দিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে পাঁচ সাত-বার নাপিতের হাতে পড়িলেই বেশ চুক্‌ চুকে কালো গোঁফ ঝেড়ে উঠে; স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প; গৃহিণীর গর্ভধারিণী

একদিন অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পাউরুটি খাইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার বয়স কালে বাঁ পায়ের উপরটী কতকটা পাউরুটীর মত ফুলে উঠেছে বটে; কিন্তু বক্ষ ও উদর অন্তরাল থাকায় রায় গিন্নি এ অঙ্গবৈভবের শ্রীবৃদ্ধি স্বয়ং কখনও দেখিতে পাইতেন না, আর এই অসীম সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষাকারী ভুজযুগ প্রকৃতই মর্ম্মান্তিক প্রেমালিঙ্গনের উপযোগী। গৃহিণী দুলিতেছেন আর ধুতুল কুটিতেছেন; ডালে ফুল দোলে, কাণে দুল দোলে, দাঁড়ে পাখী দোলে, দোলায় খুকী দোলে, কিন্তু গৃহিণীর দোলনে সে হালকা ভাব—সে ছেবলামোর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই বাসুকীর শিরঃকম্পনে মেদিনী যেমন সময়ে সময়ে মন্দ আন্দোলনে দোলে, বঁটির বাঁট-বাহিনী রায়-গৃহিণীর মন্দার-অঙ্গ তেমনি ধীরভাবে দুলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের পুঁটে দুলছে, গলায় দানা দুলছে কোমরে জিজির দুলছে, নাকে নথ দুলছে। মুক্তা চুনি খুলে নিয়ে নথটী ছোট নাতির গলার হাঁসুলি করিয়া দেবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু তার অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইলে নাসিকার চিরসহচর শুভপরিণয়ের এই সুদর্শন চক্রটীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গৃহিণীর পশ্চাতে একটী কাঁসার রেকাবিতে পাঁচখানি চাকা চাক বেগুণ, খুব সরু সরু করে' কোটা চারটী আলু, মুটো খানেক কলাই শুঁটির দানা, ও সিকিটা ফুল কপি ছাড়ান রহিয়াছে; এগুলি সপুত্র দম্পতীর রাত্রের শীতলের আয়োজন। কেহ পাছে "দৃষ্টি" দেয় এই ভয়ে তরকারি গুলির উপর অল্প মাত্রায় লবণছিটান আছে। বঁটির বাম ধারে একখানি কালো পাথরের খোরায় ডুমো ডুমো আলু, কাঁচ-কলা, বিলাতি কুমড়া, ফালি কতক বেগুন, চারটি খানি পালম শাক, ও পূজারীর নিকট চাহিয়া লওয়া গুটিকয়েক প্রসাদী ভিজা ছোলা সাজান আছে; বোনপো, বোনপো বৌ, ভাই, ও দুই একজন বিশেষ অনু-গৃহীত পোষ্যের পরিতোষের জন্য এই বন্দোবস্ত। আর বঁটির দক্ষিণে

একটী মেটে খোরায় পালমের গোড়া, ডেঙ্গর ডাঁটা, থোড় কুচান, কুমড়ার বেকলা, ঝিঙে, সবাঙ্গ বেগুন, ডুমুর স্থান পাইয়াছে, ধুতুল দুটো কোটা হইলেই হয়; ভাসুর পো, তার হেঁজল দাগা বৌটা, নিকামাইয়ে দেওর, হিঁসকুড়ি জা প্রভৃতি গাত্রখাদক পোড়া লোকদের ফাঁড় পোরাবার জন্য রাত্রের এই ব্যবস্থা। যেখানে বসিয়া গৃহিণী তরকারি কুটিতে ছিলেন, তাহার দক্ষিণের ঘরের কোণে কাল ও সবুজের মাঝামাঝি কি একটা রং মাখান একটী ছোট লোহার সিন্দুক অন্তর মাখান একটী কাঠের ফ্রেমের উপর বসান রহিয়াছে, সিন্দুকের গায়ে সিন্দুর ও চন্দনের অলকা তিলকা ও গিন্নির জপের মালার থলি, একটী ছেঁড়া শালপাতে কালীঘাটের প্রসাদী ঘৃতসিক্ত সিন্দুর ও একটী ছোট চুপড়ীতে দুইটা মুলা, কয়েকটা নারকলে কুল, পাব্ দুই তিন আক, একখানা শাঁক আলু, ও আধখান কমলালেবু,—তরকারির আঠা লাগিবার ভয়ে সোনার বালা জোড়াটী খুলিয়াও রায়-গিন্নি ঐ সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। সিন্দুকের একটু উপরেই একটী কুলঙ্গী, তাহার উপর একখানি কাচহীন আরসির ফ্রেম, গুটি কয়েক শুষ্ক বিল্বপত্র ও তারকেশ্বরের চরণামৃতের একটী শূন্য ভাণ্ড; রায় গিন্নির যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া একটী কৃতজ্ঞ মাকড়সা কুলঙ্গীর মুখটী ঢাকিয়া একখানি সুন্দর নেতের পরদা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে; সিন্দুকের পাশে একখানি জল চৌকির উপর, গুটি দুই তিন মাটীর হাঁড়ী ও গুটিচার পাঁচ ভাঁড় কতকগুলি ছোট ছোট পুটলীতে পরিপূর্ণ হইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া আরাম করিতেছে, সাম্‌নে একটী কাঁসার গেলাস, একজোড়া সেকেলে বাটা, ও একটা কাশীর লোটা, তিনটী তৈজসই সুনীল কলঙ্ক লেখায় শোভিত। চৌকার পাশেই ছাদে যাইবার ছোট দরজা, দরজার পাশে সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখা, ললাটে জিরা মরিচের চন্দন চর্চ্চা একখানি শীল বক্ষ পাতিয়া শয়ন করিয়া আছে, উহার

চরণতলে বসিয়া হেঁজল দাগা ভাসুর-পো-বৌছুঁড়ী দুই হাতে একটী নোড়া ধরিয়া শীলাবতীর হৃদয় পেষণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দুই কাণে খুড় শাশুড়ীর বকুনি খাইতেছেন, মরিচের হাতে চক্ষের জল মুছিতে গিয়া তথায় প্লাবন উপস্থিত করিতেছেন আর মনে মনে আপনাকে, স্বামীকে, ও বিধাতাকে গালি দিতেছেন। আবার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত হলুদের ছাপলাগা বক্ষের বসনের উপর দৃষ্টি পড়িতেছে, অমনি "এজীবন তো কেবল একটানা কান্নার কারবারই নয়, একজনকে পায়ে ধরাইয়া তো সকল দাসীপনা শোধ করাইয়া লই"—স্মরণ হওয়াতে আফিম খাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেছেন। বৌটীর দক্ষিণ বাহুতে মধ্যে মধ্যে যে দরজার কপাটের আঘাত লাগিতেছে, সেটী সম্মুখে বড় ঘরে যাইবার পথ, তাহার বাম পার্শ্বের কোণে একখানি মাদুর ও এক গাছা ঝাঁটা ঠেসান রহিয়াছে, তারপর একটী খোলা সেল্‌ফ; তাহার চারটী তাকে মাটীর পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল, কাঠের পুতুল, চিত্রকর, ভাঁড়, ইঁদুর কল, ঘটী তোলা কাঁটা, চাবির থোলো, ভাঙ্গা বাক্সর কল, হরিতকী, আমলকী, সিঁদুর চুপড়ী, সমুদ্রের ফেনা, বড় কড়ী, পেতলের নাড়ু গোপাল; দুই চারি খান কাঁচের বাসন, গিন্নির চুলের দড়ী প্রভৃতি জগত সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যেরই নমুনা আছে। তাকের দুপাশে দুটী প্রেক মারা, একটাতে দাঁড়ে বসা সোলার কাকাতুয়া পাখী অপরটী বাখারির তালমাড়া একটী। সেলফের পাশে একখানি টুলের উপর একটী কালো রংয়ের তেলের ভাঁড়।

সফ্রেম অফ্রেম কয়েকখানি ছবিও ঐ গৃহের দেওয়ালের শোভা সম্পাদন করিতেছে। একখানি কালীঘাটের কালীর ছবি, একখানি আর্ট ইষ্টুডিওর লক্ষ্মী, আর একখানি নলদময়ন্তী। একখানিতে একজন বিপুলনাসা হরিতালবর্ণা সুন্দরী, চেয়ারে উপবিষ্ট একটী জুলফীদার বাবুর চুল ধরিয়া সম্মার্জ্জনী সম্ভাষণ করিতেছেন, অপর একখানিতে

জামাজোড়া পরিধৃত দীর্ঘাকার এক গলদা চিংড়ী খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেয়ালে দুটী ব্র্যাকেটও আছে, একটী মাটীর অপরটী কাষ্ঠের; মাটীরটীর উপর একটী শুণ্ডশূন্য গণেশ, ও কাষ্ঠেরটীর উপর একটী বিপুল-বপু ঘড়ী, তাহার দুইটা কাঁটা ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গেই চলে, এবং রায়-গিন্নির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা খরচ করিয়া তৈলের দ্বারা উহার ষটচক্রভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসে একবার বাজিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে ক্ষান্ত হয় না। অনেক সৌখীন বাবুর বৈটকখানায়, অনেক ধনীর শয়ন কক্ষে রকম রকম অনেক ঘড়ী দেখা গেছে বটে, বাবু হ্যাণ্ডনোটে সই করিতেছেন ও ঘড়ী ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি, কৈ একবারে বারোটার অধিক বাদ্য কোনটীতেই শুনি নাই; কিন্তু গিন্নির ঘড়ী আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া সময়ে সময়ে এক শত দেড়শত পর্য্যন্ত বাজিয়া যায়। আবার সে বাদ্যের বোল কি শ্রবণ-রঞ্জন! টুং টাং ঠিং ঠিং ডিং ডিং কি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুরা খাম্বাজের গিটকিরি ভরা—ধন্ ধরর্ র্‌র্‌র্ র্। বাজনা আরম্ভ হইলেই গিন্নি দুই হাত তুলিয়া সকল কথাবার্ত্তা থামাইয়া দেন, আর সহাস্যে হাঁ করিয়া ঘড়ীর পানে চাহিয়া প্রতি ধন্ ধর্ র্ র্ র্ র্ তালে তালে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, তাঁহার বিশ্বাস—এমন ঘড়া লাট সাহেবের বাড়ী তো লাট সাহেবের বাড়ী মনুমেণ্টেও নাই। রায়-গিন্নির প্র-দাদাশ্বশুর মহাশয় এক মার্কিন হাউসে মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, সাহেব বিলাত (আমেরিকা) যাইবার সময় এই ঘড়ীটী তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া যান। কোন বৌ দেড়পোর বেলায় ঘুম থেকে উঠলো, কোন ঝি বাজারে গিয়ে ৫ ঘণ্টা কাটিয়ে এল, কোন আবাগী রাত না পোয়াতেই ভাতের পাথর নিয়ে বসলো, কোন বেহায়া ছুঁড়ী সন্ধ্যা না হতেই দোরে খিল দিয়ে শুলো, কোন গ্যাদারি গা ধুতে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা কল্লে, ঠাকুরপো কবে

দুপুর রাত করে বাড়ী এলো, এই সকলের বিচার গৃহিণী ঐ ঘড়ীর সাহায্যেই করিতেন, এবং ঐ ঘড়ী দেখিয়াই তিনি চারটে রাত্রে উঠিতেন, দু'ঘণ্টা একাসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা করিতেন, তিনটে বেলায় দুটী ভাতে বসিতেন আর ছ'টা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত জ্বালিবার জন্য প্রতি প্রদীপে এক পলার হিসাবে তৈল মাপিয়া দিতেন। এই যে গৃহ সজ্জা দেখিলেন ইহা হইতে রায়-গিন্নির পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র কুটুরিটী রহিয়াছে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। গিন্নির আফিস ঘরে যে লোহার সিন্ধুকটী রহিয়াছে সেটীতে হাত খরচার টাকা পয়সা নিজের নিত্য ব্যবহারের গহনা ও দু একটা রূপার হালকা গেলাস বাটী মাত্র সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। যে ক্ষুদ্র গৃহটীর কথা বলিলাম গৃহিণী যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার পশ্চাতেই তাহাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করা রহিয়াছে। কপাটের উপরে মধ্যে নীচে তিনটী জগন্নাথে তালা খুলিয়া তবে সে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার খুলিবা মাত্র কারারুদ্ধ পবনদেবের পলায়নের বেগে প্রদীপটী একেবারে নিভিয়া যায়, পুনরায় জ্বালিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায়, সে ক্ষুদ্র গৃহে একটী ক্ষুদ্রতম জানালা আছে বটে, কিন্তু তাহার কপাট খুলিলে এক পল্টন মশা ব্যণ্ড বাজাইয়া বাহিরে যায় মাত্র, সূর্য্যের আলোক ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু যাক এ সব কথা বলিবার প্রয়োজনই নাই, কারণ গৃহিণী ভিন্ন সে গৃহে অন্য কেহ প্রবেশ করে নাই করিবার অনুমতিও নাই, জানলাটীও কস্মিন্‌কালে খোলা হয় না, আর গৃহিণীর প্রদীপ জ্বালিবারও প্রয়োজন হয় না; পূর্ব্বজন্মে মার্জ্জারকে প্রভূত পরিমাণে মৎস্যের কাঁটা খাওয়াইবার পুণ্যে,—লোভ হিংসা, কলহপটুতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মেনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে

ন্ধকারে চক্ষু জ্বালিবার ক্ষমতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তবে হু লিখিলেই নাকি অনুভব শক্তির অমানুষিক প্রখরতা জন্মে, তাই গুপ্তকক্ষ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারিতেছি। গৃহমধ্যে একটী লকাঠের সুবৃহৎ বাতাবন্দি সিন্ধুক ছিল, সেই সিন্ধুকে আরোহণ রিয়া রায়-গিন্নি শ্বশুরবাড়ী ঘর বসত করিতে আসিয়াছিলেন, মোটা াটা কাঠের ঢাকা লাগান ছিল; পুটলিতে টিকিট লাগান ঢাকাই, ন্তিপুরে, চেলি, তসর, গরদ, বেনারসি, বোম্বাই, ড্রেসপীস, পায়না-পাল প্রভৃতি কাপড়, আলোয়ান, জামিয়ার, শাল, রুমাল, কোট, াগা, গলাবন্দ, কোমরবন্দ, তাজ, টুপী, পাকড়ী ও নানাবিধ রিধেয় উত্তরীয় বাস এবং অগণন আরশুলায় সিন্দুকটী পরিপূর্ণ ল; আরশুলা ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্রব্যই বন্ধকী। ধর্ম্মে মতি ওয়ায় ঐ আরশুলার দল জীবহিংসা মহাপাপ জ্ঞানে কীট পতঙ্গাদি ামিষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শাল, আলোয়ানাদি কিয়াই জীবন ধারণ করিত, অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যও এ সংসারে ংস্য মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধকার গৃহে শাল, আলোয়ান কাটিয়া াকেন। গিন্নির নিজের এবং বৌ ও ছেলেদের মূল্যবান কাপড় চোপড় একটী ছোট কর্পূরকাষ্ঠের সিন্ধুক ও মাঝারি রকম সেগুণ াষ্ঠের দেরাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বন্ধকী পিতল কাঁসার তৈজস, াথরের বাসন এবং অন্যান্য ইতর জাতীয় ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ঐ হস্থিত আর একটী বড় সিন্ধুকের মধ্যে থাকিত। দক্ষিণ কোণে কটী বড় লোহার সিন্ধুক—প্রতিবাসিনী কুলজা ও কুলটাগণের অশ্রু-লসিক্ত সুবর্ণ, রৌপ্য এবং জহরতের অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ, বন্ধকী পার বাসন গুলিও উহার মধ্যে থাকিত। পারিবারিক মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি উত্তর কোণে লোহার সেল্‌ফের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইত। লওয়ারী চুড়ীওয়ালাদিগকে প্রতিপালন করিয়াই বধূগণ বারমাস

এয়োত রক্ষা করিতেন, কেবল তেমন তেমন স্থানে নিমন্ত্রণ যাইবার সময় গৃহিণী দুই চারিখানা গহনা বাহির করিয়া দিতেন, এবং পাল্কী হইতে নামিবা মাত্র খুলিয়া লইয়া নখিন্দরের বাসর ঘরে আবদ্ধ করিতেন, এই তো গেল অন্ধকূপের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের কথা। অন্য অন্য বাড়ীতে তত্ত্ব করিলেও কমবেশী এরূপ অনেক সামগ্রী দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ অসূর্য্যম্পশ্যা কক্ষসুন্দরীর নিভৃত গর্ভে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিল, তাহা সাধারণ লোকে প্রায় দেখিতে পায় না! হাঁড়ির উপর হাঁড়ি তার উপর হাঁড়ি তার উপর তার উপর তার উপর এইরূপ কোমর সমান, বুক সমান, গলা সমান হাঁড়ির সারিতে গৃহটীর মেজেয় আর পা বাড়াইবার স্থান ছিল না; গৃহিণী ভিন্ন অপর কেহ সে গোলকধাঁধাঁয় প্রবেশ করিলে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাঁড়ির তলায় সমাধিলাভ করিত। দেয়ালে পেতেন তাহাতেও হাঁড়ি, কড়িকাট হইতে দোদুল্যমান সিকার সারী তাহাতেও হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী। এই হাঁড়ির কাঁড়ীর মধ্যে কোনটীতে চাল-ভাজার নাড়ু—গৃহিণীর শ্বাশুড়ী জীবিতকালে স্বহস্তে উহা পাক করিয়া-ছিলেন; কোনটীতে দাদখানি চাউল—তাঁহার শ্বশুরের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়, কোনটীতে তাঁহার নিজের বিবাহান্তে মেলানি ভারের ফেণী বাতাসা, তাঁহার দিদিশাশুড়ী কাশী হইতে নৌকা পথে পেঁড়া আনিয়াছিলেন, তাহার গুটিচার পাঁচ কোন হাঁড়ীতে আছে; কোনটীতে কর্ত্তার প্রথম ষষ্ঠীবাটার ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হরিৎ ও গাত্রে শুভ্র লোমাবলি বাহির হইয়াছে; কোনটীতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির মুড়কী, ছাতু বাবুর পুত্রের বিবাহের সামাজিকের ওলা কোন হাঁড়িতে। বিবাহের জল গায়ে লাগিয়াই কর্ত্তার একবার জ্বর হইয়াছিল। সে সময় সাবুদানা আসে, তাহার এক মুঠাও এক হাঁড়ীর তলায় পড়িয়া আছে।

এইরূপ রলার থিরপুলি, অভয় চরণ মিত্রের বাড়ীর মেঠাই, রাধাকান্ত দেবের শ্রাদ্ধের থাজা, খেলাৎ ঘোষের জন্ম তিথি পূজার গজা, বিশ বছুরে খেজুর, পঁচিশ বছুরে নারিকেল নাড়ু, ঝড়ের বছরের বেদানা, ৬০ সালের পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচুরি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যে হাঁড়িগুলি পরিপূর্ণ; একটী বড় হাঁড়ায় গুটিকয়েক কমলা লেবু ও আম গৃহিণী একদিন যৌবন কালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইদুরমাটীর সাহায্যে তাহা হইতে ২।৪টী গাছ বাহির হইয়াছিল।

(২)

কলিকাতার উপকণ্ঠ সুঁড়ায় গৃহিণীর মাতুলালয় ছিল, কুমারী কালে মধ্যে মধ্যে সেখানে অবস্থান কালে তিনি পুরুষের মত কাপড় পরিয়া বেণী দোলাইয়া সেখানকার রাজাদের বাড়ী খেলা করিতে যাইতেন; কেহ কেহ বলে, ঐ স্থান হইতেই রায়-গিন্নির রুচি প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় আকর্ষিত হয়, এবং ঘর বসত করিতে আসিয়াই তিনি গুপ্ত ও প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন; শাশুড়ী ঠাকুরাণীরও এ বিষয়ে স্বভাব-সিদ্ধ সথ থাকায় গৃহিণী এমন অমূল্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার এক মূষিক-দম্পতি হঠাৎ ঐ গৃহে প্রবেশ করে, আর বাহির হইবার সুযোগ না পাওয়ায় ঐ স্থানেই উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এক্ষণে তাহাদের ভয়ে কোন বিড়াল ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করে না; গৃহিণী কয়েক-বার কল পাতিয়াছিলেন; কিন্তু সাত আটটী কল ভগ্ন হইবার পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছেন। এক সময় রায় মহাশয় তাঁহার ভাড়া-টিয়া এক রাস্তাবন্দি সাহেবের নিকট বাকি ভাড়ার দরুণ একখানি বেতের কাজকরা বগি ও একটী হলদে চামড়া মোড়া হার্টের ঘোড়া লইয়া তাহাকে ছাড় দেন; ঘোড়াটী প্রাতঃকালে বাড়ীর ভিতর হইতে

কতকগুলি তরকারীর খোসা ও সায়ংকালে গোশালার ভৃত্যের হস্তে একটী যাব পাইত, রাত্রিকালে অশ্বটীকে বাটীর নিকটবর্ত্তী বাজারে চরিতে দিতেন, ঐ কৃষ্ণের জীবের প্রতি সুনজর রাখিবার জন্য ঘাটির পাহারাওয়ালার একটী করিয়া দোয়ানি মাসহারা বরাদ্দ ছিল; দিনের বেলা উচ্চৈঃশ্রবা আফিসের আস্তাবলে সাহেবের ঘোড়ার পাশে থাকিবার স্থান পাইত।

একদিন সাহেব নিজের ঘোড়ার টিফিন তদারক করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বাবুর বাহন সকরুণনয়নে বাল্‌তির পানে চাহিয়া আছে এবং বিক্রয়াবশিষ্ট যে কয়েকটী পুচ্ছ আছে, তাহার দুর্ব্বল আঘাতে পৃষ্ঠস্থ একখানি ক্ষত হইতে মাছি তাড়াইতেছে। বেচারির টিফিনের কোন বন্দবস্ত নাই জানিয়া সাহেবের দয়া হইল ও আপনার সহিসকে তাঁহার ঘোড়ার দানা হইতে কতক অংশ উহাকে দেওয়াইতে অনুমতি করিলেন; তোবড়া মুখের কাছে ধরিবামাত্র হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের আবেগে অস্থিচর্ম্মসার পীতাশ্ব একবার তোবড়াস্থিত দানার প্রতি, একবার সাহেবের মুখের প্রতি ও একবার সহিসের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল; পরে আনত আননে বারেক মাতা বসুমতীকে দেখিয়া লইল, বিপুল উদর ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছুটিল, নয়নদ্বয়ে এক এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তারপর কে জানে কি ভাবিয়া পশ্চাতের পা দুখানির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল ও আকাশের দিকে মুখ করিয়া সে হা হা হা হা শব্দে এক বিকট হাসি হাসিয়া একেবারে ধরাশায়ী হইল। সেই অবধি অশ্বরাজ আর চতুষ্পদে দাঁড়ায় নাই, বাখারির আঘাত সহ্য করে নাই, ছেঁড়া বেতের বগী টানে নাই, জাব খায় নাই, তাহার নশ্বর দেহ ধাপায় প্রেরিত হইল, অশ্ব কোন কেরাণী-জননীর জঠোরে প্রবেশ করিবার জন্য লাল দীঘি ঘুরিয়া বাঙ্গালী টোলাভিমুখে চলিল; স্নেহপরায়ণ প্রভু হিন্দু-কুল-রবি রায় মহাশয়ের

তি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুর্ব্বল দেহস্থ স্বল্পাবশিষ্ট চর্ব্বি হিন্দুদিগের আহার্য্য তে মিশ্রিত করিবার জন্য উইল করিয়া গেল। অশ্বের শোকে ামীকে পাগল প্রায় দেখিয়া বুদ্ধিমতী সতী আমাদের গৃহিণী প্রবোধ য়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার াণ্ডারস্থ একটী ইঁদুর ধরিয়া কর্ত্তার বগী টানার কার্য্য চালাইয়া দিবেন।

এমন সোণার লক্ষ্মী এতগুলো হাড় জ্বালানে পর লইয়া ঘর করিতেন ক করিয়া, ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে ারে বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় বাটীর পাট্টাখানি রায় মহাশয়ের প্রপিতামহের নামে এবং কতকটা পৈত্রিক সম্পত্তির জের এখনও াহার জমার খাতায় টানিতে হইতেছে, এবং ভ্রাতৃবংশে গ্রাসাচ্ছাদন এবং তাঁহাদিগের তরফের প্রত্যেক বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ, সূতিকাগৃহ, আটকৌড়ে, ষষ্ঠী পূজা, অন্ন প্রাশন, বিদ্যার্জ্জন, লোকলৌকিকতা, চিকিৎসা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধে সপিণ্ডী করণের খরচ আপন ইচ্ছায় ুক্তহস্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াও এখনও কিছু ফাজিল বাকি কাটিতে পারেন নাই, তখন আমার ন্যায় পাষণ্ডও গৃহিণীর দূরদৃষ্টি ও বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেননা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছেন যে "যত খরচ তো ওদেরই জন্য, আমাদের কটী পেটে আর ত পড়ে! এ সওয়ায় ঠাকুরের দুবেলা ও বার মাসে তের পার্ব্বন আছে, কর্ত্তারা তো আর হাতী ঘোড়া রেখে যান নাই।" বাস্তবিক তাঁহারা হাতী ঘোড়া রেখে যান নাই, সেকেলে মানুষ নগদ টাকা ার সোণা রূপাই ভাল বুঝিতেন তাহাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। রায় হাশয় পরিবারের নিকট তাঁহার স্ত্রীধন কর্জ্জ করিয়া মুচ্ছুদ্দিগিরি িবার সময় আফিষে সিকিউরিটী জমা দেন, লোক জনে ৩।৪ বার হবিল ভাঙ্গায়, ঝুঁকি রায় মহাশয়ের ঘাড়ে পড়ে; কাজেই সাহেবেরা জমার টাকা কাটিয়া কাটিয়া লয়েন, কর্ত্তাও বার বার উক্ত রূপ

কর্জ্জ দ্বারা ডিপজিটের টাকা পূরণ করেন ; আর একবার পাঁচ জনের কুপরামর্শে পাটের কাজ করিতে গিয়া একেবারে গৃহিণীকে ফতুর করিয়া ফেলেন। গরীব স্ত্রীলোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার তো আর চারা নাই, এক্ষণে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আফিষে যে কয়টী টাকা পান মাসে মাসে তাহা অর্দ্ধাঙ্গিণী উত্তমর্ণের হস্তে দিয়া থাকেন। গৃহিণীর পিতা সুদাই ঘোষ কন্যার বিবাহের পর জামাতার অধীনে একটী ওজনসরকারি কর্ম্মে ভর্ত্তি হয়েন ; সুতরাং কোন্ আলাদিনের প্রদীপ ঘসিয়া কোন্ দৈত্যের তমোময় ভাণ্ডার হইতে গৃহিণী স্ত্রীধন আনাইতেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না ; স্বামীকে কর্জ্জ দিবার পূর্ব্বে বা সময়ে সে ধনের কোন রূপ চিহ্নও কেহ দেখে নাই, কখনও তাহার উল্লেখও শুনে নাই ; কিন্তু ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ভাড়াটীয়া বাটী কোম্পানির কাগজ তেজারতি ও অলঙ্কারাদিতে তাহা ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। এই সমস্ত সম্পত্তির কেনা বেচা আদায় তাগাদার ম্যানেজারি রায় মহাশয়কেই করিতে হইত এবং সেই জন্য সতী হাত তুলিয়া পতিকে নিজ খরচের জন্য কিছু কিছু মাসহারা দিতেন।

(৩)

পিতা বর্ত্তমানে রায় মহাশয়ের জেষ্ঠ্যের মৃত্যু হয় এবং পিতাও পুত্রশোকে অল্পদিন পরেই গঙ্গা লাভ করেন সুতরাং জেষ্ঠ্যের পুত্র ও নিজের কনিষ্ঠ দুইটী নাবালকের ভারই রায় মহাশয়ের উপরেই পড়ে ; প্রগাঢ় স্নেহের আধিক্যে তিনি নাবালক দুটীকে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত আদর দেন, তাহাদিগকে স্কুল পাঠশালা দিয়া অধিক কষ্ট দেন নাই, কাজেই বয়ঃপ্রাপ্তে তাহারা কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত হইল না এবং আপনার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটা ছোট কার্য্যে ভর্ত্তি করিয়া তিনি তাহাদের বা বংশের মর্য্যাদা

ানি করিতে পারেন না। শ্যালক শ্যালীপতি আদি হিসাবে কয়েকটী ালরূপ লেখাপড়া নাজানা লোক রায় মহাশয়ের অধীনে কোলি-ারি গুদাম সরকারি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া এক রকম দশ টাকা পার্জ্জন করিত বটে এবং তহবিল তছরুপাতের ব্যাপারটা তাহাদের রা সুবিধামত সমাধা হইত, কিন্তু তাহারা পর বৈত নয় ; তাহাদিগের বতনাদি তো আর রায় মহাশয়ের ঘরে আসিত না, কিন্তু ভ্রাতা াতুষ্পুত্রের ন্যায় আত্মীয়গণকে আপন অধীনে কর্ম্ম দিলে লোকে াহাকে পক্ষপাতী ও অসৎ বলিতে পারে, এইভয়ে তিনি তাহাদিগের পার্জ্জনের উপায় করিয়া দেন নাই ; সুতরাং খাতায় তাহাদের নামে ান রূপ জমা না পড়িয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া দাবী কাটিবার থটী সুন্দররূপে পরিষ্কার হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণা গৃহিণীর সৎপরামর্শে ন্যাভারগ্রস্ত স্ব-জাতির প্রতি কৃপা করিয়া নাবালক দুটীর বিবাহ অতি ন দরিদ্রের গৃহে দিয়াছিলেন, সুতরাং রুলি পরাইয়া কন্যা বিদায় রিয়াছে, এমন মুরুব্বি শ্বশুরদিগের দ্বারা জামাতাদিগের কোন প উপকার বা তাহাদিগের পক্ষ হইতে মামলা মকোদ্দমার উৎপাত ধাইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই তো গেল গিন্নির শ্বশুর গোষ্ঠীর পর করুণার কৈফিয়তী। বোনপো বোনপো বৌ প্রভৃতি পিতৃ-পর্কীয় সম্বন্ধের যে তাঁহার কোন স্নেহের পক্ষপাত ছিল এ অপবাদও হ দিতে পারিত না।

বোনপোর পিতা দু হাজার টাকা রাখিয়া যান ; ছেলে মানুষ ইয়া কেউ ঠকাইয়া লইবে বলিয়াও বটে এবং কাগজের সুদের ার আজ কাল মাটী এই জন্যও ভারী সুদে খাটাইয়া মূলধন বৃদ্ধি রিয়া দিবার নিমিত্ত গিন্নি নিজের হাতে এ টাকা লয়েন। এই সময় কটা ভারী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় ; একটা মাগী প্রায় হাজার টাকার জড়য়া গহনা রাখিয়া টাকায় চার পয়সা সুদে

দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করিতে আসে, গৃহিণীর সিন্দুকে টা
পড়িয়া পচিতেছিল ; কিন্তু পিতৃমাতৃহীন বোনপোর হিতৈষি
মাসী নিজে অমন ভারী সুদ লাভের লোভ সম্বরণ করিয়া ঐ গচ্ছি
দুই হাজার টাকা দিয়া গহনা গুলি বন্ধক রাখেন। এক বৎসরে
মেয়াদ ফুরাইল। কিন্তু সে মাগী নিরুদ্দেশ। সুদের হিসাবে এ
পয়সাও দিল না, গহনাও খালাস করিতে আসিল না। তখন মা
একদিন সস্নেহে বোনপোকে ডাকিয়া আহ্লাদে আটখানা হই
বলিলেন "নিলু তোর বড় বরাতরে বাবা দু হাজার টাকা দিয়ে আ
হাজার টাকার উপর মেরে দিলি, আমিই ঠকে গেলুম ; কর্ত্তা পা
লেখা পড়া করিয়ে নিয়েছেন, এখন সে মাগী টাকা দিতে এলে
আমরা নেবনা ; তা অত জড়য়া রেখে তুই বা করবি কি যা ওগুলো
নিয়ে ভাল জায়গা থেকে যাচিয়ে আন ; বিক্রি করে নগদ টা
হলে আবার এই রকম খাটাতে পারবি ; এইবার দেখছি তোর বরা
খুললো।" এই বলিয়া মাসী একটী টীনের বাক্স শুদ্ধ গহনা গু
একখানি একখানি করিয়া নীলুকে বোঝাইয়া দিলেন। নীলু জি
গুলি বড়বাজারে তিনটী ভাল দোকানে দেখাইয়া অবশেষে এক
আলাপী লোকের সঙ্গে এক প্রসিদ্ধ জহুরির কুঠীতে গেল, কিন্তু য
সে জহুরীও বলিল, গহনাগুলি কিছুই নয় সব ঝুঠা, গিল্টি ক
পিতলের উপর কাচ ও বাজে পাথর বসান মাত্র, উহার দু দাম
দাম হইবে না, তখন একেবারে হতাশ হইয়া জলভরা চখে উর্দ্ধশ্বা
বাড়ী আসিয়া বাক্সটী মাসীর পায়ের কাছে দিয়া বসিয়া পড়ি
মাসী অবাক্ একেবারে অবাক্—কলির লোকের ব্যবহার দে
ধর্ম্ম একেবারে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝিয়া, জগতে এত জুয়া
আছে অথচ তিনি ইহার বাষ্পও জানেন না, ভাবিয়া একে
আকাশ হইতে পড়িলেন, "নিলে তোর কি সর্ব্বনাশ করলুম, একে

পথে বসালুম" বলিয়া গগনভেদিস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, দুই হাতে হাঁটু চাপড়াইতে লাগিলেন, মাথার পাকা পাকা চুল গুলি পড়্ পড়্ করিয়া ওপড়াইয়া ফেলিলেন, পাশে হাঁপানীরোগা বিমল মাসী বসিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, বেচারার ফুস্ফুস্ শোঁ শোঁ ডাকিয়া উঠিল, অবশেষে "এ প্রাণ আর রাখবোনা আজ রক্ত গঙ্গা হব" বলিয়া দুই হাতে বঁটি তুলিয়া আপনার গলায় হাত খানেক দূরে ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন। গহনা তো গেছে এখন মাসী বাঁচিলে হয় এই ভাবিয়া হতভম্ব নীলু তখন সজোরে মাসীর হাত হইতে বঁটী কাড়িয়া লইল, টানা টানিতে বেচারার বুড়ো আঙ্গুলের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে জ্বালা উপেক্ষা করিয়া, টাকার শোকে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া নীলু মাসীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু নীলুর দু হাজার টাকা গেছে বৈত নয়, পুরুষের দশ দশা কত আসে কত যায়, বেটা ছেলে বেঁচে থাকলে অমন কত দুহাজার রোজগার করবে, মাসী এমন অপ্রস্তুত এ জীবনে কখন হন নি, তাঁর এ লজ্জা কিছুতেই যাবে না। মেয়ে মানুষ কোথায় কি পাবেন যে গিন্নী ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন, ধর্ম্মতঃ তাঁরই তো দেওয়া উচিত ; কিন্তু পোঁড়া বিধাতা মন দিয়াছেন ধন দিয়াছেন কৈ ; সুতরাং গৃহিণী কোন সান্ত্বনাই শোনেন না, কিছুতেই প্রবোধ মানেন না, তিনি পৃথিবীর সমস্ত মাগীকে গাল দিতে লাগিলেন, জড়োয়া গহনা গুলোকে অধঃপাতে দিলেন, জহুরির নিপাত করিলেন, মধুসূদনের মুখ পোড়াইলেন, ধর্ম্মের মুখে ঝাঁটা মারিলেন, চন্দ্র সূর্য্যকে চুলোয় পাঠাইলেন, টাকা রাখিয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলুর বাপকে গালি দিলেন, মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তার মাকে সর্ব্বনাশী বলিলেন এবং তাহার হাতে টাকা কেন দিয়াছিল বলিয়া নীলুকে অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিভূষিত করিলেন ; পরিশেষে, রাগে শোকে

অপমানে অন্ধ হইয়া আপনার গালে মুখে চড়াইতে গিয়া নীলের পিঠে চড়্ চড়াচড়্ চড়াইয়া দিলেন; মাসীমার চম্পকরম্ভাবিনিন্দিত অঙ্গুলী কলার চিহ্নে নীলমণির কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তরুণ অরুণের শোভা ধারণ করিল।

ভাগ্যক্রমে রাতারাতি ফাঁপিয়া যাওয়ার আহ্লাদে নীলু ঐ দিন প্রাতে, অবশ্য গহনা যাচাইতে যাইবার পূর্ব্বে, নিজের পয়সা দিয়া বাজার হইতে কয়েকটা মোচা চিংড়ী কিনিয়া আনে, রাত্রি ৯টার পর উহার দুইটা বড় বড় মুড়া চিবাইয়া তবে গৃহিণীর প্রতারিত হইবার শোক কতক শান্ত হয়।

যে স্ত্রীলোক গহনা বন্ধক দিয়া গিয়াছিল, সে কবে কখন কোন স্থান দিয়া আসিয়াছিল তাহা বাটীর অপর কেহ দেখে নাই; কর্ত্তা লেখা পড়া করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কোন স্ত্রীলোককে দেখেন নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকটীর কোন সন্ধান কস্মিন কালেও পাইবার সম্ভাবনা রহিল না।

কুলোকে কত কি কানাকানি করিত, বোনপোর টাকা গুলো গিন্নি একটা ফেরারি করে ফাঁকি দিলেন এই রকম নানান কথা বলিত, কিন্তু সে কেবল ভালখাগিরা ভাল লোকের পিছনে লেগে মরে বলে।

নীলুর স্ত্রী একরাত্রি স্বামীকে সোহাগের ভাবে পেয়ে বলেছিল, তুমিও যেমন বোকা মাসীমার কথায় বিশ্বাস করে ভুলে গেলে, ওঁকে আবার কেউ ঝুটো গহনা দিয়ে ঠকিয়ে যাবে! আর এত টাকার গহনা বাঁধা দিয়ে গেল অথচ আমারা এতগুলো লোক বাড়ীর ভিতর আছি কে মানুষটা তা কেউ একদিনও দেখলুম না; মাসীমার ঘরে অমন আরো গিল্টির গহনা জাওয়ান আছে আমি জানি। নীলু "চুপ চুপ ও কথা আর মুখে এনো না" বলিয়া তাড়াতাড়ি আপনার হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ চাপিয়া ধরিল, বৌ মনে মনে ভাবিল, ভাল

বেরসিক স্বামীর হাতে পড়িয়াছি, কথাটাও তলিয়ে বুঝিল না আর যদি ঠোঁট দুখানি চেপে ধরিল—তাও কিনা হাত দিয়ে। আমরা কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কথা কহিব, গৃহিণী সেই ঝুটো জড়োয়া গুলি বোনপো বৌকে ব্যবহার করিতে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বাড়ী থেকে যা পরে বেরুবে তাই লোকে সাঁচ্চা বলিবে।

(৪)

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দুহাজার টাকা গচ্ছিত রাখা সূত্রেই বোনপো-দম্পতি মাসীমার সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ করে। তার পর নীলু স্ত্রীর নারিকেল তৈল, নিজের জল খাবার নাম করিয়া ৩০৲ ত্রিশটী টাকা মাহিনার মধ্যে ২০৲ কুড়িটী টাকা মাসী মার হাতে লুকাইয়া দিত, এবং আঁবের সময় আঁবটা, ইলিস মাছের সময় ইলিশ মাছটা, শীতকালে নলেন গুড় খানা, এই রকম আজ এটা কাল সেটা নিজের পয়সায় কিনিয়া আনিয়া মাসীমার সংসারের সুসার করিত। এদিকে বন্ধ্যা বোনপোবৌটারও দুর্জ্জয় গতর ছিল, সংসারের অর্দ্ধেক কাজ সে আপন হাতে করিত, সে থাকাতে গৃহিণীকে আর রাঁধুনীর বেতন দিতে হইত না; বিশেষতঃ তিনি বাতাক্রান্ত স্থূল-শরীর লইয়া নিজে দেওয়ানখানাই বল আর আফীস ঘরই বল সেই খানেই প্রায় বসিয়া থাকিতেন, উপর নীচে করিয়া বড় নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন না; কে কি বললে, কে কি খেলে, কে কেমন চোখে চাইলে, কোন জিনিসটা পেয়ে কে মুখ খানা কেমনতর করলে, কে কার সঙ্গে ফিসির ফিসির করেছে, কে স্বামী ভাত খেতে বস্‌লে বাতাস করেছে, কে স্ত্রীর পানে চেয়ে হেঁসেছে ইত্যাদি রাজ্যের মঙ্গলা-মঙ্গল সমস্ত সংবাদ ঐ ধর্ম্মদূত বোনপো বৌটী গোপনে গৃহিণীর কাণে তুলিয়া দিত। মাসশ্বাশুড়ীর প্রতি বধূর হৃদয়ে ভক্তি যে উছলিয়া পড়িত এমন নয়, তবে বেচারা সমস্ত দিন জল ঘাঁটিয়া আগুণ তাতে

বসিয়া খাটিয়া মরিত, তার উপর গর্ভে একটাও হয় নি যে তাকে নিয়ে খানিক অন্যমনস্ক হয়, বাড়ীর ভিতর খোস গল্প কি খেলা ধুলারও বড় একটা চাল ছিল না, আর কেউ রামায়ণ মহাভারত খানা পড়তো না যে, দু'দণ্ড বসে শুনে, সুতরাং বৌ টীর আমোদের মধ্যে যা একটু লাগান ভাঙ্গান ছিল, এর কথা ওর কাছে ওর কথা এর কাছে বলিয়া প্রাণের গরমি টুকু কাটাইয়া রাখিত, প্রাণেশ্বর শয়নকালে বেশ ফুর ফুরে হালকা প্রাণটী পাইতেন। এই রায় সংসাররূপ নেপালে যদিও রাজমুকুট-খানি রায় মহাশয়ের মস্তকে ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্রকৃত জঙ্গ বাহাদুর ছিলেন, সুতরাং এরূপ গোয়েন্দায় তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বোনপো বৌটী বাড়ীর ভিতরের গোপন সংবাদাদি বহন করিয়া হোম ডিপার্টমেণ্টের ডিটেক্টীভের কার্য্য করিত, আর দুই চারিটী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা আত্মীয়া প্রতিপালিতা হইতেন, তাঁহারা ফরেন ডিপার্ট-মেণ্টের ডিটেক্টীভ স্বরূপ প্রতিবাসী ও কুটুম্বাদির বাটীর কুচ্ছ কথা গুছাইয়া আনিতেন।

(৫)

পরের গহনার কথা উত্থাপন করায় তিনি ধুতুল কুটিতে কুটিতে বোনপো বৌকে যে ধমকাইয়া উঠিযাছিলেন, সে তাহার মুখ বন্ধ করাইবার জন্য নয়, বৌটীও তাহা বুঝিত, সে জানিত যে, ঐ সম্পর্কীয় কথার সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য উহা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর স্বরচিত একটী প্যাটেণ্ট ইসারা মাত্র। পাড়ায় এক ঘর কায়স্থ পরিবার আসিয়া কয়েক বৎসরাবধি বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে; তাহাদের বাটীর কর্ত্রী মধ্যে মধ্যে এক আধ খানি গহনা গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; নীলুর স্ত্রী মাসশ্বাশুড়ীর সম্মুখে তাহারই কথা তুলিয়াছিল এবং ধমকের উৎসাহ পাইয়া হাসিয়া বলিল "তা বাপু যে

বৌকে গাঁথতে দিয়েছে সে দেখিয়ে নিয়ে গেল তাই আমি বল্লুম আমার দোষ কি?" গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাবিজ কি ডায়মন কাটা? বৌ একবার নীচের ঠোঁট খানি উল্টাইল, আমি সেখানে থাকিলে তাঁহার মুখের সম্মুখে একখানি আয়না ধরিতাম, যখনি কেহ ঠোঁট উল্টায়, নাসিকা কুঞ্চিত বা অপর কোন রূপ মুখ বিকৃত করে, তখনই আমার ইচ্ছা হয় যে তাহার মুখের উপর এক[illegible]ন আরসি ধরিয়া দেখাই যে, লোকে পরকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া নিজের ভগবান-দত্ত সুন্দর মুখগুলি কি কদর্য্যশ্রেণীতে অবনত করে, যাহা হউক সে স্থানে অনুপস্থিতি বিধায় যখন আয়না ধরা হয় নাই, তখন বধূ ঠাকুরাণী স্বচ্ছন্দে নিজের বেগুনিয়া ঠোঁটখানি উল্টাইয়া, তিলক সেবার উপযোগী নাসিকাটী সিটকাইয়া, সুচিত্র ভুরু দুটী কুঞ্চিত করিয়া, সুকোমল হস্ত দু'খানি বক্র করিয়া আনুনাসিক স্বরে বলিল; "পোড়া দশা আর কি ডায়মন কাটা না হাতী কাটা, ভরি পাঁচ ছয়ের সাদা মাটা জুটেছে—এই ঢের।" গৃহিণীর সনথ বৃহদ্দন্তবিকসিত বদনখানি বিদ্যুৎ বেগে বাতাসে একটা পাক খাইয়া লইয়া বলিল "ওমা সাদা তাবিজ তারি এত জারি।"

বিমল মাসী বসুমতীর উপর হাতের চাটু দুখানির ভর দিয়া বেলা দুইটা হইতে একটুখানি পুরাতন ঘৃতের উমেদারি করিতে বসিয়া বসিয়া ঠোঁট দুখানি বেটুয়া মুখের মত কুঞ্চিত করিয়া সজোরে পায়রা ডাকিতে ছিলেন, এক্ষণে একবার হামাগুড়ি দিয়া, ছাদের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া অর্দ্ধ প্রহরের সঞ্চিত ঘন মুখামৃত কতকটা নিক্ষেপ করিলেন; পরে পূর্ব্ববৎ আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন; "তা মা জারি হবে ন কেন, এখন যে আধানি লোকেরই গুমরের দিন পড়েছে, কোলকেতায় এসে যত বেটী কাটকুড়ুনীর গায়ে সোণা উঠ্‌লো তা তারা অহঙ্কার রাখে কোথা বল।"

গিন্নি—মিথ্যে নয়, সোনাটা যেন ফেলনা হয়ে পড়েছে ; সে কালে শুনেছি বড় বড় জমিদারের ঘরে রূপোর পৈঁছে রূপে খাড়ু হাতে দিত।

বোন-পো-বৌ—সব বলে শুনেছি, মিন্সে নাকি তুহাতে মুটো মুটো উপরি রোজগার করে, তা তার স্ত্রী সোণা পরবে না কে বল।

গিন্নি—উপরের দিকে চোখ পড়েছে তো তাহলেই কোন্ দি কোম্পানীতে হাতে দড়ী দিয়ে সোণা পরিয়ে দে দেখ না।

বৌ—না মাসীমা, মিন্সের নাকি সে রকম চরিত্রি নয়, ভারি ধর্ম্মিষ্ঠ চুরি করে উপরি রোজগার করে না, মহাজনেরা ওকে হাতে তুলে দেয়, সবার মাল পত্র নাকি যত্ন করে তুলে নাবিয়ে দেয়, কাকেও হাঁটাহাঁটি করায় না, মুখও নাকি খুব মিষ্টি, তাই তারা খুসি হয়ে ওকে বেশ তুপয়সা দে, এ পাওনা নাকি সাহেবের জানা।

গিন্নি—মেজবৌ, চুপ করে থাক বলছি, গেরস্থর বৌ অত বাচাল কেন না? মহাজনেরা তোর বাপ খুড়ো কিনা তাই রাজুদের পায়ে ধরে মুটো মুটো টাকা দিয়ে আসে।

বৌ—তা বাপু সব বলে সব শুনতে পাই আমি তো আর দেখতে যাইনি।

গিন্নি—যেতে পারিস্‌নি পাকড়ি বেঁধে আপিসে দেখতে? বলে কে, নীলে বুঝি? অমন পোড়ার বুদ্ধি না হলে অমন দশা হবে কেন, একটা মেয়ে মানুষে তা না হলে গিন্টির গয়না দিয়ে তু হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে যায়। (সেই গয়না সম্বন্ধীয় প্রতারণার সমস্ত অপরাধই ইদানীং গৃহিণী নীলুর

পোড়া অদৃষ্ট ও বুদ্ধির উপর চাপাইতেন) আমার কথা দেখে নিও বেমল মাসী এই বলে রাখলুম—রাজুদের হাতে এই দড়ী পড়ে, পড়ে,—ওর বৌয়ের শতেক খোয়ার হয়, হয়, হয়।

উঁহোঃ তা—তা—উঁহোঁঃ উঁহোঁঃ উঁহোঁ—ভগ্—উঁহোঁঃ—উঁহোঁঃ—উঁহোঁঃ—ভাগবা—উহোঁঃ উঁহোঁঃ হোঁঃহোঁঃ হোঁঃ”—বিমল মাসীর বুকের ভিতরে শত কবুতর একেবারে ডাকিয়া উঠিল, মুখখানি পুঁই মিটুলীর রং ধারণ করিল, জলভারাক্রান্ত চক্ষুর গোলক তুইটী খসিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, গৃহিণীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মাসী আর রাজুদের সর্ব্বনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইলেন না। গৃহিণীর মজলিসে পাড়ার এই নূতন কায়েতদের কথা লইয়া প্রায়ই এই আলোচনা হইত। বধূরাও আপনাদিগকে কর্কশ আলোচনার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কেহ কোনরূপ একটা ছুতা করিয়া ঐ দে পরিবারের সম্বন্ধে একটা কথা তুলিয়া দিত ; একবার একটী সূত্র ধরাইয়া দিতে পারিলে সে দিনকার মত নিশ্চিন্ত ; অন্ত সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া গৃহিণীর রসনাযন্ত্র গজ্ গজ্ বক্ বক্ শব্দে সেদিন এক দে পরিবারকে পেষণ করিতে থাকিবে। কাশী আসিয়া মাসীর ভগবদভক্তি স্রোতে বাধা দিল বটে কিন্তু গৃহিণীর কর্ণে ভগবানের নাম অর্দ্ধ প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার প্রেম একেবারে উথলিয়া উঠিল, “ভগবান মরেছে” এইরূপ মঙ্গলোচ্চারণ করিয়া সেই বৈকুণ্ঠবাসী চোখখেগোর যদি বিচার বোধ থাকে তাহা হইলে ঐ দে পরিবারের অহঙ্কার চূর্ণ, শতেক খোয়ার, সর্ব্বনাশ তদ্বির সম্বন্ধে কত-দূর তৎপর হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। দে দিগের উপর গৃহিণীর বিরক্তির অনেক কারণ ছিল, উহাদিগের প্রধান অপরাধ অহঙ্কার। প্রথমতঃ রাজু দে পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই গৃহিণীর অমন ঠাণ্ডা একতালা বাড়ীটী বাইশ টাকা ভাড়ায় না লইয়া মাসিক আঠার টাকা চুক্তিতে উপরে তুটী কুঠুরী

ওয়ালা একটী বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, একি কম অহঙ্কার। তুই কি এমন মেজিষ্টরী করিস, যে দোতলার উপর না হলে শোয়া হয় না; আর তুই বাড়ী ভাড়া নিবি এই প্রত্যাশায় কি রায় গিন্নি হাত ধুয়ে বসেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ গৃহিণী একদিন রাজুর পরিবারকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্য গয়লানী দিয়া বলিয়া পাঠান, তা উত্তর ক'রে পাঠালে কিনা, বাবুকে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন তো যাবো, আ'মর, বাবুকে'রে—সরকারী চাকরী করে স্বামী তিনি বুঝি আবার বাবু, কলকেতার মাটীতে পা দিলে সবাই বাবু হয় গিন্নি ডেকেছেন আসবি তার আর বাবুকে জিজ্ঞাসা কি। তার পরদিন খবর এল আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা আজ আর যাব না কাল যাব—দেখ একবার অহঙ্কারটা, ভাড়া বাড়ীতে থাকিস তোর আবার দিন ক্ষণ কিরে। তারপর অহঙ্কারের উপর অহঙ্কার, শুক্রবার দিন দুপুর বেলা মাগী কি না এক পাল্কী চড়ে হুম্ হুম্ করে এসে উপস্থিত—পাড়ার ভিতর দুটো বই গলি পার হ'তে হয় না, আর সদর রাস্তার উপর কত টুকুখানিই বা আসতে হয়, এ কিনা পায় হেঁটে আসতে পাল্লেন না, পাল্কী যেন কেউ কখন দেখেনি, তাই পাল্কী দেখাতে এলেন।

পাড়াগেঁয়ে মানুষ কখন পাল্কী চড়েনি এই মনে করে গৃহিণী তাও ক্ষমা ঘৃণা করেছিলেন, ভেবেছিলেন চড়ুক চড়ুক কতদিনই বা ভোগ হবে দুদিন চ'ড়ে নিক্; আর শুধু কি তাই, ঠাট দেখে গিন্নি রাগ করবেন কি হাসিই চেপে রাখতে পাল্লেম না। মাসীর বয়স যেমন করে হোক ছগণ্ডার উপর হয়েছে, পাড়ার ভিতর একখানা যা'তা' পরে এলেই হতো, তানা তিন আঙুল চওড়া মতি পেড়ে শাড়ী পাট ভেঙে পরে আসা হয়েছে; আবার নীচে হাতে বালা, চুড়ী, ওপর হাতে তাগা, গলায় চিক, কোমরে সোনার গোট, কানে মাকড়ি; আ'মর কার বাড়ী তুই গয়না দেখাতে এসেছিস্; আবার লজ্জার কথা বলবো কি ফিরিঙ্গি খোঁপা করে চুল বাঁধা হয়েছিল। এসেই গিন্নিকে ঢিপ করে এক প্রণাম করা হলো, এটি জানান হলো, যে তিনি যেন

ওর চেয়ে বয়সে বড়। বাড়ীতে লোকটা এসেছে তাই গিন্নি আদর করে জিজ্ঞেসা করেছিলেন যে দিদি তোমার নামটী কি ভাই, তা বলা হ'ল "ভবসুন্দরী"; শুধু ভব বললে কেউ যেন বুঝতে পারতো না; আর অহঙ্কারের কথা কত বলব বল, গোটছড়াটী দেখে গিন্নির মনে ধরেছিল, তাই সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা আলাদা তুলে রেখে ছিলেন, তা মাগী কি বজ্জাত একদিনও সে ছড়া বাঁধা দিতে এলো না। ও যেমন মাগী তেমনি মিন্সে, মিন্সে বাজার করে দরজা দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায়, একদিন একটা ভেটকি মাছ, একটা ইলিস, একদিন একটা গর্ভমোচা, একদিন ডিমলো কাঁকড়া, একদিন কুড়ী খানেক লিচু, এই রকম কতদিন কত কি নিয়ে নিয়ে গেছে, গৃহিণী বৈঠকখানার খড়খড়ীর ভিতর দিয়ে এসব দেখেছেন। হায় হায় এত অহঙ্কার করেও মানুষের এতদিন স্বচ্ছলে চলছে, এতদিন এসে বাড়ি ভাড়া করে আছে, এর মধ্যে একদিনও জলের কলসী আগুন রাখাতো হলোনা, এতে যে কলিতে ধর্ম্ম আছে, মুখ পোড়া মধুসূধনের বিচার আছে, তা গৃহিণী কেমন করে বিশ্বাস করেন বল দেখি। তিনি নিজেও তাঁহার স্বামী পুত্রাদি ভিন্ন অপর লোক যে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে, পিতৃপুণ্যে ও নিজঅমানুষিক ধৈর্য্য গুণে গৃহিণী ইহাও কোন মতে সহ্য করে আছেন, কিন্তু তাহার উপর উহার ায়, পরে, কোটা বাড়ীতে বাস করে, গহনা গড়ায়, ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়, বাড়ীতে প্রতিমাটা আসটা আনে, চর্ম্ম চক্ষে এসব গৃহিণী কেমন করে দেখেন বল; গৃহিণীর সাংসারিক সুখের মধ্যে এই গুলি ণ্টক, লক্ষ্মীস্বরূপিণী অবলা এই সব দেখিয়া শুনিয়া দিবারাত্রি হা তাশ করেন, থাকিয়া থাকিয়া ওহো হো হোহো হো মধুসূদন তদিনে এ যন্ত্রণা যাবে, কবে নিস্তার পাব বলিয়া চিৎকার করিয়া ঠেন, এবং ত্রিসন্ধ্যা ঠাকুর ঘরের চৌকাটে মাথা কুটিয়া কুটিয়া লাটের মধ্যস্থলে একটী আব প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন ড়ার বারওয়ারী পূজা উপলক্ষে যাত্রা হইতেছিল, পল্লীর প্রায় সমস্ত

লোক সেইখানে সমবেত হইয়া যাত্রা শুনিতেছিল, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই আমোদ করিতেছিল, অনেক স্ত্রীলোকও আটচালার অন্তরালে বা বারওয়ারী তলার চতুঃস্পার্শস্থ ছাদ হইতে যাত্রা শুনিতেছিলেন। আজকাল দিনেরবেলাই যাত্রা হয়, রায় মহাশয় আফিষে গিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যমযাতনা উপস্থিত হইল। তিনি গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি ঢোল মন্দিরার আওয়াজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, গানের সুর হাসির হররা, তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল, গৃহিণীর প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অবশেষে তিনি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যার মানসে গলায় দড়ী দিবার উদ্যোগ করিলেন; এমন সময় তাঁহার পিতৃপুণ্যে পার্শ্বের গলির ভিতর হইতে অকস্মাৎ একেবারে বহুকণ্ঠে হৃদয়বিদারক রোদন ধ্বনি উঠিল, গৃহিণীর হস্ত হইতে রজ্জু পড়িয়া গেল, তাঁহার কৃষ্ণ দন্তপাতি বিস্ফারিত হইল, বুঝিলেন যে মস্করাদের যে বৌটী সূতিকা পীড়ায় ভুগিতেছিল, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গেল; যেন যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়া তিনি সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন; ঢোল, মন্দিরা, তানপুরা, বেহালা হাসির হররা, তুড়ি, বাহবা, বেশ, ছাপাইয়া সর্ব্বনাশঘোষণাকারী আর্ত্তনাদী রোদনরোল সেই ক্ষুদ্র গৃহ খানি ছাইয়া ফেলিল। প্রফুল্ল মুখী রায়গৃহিণী তখন লোহার সিন্দুক খুলিয়া একটী আদলা পয়সা বাহির করিলেন এবং "বিধাতা তুমিই সত্য" এই বলিয়া আদলাটি নিজের কপাল স্পর্শ করাইয়া হরির লুটের বাতাসা কিনিবার জন্য তাকের উপর উঠাইয়া রাখিলেন।

ধান্যের চাষ।

এদেশে তুলার ও পাটের চাষের উন্নতি হয় হউক; ইক্ষু ও গোলালুর চাষের বিস্তৃতি হয় হউক; রিহা ও আগাভের আঁইশ্ বাহির করার সুব্যবস্থা হয় হউক; গো-চিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় হউক; হাড়ের গুঁড়া ও সোরা চাষাদের দ্বারা ব্যবহার করাইবার প্রয়াস পাওয়া হয় হউক; কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে গেলেই,—সাধারণ কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই, ধান-চাষের উন্নতি করা আবশ্যক।

ধান-চাষের কি কি উন্নতি সহজে হইতে পারে, ইহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। ধান কাটা সমাধা করিবার পরেই কাল বিলম্ব না করিয়া 'যো' পাইলেই জমি প্রস্তুত করা আবশ্যক। পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রায়ই দুই একবার বৃষ্টিপাত হইবার পরে জমি কর্ষণোপযোগী হইয়া থাকে। এই সময়ে জমি কর্ষণ না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে জমির নানা ক্ষতি হইয়া থাকে, অথচ পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ধানের জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা এদেশের কৃষকদিগের সাধারণ নিয়ম। উহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারম্ভ হইলে জমি কর্ষণ করিয়া বীজ রোপণ করিয়া থাকে। এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া চাষ করিলে জমির মধ্যে যে যে সকল পোকার বাসা ও উদ্ভিদ্-রোগের বীজ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে, ঐ গুলি নষ্ট হইতে পারে না; জমির আগাছা গুলিও ভাল হইয়া নষ্ট হইতে পায় না, এবং জমি বায়ু হইতে উর্ব্বরতা সংগ্রহ করিবার অবকাশ পায় না। পৌষ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে, জমিতে বৃষ্টি পড়িয়া, অথবা জমির অতিরিক্ত জল শুকাইয়া,

জমি কর্ষণোপযোগী হইলেই উহা কর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় হইতে কর্ষিত ভূমি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্লথ অবস্থায় থাকিলে অনেক দিবস ধরিয়া বায়ুর মধ্যে নিহিত যে যে উর্ব্বরতাদায়ক পদার্থ থাকে, ঐ সকল পদার্থ মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইবার অবসর পাইয়া থাকে। অম্লজান ও দ্ব্যম্পঙ্গারক বায়ু মৃত্তিকার প্রত্যেক কণার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারিলে মৃত্তিকার মধ্যে নানা প্রকার সুন্দর রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং মৃত্তিকা উর্ব্বরতা লাভ করে। কিন্তু মৃত্তিকা ঈষৎ সিক্ত ও সম্পূর্ণ শ্লথ অবস্থায় থাকিলে আর একটী কার্য্য মৃত্তিকার মধ্যে সাধিত হওয়ায় মৃত্তিকা আরও অধিক উর্ব্বর হইয়া থাকে। এই কার্য্যের নাম যাবক্ষারিক কার্য্য বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার মধ্যে যাবক্ষারিক কার্য্য কয়েক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সাধিত হয়। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি ক্ষুদ্রতম জীবিত উদ্ভিদণু। ইহারা বায়ু, চূণ ও জৈবিক পদার্থের সংস্রবে সিক্ত ভূমিতে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহাদের একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহারা বায়ুর যবক্ষারজাণ গ্রহণ করিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে এল্‌বুমিনয়েড্ পদার্থ গঠিত করিতে পারে। এলবুমিনয়েড পদার্থ পিচ্ছিল অণ্ডাভ্যন্তরীণ পদার্থসদৃশ তেজীয়ান পদার্থ। ইহা দ্বারা জমি সারবান্ হইয়া থাকে। জমির মধ্যে কিছু চূণের ভাগ সর্ব্বদাই থাকে। যেখানে চূণের ভাগ নিতান্ত কম থাকে, সেখানে ঘুটিং শামুক, বা কোন প্রকার চূণা পাথর, অথবা পুরাতন অর্থাৎ তেজ মরা চূণ ছিটান আবশ্যক। উর্ব্বর জমি ভিন্ন চূণ ব্যবহার করা ভাল নহে, কিন্তু ঘুটিং পাথর অথবা চূণা-পাথর ব্যবহারে ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ সকল জমিতেই যে পরিমাণ চূণের ভাগ ও জৈবিক পদার্থ থাকে, তাহাতে কেবল শীতকালে কর্ষণ মাত্র দ্বারা যাবক্ষারিক ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। অত্যধিক উত্তাপ দ্বারা যাবক্ষারিক ক্রিয়ার ক্ষতি হইয়া থাকে; একারণ পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাসের

প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যাবক্ষারিক ক্রিয়া যেরূপ সহজে নির্বাহিত হয়, অন্য ঋতুতে সেরূপ হয় না। এই হেতু এই কয়েক মাস জমি শ্লথ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়াতে বিশেষ উপকার আছে। চৈত্র—বৈশাখে রাত্রিকালে মৃত্তিকা শিশির দ্বারা সিক্ত হয় না বলিয়া এবং দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপে মৃত্তিকা অত্যধিক উত্তপ্ত হয় বলিয়া, যাবক্ষারিক ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ শৈত্য ও উষ্ণতা আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বর্ষার প্রকোপ থাকাতে যাবক্ষারিক ক্রিয়াজনিত যে সকল গলনশীল ও উদ্ভিদের আহারের উপযোগী পদার্থ উদ্ভূত হয়, ঐ সকল ধৌত হইয়া জমির বাহির হইয়া গিয়া অপচয় হওয়া সম্ভব। এ কারণ এই কয়েক মাসে জমি শ্লথ ও কর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। এই সময়ে জমিতে ফসল থাকিলে ঐ সকল পদার্থ ধৌত হইয়া জমি হইতে বহির্গত না হইয়া গিয়া ফসলকে পরিপুষ্ট করে। পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে যদি অত্যধিক বৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও জমির মধ্যে উদ্ভূত গলনশীল সারবান্ পদার্থ সকল ধৌত হইয়া গিয়া জমির ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু এই সময়ের ভিতর অত্যধিক বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে যেরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাতে জমির শৈত্য রক্ষিত হইয়া যাবক্ষারিক ক্রিয়ার সহায়তা করে। এ কারণ পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জমিতে লাঙ্গল, মৈ দিতে পারিলে জমির প্রায়ই প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের চাষারা এ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞও নহে, তবে তাহাদের ধারণা, শীতকালে জমিতে চাষ দিতে পারিলে জমিকে শীত খাওয়ান হয়, এবং শীত খাওয়াইলে জমির উপকার দর্শে। কিন্তু এই ধারণা দ্বারা চালিত হইয়া শতকরা পাঁচ জন কৃষকও শীতকাল হইতে ধানের জমি প্রস্তুত করিয়া রাখার প্রথা অনুসরণ করে না। এই প্রথা সকল কৃষকেরই অনুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। যাবক্ষারিক ক্রিয়া যেমন মৃত্তিকার মধ্যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ এই ক্রিয়ার অনুরূপ আর একটী ক্রিয়া কলাই-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কলাই, ছোলা, চীনাবাদাম, নীল, অড়হর, শণ, ধইঞ্চা, বর্ব্বটী, প্রভৃতি কলাই-জাতীয় গাছ তরুণ অবস্থায় শিকড় শুদ্ধ উঠাইলে দেখা যায় উহাদের শিকড়ে স্বল্প-বিস্তর স্ফোটক সদৃশ পদার্থ জন্মিয়া আছে; এই পদার্থকে মূল-গণ্ড বলা যাইতে পারে। এই স্ফোটক বা গণ্ড কোন বিশেষ জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা জন্মিয়া থাকে। যেমন মানুষের গাত্রে মশক দংশন দ্বারা স্ফোটক জন্মে, সেইরূপ কলাই জাতীয় গাছের শিকড়ে ব্যাক্টিরিয়া আশ্রয় লইলে শিকড় স্থানে স্থানে স্ফীত হয়। বস্তুতঃ মূল-গণ্ড-গুলি বিশেষ বিশেষ জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার উপনিবেশ। একটীমাত্র গণ্ড শিকড় হইতে খসাইয়া লইয়া, এক হাজার ব্যাস বর্দ্ধিত করিতে পারে এরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ গণ্ডের মধ্যস্থ পিচ্ছিল পদার্থ পরীক্ষা করিলে সহস্র সহস্র খর্ব্বাকার, সচল সূত্রবৎ ব্যাক্টিরিয়া দেখা যাইবে। এই ব্যাক্টিরিয়া গুলিরও বায়ু হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া জটিল যাবক্ষারিক পদার্থ, অর্থাৎ প্রোটোপ্লাস্মে, পরিণত করিবার ক্ষমতা আছে।

যে পিচ্ছিল পদার্থ গণ্ডগুলি পেষণ দ্বারা অনুভূত হয় উহা প্রোটোপ্লাস্ম্। ব্যাক্টিরিয়াগুলিও প্রোটোপ্লাস্ম্ মাত্র। যে গাছের মূলে যত অধিক পরিমাণে-মূল-গণ্ড থাকে, সেই গাছ তত অধিক পরিমাণে সারবান্ পদার্থ মৃত্তিকায় সঞ্চয় করিয়া থাকে অর্থাৎ বায়ু হইতে সংগ্রহ করিয়া রূপান্তরিত করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিতাবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত করিয়া লয়। ছোলা বা কলাই গাছের মূলে যে পরিমাণ মূল-গণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ মূল-গণ্ড চীনাবাদাম, শণ, অড়হর, ধইঞ্চা ইত্যাদি কয়েক প্রকার

গাছের শিকড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। একারণ এই সকল গাছ জন্মানতে মৃত্তিকা অধিক সারবান্ হয়। শণ, অড়হর ও ধইঞ্চা জন্মানর দ্বারা মৃত্তিকা আরও অধিক সারবান্ হইবার একটী বিশেষ কারণ আছে। এগুলি যেমন অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদের শিকড়ও গভীরতর হয়। গভীর শিকড় দিয়া মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে ফস্ফেট্, পটাশ্, প্রভৃতি সারবান্ পদার্থ ডাল-পাতায় সঞ্চিত করিয়া ক্রমশঃ পত্রস্খলন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার উপর স্তর অধিক সারবান্ করিয়া তুলে। অর্থাৎ এই সকল গভীর শিকড়যুক্ত কলাই জাতীয় উদ্ভিদ, বায়ু হইতে যাবক্ষারিক পদার্থের সংগ্রহ দ্বারা এবং মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে ফস্ফেট্, পটাশ্ প্রভৃতি সারবান পদার্থ টানিয়া লইয়া মৃত্তিকার উপরিভাগে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া, মৃত্তিকাকে সমধিক ও সম্যক্‌ভাবে উর্ব্বর করিয়া তুলে। শণ ধইঞ্চা ও অড়হর এই তিনটী গাছের মধ্যে শণ ও ধইঞ্চা সত্বর বর্দ্ধিত হইয়া যায় বলিয়া এই দুইটী গাছ সারপ্রয়োগের জন্য অধিক উপযোগী। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে সুবিধামত জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিলে চৈত্র মাসে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া গেলেই জমিতে 'যো' বুঝিয়া ধইঞ্চা বা শণের বীজ ঘন করিয়া ছিটাইয়া লাঙ্গল মৈ দেওয়া চলিতে পারে। তিন মাসের মধ্যে শণ বা ধইঞ্চা গাছগুলি ৪।৫ ফুট উচ্চ হইয়া যাইবে। পরে এই গুলির উপর গরু চরাইয়া দিয়া অথবা কাটিয়া এ গুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া লইয়া পুনঃপুনঃ লাঙ্গল-মৈ দিয়া মৃত্তিকা-সাৎ করিয়া লইতে পারিলে মৃত্তিকা বিশেষ সারবান্ হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে ধান্য রোপণ করিতে পারিলে ধান্যের ফসল অনেক অধিক হইবে। ধান-চাষের সংশ্রবে এইরূপ উদ্ভিদ্

সারের ব্যবহার কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কৃষকগণ হাড়ের গুঁড়া, সোরা, খোল প্রভৃতি মূল্যবান সার ক্রয় করিয়া যে ধানের চাষে ব্যবহার করিবে এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু ধান রোপণের পাঁচ মাস পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া তিনমাস পূর্ব্বে ধইঞ্চা বা শণ লাগাইয়া, এক মাস পূর্ব্বে ঐ ধইঞ্চা বা শণ গাছ ভূমিসাৎ করিয়া লাঙ্গল, মৈ দিয়া পুনরায় জমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া, পরে ধান রোপণ করিতে কৃষকগণের অপারক হওয়ার কোন কারণ নাই।

৩। বঙ্গদেশের কৃষকগণ প্রায়ই এক এক স্থানে ৪।৫টী করিয়া ধানের চারা গুছি বাঁধিয়া রোপণ করিয়া থাকে। এক এক স্থানে যদি ৪।৫টী বেগুণের বা কার্পাসের, বা লঙ্কার চারা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে একটী গাছও ভাল জন্মে না, সকলগুলি একত্রে জন্মিয়া সকলগুলিই ক্ষীণ হইয়া পড়ে, একটী হইতেও ফল ভাল হয় না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ধান্য সম্বন্ধে যে কিছু পৃথক্ প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এরূপ সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে এক একটী ধানের চারা এক এক স্থানে রোপণ করিলে যে পরিমাণ ফসল জন্মে, দুইটী করিয়া চারা রোপণ করিবার দ্বারা তদপেক্ষা কিছু অধিক ফসল জন্মে না, এবং চারি পাঁচটী করিয়া চারা এক এক স্থানে লাগাইলে ফসল বাস্তবিক কম হইয়া থাকে। এক এক স্থানে এক একটী করিয়া ধানের চারা রোপণ করিবার প্রথা কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত করা যাইতে পারে।

৪। এদেশে যেরূপ অন্তরে অন্তরে ধান্য রোপণ করিবার প্রথা আছে, তদপেক্ষা অধিক অন্তরে অন্তরে রোপণ করিলে ফল ভাল হয়। এক ফুট অন্তর একটী করিয়া চারা লাগান উচিত। ছয় বা নয় ইঞ্চি অন্তর লাগাইলে গাছে ভাল করিয়া ঝাড় বাঁধে না। বিলাতে হালেট্ সাহেব নামে এক জন প্রসিদ্ধ কৃষক গোধুম প্রভৃতির গাছ অধিক

অন্তরে অন্তরে জন্মাইয়া "পেডিগ্রি" বীজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপে গাছ লাগাইলে শীষে অধিক পরিমাণ দানা জন্মে এবং দানাগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্ট হয়, এবং এইরূপ দানা ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজের জন্য ব্যবহারে সুপুষ্ট ও অধিক পরিমাণ দানা জন্মিবার প্রবণতা হালেট্ সাহেব বীজে জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হয়েন। এদেশের কৃষকগণ নিতান্ত ঘন করিয়া গাছ লাগাইয়া অধিক পরিমাণ বীজ ব্যবহার করিয়া, নিজেদের ক্ষতিই করিয়া থাকে। ইক্ষু, পাট, ইত্যাদি অন্যান্য ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ ঘন করিয়া ফসল জন্মাবার কু-প্রথা প্রচলিত আছে।

৫। বর্দ্ধমান পরীক্ষা ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে, হাড়ের গুঁড়া ও সোরা ধান্যের পক্ষে অতি উত্তম সার। এই দুইটী সারের প্রচলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেবল হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার দ্বারা বিশেষ উপকার লক্ষিত হয় না, কেননা চূর্ণাবস্থাতেও অস্থি দ্রবীভূত হইয়া অতি সত্বর উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয় না। হাড়ের গুঁড়া জমিতে ব্যবহার করিলে অতি সামান্য উপকার অনেক কাল ধরিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমিতে সোরার কার্য্য ঠিক্ বিপরীত রূপে হইয়া থাকে। এই সার সহজেই গলিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া যায়। বস্তুতঃ অধিক বৃষ্টি হইলে এই সার ধৌত হইয়াও যায় এবং ইহা মৃত্তিকাকে অধিক গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ভবিষ্যতে মৃত্তিকার কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া ও সোরা একই ফসলে সাররূপে ব্যবহার করিলে দুইটী সারেরই উপকারিতার বৃদ্ধি হয়, হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষাকৃত অধিক গলনশীল অবস্থায় পরিণত হওয়ায় ইহা হইতে আশু উপকার লক্ষিত হয় এবং সোরা দ্বারা জমির যে ক্ষতি হয়, তাহা হাড়ের গুঁড়ার দ্বারা পূরণ হইয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি এক মণ, জমি প্রস্তুতের সময় ছিটাইয়া দিয়া

লাঙ্গল-মৈ করিতে হয়। বীজ রোপণের পরে গাছগুলি যখন সবল হইয়া জাগিয়া উঠে তখন বিঘা প্রতি দশসের সোরা জলে গুলিয়া বালির গুঁড়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়। বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে যত প্রকার সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে হাড়ের গুঁড়া ও সোরা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে; বিঘা প্রতি সার প্রয়োগের ব্যয় ৪৲ টাকারও কম পড়িয়াছে, কিন্তু খরচ বাদ লাভ বিঘা প্রতি ৩৫৲ টাকা হইয়াছে। ৩২⁄ মণ গোময়-সার ব্যবহার দ্বারা বিঘা প্রতি ১৷৹ টাকা আন্দাজ খরচ পড়িয়াছে, কিন্তু খরচ বাদ লাভ ২৮৲ টাকা হইয়াছে। অতএব গোময় সারও ধানের পক্ষে মন্দ নহে।

৬। আশু-ধান্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটী বিশেষ ও অভিনব আবিষ্কার বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আশু-ধান্য বলিলেই যে দুষ্পাচ্য লোহিত বর্ণের ও কদর্য্য চাউল যুক্ত ধান্য বুঝায় এমত নহে। ৩।৪ মাসের মধ্যে পাকিয়া যায় এরূপ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ ধান্য স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। যে পরীক্ষাটী বর্ণনা করা যাইবে, উহা কদর্য্য আশু-ধান্য লইয়া সম্পাদিত না করিয়া কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু-ধান্য লইয়া সম্পাদিত করা বিধেয়। মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম আশু-ধান্য ও পেশোয়ারের সোয়াতি নামক লম্বাভাবের, কিছু বৃহদাকারের কিন্তু অতি সুগন্ধ একপ্রকার ধান্য, এই দুই জাতীয় ধান্য লইয়া শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই পরীক্ষাটী সম্পাদিত হইতেছে। অন্যান্য আশু-ধান্যের ন্যায় এই দুই জাতীয় ধান্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কাটা হয়। এই সময়ে জমি বিলক্ষণ সরস থাকে। ধানের গোড়াগুলি উৎখাত করিয়া না ফেলিলে উহা হইতে নবপত্র ও কতকগুলি শীষ পুনরায় বাহির হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে এই শীষগুলি পাকিয়া গেলে উহাদের সংগ্রহ করিয়া পর বৎসর বীজ রূপে ব্যবহার করিলে

ঐ বীজ হইতে যে গাছ বাহির হয় উহা অপেক্ষাকৃত অধিক ফল-প্রদ ও অনাবৃষ্টিসহ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ গুলির শিকড় অধিকতর গভীর হয় বলিয়া, উক্ত গুণ দুইটী এই গাছে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে যে গাছ হয়, উহা পাকিতে এক মাস বিলম্ব হয়, অর্থাৎ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শস্য কাটিবার উপযুক্ত না হইয়া আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাও কিছু উপকার দর্শে। আশু-ধান্যের শীষে স্বভাবতঃই কিছু অধিক "আগড়া" হইয়া থাকে। ইহার কারণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে প্রায়ই বর্ষার প্রকোপ অধিক থাকে এবং এই সময়েই আশু-ধান্যের ফুল হয়; ফুল-রেণু বর্ষার বেগে ধৌত হইয়া গেলে শীষে ভাল করিয়া দানা জন্মিতে পারে না,—অনেক শস্যশূন্য দানা জন্মিয়া যায়। অবশ্য কোন কোন বৎসরে আশ্বিন মাসে ৮।১০ দিবস ধরিয়া ক্রমাগত বর্ষা হওয়ায় ঐ সময়ে যে সকল ধান ফুলিয়া যায়, ঐ সকলের ক্ষতি করে; কিন্তু সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে বর্ষার প্রকোপ অধিক থাকে না, এবং এই মাসে আশু-ধান্যের ফুল হইলে আগ্ড়া কম হয়। দো-কাটের গাছ পাকিতে এক মাস অধিক সময় লাগে বলিয়া আশ্বিন মাসে এই গাছের ফুল হয় এবং এ কারণ ধান পাকিয়া গেলে আগ্ড়া নিতান্ত কম হয়। দোকাটের গাছ হইতে যে ফসল হইবে উহা বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকারে আশু-ধান্যের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া আমন ধান্যের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে বীজ লাগাইয়া বর্ষার প্রারম্ভে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ আশু-ধান্যও রোপণ করিয়া লাগাইলে যত ফল পাওয়া যায়, ছিটাইয়া বপন করিলে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু আমন ধান্যে এ সম্বন্ধে প্রভেদ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। দো-কাটের আশু-ধান্যও আমন ধান্যের ন্যায় অধিক ফলশালী ও অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ধরিয়া স্থান অধিকার করিয়া থাকে; একারণ ইহারও পাট ঠিক

আমন ধান্যের ন্যায় হওয়া উচিত। অথচ অনাবৃষ্টিসহতা গুণ সাধারণ আশু-ধান্য অথবা আমন ধান্য অপেক্ষা অধিক থাকাতে দো-কাটের বীজ আমন ধান্যের বীজ লাগাইবার এক মাস পূর্ব্বে লাগান যাইতে পারে; রোপণও আমন ধান্যের এক মাস পূর্ব্বে চলিতে পারে।

১৯০২ ও ১৯০৩ সালে শিবপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটী হইতে যে ফল লাভ করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্ন তালিকায় দেওয়া গেল :—

ধান্যের বর্ণনা।	উৎপন্ন।	
	১৯০২।	১৯০৩।
প্রথম কাটের বীজ (মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম আশু ধান্য) ...	একার প্রতি ১৮/ মণ	একার প্রতি ২০॥/ মণ
দ্বিতীয় কাটের বীজ (ঐ) ...	২২/ ,,	২৫৮/ ,,
প্রথম কাটের বীজ (পেশোয়ারি সোয়াতি ধান্য) ...	শুকাইয়া মরিয়া যায়।	১৯॥/ ,,
দ্বিতীয় কাটের বীজ (ঐ) ...	২০/ মণ	১৯॥৫/ ,,

পেশোয়ারি সোয়াতি ধান্য সম্বন্ধে ১৯০১ সালে দোকাটের বীজ হইতে অতি সামান্যই উপকার পাওয়া গিয়াছে; ইহার কারণ শিবপুরে নাম্‌লা বৃষ্টি অধিক হওয়াতে ১৯০৩ সালে দোকাটের বীজ হইতে যে ফসল হয় তাহাতে কিছু আগ্‌ড়া অধিক হয়। বস্তুতঃ খড়ের পরিমাণ দোকাটের বীজ হইতে অনেক অধিক হইয়াছিল। প্রথম কাটের

বীজ হইতে উৎপন্ন ফসল সোয়াতি ধান্য হইতে একার প্রতি ১৭৮৫ পাউণ্ড খড় জন্মে, ও দোকাটের বীজ হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয় উহা হইতে একার প্রতি ২০১১ পাউণ্ড খড় জন্মে। মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম ধান্যের প্রথম কাটের বীজ হইতে ১৭৭৬ পাউণ্ড ও দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে ২২১৪ পাউণ্ড খড় জন্মে। শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু ধান্যের দো-কাটের বীজ ব্যবহার দেশে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

জশনে নৌরোজী।

একটি উর্দ্দুগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মোগল সম্রাট আকবর সাহের নৌরোজ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লেখা হইল।

সহস্র হিজরীতে দেশ ও ধর্ম্মের অবস্থাপরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং আকবরের দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে একথা অর্থলিপ্সু পণ্ডিতগণ আকবরের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে আকবর আনন্দে এতদূর অধৈর্য্য হইয়াছিলেন যে নয়শত নব্বই হিজরীতেই সহস্র হিজরীর মুদ্রা প্রচলনপূর্ব্বক জশনে নৌরোজী অর্থাৎ নববর্ষোৎসব আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বৎসরেই তাহার উন্নতিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিল্লীর প্রাসাদস্থিত দাওয়ানেআমা ও দাওয়ানেখাসের চারিদিকে সুরঞ্জিত প্রস্তরনির্ম্মিত একশত চারিটি প্রকোষ্ঠ এই উৎসব উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইয়া আমীরগণের দক্ষতা প্রকাশ করার জন্য এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একজন আমীরের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইত। বাদশাহের খাস প্রকোষ্ঠ খাস খেদমৎগারগণ সাজাইত। ইহা ভিন্ন সভামণ্ডল অর্থাৎ দরবারগৃহ পৃথক ছিল। সাধারণতঃ সমস্ত প্রকোষ্ঠই

পর্চুগিজ বনাত, রুমী এবং কাবানী মখমল, বেনারসী জড়াও বস্ত্র, কাশ্মিরী শাল, ইউরোপ ও চীন দেশীয় পরদা, চিত্র, আয়না ইত্যাদি এবং তুর্ক স্থানও পারস্য দেশীয় গালিচার দ্বারা সাজান হইত। সেই সময়ের আমীর গণেরও নানাবিধ মনোহর শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহের আগ্রহ ছিল এবং কে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখাইয়া সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে এজন্য প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না।

আমীরগণকে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে কোন বিশেষ বিষয় প্রদর্শনের ভার দেওয়ার নিয়ম ছিল। খাঁ খাঁনা ও খাঁ আজম নানা দেশীয় বিবিধ প্রকার শিল্প দ্রব্য এবং সাফতেউল্লা ঘটিকা গ্লোব ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক যন্ত্র প্রদর্শন করিত। কিন্তু অধিকাংশ আমীরগণের প্রকোষ্ঠই ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্য দেশীয় যুদ্ধের অস্ত্রে সাজান হইত। তৎকালে ইউরোপিয়নেরাও তাহাদের দেশীয় নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক এবং অর্গান ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া ও নাট্যাভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত।

নববর্ষারম্ভ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত বাদশাহ প্রত্যেক আমীর কর্ত্তৃক তাহাদের প্রকোষ্ঠে নিমন্ত্রিত হইয়া সকলের সহিত বিনা আড়ম্বরে মিলিয়া মিশিয়া আপ্যায়িত করিতেন। আমীরগণ তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুসারে বাদশাহকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন। উৎসবের কয়েকদিন সর্ব্বত্র অবিরাম নাচ, গান, আমোদ প্রমোদের স্রোত বহিতে থাকিত।

উৎসবের নিয়ম।

উৎসবের পূর্ব্ব দিবস শুভলগ্নে একজন সধবা হিন্দু স্ত্রী দাল ভাঙ্গিয়া তাহা গঙ্গা জলে ভিজাইয়া পিষিয়া রাখিত। পরদিন উৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে বাদশাহ স্নান করিয়া সেই সময়ের যে নক্ষত্র সেই নক্ষত্রের বর্ণানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রাজপুতদের ন্যায় খিড়কীদার

পাগড়ী বাঁধিয়া মুকুট ধারণ করিতেন এবং কতক স্বজাতীয় ও কতক হিন্দুদের অলঙ্কার পরিতেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ উপযুক্ত সময় জানাইলে ব্রাহ্মণে বাদশাহের কপালে টীকা দিয়া হাতে মণিমাণ্িক্য খচিত কঙ্কণ পরাইয়া দিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বদিনের গঙ্গাজলে বাটা দালের বড়া ভাজা আরম্ভ হইত বাদশাহ সিংহাসনে পদার্পণ করা মাত্র চতুর্দ্দিকে নহবৎ বাজিয়া উঠিত। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি নানাবিধ ফল ও মনি মাণিক্য মোহর পূর্ণ মুক্তার ঝালর দেওয়া জড়াও থলিয়া সজ্জিত পাত্র হস্তে আমীরগণ দাড়াইয়া থাকিত। সভাস্থলে উক্ত মণি মাণিক্য গুলি এরূপ ছড়ান হইত বোধ হইত যেন শিলা বর্ষণ হইতেছে। রাজা, মহারাজা, প্রধান প্রধান ঠাকুর যাহারা কোথাও কখনও মস্তক নত করে নাই; ইরাণী তুরাণী সর্দ্দারগণ যাহারা বীর রুস্তম ও স্কন্দীয়ারকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে নাই তাহারাও আপাদমস্তক কবচে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। খাস সাহজাদাগণ ব্যতীত অন্য কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। প্রথমতঃ সাহজাদাগণ তৎপর ওমরাও প্রত্যেকের পদমর্য্যাদানুসারে বাদসাহকে নজর প্রদান পূর্ব্বক স্লামগাতে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত তিন স্থানে আদাব ও কুর্নীশ করতঃ যখন চতুর্থ অভিবাদন অর্থাৎ আদাবে জমানবুস (ভূমি চুম্বন) শেষ করে তখন নকীব "আদাব বজালাও, জাহাঁপনা বাদসাহ স্লামত, মহাবলী বাদশাহ স্লামত" বলিয়া উঠে। নকিবের বাক্য শেষ হইলে রাজকবি বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিনন্দন পাঠ করে, তাহার পর পারিতোষিক ও খিলাত বিতরণ হইয়া দরবার ভঙ্গ হয়।

মীনাবাজার—জনানা বাজার।

যে সমস্ত নানাদেশীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইত সেইগুলি দেখিয়া অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও যেন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এজন্য

দরবার শেষ হইলে সেই স্থানে মহিলাগণের আসিবার সুবিধার্থে অস্ত্র-ধারী স্ত্রীলোক প্রহরী এবং দোকানগুলিতে স্ত্রীলোক বিক্রেত্রী নিযুক্ত থাকিত। বেগমেরা আসিতেন, এবং ওমরাও ও ভদ্র পরিবারস্থ মহিলাগণ যাহার ইচ্ছা আসিয়া দেখিতে পারেন এরূপ আদেশ ছিল। ইহারই নাম খুশরোজ। বাদশাহ আপন বেগম, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি সহ আসিলে, আমীরদের স্ত্রী, কন্যাগণ আসিয়া সেলাম্ করিয়া তাহাদের ছোট ছোট শিশু সন্তানগণকে বাদশাহের নিকট পরিচয় করিয়া দিত। সেইখানে বাদশাহ অনেকের সম্বন্ধও স্থির করিতেন। ইহাতে আকবরের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আমীরদের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে মনো-মালিন্য ঘটিয়াছে ইহা আকবর জানিলে এইরূপ মনোমালিন্যে রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত ও শাসনবিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া বাদশাহ তাহাদের বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সকল সময় সুবিধা হইত না। এজন্য, উক্ত উৎসবে আমীরদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সকলে যখন উপস্থিত হইত, তখন পরস্পরবিরোধী কোন আমীরের পুত্র কি কন্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া বাদশাহ বলিতেন, আজ হইতে এ সন্তান আমার হইল, ইহার উপর আর কাহারও দাবী দাওয়া রহিল না। বেগম অপর আর একজনের সন্তানকে এইভাবে গ্রহণ করিতেন। বাদশাহ ও বেগম তাহাদের সন্তানসন্ততিকে গ্রহণ করাতে, তাহাদের পিতামাতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিত, জাঁহাপনা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্তান হুজুরের জন্যই প্রতিপালন করিয়াছি, আজ জাঁহাপনার চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তখন বাদশাহ ও বেগম, উভয়ে বিরোধী আমীরের পুত্র ও কন্যার মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া এরূপ জাঁকজমকের সহিত তাহাদের বিবাহ দিতেন যে, তাহাদের পিতামাতার দ্বারা তদ্রূপ হওয়া কখনই সম্ভবপর ছিল না। এইরূপে বাদশাহ দুইজন বিরোধী আমীরকে কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ

করিয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দিতেন। খুশরোজ-উৎসবে এভাবে যাতায়াতে জৈন খাঁ কুকার কন্যাকে সাহজাদা সেলীম দেখিয়া উক্ত কন্যার প্রতি সেলীমের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং বাদশাহ তাহার পুত্রের সহিত জৈন খাঁ কুকার কন্যার বিবাহ দেওয়াইয়া দেন।

সেলীম ও মেহের উন্নিসা।

একদা এইরূপ মীনাবাজারে বেগমেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতে-ছিলেন এমন সময় ঘটনাক্রমে অল্পবয়স্ক যুবক সেলীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সম্মুখে বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেলীমের নিতান্ত ইচ্ছা ফুল তোলে, কিন্তু দুহাতে দুটি কবুতর থাকাতে ফুল তুলিতে পারি-তেছে না। সেই সময় সেই স্থান দিয়া একজন বালিকা যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সেলীম বলিল, বোন, কতক্ষণের জন্য এ দুটি কবুতর ধর, আমি ফুল তুলিয়া আনিতেছি। ইহা বলিয়া সেই বালিকার হাতে কবুতর দুটি দিয়া সেলীম ফুল তুলিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বালিকার হাতে কেবল একটিমাত্র কবুতর রহিয়াছে আর একটি নাই। ইহা দেখিয়া সেলীম জিজ্ঞাসা করিল, আর একটি কবুতর কি হইল। বালিকা উত্তর করিল, উড়িয়া গিয়াছে। সেলীম আবার প্রশ্ন করিল, কিরূপে? বালিকা হাত বাড়াইয়া দ্বিতীয় কবুতরটিও ছাড়িয়া দিয়া বলিল, এইরূপে। সেলীম অবাক হইয়া রহিল, জানিত না, এ বালিকাটি কে এবং কাহার কন্যা। অতএব পরিচয় জানার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহার নাম ও তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিল যে, বালিকার নাম মেহের উন্নিসা, মিরজা ঘিয়াসের কন্যা। পরিচয় পাইয়া সেলীম বলিল অন্যান্য আমীরদের কন্যা আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করে, তুমি আইস না কেন? উত্তরে বালিকা বলিল, আমার মা আইসেন বটে কিন্তু আমাকে সঙ্গে আনেন না, কারণ আমাদের

পরিবারস্থ বালিকারা অন্যত্র যাতায়াত করে না, আজ কেবল অনেক কাকুতি মিনতি করাতে মা আমাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। সেলীম উক্ত বালিকাকে সময় সময় তাহাদের সেখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে পর বালিকা সেলাম করিয়া বিদায় হইল। কিন্তু সেই দিন হইতেই উভয়ের অন্তঃকরণ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

আর একদিন মিরজা ঘীয়াসের স্ত্রী বেগমকে সেলাম করিবার জন্য শাহী মহলে আসিবার সময় কন্যার কাকুতি-মিনতিতে কন্যাকে সঙ্গে আনে। বেগম দেখিলেন যদিও অল্পবয়স্কা বালিকা কিন্তু আদব কায়দায় পরিপক্ক ও চতুরা। বালিকার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা বেগমের ভাল বোধ হওয়াতে কন্যাটিকে সর্ব্বদা সঙ্গে আনার জন্য তাহার মাতাকে বলিলেন। ক্রমেই যাতায়াত চলিতে লাগিল। মেহের উন্নিসা আসিলেই সেলীম সেখানে উপস্থিত হইয়া কোন না কোন উপলক্ষে তাহার সহিত আলাপ করিত। অবশেষে বেগম তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বাদশাহকে গোপনে তাহা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ বেগমকে বলিলেন যে, কয়েকদিন যেন বালিকাকে সঙ্গে না আনে, ইহা মিরজা ঘীয়াসের স্ত্রীকে বলিয়া দাও, এবং সত্বর কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়ার জন্য মিরজা ঘীয়াসকে আদেশ করিলেন।

খাঁ খাঁনা যখন ভক্করের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় তহমাসব কল্মী নামক জনৈক পারস্যদেশবাসী যুবক শাসনকার্য্যে সাহায্য করিয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করাতে খাঁখানাঁ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শাহীদরবারে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তহমাসব কল্মী সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া দরবার হইতে সের আফগান উপাধি লাভ করে। বাদশাহ তাহারই সহিত মেহের উন্নিসার বিবাহ দেওয়াইয়া দিলেন। এই বিবাহই উক্ত বীরযুবকের কালস্বরূপ হইয়াছিল। অদৃষ্ট লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? শেষে এই হইল যে, যৌবনেই শের

আফগান জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রমূলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মেহের উন্নিসা বিধবা হইয়া শাহীমহলে আসিয়া কয়েক দিন থাকার পর নুরজাহান বেগম নামে জগতে পরিচিত হইলেন। দুঃখের বিষয় এ জগতে জাহাঙ্গীরও নাই, নুরজাহানও নাই কিন্তু চিরকালের জন্য তাহাদের নামে কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ।

কতিপয় বৎসর হইল বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রধানতঃ দুই দল হইয়াছে—একদল সংস্কৃত ব্যাকরণের পথেই চলিতে চান, অন্য দল বঙ্গভাষার জন্য পৃথক্ ব্যাকরণ রচনার পক্ষপাতী। কেহ কেহ আবার মধ্য-পথ-অবলম্বী।

বাস্তবিক পক্ষে এই কয় দলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। খাঁটি বাঙ্গালার জন্য 'স্বতন্ত্র' ব্যাকরণ রচনা করা কাহারও সাধ্য নয়—বোধ হয়, দ্বিতীয় দলের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। "সংস্কৃত"র সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে না।

যাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বনে চলিতে চান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই—কিন্তু সংস্কৃতের পক্ষপাতি-পণ্ডিতগণ যে ভাবে আন্দোলন করিতেছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—"ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে কি না?" ইহার উত্তর খুব সহজ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ, ভাষা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। যে উচ্চারিত শব্দরূপ উপায়দ্বারা লোকে মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই মানুষের ভাষা। এই ভাষা

শুদ্ধরূপে "লেখা" ও "বলা" যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহার নাম ব্যাকর
যাহা দশজনে বলে বা দশজনে লেখে তাহা দেখিয়াই প্রথম
ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। একথা নিশ্চিত যে, যখন বাঙ্গাল
বলিয়া একটা ভাষা আছে তখন তাহার ব্যাকরণও আবশ্যক। সুতরাং
বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে কি না এ প্রশ্ন তুলিবা
কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। ভাষা
যে পথে চলিবে ব্যাকরণেরও প্রথমে সেই পথে চলা উচিত। প
মধ্যপথ হইতে এ উহার সহায় হয়। ভাষা যদি উন্নতিশীল অতএ
পরিবর্ত্তনশীল হয় তবে ব্যাকরণের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। দু'
পাঁচ শ' ব র পরে ভাষা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবার অর্থ কি? তখনকা
লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে তাহাই কি তাহাদের কাছে দুর্বো
ঠেকিবে? না, 'আমাদের' ব্যাকরণ কি 'আমাদের' ভাষা বুঝিবা
কোন সহায়তা করিবে না? অথবা, তাহারা আমাদের 'সাহিত
পড়িবে অথচ আমাদের 'ব্যাকরণ' পড়িবে না? ফলতঃ, কথা এই
বর্ত্তমান ব্যাকরণ আমাদের বর্দ্ধিষ্ণু ভাষার গতি সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া
কি না?—না, এ পর্য্যন্ত করে নাই। সেইজন্য যাঁহারা বাঙ্গলায় কথা
বার্ত্তা বলেন বা লেখনীচালনা করেন, তাঁহারা আধুনিক ব্যাকরণে
উপযোগি-উপাদান নানা প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। যা
ইতিপূর্ব্বেই সংগৃহীত আছে তাহারও নির্ব্বাচন চলিতেছে। সম্ভব
আরও কিছুদিন এই সংগ্রহকার্য্য চলিবে; পরে ব্যাকরণের প্রথ
"সংস্করণ" হইবে।

"কথিত ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা" এ কথাও সম্পূর্ণ ঠিক না
"সাধারণ" মানে যদি 'ইতর' বা 'অশিক্ষিত' হয়, তবে কি 'ভদ্র'
'শিক্ষিত' লোকের কথিত ভাষা নাই! আর যদি 'সাধারণ' মা
"অধিকাংশ" লোক হয়, তবে তাহাদের ছাড়িয়া ব্যাকরণ কি

াহিত্য রচিত হইবে কি করিয়া? "বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বিদ্যমান না
াকায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে"—এ কথার অর্থ
ক এই যে, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানিও শুদ্ধ
য়? সকলই যদি ভ্রমসঙ্কুল হয় তবে ত আশঙ্কার কথাই বটে!
তরাং "অধুনা বাঙ্গালালেখকগণ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন।"
হাতে বিচিত্র কি? কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধকে পথপ্রদর্শক
রে?—তবে পঙ্গু হইলে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করাই ন্যায়সঙ্গত
টে! অতএব লেখকবর্গ যে যাহার মতে চলিতেছেন তাহাতে আক্ষেপ
ক? অথবা, যদি তাঁহারা প্রকৃত লেখক হন, তবে তাঁহাদের লিখন-
ঙ্গীই যে "নিয়ম" হইয়া পড়ে! ফল কথা, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রচলিত
াছে তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতব্যাকরণের বাঙ্গালা-পকেট্-সংস্করণ,
তক বা ইংরাজিব্যাকরণের অনুকরণ—অতি অল্প সংখ্যকই বাঙ্গালা-
চনার অবলম্বন হইতে পারে। এই অত্যল্প সংখ্যকও আবার অল্প
খকই দেখিয়া থাকেন!

'সজীব' ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাষার বাল্যাবস্থা
হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে আসিতে হইবে, পরে তাহা
ইতে সাধারণসূত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক বর্ত্তমান লেখকগণের সম্মুখে ধরিতে
হইবে; এবং ভবিষ্যতে তাহার ঝোঁক কোন্ দিকে তাহাও আভাসে
ঙ্গিতে দেখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিধানরচনারও বিধান করিতে
হইবে।

"ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলেই ভাষা মরিয়া যায়"—এ কথারও
কান যুক্তি বা ভিত্তি নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সজীব ভাষার অনুচর
চ্ছ ব্যাকরণ; শেষে অনুচর প্রায় সহচর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি
দন্তীর মত ভাষার গতি স্বাধীন ও উদ্দাম থাকিলে ব্যাকরণের সাধ্য
যে, সরু সরু "সূত্র" তৈরি করিয়া তাহাকে বদ্ধ করে! তবে যখন

গতি মন্থর হইয়া আসে, তখন তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে পারে; শেষে যখন ভাষা নিতান্ত স্থির হয় বা 'মরে,' তখন ব্যাকরণ তাহাকে একেবারেই 'বাঁধিতে' পারে! এতদিন যে অনুচর ছিল, সে এখন নিতান্ত 'আপনার' হইল—এখনই সে ভাষার প্রকৃত "সাহিত্য" লাভ করিল!

কিন্তু উপমার রজ্জু বেশী টানিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তুলনা ছাড়িয়া স্থূলকথা, এই ভাষার চরমদশায় ব্যাকরণই প্রহরীস্বরূপ। মৃত ভাষাকে নাড়া চাড়া করিতে হইলে ব্যাকরণের অনুমতি ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ব্যাকরণের সহায়তায় মৃত ভাষারও "সাড়া" পাওয়া যায়।

আর, সকল ভাষারই কি মৃত্যু আছে? "সংস্কৃত" ভাষা অমর ভাষা। হিন্দুধর্ম্মের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে, রীতিনীতিতে, তন্ত্রমন্ত্রে ইহার সজীবতা এখনও কিছু লক্ষিত হয়। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 'পণ্ডিতে' 'পণ্ডিতে' সংস্কৃতে কথোপকথন চলে; অদ্যাপি সংস্কৃত নাটক প্রণীত ও অভিনীত হইয়া থাকে; আজিও "সংস্কৃত" বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই মেলে। যাহা হউক, ইহারও পরিবর্ত্তন যুগে যুগে সংসাধিত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই—অর্থাৎ, উহা কৃত্রিম ব্যাকরণের উপর স্থাপিত,* কি উহা হইতেই ব্যাকরণের উদ্ভব হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন। কিন্তু এটা ঠিক যে, সুপ্রতিষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বেই উহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ব্যাকরণই যে এই ভাষার সর্ব্বথা নিয়ামক তাহা নহে। পরবর্ত্তী ব্যাকরণকারেরাও পাণিনি-পরিত্যক্ত অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ পাণিনির পরবর্ত্তী সংস্কৃতসাহিত্যকারগণ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ব্যাকরণে নূতন সূত্র দিতে

* আজ কাল Esperanto বলিয়া একটা নূতন ভাষা ইয়ুরোপে সার্ব্বজাতিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, এবং তাহার জন্য "কৃত্রিম" ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। তাহা ছাড়া কত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ, কত শত পদের একাধিক 'রূপ' আছে, কত প্রতিপ্রসব, কত বিকল্প, কত আর্ষপ্রয়োগ ইত্যাদি কত-কি আছে, যাহাতে বোঝা যায় যে, ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রথমে সমভাবে বিবাদ করিলেও শেষে সাহিত্যেরই জয় হইয়াছে!

সংস্কৃতের একান্ত পক্ষপাতি-সম্প্রদায় বলেন, "যে সকল পদের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সে গুলি বর্জ্জন করা উচিত"। পদসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপক কি?—কিছুই নাই। 'যাহা বহুস্থান ও বহুকাল ব্যাপিয়া আছে' তাহা প্রবল বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না কে বলিতে পারে? বিদ্যাসাগরী 'হইবেক' 'যাইবেক' ইত্যাদি পদ ত সেদিন সাহিত্যে ছিল—এখন কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। উহাদিগকে কি রাখা সঙ্গত "হইবেক"? যদি বলেন ঐ "ক" প্রাদেশিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে—তাহার উত্তর এই যে 'হইবে' যাইবে' প্রভৃতি পদেও পূর্ব্বাঞ্চলের গন্ধ আছে! এই গুলিও 'কাল্পনিক' বা 'স্থির' পদ নয়। যাহা পূর্ব্বে হইতে "আইসে" তাহা এখন "আসে"—যাহা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে," তাহা বর্ত্তমানে প্রায় হইয়া "গেছে"।

এইরূপে দেখা যায়, যাহাকে 'কল্পিত' বা 'স্থির' পদ বলা হয়, তাহা কোন না কোন প্রদেশের "প্রচলিত" এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানে ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত; অবশ্য, "লিখিত" পদ সর্ব্বথা "কথিত" শব্দের অনুরূপ হয় না। এই গুলি সময়ে রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিকতায় পরিবর্ত্তিত হইবার খুব সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহা ঠেকাইবার উপায় নাই—এবং ঠেকাইয়া লাভও নাই।

ক্রিয়াপদ ছাড়া, বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম অব্যয় সম্বোধন, এবং অন্যান্য বাগ্‌ভঙ্গী ইত্যাদিতেও কলিকাতা রাজধানীর প্রাধান্যই সূচিত হয়। যতদিন এই নগরই বঙ্গের রাজধানী থাকিবে ততদিনই ভাষায় ভূষায় অন্যান্য প্রদেশ ইহার অনুবর্ত্তন করিবে। যদি উচ্চারণ

সংবলিত অভিধান বাঙ্গলাভাষায় প্রচারিত হয়, তবে তাহা সম্ভবতঃ রাজধানী অঞ্চলের উচ্চারণ লইয়াই বাহির হইবে, এবং সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলা পদ্যে ত আছেই, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থে ও প্রবন্ধে, নাটকে ও নভেলে, সাপ্তাহিকে ও মাসিকে সাধুলেখকবর্গ নিরন্তর যে যে সকল কথিত প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাদের প্রচলন বন্ধ না করিয়া, তাহাদের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ, ব্যাকরণ বা অভিধানে প্রদান করিবার চেষ্টা হউক। নতুবা ভাষার পুষ্টি সুদূরপরাহত। যাঁহারা বলেন—বরং 'কল্পিত' বা 'বিদেশীয়' পদ ব্যবহার করিব তথাপি প্রাদেশিক পদ ব্যবহার করিব না—তাঁহারা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। কারণ, প্রাদেশিক বা দেশজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই। একটী প্রাদেশিক শব্দের মধ্যে জাতীয় অনেক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে; অধিকন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মূল প্রকৃতি অবধারিত হইলে তাহাদের অনেকেই যে আমাদের সকলেরই নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া পরিচিত পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বাঙ্গালায় 'প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত' অথবা 'কথিত' ও 'লিখিত' এই দুই শ্রেণী পৃথক্ করিয়া সাহিত্যগঠনের আবশ্যকতা নাই। বরং উভয়কে পরস্পর 'বেমালুম' মিশ্রিত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট করাই সঙ্গত।

পরিশেষে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একান্ত "সাংস্কৃত্য" অনুরাগে পণ্ডিতেরা কথোপকথনেও 'খেলনা'কে 'ক্রীড়ন দ্রব্য' ও 'দাঁড় করাও' স্থলে 'দণ্ডায়মান কর' ইত্যাদি বিশুদ্ধভাষাপ্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াও অসংখ্য স্থলে 'খাঁটি' প্রাদেশিক বাঙ্গালা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এইরূপে অনেক নিরীহ সংস্কৃত পদকেও অকারণে "বিদূরিত" করিতেছেন।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

পল্লীগ্রামে একদিন।

আমাদের নিবাস হুগলি জেলাস্থ—গ্রামে। আমার পিতৃপিতামহাদি ঐ গ্রামেই মানুষ হইয়াছিলেন। তখন গ্রামের অবস্থাও ভাল ছিল। শীর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা নদী রূপার হারের ন্যায় গ্রামখানির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছিল। নদীতে প্রচুর মৎস্য—উহার জল সুস্বাদু। গ্রামবাসীর কখন জলকষ্ট ছিল না। এখন সে নদী শুকাইয়া গিয়াছে। যেখানে নদী বহিত সেখানে এখন জঙ্গল। রত্নহারা সুন্দরী আভরণ বিহীনা হইলে যেমন হতশ্রী হইয়া পড়ে গ্রামখানিও সেইরূপ নদী বিহনে শ্রীভ্রষ্ট।

সুবৃহৎ গ্রাম। পূর্ব্বে তথায় বহুলোকের বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত গ্রামপ্রান্তে অনেক বাগ্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক ও তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পজাতির বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন। সকল গৃহেই গৃহদেবতা। বিবিধ বিধানে সকলেই প্রত্যহ স্ব স্ব দেবতার পূজা করিতেন। গ্রামে কয়েকটী শিব ও কালীর মন্দির ছিল। মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবদেবীর সেবার কখনও ত্রুটি হইত না। গ্রামান্তর হইতে কত লোক কত মানস করিয়া ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে দেবদেবীর পূজা দিয়া চরণামৃত লইয়া যাইত। প্রতি অমাবস্যায় ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা হইত। সন্ধ্যাকালে মন্দিরগুলি দীপমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। অসংখ্য লোক আরতি দর্শনাভিলাষে মন্দির সন্নিধানে সমবেত হইত। আরতির সময় নাগ্‌রার গম্ভীর বাদ্য, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টারব—ইত্যাদি চারিদিক প্লাবিত করিত, গ্রামে এক অব্যক্ত, অভাবনীয় ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইত।

অবস্থাপন্ন কায়স্থগণ বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন; এবং সকলেই যথাসম্ভব পরহিত-রত ছিলেন। কয়েক জমিদারের বাস ছিল—তাঁহারা অনেক কাঙ্গালগরীবের পিতামাতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে সদাব্রত—সকাল, সন্ধ্যা, দিবারাত্রি তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রতি বৎসর গ্রামে ৮।১০ খানি প্রতিমা হইত, কখন কখন সহর হইতে যাত্রার দল যাইত। সকল গৃহেই আনন্দের উৎস ছুটিত। গরীব দুঃখীরাও জমীদারদিগের নিকট নূতন বস্ত্র, অল্পবিস্তর অর্থসাহায্যাদি পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বেড়াইত।

আমরা এখন সহরবাসী, সেকালের পল্লীগ্রাম দেখি নাই; পিতৃ-পিতামহের মুখে তথাকার সুখস্বচ্ছন্দের কথা শুনিয়াছি। অনেক দিনের পর সেই সকল কথা মনে হইতে লাগিল। সাধ হইল একবার আমাদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি-বিজড়িত পল্লীটুকু দেখিয়া আসিব। আমরা সেস্থান ত্যাগ করিয়াছি—আমাদের ন্যায় আরো অনেকে দেশত্যাগী হইয়াছেন। নানাকারণে তথাকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। এখন সেখানে লোক নাই, আহার নাই, জল নাই। তাহার উপর আবার রোগের পীড়ন। সুতরাং একদিনের জন্য যাইব। রাত্রি কাটান হইবে না—কারণ পল্লীগ্রামের মশকে ম্যালেরিয়া, জলে ওলাউঠা।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি। প্রাতে উঠিয়াই যাত্রা করিলাম। ২।৩ ঘণ্টার রেলপথ; তাহার পর একক্রোশ হাঁটা পথ বা ঘোড়ার গাড়ী। সহরে থাকিয়া আমাদের অনেকেরই পায়ে পক্ষাঘাত হইয়া যায়—আমারও তদবস্থা। ষ্টেশনে নামিয়া অনেক বিবেচনার পর গাড়ী করাই সাব্যস্ত হইল। আমি গাড়ীতে উঠিলাম। সহরের ন্যায় সুনির্ম্মিত পথ তথায় নাই—সেখানে কাঁচা রাস্তা। বর্ষাগমে

সে অপ্রশস্ত পথ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কর্দ্দমের অবধি নাই—পথ স্থানে স্থানে ধসিয়া যাইতেছে। তাহাতে আবার সেদিন অজস্র বারিবর্ষণ হইতেছিল। গাড়ী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার পরই থামিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম চাকা কর্দ্দমে বসিয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে তাহার উদ্ধার হইল। কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম; কিন্তু ২।৪ মিনিট অন্তরই এক একবার নামিতে হইল; কারণ সে ভীষণ শকটান্দোলন সহ্য করা আমাদের ন্যায় সহরবাসীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

পথের চতুস্পার্শ্বস্থ দৃশ্য-মাধুর্য্যে আমি বড় আকৃষ্ট হইলাম। উভয় পার্শ্বে বনপ্রান্ত শস্যশ্যামল প্রশস্ত মাঠ সোনার রঙে রঞ্জিত।—মধ্যে মধ্যে গ্রামের দৃশ্য পরিদৃশ্যমান্। বায়ুহিল্লোলে শস্যরাশি তরঙ্গায়িত হইতেছে; স্থানে স্থানে নাতিদীর্ঘ ঝিল বরষায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তীরে সিঞ্চিত-পক্ষে স্থিরচিত্তে বসিয়া বকপক্ষী শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে।

প্রায় একঘণ্টাকাল এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া গিয়া আমাদের গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ীচড়ার সুখ তখন সম্যক্ উপলব্ধি হইয়াছে। দূর হইতেই গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল—আমি যেন তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

ক্রমে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথম দৃশ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। সুন্দরীর রত্নহারতুল্য অমন যে নদী—তাহার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। স্থানে স্থানে দরিদ্র পল্লীবাসীরা জলকষ্ট নিবারণের জন্য নদীর খাতে ডোবা কাটিয়া রাখিয়াছে। পথি মধ্যে কয়েকটী সুবৃহৎ অট্টালিকা ও দুই চারিটী

ভগ্ন মন্দির। অট্টালিকায় মনুষ্য নাই, সৌষ্ঠব নাই, মন্দিরে দেবতা নাই। ধীরে ধীরে ব্যথিত হৃদয়ে একটী ভগ্ন অট্টালিকার জঙ্গলপূর্ণ প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বিতল অট্টালিকা। উপরে উঠিব বলিয়া সিঁড়ির নিকট অগ্রসর হইলাম। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—গৃহ সকল অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় এখনও কালের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। হায়! যেখানে লোকজন দাসদাসী অতিথি-অভ্যাগত কত সুখে বিচরণ করিত আজ সেস্থান মনুষ্যকণ্ঠ-হীন—আজ তথায় অহোরাত্র প্রহেলিকাময় মানব জীবনের অপূর্ব্ব রহস্যগাথা ধ্বনিত হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি তথা হইতে এক ভগ্ন দেবালয় সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বহুকালের মন্দির সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন অশ্বত্থ বট তাহার উন্নতচূড়া বেষ্টন করিয়া আছে—বিষধর ফণিণী তাহার নিভৃত-নিকেতনে আশ্রয় লইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনুষ্যবসতির চিহ্নও নাই, একটা শৃগাল কুক্কুরও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমার আতঙ্ক হইল। আপনার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আপনি শুনিতে শুনিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

কিছুদূর আসিয়া বিশ্রামার্থ এক পুষ্করিণীর ভগ্নঘাটে উপবেশন করিলাম। সরোবরে স্নাতক নাই। অনেকক্ষণ পরে এক অতশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা যষ্টিতে ভর দিয়া আসিয়া আমার নিকট বসিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধা বসিয়া পড়িয়াছেন। একটু পরে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জ্ঞাত হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। গমন কালে বৃদ্ধা আত্ম পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলাম তিনি আমাদেরই এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। এক্ষণে তাঁহার কেহই নাই। পুত্র পৌত্রাদি তাঁহার সকলই ছিল; কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সর্ব্বস্বই কাড়িয়া লইয়াছে। এখন ঐ যষ্টিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। একটী বৃহৎ

ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে বৃদ্ধা প্রবেশ করিলেন। ঐ অট্টালিকায় বসিয়া এক সময় তাঁহার স্বামী সমগ্র গ্রামবাসীকে লইয়া কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন! প্রশস্ত দালান যেখানে বৎসর বৎসর মা জগদম্বা আসিতেন; বসনে, ভূষণে, অলঙ্কারে কত সাজে মাকে সাজাইয়া গৃহস্থ ও প্রতিবেশীবর্গ চরিতার্থ হইতেন—আজ সে স্থান শূন্য। গায়কের গীতধ্বনি, বাদ্যকরের বাদ্যরব, ভিক্ষুকগণের ভুক্তোল্লাস, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টারব ইত্যাদি যে স্থান সতত প্লাবিত করিত আজ সেখানে গভীর নীরবতা—দুই চারিটা চামচিকা সকাল সন্ধ্যায় তথায় কিচি মিচি করে—রাত্রিতে কয়েকটা জোনাকী জ্বলে মাত্র। আর কখন কখন ঐ শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা ঐ ভগ্নদালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানস নেত্রে বসনভূষণ অলঙ্কার পরিধানা, শোভাসমন্বিতা, পতিতপাবণী জগন্মাতাকে দেখিতে পান—অলক্ষ্যে তাঁহার চক্ষে শতধারা বহিতে থাকে।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া ও তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। পথে আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে বিধির নির্ব্বন্ধ, কালের গতি ভাবিতে ভাবিতে আমাদের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিলাম। সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন—চারিদিক চকমিলান। পশ্চাতে অন্দরমহল বা বসতবাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই—চাল পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছে। বসতবাড়ীর অবস্থা অতি শোচনীয়—দুই এক অংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে—অবশিষ্টাংশ পতনোন্মুখ। পুরাতন ইষ্টকস্তূপ ব্যতীত তথায় দেখিবার আর কিছুই নাই। খিড়কীর পথ উন্মুক্ত, তাহা দিয়া বাহিরে আসা যায়; কিন্তু সে পথ এত জঙ্গলপূর্ণ যে তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না। খিড়কীতে একটী সুন্দর সরোবর ছিল—এখন তাহার চিহ্ণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি আসিয়াছি শুনিয়া দুই চারিজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী আমার নিকট

আগমন করিলেন, আমি তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না—পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হইল। অবশেষে তাঁহারা আপনারাই পরিচয় দিলেন। কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না। একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের ভগ্নভিটা ও চণ্ডীমণ্ডপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কাতর ভাবে আমায় বলিলেন :—বাবা, সহরের স্বাদ পাইয়া কেমন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটা ত্যাগ করিয়া আছ? বলদেখি, বাস্তুভিটার এ দুর্গতি দেখিয়া তোমার অন্তর কাঁদে কি না? পূর্ব্বে ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় লোক ধরিত না; এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তোমার পিতামহ কৃতাঞ্জলীপুটে মহামায়ার সমক্ষে তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেন। আহা! সে যেন সেদিনকার কথা! কায়মনোবাক্যে তিনি মহামায়ার নিকট যে কামনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি তোমাদের সকলকেই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ তোমরা থাকিতে তোমাদের পিতামহের আদরের জন্মস্থান, সাধের বাড়ী, প্রিয়তম চণ্ডীমণ্ডপের এ দুরবস্থা কেন? তুমি হয়ত বলিবে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, কেমন করিয়া আসা যাওয়া চলে। আমি বলি সেটী ভুল। লোক না থাকিলেই দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আবার তোমরা দশঘর আসিয়া দেশে বাস করিলে দেশের অবস্থা ফিরিবে। সুতরাং আমার অনুরোধ এই, পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে কষ্ট দিও না। আবার দেশে আসিয়া বাস করিয়া দোল দুর্গোৎসব কর।"

বৃদ্ধের কথা আমার প্রাণে লাগিল। যতক্ষণ সেখানে ছিলাম মনে মনে ঐ কথারই আলোচনা করিতে লাগিলাম। তখন মনে পড়িল কি জন্য মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র শেষপীড়াকালীন রাজধানীর রাজসম্মান এবং বৃহৎ নগরীর বিরাট সমাজের বিপুল যত্ন হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অপ্রথিতনামা সেই অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বড় আদরের জন্মস্থান আগুণ্সী গ্রামে গিয়া পিতৃ-পিতামহের চিতাভস্মে আপন নশ্বর দেহের

ভস্মাবশেষ মিশাইয়া ছিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম নিবাসস্থানের প্রতি নির্ম্মম হইয়া আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অবিচার করিতেছি।

যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমায় পূর্ব্বোক্তরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি আমায় আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি গিয়াছি জানিয়া ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। আমার তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা বিশেষ কিছুই হয় নাই—দেশের দুর্গতি দেখিয়া আমি বড় ভাবনাক্লিষ্ট হইয়াছিলাম। তথাপি ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস হইল না। তাঁহার বাটীতে প্রসাদ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সুতরাং তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলাম। বেলা দুই প্রহর অতীত—আকাশের আর দুর্যোগ নাই। বিস্তীর্ণ মাঠ রৌদ্রে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর সংলগ্ন আম্রকানন মধ্যে ঘুঘু ডাকিতেছে। দুই চারিজন কৃষক লাঙ্গল লইয়া, কদাচিৎ কোন গোপালক গরু লইয়া যাইতেছে। প্রথম গিয়া গ্রামখানিকে যত নির্জীব দেখিয়াছিলাম এখন তদপেক্ষা স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিলাম।

আমাদের বাটী হইতে প্রায় একপোয়া দূরে ব্রাহ্মণের বাড়ী, অবশ্য আমাকে পদব্রজেই যাইতে হইল। অশ্বযানের কি দুরবস্থা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এ পল্লীগ্রামের মেঠো পথে বৈদ্যুতিক গাড়ীই বা কোথায় পাইব? সহর হইলে এতখানি পথ পদব্রজে যাওয়া অনেকের পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনতুল্য। কিন্তু পল্লীবাসীর পক্ষে এ পথ অতি সামান্য। এখানে বৈদ্যুতিক গাড়ী নাই বটে, কিন্তু এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। সর্ব্বাভরণভূষিতা প্রকৃতিরই সেই বৈদ্যুতিক শক্তি। পল্লীবাসিগণ সেই শক্তির সাহায্যে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বৈদ্যুতিক যানারোহণ অপেক্ষা অধিকতর সুখ অনুভব করেন। আমি পল্লীবাসী না হইলেও তৎকালে পল্লীবাসীর মানসিক অবস্থায়

আগমন করিলেন, আমি তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না—পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হইল। অবশেষে তাঁহারা আপনারাই পরিচয় দিলেন। কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না। একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের ভগ্নভিটা ও চণ্ডীমণ্ডপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কাতর ভাবে আমায় বলিলেন :—বাবা, সহরের স্বাদ পাইয়া কেমন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটা ত্যাগ করিয়া আছ? বলদেখি, বাস্তুভিটার এ দুর্গতি দেখিয়া তোমার অন্তর কাঁদে কি না? পূর্ব্বে ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় লোক ধরিত না; এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তোমার পিতামহ কৃতাঞ্জলীপুটে মহামায়ার সমক্ষে তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেন। আহা! সে যেন সেদিনকার কথা! কায়মনোবাক্যে তিনি মহামায়ার নিকট যে কামনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি তোমাদের সকলকেই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ তোমরা থাকিতে তোমাদের পিতামহের আদরের জন্মস্থান, সাধের বাড়ী, প্রিয়তম চণ্ডীমণ্ডপের এ দুরবস্থা কেন? তুমি হয়ত বলিবে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে কেমন করিয়া আসা যাওয়া চলে। আমি বলি সেটী ভুল। লোক না থাকিলেই দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আবার তোমরা দশঘর আসিয়া দেশে বাস করিলে দেশের অবস্থা ফিরিবে। সুতরাং আমার অনুরোধ এই, পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে কষ্ট দিও না। আবার দেশে আসিয়া বাস করিয়া দোল দুর্গোৎসব কর।"

বৃদ্ধের কথা আমার প্রাণে লাগিল। যতক্ষণ সেখানে ছিলাম মনে মনে ঐ কথারই আলোচনা করিতে লাগিলাম। তখন মনে পড়িল কি জন্য মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র শেষপীড়াকালীন রাজধানীর রাজসম্মান এবং বৃহৎ নগরীর বিরাট সমাজের বিপুল যত্ন হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অপ্রথিতনামা সেই অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বড় আদরের জন্মস্থান আগুণসী গ্রামে গিয়া পিতৃ-পিতামহের চিতাভস্মে আপন নশ্বর দেহ

ভস্মাবশেষ মিশাইয়া ছিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম নিবাসস্থানের প্রতি নির্ম্মম হইয়া আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অবিচার করিতেছি।

যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমায় পূর্ব্বোক্তরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি আমায় আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি গিয়াছি জানিয়া ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া ছিলেন। আমার তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা বিশেষ কিছুই হয় নাই—দেশের দুর্গতি দেখিয়া আমি বড় ভাবনাক্লিষ্ট হইয়াছিলাম। তথাপি ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস হইল না। তাঁহার বাটীতে প্রসাদ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সুতরাং তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলাম। বেলা দুই প্রহর অতীত—আকাশের আর দুর্য্যোগ নাই। বিস্তীর্ণ মাঠ রৌদ্রে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর সংলগ্ন আম্রকানন মধ্যে ঘুঘু ডাকিতেছে। দুই চারিজন কৃষক লাঙ্গল লইয়া, কদাচিৎ কোন গোপালক গরু লইয়া যাইতেছে। প্রথম গিয়া গ্রামখানিকে যত নির্জ্জীব দেখিয়াছিলাম এখন তদপেক্ষা স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিলাম।

আমাদের বাটী হইতে প্রায় একপোয়া দূরে ব্রাহ্মণের বাড়ী, অবশ্য আমাকে পদব্রজেই যাইতে হইল। অশ্বযানের কি দুরবস্থা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এ পল্লীগ্রামের মেঠো পথে বৈদ্যুতিক গাড়ীই বা কোথায় পাইব? সহর হইলে এতখানি পথ পদব্রজে যাওয়া অনেকের পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনতুল্য। কিন্তু পল্লীবাসীর পক্ষে এ পথ অতি সামান্য। এখানে বৈদ্যুতিক গাড়ী নাই বটে, কিন্তু এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। সর্ব্বাভরণভূষিতা প্রকৃতিরই সেই বৈদ্যুতিক শক্তি। পল্লীবাসিগণ সেই শক্তির সাহায্যে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বৈদ্যুতিক যানারোহণ অপেক্ষা অধিকতর সুখ অনুভব করেন। আমি পল্লীবাসী না হইলেও তৎকালে পল্লীবাসীর মানসিক অবস্থায়

উপস্থিত হইয়া প্রকৃতি শক্তির অধিকারী হইয়াছিলাম। সেই জন্য এত ভ্রমণেও ক্লান্তি আসিল না।

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া বহির্ব্বাটীর দাওয়ার উপর একখানি মাদুরে উপবেশন করিলাম। বাড়ীতে কয়েকখানি মেটে ঘর আছে। ইষ্টকনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র গৃহে গৃহদেবতা থাকেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তথাপি গৃহদেবতাকে নিজেরা যেরূপ ঘরে থাকেন সেরূপ ঘরে রাখিতে পারেন নাই, সেই জন্য কষ্ট করিয়াও একটী পাকাঘর করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক দেবতার অনুগ্রহে এই জনহীন পল্লী-গ্রামে থাকিয়াও তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ বেশ মনের সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন।

বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার—চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। সম্মুখে এক খণ্ড প্রশস্তভূমি, তাহার এক দিকে বেল্ লেবু পেয়ারা প্রভৃতি বৃক্ষ, আর একদিকে কপি কলাইশুঁটি, বেগুন প্রভৃতির ছোট ছোট ক্ষেত্র। বাড়ীর পিছনে খিড়কীর পুষ্করিণী। খিড়কীর পথের এক পার্শ্বে মাচার উপর পুঁই শাক, লাউশাক, কুমড়াশাক ইত্যাদি; অপর পার্শ্বে নটিয়া, পালম প্রভৃতির ক্ষেত্র। পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য, গৃহস্থকে কখন মৎস্য কিনিয়া খাইতে হয় না। পুষ্করিণীর চারিদিকে নারিকেল ও তালবৃক্ষ, পরপারে পাঁচ ছয় বিঘা প্রমাণ বাগান। বাগানে আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ; একদিকে একটা বাঁশঝাড়—আর একদিকে কতকগুলা কলাগাছ। বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটী ছোট ডোবা—ডোবায় প্রচুর কই ও মাগুর মাছ। ডোবার একদিকে পথ, অপর দিকে গাছ—সজিনা গাছ, আমড়া গাছ, চালতা গাছ, তেঁতুল গাছ ইত্যাদি। সে বাড়ীতে রীতিমত ফুলের বাগান নাই। কিন্তু বহিবাটীর বহির্দ্বারের উপরপার্শ্বে কতকগুলি শেফালিকা, জবা ও চম্পকাদি পুষ্প বৃক্ষ। ঐ সকল পুষ্প গৃহস্থের নিত্য পূজায় ব্যবহৃত হয়।

বাড়ীটী দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল। পথে আরো দুই একটী ঐরূপ বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইলেও এই সকল দরিদ্র গৃহস্থ কেমন সুখে দিনপাত করিতেছে। অনেক গৃহেই এইরূপ গাছে ফল, মাচায় শাক, পুকুরে মাছ ইত্যাদি পাওয়া যায়—ওসকল কিনিয়া খাইতে হয় না। বাটীর স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং এগুলির তত্ত্বাবধান করেন। এবং গৃহজাত তরকারীর দ্বারা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। সুন্দর গৃহস্থালির গুণে গৃহস্থকে কখন পল্লীত্যাগী সহরবিলাসীদিগের ন্যায় শুষ্ক, পুরাতন, পচা বা কীট-ভুক্ত তরকারী খাইয়া পীড়া বা রুচিবিকারগ্রস্ত হইতে হয় না এবং ভোজনার্থ নিত্য ব্যয়বাহুল্যও স্বীকার করিতে হয় না।

দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইয়া পড়িল, আমি তখনও আহার করি নাই—চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছি। ক্রমে জানিতে পারিলাম ব্রাহ্মণ সপরিবারে তখনও অভুক্ত আছেন। আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী, অতিথি, সুতরাং আমায় আহার না করাইয়া তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ কেমন করিয়া আহার করিবেন? পল্লীগ্রামে এখনও যে এরূপ আতিথেয়তা আছে তাহা আমি জানিতাম না। আমরা সহরবাসী হইয়া আতিথ্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছি। আমরা "রুটিন্" দুরস্ত করিয়া ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চলি; কোন কাজের একটু এদিক ওদিক হইলে ত্রিলোক আলোড়িত করি; আহার প্রস্তুতের পাঁচ মিনিট বিলম্বে ব্রহ্মাণ্ড শূন্য দেখি—উন্মত্ত হইয়া সমস্ত পরিবারের অব-মাননা করি। আহারীয় দ্রব্য পদদলিত করিয়া, তৈজসাদি ভাঙ্গিয়া, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্নেহময়ী বনিতার চক্ষের জল ফেলাইয়া ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। নিমন্ত্রিতই আসুন, আর অতিথি অভ্যাগতই আসুন, আমাদের নিজের আহারের সময়ের একটু অগ্রপশ্চাৎ হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্রের গৃহে আতিথ্যধর্ম্মের যে পবিত্র স্রোত এখনও প্রবাহিত তাহার কণিকামাত্র আমাদিগকে স্পর্শ করিলে আমরা আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় দিবার উপযুক্ত হই।

আমি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আহারার্থ গমন করিলাম।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তখন ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। ভিত্য় বাড়ীর একটী বড় ঘরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত দাওয়ায় আমার আহারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার। মাটির হইলেও যেন ঝক ঝক করিতেছে, দেখিলে বসিতে ইচ্ছা করে। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনটুকুও বেশ পরিচ্ছন্ন। তাহার একদিকে কতকগুলি ছোট বড় ধানের মরাই, অপর দিকে ঢেঁকিশালা। বাসগৃহের ন্যায় গোশালাও পরিষ্কার ও গন্ধহীন—তথায় মশাটী পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। দুইটী গাভী রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ এই বৃদ্ধ বয়সে এখনও স্বহস্তে গাভীর সেবা করেন। গাভীদ্বয় বেশ হৃষ্ট পুষ্ট—দেখিয়া বুঝিলাম ব্রাহ্মণ ইহাদের অতি যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন।

আমি আহারে বসিলাম। ব্রাহ্মণী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে, ধীরে ধীরে আমায় অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া গেলেন। তিনি আমার ঠাকুরমাতার বয়ঃপ্রাপ্তা তথাপি এখনও এত লজ্জাশীলা যে তাঁহাকে দেখিলে অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুরমণীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

আহারকালে ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ আরো দুই একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বসিয়া যত্নপূর্ব্বক আমায় আহার করাইতে লাগিলেন। চপ্, কাট্‌লেট, কোরমা, কোপ্তা, punch, pudding—এ সকল কিছুই ছিল না। মোগল, পাঠান, ফরাসী, জর্ম্মাণ,—কাহারও অনু করণে রন্ধন করা হয় নাই। আহারের উপকরণ অতি সামান্য, কিন্তু বড় উপাদেয়। সুসিদ্ধ অন্ন,—সুন্দর ডাল ও কয়েকপ্রকার ব্যঞ্জন, সুমিষ্ট মাছের ঝোল ও অম্ল, সর্ব্বশেষে একটু সুস্বাদু দুগ্ধ ও চিনি। অন্ন ব্যঞ্জনাদি পল্লীরমণীর প্রাচীন পাকপ্রণালীমতে প্রস্তুত। আমি খাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম। আহার করিয়া এমন তৃপ্তিলাভ অনেক কাল আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সহরে আমরা বেতনভোগী পাচক পাচিকার হস্তে খাইয়া থাকি। তাহারা কায়িক পরিশ্রমে পটু হইলেও এরূপ রন্ধন করিতে অসমর্থ। শুদ্ধ ঘি মশলার শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে রন্ধন করা হয় না। রন্ধন বড় উচ্চ অঙ্গের কার্য্য। রন্ধনকালে রন্ধনকারীর শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বলের অধিক প্রয়োজন। ধর্ম্মকার্য্যে যেমন একাগ্রতা ও আন্তরিকতা আবশ্যক রন্ধনকার্য্যেও সেইরূপ প্রয়োজন। কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ থাকিলে ভোক্তার যেরূপ

খাইয়া তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ রন্ধনকারীর মনপ্রাণ তাহার কার্য্যে নিবদ্ধ না থাকিলে সুরন্ধনও কখন সম্ভবে না। অর্থ দিয়া আমরা লোক সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু লোকের মন পাই কিরূপে? সেই নিমিত্ত বেতনভোগী পাচক পাচিকার হস্তে খাইয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকগণ অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহসহকারে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পাকান্তে ভোক্তার পরিতুষ্টির জন্য একান্ত মনে জগদীশ্বরকে ডাকেন। রন্ধন কার্য্য তাঁহাদের নিকট একটী ধর্ম্মকার্য্য —সুতরাং তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহজাত দ্রব্যাদি খাইয়া ভোক্তা অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করে। আমার এক বিশেষ বন্ধু আমায় বলিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে তাঁহার জননীও রন্ধন করেন, পাচিকাও রন্ধন করেন; কিন্তু কোন্ ব্যঞ্জন কে রন্ধন করিয়াছেন তাহা তিনি আহার করিয়া বলিতে পারেন। কারণ তাঁহার জননীর ন্যায় সুমিষ্ট রন্ধন বামুনদিদির দ্বারা হয় না। সে মিষ্টত্বটুকু যে জননীর স্নেহ হইতে আসে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রন্ধনকালে জননীর ও বেতনভোগী পাচিকার মানসিক অবস্থাই এবম্বিধ তারতম্যের কারণ। জননী যে ভাবে যে প্রাণে সন্তানকে স্তন্যদান করেন এবং সেই স্তন্য পানে সন্তানের যে শক্তিলাভ হয়, জননীর অভাবে ধাত্রী কি সেইভাবে, সেই প্রাণে শিশুকে স্তন্যদান করিতে পারে; না, তাহার স্তন্যপানে শিশু মাতৃস্তন্য পানের ফল সম্যক লাভ করিতে সমর্থ হয়? সেইজন্য বলিতেছি যে রন্ধনকার্য্য বেতনভোগী পাচক পাচিকার দ্বারা সম্পন্ন হইলে আহারের সুখ ও মধুরতা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না। পল্লীগ্রামে এখনও রন্ধনের সমাদর আছে। অবস্থাপন্ন-দিগের মধ্যেও বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন বা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। শিক্ষাদোষে, কালের বশে সহরে থাকিয়া আমাদের রমণীরা রন্ধনকার্য্য একরূপ ভুলিয়া যাইতেছেন, সামান্য দুধটুকু গরম করিতে গিয়া তাঁহারা হস্ত পদাদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন—ভাতের ফেণ গালিবার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। বড় দুঃখের কথা। রন্ধনশিল্প উঠিয়া গেলে আমাদের ধর্ম্মের একটী অঙ্গ খসিয়া পড়িবে।

আহারান্তে বিশ্রামার্থ আমি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলাম। একে একে গ্রামের কয়েকটী লোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন।

নানারূপ গল্পগুজবে আমাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমায় দেখিয়া সকলেই বড় আনন্দিত। একবাক্যে সকলেই আমা বাস্তুভিটার সংস্কার করিয়া আবার দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবা জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বগ্রামের অবস্থা দেখিয়া এবং গ্রামবাসীদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমার মনে হইল যে নিবাসস্থান ত্যাগ করিয়া আমরা ভাল করি নাই। আবা থাকিতে কে কোথায় প্রবাসী হইয়া থাকে? সহর আমাদিগের পক্ষে প্রবাস। সহরে আমরা বিলাস-বৈভবের ক্রোড়ে লালিত। যেখানে বিলাসভোগেচ্ছা প্রবল, অর্থচিন্তা ভয়ঙ্কর, প্রলোভন বিস্তারিত, অশান্তি প্রবাহিত, সেখানে কখন প্রকৃত সুখ ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। সহরে ঐ সকলই আছে—এই জন্য তথায় সুখ শান্তির এত অভাব। সহরে থাকিয়া আমাদিগের সরল, সুন্দর, শান্তিময় পল্লী-জীবনের স্বচ্ছন্দটুকু কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে একবার আসিয়া আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। প্রত্যাগমনকালে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিলাম আবার যাহাতে বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা জ্বলে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

শ্রীহরনাথ বসু।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দোলমঞ্চ।

এই দোলমঞ্চটীর সম্বন্ধে কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ইহার স্থাপয়িতার বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা বিশে প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেছি। যাঁহারা ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট এই মহাত্মা নাম নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া বোধ হইবে না। কবিবর ভারতচ

খন কৈশোরে দারিদ্রের কঠোর পীড়নে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইতেছিলেন তখন এই মহানুভবই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ মনস্বিতা ও ঔদার্য্য সহকারে তাঁহাকে চন্দননগরে স্বীয় বাসভবনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার ও বঙ্গভাষার প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ইন্দ্রনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্দ ও ঘনিষ্টতা ছিল। এমন কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন ও তদুপলক্ষে তিনি চন্দননগরে শুভাগমন করিতেন। মহারাজের সহিত তাদৃশ আত্মীয়তা থাকায় তিনি আশ্রিত ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সহিত সহজেই পরিচিত করিয়া দেন। পরে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। এবং তাহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূতও নহে।

আমাদের আলোচ্য দোলমঞ্চ ব্যতীত ইঁহার বিস্তর কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। ফরাসী চন্দন নগরের Quai Dupleix নামক মনোরম স্থানটী ইঁহারই প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত। তথায় চৌধুরী-ঘাট বলিয়া যে বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী গঙ্গাবক্ষে অদ্যাবধি শোভা পাইতেছে তাহাও তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। বলা বাহুল্য সেই সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসীদের অবস্থা এখনকার মত হীনপ্রভ ছিল না। বিখ্যাত বীরপুরুষ Dupleix তখন ফরাসীভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তখন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানের পদ যে কিরূপ সম্মানার্হ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের Dupleix মহোদয় ইন্দ্রনারায়ণকে যে পত্রাদি লিখিতেন সেগুলি তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এই প্রবন্ধের পুরোভাগে যে দোলমঞ্চটীর বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা সন ১১৪৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটীর সম্মুখস্থ এক-

খানি প্রস্তর ফলকের উপর ইহার নির্ম্মাণের তারিখ উৎকীর্ণ আছে। প্রস্তর ফলকখান এইরূপ :—

শকাব্দা ১৬৬১।৮	
হরে কৃষ্ণ	হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ	হরে হরে
হরে রাম	হরে রাম
রাম রাম	হরে হরে
সন ১১৪৬ সাল	

সুতরাং এই প্রস্তর ফলক দৃষ্টে জানা যায় যে এই মন্দিরটী ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মিত হইবার পরে আর কেহ কখনও এই মন্দিরটীতে হস্তার্পণ করে নাই। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইহা কালের প্রবল অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রায় অটুট অবস্থায় রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সামান্য দুই একটী স্থান ফাটিয়াছে মাত্র। তবে মন্দিরপ্রাঙ্গনে পুরোহিত পাচক প্রভৃতির নিমিত্ত যে বাসগৃহ ছিল তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ আজ কাল নিঃস্ব অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, মন্দিরটী সংস্কার করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আর নাই। মন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকের মাঠ বিজন অরণ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটী আজ কাল শূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার ভিতর জনৈক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ একটী টোল স্থাপিত করিয়া অধ্যাপনা করিতেন—কিন্তু আজ কাল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত স্থান বলিয়া স্থানটী বদমায়েসদিগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে ও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় জনৈক ফিরিঙ্গি মুর্দ্দাফরাস মন্দিরের ভিতর বসিয়া কফিন প্রস্তুত করে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। মন্দিরের সম্মুখেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিস্তর জনতা হইত। তুমুল বাদ্যোদ্যোম ও সমবেত যাত্রীগণের কলরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিত। দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে ব্যবসায়ীগণ আসিয়া উৎসব-ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিত।

মন্দিরটী দেখিলে উহার নির্ম্মাতাগণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার নির্ম্মাণকৌশল এতই সুন্দর যে দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে প্রচণ্ড বলশালী ঝটিকার বেগ অপ্রতিহতভাবে সহ্য করিবার জন্যই যেন ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার ছাদ এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে বৃষ্টির জল তিলার্দ্ধের জন্যও তাহার উপর দাঁড়াইতে পারে না। বোধ হয় এই কারণেই ইহা এতকাল ধরিয়া বিনা সংস্কারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরটীর পশ্চাদ্ভাগে 'নন্দদুলাল' নামে এক অতি বৃহৎ সরোবর বিরাজিত। মন্দিরটীর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খনন করা হয়—এই সরোবরও নানাপ্রকার জলজ শৈবালে আজ কাল পরিপূর্ণ। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল এতই ভয়ানক যে দিবসেও কেহ ইহার নিকট যাইতে সাহসী হয় না। ইহার জলকর প্রায় ১০ বিঘা হইবে। মন্দিরটীর উত্তরাংশের দেউলের প্রায় অর্দ্ধেক এই সরোবরে প্রোথিত রহিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে স্থানের একখানি ইষ্টকও স্থানচ্যুত হয় নাই। বিগত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহাঁর কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

ইহার কারুকার্য্যও অতি সুন্দর। মন্দিরের গাত্রে নানা প্রকার লতা পুষ্প ও দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা আছে। সেগুলি এত সুন্দর যে দেখিলে প্রকৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাহাদের বর্ণ এখনও এত উজ্জ্বল যে দেখিলে বোধ হয় যেন দুই চারি দিন পূর্ব্বে কোনও নিপুণ চিত্রকর তাহাদের উপর নূতন করিয়া রং ফলাইয়াছে।

মন্দিরটীর গঠন বাঙ্গালাদেশের সাধারণ মন্দিরের গঠন হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই শত হাত ও প্রস্থে প্রায় চল্লিশ হাত হইবে। প্রায় তিন হাত উচ্চ একটী ভিত্তির উপর মন্দিরটী স্থাপিত রহিয়াছে। ইহাতে কড়িকাঠ বা বরগার সম্পর্ক নাই। এতাদৃশ বৃহৎ মন্দিরের ছাদ একটী খিলানের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ; ঈদৃশ বৃহৎ

খিলান তৎকালীন রাজমিস্ত্রীর দ্বারা যে কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

মন্দিরের অভ্যন্তরে যে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার নাম নন্দদুলাল। এইরূপ কিম্বদন্তী যে তিনি মৃত্তিকার গর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। বিগ্রহটী এক্ষণে আর নাই।

মন্দিরটীর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই এক উদাসভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে স্থানে পূর্ব্বে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল অদ্য সেই স্থান সর্পজাতির আবাসভূমি হইয়াছে। দিবসেও কেহ উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। সায়াহ্নে মধুর মঙ্গল আরতির পরিবর্ত্তে আজকাল তথায় আরণ্য কপোতের হৃদয়ভেদী কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে স্থান ব্রহ্মাণ কণ্ঠনিসৃত স্তোত্র মুখরিত ছিল অধুনা তথায় বায়স কুলের কর্কশ রব কর্ণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। মন্দির প্রাঙ্গন, যথায় পূর্ব্বে এককোঁটা সিন্দুর পড়িলে কুড়াইয়া লইতে পারা যাইত তথায়, আজকাল বিজন অরণ্যসমাকুল হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানটী এতই নিস্তব্ধ যে তথায় উপনীত হইবামাত্র অতি লঘুচেতা ব্যক্তিগনের মনেও এক উদারভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব-গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এই ভগ্নস্তুপের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ইহার স্থাপয়িতার বিগত সম্পদের কথা যখন স্মরণ হয় তখন মানুষের জীবন ও তাহার কীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গুরতা জীবন্ত অক্ষরে হৃদয়ে প্রতিপন্ন হয়।

এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত এই মন্দির সম্বন্ধে চন্দননগরের গবর্ণর সাহেব Monsieu Bernard Chevalier de la Legiond Honneurএর সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি এই মন্দিরটী দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার পত্নী স্বহস্তে ইহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া তাহা ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিয়াছেন। Governor বাহাদুর বলিলেন যে তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু ঈদৃশ chaste style of architecture কুত্রাপি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন ইহার জীর্ণ সংস্কার বিষয়ে তিনি মনোযোগ করিবেন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

পত্র।

বনক্ষেত্র। শিমলাশৈল,
শনিবার ১৮৯৮।

সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব,
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে,
গ্রহ তারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে ;
হাঁকায়ে দুচারি জোড়া
তাজা পক্ষিরাজ ঘোড়া,
কলপনা গগন-ভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশ কাল যায় লঙ্ঘি
কোথা পড়ে থাকে এ মেদিনী ?
সেই তুমি ব্যোমচারী,
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে,
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতিহীন মর্ত্ত্যবাসী জনে !
ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ
দূরবীণ ভ্রষ্টলক্ষ্য
কোথা হতে কোথায় পতন !
ত্যজি দীপ্ত ছায়া পথে
পড়িয়াছ কায়া-পথে,
মেদ মাংস মজ্জা নিকেতন !
বিধি বড় অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে !—
তবুত ক্ষণেক তরে
ধূলিময় খেলা ঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে !

তুমি অদ্য কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে
দু'বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূম্রোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম,
পরিপূর্ণ ভাব ভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা দেবী চেপেছেন বক্ষে,
সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম,
কিছুতে রবে না আর রক্ষে !
নাহি গান নাহি বাঁশী,
দিন রাত্রি শুধু কাশী,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের
বহে গেল সর্দ্দির প্রবাহে !
অতএব নমো নম
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দোরণে,
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বল পারিবে তোমাসনে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অস্ত্রের জন্মকথা।*

সভাসদ্ ও অমাত্যপরিবৃত সভামধ্যে রাজা জনমেজয় সম্মুখোপবিষ্ট মহর্ষি বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পুরুষোত্তম! ইহসংসারে কিরূপে এবং কোন্ সময়ে অধুনাপ্রচলিত অস্ত্রসমূহের প্রথম উৎপত্তি হয় তাহা আমাকে সবিস্তারে বলুন ; আমি শুনিবার [illegible] বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে জনমেজয়! অস্ত্রের জন্মকথা শুনিতে তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম। হে রাজন্! আজ পর্য্যন্ত অস্ত্রের এই জন্মকথা পৃথিবীতে অপরিজ্ঞাত আছে ; আমি অতি গোপনে ব্যাসদেব প্রমুখাৎ ইহা বহুকাল পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম ; তাঁহার আদেশ ছিল, উপযুক্ত কালে যেন আমি এই নিগূঢ় তথ্যপূর্ণ কথা সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে ইহজগতে প্রকাশ করি। ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে এই অস্ত্রকথা প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়,—আমি তোমাকে সেই অদ্ভুত বিস্ময়পূর্ণ অস্ত্রের জন্মকথা বলিতেছি, তুমি ধীরচিত্তে শ্রবণ কর।

জনমেজয়! জগতে অস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী ও বলশালী। এই অস্ত্র রাজার রাজ্য ও মান এবং প্রজাবৃন্দের ধন ও প্রাণ রক্ষা করে ; দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে। অস্ত্রবলে রাজ্যতাড়িত, লাঞ্ছিত, দীনহীন ব্যক্তিও পুনঃ রাজ্যলাভ করে ; ভিখারী সময়ে রত্নসিংহাসনের অধিকারী হয়। এ সংসারে অস্ত্রই বীরের একমাত্র সহায়। অস্ত্রযুক্ত থাকিলে অতি ভীরু অন্তঃকরণেও সাহস সঞ্চার হয়। অস্ত্রচর্চ্চার অভাবে রাজ্য বিশৃঙ্খল এবং প্রজা বিপদসঙ্কুল হয়। দেখ,

* নবপ্রকাশিত মহাভারতের একাধ্যায়।

অস্ত্রপ্রভাবে পাশ্চাত্য জাতি অধুনা কিরূপ বলবিক্রমশালী ও গৌরবান্বিত। একমাত্র অস্ত্রসহায়ে ইংরাজজাতি আজ মেদিনীর অধিপতি, কত কোটী কোটী নর তাহাদের দাসত্ব করিতেছে। ত্রিশ বৎসরের জাতি ক্ষুদ্রকায় জাপানী আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান বলিয়া এক পাশ্চাত্য মহাজাতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান; প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতেছে। আর দেখ, অস্ত্রচর্য্যার অভাবে দেবগণের পরম প্রিয় স্থান, ধনবীর্য্যসম্পদে গরীয়ান্ ভারতবর্ষের আজ কি দুর্দ্দশা!

হে মহারাজ! সৃষ্টির পুরাকালে—যে সময় মানবজাতি পূর্ণ অসভ্য অবস্থায় বর্ত্তমান, বল্কল যখন তাঁহাদের পরিধেয়, ফলমূল যখন আহার্য্য, পর্ণকুটীর যখন বাসগৃহ—সেই অতীতের দিনে অস্ত্র বলিয়া কোন দ্রব্য মানবসমাজে প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে তাহার উৎপত্তি হয়।

জনমেজয় কহিলেন—হে মহর্ষে! পুরাকালে কোন প্রকার অস্ত্র ছিল না শুনিয়া সংশয়ান্বিত হইতেছি। মানবগণ একত্র হইলে পরস্পরের মধ্যে যেমন সদ্ভাব হইয়া থাকে আবার তেমনই বিবাদ বিসম্বাদও হয়। হে দেব! সেকালে পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিলে কি উপায়ে তাহার মীমাংসা হইত?—আমরা ত দেখি, অনেক কলহ বিনা অস্ত্রঝঙ্কারে নিষ্পত্তি হয় না। আধুনিক নরপতিদিগের ন্যায় স্বাধিকারভুক্ত ভূমি, শস্য, ফল লইয়া বিবাদ হইলে তাহার নিরাকরণ তাঁহারা কি ভাবে করিতেন?—আর অস্ত্র অভাবে হিংস্র পশ্বাদির কবল হইতেই বা কিরূপে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ভাবে অস্ত্রহীন হইয়া জীবনযাপন করিতেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না;—আপনি আমার সংশয় দুর করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে নরপতি! অতি প্রাচীনকালে অস্ত্র

নামে কোন বিশেষ দ্রব্য পৃথিবীতে ছিল না, কিন্তু কালক্রমে, কার্য্যানুরোধে আবশ্যকানুযায়ী হস্ত, পদ, দশন প্রভৃতি অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। এই দৈহিক অঙ্গগুলি হইতেই জগতে সর্ব্ব অস্ত্রের উদ্ভব হয়। সে অপূর্ব্ব রহস্য তোমাকে বিশদ ভাবে বিবৃত করিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

মানবের মনের অভ্যন্তরে এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার সাহায্যে বাহ্যিক ব্যবহার হইতে মানুষ হর্ষ দুঃখ প্রভৃতি ভাব টানিয়া লয়। এই বৃত্তি শান্ত বা নম্র ব্যবহারে হর্ষাদিতে বিগলিত হয় এবং রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এই বৃত্তি কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে মানুষের মন চঞ্চল হয় এবং মনশ্চাঞ্চল্যের ফলে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও চঞ্চল হয়। ইহা আর তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে হইবে না,—তুমি শত সহস্রবার দেখিয়াছ মনে আনন্দের আবেগে মানুষ অনেক সময় নৃত্য করে; ক্রোধাবিষ্ট হইলে কম্পিতকলেবর হয়, বিকট অঙ্গভঙ্গী করে; ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার অনেক চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পায়। হে জনমেজয়! ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কেবল মানসিক চাঞ্চল্য বাহিরের অঙ্গে আসিয়া বিকাশ পায়। তোমাকে বোধ হয় বলিবার আবশ্যক নাই যে বিবাদ, যুদ্ধ, মারা-মারি প্রভৃতির মূলে কোন না কোনরূপ মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ বিদ্যমান থাকে। পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গত বা অন্যায় ব্যবহার না থাকিলে কখন বিবাদ হইতে পারে না। মানুষ যখন এইরূপ কোন একটি অসঙ্গত আচরণ অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় তখন তাহার সেই মানসিক বৃত্তিটা জাগিয়া উঠে। সেই বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় এবং নিজের উগ্রমূর্ত্তি লইয়া মানুষের অঙ্গে আসিয়া প্রকাশ পায়। দৈহিক অবয়বগুলিও এইরূপে উত্ত্যক্ত হইলে সম্মুখে যাহাকে পায় তাহার উপরই অত্যাচার করে। এই ভাবে পৃথিবীতে মানবের অজ্ঞাতসারে আপনা

আপনি মারামারি নামক দৈত্যটা আবির্ভূত হয়। এখন বুঝিতেছ, মারা-মারি যুদ্ধ বা অস্ত্রের আবশ্যকতা কেবল ঐ মানসিক চাঞ্চল্য শীতল করিবার জন্য; এবং সেই পন্থা কিরূপ স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়াছিল। প্রথমে অবশ্য মানুষ জানিত না যে অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে হস্ত পদের ব্যবহার করিতে হয়,—কিন্তু প্রতিশোধের স্বভাবোদ্রিক্ত প্রণালী দেখিয়া তাহারা সেইটাকে সময়ে ব্যবহারগত করিয়া লয়। তখন মারা-মারিতে হস্তদ্বারা মুষ্ট্যাঘাত, পদ-দ্বারা পদাঘাত, দশন দ্বারা দংশনাদি করিয়াই যুদ্ধের বিজয় গর্ব্বে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। হে মহারাজ! আদিম ও অসভ্য অবস্থায় যাবতীয় স্বাভাবিক উপকরণই মানুষের ব্যবহার্য্য ছিল, তখন অন্য যুদ্ধোপকরণ আর কোথা!

জনমেজয় বলিলেন,—হে বৈশম্পায়ন! এখন বুঝিলাম হস্তপদ প্রভৃতি অবয়বগুলি কিরূপে অস্ত্রভাব ধারণ করিয়াছিল। অস্ত্রের বিবরণ শ্রবণে আমার বড়ই আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে আপনি তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে আর্য্য! আমি বলিয়াছি অবয়ব চালন হইতেই জগতে যাবতীয় অস্ত্রের উৎপত্তি—এখন মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, তোমায় বিবৃত করিতেছি।

একমাত্র হস্তপদাদিরূপ যুদ্ধোপকরণের ব্যবহার কিছুকাল চলিল। ক্রমে দেখা গেল হস্তাদির দ্বারা এবম্প্রকার যুদ্ধ সমীচীন নয়, যে হেতু তাহা বিশেষ অসুবিধাজনক; এ উপায়ে অনেকের বিরুদ্ধে একজন দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, অধিকন্তু তাঁহাকেই বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়; বাহুযুদ্ধে পরতাড়নায় স্বীয় অঙ্গই বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হয় বরঞ্চ অপরকে গুরুতর ভাবে মনোক্ষোভ মিটাইয়া প্রহার করা যায় না;—এবম্প্রকার নানাবিধ গোলযোগ ও অসুবিধা বাহুযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মনুষ্যজাতি আলোচনা

করিয়া বুঝিলেন যুদ্ধ-মারা-মারির জন্য অন্যবিধ উপায় উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক। অতঃপর সকলেই সে বিষয়ে মনোযোগ করিলেন।

হে জনমেজয়! প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জনয়িতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনেক গবেষণা ও চিন্তাদ্বারা ধার্য্য করিলেন যে হস্তপদাদির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অপর কোনও প্রাকৃতিক দ্রব্য দ্বারাও অস্ত্রের কার্য্য চলিবে, যে হেতু হস্তপদাদির দ্বারা যখন এ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তখন সেইরূপ সুগোল, দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট অপর কোন দ্রব্য দ্বারা তাহা হইবে না কেন? অল্পদিনের মধ্যেই মানবের লোলুপদৃষ্টি সহজলব্ধ প্রকাণ্ড তরুশ্রেণীর উপর পতিত হইল। তাঁহারা মিলাইয়া দেখিলেন মানুষের হস্ত পদ ও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা প্রায় একরূপেই গঠিত,—তেমনই সুগোল, তেমনি দীর্ঘাকৃতি! সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন;—ভাল ভাল বাছাই করিয়া এই বৃক্ষশাখা চারিদিক হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কোথাও মারা-মারি বাধিলে বড় বড় বৃক্ষশাখায় সজ্জিত হইয়া দুই পক্ষ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—চারিদিকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। বাহুযুদ্ধের অনেক কষ্ট দূর হইল;—সকলেই ভাবিলেন, ঠিক হইয়াছে!—আমরা উপযুক্ত অস্ত্র পাইয়াছি! হে জনমেজয়! দেখ, কিরূপে হস্তাদি হইতে প্রথম কৃত্রিম অস্ত্রের উৎপত্তি হইল।

মানুষের সৌখীনতা তাহাকে অধিক দিন বৃক্ষশাখার পক্ষপাতী থাকিতে দিল না;—বৃক্ষশাখা কি কুৎসিৎ! কি অসরল! পরে দেখা গেল, বৃক্ষশাখা হইতে বংশ দণ্ড অধিকতর কার্য্যোপযোগী, যে হেতু ইহা সরল ও সবল। তখন সকলেই বৃক্ষশাখা ফেলিয়া বংশদণ্ডের উদ্দেশে ছুটিলেন।—এই হইল যষ্টির উৎপত্তি।

সরল বংশদণ্ড প্রয়োজন মত কাটিয়া, নানা উপায় অবলম্বনে সবলতর করিয়া তুলিলে তাহা জগতে যষ্টি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইল। এই যষ্টি বা লাঠি পুঙ্গবের উদ্ভবে জগতে মহোপকার সাধিত হইয়াছিল।—

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার কল্যাণে আপনাদিগকে বিশেষ বলশালী জ্ঞান করিতেন।

হে নররাজ! অস্ত্রের আদিপুরুষ লাঠির গৌরবে এককালে মেদিনী গৌরবান্বিত ছিলেন। দেখ, কত কাল চলিয়া গিয়াছে, কত দ্রব্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে, কত দ্রব্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে—তত্রাচ লাঠির এখনও ধ্বংশ সাধন হয় নাই। অল্প হউক, বিস্তর হউক এখনও তাহার যথেষ্ট আধিপত্য রহিয়াছে। এখন, ভারতবর্ষে রাজার আজ্ঞায় নেটিভ্গণের অস্ত্র ব্যবহারে অধিকার নাই; কিন্তু গৌরাঙ্গগণ কর্ত্তৃক অনেক লাঞ্ছিত নেটিভ্ এই একমাত্র লাঠির সাহায্যে অনেক মনোক্ষোভ মিটাইতেছে। কিন্তু অধুনা এ অস্ত্রদেবের ততদূর আদর নাই সেই জন্য তাহার প্রশংসা আর আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে না। তত্রাচ আমি বলি ইহার গুণ অনুপম—এক মুখে শেষ করা যায় না। এক সময় বাঙ্গালাদেশ ইহার ব্যবহারে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বড় বড় বাঙ্গালী লাঠিয়ালের লাঠির জোরে অনেক কাজ হইয়াছে। এই লাঠির কৃপায় এক এক মহাপুরুষ জগতে বীরখ্যাতি লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সহজপ্রাপ্য অস্ত্রের আদর মানব একেবারে ভুলিয়াছে! হে রাজন্, যে পুরাকালে আমাদের ধন মান প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, যে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে চির-কাল সঙ্গের সাথী তাহার প্রতি এ অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য কি মানুষের শোভা পায়? বঙ্গদেশের এক কৃতী সন্তান—একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার এক অমূল্য পুস্তকে এই লাঠির গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তুমি সময়ান্তরে পাঠ করিও, বিপুল আনন্দ লাভ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন,—মানব অকৃতজ্ঞ ও নরাধম! অস্ত্রের আদি পুরুষ লাঠির প্রতি মানুষের তাচ্ছিল্য ভাব আমায় মর্ম্মাহত করিতেছে; ব্রহ্মার অভিশম্পাতে তাহারা ইহার ফলভোগ করুক! হে মহর্ষে! এখন বলুন, হস্তপদ, বৃক্ষশাখা ও লাঠিকে আপনি অস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন কেন? অধুনা ঐ গুলিকে অস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত করিলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কেননা, ইদানীং যে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক বিপুল ক্ষমতাশালী অস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সমক্ষে ও গুলি অতি তুচ্ছ, হীনাদপি হীন!

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! আমাকে বাতুল ভাবিও না। আজকালকার তর্জ্জন গর্জ্জনশালী নানাবিধ অস্ত্র বর্ত্তমানে আমি ঐ সামান্য পদার্থগুলিকেও অস্ত্র নাম দিতে সাহস পাইয়াছি, তাহার কারণ আছে। যাহা ক্ষেপণ করা যায় তাহাই অস্ত্র। অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস্ত্রং। তবে ওগুলিকে অস্ত্র বলিব না কেন? হে নররাজ! লাঠির গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছ, এখন অস্ত্রের ক্রমবিকাশের কথা অবধান কর। দেখ, এই লাঠি হইতেই অন্যান্য অস্ত্রের বিকাশ। বহুকাল পর্য্যন্ত এই লাঠির অমোঘ শক্তির গর্ব্ব দিগ্বিদিকে প্রচার ছিল, এমন স্থান প্রায় ছিল না যথায় উহা অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালের স্রোতে ও মানবের প্রয়োজনবিধায় অনেক দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়। লাঠির শক্তি কতকটা সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেই থাকে; কালে সেই সীমার গণ্ডী বড় করিয়া তুলিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। কালের কুটিলতায় মানুষও কুটিল হইয়া উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহে কুটিলতা প্রবেশ করিল, মানব নিজেকে রক্ষা করিয়া, ফাঁকি দিয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল—দূর হইতেই শত্রুর উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা মাথায় ঘুরিতে থাকিল!

হস্তদ্বারা দ্রব্যাদি উত্তোলন, প্রস্তর প্রক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য লক্ষ্য করিয়া মানুষের জ্ঞান হইয়াছিল যে "আকর্ষণের" মধ্যে একটা মহতী শক্তি রহিয়াছে,—একটা জিনিসকে যত দূরে ফেলিবার দরকার হাত-

টাকে তত জোরে আকর্ষণ করিতে হয়। এই আকর্ষণী শক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য মানুষ লুব্ধ হইয়া উঠিল। এবং তাহাদের যত্নে ও চেষ্টায় ক্রমে সেই শক্তি লাঠির স্কন্ধে আসিয়া চাপিল—ভারাক্রান্ত লাঠি বক্রভাব ধারণ করিল।—এই হইল ধনুর উৎপত্তি।

হে জনমেজয়! এই গেল কতক লোকের কথা। একটা বিষয় লইয়া বিশ্বশুদ্ধ লোক যখন মাথা ঘামায় তখন তাহার নিষ্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাথায় ভিন্নভাবে গজাইয়া উঠে। ‘একদল যখন “আকর্ষণী-শক্তি”টাকে সরল বংশদণ্ডের কাঁধে চাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আর এক দিকে, আর এক দল সরলদণ্ডের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহারই একটা নূতন সংস্করণ ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। বংশ-দণ্ডের ভঙ্গ-প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহারা একেবারে ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন অনেক মহাপুরুষ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া, আকাশে চড়িয়া বিশ্বস্রষ্টা কোথায় কি গুপ্তধন রাখিয়াছেন তাহা বাহির করিবার জন্য বিশ্বখানা ওলট পালট করিতেছিলেন। সবে মাত্র তাঁহাদের নবপ্রাপ্ত গুপ্তধন “লৌহ” লইয়া নাড়া চাড়া হইতেছে এমন সময় অস্ত্রসংস্কারকদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তাঁহারা লৌহ পরীক্ষা করিয়া তাহাই মঞ্জুর করিলেন। সরল বংশদণ্ড বেচারা এইভাবে নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইলে, তাহারই ভীম ভাই কঠিনধাতুপুষ্ট অঙ্গ লইয়া তাহার স্থানে শোভা পাইতে লাগিলেন। সরল বংশদণ্ডের হাতে যাঁহারা এতদিন প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, ভীম লৌহদণ্ডের কাছে তাঁহাদের একেবারে স্বর্গ প্রয়ানের ব্যবস্থা হইল।

পৃথিবীতে যখন যে জিনিসটা নূতন দেখা দেয়, তার প্রতিপত্তি বড় বেশী হইয়া উঠে।

হে জনমেজয়! মানুষ যখন কোন একটা নূতন লইয়া মাতে

তখন সে কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। সে যতই কেন করুক না, তার করিবার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। লৌহকে সংসারে একটা ছোট-খাট প্রতিপত্তি দিয়াও মানুষ ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। পিটিয়া ছাঁটিয়া তাহাকে নানা ভাবে দাঁড় করাইলেন। পীড়নের উপর পীড়ন খাইতে খাইতে সুগোল লৌহদণ্ড একেবারে সূক্ষ্ম পাত হইয়া গেল; সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন এই নবোদ্ভূত দ্রব্যে এক অভূতপূর্ব্ব বিষয় সাধন হয়—এই হইল তরবারি।

হে নরপতি! যে উপায়ে এই তরবারি নির্ম্মিত হইল তাহাই অনুসরণ করিয়া অনেকে অনেক প্রকার লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার নাম তোমায় আর কি বলিব? মহাভারতে সবিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে শুনিয়াছ।

সুগোল লৌহদণ্ড পিটিয়া অস্থিমাংসহীন করিয়া যে যে অস্ত্র পাইলেন, মানব তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। লৌহটাকে আবার নূতন উদ্যমে ঘাঁটিতে লাগিলেন। একটা লৌহদণ্ডকে যতটা সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে, এখন দেখা যাউক এটা স্থূলতর করিয়া আমরা কি পাই। এই আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সমস্ত শক্তি ও অধ্যবসায় লৌহদণ্ডের শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য লাগিয়া গেল। একবার তাহাকে অস্থিমাংসহীন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন ইহা যেন তাহারই প্রতিকার।

লৌহদণ্ডকে পুষ্ট হইতে ক্রমশঃ পুষ্টতর করা হইতে লাগিল। এই স্থূলকায় বিশাল হৃষ্ট পুষ্ট লৌহদণ্ড মনুষ্যসমাজে কোন্ অস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত জান কি?—ইহা হইতেই শতঘ্নী কামান ও বন্দুকের সৃষ্টি!

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করিয়া এই অস্ত্র সৃষ্টি হয়। এই অস্ত্র আধুনিক সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তাহা তুমি জান। হে রাজন্! এখন বুঝিতেছ. এক অস্ত্র হইতে সর্ব্ব অস্ত্রের উৎপত্তি।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বহু প্রকার অস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছি, এখন আর তাহা বলিব না। ঐ যুদ্ধকালে অস্ত্রের এক প্রকার পূর্ণাঙ্গতা লাভ হইয়াছিল। যাবতীয় অস্ত্র প্রথম ভারতবর্ষেই সৃষ্টি হয়; ক্রমশঃ চীন প্রভৃতি নানা জাতি, এই ভারতবর্ষ হইতে যাবতীয় অস্ত্র ও তাহাদের নির্ম্মাণকৌশল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের নিকট হইতে প্রথমে পাশ্চাত্য জাতি এই সমস্ত প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে এবং কেমন ভাবে তাহা সময়ান্তরে বলিব।

হে নররাজ! এই অস্ত্রের জন্মকথা যিনি সোৎসুকে ও সাগ্রহে নিত্য শ্রবণ করেন তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস হয়—যিনি ইহার অবহেলা করেন তাঁহার পাপের সীমা নাই। তুমি অস্ত্রের সৃষ্টি কথা ও তাহার উদ্ভাবক মহাপুরুষগণকে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ কর।

স্বস্তি বচন।*

নয় কাশী বারাণসী, নয় বৃন্দাবন,
এবার বৃটনভূমি বিলাতী নন্দন।
তাড়া তাড়ি দিয়ে পাড়ি বড় চট্‌পট্,
বাঙ্গালি মুল্লুক ছাড়ি দাওহে চম্পট্।
পত্রারম্ভে তাই
মিষ্টান্নের সঙ্গে দুটো স্বস্তি বলা চাই।
প্রদ্যোৎ তোমার দ্যুতি সপ্ত সিন্ধু পারে
উঠুক উজ্জলতর উদয় শিখরে।
স্বয়ং জলধিনাথ † সহায় যাহার,
অপার সমুদ্র মাঝে কি ভয় তাহার!
দক্ষিণে নলিনীকান্ত † নিজে দিনমণি,
বামেতে গগণচন্দ্র † পীযূষের খণি
সম্মুখে পুণ্ডরীকাক্ষে † রাখিয়া সদাই,
বিদ্যুতের বেগে চল কিছু ভয় নাই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমারের বিলাত যাত্রা উপলক্ষে রচিত।

† সহযাত্রিক আত্মীয়গণ।

কণিকা।

শুধু সঞ্চয় করা সুগৃহিণীর একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর ঘরে অপচয়ও অনেক ঘটে। অতিথি প্রত্যহ আসে না কিন্তু সেই প্রত্যাশায় তিনি প্রতিদিনই কত আয়োজন করে রাখেন।

গৃহিণী যদি বিধবা হ'ন তবে শুধু তাঁর নিরামিষের ব্যবস্থা করিলে চলেনা, আমিষের ব্যবস্থা তাঁকেই করিতে হয়, একাদশীর দিনেও তাঁর ঘরে রান্না চড়ে।

দুঃখের দিনে দুঃখ করাতো বিদ্রোহ নয়, কিন্তু স্নেই দুঃখকে জীবনে জাগ্রত করে রাখিবার চেষ্টাই বিদ্রোহ।

মানুষ নিজের দোষে জীবনটা নষ্ট করে, যখন দুঃখে পড়ে তখন অদৃষ্টের দোষ দেয়; কিন্তু দৈবে যদি সুখ হয় তখন আত্মপ্রশংসা আর মুখে ধরে না।

চিত্র।

টাউন হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। সভাপতি আসীন।
বক্তার বক্তৃতা।

মহোদয়গণ, করুন শ্রবণ,
সভা এক মোরা করেছি গঠন ;
উদ্দেশ্য, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণ।
কারণ, কলির বাতাসে বেজায়,
পাছে ঋষিদের ধর্ম্ম উবে যায়,
কর্পূরের মত ! মোরা সেই ভয়ে,
কাঁপিতাম সদা দিশেহারা হয়ে ;
যথা কাঁপে বৃক্ষ বায়ুর গতিতে
সাঁ সাঁ করে ! এ বিষম বিপত্তিতে,
কিবা দশা হোত আমাদের, যদি
পূজনীয় প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ সভাপতি,
দিয়া পরামর্শ অতি সুগভীর,
আমাদের নাহি করিতেন স্থির !

পাঠ্যাবস্থা হোতে আমরা ছ'জন
ভাবিতাম সদা করি প্রাণপন
দেশের দুর্গতি। লাগিত না মন
কোন কাজে ; দুনিয়াটা অনুক্ষণ
বোধ হত ফাঁপা ফুটবল সম,
শুধু বায়ু ভরা। নিরেট দেখিয়া
না কিছু, হৃদয় উঠিত রুখিয়া

কখন কখন। কভু, মানবের
দুঃখ হেরি, উত্তাপেতে বরফের
মত, গলে যেত আমাদের মন।
এইরূপে গেল দিন অগণন।

একদিন মোরা বসি নদীতীরে,
খাইতেছি খাবি ঘোর চিন্তা নীরে,
হেন কালে যেন কাহার আহ্বান
পশিল শ্রবণে, শিহরিল প্রাণ;
দেখিলাম এক পুরুষ মহান্
দাঁড়াইয়া পাশে। শুভাশীষ দান,
করি শুধালেন চিন্তার কারণ;
কহিলাম মোরা সর্ব্ব বিবরণ।

বলিলেন তিনি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ,
স্বাধীনতা দ্বার না করিলে রুদ্ধ,
হিন্দুদের না হবে মঙ্গল। শিশি-
বদ্ধ কর্পূর মরিচ, দিবানিশি
থাকে নিরাপদে। তথা, লোকাচার-
বোতলেই, হিন্দুধর্ম্মের আগার।
বোতলের মধ্যে, ফেলে গঙ্গামাটি,
শাস্ত্র ছিপি দিয়ে মুখ দাও আঁটি;
এরূপেই এই ধর্ম্ম রবে খাঁটি।

ঘোর রজনীতে, রাতকানা পায়
যদি দিব্যদৃষ্টি, তার হৃদি তায়
যেমন নেচে ওঠে ফড়িঙের প্রায়

আহ্লাদেতে! সেইরূপ পুলকিত
হইলাম মোরা। হল কণ্টকিত
রোমগুলি, ঠিক সজারুর মত,
শুনি তাঁর কথা অমৃত সমান।
লুটালাম মাথা হয়ে ভক্তিমান্
চরণেতে; তাঁরে করিয়া বরণ
গুরুপদে, মিলি মোরা ছয় জন
করিলাম এই সভা। সভ্যদল
বাড়িতেছে ক্রমে, যথা বাড়ে জল
জলের সংযোগে। সে দিন আসিবে,
যবে সকলে এ সভাকে মানিবে।

শুনিলেন সবে মহাশয়গণ,
যেরূপে হয়েছে সভার স্থাপন।
কালটা পড়েছে বিষম এমন,
কেহ নাহি করে মস্তিষ্ক চালন।
ইউরোপের কথায়, সর্ব্বজন
করে ওঠ্‌বোস্‌, কাণটি ধরিয়ে
হাতে; যদি সে উঠে চীৎকারিয়ে,
"কাণ নিয়ে গেল কাকে," আহাম্মাক
সব, অমনি ছোটে যথা যায় কাক।
য়ুরোপের মত করুন শ্রবণ,
জাতিভেদ হয় করিয়া যেমন।
"পিতৃদের গুণ সন্তানে বর্ত্তায়,"
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণত্ব পায়।

মূষিকের বাচ্ছা সিংহ কভু নয়,
শূদ্র পুত্র কভু ব্রাহ্মণ না হয়।
ব্রাহ্মণ হিন্দুর মাথা, শাস্ত্রে বলে ;
লোকে মাথার রক্ত খারাপ হোলে,
যেমন পাগল হয়,—হিন্দুদেরো,
জাতিভেদ বিনা সেইরূপ গেরো !

ইউরোপে জাতিভেদ নাই বোলে,
কার্য্যের বিভাগ না জানে সকলে।
যার যাহা ইচ্ছা করে সেই কাজ,
এইজন্য সেথা নাই লোক লাজ।
মুচির ছেলে সেখানে রাজ্য পায়,
রাজার ছেলে সেথা নৌকা চালায়।
ধোপা নাপিত মুচি সেখানে নাই,
নিজের কাজ নিজে করে সবাই।
এইরূপে নীচুকাজ করে বোলে,
ধর্ম্মহীন হয় তাহারা সকলে।
সদা ব্যস্ত থাকে আপনাকে নিয়ে,
পর সুখ দুখ না দেখে চাহিয়ে।
তাই তারা হয় বড় স্বার্থপর,
বাহ্য চাকচিক্যে মত্ত নিরন্তর।

অতএব জাতিভেদ উঠিলে কলে,
ভারত ডুবিবে সাগরের জলে।
ব্রাহ্মণের পাদুক জল খাইবে
না কেহ, দক্ষিণা মারা যাইবে।

রিক্ত হস্ত ব্রাহ্মণকে খেতে হবে
ব্রাহ্মণীর ঝাঁটা ; ধর্ম্ম নাহি রবে।
কি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হবে,
জানিবেন সবে শিহরিবে প্রাণ !

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবার
বিয়ে নিয়ে ; লোকে, আজ কালকার
দিনে, এত গোলযোগ করে ; যেন,
ধরণীমাতা হারাইয়া জ্ঞান,—
তাদের কণ্ঠের ফুৎকারে, উড়ে
যানই বুঝি লক্ষ যোজন দূরে।

একথাটা অবিদিত নাই কারো,
স্ত্রীদিগের কূটবুদ্ধি আছে বড়ো।
আর, তারা পেঁচাও বুদ্ধির জোরে,
স্বামীদের রাখে এরকম কোরে,
তাঁরা ঘানিচক্রে ইঙ্গিতের
ফেরে ঘোরে অবিরত, বলদের মত।
এরওপোর দিলে তাদের শিক্ষা,
স্বামীবেচারারা নাহি পাবে রক্ষা ;
একজোট হোয়ে স্ত্রীলোক সকলে,
ফেলিবে ফাঁপরে পুরুষের দলে।
তাই বলে ইহা শাস্ত্রকারগণ,
স্ত্রীকর্ম্ম স্বামীর পদে তৈললেপন।
ইহার অধিক কিছু করিলেই,
স্ত্রীত্ব তাদের লোপ হইবেই।

লেখা পড়া তারা শিখিলেই কিন্তু,
হবে কিম্ভুত কিমাকার জন্তু।
এবারে আসিছে বিধবা বিবাহ কথা,
ইহা ঠিক সোণার পাথর বাটি যথা।
ভেবে দেখ বিধবার কি মহান ধর্ম্ম,
কেবল আচরয়ে তারা নিষ্কাম কর্ম্ম !
আপন ভুলিয়ে, পরহিতে লেগে থাকে,
যে রকমে রাখ, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।
তারা কাজ করে বেশী, আর অল্প খায়,
তাই সধবার চেয়ে, সুস্থদেহ হয়।
আর মোদের চেষ্টায় গৃহিণীরা ক্রমে
হইতেছে পতিব্রতা; তারা থাকে জমে,
জেঁাকের মতন, পতিদেবের চরণে।
পতিই সর্ব্বস্বধন; পতির বিহনে,
চক্ষে দেখে তারা, শুধু সরিষার ফুল।
পতিপুত্রের মঙ্গলে হইয়া আকুল,
কোন কাজে অপারগ। ইহার উপর,
কুটুম্বের যাতায়াত আছে নিরন্তর।
তা ভিন্ন আজ কালের দাসী ও চাকর
বড়ই দেমাকে, তারা কার্য্য ত্যাগ করে
কথায় কথায়। বিধবারা নাহি র'লে
এমন সঙ্কটে কেমনে কাজ চলে !

আমাদের পূজা আর্চ্চা যাহা কিছু হয়,
বিধবারা না থাকিলে হয়ে যাবে লয়।

পার্থক্য রবেনা কোন হিন্দুতে ও ম্লেচ্ছে,
সনাতন ধর্ম্ম সব হয়ে যাবে মিছে !
যে বিধবা বিবাহ এত অনিষ্ট আলয়,
সে বিধবা বিবাহ কি না দিলেই নয় ?
দেশেতে গরীব দুঃখী কত লোক আছে,
আর দুর্ভিক্ষ মড়ক ত লে[illegible]
কার্য্যের এ ক্ষেত্রগুলি কেহ নাহি চষে
খালি "বিধবার বিয়ে দাও" চেঁচায় কষে,
দেখি হস্ত পদ ত্বক জ্বলে যায় রোষে।

ভুলে গেছি এক কথা উৎসাহের চোটে;
কারণ দপ্ কোরে শোকাগ্নি জ্বলে ওঠে,
আর থাক হোয়ে যায় হৃদয়ের গিঁঠে।
দেশের দুর্দ্দশা হেরি স্মৃতি যায় মিটে,
সে কথাটা দরকারী, সকলে শুনুন,
এ দেশে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ।
বিধবাদের বিবাহ হইলে, এস্থলে,
বড় অবিচার হয় কুমারীর দলে।

সম্প্রতি একদল শৃগাল বৃত্তিধর,
ডাকৃছে ফেউ—
"স্ত্রীবাল্য বিবাহ অকল্যাণকর।"
যেন তাঁরাই হন সমাজের
বংশকল্পতরু,
আর পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন,
এক একটি প্রকাণ্ড গরু।

এ সোজা কথাটা তারা,
বোঝে নাক মোটে,
মেয়েরা পুরুষের চেয়ে,
শীঘ্র বেড়ে ওঠে ;

আর, দশ বছরের মেয়ে,
[illegible] বছরের যুবাকে,
চড়িয়ে আসে গোঠে।
সুতরাং তাদের মুখ চোখ কাণ,
ফুটিয়া ওঠেনি যবে,
শ্বশুর বাড়ীর শৃঙ্খলেতে টেনে,
বদ্ধ করতে হবে,
এ রকম করলেই তাদের
সুশিক্ষা দান হবে।
ইউরোপের লোকে এ কথাটা
জানে না বলেই,
সেখানে সংসারে কিছুমাত্র
সুখশান্তি নেই।

অতএব দেখুন সকলে চক্ষু চেয়ে,
কিবা ভয়ানক, কালো, বড় মেঘে ছে[illegible]
রহিয়াছে ভারত আকাশ! যদি বা[illegible]
পড়ে, সাবাড় কর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের ক[illegible]।
কিংবা যদি বৃষ্টি পড়ে জোরে, ভা[illegible]
লয়ে যাবে হিন্দুধর্ম্মে, কাঁপাইয়া [illegible]

সবাকার। অতএব থাকিতে সময়
হন সাবধান, মোর শেষ অনুনয়।
হলে এ সভার সভ্য, দুনিয়ার তত্ত্ব
জানিবেন সবে, কহিলাম খাঁটি সত্য।
(বক্তার উপবেশন।)

সভাপতি। বক্তা মহাশয়ের কথা অ[illegible]পাদের
পুলকেতে ভরে দেছে মন প্রাণ দেহ।
আর এতে আমার সন্দেহ নাই,
আপনাদের সকলের মতও তাই।

বিলাসিতা রাহু যবে দেশগ্রাস করে,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে কারু টনক না নড়ে!
এই সভ্যতার না অসভ্যতার, ফলে,
অভক্ষ্যে অপেয়ে ঘৃণা না করে সকলে।
নিরামিষ আহারেই সত্ত্বগুণ রয়,
একথাটা কলিকালে গূঢ়তত্ত্ব হয়।
এ জগৎটা কিছু না, মিথ্যা কারসাজী,
খালি ভেল্কি, অবিকল যেন ছায়াবাজী,
মুহূর্ত্ত মধ্যে, সবার নয়ন ঝাঁঝি
শূন্যেতে মিশায় যথা আতসবাজী।
জানে ইহা, ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে যার,
আত্মতত্ত্ব সারতত্ত্ব, সব মিছে আর।
আত্মা পরমাত্মার ছায়া, আত্মজ্ঞান
বিনা, লাভ নাহি হয় পরব্রহ্ম জ্ঞান।
এই হেতু শাস্ত্রেতে এ বাণীর উদ্ভব,
আত্মহিতার্থে ত্যাগ করিবে আর সব।

এতত্ব যে পর্য্যন্ত না চিনিতে পারিবে,
নিষ্কাম কর্ম্মের তত্ব অজ্ঞাত থাকিবে।
শঙ্করাচার্য্যের উক্তি জানত সবাই,
অহং ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু এজগতে নাই।
গীতাতেও সর্ব্বস্থলে আছে এই কথা,
বেদেতেও প্রতিসূত্রে আছে সেই প্রথা।
...র্ম্ম মানে, কামনাহীন কর্ম্ম,
না করিলে বুঝিতে নারিবে এর মর্ম্ম।
আতর যেমন শুধু গোলাপের সার,
ধর্ম্মশাস্ত্র বিনা কিছু সত্য নাহি আর।

অতএব, পৃথিবীতে কোন্ ধর্ম্ম আছে,
যাহা লাগে মহিমায় হিন্দুধর্ম্ম কাছে।
বুঝি ইহা ইউরোপ আমেরিকাবাসী,
অনেকে রেখেছে টিকি, থাকে উপবাসী।
কেহ লয়ে প্রচার দীক্ষা, নিরামিশাষী,
কেহ করে গঙ্গাস্নান, কেহ বা সন্ন্যাসী।
কেহ যায় যোগাভ্যাসে হিমালয় শিরে,
কেহ যায় হত্যা দিতে তারকমন্দিরে।
কেহ লেখে বই, ইহা প্রমান করি...
হিন্দুধর্ম্ম, এক সার ধর্ম্ম পৃথিবীতে...

যবে, ম্লেচ্ছেরা শিখিছে মোদের হিন্দুধর্ম্ম,
মোরা তাদের কিছু শিখি, বিষম কুকর্ম্ম।
আমরা কোন্ বিষয়ে, তাদের চেয়ে ছোট,
সেদিনো তারা বেড়াত বনে যথা মর্কট...
অতএব হিন্দুদের কোন্ অভাব আছে,
যে তারা হবে অবনত ম্লেচ্ছদের কাছে...

(জনৈক ইংরাজ শ্রোতার সভাপতির নিকট আগমন।)

সাহেব। Baboo, I say you are preaching sedition,
I will hand you o'er to police station.

সভাপতি। No no sir, আমি কিছু বলিনি seditious,
আমি preach কচ্ছিলাম religion precious,
তার witness এই সভাশুদ্ধ লোক,
জিজ্ঞেস করুন, সত্য বলবে যেহোক।

সাহেব। Policeman ... জল্‌দি ইহাঁ আও,
Arrest this man, থানামে লেজাও।

সভাপতি। হুজুর, আমাকে অনুগ্রহ হোক আজ,
আর কখনো করবোনা এমন কাজ।

সাহেব। টোমরা বর বজ্জাট্, worthless fellows,
টোমাদের উপযুক্ত সাজা কেবল gallows,
যে গৌরবশালী জাতি, অনুগ্রহ করে, টোমাদের সভ্য কর্‌ছে,
টোমাদের শাসনের জন্য, কট ডুর দেশ ... আসছে।
যাডের আসার আগে, টোমরা শান্টি নিরাপদে কর্‌নি,
রাজা ও ডাকাতের অট্যাচারে, টোমাদের সুনিদ্রা হয়নি।
টোমাদের দেশে, এট নরহট্যা হইট,
যে, ...র জল লাল হোয়ে Bay of Bengalএ ...
... আমাদের নাবিকেরা টা দেকে শিহরিট।
... দের দেশে যট শস্য হইট,
... শাসনকর্ট্টারা সব কেড়ে খাইট।

টোমরা বেঁচে থাকুটে খালি ঘাসের বিচি খেয়ে,
এ রকম করেই ডেশে মড়ক পড়ত ছেয়ে।
টোমাদের জেনানায় যট স্ত্রীলোক থাকিট,
সকলকে ঢরে নবাব হারেমে পুরে রাখিট।
যা কিছু দু একটা ছিল লুকিয়ে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে,—
এ রকমে টোমাদের [illegible] টা extinct হচ্ছিলই বোলে।
হেন সময়ে, যদি [illegible] আমাদের [illegible] পাটাট,
টা না হোলে টোমাদের শমন ভবনে যেটে হোট।
আগে, টোমরা স্বাধীনতা [illegible] না জানিট,
কথায় কথায় নবাব, টোমা[illegible] গর্দান নিট।
আর, মুসলমানেরা হিন্দুদে[illegible] থুথু দিট।
টোমরা পরস্পরকে, এমন কি [illegible] কেও, করে এট ঈর্ষা,
যডি টোমরা দেখে কারুকে টো[illegible] চেয়ে ফর্সা।
আর, টোমরা দেবটার কাছে, এই প্রার্থ[illegible] করে,
যাটে টোমাদের চেয়ে সব কালো হোয়ে প[illegible]

আর, টোম[illegible] দেখে কারো মাথা উঁচু,
টটক্ষন ম[illegible] নাহি পায় কিছু,
যটক্ষন না[illegible]র মাথা করে দিটে পারে নিচু।
টোমাদে[illegible]নে, দেক ইয়ুরোপের আলো,
কিছুটে [illegible]ড়ে তবু কুসংস্কার জঞ্জাল।
টোমা[illegible]র্ম্ম, ইটিহাস সাহিত্য সকল,
টোম[illegible]নেছ আমাদের পুস্তকে কেবল।
টোম[illegible] আছে, যাহা কিছু পুরাণ গৌরব,
আ[illegible]রই লোকেরা রক্ষা করিয়াছে সে সব।

টোমরা অকৃটজ্ঞ নরাধম এমন,
সে সব স্বীকার না কর কখন।
পুলিসের সঙ্গে থানা চল এক্ষন।

সভাপতি। ধর্ম্মাবতার, হাতজোড় করে বলছি আপনাকে,
এমন কখন করব না [illegible] কে।

সাহেব। আচ্ছা, হেবার দো[illegible]
যদি, এই কাগ[illegible]
ছজন witnessএর [illegible] করি[illegible]
মহা অন্যায়, আর [illegible] ছ
অনুটাপ অগ্নি য[illegible] রাপিট,
সেই দিনে, য[illegible] জন্মাগ্রে না হবে উ[illegible]
আর, বক্তৃ[illegible] দু বট্সরের মট।

সভাপতি। এই দিন [illegible] স্বাক্ষর,
এবা[illegible] দি ফেথ" [illegible] নিজ ঘর।

সাহেব। যা[illegible] স হইবে ধর্ম্মে[illegible]
হেব[illegible] ত পার্শ্বী হিন্দু মুসল[illegible]
[illegible] রাজার দ্বারে টান দা[illegible] পুলিসের প্রস্থান।)

[illegible] হয় যদি চীনের ক্যান্ট[illegible]
[illegible] কি শাসিতে চীনে গোরার [illegible]
[illegible] ধর্ম্ম বর্ণভেদ না করি বিচার

বক্তা। [illegible] কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার [illegible] ত ভাই।
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটী কে কাহারে বলিতেছে দাদা[illegible]
[illegible]রাজ জাতির ভাব,—ভু-পালের ভাব।
অমৃত সমান কথা শুনে হিন্দু দাস॥

এরা নিজ ছিদ্রগুলির দিকে অন্ধ হইয়ে,
খালি বের করে পর ছিদ্র খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে।
এসব বিষয়ে, আমি প্রবন্ধ লিখব মজবুৎ,
ভারত ও বিলাতের খবরের কাগজে বহুৎ।

১ম লোক। দেখ, ... দিচ্ছিল গাল,
... য়ে উঠ্‌ছিল উত্তাল।
ভাবলাম, তা... সঙ্গে ঝগড়া করি খুব জোরে;
নিরস্ত হলেম, ... বি, কেহ সাহায্য করবে না মোরে;
আর, আমায় টে... ন যাবে কয়েদখানার অন্ধকারে।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ লোক। দেখ, ... নিশ্চয় আমাদের সাহায্য পেতে,
যদি আমরা চা... , ঐ সাহেবের আফিসেতে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ লোক। এ ম... জবর...স্ত,
পুলিসেরা ...

৭ম লোক। সভাপতি...
তবে, স...

সভাপতি। আমিও...
কিন্তু, ...

তাহার কারণ; বঙ্গদেশে গ্রীষ্মের সময়,
বই হাতে করলেই হয় নিদ্রার উদয়;
আর, চিন্তাদেবী ধরা দিয়ে হন না সদয়
আর বরষার কালে,
দেখি ঘন মেঘজালে,
হৃদয় আমার স্থির নাহি...
খালি মেঘদূত শ্লোক ... হয়।

তাভিন্ন, ...দেশের ...
এখানে, ...াহা লোকের ...দা থাকাই ...
দেখ দেখি বিধাতা, কে... এমন,
আমার সংকল্প সিদ্ধ ...
তোমাদের কাছে ... ছিনু ছুটি দুইবার,
তোমরা ... না দিন একটি সভার।
বিধাত... লে আর!
আমার ... ানা কিছু
এ দু... উঁচু উঁচু।
ব... ,

... ভঙ্গ।
... প্রস্থান।)

প্রোক্লামেশন্।

বিনয়ে সুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে॥
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন।
[illegible] করান স্মরণ॥
[illegible] ছন রায়।
অ[illegible] বজায়॥
সেই [illegible]চনের প্রকৃত কি অর্থ।
হবে কি [illegible] কখন যথার্থ॥
মেনে ল'ব রা[illegible]ন করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কি[illegible]না প্রভেদ॥
বাজার গরম এ[illegible]ট।
কোরা কালো [illegible] -পাটে॥
করিয়া গোর[illegible]
হবে কি ক[illegible]
মিষ্টার ফ[illegible]
সত্য কি[illegible]
কেষ্টার[illegible]
হবে কি[illegible]
জিজ্ঞ[illegible]
ইং[illegible]

দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে বাড়া জাল।
তবু কি রপ্তানী বন্ধ হবে কভু চাল॥
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কত দিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট॥
কেবল পকেট নয় ই[illegible]
দোকানে কোকেন [illegible]
মরিলে কলুর কলু [illegible]
কলুনীর চুলো কিগো র[illegible] জ্বেলে॥
কখন দেবেনা হাত ধর্ম্মেতে [illegible]দার।
এ কেমন কথা শুনি মুখে [illegible]জার॥
অত্যাচার করিবেনা [illegible] অর্থ[illegible]।
জিজ্ঞাসিও সে ক[illegible] কি বেশী [illegible]॥
"ডিফেনডার [illegible]দি ফেথ" যা[illegible]ধি।
কোন লা[illegible]স হইবে ধর্ম্মেতে [illegible]॥
খৃষ্টানে[illegible]ত পার্শী হিন্দু মুসল্মা[illegible]
পাবে[illegible] রাজার দ্বারে টান দান [illegible]
ব্রহ্ম[illegible] হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে [illegible]
[illegible] কি শাসিতে চীনে গোরার প[illegible]
[illegible]তি ধর্ম্ম বর্ণভেদ না করি বিচার।
[illegible]বিস্তার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটী কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভু-পালের ভাষ।
অমৃত সমান কথা শুনে হিন্দু দাস॥

এ বর্ণের অর্থ কিগো নহে চতুর্বর্ণ।
যাদের পৈত্রিক সত্বে নাহি দিবে কর্ণ॥
"কাষ্ট ক্রিড্ কলারের" এই রূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে॥
[illegible] সভা-সভ্য [illegible] বালো ভাল করে'।
[illegible] কার্য্যে দেন ধরে'॥
[illegible] সেই ঘোষণায়।
[illegible] সমুদায়॥
তাৎপর্য্যটা [illegible] হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কা[illegible]ত হবনা আশ্চর্য্য॥
"রাইট [illegible] করে' চিৎকার।
মর্ম্মে ম[illegible] দা[illegible] ধিৎকার॥
হিন্দুর [illegible] রাজা দেব-শ[illegible]-ময়।
মারো [illegible] ভালবাসো তবু গ[illegible] জয়॥

শ্রীঅ[illegible]লাল বসু।

সাময়িক কথা।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাট বাহাদুরের মন্ত্রণা-সভার সদস্য মাননীয়

রায় নেহাল চাঁদ বাহাদুরের প্রস্তাব।

[illegible] রায় নে[illegible]চাঁদ বাহাদুর এতদ্দেশীয় ভিক্ষা-[illegible] ও সাধু স[illegible] ক্রান্ত একখানি [illegible]

রায় বাহাদুর বলেন, বিগত ১৯০[illegible] হয়, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ভিক্ষুকের সংখ্যা [illegible] উপরে, ইহারা প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন ক[illegible] আরও সহস্র সহস্র লোক, যাহাদের পেশা ভিক্ষা নহে তাহারাও রা[illegible] ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, এই লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ [illegible] লোক। ইহাদের দেহ বলিষ্ঠ, মুখে দুর্ব্বলতা বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কোন [illegible], ইহারা জোর করিয়া দাবী আদায় করিয়া লয়, এবং সময়ে সময়ে [illegible] ইতে [illegible] না।

বাজে ভিক্ষুকের কথা [illegible] লেও, [illegible]০ ল[illegible] ভিক্ষুকের অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য ন্যূন পক্ষে গড়ে [illegible] তিন টাকা মাসি[illegible] ধরিয়া লইলে ভারতবর্ষকে মাসে মাসে ইহাদের [illegible] টাকা ব্যয় কা[illegible]; রায় বাহাদুরের মতে এই টাকাটা বরং [illegible] লিয়া দেওয়াও ভাল, ত[illegible] সাধু ও ভিক্ষুকদিগকে দেওয়া ঠিক নহে, [illegible] ইহাদের দ্বারা জগতের অ[illegible] উৎপাদনের কোন সম্ভাবনাই নাই। [illegible] চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সর্ব্ব [illegible] ঘটাইয়া থাকে, [illegible] শান্তি[illegible] ইহাদের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকি[illegible]—সুতরাং এই সাধু ও ভিক্ষুকের [illegible] আর প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপেই [illegible], ইহাদের উপর [illegible] হয়, জাতীয় ক্ষতির হিসাবে তাহাই [illegible] নহে, এই [illegible] ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া—কোন হিতকর [illegible] অবলম্বন করিত, [illegible] দেশের কল্যান সাধিত হইত।

রায় বা[illegible] কল্প করিয়াছেন, এই সাধু ও ভিক্ষুকের [illegible] আইন করিবার [illegible] পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের সভায় প্রস্তাব [illegible] বেন। [illegible] এই প্রকার সাধু ও ভিক্ষুকের বৃত্তি হিন্দু বা [illegible] র্ম্মের

অনুমোদিত নহে। মনুর মতে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ অসিদ্ধ। যাঁহারা বিদ্যা বা ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেন, অথবা রুগ্ন বা অসমর্থ, মনু তাহাদিগকেই প্রকৃত দানের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহারা ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিরীহ গৃহস্থকে পীড়ন করে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে দণ্ডার্হ। বিশেষতঃ অজাতশ্মশ্রু বালকদের সাধু সাজিবার অধিকার কোন ধর্ম্মে নাই।

গবর্ণমেণ্ট [illegible] ক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু নিতান্ত [illegible] উদাসীন থাকিতে পারেন না। সতীদাহ, গঙ্গায় শিশুসন্ত[illegible] বয়সনির্দ্ধারণ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে [illegible] হইয়াছেন, এই সাধুগণের হস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করাও সেইরূপ প্রয়ো[illegible] হইয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর এতৎসম্বন্ধে [illegible] ও উর্দ্দু ভাষায় তিন শত পত্র ছাপাইয়া বন্ধু বান্ধব ও গন্য মান্য ব্যক্তিগণে[illegible] করিয়াছেন, তিনি এতৎসম্বন্ধে একখানি বড় পুস্তক রচনা করিয়াছেন[illegible] কাশিত হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। তিনি ছোটলাটের সভায় [illegible] বিল উপ[illegible]ত করিতে ইচ্ছুক।

১। ২১ বৎসরের [illegible] হ ভিক্ষাবৃত্তি অব[illegible]ন করিতে পারিবে না।

২। যদি কোন [illegible] অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়[illegible]লককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে ছাড়িয়া দেন, [illegible] তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন।

৩। এই দুই [illegible] প্রমাণিত হইলে ১০৲ টাকা [illegible] না হইবে।

৪। যদি কে[illegible]কের দলে এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক [illegible] থাকে এবং ইহা প্রমাণ হয় যে, সে[illegible]ত্র বালকের আইনসঙ্গত অভিভাবক [illegible] তবে তাহাকে সেই আশ্রয় হই[illegible] লইয়া কোন অনাথাশ্রমে রাখা হইবে।

৫। এই[illegible] বালকের শিক্ষা দীক্ষার জন্য স্থানে স্থানে [illegible] প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা [illegible] হইবে।

অযোধ্যা[illegible]জা স্যার প্রতাপ নারায়ণ বাহাদুর এই সংকল্প [illegible] অনেক সাধুবাদ [illegible] এবং আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া[illegible] সঙ্গত বা অন্যায়স[illegible] উপায়েই কোন গুরু চেলা সংগ্রহ করিবেন, তাঁহা[illegible] পাইতে হইবে [illegible] কোন ভিক্ষুক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা না করিতে পারে [illegible] আইন করা [illegible]

নেহালচাঁদ বাহাদুরের এই অভিপ্রায় সমর্থন করিয়া অযোধ্যার উপাধিপ্রাপ্ত রাজা বাহাদুর সার প্রতাপনারায়ণ রায়, শ্যামসুন্দর লাল বাহাদুর সি, আই, ই, মলভি মকসদ আলি খাঁ—ডিপুটি কলেক্টার, বাবু তুলসি রাম ডিপুটি কলেক্টার প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ও কর্ম্মচারীগণ পত্র লিখিয়াছেন—রায় নেহালচাঁদ বাহাদুর সেগুলি তাঁহার পুস্তিকায় ছাপিয়া দিয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে কি রায় বাহাদুরের এই প্রস্তা[illegible] এবং এ[illegible] সম্বন্ধে উদ্যোগাদি দেখিয়া আমরা কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিতে[illegible]স ভাল তাহারই ভেল থাকে,—ভারতের সাধুগণ জগতের পূজনীয়। [illegible]ত শত সাধুনামধারী অসাধুর মধ্যে একটী সাধু থাকে তবে তাহাই ত[illegible]াদের যথেষ্ট লাভ। য়ুরোপের বিপুল বৈজ্ঞানিক পাঠশালাগুলি হইতে যেরূপ [illegible] সহস্র অকৃতী শিক্ষার্থীর মধ্যে একটী নিউটন, পাস্কেল কিম্বা এডিসন [illegible] হইলে সেগুলি সার্থক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনের উপযোগী যে সকল [illegible] ভারতবর্ষ জুড়িয়া আছে, তাহারাও নানারূপ নিরুৎসাহকর উপাদানের মধ্যে [illegible]ানন্দ কিম্বা তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের প্রতীক্ষা করিয়া [illegible], সেইরূপ ম[illegible]পুরুষের আবির্ভাব সাধুগণের আড্ডাতেই সম্ভব। সাধুরা [illegible]বৃত্তি করি[illegible] কিন্তু খাঁটি সাধু নাই একথা কেহ অঙ্গীকার করিয়া বলি[illegible] পারিবেন না, [illegible] আছেন তাঁহারা জগৎপূজ্য।—সমস্ত সাধুর আড্ডা [illegible] দিয়া দেওয়া ভারত[illegible] করিবেন না, কারণ সেই সকল আড্ডাতে [illegible] ভারতের প্রকৃত শক্তি [illegible] রহিয়াছে। ডাকাত সাধুকে ফাঁসি দাও [illegible] উপযুক্ত আইন রহিয়াছে, [illegible] নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? রত্নের খনি অধিকাংশ [illegible] পূর্ণ বলিয়া সেই খনিগুলি বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা উচিত নহে।

বাল[illegible]চর্য্যে দীক্ষিত না হইলে একুশ বৎসরের [illegible] লোকের গৃহস্থ হইয়া [illegible]িক, সুতরাং বয়সের যে সীমা নির্দ্দি[illegible]ছে, তাহাতে আর কেহ [illegible] হইতে পারিবেন না, বিশেষ অযোধ্যারাজের [illegible]নুসারে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা[illegible] দণ্ডনীয় হইবেন,—ইহাতে সাধুকুল নির্মূ[illegible] আর কোন অনু[illegible]হল না।

[illegible] ও সুস্থ দেহ, তজ্জন্য দুঃখ কেন? ত্রিশ[illegible]ন প্রাপ্ত দাস[illegible]ী, কেরাণীপদপ্রার্থী দুর্ভাগ্যের গণ্ডী বাড়াই[illegible] হইবে?

যাহারা এই পরমুখাপেক্ষী হীন জীবনের কলঙ্কিত বায়ু হইতে— দূরে একটু স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করিতেছে, যাহারা অবিবাহিত সুতরাং কোনরূপ উৎকৃষ্ট দীক্ষার জন্য অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদিগকে টিকি ধরিয়া অনাথাশ্রমে আনিয়া কেরাণীগিরির জন্য প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষ সবল হইবে কি দুর্ব্বল হইবে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত।

এই সাধুসম্প্রদায় ভারতের [illegible]গ্রামের ধর্ম্ম-বিশ্বাস জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাঁরা কেরানী স[illegible] গ্রহণ করিবেন, পুলিসে কর্ম্ম লইয়া দস্যুবৃত্তি করিবেন,—তাহাতেই [illegible]তির কি উন্নতি হইবে? আফিসে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং ইহাঁরা [illegible] সন্ততি বৃদ্ধি করিলে বাজারে অন্ন ও রুটির মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। [illegible] হইতে ইহাঁরা যে ধর্ম্ম-শিক্ষার অন্ততঃ ভাণ করিয়াও সংসার হইতে বা[illegible] পড়িয়াছেন—সেই ভাণ ঘুচাইয়া খাঁটি ধর্ম্মের শিক্ষা ইহাদিগকে প্রদান করি[illegible] করিলে সেইরূপ সংস্কারে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। আজিও সাধুর কথায় [illegible] ভারতবর্ষ সাড়া দেয়, যদি সাধুর প্রকৃত সাধুত্ব হয়, তবে [illegible]র কল্যাণ অ[illegible] সাধুর আড্ডায় ডাকাতের মত পড়িয়া গভর্ণমেন্টের আ[illegible] কানুন ও [illegible] লইয়া—উহা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থার কথা শুনিলে [illegible]ভারতবর্ষ শিহরিয়া হইয়া[illegible]।—কুম্ভমেলায় যে সকল সাধুর সমাগম হয়, [illegible]দের মধ্যে জগৎদুল[illegible] চরিত্রে[illegible]ন্ত এখনও বিরল নহে, যে শৃঙ্খলা ও শান্তির [illegible] তখন প্রকটিত হয়, তাহা [illegible] না দেখিয়া কেহ কল্পনা করিতে পা[illegible]।—সাধুদিগকে উৎপীড়ন করি[illegible]রতের শীর্ষস্থানে বেদনা অনুভূত হ[illegible] চোর ডাকাত ধরিবার জন্য ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট লাগিয়া পড়িয়া আছেন, [illegible] চাঁদ রায় বাহাদুরের ভা[illegible] কো[illegible] নাই। আর এদেশে [illegible] মত সরকারী গরীবখানা নাই; [illegible] তাহারা পথে আসিয়া [illegible]তে হইবে, কিম্বা অন্নবস্ত্রের জন্য লোকের [illegible] যাইতে হইবে, নতুবা [illegible] কোথায় যাইবে? আজিও এদেশে [illegible]কে এক মুষ্টি অন্ন [illegible] পবিত্র করিয়া থাকে, কোন উৎসব উপলক্ষে [illegible] দ্বারে দ্বারে ক[illegible]ইয়া বসিয়া পড়ে,—গরীবখানা অপেক্ষা লো[illegible] ব্যক্তিগত দা[illegible]জের পক্ষে কল্যাণকর, দাতা ও গৃহীতা [illegible] সম্বন্ধে পরস্পর[illegible]আসিয়া ধন্য হইয়া থাকে—আর যদি বলিষ্ঠ [illegible]রিতে

[illegible]সে তবে একথাও মনে হইতে পারে, নিরাশ্রয় দুর্ভিক্ষপীড়িত বহুপোষ্য হয়ত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, আজকালকার কর্ম্মবিরলতার দিনে তাহার বাহুবল হয়ত উপার্জ্জনের পন্থা খুঁজিয়া পায় নাই,—সুতরাং দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন পাশব শক্তি প্রয়োগ বা আইন বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে অনেকটা ভাবিয়া দেখা উচিত। যেখানে কেহ সত্য সত্যই প্রতারণা করিতেছে সেখানেও তুমি এক মুষ্টির বেশী ক্ষতি স্বীকার [illegible] না,—[illegible] প্রতা[illegible] শাস্তি দেওয়ার অধিকারও তোমার আছে, এমতবস্থায় আমাদের [illegible]ক্ত বৃহৎ পরিবারের দারিদ্র্যের সমস্যা উৎকৃষ্টরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়া [illegible]দ্রের বিরুদ্ধে আইন করিবার প্রস্তাব অতি অসঙ্গত। যাহারা আমা[illegible] দেশে ভিক্ষা করিতেছে—তাহারাই শুধু এদেশের প্রকৃত দরিদ্র [illegible], [illegible] বুভুক্ষিতের উদরের জ্বালা গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে ব্যক্ত হয় না, লজ্জায় [illegible] দুরবস্থা কাহাকেও না জানাইয়া নানারূপ কষ্ট পাইতেছে—এই দারিদ্র্যপী[illegible] ভারতবর্ষে দরিদ্রের ভিক্ষা চাওয়ার ক্ষমতা লোপ করা ও তাহা[illegible] টিপিয়া মারিয়া ফেলা তুল্য। রায় বাহাদুরের অর্থের অংশ দরিদ্রগণের হিতার্থে ব্যয়ি[illegible] হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম, দরিদ্র দলনের [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] বড়ই বিসদৃশ—এমন কি [illegible]শংস বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভগবদ্গীতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। অনুবাদক [illegible]কের প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে গীতার কাল, [illegible] গীতোক্ত [illegible] সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা আছে। অনুবাদ ও ভূমিকা পাঠে দেখা যায় [illegible] গীতার প্রতি ভক্তের ন্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত, গীতার উপাসনায় ইনি কাহারও অ[illegible] আগ্রহ দেখান নাই, অথচ ভক্তির উচ্ছ্বাসে ইনি ঐতি- হাসিকের চক্ষু দুইটি [illegible] বসেন নাই। গীতার কালনির্ণয় প্রসঙ্গে ইনি স্বর্গী- কাশীনাথ ত্র্যম্বক তিলা[illegible] বাবু প্রভৃতি মণিষীগণের মত উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন; তিনি বাণভট্ট[illegible] গ্রন্থ হইতে উদাহরণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টীয় [illegible] শতাব্দীতে গীতা বিদ্যমান ও বিশেষরূপে আদৃ[illegible] ছিল, যদিও তিলাঙ্গের উদ্ধৃত [illegible] প্রমাণ তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তথাপি মোটের উপর গীতার কাল সম্বন্ধে তাঁহার [illegible] সায় দিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মিবার [illegible] শতাব্দী পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছিল, [illegible]। মূল মহাভারতে গীতা ছিল কিনা এ সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, সত্যেন্দ্র বাবু [illegible] করেন গীতা মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে যো[illegible] হইয়াছে। তাঁহার মতে ম[illegible] এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ মানুষ তৎপরে মহাপুরুষ [illegible] শেষে স্বয়ং ভগবান্ অবতার রূপে লোকে[illegible] ধারণা হইয়াছিল। মহাভারত [illegible] ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ত্রিবিধযুগের এই ত্রিবিধ [illegible] বিশ্বাসের পর্য্যায় অনুসন্ধান করিলে মহাভারতেই পাওয়া যাইবে [illegible] বৌদ্ধ হইতে গৃহীত [illegible] গীতায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রূপে কল্পিত [illegible] মহাভারতে [illegible] বৌদ্ধযুগের সংযোজনা, সত্যেন্দ্র বাবুর এই মত। মতামত সম্বন্ধে অ[illegible] ও প্রতিকূলতা উভয়ই থাকিবে, কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ বিচক্ষণ[illegible] সহিত বিচার করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তৎপরে গীতার জ্ঞান, [illegible] ভক্তি ও দর্শনাংশ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা আছে, তাহা অতি সু[illegible] ভাবে [illegible] হইয়াছে। গীতার এক বিষয়ে প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করি[illegible] হইবে [illegible] সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছে, গীতায় দ্বৈত [illegible]

বিশিষ্টাদ্বৈত, নিরাকার সাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মতের সমর্থক যুক্তি পাওয়া যায়,—এমন কি জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও ইহার মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রমাণ পাওয়া যায় এরূপ শুনিয়াছি, সুতরাং এক বিষয়ে গীতা আমাদিগকে যাহা দিয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তাহা দেয় নাই, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের বিরোধ গীতা ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। ইহার সমুচ্চ দার্শনিক বেদী হইতে এই গ্রন্থ সমস্ত জগতকে আহ্বান করিয়া [illegible]লিতে[illegible] যেভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত দেবসেবা করিতেছে, সকলের জন্যই স্বর্গের [illegible] বাণী হিন্দুধর্ম্মের পরম বাণী, এই বাণীর প্রভাবে হিন্দুস্থানে ধর্ম্মবিদ্বেষের [illegible] নিবিয়া গিয়াছে, পাদ্রী যখন আমাদিগকে গালাগালি দেয় তখন [illegible] তাহার প্রত্যুত্তর গাহিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করি না।

অনুবাদ অতি চমৎকার হইয়াছে, [illegible] ও ত্রিপদী প্রভৃতি সরলচ্ছন্দে গীতামাহাত্ম্য এভাবে আর কোন পুস্তকে [illegible] নাই,—আমরা একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

"দেখ পার্থ দেখ [illegible] শতরূপ সহস্র প্রকার,
নানাবর্ণে বি[illegible]ত, জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র আকার।
দেখ সূর্য্য, [illegible], রুদ্র, দেখ যুগ্ম অশ্বিনী কুমার,
কখন [illegible] দেখ নাই, বহুরূপ চিত্র চমৎকার।
এ[illegible] এক ঠাঁই সমুদয় বিশ্ব চরাচর,
[illegible] যাহা ইচ্ছা তব, মন দেহে [illegible]।
তোমার এ চর্ম্ম চক্ষে এ দৃশ্য না আ[illegible],
দিব্য চক্ষু করি দান হবে তাহে সুক্ত দর্শন।"

এই পুস্তকের বাঁধাই ও সাজ সজ্জা বড় সুন্দর হইয়াছে। প্রাচীন গীতাকে এই নবীন পোষাকে বড় মানাইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র [illegible]।

যশোহর।

ত্রিশত বৎসর আগে যে জ[illegible]
উড়েছিল মহাতেজে বা[illegible]
বীরত্ব গৌরবদৃপ্ত যে[illegible]
শোভেছিল ধন্য ক[illegible] এই [illegible]রে ;
তাহারি মহিমাস্মৃতি য[illegible]জ্জ্বল
আজো জ্বলে [illegible]নরঞ্জন
—অতীতের কী[illegible]াক্ষী অচঞ্চল,
করে আজ [illegible] কলঙ্ক ভঞ্জন।
বাঙ্গলার কুরু[illegible]! বঙ্গবীরশ্রিত,
যে যশো[illegible]দিন তুমি অনাদৃত ;
তবু [illegible]ীয়সী স্মৃতির সম্পদে
ম[illegible] বঙ্গবাসী, বাচ্য বীর পদে।
[illegible] কালে হ'রেছিলে সবাকার যশ
হে যশোর ! আজি হ'র বঙ্গঅপযশ !

তুকারামের আত্মকাহিনী।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ছিলেন, শস্য-ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। পুণা হইতে আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, দেহুগ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজি ও শিবাজির গুরু রামদাসের সমসাময়িক। তুকারামের বংশ, পুরুষানুক্রমে [illegible] বিঠোবা-দেবের ভক্ত। তাঁহার পিতার নাম বহুলজি। বহুল[illegible] উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সাবাজির উপর [illegible]র ভার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন থাকায়, তিনি সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। [illegible] বহুলজী তাঁহার মধ্যম পুত্র তুকারামকে কাজকর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত তুকারাম, সাংসারিক কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তুকারামের দুই স্ত্রী ছিল—রক্ষুমাই ও জিজাই। তুকারামের যখন বিশ বৎসর বয়স তখন রক্ষুমাইর মৃত্যু হয়। সেই বৎসর তাঁহার একপুত্রও কালগ্রাসে পতিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃজায়াও ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ভ্রাতাও গৃহ ছাড়িয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হয়েন। তাহার পর, দেশে একটা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এই দুর্ভিক্ষে তাঁহার ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতি হইল,—তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি সংসারে বিরা[illegible] হইয়া দেহুগ্রামে বিঠোবার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কি হে[illegible] তিনি এই পথের পথিক হইলেন—তাঁহার সহভক্ত ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করায়, তিনি তাঁহার কোন একটী অভঙ্গে * আত্মকাহিনী

* তুকারামের রচিত পদ্যাবলীর নাম "অভঙ্গ"; ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচি[illegible] ইহা ভক্তিরসাত্মক বিবিধ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। এই অভঙ্গ-রচনায় তাঁহার এ[illegible] অভ্যাস ছিল যে, কীর্ত্তন-কালে উহা মুখেমুখে রচনা করিয়া অনর্গল বলিতে পারিতে[illegible] ইহার কোথাও ভঙ্গ হইত না বলিয়া ইহার নাম অভঙ্গ হইয়াছে। এই অভঙ্গগু[illegible]

যেরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারি যথাযথ অনুবাদ নিয়ে দিলাম।

* শূদ্রবংশে জন্ম মোর, করি ব্যবসায়;
কুলপূজ্য আমাদের বিঠোবা-ঠাকুর।
বলাটা উচিত নহে—কিন্তু সাধুগণ!
তোমরা করিছ প্রশ্ন—পালিব বচন।
অতি দুঃখে দুঃখী আমি হইনু সংসারে
মা-বাপ মরিলা যবে; দুর্ভিক্ষ-অকালে
নিঃশেষ হইল অর্থ, হারাইনু মান।
"হা অন্ন! হা অন্ন!" ক'রে ম'রে পত্নী এক;
পেনু লজ্জা; এই দুঃখে ফাটিল পরাণ।
দেখিলাম ব্যবসায়ে হইতেছে ক্ষতি;
ভগ্ন দেবালয়ে আসি করিলাম বাস।
কীর্ত্তন করিনু সুরু একাদশ দিনে;
না ছিল অভ্যাস আগে; করিনু কণ্ঠস্থ
সাধুদের পদাবলী সাদর বিশ্বাসে।
গান যবে হ'ত—আমি ধরিতাম ধুয়া
চিত্তশুদ্ধি করি' ভাবে; তীর্থসম সাধুদের
সেবিতাম পদযুগ লজ্জা করি' দূর।
যথাসাধ্য করিতাম পর-উপকার

[illegible]বিশেষত্ব এই যে, উহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব মুদ্রিত। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের [illegible]দয় হইত,—তিনি অভঙ্গ রচনা করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে পদলালিত্য [illegible] বিশেষ কবিত্বের ঘটা না থাকিলেও, ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস বলিয়াই ইহা [illegible]ত হৃদয়গ্রাহী। মহারাষ্ট্র দেশে এই জন্যই ইঁহার এত আদর। বঙ্গদেশে যেরূপ [illegible]মপ্রসাদ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ তুলসি দাস, মহারাষ্ট্রদেশে সেইরূপ তুকারাম।

* "তুকারামচে অভঙ্গ"—সংখ্যা ১০৩৩, প্রথম ভাগ।

খাটায়ে শরীর নিজ ; না মানিনু আমি
সুহৃদ্ জনের বাক্য ; সমস্ত সংসারে
হইল বিতৃষ্ণা ঘোর ; মনেরে করিনু
সত্যাসত্যের সাক্ষী, গ্রাহ্য না করিয়া
বহুজন মতামত ; করিনু গ্রহণ
স্বপ্নে গুরু-উপদেশ ; ধরিলাম নাম *
দৃঢ় বিশ্বাসের ভরে ; হ'ল তারি পরে
কবিত্ব-[illegible]রতি মোর ; ধরিলাম চিতে
বিঠোবার [illegible]-দুখানি ; পাইনু আঘাত
কোন নিষেধ বচনে ; কিছুকাল তরে
হইলাম মর্ম্মাহত ; কবিতার পুঁথি
ডুবাইয়া নদী জলে [illegible]। দিনু বসি' ;
তখন দিলেন শান্তি মোরে নারায়ণ।
বিস্তারি' কহিতে গেলে হইবে বিলম্ব,
— থাক্ আজকার মত ; দেখিছ তোমরা
—যে ভাবে এখন আছি ; কি হইবে পরে
—জানেন বিঠোবা দেব ; কৃপাময় হরি
না করেন ভক্তজনে উপেক্ষা তিলেক
—জানিতে পেরেছি আমি ; তুকারাম বলে,
যে বোল্ বলান্ মোরে দেব পাণ্ডুরং
তাই মোর একমাত্র জীবন-সম্বল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* নাম-কীর্ত্তন চৈতন্যদেবই প্রথম প্রচার করেন। এই চৈতন্যধর্ম্ম বোধ হ মহারাষ্ট্রদেশেও এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। "বাবাজি" নামে কোন ব্যক্তি তুকারামের নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া, "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করেন এবং রাঘব-চৈতন্য ও কেশব-চৈতন্যকে গুরু বলিয়া মানিতে উপদে দেন। ইহাতেই বোধ হয়, মহাপ্রভু চৈতন্যের নামে, চৈতন্যের কোন শিষ্য মহারাষ্ট্রদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে বোধ হয় আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

পাণিনি-তত্ত্ব।

লিপি-প্রণালী।

"যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দ বারিভিঃ।
তস্মৈ পাণিণায় [illegible]।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অধুনা অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছে। হয়ত এই উপলক্ষে অশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডারস্বরূপ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচুর অধ্যয়ন অধ্যাপনা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, ঐ সকল পুস্তকের যথাযথ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্যতীত, ভারতের প্রাচীনতত্ত্ববিষয়ক কোনরূপ মতামত স্থির করিবার উপায়ান্তর নাই। প্রায় দুই শত বৎসর হইতে ইউরোপে ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে তদুপলক্ষে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের সংগ্রহ, মুদ্রাঙ্কন ও ভাষান্তর সম্পাদিত হইয়াছে। অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মূল সংস্কৃতপুস্তকগুলি যথাযথ অধীত না হওয়ায়, এবং তর্ক-শাস্ত্রের সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহার সমালোচনার চেষ্টা না করায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রচারিত অনেক সিদ্ধান্তই দোষশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী হইলেও সংস্কৃতগ্রন্থনিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধেও বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া নিরর্থক ঋণভার বৃদ্ধি করেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত গ্রন্থ ও তদন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। তাহার জন্য বিদেশীয় লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

অধুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মতামতের অবতারণা দেখা যাইতেছে। তাহাতে সাধারণতঃ ঐ পাশ্চাত্য মতেরই পুনরুক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে। আমাদের স্বদেশীয় সুধীগণ যখন মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, উপযুক্ত তর্কপদ্ধতির সাহায্যে, কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন, তখনই তাঁহাদের কথার সমুচিত সমাদর হইবে। নতুবা কেবল নামের গৌরবে, মতের গৌরব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাশ্চত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের একটী মত এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। পাঠকগণ তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, অবিচারিত ভাবে সমস্ত পাশ্চাত্য মত গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত!

এইস্থলে আরও একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ আমাদের প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থগুলির রচনাকাল নির্ণয়ের জন্য বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের পুরাতন গ্রন্থকারগণ গ্রন্থরচনার কালনিরূপণের বিশেষ কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। বরং অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা আত্ম- পরিচয় পর্য্যন্তও প্রদান করেন নাই। ইহা ভিন্ন, বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি হস্তলিপি সাহায্যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে কালক্রমে অনেক প্রক্ষিপ্তাংশ সংযুক্ত হইয়াছে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে ঐ সকল গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণ করা একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বাধাবিপত্তি থাকিতেও, এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, এ একজন একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

তাঁহাদের এরূপ বিড়ম্বনা দেখিয়া আশা করা যায় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দুরূহ কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে কি কি শিক্ষার বিষয় আছে, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। বিদেশীয় অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়া, স্বদেশীয় আচার্য্যগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের ত্যক্তসম্পত্তিতে নিজের উত্তরাধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করাই সুসঙ্গত। এইরূপে শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর হইলে, কালক্রমে এমন তত্ত্ব আবিস্কৃত হইতে পারে, যাহার আশ্রয়ে কোন কোন বিষয়ের প্রকৃত কাল নির্ণয়ের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারিবে। তখনই কালনির্ণয়ে অগ্রসর হইবার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইবে। শান্তভাবে সে অবসর-কালের প্রতীক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। প্রকৃত বিষয়ে অধিকারী না হইয়া, তাহাতে হস্তক্ষেপণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অধ্যাপক মোক্ষমূলর অস্মদ্দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। বিদ্যামন্দিরে ইঁহার গ্রন্থ অধ্যাপিত হইয়া থাকে। অনেকেই ইঁহার মতের বিশেষ পক্ষপাতী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর দীর্ঘকাল সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া সায়নভাষ্যসহ ঋগ্বেদ মুদ্রিত ও তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন; এবং আর্য্যসমাজের পুরাতন ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধীসমাজে যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয় পাঠ করিলে, তাঁহার অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রসংশা করিতে হয়। মোক্ষমূলর জর্ম্মনিদেশের লোক, তিনি কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। অথচ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে মাতৃভাষারচিত গ্রন্থের ন্যায় সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন;—দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সংস্কৃত ভাষা দুরূহ। তাহার পদপদার্থ নিরূপণ ও অন্বয় স্থির করিতে ভারতীয় পণ্ডিতগণেরই মস্তক

বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। বিদেশীয়গণের পক্ষে এই ভাষার শব্দোচ্চারণই কষ্টসাধ্য। এই সকল ও অন্যান্য অসুবিধা থাকিতেও, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তথাপি তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক মো[illegible]র লিখিয়াছেন যে,—পাণিনির সময়ে ভারতবর্ষে লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল না; তাহার প্রমান স্বরূপ বলিয়াছেন যে,—পাণিনিব্যাকরণে এমন নিয়ম নাই যাহাতে তাঁহার সময়ে লিখনপ্রণালী প্রচলিত থাকা বুঝা যাইতে পারে।*

যাঁহারা পাণিনিব্যাকরণ আদৌ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা এই কথায় মনে করিতে পারেন—মোক্ষমূলরের ন্যায় খ্যাতনামা পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত অবশ্যই অভ্রান্ত হইবে। যাঁহারা সমগ্র পাণিনিসূত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষমূলরের এই সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। পাণিনি-ব্যাকরণে অক্ষরের আকৃতিবিজ্ঞাপক শব্দ আছে, এবং লিখন প্রণালী প্রচলিত থাকারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন,—লিখন-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, পাণিনি ব্যাকরণ কেন সংস্কৃত ভাষার কোন ব্যাকরণ রচিত হওয়াই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, পাণিনি-ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পাণিনির সময়ে কি কি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা আবশ্যক।

* If writing had been known to Panini, some of his grammatical terms would surely point to the graphical appearance of words. I maintain that there is not a single word in Panini's terminology which presupposes the existence of writing.—Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 507.

পাণিনি-ব্যাকরণ বলিলে পাণিনিমুনিকৃত "অষ্টাধ্যায়ী" ব্যাকরণ
ায়। ঐ ব্যাকরণের আটটি "অধ্যায়" ও প্রত্যেক অধ্যায়ের
রিটি "পদ" আছে। এইরূপে সমগ্র ব্যাকরণ আট "অধ্যায়" ও
ত্রিশ "পাদে" বিভক্ত। পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্রমাত্রেই রচনা
রিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি স্বকৃত সূত্রের সহিত কোন
ত্তি বা উদাহরণ সংযোগ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সন্ধান
াপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষনে যে "অষ্টাধ্যায়ী" প্রচলিত আছে
াহার সূত্রসংখ্যা ৩৯৯৬।* তাহার মধ্যে প্রায় পাঁচশত সূত্র
র-বিষয়ক; তজ্জন্য তাহা সাধারণতঃ "স্বরসূত্র" নামে কথিত হইয়া
কে। সংস্কৃতশব্দগুলি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত;—বৈদিক
লৌকিক। বৈদিক শব্দগুলি কেবল বেদেই নিযুক্ত ছিল; অন্যত্র
যুক্ত হইত না। লৌকিক শব্দগুলি লোকে অর্থাৎ সাধুসমাজে
চলিত ছিল; এবং স্থলবিশেষ ভিন্ন, বেদেও ব্যবহৃত হইত।
ৌকিক শব্দ "ভাষা" নামেও পরিচিত ছিল। প্রত্যেক শব্দই বিশেষ
শেষ স্বর আশ্রয়ে উচ্চারিত হইত। ঐ স্বর তিনটি;—উদাত্ত, অনুদাত্ত,
রিত। পাণিনি লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দেরই ব্যাকরণ
চনা করিয়াছিলেন। "ভাষা" হইতে বহুকাল স্বরের ব্যবহার বিলুপ্ত
ইয়াছে। বঙ্গদেশে বৈদিকশব্দ পর্য্যন্তও স্বর ব্যতীত উচ্চারিত হইয়া
কে। পাণিনি-ব্যাকরণের আরম্ভেই

অথ শব্দানুশাসনং

লিয়া একটী প্রতিজ্ঞা আছে। তাহার পর প্রত্যাহারের চতুর্দ্দশটী
ত্র আছে। তাহা "মাহেশ্বর" সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে
,—পাণিনি তপোবলে দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে ঐ
তুর্দ্দশসূত্র লাভ করিয়া, তাহারই সাহায্যে "অষ্টাধ্যায়ী" রচনা করিয়া

* এই সকল সূত্রের মধ্যে তিনটি কি চারিটি সূত্র পাণিনি-রচিত কিনা
বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এবিষয়ে Godstucker's Panini,
29 দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ চতুর্দ্দশ সূত্র পাণিনি-সূত্র ম[ধ্যে] পরিগণিত নহে। কাত্যায়ন উক্ত চতুর্দ্দশ সূত্রকে "অক্ষর-সমাম্নায়" অর্থাৎ অক্ষর পাঠের ক্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"যেনাক্ষরসমাম্নায় মাধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

এই অক্ষর পাঠের ক্রম পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রম হইতে বিভিন্ন এবং উহা কেবল পাণিনি ব্যাকরণেরই উপযোগী। কলাপ-ব্যাকরণ প্রণেতা ঐ ক্রম অবলম্বন না করিয়া, পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রমেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। লোকসমাজে অদ্যাপি পুরাতন ক্রমই প্রচলিত আছে; বালকেরা তদনুসারেই বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া থাকে। কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে,—

সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ॥

ঐ সূত্রটি স্বনামখ্যাত নিরুক্তকার সাস্ক ঋষির সূত্র।

সংস্কৃত ভাষায় পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই অনেক ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। পাণিনিসূত্রে ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে বর্ণমালাক্রমে তাঁহাদের নাম ও পাণিনি কর্ত্তৃক কোন্ সূত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

আপিশলি	...	...	৬।১।৯২।
কাশ্যপ	...	...	১।২।২৫।
গার্গ্য	...	...	৭।৩।৯৯।
চাক্রবর্ম্মণ	...	...	৬।১।১৩০।
ভারদ্বাজ	...	...	৭।২।৬৩।
শাকটায়ন	...	...	৩।৪।১১১।
সাকল্য	...	...	১।১।১৬।
সেনক	...	...	৫।৪।১১২।

ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম একাধিক সূত্রেও প্রা[প্ত] হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি করিয়া সূত্রই উল্লিখিত হইল।

পাণিনির সময়ে সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল ব্যাকরণ ব্যতীত ব্যাকরণের সহযোগী আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাণিনির সূত্রেই পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে শিক্ষা, গণ-পাঠ, উণাদিসূত্র ও অভিধান বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। কোন্ কোন্ বর্ণ পরস্পর সবর্ণ; কোন্ কোন্ বর্ণ কোন্ কোন্ বর্গের অন্তর্গত; কোন্গুলি অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, নাদ, ঘোষ, বিবৃত, সংবৃত এই সকল বিষয়ের কোন সূত্র অষ্টাধ্যায়ীতে নাই; অথচ এই গুলির বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে অষ্টাধ্যায়ীর অনেক সূত্রই বুঝিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী সূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণং ১।১।৯

মুখের তুল্য স্থান হইতে যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে তাহাদিগকে সবর্ণ বলে। কোন্ কোন্ বর্ণ তুল্য স্থান হইতে উচ্চারণ হয়, পাণিনির ব্যাকরণে তাহার কোন সূত্র নাই।

স্তোশ্চুনা শ্চুঃ ৮।৪।৪০
ষ্টুনা ষ্টুঃ ৮।৪।৪১
কুপ্বো=ক≍পৌচ। ৮।৩।৩৭
কুহোশ্চুঃ।

এই সকল সূত্রে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, ইত্যাদির স্পষ্ট উল্লেখ আছে; অথচ কোন্ গুলি কবর্গ বা চবর্গ বা টবর্গ বা তবর্গ বা পবর্গ তাহার কোন সূত্র অষ্টাধ্যায়ীতে নাই। "কুহোশ্চুঃ" সূত্রে কবর্গ ও হকারের স্থানে স্থলবিশেষে চবর্গ হওয়ার বিধান আছে; কিন্তু কবর্গভুক্ত কোন্ বর্ণস্থানে চবর্গভুক্ত কোন্ বর্ণের আদেশ হইবে তাহার কোন সূত্র নাই।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ বা শিক্ষার জন্য অন্য কোন গ্রন্থ অর্থাৎ শিক্ষাগ্রন্থ অবশ্যই বর্ত্তমান

ছিল। তজ্জন্যই পাণিনি মুনি আপন ব্যাকরণে ঐ সকল বিষয়ে নূতন কোন সূত্র করেন নাই।

চাদয়োঽসত্ত্বে	১।৪।৫৭
স্বরাদি নিপাতনমধ্যয়ম্।	১।১।৩৭
নড়াদিভ্য ফক্।	৪।১।৯১
ভূবাদয়ো ধাতবঃ।	১।৩।১
নবৃত্ত্যচ্চতুর্ভ্যঃ।	৭।২।৫৯
নিজাং ত্রয়াণাং গুণঃ শ্লৌ।	৭।৪।৭৫
জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্।	৬।১।৬
তুদাদিভ্যঃ শঃ।	৩।১।৭৭
অদাদিভ্যঃ পঃ।	২।৪।৭২
ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না।	৩।১।৮১
রুধাদিভ্যঃ শ্নম্।	৩।১।৭৮
জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ।	৩।৪।৭৫
দিবাদিভ্যঃ শ্যন্।	৩।১।৬৫
স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ।	৩।১।৭৩
তনাদি কৃঞভ্যঃ উঃ।	৩।১।৭৯

এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ধাতু ও তদিতর শব্দের এক্ষণে যেরূপ গণপাঠ প্রচলিত আছে ঐরূপ গণপাঠের গ্রন্থ পাণিনির সময়েও প্রচলিত ছিল। তাহা না হইলে পাণিনি উপরি লিখিত সূত্রগুলিতে গণের নামমাত্র উল্লেখ করি[য়া] ক্ষান্ত থাকিতেন না কোন্ কোন্ শব্দ কোন্ কোন্ গণভুক্ত ব্যাকরণেই তাহার উল্লেখ করিতেন।

পাণিনির ব্যাকরণ পাঠে আরও জানা যায় যে উণাদি প্রত্যয়ে[র] গ্রন্থ তাঁহার সময়ের পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। উণাদি প্রত্য[য়]

[ধ]াতুর উত্তর হইয়া থাকে। সে গুলিও কৃৎপ্রত্যয়। কোন্ উণাদি প্রত্যয় কোন্ ধাতুর উত্তর হয়, তাহার কোন নিয়ম পাণিনি-সূত্রে নাই। অথচ উণাদি প্রত্যয় স্বীকার করিয়া পাণিনি কয়েকটী সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা—

উণাদয়ো বহুলম্	৩।৩।১
ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে	৩।৩।২
তাভ্যামন্যত্র উণাদয়ঃ	৩।৪।৭৫

ইহা ব্যতীত অভিধানের গ্রন্থ প্রচলিত থাকারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রমাত্রই রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ভিন্ন, সূত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সূত্রের বৃত্তি, ব্যাখ্যা, উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ ইত্যাদি না থাকিলে পাণিনিসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অতীব দুরূহ। পাণিনি আপন ছাত্রদিগকে যে কেবল সূত্রমাত্রই শিক্ষা দিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যায় না; সম্ভবতঃ তিনি সূত্রগুলির ব্যাখ্যাও করিয়া দিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে কাত্যায়ন মুনি পাণিনিসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, উহাকে মহাবৃত্তি বলে। এ পর্য্যন্ত ঐ মহাবৃত্তি কুত্রাপি মুদ্রিত আছে শুনা যায় না। কাত্যায়নের পরবর্ত্তী কোনও সময়ে পতঞ্জলি মুনি পাণিনিসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, উহাকে মহাভাষ্য বলে। এক্ষণে মহাভাষ্যেই কাত্যায়নের মহাবৃত্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ মহাবৃত্তি ও মহাভাষ্যযোগে পাণিনিসূত্র পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং সেই কারণেই তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমষ্টিকে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' কহে। তিন মুনি বিদ্যায় সমতা লাভ করায় 'একবংশ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এবং "সংখ্যা বংশ্যেন" ২।১।১৯।

সূত্র অনুসারে ঐ সংজ্ঞা হইয়াছে। যেমন এক বংশে জন্মলে সন্তানগণ 'একবংশ্য' বলিয়া অভিহিত হয় সেইরূপ বিদ্যার তুল্যতা-হেতু এক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণও 'বংশ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রিমুনিব্যাকরণ ব্যতীত পরবর্ত্তী সময়ে পাণিনি-সূত্রের আরও অনেক বৃত্তি, টীকা ও ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই ত্রিমুনি ব্যাকরণই অধীত হইত। পরবর্ত্তী সময়ে স্বল্পপ্রয়াসীর জন্য সংস্কৃত ভাষার অনেক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচিত হওয়ায় এবং তাহাদের পঠন পাঠন বাহুল্যরূপে প্রচলিত হওয়ায়, ত্রিমুনি-ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ক্রমে বিরল হওয়াতে ত্রিমুনি-গ্রন্থগুলিও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

পাণিনির সময়ের পূর্ব্ব হইতেই যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলা হইল, ঐ সকল গ্রন্থই লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক। সাহিত্যের বাহুল্য ও বিশেষ আদর না হইলে, ব্যাকরণের আবশ্যক উপস্থিত হয় না। পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক ও ভাষা উভয়বিধ সাহিত্য প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাণিনি-ব্যাকরণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষা-সংস্কৃত সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের মত পাণিনি আপন ব্যাকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন *; তাহাতেই বুঝা যায়,— ঐ সকল বৈয়াকরণের সময়েও ভাষা-সাহিত্য এবং ভাষা-ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগে বৈদিক সাহিত্য লইয়াই আর্য্যগণের বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকিবার কথা, তখন হয়ত "ভাষার" বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু পাণিনির বহুপূর্ব্ব হইতেই ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া-

* ৭।৩।৪৬-৪৭।

ছিল এবং ভাষা-সংস্কৃতও যথেষ্ট গৌরব লাভ করিয়া নানা সাহিত্যে অলংকৃত হইয়াছিল। তাহাদের সেবা করাও অত্যাবশ্যক বলিয়াই বৈয়াকরণগণ একই ব্যাকরণে বৈদিক ও ভাষা-সংস্কৃতের শব্দানুশাসন-সূত্র একত্র সমাবেশ করিয়া উভয়কেই তুল্যাসনে স্থান দান করিয়াছিলেন।

পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার কত কাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কালনির্দ্দেশ করা অসম্ভব, স্থিতিশীল ও বেদপ্রাণ আর্য্যসমাজের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই পরিবর্ত্তন বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়াই বোধ হয়। পাণিনির পূর্ব্বে ভাষা-সাহিত্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার উপায় না থাকিলেও, পাণিনি-সূত্রের কোন কোন স্থানে কিছু কিছু আভাস মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে ॥৪।৩।৮৭॥

শিশুক্রন্দ-যমসভ-দ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্য শ্ছঃ ॥৪।৩।৮৮॥

পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নট-সূত্রয়োঃ ॥৪।৩।১১০॥

কর্ম্মন্দ-কৃশাশ্বাদিনিঃ ॥৪।৩।১১১॥

গ্রন্থান্তাধিকে চ ॥৬।৩।৭৯॥

বহু সাহিত্য বিরচিত হইয়া ভাষা যে আকার ধারণ করে, তাহার পরিবর্ত্তন সহজে সাধিত হয় না বলিয়াই, সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিবার সম্ভাবনা থাকে। কথনের ভাষা দেশ, শ্রেণী ও সময় ভেদে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য তাহার ব্যাকরণ রচনা করিবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ব্যাকরণ রচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে,—তৎপূর্ব্বেই সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সাহিত্যরাশি কেবল মুখে মুখে রচিত ও রক্ষিত হইয়া থাকিলে, তাহার ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস বৃথা হইত

যে দেশে ভাষা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশে যে লি
প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, ইহা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যু
হয় না।

লিপি-কৌশল কি এতই মহোচ্চ প্রতিভা-বিজ্ঞাপক যে, প্রাচী
কালে আর্য্যজাতির মধ্যে তাহার বিকাশ হওয়া একেবারে অস
ছিল? তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। মনের ভা
ব্যক্ত করিবার জন্য মনুষ্য নানা সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করে;
ইঙ্গিত ও উচ্চারিত শব্দই ঐ সঙ্কেত। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে
সাহায্যে ইঙ্গিতে ভাব-প্রকাশ করা বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির অপে
করে না। অল্পবুদ্ধি ও অশিক্ষিত লোকেও ঐ উপায় অবলম্
করিয়া থাকে। যে আর্য্যজাতি, উচ্চরিত সর্ব্বপ্রকার ব্যক্ত শব্দে
সমগ্র তত্ত্ব পুংখানুপুংখরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, অ-কারাদি অক্ষ
কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণের স্থান
কৌশল স্থির করিয়া, প্রত্যেক বর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া
তাহার অনুশাসনের জন্য শিক্ষাগ্রন্থ এবং অনন্ত শব্দ রাশির অনুশাসনে
জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ পর্য্যন্ত রচনা করিবার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া মহো
প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সঙ্গে স
অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য অথচ গ্রন্থরচনার নিত্যপ্রয়োজনী
উপাদানস্বরূপ লিপি-কৌশল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তা
বিশ্বাস করা কঠিন। অভাবই মানব সমাজকে বিবিধ কৌ
উদ্ভাবনায় প্রেরণ করিয়া, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া দে
প্রাচীন আর্য্যজাতি বেদ-প্রাণ ছিলেন; বেদ ও আর্য্যজাতি
নিত্য-সহচরিত ভাবে প্রথমেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মান
সভ্যতার যত দিনের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত দিনই
আর্য্যজাতির নিত্যসহচর থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রা

—বধি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া, বেদার্থ সম্যক্ অধিগত ও আজীবন তাহারই সেবা করা আর্য্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারই অনুরোধে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দস্ ও জ্যোতিষ,—বেদের এই সুবিখ্যাত ষড়ঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বেদবেদাঙ্গের প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা অবিকৃতভাবে প্রচলিত ও সুরক্ষিত করিবার জন্য এতদূর ব্যাকুল ছিলেন, তাঁহারা কি তাহার একমাত্র সহজ উপায়স্বরূপ লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, বা চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রয়াস হইয়াছিলেন?

অন্যান্য জাতির ইতিহাসে জানা যায় যে,—ক্রয়বিক্রয় ও বাণিজ্য-ব্যবসায় লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত করিয়াছিল। তাহাতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে,—হয় ত কালদীয়, ফিনিসীয় বা গ্রীসীয় জনপদ হইতেই ভারতবর্ষে লিখন-প্রণালী আনীত হইয়া থাকিবে। ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র; এরূপ অনুমানের কোন মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্য্যজাতির বর্ণমালাই এরূপ অনুমানের বিশেষ অন্তরায়। কালদীয়, ফিনিসীয় বা গ্রীসীয় বর্ণমালায় পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকিলেও, তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের বর্ণমালার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর্য্য বর্ণমালা প্রধানতঃ স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুইভাগে, এবং উহারা আবার কণ্ঠ্য, তালব্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, মূর্দ্ধণ্যাদি উচ্চারণের স্থানভেদের স্বাভাবিক নিয়মে বিভক্ত হইয়া প্রথম হইতেই বর্ত্তমান আছে। তাহাই আর্য্য বর্ণমালার বিশেষত্ব! আদর্শের অভাবে তাহা অনুকরণ-লব্ধ বা দেশান্তরাগত বলিয়া অনুমিত হইতে পারেনা। আর্য্যজাতির বর্ণমালার পূর্ণতা, স্বাভাবিক বিভাগ ও যথাস্থান বিন্যাস অদ্যাপি

অপরাপর সকল জাতির বর্ণমালাকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে। ইহা কাহারও অনুকরণলব্ধ হইতে পারে না। কোন্ সময়ে এই বর্ণমালা আর্য্যজাতিকে প্রথমে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার কাল কেহই প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—লোকে সর্ব্বপ্রথমে চিত্র বা বস্তুর আকৃতিবিজ্ঞাপক চিহ্নাদির দ্বারা শব্দ লিখিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কালদীয় রাজ্যে ঐ প্রণালী প্রচলিত ছিল, চীনদেশে অদ্যাপিও তাহা প্রচলিত আছে। পরে, ক্রমে শব্দগুলির প্রত্যেক বর্ণবোধক লিপি-সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লিখনপ্রণালী আর্য্যগণের গৃহজাত হইলে, এই দুই অবস্থার কোন না কোন একটির অস্তিত্বের পরিচয় অবশ্যই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। আর্য্যগণের বর্ণমালার যে সর্ব্ব প্রাচীন আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ের পূর্ণ কলেবর বর্ণমালার অনুরূপ। অন্যদেশে, চিত্রাদির অবস্থা উদ্ভূত হইয়া লিখনপ্রণালী মার্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পরেই, তাহা ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। তজ্জন্যই ভারতবর্ষে বর্ণমালার অতি পুরাতন লিখনকৌশলের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই; বিদেশে তাহা বর্ত্তমান আছে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এরূপ তর্কের সহজ উত্তর এই যে,—হয়ত আর্য্যগণের মধ্যেও অতি পুরাকালে চিত্রাদির দ্বারা লিখনপ্রণালীর প্রথম সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাহার স্মৃতি লুপ্ত হওয়ার পর বৈদিকযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল বুভুক্ষা ও জিজনয়িষা দ্বারা তাড়িত হইয়া মানবসমাজ, জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত থাকিবার সময়ে, পশুবৎ সময় কর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে। বৈদিকযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সেই

প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহারা কোন্ বিষয় কত সংগ্রামের পর বৈদিকযুগের সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিষয়েরই প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বহুকালের ব্যবধানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লিপিকৌশল আবিষ্কারের প্রথম চেষ্টার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই, তাহা দেশান্তরানীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না।

কেহ কেহ বলেন,—ভারতবর্ষে অশোকের সময়ের পূর্ব্বের কোনরূপ প্রশস্তি বা খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সময়ে লিপিকৌশল পরিজ্ঞাত থাকিলে, অবশ্যই কোন না কোন প্রশস্তি বা খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই তর্কও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অশোকের সময়ে যে যে কারণে খোদিত লিপির প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে ঐ সকল কারণেরই অভাব ছিল। অশোক, রাজশাসন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাসন বিস্তার করিবার জন্যই খোদিত-লিপির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্ম ও শাসনের পরিবর্ত্তে নবপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে অভিনবপ্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বৈদিক শাস্ত্রের শাসন অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতেই দেশে বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা গুরূপদেশ সাপেক্ষ থাকায় তাহা স্বল্পস্থানে স্বল্পাক্ষরে খোদিত করিয়া প্রচার করা অসম্ভব। রাজশাসন, ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রবর্ত্তিত হইত। তাহার জন্যও খোদিত লিপির সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। ব্রাহ্মণগণ তপঃস্বাধ্যায়নিরত থাকিয়া বর্ণাশ্রমানুসারে জীবনের শেষভাগে বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু হইবারই জন্য প্রয়াস করিতেন। অল্প লোকেই ভূমিদানগ্রহণ করিতে সম্মত

হইতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি জনসাধারণের দেববৎ অবিচলিত ভক্তি
প্রবল থাকায়, ব্রহ্মস্ব অপহৃত হইবারও আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং
ভূমিদান লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজপ্রশস্তির প্রয়োজন অনুভূত
হইত না। প্রয়োজনের অভাবই প্রশস্তির অভাবের কারণ বলিয়া
বোধ হয়। এই স্থলে, রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা স্মরণপথে
পতিত হইতেছে। রাজা দশরথ অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে
ভূমিদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তৎপারিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য
গ্রহণের জন্যই আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

"ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরান্তাং কুলবর্দ্ধনঃ॥
এবং দত্বা প্রহৃষ্টোঽভূৎ শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্ব্বে রাজানং গতকিল্বিষম্॥
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে॥
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতং।
তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্॥"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

ভারতের কলকারখানা।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই নগরে ষ্টীমেরদ্বারা চালিত যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে কার্পাসের কার্য্য হইত। তৎপরে, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সমস্ত বাণিজ্য-প্রধান স্থানে এবং প্রেসিডেন্সি নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক ছোটবড় কুঠি স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সুয়েজখাল উন্মুক্তের পর হইতে ভারতবর্ষে ষ্টীমের ব্যবহার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা পাঠে অবগত হওয়া যাইবে, ভারতে বর্ত্তমান সময়ে কোন কাজের কতটি কল আছে,—

কল।	সংখ্যা।	শ্রমজীবিরসংখ্যা।	তাঁত।	কত টাকা খাটে।
তুলার	১২৫	১১১৯৯৮	২৩৮৪৫	১২০০০০০০০৲
কোষ্টার	২৬	৬১৯১১০	৮৩০০	৩৫০০০০০০৲
পশমের	৫	২১৬৪	৫২৬	২৪৭৫০০০৲

এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ছয়টী কাগজের এবং তিনটী চামড়ার কলকারখানা আছে। দুই একটী শস্যনিষ্পেষণের কল ও চিনির কুঠি, এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। জয়েন্টষ্টক কোম্পানীদিগের সম্পত্তি,—তুলার কারখানা ব্যতীত, পূর্ব্বোলিখিত অধিকাংশ কুঠিই ইংরেজ মহাজনদিগের।

যে ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯৪৪,১০৮ বর্গ মাইল, যাহার লোকসংখ্যা ইহার দ্বিগুণেরও অধিক, যে ভারতবর্ষ, বৃটন এবং আয়ারল্যাণ্ড অপেক্ষাও সাতগুণ বড়, সেই ভারতবর্ষে কেবল ১৬০টী মাত্র কারখানা, আর যাহার তুলনায় যুক্তরাজ্য সূচাগ্রপরিমিত ভূমিখণ্ড বলিলেও চলে, তথায় সাত হাজারেরও অধিক কলকারখানা এবং কার্পাসের কার্য্যে ২৫০০ হাজারেরও অধিক লোক নিযুক্ত আছে।

লিভারপুলের মিঃ টমাস ইলিমন বলেন যে, এই সকল কারখানায় ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ খাটিতেছে এবং স্ত্রীপুরুষ-বালকবালিকাতে অন্ততঃ ৫,০০০,০০০ জন তদ্দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। অপিচ, বৃটিশ এবং আয়রিস্‌দিগের প্রস্তুত দ্রব্যের অর্দ্ধেকই রপ্তানির জন্য এবং তাহা সমস্তই তান্তব দ্রব্য।

তুলনাব্যপদেশে একবার আমেরিকার শিল্প ও কারখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক্‌। বহুসংখ্যক লৌহ এবং ইস্পাতের কুঠির মধ্যে চিগাগোর ইলিনোইস ষ্টীল্‌ কোম্পানী (Illinois Steel Co.) বৎসরে ৭০০,০০০টন দ্রব্য প্রস্তুত এবং শিল্পীদিগকে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা বেতন প্রদান করে। আর একটী টিনের কারখানায় প্রত্যহ ৮০০,০০০ হাজার ক্যানেস্তারা প্রস্তুত হয়। এই কারখানার সমস্ত কার্য্যই কলের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কলেই টিনের পাত কাটা হয়, ক্যানেস্তারার আকারে গঠিত করা হয়, কলেই জোড় দেওয়া হয়, নীচে ও উপরে ঢাকনি লাগান হয়, উপরে বোতাম লাগান হয়, ছিদ্র আছে কিনা পরীক্ষিত হয়; কলেই গণনা করা হয় এবং তৎসাহায্যেই গোলাজাত কারবার জন্য গুদামে ও রপ্তানির জন্য মালগাড়ীতে প্রেরিত হয়। ফিলাডেল্‌ফিয়ার Baldwin Locomotive Worksএ বৎসরে ৮০০ হইতে ৯০০ শত এঞ্জিন প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা বার্‌মিন্‌হাম, তাহার খনি হইতে, প্রত্যহ ২০,০০০ টন কয়লা ও ২,২০০টন লৌহ প্রদান করে। পিট্‌স্‌বার্গ জেলা, ১,১২০ মাইলব্যাপী পাইপে প্রত্যহ ৭৫০,০০০,০০০ ফিট গ্যাস (natural gas) যোগায় এবং তদ্দ্বারা বৎসরে ৮,০০০,০০০ টন কয়লার মূল্য বাঁচিয়া যায়। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যন্ত্রদ্বারা কত অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং কত পরিশ্রমের লাঘব হয়।

আমাদের দেশে যে দুই একটী কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে

তাহার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় নহে। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ যত কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার ⅙ ভাগ এই সকল কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যয়িত হয়। হুইট্টাকার (Whittaker) বলেন যে, চায়না এবং জাপানের বিপণিসমূহ ইংলণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য [illegible]ার করিয়া লইলেও, বোম্বাই কলের অধিকারীগণ পূর্ব্বাঅফ্রিকা, সিলোন, এডেন এবং ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টের বাজারে সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে। আমাদের শিশুশিল্পের পক্ষে ইহা নিতান্তই গৌরবের বিষয়।

[illegible] কাগজের ছয়টী কলেও বেশ কাজ হইতেছে। বালির কলের উন্নতি দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই প্রকার কার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একজন মাদ্রাজ বালক স্থানীয় কলেজের ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, "কেবল কাগজের জন্য ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ইয়ুরোপকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া থাকে। এই টাকা সমস্তই এদেশে রাখা উচিত। ভারতবর্ষ যে প্রকারের কাগজ চায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাগজ প্রস্তুতের উপাদান আমাদের বনজঙ্গলে, ময়দানে এবং পাথিপার্শ্বে পচিতেছে। ক্রয় করার পরিবর্ত্তে ভারতের কাগজ বিক্রয় করা উচিত।" বর্ম্মা হইতে মাদ্রাজের উপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কদলী বৃক্ষ পওয়া যায় এবং লোহিত কার্পাস বৃক্ষও উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুতের উপকরণ প্রদান করে। বাঁসও কাগজের একটী উৎকৃষ্ট উপকরণ।

দুই একটী চামড়ার কারখানার কথাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট (fancy) চামড়ার দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ সকল কারখানা হইতে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে না। কারণ প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০ লক্ষ টাকার চর্ম্ম, নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হয়।

ভারতীয় পাটের কলের কার্য্যাবলী অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। কলিকাতা যে কেবল সমগ্র ভারতবর্ষের বস্তার (থলের) অভাব মোচন করে তাহা নহে, এই একটী মাত্র ভারতীয় দ্রব্য, অনেক বিদেশীয় বাজারে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। মিঃ ওকনর (O' Connor) বলেন, 'আমেরিকার ও অন্যান্য বৈদেশিক বিপণিতে ডান্‌ডি হইতে যে সকল থলে প্রেরিত হয়, ভারতবর্ষ কেবল যে সেইস্থান অধিকার করিয়া বসিবে তাহা নহে, ইংলণ্ডকেও সে ডান্‌ডি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে থলে সরবরাহ করিতে পারিবে।'

এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষ কমিশন আমাদের দেশের দক্ষ শিল্পীদিগকে শর্করা প্রস্তুত ও পরিশুদ্ধ করিতে, কার্পাস, রেশমী ও পশমী সূত্র প্রস্তুত করিতে এবং আঁইসযুক্ত দ্রব্য হইতে সূত্র বাহির করা শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। কমিশন আরো বলেন যে, গ্লাস, সাবান, বাতি, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালীও শিক্ষা করা উচিত। আঁইসযুক্ত গাছ-পালা হইতে বুনানের উপযোগী সূত্র প্রস্তুতের ব্যবসা সুন্দর রূপে চলিতে পারে। তামাকের চাষ ছাড়া ঔষধীয় বৃক্ষলতা পালন ও ঔষধ প্রস্তুতের কার্য্যও একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

ছাতা এবং 'লুসফির' দেশলাই প্রস্তুতও যে আমাদের সাধ্যাতীত তাহা নহে। শিল্পজগতে ইহা অপেক্ষা সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই। ১৮৯৩-৯৪ সালে ৩৮ লক্ষ টাকার দেশলাই এবং ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতা আমরা আমদানি করিয়াছি। এই ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে দেশে বিস্তৃত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতীয় মহাজনদিগের দৃষ্টি এদিকে পড়িতেছে না।

লর্ড ল্যান্সডাউন, রয়েল এক্সচেঞ্জে বিদায় কালীন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ অনেক শিল্পবিভাগে সুন্দর উন্নতি

করিয়াছে কিন্তু যখন উহার উপাদান সমূহ, উহার উর্ব্বরা ভূমি, ইহার সুলভ শ্রমজীবিও ভীতিবিহ্বল জনসমূহ কি প্রকারের উন্নতি লাভ করিয়াছে চিন্তা করি, তখন আমি সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট হইতে এইটুকু আমরা উদ্ধৃত না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না;—আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে ভারতের লোকসমূহের দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের যে সঙ্কটাবস্থা হয় তাহার একমাত্র কারণ, প্রায় অধিকাংশ লোক কৃষি-কার্য্যের উপরই নির্ভর করে। যত দিন না তাহারা অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে, যতদিন না তাহারা বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, ততদিন ইহার প্রতিবিধান হইবে না।

আমাদের দেশে যে আজকাল কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহা দেশের শুভচিহ্ন। বর্ত্তমান অবারিত প্রতিযোগীতায় এবং অস্তিত্বরক্ষার প্রাণপণসংগ্রামসময়ে কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণের উপরই জাতীয় প্রাধান্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কলকারখানার সংখ্যা এত অল্প যে তাহার উপর বড় আশা করা যায় না। এবং সত্য কথা বলিতে কি বোম্বাই-য়ের পারসীদিগের তুলার কল ব্যতীত অধিকাংশ কল ও কুঠী ইংরাজ মহাজনদিগের। বিদেশীয় অর্থদ্বারা আমাদিগের জীবনোপায় এভাবে উন্নত করা নিশ্চয়ই মঙ্গলকর নহে—ইহাতে আমাদিগকে দিন দিন জীবনসংগ্রামে অনুপযুক্ত করিতেছে এবং প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ চক্রবৃদ্ধির হারে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

শিগো-স্বুভে।

প্রসিদ্ধ শিকারী ডুশেলুর অনুগ্রহে, পাঠকবর্গকে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলবাসী শিগো-স্বুভের বিবরণ উপহার দিতে সমর্থ হইলাম। শি[illegible]ভে দেখিতে গরিলার ন্যায়, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, ইহারা কিছু ছোট। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেক; ইহারা গরিলা অপেক্ষা কোমলস্বভাব এবং শীঘ্র মনুষ্যের অনুগত হয়। বানর বা বনমানুষের মধ্যে বাসগৃহনির্ম্মাণপ্রথা বিরল। কিন্তু শিগো-স্বুভে, বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা ও পত্রাদি দ্বারা এক প্রার বাসস্থান বা আশ্রয় প্রস্তুত করে। বনমধ্যস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে পৃথক একটী বৃক্ষ বাছিয়া লইয়া ভূমি হইতে প্রায় ১৫ বা ২০ ফুট উচ্চে ইহার আবাস নির্ম্মাণ করে; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বনের অন্যান্য বৃক্ষের সহিত সংশ্রব না থাকিলে গৃহটী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবে। ইহারা যে শাখায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করে তাহার নিম্নে বৃক্ষের অন্য শাখা থাকে না। ভূমি হইতে প্রায় ৫০ ফুট উর্দ্ধেও শিকারী ডুশেলু ইহাদিগের গৃহ দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা অতি বিরল।

একজন দেশীয় শিকারী ডুশেলুকে বলিয়াছেন যে ইহারা স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করে। শিগো-স্বুভে গৃহের ছাদ বা আবরণের নিমিত্ত পত্রযুক্ত ছোট ছোট শাখা এবং সেই সকল শাখানির্ম্মিত গৃহটী বৃক্ষে বন্ধন করিবার নিমিত্ত লতা ব্যবহার করে। ইহাদিগের বন্ধনক্রিয়া এত পরিচ্ছন্ন এবং ছাদ এরূপ সুনির্ম্মিত যে ঐ সমুদয় গৃহ দেখিলে মনুষ্যহস্ত নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

শিগো-স্বুভে দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না। এই বিষয়ে ইহারা গরিলার ন্যায়। ইহাদের বাসস্থান একত্রে অনেকগুলি দেখিতে

পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে কোন নিভৃত বাসস্থানে এক একটী বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ, ভগ্নদন্ত শিগো-স্বুভে দৃষ্ট হয়—যেন বৃদ্ধ, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, নির্জ্জনে আসিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

শিগো-স্বুভে গরিলার ন্যায় বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদিগের সংসারিক প্রথা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যদিও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে পুরুষশিগো-স্বুভে স্বনির্ব্বাচিত [illegible]র সাহায্য গ্রহণ করে—স্ত্রীশিগো গৃহনির্ম্মাণ উপযোগী দ্রব্যাদি বহন করে ও পুরুষটী নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করে—যদিও কখন কখন স্ত্রীপুরুষকে একত্র মিলিয়া আহার করিতে দেখা যায়, তথাপি তাহার কখনও একগৃহে বাস করে না। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্ম্মাণ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শিগো-স্বুভে গরিলা অপেক্ষা ছোট। ডুশেলু কর্ত্তৃক নিহত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিগো-স্বুভে ৪॥ ফুটের অনধিক উচ্চ কিন্তু তাঁর কর্ত্তৃক রক্ষিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গরিলার চর্ম্ম মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট। শিগোর বক্ষ গরিলা অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহাদিগের শরীর সবল পেশীবিহীন। কিন্তু গরিলা অপেক্ষা ইহাদিগের বাহু দীর্ঘ—প্রসার করিলে এক হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সাত ফুট হইবে। এই দুই প্রাণীর লোমেরও পার্থক্য আছে। শিগোর লোম গরিলা অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ, উজ্জ্বল এবং কৃষ্ণবর্ণ। গরিলার মস্তক যেমন লোমাবৃত ইহাদের মস্তক তেমন নহে। ইহাদের মস্তকে আদৌ লোম নাই। নাসিকা গরিলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র; মুখ বিস্তৃত; কর্ণ অতি বৃহৎ ও মুখের নিম্নভাগ গোল। শিগোর দেহের পশ্চাৎ ভাগ লোমবিহীন। এবং সেখানকার চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগের ভ্রূ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও অল্প লোমাবৃত; মুখের নিম্নভাগ ও কর্ণ মধ্যস্থলের সমদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরল লোমযুক্ত।

ইহাদিগের বাসভূমি গরিলা অপেক্ষা অপ্রশস্ত। কেবলমাত্র আফ্রিকার মধ্যস্থিত অধিত্যকা ও নিবিড়তম বনে ডুশেলু ইহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। গরিলার সহিত একবনে ইহারা বাস করে এবং এই ভীষণ প্রাণীর সহিত বেশ সদ্ভাবে থাকে। ডুশেলু বলিয়াছেন:— “আমি অনেকবার শিগোকে রাত্রে স্বীয় বাসস্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতে দেখিয়াছি। অন্যও অনেকবার দেখিয়াছি, শিগো বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল ও তৎপরে গৃহবহির্স্থিত শাখার উপর স্বচ্ছন্দে বসিয়া গৃহচুড়া মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত রাখিয়া হস্ত দ্বারা বৃক্ষকাণ্ড বেষ্টন করিয়া রহিল।” ইহাদিগের গৃহের ছাদের আকৃতি ঠিক একটী বিস্তৃত ছাতার ন্যায় এবং ব্যাস আট ফুটের অধিক হয় না।

ডুশেলুর সহিত শিগোর প্রথম পরিচয়ের প্রায় এক মাস পরে সুবিধাক্রমে তিনি একটী শিগোশিশু ধৃত করিয়াছিলেন। ডুশেলু স্বয়ং এরূপ মনোহর ভাষায় তাহাকে ধরিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ও সেই শিগোশিশু যতকাল জীবিত ছিল ততকাল আচার ব্যবহারে আকৃতি ও প্রকৃতিতে মনুষ্যের ন্যায় অন্ততঃ মনুষ্যশিশুর সহিত তাহার এতদূর সাদৃশ্য ছিল যে, তাহার বিবরণ যথেষ্ট প্রীতিদায়ক হইবে। আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

“আমরা এক অধিত্যকার উপর দিয়া যাইতেছিলাম; এমন সময়ে একটী জন্তুশাবকের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাহা শিগোশিশুর শব্দ। ইহাতে যেন আমার অন্তরে বৈদ্যুতিক তেজোসঞ্চার হইল। ইতঃপূর্ব্বে প্রতি পদবিক্ষেপেই যেন প্রাণ বহির্গত হইতেছিল। সে বিষম ক্লান্তি তখন দূরীভূত হইল, যে ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদিগকে এতক্ষণ কাতর করিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ যেন লোপ পাইল। শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে আমরা যথাসম্ভব নিঃশব্দে জঙ্গলের ভিতর দিয়া হস্ত ও পদের উপর

ভর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে একখণ্ড পরিষ্কৃত ভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিলাম যে একটী প্রাণী আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে সমীপবর্ত্তী হইলে বুঝিতে পারিলাম যে একটী স্ত্রী শিগো-ম্বুভে বক্ষে একটী সন্তান ধারণ করিয়া চারিহস্তে ভর দিয়া বেগে আসিতেছে; সে সময়ে সে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া ফল ভক্ষণ করিতেছিল এবং একহস্ত দ্বারা অপর হস্তে সন্তানের ভার রক্ষা করিতেছিল।

“আমার একজন অনুচর সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে গুলি করিল। হতভাগিনী তৎক্ষণাৎ জড়বৎ ধরাশায়ী হইল। দুর্ভাগ্য শিশু ‘হিউ হিউ হিউ’ শব্দ করিয়া মৃত মাতার দেহ জড়াইয়া স্তনপান করিতে লাগিল এবং বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া মাতার বক্ষস্থলে মস্তক লুকাইল। আমরা মহানন্দে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ছুটিলাম। সেই শিগো-শিশুর মুখ নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ দেখিয়া আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় কৌতুহলোদ্রেক হইল। তাহার মুখ রক্তাভাহীন, বিবর্ণ, ইংরাজ শিশুর মুখের ন্যায় শুভ্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার মাতার মুখ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

“শিগো শিশুটী উচ্চে এক ফুটের অধিক হইবে না; আমার একজন অনুচর দৌড়াইয়া তাহার মস্তকে এক খণ্ড বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিল। ইত্যবসরে অন্য একজন তাহার গলদেশ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিল। শিশুটী অতি অল্প বয়স্ক হইলেও আমাদিগের সহিত চলিয়া আসিল। আমরা তাহাকে লইয়া অবিলম্বে আমাদিগের তাম্বু অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় পৌছিলাম। এতক্ষণ ক্ষুদ্র শিগো শিশুটী তাহার মৃতমাতার নিকট হইতে দূরে ছিল। এখন তাহাকে তাহার মাতার নিকট যাইতে দেওয়া হইল। তখন এক হৃদয়ভেদী করুণ দৃশ্য আমাদিগকে

বিচলিত করিয়া ফেলিল। শিগোশাবক দৌড়াইয়া তাহার মৃত মাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং মাতার মুখ ও বক্ষ স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিল যে নিশ্চয়ই কোন এক প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিছুক্ষণ সে মৃতমাতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যেন আদর করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী প্রগাঢ় দুঃখব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিল এবং সে অতি করুণস্বরে 'উঙ্গ, উঙ্গ, উঙ্গ' শব্দে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে আমার হৃদয় বিগলিত হইল। সেই শোকার্ত্ত আকৃতিতে স্পষ্ট বোধ হইল যে সে তাহার দুরদৃষ্ট যথার্থ অনুভব করিতেছে। আমাদের আবাসস্থ সকলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ তাহার দুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন।"

সেই ক্ষুদ্র শ্বেতমুখ বানরশিশুর মাতৃশোকে কোমলান্তঃকরণ শিকারী দুশেলু অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা করিতে অধিক দিন যাইল না। তিন দিনের মধ্যে সে এমন শান্ত হইল যে দুশেলুর হস্ত হইতে নিঃসঙ্কোচে আহার লইত। সে যেন বুঝিয়াছিল যে অদৃষ্টের সহিত বিবাদ করা বৃথা। একপক্ষমধ্যে সে এমন পোষ মানিল যে আর তাহাকে বন্ধন করা আবশ্যক হইত না; তখন সে যথেচ্ছা বিচরণ করিত। দুশেলু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "টমি"। টমি শীঘ্রই নীচপ্রকৃতি মানবসুলভ চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা করিল। দুশেলু লিখিয়াছেন:—"সে প্রায় আমার নিকট হইতে লুকাইয়া পলায়ন করিত। আমার কুটীরে প্রচুর পরিমাণে পক্ক কদলী ও অন্যান্য ফল থাকিত। টমি বুঝিয়াছিল যে, প্রত্যুষে যখন আমি নিদ্রিত থাকি তখনই চুরি করিবার প্রশস্ত সময়। সে তখন অঙ্গুলীর অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া নিঃশব্দে আমার শয্যার নিকট আসিত, আমার মুদিত চক্ষের উপর এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত এবং চক্ষের পাতা নিশ্চল দেখিলে

মহানন্দে নিশ্চিন্তমনে তথা হইতে যাইয়া স্বেচ্ছামত কদলী চুরি করিত। আমি অনুমাত্র নড়িলে সে বিদ্যুৎ বেগে পলায়ন করিত। অল্পক্ষণ পরেই আমি ঘুমাইতেছি কিনা আবার পরীক্ষা করিতে আসিত। যদি এরূপ চুরি করিতে আসিয়া কখনও দেখিত আমি জাগিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিত ও লাফাইয়া আমার গলা জড়াইয়া বসিত—যেন কত ভাল মানুষ—যেন আমাকে আদর করিতেই আসিতেছিল। সে অবস্থাতেও সহজে বুঝিতে পারিতাম, টমি মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণ নয়নে কদলীগুচ্ছের দিকে চাহিতেছে। আমার কুটীরের কপাট ছিল না; এক খণ্ড পর্দ্দাই দ্বারের কার্য্য করিত। আমি নিদ্রিত আছি কিনা দেখিবার নিমিত্ত 'টমি' অতি ধীরে সেই পর্দ্দার এক কোণ তুলিয়া উঁকি মারিত। আমরা তাহার এই রঙ্গ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইতাম। কখনও কখনও আমি নিদ্রার ভান করিতাম এবং 'টমি' যখন কদলী লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিত অমনি উঠিয়া পড়িতাম। সে তখন কদলীগুলি ফেলিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত।

"বানরজাতি যত প্রকার দুষ্টপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয় ক্ষুদ্র 'টমি' তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রমাণ দিয়াছিল! শীতকালের রাত্রে সে নিগ্রোভৃত্যদিগের শয্যায় প্রবেশ করিত এবং প্রাতঃকালে শয্যা হইতে বহির্গত হইয়া "হু, হু" শব্দ করিয়া পরমানন্দে প্রভুর করমর্দ্দণ করিত—যেন তাহার ভাষায় গুডমর্ণিং কথাটী 'হু হু'তে পরিণত হইয়াছিল। প্রাতঃ ভোজনের সময় সে মনুষ্যের ন্যায় বেশ সভ্যভাবে কাফিপান করিত। অবশেষে সে একদিন মদ্যপানে মত্ত হইয়া চিরকালের মত অখ্যাতি ক্রয় করিল। দুশেলু বলিয়াছেন—"দেখিলাম আমার বহুযত্নরক্ষিত ব্র্যাণ্ডির বোতলটী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। 'টমি' সেই ভগ্ন কাচখণ্ডগুলির পার্শ্বে 'বেদম

মাতাল’ হইয়া জড়সড়ভাবে পড়িয়া আছে। সেইটিই আমার শে
বোতল। আফ্রিকার এই অংশে ব্র্যাণ্ডি কুইনাইনের মত নিত্য-
প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি করিব, ‘টমি’ আমাকে বিষম কষ্টে ফেলিল
সেখানে ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যায় না। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াই
উঠিয়া আমার দিকে টলিতে টলিতে আসিবার চেষ্টা করিল, কি
পারিল না, অনেকবার পড়িয়া গেল। তাহার চক্ষু দুইটী তখন মদ্য-
পানে বিহ্বল মনুষ্যের ন্যায়। আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সে কেবল
বৃথা হস্ত প্রসার করিতে লাগিল। তাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছিল। প্রকৃত
পক্ষে তখন তাহার অবস্থা মদ্যপানে মত্ত মনুষ্যের ন্যায়—সে যেন
আপনার কুকার্য্যের নিমিত্ত অনুতপ্ত অথচ তাহার ভঙ্গিমা বিলক্ষ
রঙ্গপূর্ণ। তাহার প্রতি অঙ্গ বিক্ষেপে অনুতপ্ত মদ্যপানোন্মত্ত মনুষ্যের
ব্যবহার প্রতিফলিত হইতেছিল। আমি তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার
করিলাম। তাহাতে সেই ক্ষুদ্র মাতাল একটু প্রকৃতিস্থ হইল। কি
তদবধি তাহার বিষম পানাসক্তি জন্মিল—কিছুতেই তাহার সে আসক্তি
ত্যাগ করাইতে পারিলাম না।

“হায়, হতভাগ্য ‘টমি’ অকস্মাৎ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেল।
একদিন প্রাতঃকালে সে কিছুই খাইতে চাহিল না; অতি বিমর্ষভা
ধারণ করিয়া এবং কোলে উঠিয়া বসিবার ও তাহার গায়ে হা
বুলাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহার জ
বিবিধ প্রকার বন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। কিন্তু সে তাহা
একটীও স্পর্শ করিল না। তাহার শরীরে কোন প্রকার পীড়ার লক্ষ
দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সে দিন সে কিছুই খাইল না। পর দি
অনুমাত্র কষ্ট না পাইয়া পাঁচ মাস মাত্র বয়সে প্রাণত্যাগ করিল।”

শ্রীবিপিন বিহারী দত্ত।

মহানাটক।*

নান্দী।

ত্রিগুণের সহায়তা অবলম্বি’ যিনি বারম্বার
স্বেচ্ছাক্রমে করিছেন সৃজন পালন সংহার,
কি-এক মহিমা যাঁর লোকাতীত, বিরাজয়ে
সর্ব্বসীমা করি’ অতিক্রম,
চক্ষু শ্রোত্র ইন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিত হয়েও যিনি
ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে দক্ষতম,
—সেই বিশ্বেশ্বর দেব
তোমাদের করুন রক্ষণ॥

শুণ্ডাগ্রে গণেশ যবে সমস্ত সমুদ্র-জল
পান করি’—করিলেন পুন উদ্গীরণ,
সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিলেন সবিস্ময়ে
গগন-মণ্ডলবাসী যত দেবগণ।
কোথাও রহিল অম্বু, কোথাও বা ব্রহ্মা বিষ্ণু,
কোথাও অনন্ত আর কোথাও বা শৈল;
কোথাও বাড়বানল, কোথাও বা রত্নরাশি,
কোথাও বা মৎস্য নক্র তিমি তিমিঙ্গিল;
—এ-হেন সে বিঘ্নেশ্বর বিঘ্নবিনাশন
গণপতি তোমাদের করুন রক্ষণ॥

রঘুবংশ-অবতংশ— কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন,
দশানন-হন্তা যিনি, যিনি পদ্মপলাশলোচন,

* হনুমান-রচিত বলিয়া ইহার আর এক নাম হনুমান-নাটক। কিন্তু ইহার প্রকৃত গ্রন্থকার শ্রীমধুসূদন মিশ্র। নাটক না বলিয়া ইহাকে কাব্য বলিলেই ঠিক হয়। গ্রন্থকার রাম-বৃত্তান্ত ঘটিত নানা শ্লোক নানা গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দাতে রচিত হয়।

সেই সে রামের জয় জয় জয় বল' সর্ব্বজন ॥
সুর-কল্পতরু যিনি ধনুর্দ্ধর, নীরদবরণ,
গুণ-অভিরাম সেই রামচন্দ্র কমল-বদন
লক্ষ্মীর আস্পদ, যাঁরে লক্ষ্মী নাহি ত্যজেন কখন ॥
লক্ষ্মণ অনুজ যাঁর, রঘুবর, সীতাপতি,
সুরূপ সুন্দর,
কাকুৎস্থ, করুণাময়, বিপ্র-প্রিয়, গুণনিধি,
ধার্ম্মিকপ্রবর,
রাজ-শ্রেষ্ঠ, সত্যসন্ধ, দশরথের তনয়,
সৌম্য শান্ত মূরতি শ্যামল,
রঘুকুল-তিলক যে, রাঘব, রাবণ-অরি
—বন্দি তাঁর চরণ-কমল ॥
মন-অভিরাম যিনি, নয়নাভিরাম,
বাক্য অভিরাম যিনি, শ্রবণাভিরাম,
—বন্দি আমি সদা সেই দাশরথী রাম ॥
তুমি গো শ্রীরামচন্দ্র, ভুবন-বিশ্রুত কীর্ত্তি-চন্দ্র,
মৃদু হাস্যানন-চন্দ্র, নিশাচরগণ-পদ্মচন্দ্র, *
তুমি গো আনন্দচন্দ্র, রঘুবংশ-জলধির চন্দ্র,
সীতা-চিত্ত-কুমুদের সুখচন্দ্র তুমি সীতাপতে !
নমি তোমা বার বার নমোনমঃ নমস্তে নমস্তে !
সর্ব্ব কল্যাণের মূল কলি-পাপ-ধ্বংসক্ষম,
সজ্জন-জীবন ;
কৈবল্য লভিবারে ঝটিতি আকাঙ্ক্ষা করে
মুমুক্ষু যে জন
—পথের সম্বল তার ; কবিবর-বচনের
যাহা হয় একমাত্র বিশ্রামের স্থল,

* রাক্ষসরূপ পদ্ম যে চন্দ্রের উদয়ে সঙ্কুচিত হয়।

পাবক-পাবন যাহা,— ধর্ম্মতরু-বীজ সেই
রাম-নাম তোমাদের করুক মঙ্গল ॥
যে রামের বাহুদ্বয় ক'রিয়াছে ছারখার
দশানন-কণ্ঠরূপ কদলীর বন,
সতী-কুচ-কুম্ভ-লগ্ন কুঙ্কুমের রজ-চূর্ণে
অঙ্কিত হইয়া ধরে অরুণ বরণ,
লোক-পরিত্রাণকর সেই বাহু সাধুজন-
কৃত যজ্ঞ-যূপের সমান,
সেই মহৈশ্বর্য্যশালী বাহুদ্বয় করুক গো
তোমাদের মঙ্গল বিধান ॥
শিব-ধনুর্ভঙ্গাবধি বাল্যকালে রামচন্দ্র
করিলেন বাল্যলীলা যত,
অরণ্য-গমনাবধি করিলেন নম্রভাবে
যাহা কিছু পিতৃ-আজ্ঞামত,
সুগ্রীবের সখ্যাবধি করিলেন যে সকল
দয়ার করম,
বারিধি-বন্ধনাবধি করিলেন যাহা কিছু
প্রকটি' শাসন,
লঙ্কেশ-বিনাশাবধি করিলেন অর্জ্জন
যে সমস্ত যশ,
জানকী-বর্জ্জনাবধি করিলেন যাহা কিছু
হয়ে লোক-বশ,
সেই সব তাঁর কার্য্য অতীব বিচিত্র
তোমা সবাকারে যেন করয়ে পবিত্র ॥

সূত্রধার।

বাল্মীকির উপদেশে বক্তা স্বয়ং কপি হনুমান ;
রঘুবংশ-ধুরন্ধর শ্রীরামের চরিত মহান্ ;
সৌম্য নর্ত্তক মোরা ; বেষ্টিত এ সভাস্থল
সুহৃৎ সজ্জনে ;

তাই বলি, সুধিগণ! আনন্দ সম্ভোগ কর
তোমরা এক্ষণে ;
রামায়ণ-কথা আমি বলিতেছি, শোনো সবে
প্রফুল্লিত মনে ॥
মহারথ দশরথ সূর্য্যবংশ-অগ্রগণ্য
ছিলেন নৃপতি ;
ছিল তাঁহার তিন মহিষী শুভলক্ষণা
—অতি রূপবতী।
জ্যেষ্ঠ রাম, তার পর কনিষ্ঠ ভরত, পরে
অনুজ লক্ষ্মণ,
শত্রুঘ্ন তাহার পর ; —জনমিল বীরপুত্র
এই চারি জন।
শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন সে, —কৈকেয়ী-নন্দন সেই
ভরতের স্নেহবশে হৈলা অনুগত।
ধর্ম্মকর্ম্মে সুপ্রবীণ লক্ষ্মণ সুমিত্রা-পুত্র
হইলেন স্নেহবশে রামের ভকত।
দশরথ নৃপতির চারিটি তনয় এই
বিষ্ণুর ছিলেন সবে অংশ-অবতার ॥
তার মধ্যে রামচন্দ্রে প্রার্থিলে কৌশিক মুনি
যজ্ঞসিদ্ধি তরে,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি' লক্ষ্মণেরে লয়ে রাম
কৌতুকের ভরে
গেলেন সে যজ্ঞভূমে বধিতে রাক্ষসগণে ;
যাত্রাকালে পুরনারীগণ
নয়ন-কমল খুলি' সাদর ঔৎসুক্য ভরে
করিতে লাগিল নিরীক্ষণ।

[শ্রীরামচন্দ্র তপোবনে প্রবেশ করিলে বৈতালিকের প্রবেশ।]

বৈতালিক।—জয়া ও বিজয়া এই উৎকৃষ্ট বিদ্যা দুটি
বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে হয়ে অবগত

যাজ্ঞিকের হয়ে বন্ধু বধিতে রাক্ষসবৃন্দ
দেখ ওই রামচন্দ্র এবে সমাগত ॥
রাক্ষস-চমূর নেতা মারীচ রাক্ষসবরে
বধিলেন স্বয়ং রাঘব।
লক্ষ্মণের শরাঘাতে যমালয়ে গেল চলি,
আর যত রাক্ষসেরা সব ॥
মহর্ষিগণের সাথে বিপ্রবর্গ সকলেরি
হইল আহ্লাদ।
যজ্ঞক্রিয়া সমাপনে হয়ে হৃষ্ট করিলেন
শুভ আশীর্ব্বাদ।
রক্ষকুলে রামভদ্র করিলে নিধন,
যজ্ঞকর্ম্ম বিধি মতে করি' সমাপন,
বিশ্বামিত্র চলিলেন জনক-পত্তনে
সঙ্গেলয়ে নিজ সাথে রাম ও লক্ষ্মণ ॥

(বৈতালিকের প্রস্থান)

রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলে
বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—যজ্ঞ-বিঘ্ন-নাশ-তরে বিশ্বামিত্রমুনি হস্তে
দশরথ দিলেন যাঁহারে,
বন প্রস্থানের কালে পথের মাঝারে যিনি
বধিলেন পাপ-তাড়কারে,
মুনি-হতে অস্ত্র লভি' মুনির সে যজ্ঞ যিনি
দেখিলেন কৌতুকের ভরে,
সেই সে রাঘব এবে অনুজে লইয়া সাথে
সমাগত জনক-নগরে ॥
নিজের সে যজ্ঞকর্ম্ম সুসম্পন্ন হল যবে
তখন সে বিশ্বামিত্র মুনি,
সীতা-স্বয়ম্বরাগত নৃপ যত, ধনুর্যজ্ঞে
ভগ্নবীর্য্য হইয়াছে—শুনি,'

জনকের আমন্ত্রণে রামভদ্রে লয়ে সাথে
আইলেন তিনি মিথিলায় ;
যোগ্য অভ্যর্থনা লভি' উপস্থিত হইলেন
অবশেষে যজ্ঞের সভায় ॥

(জনকের প্রবেশ।)

জনক।—অসুর-সুর-ভুজঙ্গ বানর-নর-কিন্নর
সিদ্ধ চারণ-আদি-মাঝে যেই জন
এই ভীম হর-ধনু পারিবেক নোয়াইতে,
মোর কন্যা সীতারে সে করিবে বরণ ॥

(রাবণ-দূত শৌষ্কলের প্রবেশ)

শৌষ্কল।—(সকোপে)
দুর্ম্মদ রাজন্ ও গো! যে রাবণ-বাহুবলে
—হর ও হর-বল্লভা পার্ব্বতী-সহিত—
গণেশ, কার্ত্তিক, বৃষ ভূতগণ-সমাকীর্ণ
গিরিরাজ কইলাস হয় উত্তোলিত,
সেই মহাবাহুবল রাবণ রাজের
হরধনুর্ভঙ্গ-কাজে পরীক্ষা কিসের ?

জনক।—এ হর-ধনুতে যেই বসাতে পারিবে ছিলা
করিব তাহারে কন্যাদান।

শৌষ্কল।—গুরুর ধনুক সে যে নতুবা গো ক্ষণমাত্রে
করিতেন তারে খান্ খান্ ॥
এ তব দুহিতাটিরে কাহাকেও-না-কাহাকে
অবশ্য করিতে হবে দান।
যার ভুজ-পরাক্রমে সমস্ত এ ত্রিভুবন
হইয়াছে মশক-সমান,
সেই লঙ্কা-অধিপতি যাচে তব দুহিতারে,
কেন তবে মূঢ়বৎ করিছ দর্শন ?
জামাতো মরীচী-আদি পূর্ব্বতন মুনিগণ
সাত্ত্বিক চরিত্র তাঁর করিলা কীর্ত্তন ॥

(রামের প্রতি)
চারিদিক হতে যাঁরে সুরাঙ্গনাগণ
বায়ুর তরঙ্গ তুলি করিছে ব্যজন
উজ্জ্বল অর্গল-সম বাহুদুটী যাঁর
চারি ধারে সন্তরন্ত করিছে বিস্তার,
ত্রিভুবন জয়ী সেই পুলস্ত্য-নন্দন
যাহারে হৃদয়-মাঝে করিল ধারণ
—জনক-নন্দিনী সেই—সীতা যার নাম—
করিসনে তারে বিয়া শোন্ বলি রাম !
শম্ভুর আবাস-ভূমি কৈলাস-পর্ব্বত যেই
তুলে কুতূহলে,
সে রাবণ হর-ধনু পারে না কি আকর্ষিতে
নিজ বাহুবলে ?

(খেদ-সহকারে)
মহেশ্বর-উপাসক রাজা দশানন ;
হীনবল অতি ক্ষুদ্র অন্য রাজগণ,
ধনুর্ভঙ্গপণ এবে জনক রাজার,
হায় সীতা ! এ সঙ্কটে কি হবে তোমার ?

(দূতের প্রস্থান।)

নৃপ-পূর্ণ সভামাঝে জনক-রাজার পুরোহিত
শতানন্দ, রাজাদের কহিলেন বচন বিহিত।

শতানন্দ।—শোনো গো ক্ষত্রিয় সবে, জনকের পণ :—
কুণ্ঠিত-শকতি যাহে রাজা দশানন,
সেই ধনুকেতে ছিলা যেই দিবে তুলি'
তারি পত্নী—ত্রিভুবন-জয়িনী মৈথিলী ॥

(নৃপতিগণ ধনুর্গ্রহণ না করায়)

জনক।—দেশদেশান্তর হতে সমাগত বহু নরপতি ;
কাঞ্চন-কোমল-কান্তি এই কন্যা—কীর্ত্তিও মহতী ;
কিন্তু তবু কাহা-হতে হ'ল না এ ধনু আকর্ষিত,
টঙ্কিত, নমিত কিম্বা স্থান-হতে তিল উত্থাপিত।
কি আশ্চর্য্য হায়-হায় ! উর্ব্বীতল নির্ব্বীর নিশ্চিত॥

সীতার সখীজন।—রাম দুর্ব্বাদল শ্যাম জানকী কানকী লতা,
যোগ্য এ উদ্বাহ, কিন্তু বিষম সে পণ-কথা।

সীতা।—(স্বগত)
কমঠ-পৃষ্ঠের সম কঠোর এ ধনু,
কোমল মধুর রঘু-নন্দনের তনু,
কেমনে ধনুতে হবে গুণ আরোপণ,
ও হো হো ! পিতাগো তব দারুণ এ পণ॥

লক্ষণ।—(শ্রীরামের লজ্জা হইলে সীতার উৎসাহ-বর্দ্ধন করত)
বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ ! অধিক বলিব কিবা আর,
উপস্থিত আছে হেথা লক্ষণ, এ কিঙ্কর তোমার ;
সুমেরু-ভূধর আদি তুচ্ছগণি, তুচ্ছ এই
মাহেশ্বর-ধনু পুরাতন ;
আদেশ করহে বীর ! পাইলে বচন তব
কতুহলী আমি এ লক্ষণ,
উত্তোলিতে, নাড়াইতে নোয়াতে, ভাঙ্গিতে এই
ধনুটিরে আমি-ই সক্ষম॥

কবি।—পরিণয়োদ্যত হয়ে রামচন্দ্র হরধনু
করিলে গ্রহণ,
জানকী ও জামদগ্ন্য —উভয়েরি বাম নেত্র
হইল স্পন্দন।

রাম।—(ধনুর্গ্রহণ)

লক্ষণ।—পৃথ্বী হও স্থির তুমি, নাগ-পতি ধর' পৃথিবীরে,
তুমি ওগো কুর্ম্মরাজ ! ধর' ধর' ভুজঙ্গ-পতিরে,

তোমরা গো দিক্-হস্তী ! তিনেরেই করহ ধারণ,
হরের ধনুতে আর্য্য করিছেন গুণ আরোপণ॥
পৃথ্বী রসাতলোন্মুখী ; ফণিপতি আনমিত
ফণা ধরি হইল ব্যথিত ;
কুর্ম্মরাজ-সহ যত দিক্-গজ সকাতর
ঘোররবে কর়য়ে বৃংহিত ;
রাঘব-পুঙ্গব এবে হর-শরাসনে গুণ
ওই দেখ করেন যোজিত॥
হর-শরাসন, রাম তুলিলা যখন,
মুচকি-মুচকি হাসে যত নৃপগণ।
গুণ-আরোপণে যবে হইলা তৎপর,
করতালি দিয়া হাসে তারা পরস্পর।
অঙ্গুলী-পল্লবগুলি করি' সঞ্চালন,
করিতে উদ্যত যবে গুণ আকর্ষণ
ম্লানমুখ হল তারা ; গুণে দিয়া টান্
খান্-খান্ করে যবে সেই ধনু, রাম,
অমনি, নৃপতি যারা ছিল উপস্থিত
নিজ নিজ সিংহাসনে হইল মূর্চ্ছিত॥
কৌশিক-পুলক-সাথে ধনু হল উত্তোলিত,
নৃপদের মুখ-সাথে ধনু হল আনমিত,
জনক-সংশয়-সাথে ধনু হল আন্দোলিত,
বৈদেহীর চিত্ত-সাথে ধনু হল আকর্ষিত,
ভার্গবের গর্ব্ব-সাথে ধনু হল বিখণ্ডিত॥
চতুর্ম্মুখ-অষ্টকর্ণ করি' মুখরিত,
অষ্টদিক্ সমুদায় করিয়া ধ্বনিত,
অষ্টমূর্ত্তি শঙ্করের করি' বক্রীকৃত,
অষ্ট কুল-পর্ব্বতেরে করি' বিদলিত,
বধীর করিয়া তুলি অষ্টনাগগণে
আর্য্য-ধনু-মহানাদ উঠিল গগনে॥

নিদ্রা ত্যজি মুরারীর, সকল নৃপতিদের
শৌর্য্যদর্প করিয়া খণ্ডিত,
দিগ্‌দন্তী-সমূহের ছেদি' কর্ণ, আর করি'
সর্পরাজ-ফণারে কম্পিত,
উদ্দাম গম্ভীর সেই কল্পান্ত জলদের
গরজন করি' তিরস্কৃত
ভগ্ন-[illegible]-ধনু-হতে ভীষণ টঙ্কার-ধ্বনি,
মহারবে হল বিনিসৃত ॥
সপ্তলোক নিনাদিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করি তুলি
সূর্য্যের সাতটি তুরঙ্গ,
সপ্তর্ষির ধ্যান ভাঙি, বিক্ষুব্ধ করি তুলি'
সপ্ত-মহাসিন্ধুর তরঙ্গ,
অতল বিতল আর নিতল সুতল আদি
সপ্ত রসাতলদের করি আন্দোলিত।
রাম-বাহু-বিদলিত কোদণ্ড-প্রচণ্ড-ধ্বনি
গগন-মণ্ডল ব্যাপি' হল সমুত্থিত ॥

কন্দুক-লাঞ্ছন-চিহ্নে যেই বাহু এখনো ভূষিত,
রক্ত-পদ্ম-নাল সম যেই বাহু হয় গো লক্ষিত,
যে বাহুতে কৌশল্যা পরাইলা মঙ্গল-কঙ্কণ,
যে বাহু বাড়িবারে করিয়াছে সবে উপক্রম,
সেই রাম-বাহুবলে সহসা সে হরধনু ভগ্ন
আর সেই ধনু-হতে ঘোর শব্দ হয়ে উৎপন্ন,
ত্রিলোক দলিত করি' কল্পান্ত-সাগরে হ'ল মগ্ন ॥
যে ভীম কঠোর নাদে সভাজন হইল বিস্মিত,
ত্রাসে রবি মার্গভ্রষ্ট, শম্ভু-শিব হ'ল বিকম্পিত,
বিশ্বলিত দিগ্‌দন্তী, বিচলিত মহা-গিরিকুল,
আন্দোলিত সপ্তসিন্ধু, বৈদেহী সে মদন-আকুল,
মদান্ধজনেরা সবে হইল দমিত,
সমস্ত ত্রৈলোক্য তাহে হল সম্মোহিত ॥

সে প্রচণ্ড শব্দ-পিণ্ড বিজয়-ডিণ্ডিম-সম
আর্য্যের সে বাল্য-কথা
বিশ্বজনে করি' বিঘোষিত,
ত্রৈলোক্য-কপাল ভেদি' ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে
ভ্রমিয়া অদ্যিও তবু
কিছুমাত্র হল না শমিত ॥
ধনুর্ভঙ্গে দশ দিক্ যে করি[illegible] মুখরিত
অসামান্য ধনুর্বিৎ মহা কীর্ত্তিমান
জনক-কন্যার সেই শ্লাঘ্য বরণীয় বর
—করি আমি বারবার তাঁহারে প্রণাম ॥

শতানন্দ-আনীত দশরথ মিথিলায়
প্রবেশ করিলে বৈতালিকের
পাঠ।

শতানন্দ-প্রমুখাৎ শুনি' হৃদ্য প্রিয়বাক্য
—রাম-শৌর্য্য কথা
হৃষ্ট হয়ে দশরথ আর দুটি পুত্র সাথে
আইলেন তথা।

পরমাতিথেয় রাজা জনক মিথিলা অধিপতি
আতিথ্য সৎকার করি' যথাবিধি দশরথ-প্রতি
নিজ কন্যা সীতা ও তার কনিষ্ঠ ঊর্ম্মিলায়,
মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি,— কুশধ্বজ ভ্রাতার কন্যায়
শ্রীরাম লক্ষণে আর ভরত শত্রুঘ্নে
যথাবিধি সম্প্রদান করিলা যতনে ॥
রসাল মর্দ্দল-রব, ভেরীর গভীর ধ্বনি
[illegible]ার অন্য বাদ্য শব্দজালে,
হইল গো পরিপূর্ণ পৃথিবী গগনতল
রাম সীতা-পরিণয় কালে ॥

বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম,
—ইহাঁদের দ্বারা হ'ল সমাপন শুভ অনুষ্ঠান।
অনুজ-সহিত রাম তিল, গাভী আর বহুধন
ঐ সব পুরোহিতে মুক্ত হস্তে করিলেন দান॥
জনক ও দশরথ —এ দোঁহার অপত্যের
হল শুভ পরিণয়-যোগ ;
ত্রিভুবন-জন তাহে হইয়া একত্র সবে
হরষ প্রমোদ কত করিল সম্ভোগ।
সীতায় শ্রীরামচন্দ্র, ভরত সে মাণ্ডবীরে,
লক্ষণ সে চারু উর্ম্মিলায়
করিলে বিবাহ, পরে উৎসব করিয়া শেষ
দশরথ গেলা অযোধ্যায়।
মহাবীর শ্রীরামের বিক্রম কীর্ত্তন করি'
এ মহানাটকখানি রচিলা হনুমান।
শ্রীমধুসূদন মিশ্র রচি' তা' সন্দর্ভাকারে
প্রথম অঙ্কের দিলা "সীতালাভ" নাম॥
ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস।

বল্লাল সেনের সঙ্গে সঙ্গেই রামপালের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন, কিছুকাল রামপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই স্বনাম-প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণাবতী নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত, লোক-প্রবাদ বা অন্য কোনও সূত্রে জানা যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। নানা দিগ্দেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালোচনায়, তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অনুকরণে গঠিত, তাঁহার পঞ্চরত্ন নামে এক সভা ছিল। গোবর্দ্ধণাচার্য্য, বারণাচার্য্য, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ মিশ্র এই পঞ্চ উজ্জ্বল রত্ন দ্বারা লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন-সভা সদা শোভিত থাকিত। এই জয়দেবই, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতময় "গীত-গোবিন্দ" কাব্যের প্রণেতা—অমর কবি জয়দেব গোস্বামী। কথিত আছে, তিনি লক্ষ্মণসেনের সভায় থাকিয়াই উক্ত মধুময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হলায়ুধ, উক্ত পণ্ডিত সভার সদস্য ও রাজার প্রধান মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাঁর রচিত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতিগ্রন্থ ইহাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে বর্ত্তমান আছে।

লক্ষ্মণসেনের পরেই রামপাল-রাজধানী একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তবে লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র লাক্ষ্মণেয় সেন, সময় সময় রামপালে আসিয়া বাস করিতেন। কথিত আছে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে পর, লক্ষ্মণসেন পরিবার ও পরিচারকগণ-

সহ নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া রামপালে আসিয়া বাস করেন। শেষে জীবনের অন্তীম সময়ে পুরুষোত্তমধামে চলিয়া যান। সেখানেই তাঁহার অশান্তিময় জীবন চিরশান্তি লাভ করে।

লক্ষ্মণসেনের অবসানের সঙ্গেই রামপালের অস্তমিতপ্রায় সৌভাগ্য রবির অবসান হয়। মুসলমান-প্রভাব শনৈঃ শনৈঃ সমস্ত বঙ্গদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু হিন্দু-প্রভাব অন্তমিত হইলেও মুসলমান-প্রভাব বদ্ধমূল হইতে অনেক কাল গত হইয়াছিল। এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ, একপ্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল। এই অরাজক সময়ে রামপালের সমৃদ্ধ অধিবাসীগণ, রাজশূন্য বিলুপ্ত-প্রভ রাজধানীতে বাস করা শঙ্কাজনক মনে করিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান। সেই সময় হইতেই সুরম্যহর্ম্ম্যাবলীপরিশোভিত রামপাল, বিজন অরণ্যে পরিণত হইতে থাকে।

রামপালের অবনতির সঙ্গেই বিক্রমপুরও হতশ্রী হইতে থাকে। হিন্দুরাজশ্রী বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিলে অরাজকতায় দেশ সমাচ্ছন্ন হয়। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, দস্যু তস্করাদির উপদ্রব দেশে বিশেষ প্রাবল্য লাভ করে। সেই সময় হইতে বিক্রমপুরের ঐতিহাসিকতত্ত্ব, ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সেই অনালোকিত অতীতের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। জনশ্রুতি, পুরাতন মঠ, মন্দির, দেউল, দীর্ঘিকা প্রভৃতি হইতে যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়, তাহা আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইলেও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে হয়ত কালে কোন ঐতিহাসিকের প্রয়োজনে আসিতে পারে।

রামপালে হিন্দুরাজত্বের অবসানের পর হইতে মোগল রাজত্বের প্রায় অন্তিম সময় পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, বিক্রমপুরে যে সকল

ব্যক্তি অসাধারণ কার্য্য বা অসাধারণ গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাসস্থল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে বিশেষ বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন,—যাঁহাদের কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ বক্ষে বহন করিয়া বিক্রমপুর আজিও পূর্ব্বস্মৃতিজনিত উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করে—সেইরূপ কয়েকটী লোকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এই প্রবন্ধে জগন্নাথ বণিক, রাজা রঘুনাথ রায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়, কাজি মহোম্মদ সাদি উদ্দিন এই চারি ব্যক্তির বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

কোনো পুরাতন বৃত্তান্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেই, অধিকাংশ স্থলে জনশ্রুতির উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এক ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তব ঘটনার সহিত নানা অবান্তর ঘটনা মিশ্রিত হইয়া বাস্তব বৃত্তান্তটীকে এরূপ দুরূদ্ধর করিয়া তুলে যে সহসা বাস্তব বৃত্তান্তের উদ্ধার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহু লোকের নিকট এক বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তত্ত্ব লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহেও সেই পথই অনুসৃত হইতেছে। অনেকে জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করিতে ভরসা করেন না, কিন্তু আমরা বলি "নহ্যমুলাজনশ্রুতি" এই প্রাচীন বাক্যটীর মূলে সত্য নিহিত আছে। কিন্তু আমরা কেবল জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করি নাই; প্রত্যেকের নামের সহিত জড়িত হইয়া যে ২।৪টী কীর্ত্তি—মট, মন্দিরাদির ভগ্নাংশ, দেউল, সরোবরাদি বর্ত্তমান আছে, সেই সকল আমরা ভালরূপ পরিদর্শন ও তৎপার্শ্বস্থিত লোকদিগের নিকট তৎবৃত্তান্ত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া প্রধান জনশ্রুতির সহিত তাহার সমন্বয় করিয়াছি। এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত যতটুকু সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছি।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ-কালে রামপালে নিকটবর্ত্তী স্থানে জগন্নাথ বণিক নামে এক ব্যক্তি অতুল সম্পত্তি অধিশ্বর হইয়া, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জগন্নাথ অতি দরিদ্রের সন্তান ছিল। বাল্যে ইহার পিতৃবিয়োগ হইলে একমাত্র বিধবা জননীই তাহার অকূল সংসারসাগরের ভগ্নতরণী ন্যায় একমাত্র আশ্রয় ছিল। বালক জগন্নাথ ৮।১০ বৎসর বয়সে সময়ই পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'য়। বনজাত ঔষধ, লতা, পত্র বৃক্ষ, বল্কলাদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করাই তাহার ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসায়ে তাহার ও তাহার জননীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনও প্রকারে চলিত। এই দরিদ্র বালক তখন "জগাবেণে" নামে পরিচিত ছিল। কালে এই জগাবেণেই কোটী-পতি জগন্নাথ বণিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দরিদ্র বালক জগন্নাথ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া কিরূপে জয়লাভ করে, কিরূপে কপর্দকসম্বলহীন বালক অতুল ধনেশ্বর হইতে সমর্থ হয়, তাহার প্রকৃত কারণ সৌজন্য ও ব্যবসায়-নৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই অনুমিত হয় না। কিন্তু তাহার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অসাধারণতা দৃষ্টে, তাহার একটী অসাধারণ কারণও লোকে প্রচার করে। সেটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহা জগন্নাথের সম্পত্তির বিপুলতার একটা আনুসঙ্গিক প্রমান লোকচিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছে। উপাখ্যানটী কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

কথিত আছে—একদা জগন্নাথ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বাজারে সম দিন নিজের দোকানের কাজ করিয়া সন্ধ্যার পরে একটী বোয়াল মা লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়। জগন্নাথের গৃহে এমন অস্ত্র ছিল না যদ্বারা অত বড় মাছ কাটা যাইতে পারে। জগন্নাথের মাতা কো প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে একখানা মাছ কাটা দা চাহিয়া আনে এ

মাছটী কাটিয়া রাত্রিতেই প্রতিবেশীকে তাহার দা ফিরাইয়া দেয়। পর-দিন প্রতিবেশী আসিয়া বলে যে আমাকে যে দা রাত্রিতে দিয়াছ, তাহা আমার দা নয়। জগন্নাথের মাতা বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পায় প্রকৃতই দায়ের বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একথা প্রচারিত হইলে অনেকেই সেই দা দেখিতে আসে। অভিজ্ঞ প্রতিবেশীগণ দর্শনমাত্রই দাখানা স্বর্ণময় বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান হইতে থাকে। অনুসন্ধানে স্থির হয় যে, নিশ্চয়ই বোয়াল মাছের উদারাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল, তাহার সংস্পর্শেই লৌহময় দা, স্বর্ণময় হইয়াছে। ইহার পরে জগন্নাথ যেখানে মাছের আঁইস ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেখানে অনুসন্ধান করিয়া সেই স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়। এই স্পর্শমণির প্রভাবেই লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া জগন্নাথ অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা কল্পিত উপাখ্যান মাত্র। যাঁহারা বানিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা জানেন বানিজ্যে যখন পড়তা পড়ে তখন স্পর্শমণির বিস্ময়করী শক্তির অপেক্ষাও তাহার শক্তি অধিকতর বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। স্পর্শমণি লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করে; পড়তা, ছাইমুষ্টিকে স্বর্ণমুটিতে পরিণত করিয়া থাকে। যখন যাহার পড়তা পড়ে তখন তাহার সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশির ন্যায়, আপনা হইতেই কাটিয়া যায়। জগন্নাথেরও তাহাই ঘটিয়াছিল, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

জগন্নাথ নানা সৎকার্য্যে ধনরাশির বিনিয়োগ করিয়াছিল। কথিত আছে, সে অষ্টোত্তর শত দেউল প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এতৎ ভিন্ন বহুসংখ্যক দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করে। তাহার প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক দেউলের ভগ্নাবশেষ—ইষ্টকের স্তূপাকার, আমরা জোড়া-

দেউল, গানাম, সুখবাসপুর, দেওসাব, সোণারঙ্গ প্রভৃতি গ্রা... আজিও দেখিতে পাই। এক একটী দেউলের ভগ্নাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীতি হয় যে, দেউলগুলি বিপুলায়তন ছি... এক একটী দেউলের ভগ্নাবশেষ দ্বারা কোন কোন স্থানে ২।৩ বি... ভূমি, তৎচতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা ৮।১০ হাত উচ্চতা লাভ করিয়াছে... জোড়াদেউল গ্রামে এইরূপ দুইটী (জোড়া) দেউল একস্থানে প্রতি... ছিল বলিয়াই ইহা জোড়াদেউল নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে... এই দেউলদ্বয় যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজিও "দেউল বাড়ী" না... তাহা পরিচিত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ বহুসংখ্যা... দেউলের ভগ্নাবশেষ এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্তগুলি... জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। ভগ্ন-দেউলের ইষ্টকস্তূ... তৎপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই স... ইষ্টকস্তূপের উপর নানা প্রকার বৃক্ষাদি জন্মিয়া পাহাড়ের সহি... সমতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। অনেক দেউলের উপরে গৃহস্থ... আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। এই সকল দেউলে... গঠণ প্রণালী ও তাহার নির্ম্মাণকৌশল কিরূপ ছিল, এবং তাহা... কোন্ প্রকার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কিছু... জানিবার উপায় নাই। এই সকল স্থান খনন করিলে বহু পুরা... আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ ভরসা করা যায়। কিন্তু তাহা বহু অ... ব্যয় ও রাজশক্তির সাহায্য সাপেক্ষ।

প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল উক্ত দেউল বাড়ীর এক স্থান খ... করার সময় বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ অনেক প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। বহু চে... তাহার এক খণ্ড উত্তোলিত হইয়াছিল। তাহা নানা কারুকা... সমন্বিত ও খোদিত দেবনাগর অক্ষরলিপি পূর্ণ ছিল। এই প্র... খণ্ড এক কাগজীর নিকট যৎসামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়। কাগজী...

...সুদৃঢ় প্রস্তরের উপর কাগজের উপাদানসামগ্রী, জীর্ণ বস্ত্র, পাট ইত্যাদি ...রাখিয়া ঢেকি দ্বারা তাহা চুর্ণ করে, সেই চুর্ণ, মাড়যুক্ত জলে গুলিয়া ...কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সামান্য কার্য্যের জন্য একটী অমূল্য ...জিনিস তুচ্ছ মূল্যে কাগজীর হস্তগত হয়। আমরা সেই কাগজীর ...অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। উক্ত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া ...গেলে পুরাতন অনেক কথা জানিবার উপায় হইত। অপর প্রস্তর ...খণ্ড পূর্ব্বকথিত স্থানেই পতিত আছে। বিশেষ চেষ্টা করিলে এই ...প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা যায় তাহাতে ...কোন কারুকার্য্য বা লিপি দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ বণিক যে সকল জলাশয় ...প্রতিষ্ঠা করিয়া যায়, তাহার অনেকগুলি এখনও দৃষ্ট হয়। যেখানে ...জগন্নাথের দেউল আছে তাহার নিকটেই তৎকর্ত্তৃক নিখাত জলাশয় ...দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে জোড়াদেউলগ্রামে যে দেউল বাড়ীর ...কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে একটী পুরাতন দীর্ঘিকা ...জগাবেণের দীঘিনামে আজিও পরিচিত হইতেছে। আমরা অনুসন্ধান ...করিয়া আর কোন জলাশয় জগন্নাথ বণিকের নামাঙ্কযুক্ত দেখিতে ...পাই নাই। কিন্তু জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত দেউলের অদূরেই যে সকল ...পুরাতন জলাশয় দেখা যায় সেগুলি যে তৎকর্ত্তৃক নিখাত তাহাতে ...কোন সন্দেহ থাকে না। জগন্নাথের বাস ঠিক কোন্ স্থানে ছিল তাহা ...নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথের বংশধরদের মধ্যে ...কেহ কেহ পঞ্চসার নামক স্থানে বাস করিতেছে। পঞ্চসার গ্রামে কয়েক ...র বণিক বাস করে সত্য কিন্তু তাহারা কেহই তাহাদের ধারাবাহিক ...বংশাবলী বলিতে পারে না। অনেকেই পিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের ...সংবাদ জানে না। কাজেই ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা স্থির ...করা অসম্ভব।

জগন্নাথের সম্বন্ধে আরও ২।১টী অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে,

তাহা একণে উল্লেখ করিয়াই জগন্নাথের বৃত্তান্তের উপসংহার ক
যাইতেছে। শুনা যায়, জগন্নাথ স্বর্ণময় দেউল নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহ
প্রতিষ্ঠার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইত
পারেন নাই। তখন পাঠানগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালার নানা স্থানে আপনাদে
অধিকার স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিল। তাহাদের অত্যাচারে দে
অশান্তির আলয় হইয়াছিল। জগন্নাথের অতুল সম্পত্তির কথা তাহাদে
শ্রুতিগোচর হয়। এ দেশের তদানীন্তন পাঠানরাজপ্রতিনি
জগন্নাথের অতুল সম্পত্তির নিদান—সেই স্পর্শমণি, রাজপ্রাপ্য বলি
দাবি করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ প্রতিনিধির নিক
তাহা দেওয়ার আদেশ করে। অনন্যোপায় হইয়া জগন্নাথ স্পর্শমণিস
লক্ষ্যা নদীতে পাঠান-রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন। কথি
আছে, জগন্নাথ রাজপ্রতিনিধির হস্তে উক্তমণি অর্পণ করার স
কৌশলক্রমে তাহা নদীতে ফেলিয়া দেন। সাধারণ লোকে ব
তদবধি সেই স্পর্শমণির স্পর্শে লক্ষ্যার জল অসাধারণ শৈত্য
নির্ম্মলতা—গুণসমন্বিত হইয়াছে, এবং শীতললক্ষ্যা নামে অভিহি
হইয়া আসিতেছে।

এই জনশ্রুতি দ্বারা অনুমিত হয় জগন্নাথের বিপুল সম্পত্তির ক
পাঠানগণের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহারা জগন্নাথের প্রতি অত্যাচা
করিয়া সেই সম্পত্তিরাশি স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়। ইহার প
জগন্নাথের সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

জগন্নাথের পরই আমরা এ প্রদেশে রাজা রঘুরাম রায়ের না
শুনিতে পাই। মুসলমানরাজত্বের মধ্যাহ্ন সময়ে, যখন পূর্ব্ব
মোগলরাজত্ব সবেমাত্র বদ্ধমূল হইতেছিল, যখন পূর্ব্ববঙ্গের মুসলম
রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) ভিত্তি পত্তন হয় নাই,
সময়ে গ্রাম প্যালের দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, রঘুরামপুর নামক স্থা

ায়স্থকুলসম্ভূত রাজা রঘুরাম রায়, বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুগৌরব-প্রভার
ীণ-আলোক-বর্ত্তিকার ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া বিক্রমপুর আলোকিত
রিতেছিলেন। শুনা যায়, তখন তিনি এই বিক্রমপুরের কিয়দংশে
াধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁহাকে অধিক
ন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত
ল অধুনা তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। তবে সে সময়ের
বস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, তাঁহার রাজত্ব অতি বিস্তীর্ণ
ল না। মুসলমান আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার
র্ব্বে, যখন মোগলপাঠানগণ নিজ নিজ ভাগ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন,
শ এক প্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল; তখন শক্তিশালী উদ্যমশীল
াকগণ পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারীদিগকে লাঠির জোরে
ীভূত করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল;
ইরূপে পূর্ব্ববাঙ্গলা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার অধিকারভুক্ত
ইয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুঁয়ার অধিকৃত স্থানই কালে
ঙ্গের প্রসিদ্ধ বার ভুঁয়ার অধিকারভুক্ত হয়। যখন রাজা রঘুরাম
য় বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন তখন সোণারগাঁ মুসলমান
রতলগত হইয়াছিল। দক্ষিণে, ইদিলপুর প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশের
িকৃত ছিল। পূর্ব্বে,—মেঘনার পূর্ব্বে, ত্রিপুরারাজের অধিকার
ল। পশ্চিমে, বিশালকায়া পদ্মা, ফতোয়াবাদ (বর্ত্তমান ফরিদপুর)
ুরামের রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। উত্তরে, জেনানাবাদ
ওয়ালের গাজি বংশের অধিকার ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময় যে স্থানে
কা নগরী বিস্তৃত আছে, তাহা জেনানাবাদেরই অংশ বিশেষ। সে
য় ঐ স্থান কৃষকপল্লী বা অসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র নগর মাত্র ছিল। রঘুরাম
য়ের অধিকার এই অনতিবিস্তৃত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।
ই সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগেরও রঘুরামরায়ের সর্ব্বাংশে আধিপত্য ছিল

কি না তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রঘুরা রায়ের সমকালে বিক্রমপুরে অন্য কোনও পরাক্রান্ত ভূস্বামীর না শুনিতে পাওয়া যায় না। রঘুরাম রায়ের পরেই বিক্রমপুরে চাঁদরা কেদার রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকা যে রঘুরায়ের অধিকার অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত ছিল, তাহাতে কো সন্দেহ নাই। তবে রঘুরায়ের অধিকার যে কেবল রঘুরামপুরে নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন বোধ হয় না। বিশালব পদ্মার গর্ভে বিক্রমপুরের যে সকল পল্লী বিলুপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরিশপুর একটী বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পল্লী ছিল। সেখানে রায়দীঘী নামক এক বৃহৎ জলাশয়ের পাড়ে প্রতি বৎসর বিজয়াদশমীর দি হইতে একটী সপ্তাহব্যাপী মেলা বসিত। রাজনগরের সমৃদ্ধি সময়ে সেই মেলা বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে, হরিশপুরে রাজা হরিশ্চ সময়ে সময়ে বাস করিতেন। সেখানে তিনি প্রতি বৎসর বিশে সমারোহপূর্ব্বক দুর্গোৎসব করিতেন। সেই সময় হইতেই উক্ত মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। এই হরিশ্চন্দ্র, রঘুরাম রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলে —এখন সেই হরিশপুর, রায়দীঘী ও বিজয়ার মেলা ধ্বংশ .রে আশ্র লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে তালতলার বাজারের অদূরে রায়পু নামে যে গ্রাম দৃষ্ট হয়, অনেকের বিশ্বাস তাহাও উক্ত পরিবারের নামযুক্ত। ইহাদ্বারাও অনুমিত হয় রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ে অধিকার কেবল রঘুরামপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

রঘুরাম রায়ের অধিকার ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি যেরূপ শ্রুত হওয়া যায় তাহা তত ক্ষুদ্র নয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মুসলমান আধিপত্য তখনও পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বত্র বদ্ধমূল হয় নাই পাঠানগণ কখনও পাণ্ডুয়ায় কখনও সোণার গাঁয় আপনাদিগের

জধানী স্থাপন করিয়া অধিকৃত রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ করিতে লেন, তাঁহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালীতে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কোনও শাসনকর্ত্তা দিল্লীর রাজশক্তির অধীনে থাকিয়া, কেহ বা সেই শাসন ছিন্ন করিয়া, রাজ্য-শাসনের নামে রাজ্য-শোষণ করিতেন। র্ব্বদা লুট তরাজ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করাই তাহাদের প্রধান ব্রত ল। কিন্তু তাহাদের এমন সৈন্যবল বা সৈন্য পরিচালন ক্ষমতা লনা, যে কেহ সাহস করিয়া তাহাদের অত্যাচারে বাধা দিতে উদ্যত ইলে তাঁহারা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। অন্ততঃ রঘুরাম রায়ের ময় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গলার পাঠানগণের অবস্থা এইরূপই অনুমিত য়। রঘুরামের সময়ে পাঠানগণ হীনবীর্য্য হওয়াতে মোগল প্রভুত্ব শ্চিম-বাঙ্গলার ন্যায় পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

কথিত আছে, সোণারগাঁয়ের মুসলমানরাজপ্রতিনিধি রঘুরাম য়কে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার ও করপ্রদানে নিজ রাজ্যভোগ তে বলিয়াছিলেন। রঘুরাম রায় ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য রেন। ইহাতে মুসলমান রাজপ্রতিনিধি ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে হার অধীনস্থ সৈন্যসহ রঘুরামের রাজধানী রঘুরামপুরের অদূরে াসিয়া উপস্থিত হন। রঘুরামরায়ও অপ্রস্তুত ছিলেন না। তিনি াহার লাঠিয়াল ও গুলানবাজসৈন্যসহ অসীম সাহসের সহিত তাহাদের ুখীন্ হইলেন। লাঠিয়ালগণের লাঠিপরিচালননৈপুণ্যে মুসলমান ন্যের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। লাঠিয়ালগণ বাণের জলপ্রবাহের ায় মুসলমান সৈন্যদল ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এইরূপে বিতাড়িত ইয়া তাহারা ইছামতী (বর্ত্তমান ধনেশ্বরী) নদীর পরপারে যাইয়া রাপদ হইল।

এইরূপে মুসলমান সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রঘুরাম বিজয়োল্লাসে ৎফুল্ল হইয়া স্বভবনে উপস্থিত হন, এবং স্বহস্তে সৈন্য ও সেনা-নায়ক

দিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সেনাদলের নায়ক রাম মালিক সরদার বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হয়। লাঠি পরিচালন কার্য্যে রাম মালিকের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে শত্রুপক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে রাম মালিক এক মাত্র লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী গ্রাম্য ছড়া এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার চারিটী ছড়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটী॥
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ॥
গুল্লি ফিরে ঝাঁকে।
রায়ের লাঠির পাকে॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি॥

এই সকল ছড়ায় রাম মালিকের লাঠি পরিচালনদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাহাকে অসাধারণ লাঠিয়াল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বাঙ্গালায় লাঠির প্রভাব এক সময়ে যে অসাধারণ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজিও পূর্ব্ববঙ্গে, লাঠির সে পূর্ব্বমহিমার যে ক্ষীণজ্যোতি, বৃটিশ শাসনে সংযতহস্ত লাঠিয়াল বংশধরগণের লাঠিতে প্রতিভাত হয় তাহা দেখিয়াই আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। বাঙ্গালী জাতি লাঠি বিসর্জ্জন দিয়াই আপনাদের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে। যতদিন বাঙ্গালী লাঠি সম্মান করিত ততদিন তাহাদের সম্মানও অক্ষুণ্ণ ছিল।

রঘুরামপুরের অদূরে মাণিককান্দারমাঠ নামে একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর

দৃষ্ট হয়। রামমালিকের সহিত এই নামের কোন সংস্রব আছে কিনা বিশেষ অনুসন্ধানেও আমরা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে ঐ প্রান্তরটী যে বহুকাল হইতে ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রঘুরাম রায়ের লাঠিয়াল সেনার অধিনায়ক রামমালিকের নামে ঐ প্রান্তরের নামকরণ হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান একেবারে কষ্টকল্পনা সঞ্জাত নয়।

উপরে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির সহিত যে সংঘর্ষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আপাতসুখকর হইলেও পরিণামে যে বিষময় হইবে, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুরাম রায়ের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সোণারগাঁয়ের ক্ষুদ্র রাজকীয় সৈন্যদলের পশ্চাতে যে পাঠানের বিপুল বল মজুত আছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সে বলের নিকট তাঁহার সামান্য লাঠিয়াল সৈন্যবল যে ঝড়ের সন্মুখবর্ত্তী তৃণের ন্যায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহাও তিনি জানিতেন। তবে তিনি কেন এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তেজস্বী পুরুষের তেজ প্রায় পরিণামচিন্তার অবসর রাখে না। ইহাই এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন দিল্লীতে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও অব্যাহত হয় নাই। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গালায়, পাঠানের সহিত মোগলের বলপরীক্ষা চলিতেছে। কোন পক্ষই আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না। উভয় পক্ষই আপন লইয়া ব্যস্ত, সেজন্য শাসনপ্রণালীর কোন শৃঙ্খলাই ছিল না। বর্ত্তমান ইংরেজশাসনযন্ত্র যেমন সুগঠিত, মুসলমান রাজত্বের চরমোন্নতির সময়ও মুসলমান শাসনযন্ত্র, তাহার শতাংশের একাংশ উৎকর্ষও লাভ করিতে পারে নাই। এখন শাসনযন্ত্রের এক ক্ষুদ্র

প্রান্তে অতি সামান্য আঘাত হইলে, যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত সে আঘাত বেগ প্রসৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রটী যেন সজীব রক্তমাংসের দেহ,—ক্ষুদ্র কণ্টকপ্রহারবেদনাও নিমেষে মস্তিষ্কে অনুভূত হয়। মুসলমান শাসনযন্ত্রের গঠনপ্রনালীতে সেরূপ সুকৌশল কেন্দ্রস্থানেও লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার নবাবগণ কখনও দিল্লীর রাজশক্তির অধীনে থাকিয়া কখনও বা স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় নবাবের এক প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তিনিও সুযোগ পাইলেই নবাবের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যরক্ষা করিতেন। যখন বাঙ্গালার সুবাদার দিল্লীর শাসন ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি সুবাদারের শাসন মানিয়া চলিতেন তখনও পূর্ব্ববাঙ্গালার সংবাদ নবাবদরবারে পৌছিতে বহু সময় লাগিত। দিল্লীর সম্রাটসকাশে সে সংবাদ পৌছিতে আরও কত অধিক সময়সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই সকল সংবাদ আদান প্রদানেরও নানা প্রকার অব্যা সময়হারী কায়দা কানুন ছিল। অনেক সংবাদ নবাব বা সম্রাটের নিকট পেশ করা, না করা, কর্ম্মচারি-বিশেষের বিবেচনাধীন ছিল। ঘুষের রাজত্ব সর্ব্বত্রই অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান শাসন সময়েও তাহার বিশেষ প্রাবল্য ছিল। তাহার প্রসাদে অনেক গুরুতর ঘটনার সংবাদও চাপা পড়িয়া থাকিত। এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোন সংবাদ নবাব বা বাদসাহের গোচরে আসিলেও ২।১ বার বিচার বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া উপযুক্ত আদেশের অপেক্ষায় দপ্তরে বাকসজাত হইয়া থাকিত। নবাব ও বাদসাহগণ তাহাদের চিরাভ্যস্ত বিলাসিতার প্রবলস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবন্মৃতবৎ ভাসিয়া ফিরিতেন আর কর্ম্মচারীগণ আপন খেয়ালমতে রাজ্য চালাইতেন। ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে কোন কর্ম্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন

কথা উত্থাপন না করিলে সে সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইত না; অনেক সময় বাকী রাজস্বের জন্য অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিয়াও যখন অভীপ্সিত কার্য্য সাধন করা হইত না তখন বাদসাহদরবার হইতে নবাবদরবারে; নবাবদরবার হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধির সকাশে, পত্রবাহক মারফত রাজকীয় পত্রবিশেষ আড়ম্বরের সহিত প্রেরিত হইত। অনেক সময় এরূপ ঘটিত যে, পত্রবাহক যাহার নিকট প্রেরিত হইত তাহার নিকট হইতে কিছু জায়গীর বা প্রচুর আস্রবি আত্মসাৎ করিয়া সে আর প্রত্যাবৃত্ত হইত না। যে সেরেস্তা হইতে লোক প্রেরিত হইত সেখানে উপযুক্ত তদ্বির হইলে, রাজদরবারে আর সে কথা কখনও উঠিত না।

রঘুরামরায় মুসলমান শাসনপ্রণালীর এই দুর্ব্বলতা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি কৌশলে স্বকীয় অধিকার দৃঢ় রাখা ও উক্ত রাজকীয় সৈন্যের পরাভবের প্রতিশোধ হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই নিজ কনিষ্ঠ সহোদর হরিশ্চন্দ্র রায়কে দিল্লীতে বাদসাহদরবারে পাঠাইয়া দেন। হরিশ্চন্দ্র দিল্লীতে থাকিয়া পার্শি ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র সেখানে অসাধারণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হন। এবং দরবারের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণের সহিত বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্র দিল্লীর রাজদরবারে এক অসাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজের অসামান্য কার্য্যদক্ষতাগুণে উচ্চপদ লাভ করেন।

এই সময়ে মোগলরবি আকবর, দিল্লীররাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে ছিলেন। তাঁহার জাতিনির্ব্বিশেষে গুণগ্রাহিতার খ্যাতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের গুণের কাহিনী

তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শুনা যায়, হরিশ্চন্দ্র অ
কঠিন কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্পায়াসে তাহ
সুসম্পন্ন করাতে বাদসাহ বিশেষ প্রীত হন। প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ
রঘুরামরায়ের অধিকৃত রাজ্যের আধিপত্য, নামমাত্র করদানের
অঙ্গীকারে বাধ্য করিয়া, হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্র তাহা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুরামরায়ের নামেই গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃভক্তির পরিচা
প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে বিক্রমপুরে প্রথম মুসলমান আধিপত্য
প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ঘটনার সমকালেই পূর্ব্ববাঙ্গালায় পাঠানদিগের আধিপত্য
একপ্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। রঘুরামরায়কৃত পরাভবের প্রতি-
শোধের পূর্ব্বেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যুদল
রূপে পরিণত হয়। তদবধি রঘুরাম রায় নিঃশঙ্কভাবে স্বরাজ্যে
অবাধশক্তির পরিচালন করিতে থাকেন। যতদিন হরিশ্চন্দ্র দিল্লীর
রাজসরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন ততদিন রঘুরামরায়, নামমাত্র
অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে যখন রঘুরাম রায় বার্দ্ধক্য-
প্রযুক্ত রাজ্য চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন হরিশ্চন্দ্র স্বীয়
জামাতাকে দিল্লীর রাজসরকারে এক কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া নিজে
কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং রঘুরামের হস্ত
হইতে তাহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত
শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন।

সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্যের অবস্থা লোকের চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান
থাকে না। রাজা রঘুরামরায় ও হরিশ্চন্দ্র এতদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর
কোমলক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসারকে চিরসুখের স্থান বলিয়াই
মনে করিতেছিলেন। সহসা অবস্থাচক্রনেমীর বিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

ঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রের সেই ভাগ্যবিবর্ত্তনবৃত্তান্ত আমরা সংক্ষেপে এস্থানে
বিবৃত করিতেছি।

আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভসময়ে বোগ্দাদ হইতে এক সম্ভ্রান্ত
মুসলমান, ভাগ্যচক্রের নিষ্পেষণে ক্লিষ্ট হইয়া অদৃষ্টযবনিকার
অন্তরালে আর কি লুক্কায়িত আছে নির্দ্ধারণ জন্য স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-
সমন্বিত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে উপস্থিত হয়।
কালে এই মুসলমান যুবক দিল্লীর রাজদরবারে বিশেষ পরিচিত হইয়া
উঠে। কথিত আছে, রাজকুমার সেলিমের সহিত এই যুবকের
বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেলিম তাহার পিতার আদেশে বাঙ্গালায় আগমন
করিয়াছিলেন; সেই সময় উক্ত যুবক মাহাম্মদ মজফিউদ্দিন তাঁহার
সহিত এদেশে উপস্থিত হয়। সেলিম উক্ত মাহাম্মদ মজফিউদ্দিনের
সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। অবশেষে
সেলিমের অনুরোধে মাহাম্মদ মজফিউদ্দিন পূর্ব্ব-বাঙ্গালার প্রধান কাজির
পদলাভ করিয়া কাজি মাহাম্মদ নামে পরিচিত হন। কাজি সাহেব
রঘুরামপুরের অদূরবর্ত্তী কস্‌বা নামক স্থান স্বীয় আবাস জন্য মনোনীত
করিয়া দিল্লীর রাজসরকারে আবেদন করাতে সেলিমের অনুগ্রহে
তিনশত বাহান্ন দ্রোণ ভূমির সহিত উক্ত গ্রাম তাঁহাকে নিষ্কর জায়গীর
প্রদত্ত হয়। কাজি সাহেব কস্‌বা গ্রামে স্বীয় বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া
বাস করিতে থাকেন। তদবধি ঐ স্থান কাজি কস্‌বা নামে পরিচিত
হইয়া আসিতেছে।

কাজি সাহেবকে যে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়, তাহা রঘুরাম রায়ের
অধিকৃত ভূভাগ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। তখন পূর্ব্ববাঙ্গলায়
মোগলপ্রভুত্ব এক প্রকার বদ্ধমুল হইয়াছে। রাজশক্তি অবিচলিত
রাখার জন্য রীতিমত সৈন্যসামন্ত সোণারগাঁয়ে স্থাপিত হইয়াছিল।
তথাপি হরিশ্চন্দ্র রায় এই অপ্রীতিকর কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিবাদের

জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কাজি সাহেব দিল্লীর দরবারে আবেদন করিয়া একদল মুসলমান সিপাহী আত্মরক্ষার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের বাসের নিমিত্ত ও খরচ সরবরাহের জন্য আর একটী গ্রাম কাজি সাহেব নিষ্কর প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি ঐ গ্রাম সিপাইপাড়া নামে কথিত হইয়া থাকে। সিপাইপাড়ায় এখনও সেই সিপাইদিগের বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া কাজিগণের পূর্ব্ব-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রথমতঃ স্বীয় জামাতা দ্বারা দিল্লীর দরবারে ইহার প্রতিকারপ্রার্থী হন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, কাজিদিগের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। তখন কাজি মাহাম্মদের পুত্র কাজি আবুলফতা এ প্রদেশের প্রধান কাজির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বকীয় বাসস্থানে একখানা বড় বাংলা (চারি চালা ঘর) প্রস্তুত করিয়া নানা প্রকার গৃহসজ্জায় পরিশোভিত করিয়াছিলেন। সে সময় কোন প্রজারই ঐ প্রকার ঘর প্রস্তুত করার অধিকার ছিল না। উহা বাণ, ডঙ্কা, নিশানাদির ন্যায় রাজ বিভুতি-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। রাজপ্রতিনিধি বা রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বাসের জন্য ঐ প্রকার ঘর রাজব্যয়ে নির্ম্মিত হইত। কোন প্রজা, বাদসাহ বা নবাবের অনুমতি ভিন্ন, ঐরূপ ঘর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে রাজদণ্ড লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বাদসাহ সকাশে এই অভিযোগ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ কাজি সাহেবের অবিদিত ছিল না। তিনি অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ইহার পাল্টা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—হরিশ্চন্দ্র রায় সর্ব্বদাই কাজিদিগকে কাজিকস্‌বা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বৈধ উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না মনে করিয়া, অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশি ও ঢাক বাদ্য দ্বারা তাহাদের নমাজের ব্যাঘাত করিতেছেন। এই উভয় অভিযোগের তদন্তভার তদানীন্তন পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজ-প্রতিনিধির প্রতি অর্পিত হয়। কাজি সাহেবের তখন উক্ত রাজ প্রতিনিধির নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে বলিলেন যে তিনি চারিচালা ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য কিন্তু নিজ ব্যবহার জন্য নয় ;—উহা খোদাই ঘর—কেবল নমাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উত্তরে রাজ প্রতিনিধি সন্তুষ্ট হন। হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন দেবপূজা কোন প্রকার বাদ্য ভিন্ন হইতে পারে না। কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে তাহা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এ উত্তর মুসলমান রাজপ্রতিনিধির প্রীতিকর হইল না। তিনি কাজিগণের অনুকূলে ও রায়গণের প্রতিকূলে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে দিল্লীদরবার হইতে আদেশ হইল—অবিলম্বে রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রের বাসভবন স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তাহারা স্বেচ্ছায় তাহা না করিলে রাজকীয় সৈন্যদল এ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবে।

এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া রঘুরাম তাঁহার সম্পত্তি ও পরিবারসহ স্থানান্তরে চলিয়া যান। হরিশ্চন্দ্র রাজকীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। রাজকীয় সৈন্যদল কাজি সাহেবের সৈন্যসহ মিলিত হইয়া রঘুরামপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে হরিশ্চন্দ্র তাহার লাঠিয়াল সৈন্যদলসহ তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মুসলমান সৈন্য রঘুরামপুরে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সুগঠিত রাজভবন চূর্ণ করিয়া ফেলে। রঘুরামের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবালয় ভগ্ন এবং দেবমূর্ত্তিগুলি ভগ্ন ও স্থানান্তরিত

করে। কথিত আছে, রঘুরাম রায়ের ভগ্ন দেবালয়ের মাল মসলা দ্বারা কাজি আবুলফতা তাহার বাস ভবনের সম্মুখে খালকা নামক স্থানে এক সুবৃহৎ মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে মসজিদও এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। কাজি সাহেবের বাসবাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী মসজিদ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কতক বৎসর হইল তাহার জীর্ণসংস্কার করা হইয়াছে। উক্ত কাজি সাহেবের বংশধরগণ বলেন ঐ মসজিদও কাজি আবুলফতার সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের দ্বারদেশে একটী প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তি দেখা যায়। কাজিগণ বলেন রঘুরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত "বাসুদেব" বিগ্রহ জয়ের চিহ্নস্বরূপ আনিয়া কাজিসাহেব তাহার মসজিদের দ্বারে সিঁড়ি রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই মসজিদের দ্বারদেশের উপরিভাগে পারসী ভাষায় লিখিত একখণ্ড শিলালিপি প্রোথিত ছিল। মসজিদটীর জীর্ণাবস্থা ঘটিলে, উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। সে সময় ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তাহা লইয়া যান। সম্ভবতঃ ওয়াইজ সাহেবের লিখিত ঢাকা জেলার বিবরণে তাহার অনুলিপি উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। তাহা পাওয়া গেলে রঘুরাম রায় ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের সময়নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হইত।

ঐরূপে রঘুরামপুরের ধ্বংশের পর রায়পরিবার ঠিক কোন স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন কীর্ত্তিপাশার কুক্ষিগত নপাড়া নামক স্থানে ইহাঁরা নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মতে এই হরিশ্চন্দ্র রায়, নপাড়ার প্রসিদ্ধ চৌধুরি বংশের আদিপুরুষ। নপাড়ার চৌধুরিগণ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রঘুরাম কায়স্থ বংশধর। এরূপ নির্দ্দেশের কারণ এই—রঘুরামপুরের নিকটবর্ত্তী

শঙ্করবন্দ নামক স্থানে চৌধুরী উপাধিধারী যে সকল কায়স্থ ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন লোক আপনাদিগকে রঘুরামরায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যাঁহারা রঘুরাম রায়কে কায়স্থকুলোদ্ভব দে বংশীয় বলিয়া বলেন তাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইতে চান। প্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদার রায়কে তাঁহারা এই রঘুরাম বা হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। উক্ত চাঁদরায়, কেদার রায় যে দে-বংশজাত কায়স্থ তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা। এজন্যই ঐরূপ অনুমান একেবারে অহেতুক নয়। রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের পরেই আমরা বিক্রমপুরে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের প্রসিদ্ধির কথা শুনিতে পাই। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না।

যাঁহারা রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রকে নপাড়ার চৌধুরী বংশের প্রবর্ত্তক বলিয়া বলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ২১টী কথা আলোচনার যোগ্য। বজ্রযোগিনীতে পুরোহিতপাড়া নামে একটী পল্লী আছে। রঘুরাম রায়ের পুরোহিত বংশের বাসস্থান বলিয়াই ঐ পল্লীর নাম পুরোহিত পাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরোহিত পাড়াতে উক্ত পুরোহিত বংশীয় যে সকল প্রাচীন লোক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা বলেন নপাড়ার চৌধুরী বংশ তাঁহাদের যজমান। এখনও তাঁহারা ইহাঁদিগকে তাঁহাদের পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত চৌধুরীগণের আদিপুরুষ রঘুরামপুর হইতেই নপাড়ায় যাইয়া বাস করেন। কিন্তু সেই আদিপুরুষ রঘুরাম কিম্বা হরিশ্চন্দ্র রায় কি না তাহা উক্ত পুরোহিত মহাশয়গণ বলিতে পারেন না। এস্থলে রঘুরাম রায়ের পরিত্যক্ত রঘুরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী ২।১ টী স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বর্ত্তমান সময়ে রঘুরামপুর একটী অসমৃদ্ধ কৃষকপল্লীতে পরিণত

হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থানে কৃষকগণের ইক্ষু, কদলী, আদা হরিদ্রা ইত্যাদির বাগান ; মধ্যে মধ্যে জঙ্গল ও কৃষকগণের আবা বাটী দৃষ্ট হয়। রঘুরামপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক প্রাচী দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের কীর্ত্তি বলিয়াই সর্ব্বত্র কথিত হইয়া থাকে। রঘুরামপুরের অনতিদূর উত্তরে দেওসায়ের দীঘি নামে একটী বৃহৎ জলাশয় এখনও অর্দ্ধভরাঠ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান অত্যাচারে ও কালের কঠোর দশনাঘাতে দেবমূর্ত্তির সহিত দেবমন্দিরগুলি কালের তিমিরগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও অল্পমাত্র মৃত্তিকা খনন করিলেই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দেওসার নাম, সম্ভবতঃ দেবসার নামেরই অপভ্রংশ। বহুদেবদেবীর স্থান বলিয়াই ঐ স্থানের নাম দেবসার হইয়া থাকিবে।

(রঘুরামপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে সুখবাসপুর নামে একটী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই গ্রাম প্রসিদ্ধ যোগিনী গ্রামের অন্তর্গত। এই গ্রামে একটী পুরাতন দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। ইহা সুখবাসপুরের দীঘি নামে এ অঞ্চলে পরিচিত। জনশ্রুতি এই—এই দীঘির পূর্ব্ব পারে রঘুরাম রায়ের একটী আরামবাটী ছিল। তিনি অবকাশের অধিকাংশ সময় এই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া শান্তিসুখ অনুভব করিতেন। এইজন্য এই স্থানের নাম সুখবাসপুর হইয়াছে।)

রঘুরামপুরের অল্পদূর দক্ষিণে শঙ্করবন্দ নামে একটী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল। এই শঙ্কর রঘুরাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুরামরায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের বাসগ্রাম তাঁহাকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। সেই জন্যই ইহা শঙ্করবন্দনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কো

বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহার বংশের কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

রঘুরামপুরে একটী দর্শনীয় ব্যাপার দেখিবার জন্য প্রতিবৎসর অনেক লোক আসিয়া থাকে। এই স্থানে হরিশ্চন্দ্রের দীঘি নামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যে একটু স্থানে অল্প জল থাকে, তাহাও অতি পুরু জলজতৃণাদি দ্বারা আবৃত থাকে। উক্ত তৃণগুল্ম এরূপ পুরু যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ঐ তৃণস্তর একটু একটু করিয়া প্রতিদিন নামিয়া যাইতে থাকে। সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে প্রায় সমস্ত তৃণগুল্ম তলাইয়া যায়। তখন পরিস্কার জল উহার উপরে ঢল ঢল করিতে থাকে। ইহার পরে ৭।৮ দিনের মধ্যে আবার পুকুরটী ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জলজ উদ্ভিদস্তর পুনরায় ভাসিয়া উঠে, জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাপি ইহার কারণ কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

রঘুরামপুরে পূর্ব্বসমৃদ্ধির যে ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রঘুরামরায় ও বর্ত্তমান কাজিদিগের পূর্ব্বপুরুষ কাজি মাহাম্মদ ও কাজি আবুলফতা যে এক সময়ের লোক তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রঘুরামপুরের ভুগর্ভে যে সকল অট্টালিকার ভগ্নাংশ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায় তদ্‌ভিন্ন ভূমির উপরে দণ্ডায়মান কোন মন্দির, মঠ বা আবাসগৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজি আবুলফতার সময় যে মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে জীর্ণবস্থাপন্ন হইলেও তাহা এ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। কাজি মাহাম্মদ হইতে কাজি ইমামুদ্দিন অষ্টম পুরুষ, এখন নবম পুরুষ চলিতেছে। প্রতি পুরুষের স্থিতিকাল ৪০ বৎসর ধরিলেও ৩২০

বৎসর হয়। এই সময়ের সহিত আকবরের রাজত্ব সময়ের ঐক্য লক্ষিত হয়। কাজি ইমামুদ্দিনের নিকট হইতে যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রঘুরাম রায়ের অভ্যুদয়ের সময় আকবরের রাজত্বের সমকালবর্ত্তী বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত কাজি ইমামুদ্দিনের নিকট বাদসাহ জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা (হাতের ছাপ). যুক্ত এক সনদ ছিল। তাহাতে আকবর প্রদত্ত জায়গীরের স্বত্ব কাজিদিগকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও নূতন জায়গীর দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহার পরেও কাজিদিগের বংশবৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব জায়গীরের আয় দ্বারা তাঁহাদের সম্যক ভরণপোষণ কষ্টকর বলিয়া সম্রাট সাহআলম পুনরায় খালকা গ্রাম জায়গীর দেন। তাহাতেও পূর্ব্বদত্ত জায়গীরের উল্লেখ আছে। এই দলিলেও বাদসাহ সাহ আলমের দস্তখৎ ও মোহর অঙ্কিত আছে। ঐ উভয় দলিল কোন এক মোকদ্দমায় আদালতে দাখিল থাকাতে আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু উক্ত কাজি সাহেবের কথিত উক্তিতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা যায় না। ঐ সকল প্রমাণ দৃষ্টে রঘুরাম রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ করা যায় না। ৩০০—৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত মঠমন্দিরাদি আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। তবে রঘুরামরায়ের আবাসভবন ও তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদির চিহ্নমাত্রও নাই কেন? ইহার এক কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিজয়োন্মত্ত মুসলমান সৈন্যের অত্যাচারে ঐ সকলগুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়। পরে জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্ব সময়ে যখন জাহাঙ্গীর নগর (বর্ত্তমান ঢাকা) নির্ম্মিত হয় তখন রায়পুরের ন্যায় রঘুরামপুরের ভগ্নঅট্টালিকাদির মান সন্মানও তথায় নীত হইয়া থাকিবে। এ বিষয়ে বল্লাল বাড়ী সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তেমন কোন বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায় না।

শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

মেয়েলি খাতা।

খেয়াল।

বিশ্বখানি সৃষ্টি যে গো খেয়ালে বিধাতার,
খেয়ালে তাই জীবন-খেলা খেলি গো আপনার।
ঋতুর পর আসেরে ঋতু খেয়ালে প্রকৃতির,
কাব্যকলা বিকশে লীলা খেয়ালে ভারতীর।

খেয়ালে গীতি গাহে ভারতী মানস-সর-মাঝে;
চরণ দোলে বীণার তালে,—কমল-দল নাচে।
গীতির সুর, চরণ-পূত সুরভি বহি আসে;
পুলকে জাগে কবিতা-লীলা মর-জগত-বাসে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা, অথবা স্তবন
লক্ষ্মী গৃহে আসুন্ বা ছাড়ুন্ ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক্ কিম্বা হোক্ যুগান্তরে
ন্যায় পথ হ'তে ধীর এক পা না সরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়াল।

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবানের একটী খেয়ালের প্রতিমূর্ত্তি। ভগবানের একবার বটপত্রপৃষ্ঠে চাপিয়া কারণসমুদ্রে ভাসিবার খেয়াল হইয়াছিল। যেমন খেয়ালটী মনে উঠা, অমনি তিনি সেই অপার জলধিজলে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। ভাসিতে ভাসিতে আবার তাঁহার খেয়াল হইল, নাভিসরোবরে একটী প্রস্ফুটিত সহস্রদলের প্রতিষ্ঠা হউক। মনে কথাটা উঠিতে না উঠিতে, নাভিদেশে একটী কমল ফুটিয়া উঠিল। সেই সহস্রদলের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া ভগবান কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। যখন চোখ মেলিলেন, তখন দেখিলেন, সেই পদ্মের উপর রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ, অথচ দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকর একটী অভিনব মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কেহে তুমি?"

"আজ্ঞে আমি পদ্মের ফাউ।"

"ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"একটু চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।"

ঠাকুর চোখ মুছিলেন কি না বলিতে পারি না, তবে বুঝিতে পারিলেন—হর্ষ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কেও—পদ্মযোনি—বিধাতা,—পিতামহ?

তখন উভয়ে কিছুক্ষণ ধরিয়া নমস্কারের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল।

ঠাকুর আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মনে করে?"

পদ্মযোনি বলিলেন—"খেয়াল। আপনার খেয়ালে পদ্ম, পদ্মের খেয়ালে আমি—আর আমার খেয়ালে জগৎ।"

পদ্মযোনির মুখ হইতে কথাটী বাহির হইতে না হইতে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—আকাশপথের চারিদিকে উর্দ্ধশ্বাসে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধরিত্রী—গোরূপা হাম্বারবে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে না রহিল কি? প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল—পর্ব্বত, প্রান্তর, জলাশয়—তৃণ, গুল্ম লতা, বৃক্ষ—কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী; সর্ব্বশেষে মানুষ। খেয়ালের আপদ মিটিয়া গেল। ঠাকুর অ র একটী পটোল মাথায় দিয়া একটা এঁদো পুকুরের কল্মীদামের শয্যাতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের খেয়ালে প্রজাপতি, আর প্রজাপতির খেয়ালে এই বিশ্বসংসার। এ খেয়ালের মর্ম্ম বোঝা সহজবুদ্ধির সাধ্য নয়। ঠাকুরের খেয়ালে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মযোনি কেমন করিয়া তাঁহার ঠাকুরদাদা হইলেন, এটা বুঝিতে নাকি অনেক তপস্যার প্রয়োজন। কিন্তু সে তপস্যা করে কে?

এসমস্ত বড় কথা বুঝিতে পারি আর না পারি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালী-সৃষ্টি পিতামহঠাকুরের একটা উদ্ভট রকমের খেয়াল। বাস্তবিক বাঙ্গালী জাতিটী তাঁহার একটী কবিতারসময়ী সৃষ্টি। এমন একাধারে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীগুণবিশিষ্ট জাতি জগতের আর কোনও স্থানে দেখিতে পাইবে না।

অথবা গুণই বা বলি কেন? বাঙ্গালীর গুণও বলিতে পারি না, দোষও বলিতে পারি না। গুণ বর্ণনকালে তাহার অশেষ দোষ দেখিতে পাই, আবার দোষের কথা বলিতে গেলে, তাহার অশেষগুণে আকৃষ্ট হইয়া—মুগ্ধ হইয়া, নির্ব্বাক হই। মানবের সৃষ্টিকার্য্যে রত থাকিয়া বাঙ্গালীসৃষ্টিটা বুঝি বিধাতার সর্ব্বশেষের খেয়াল। নেশার শেষ অবস্থায়, তাঁহার কার্য্য অবসাদ বুঝি এক হইয়া গিয়াছিল, জ্ঞানে বুঝি একরাশ মোহ মিশিয়াছিল। সর্ব্বগুণের সার সঙ্কলন করিয়া

এই জাতিটী রচনা করিতে করিতে পিতামহ বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন র, অন্যমনস্কে আর একটী পিতামহ রচনা করিয়া ফেলিয়াছি। তাই লজ্জায় দাঁতে জিব কাটিয়া, এক কলসী দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজে কাজেই বাঙ্গালী পুত্রও হইল না, পিতাও হইল না, পিতামহও হইল না—মাঝখানথেকে ত্রিগুণবিশিষ্ট একটী জ্যাঠা হইয়া বসিল। শিবের ন্যায় বাঙ্গালীকে ত্রিগুণবিশিষ্টও বলিতে পার, নির্গুণও বলিতে পার। "কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন"। শিবঠাকুরের উদ্দেশ্য লয়, বাঙ্গালারও উদ্দেশ্য বুঝি লয়।

জ্যাঠা।

ভূত, ভবিষ্যৎ. বর্ত্তমান।

(উন্নতির প্রণালী।)

Schlegel এক জায়গায় বলেছেন:—"The illusion of a ast golden age is one of the greatest hindrances to the pproach of the golden age that should come—if the olden age is past it was not genuine"

এ কথা কি ঠিক নহে? আমরা অতীত ও ভবিষ্যতকে নিয়েই াছি, বর্ত্তমানকে গ্রাহ্য করি না। অলস, কল্পনাপ্রিয় লোকদের ক্ষেই এরূপ শোভা পায়, যারা কাজের লোক তাদের পক্ষে বর্ত্তমান ব কেজো জিনিস—বর্ত্তমানই জীবন।

একজন ফরাসি গ্রন্থকর্ত্তা বলে গেছেন—"জীবন কি?—না কতক-লি কর্ত্তব্য-পরম্পরা"। বর্ত্তমানের প্রতি জাপানীদের বিশেষ অনুরাগ াছে বলেই তাহাদের এত উন্নতি।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"টাকাকে সাম্‌লাও, সাগুলা আপনাকে আপনি সাম্‌লাবে। সেইরূপ আমি বলি,

বর্ত্তমানকে সাম্‌লাও, ভবিষ্যৎ আপনাকে আপনি সাম্‌লাবে। পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিলে ভবিষ্যৎ ফল ভাল হবেই। বর্ত্তমান ভবিষ্যতের জনক; বর্ত্তমান বৃক্ষ—ভবিষ্যৎ ফল। বৃক্ষকে যেমন যত্ন করবে ফলও তেমনি ভাল হবে। বর্ত্তমানের প্রতি যে যত উদাসীন থাকবে ভবিষ্যতে তার তত ভাল হবে—এ কথা পাগলের কথা। তার সাক্ষী দেখ, আমরা পরকালের সুখের জন্য ইহকালের কর্ত্তব্যে বিমুখ—সেই জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমরা বেশী ভবিষ্যৎদর্শী তাই কোন সাহসের কাজে হাত দিতে পারি না—সকল তাতেই ভয়, সকল তাতেই ভাবনা, সকল তাতেই উদ্বেগ। আসল কথা, ভবিষ্যতের প্রতি সারাদিন তাকিয়ে না থেকে "act act in the living present, heart within and God over-head." গাছে যেমন রৌদ্দুর লাগা চাই, তেমনি মাটীতে জল দেওয়া চাই। আমরা যদি মনে করি, স্বর্গের রৌদ্দুর যত পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করা যাক্, পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে' কাজ নাই—তা হলে কিরূপ ফল দাঁড়ায়? যা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখাই যাচ্চে। বর্ত্তমান জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টাই ভাবী উন্নতির মূল। আমরা মনে করি, আর সব নশ্বর কেবল আত্মাই অবিনশ্বর। অতএব আর সব ত্যাগ করে' কেবল আত্মারই উন্নতি চেষ্টা করা যাক্; কিম্বা মনে করি, শরীরের সুখই সব, আত্মার দিকে দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই;—কিন্তু এই উভয় ধারণাই ভ্রমাত্মক।

এই জন্যই বৈরাগ্যমূলক সভ্যতা ভারতবর্ষে স্থায়ী হইল না। "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" কিরূপে সম্ভবে? জাপানীরা, সভ্যতামূলে জলসেক করিয়া আসিয়াছে তাই তার আগাও সহজে গজাইতেছে, ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শরীর আগে, তারপর মন, তারপর আত্মা। বাল্যকালে শরীর প্রধান, যৌবনে মন

প্রধান, ও বার্দ্ধক্যে আত্মা প্রধান—ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। বনিয়াদ ভাল হলে বাড়ির ভর সইতে পারে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী বিশুদ্ধ নয়; ছেলে-বেলায় যাহাতে শরীর ভাল হয় সে দিকে দৃষ্টি না করে' লেখা পড়ার চাপ বেশী দেওয়া হয়। যৌবনে জ্ঞান ও কাজের প্রতি বেশী ঝোঁক না দিয়ে বৈরাগ্যের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—কিন্তু তার পূর্ব্বে বৈরাগ্যের আড়ম্বর করা স্বাভাবিক নহে। প্রথমে মূল—তারপরে ফুল—তারপরে ফল। প্রথমে শরীরের উন্নতি, তারপর মনের উন্নতি, তারপর আত্মার উন্নতি। প্রথম শারীরিক সভ্যতা, তারপর মানসিক সভ্যতা, তারপর আধ্যাত্মিক সভ্যতা। সব ধাপগুলি আনুপূর্ব্বিক না মাড়াইয়া একেবারে আধ্যাত্মিক মঞ্চে লাফ দিতে গেলে পতনের সম্ভাবনা। জাগিয়ে পাকান ফল ও সুপক্ক ফলের আস্বাদে অনেক প্রভেদ।

ভারতের এখন বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত। কালের নিয়মই এই; কি জাতি, কি ব্যক্তি, কি জীবজন্তু, কি বৃক্ষলতা সকলেরই একই নিয়মে জন্ম, একই নিয়মে বৃদ্ধি, আবার একই নিয়মে পুনর্জন্ম। পুরাতন ভারতের নাড়ি এখন আর বড় পাওয়া যায় না—তার ধড়ে প্রাণ নাই বলিলেও হয়। নূতন ভারত জাগিয়া উঠিতেছে। এইবার যেন তাহার উন্নতি-চেষ্টা বিশুদ্ধ প্রণালীতে হয়। এক্ষনে বৈরাগ্যের শিক্ষা না দিয়া কার্য্যের শিক্ষা—গীতা-উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের শিক্ষা দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। অতীতের মৃত্তিকার মধ্যেই বর্ত্তমানের বীজ নিহিত। সেই জীর্ণ মৃত্তিকায় নূতন সার দিতে হইবে, আশ-পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, তবেই বর্ত্তমানের বীজ সতেজে অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত, ও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া অভীষ্ট ফুল-ফলে সুশোভিত হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

রেণু।

যা কিছু অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট তারি আবরণ আচ্ছাদনের আবশ্যক— ফুল যতদিন কোরক অবস্থায় থাকে ততদিনই সবুজ পাতার আচ্ছাদনে ঘেরা থাকে। মানুষের মনে প্রেম যখন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তখনি আমরা ব্যাকুল হয়ে প্রিয়জনের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তার আগে কেবল চোখের চাহনিতে মুখের লজ্জারাগে তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

সাদা কাগজখানির উপর একটুও কাল কালী ঢেলে পড়লে কি রকম বিশ্রী দেখতে হয়, কিন্তু অনেকটা লালকালী ঢেলে পড়লে কোন হানি হয় না বরং দেখতে ভাল হয়—জীবনভরা অনুরাগ জীবনের শোভা, কিন্তু এতটুকু কলঙ্ক তাকে কত শ্রীহীন করে!

নবোদ্ভিন্ন ধান্যগুচ্ছে যে সুকুমার পীতরাগ দেখা যায় অপ ধান্যশীর্ষে সেই পীত আবার গাঢ়তর কনকবর্ণে দেখা দেয়। জীবন প্রারম্ভের আশা আর জীবন শেষের আশ্বাসে কেবল একটু মাত্র বর্ণের তারতম্য।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সঙ্গীত।

আমার ত বিশ্বাস যে কেবলমাত্র সুরে নিজের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। একটা সুর শুনলে একটা ভাব মনে আসে বটে, কিন্তু সেটা কোন বিশেষ ভাব না, যার যে রকম মনের অবস্থা সে সেই রকম করে সুরটাকে দেখে; তাল এবং গদের অথবা বাজনার স্বরের উপর ভাবটা বোধ হয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এমন কোন সুর নাই যা আস্তে আস্তে গাইলে আনন্দ অথবা দ্রুত রকম গাইলে গভীর দুঃখ বোঝাতে পারে। আর আমার বোধ হয় যে, এমন কোন রাগিনী নাই যাকে আমাদের সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করার কাজে লাগান যায় না। কানাড়া অতবড় জাঁকাল রাগিনী দিয়ে ছিবলেভাব প্রকাশ করা যায় আর খাম্বাজ প্রভৃতি যে সকল রাগিনী গুলকে ছিবলে রকম ভাবেতেই লাগান হয় সে গুল দ্বারাও খুব মহৎ ভাব প্রকাশ হয়েছে। তাহলে, এ যদি ঠিক হয় যে সুরের উপর ভাব অতটা নির্ভর করে না তা'হলে রাগিনী ঠিক বজায় রাখা যা না, রাখাও তা। যেটাই করা যাক্‌না কেন, গানের যে প্রধান উদ্দেশ্য তার কোনই ক্ষতি হয় না। রাখ্‌লে যে ঢের সুবিধা হয় এবিষয় বোধ হয় কারো সন্দেহ নেই। যথা, গান শিখিবার সুবিধা, গান মনে রাখবার সুবিধা এবং গান তৈয়ারী করিবার সুবিধা। এইজন্য যাঁরা বলেন যে আমাদের দেশ থেকে রাগ রাগিনীর প্রণালী উঠে গেলে গানের অনেক উন্নতি হয়। আমার বোধ হয় তাঁরা ততটা ঠিক বলেন না।

সৌন্দর্য্য।

আমাদের কোন সুন্দর জিনিস দেখ্‌লেই তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে ইচ্ছা হয় কেন? সমস্ত সৌন্দর্য্যেরই কেমন একটা একত্ব আছে। খালি যে আমাদের সুখ হয় বলে আমরা একত্ব আছে ভাবি, তা নয়, সুখ ত অনেক জিনিসেই হয়। আর সৌন্দর্য্যে আমাদের সুখের সঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা আর দুঃখের ভাব আছে,—আমাদের যেন একটা বিশেষ কোন অভাব পূরণ হয়েও হচ্চে না। সুন্দর চেহারা, সুন্দর দৃশ্য, এসব ত আমাদের চোখের কথা—কিন্তু সুন্দর সঙ্গীত, সুন্দর আস্বাদ, এসমস্ত সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের, কিন্তু সমস্তই এক রকমের। এসবের মধ্যে যা কিছু সুন্দর আছে তা একই সৌন্দর্য্য। কিন্তু এরই মধ্যে আবার ভিন্নতা আছে। আমরা শব্দ, রূপ এবং গন্ধের স্থলে সৌন্দর্য্য শব্দের বিশেষ ব্যবহার করি, কিন্তু স্পর্শ আর আস্বাদন সম্বন্ধে কেবল দূরতঃ তাহার ব্যবহার হয়। স্পর্শ আর আস্বাদন বল্‌লেই কেমন একটু ইন্দ্রিয়গত (material) ভাবের উদ্রেক হয়, আর দৃষ্টি, ঘ্রাণ, ও শ্রবণ-শক্তিতে কেমন একটু অতীন্দ্রিয় (immaterial) ভাব আছে। দৃষ্টিতে সব সময়ে অতীন্দ্রিয় ভাব নাও আসতে পারে কিন্তু যখনই দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য থাকে তখনই তার অতীন্দ্রিয় ভাব আসে। স্পর্শ আর আস্বাদনের অতীন্দ্রিয় ভাব থাকে না; তাই বোধ হয় আমরা এই দুই রকমকেই সৌন্দর্য্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করি। এরই সঙ্গে আমার একটা মনে হয় যে চিত্রশিল্পের আর সঙ্গীতের যেমন সৌন্দর্য্য আছে, ঘ্রাণের কেন সৌন্দর্য্য সেই পরিমাণে নেই।

শ্রীলোকেন পালিত।

"কৃষক ও পলিটিসিয়ান্‌"।

নাজিরাবাদ জেলার বিরাট রাজনৈতিক সভার সভাপতি মিঃ ধুন্ধুমার তাঁহার দুইঘণ্টাব্যাপক ওজস্বিনী বক্তৃতা শেষ করিয়া সভ্যমণ্ডলীর তুমুল করতালি-কোলাহলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত, চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাঁহার বিরল-কেশ মস্তকের মধ্যে যেন প্রবল ঝড় বহিতেছিল। তিনি পকেট হইতে শুভ্র, সুগন্ধি-মাখা রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখ মুছিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুঃপার্শ্ব হইতে ব্যজন আরম্ভ হইল।

এবার উদ্যোগকর্ত্তৃগণের সাধুচেষ্টায় অনেক গুলি কৃষক এই মহতী সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু বসিবার স্থানের অভাবহেতু তাহারা সভামণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল। করতালির চটাপট শব্দে তাহাদের মধ্যে একজন সভয়ে সেই সভামণ্ডপের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যকে কহিল "মেয়া ভাই! ও কিয়ের শব্দ? শিল পরে না ত? আমার তরমুজের খ্যাত বুজি গরাপ অইল!"

"না—ও শিল না, ও হাততালি দেয়।"

"ক্যান্‌?"

"ওর গো মনে খুব ভারি আল্লাদ অইছে, হেয়ার লাগিয়া হাত-তালি দেয়।"

"আচ্ছা-মেয়া ভাই, ঐ যে দারিওয়ালা মশায় হাত নারিয়া সওয়াল জব করিল সে কোন্‌ হাকিমির কাছে? কৈ কোন হাকিম ত এহানে দেহি না?"

"হাকিম এহানে আছে নাই—ওনার এই তগল সওয়াল জব খোদ বর লাট সাহেবের দরবারে লেখ্যা পাঠান হবে!"

খোদ বড়লাটসাহেবের নাম শুনিয়া প্রথম বক্তা এনাতুল্লা বিস্ফারি
নেত্রে সভাপতির দিকে তাকাইয়া কহিল—"সাবাস্ বাপের বেটা
মুখ দিয়া যেন খই ফোটে!"

এই সময়ে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থা
করিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলেন। তখন সেই কৃষক
তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। একজ
মাতব্বর সভাপতিকে বলিল—

"বাবু, আমাগো সেই কথাডার কি অইলো?"

সভাপতির একজন পারিষদ অমনি বলিলেন "কিরে বেটা চাষা
বাবু—তোর বাবু কে? ইনি হইতেছেন মিষ্টার।"

মাতব্বর দেরাস্ওল্লা খাঁ যোড়হস্তে সবিনয়ে বলিল "তা আমরা
চাষা লোক—আপনারা কলম ধরেন আমরা নাঙ্গল ধরি—আমরা
কথা—কি রকমে জানমু? ('সভাপতি কে) মাষ্টের মশায়! আপনি
উঠিয়া চল্লেন, আমাগো কি কইয়া যান?" সভাপতি মহাশয় এক
থামিয়া বলিলেন "কি শুনিতে চাও?"

দেরা।—এই যে দুই দিন আমরা চাষবাস ছারিয়া এহানে আই
সোটেলে * খাইয়া আপনাগো সভায় হাজির আছি, আমাগো কা
তলব করছিলেন তা'ত কিছুই বোল্লেন না। ঐ যে একজন কা
রঙের বাবু—আমার কাজলার মত যার দাড়ী—তেনার নামডা
কি—আরে—আটাত্তর বাবু, আটাত্তর বাবু—তানি আ'জ এক মা
অইল গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌য়া আমার গো কইলেন—তোমাগোরে চৌকীদা
ট্যাক্সো মাফি হবে—জলকষ্ট নিবারণ হবে—ফুলিসির অতি আচা
বারণ হবে—এই রকম আরও কত কথা কইলেন—হেয়া আমরা স

* সোটেল=হোটেল।

বুজতি পারি না। তেনার কথা শুন্যা আমরা পাশ্ শো মানুষ আইছি—
সোটেলে এই দুইদিন খাইচি,—সোটেলে জাগা না পায়্যা গাছতলায়
শুইছি এহন্ আমার গো সেই কথার কি করলেন? আমরা শুনছি
আপনি খুব বড় মানুষ—নাট সাহেবের সাতে আপনি কথা কন—ছিরি
মুহির এট্টা বাণী হোনবার জন্যি আমরা আছি।

সভাপতি। বেশত—তোমরা এসেছ, খুব ভাল হয়েছে।
তোমাদের দেখে আমি খুব খুসী হয়েছি। তোমরা আসাতে আমাদের
এই সভার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।

দেরা। কিন্তু মাষ্টের মশায়, ক্যাবল কথায় চিরা ভেজে না—এহন
সেই কাজের কি হবে?

সভা।—এখানে কোন কাজ হয় না—এখানে কেবল কথা হয়।
আমরা যে সকল রিজলিউসন্ অর্থাৎ মন্তব্য পাশ করিলাম
সে গুলি স্বয়ং লাটসাহেবের কাছে পাঠান হবে। তিনি
আবার কালেক্টর সাহেবের কাছে পাঠাবেন। পরে
তোমাদের চৌকীদারী ট্যাক্স মাপ হবে—পুকুর কাটা
হবে—রাস্তা প্রস্তুত হবে—পুলিসের অত্যাচার নিবারণ হবে।

দেরা। আর আমরা যে ট্যাহা দিছি হে ট্যাহায় কিছু অবে না?

সভা। যে সব চাঁদা আদায় হয়েছে তা'দিয়া এই সভার ব্যয় নির্ব্বাহ
করা হবে। দেশ বিদেশ থেকে যে সব সভ্য এসেছেন,
তাঁহাদের খাওয়ান হচ্ছে।

দেরা। আর আমরা বুঝি ট্যাহা দিয়া চোরের গরে চুরি করছি?
এহন গাটির পয়সা খরচা কর্‌য়া আবার সোটেলে খামু?

এই সময় আর একজন কৃষক মাতব্বরকে বলিল "ক্যামন্ বর
মিয়া? তুমি না কইছিলে দশ হাজার ট্যাহা চাঁদা ওঠ্‌ছে, ইহার মধ্যি
আমার গো পাচ টা গ্রামে পাচশ পুষ্কন্নীর জন্যি পাচ হাজার ট্যাহা

দেবে ? ট্যাহা নেওয়ার জন্যি ছালা ত আন্‌ছিলে হে ছালা কই!
ঐ শোন্ এহন কি কয়"।

মাতব্বর কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে সভাপতিকে বলিল—"বাবু, আপনারা এই চাঁদার ট্যাহা গুলীন্ এই রকম উড়াইয়া দিলেন আমাগো হাতে দিলি আমরা হ্যা দিয়া অনেক কাজ কর্ত্তাম পার্ত্তাম। আর হেই আমোদ কর‍্যাই যদি খরচ করলেন, তবে আমরা কি চোর অইলাম? আপনারা হ্যার কিছু ট্যাহা দিয়া যদি গাজীর গীত দিতেন, তবে আমরা হেই আমোদের ভাগ পাইতাম। এহন সোটেলওয়ালার ট্যাহাডা কেডা দেয় ? হে আমাগো কাল ধর‍্যা পয়সা আদায় কর‍্যা ছারবে।

সভা।—সে টাকা তোমরাই দিবে। আমরা আমাদের নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া তোমাদের এই উপকার করিতে আসিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। এই দেখ কত দেশ বিদেশ হইতে শত শত ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছেন—দেশের জন্য ইহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন—

দেরা।—বাবু, বেশী বক্‌বেন না—হেই যে নেংটী পরা দেয়াস্ তুল্লারে দ্যাহেন—এ যদি মনে করে তবে খোদার কছমে এক দিনের মধ্যি এক লাক মানুষ জর করবার জন্য পারে। আমি যদি মনে করি তবে দশ দিনের মধ্যি দশ আজার ট্যাহা চাঁদা তোলবার পারি। তবে অমরা মুরুখ্যুলোক চাষা, আপনারা ভদ্রলোক, ন্যাহাপরা জানেন। আপনারা আমাগো চালালিই আমরা চলতি পারি। আপনারা তা করেন না এই ত দুক্ষু। দ্যাশের জন্যি আপনারা পরিছেরম করেন কইলেন ; হে কি পরিছেরম আমরা ত দেহি না; আপনারা ক্যাবল জাগায় বইস্যা কথা কন আর পান তামাক খান।

আর একজন কৃষক বলিল—

"তামাক না চুরট্।"

দেরা। হয়—হয়—চুরট্। আমরা চাষালোক তামাক খাই, ভদ্রলোকে খায় চুরুট্।

সভা। আমরা সভায় যে কি কাজ করিলাম, তোমরা মূর্খলোক তার কি বুঝিবে ? আমরা সভায় যে সব মন্তব্য পাশ করিলাম তাহা লাট সাহেবের কাছে গেলে তোমাদের খুব ভাল হবে।

দেরা। বাবু, হে ত দরখাস্ত! হেয়া ত আমরাই কর্ত্তাম পার্ত্তাম! হেই দরখাস্তের জন্যি এত ট্যাহা খরচ ক্যান্ করলেন ?

সভা।—তোমাদের দরখাস্ত ত কেউ শোনে না!

দেরা।—ক্যান্ হোন্‌বে না ? আমরা হদি দশ বিশ আজার মানুষ জুট্যা কেলেক্টার সাহেবের কাছে দরখাস্ত করি, তবে তানি আলবত্ আমাগো দরখাস্ত হোন্‌বেন। আপনা গো কথাই কেউ হোনে না ; আপনারা উকীল মোক্তার—যে ট্যাহা দেয় তার ই গুণ গান—ট্যাহার জন্যি কালা গরুরে ধলা বানান—আপনাগো কথায় লাট সাহেব বিশ্বাস করবেন ক্যান্ ?

মাতব্বরের এই বক্তৃতা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া সবেগে জলযোগগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া সেই সকল চাষা লোক "আল্লা,—মমিন!" বলিয়া ডাক ছাড়িল। দেয়াস্ তুল্লা তাহাদিগকে থামাইয়া দিল। পরে সেই কৃষককুল কোন ক্রমে "সোটেলের" দেনা পরিশোধ করিয়া সেই দিনই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই মহাসভা সম্বন্ধে দুইটী স্মৃতি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল; সেই শিলপড়ার মত চটাপট করতালিধ্বনি আর সভাপতি মহাশয়ের তালে তালে পদ বিক্ষেপ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কলুষ ও কাল।

(১)

লোকালয়ের বাহিরে ছিল পাপের বসতি।
ভুগিত সে বারমাসই অনেক দুর্গতি ॥
পবনদেব যখন তার কুটির পানে যান্।
মট্‌কা ধরে ঝট্‌কা মেরে দেন বিষম টান্ ॥
বরুণদেব চাল ফুটিয়ে করেন বরিষণ।
কাঁথা কম্বল ভিজিয়ে তারে করেন জ্বালাতন!
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা তার সব খবরই জানে।
উঁকি মেরে চেয়ে আছেন সদাই তার পানে ॥
বারমাসিক আমের গাছ সুমিষ্ট ফল তার।
ছিল বৃদ্ধ পাপের, তাই চলিত আহার ॥
দেখ্‌তে যেমন খেতে তেমন আম চমৎকার!
গাছভরে' ফল ধরে বড়ই বাহার ॥
লোভেপোড়ে চুরি ক'রে লোকে আম খায়।
গাছে চড়ে' আম পাড়ে তলারও কুড়ায় ॥
জান্‌তে পেরে পাপ বুড়ো যখন তাড়া দেয়।
ঝুপ্‌ঝাপিয়ে লাফিয়ে ভয়ে সকলে পলায় ॥
লোকেদের অত্যাচারে পাপ হ'ল কাতর।
হেন কালে এলো এক বৃদ্ধ মুনিবর ॥
দাড়ি গোঁপ জটাজুট দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
ছাই-মাখানো আগুন যেন পূত কলেবর ॥
সাঁঝেরবেলা এসে মুনি পাপের দুয়ারে।
"অতিথি, অতিথি" বলে ডাকে বারে বারে ॥

পাপ তাঁরে দেখে, ভয়ে অতিথি করিল।
বিধিমত সেবা করি মুনিরে তুষিল ॥
যা'বার সময় মুনি বলেন "লওরে পাপ, বর"।
পাপ বলে "সদয় যদি, মাগি এই বর—
"—আমি বড়ই কাতর—
"লোকগুলো চুরি করে আম আমার খায়।
"জ্বালাতন করে মোরে তাড়ানো না যায় ॥
"আমারে যে না বলিয়া উঠিবে গাছেতে।
"আমার আজ্ঞা বিনা যেন না পারে নামিতে ॥
"যদি প্রভু সদয় হ'লে, দাও এই বর।"
"তথাস্তু" বলিয়া মুনি গেলেন আপন ঘর ॥

(২)

ভাদ্রমাস বড় গরম গাঁয়ের যুবাগণ।
দলবেঁধে সাঁঝের বেলায় করয়ে ভ্রমণ ॥
নদীর পারে চাঁদ উঠেছে পশ্চিম গগনে।
চতুর্থীর সে নষ্টচন্দ্র পড়িল নয়নে ॥
চাঁদ দেখে তখন সবে করে আপশোষ।
নানারূপ যুক্তি করে কাটা'তে সে দোষ ॥
নষ্টচন্দ্রের দোষ যায় পরের গালি খেলে।
পরের ক্ষতি করার প্রথা তাই আস্‌ছে চলে ॥
ভেবেচিন্তে তখন তা'দের যুক্তি হ'ল স্থির।
"আম পাড়িতে যাই চল পাপের কুটীর ॥"
"পাপ বুড়া কড়া কড়া দেয় বড় গালি।"
"চল আজি লুটেপুটে গাছ করি খালি ॥"

গেল তবে তথায় সবে মনের উল্লাসে।
রাতের বেলায় উঠ্‌লো গাছে আমের বিনাশে॥
এদিকে সুখে, নির্ভাবনায় ঘুমে ভরপুর।
নাক ডাকিয়ে পাপবুড়া শ্রান্তি করে দূর॥
পাপের ঝাঁপে ছুড়ে তা'রা মারছে আমের আঁটি।
শিলাবৃষ্টি হচ্ছে তবু নাই পাপের সাড়াটি॥
তখন একজন বলে "ভাই বৃথাই আম পাড়া"।
"সাড়াশব্দ নাইক কোন, বুড়ো গেছে মারা॥"
"এত গণ্ডগোলে সাড়া দিচ্ছে না যখন।"
"গতিক ভাল বলে বোধ হচ্ছে না তখন॥"
"লাগ্‌ছে কেমন কেমন"॥
"গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে বুড়ো"—কহে আর একজন—
"নেমে চলো ঝাঁপ টানিগে উঠিবে এখন।"
"গালি পাড়িবে তখন॥"
"বেশ কথা" বলে সবে নেমে আস্‌তে চায়।
ডালে ডালে পড়লো বাঁধা ঘট্‌লো বিষম দায়॥
যথা সাধ্য ধস্তাধস্তি করে নানামতে।
নাম্‌তে কিন্তু পারে না কেউ আমগাছ হ'তে॥
শেষ রাত্রে ঠাণ্ডালেগে কাঁদে আর কাশে।
জান্‌তে পেরে পাপ বৃদ্ধ মনে মনে হাসে॥
নাকীসুরের কান্না ক্রমে হাহাকার হ'ল।
গোল শুনে গাঁয়ের লোকের ঘুমভেঙ্গে গেল॥
কোথা হ'তে কান্না আসে ছুটলো অন্বেষণে;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঠ্‌লো তারা পাপের প্রাঙ্গণে॥
গাছ হ'তে কান্না আসে বিকট কোলাহল।
পলায় ভয়ে লোকসকলে ভেবে ভূতের দল॥

ব্যাকুল হয়ে মায়ে বলে "ছেলেরা নাই ঘরে।"
"ভূত নয়, যাও দেখগে পড়েছে কোন ফেরে॥"
সাহস পেয়ে পুরুষেরা আবার ফিরে যায়।
এ দিকেও নিশাটুকু অবসান প্রায়॥
ঝুঁঝ্‌কিভোরে গেল সবে পুন গাছ তলে।
দেখলে সবে ডালে ডালে নিজেদের ছেলে॥
শয্যা ত্যজি পাপ বৃদ্ধ উঠেছে তখন।
তলে বসি কচ্ছে বুড়ো মহা আস্ফালন॥
বাপ ভায়েরা কেঁদে তখন পাপের পায়ে ধরে।
নাম্‌তে আদেশ দিল তবে পাপ দয়া করে॥
নেমে এলো ছেলের দল পাপের দয়ায়।
কবি বলে দয়া নয় কেবলমাত্র ভয়॥
ভয়, পাছে থাকলে গাছে আমের বিনাশ।
তাই পেলে ছেলেগুলো বেকসুর খালাস॥
ওই আম গাছে ভূত আছে হ'ল জনরব।
পারৎ পক্ষে যায় না সেথা কোনই মানব॥

(৩)

শীতকাল হু হু বহে উত্তুরে বাতাস।
ঠাণ্ডালেগে পাপের হ'ল বিষম কাশ॥
কাশিতে কাশিতে দম্ আটকিয়া গেল।
অমনি আসিয়া মহাকাল দেখা দিল॥
পাপ লয়ে যমালয়ে যাইতে তখন।
সহসা পড়িল আমে কালের নয়ন॥
মনোহর আম দেখে খেতে হ'ল মন।
পাপে তলে রাখি গাছে করে আরোহণ॥

মনসাধে মিষ্ট আম করিয়া ভক্ষণ।
নামিয়া আসিতে আর পারে না তখন ॥
মহাকাল বৃক্ষে যদি আবদ্ধ রহিল।
জগতের জীব সব অমর হইল ॥
ধরা ভারাক্রান্ত হয়ে' হাহাকার করে।
দেখি দেবগণ অতি পড়িল ফাঁপরে ॥
সবে মিলে যুক্তি করে পাপে দিয়া প্রাণ।
কাল নামাইতে তার অনুমতি চা'ন ॥
পাপ বলে অনুমতি তবে পারি দিতে।
যদি কাল মোরে আর নাহি চায় নিতে ॥
অগত্যা তাহাই কাল করি অঙ্গীকার।
বৃক্ষ হ'তে রক্ষা পেয়ে লয় কার্য্যভার ॥
সেই হ'তে পাপবুড়ো অমর হইয়া।
অতি দর্পে ফিরিতেছে জগৎ মথিয়া ॥
অমর হয়েছে নাই কোনই ভাবনা।
আয়ু দিয়া আম তার নিচ্ছে কত জনা ॥
পাপে, কালে দোঁহে মহা সখ্যতা জন্মিল।
জগতের জীব উভে নাশিতে লাগিল ॥
কলুষ কালের কথা অতি পুরাতন।
হরি হরি বল এবে করি সমাপন ॥

শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক।

সাময়িক কথা।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

সম্প্রতি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস দেখাইয়া দিয়াছেন, ওকাকুরা ইহাঁদের অগ্রণী। ইহাঁরা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মকল্পনা,—আধুনিক ঐতিহাসিকগণের প্রবর্ত্তিত।

এই দুই ধর্ম্ম কখনই পৃথক্ ধর্ম্মরূপে ভারতবর্ষে গণ্য হয় নাই, বৌদ্ধভারত, বৌদ্ধযুগ সর্ব্বৈব ঐতিহাসিকগণের কল্পনাসাগরমন্থনোৎপন্ন।

এই মতের অনুকূলে অনেক যুক্তি পাওয়া যাইতেছে ; শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত যেরূপ আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্গত, বৌদ্ধধর্ম্মও তদ্রূপই ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মেরই এক শাখা ; বৌদ্ধমত কখনই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে নাই, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীকেই বৌদ্ধগণ তুল্যরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

তবে একটা বিষয়ে অনৈক্য দাঁড়াইয়াছিল দেখাইতে যাইয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন, বৌদ্ধগণ বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন ; হিন্দুধর্ম্মের অপর যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে তাহার সকল গুলিরই ভিত্তিভূমি বেদ, বুদ্ধ সেই ভিত্তিকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম বিভিন্ন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অপর সমস্ত শাখাতেই বেদের দোহাই মান্য হয়, বৌদ্ধমত বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বথা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। "বেদ বিনিন্দত। যেন বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।" প্রভৃতি প্রচলিত শ্লোক ও জয়দেবের "নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহঃ" প্রভৃতি বাক্যে এই কথা প্রতিপন্ন হয়।

আমাদের দেশে কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠিলেই তাহা "বেদবিধি গর্হিত" বলিয়া প্রতিপক্ষীয়েরা উড়াইয়া দিতে চাহে। প্রতিপক্ষের উক্তি প্রামাণ্য নহে ; বুদ্ধদেব স্বয়ং বেদকে অমান্য করিয়াছিলেন বলিয়া কি প্রমাণ আছে? প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে বরং দেখা যায় বৌদ্ধগণ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, পশুহননবৃত্তি বেদের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয়মত

প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—এরূপ শাস্ত্র, ব্যাখ্যা হিন্দুধর্ম্মে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত এবং বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে, বাদী প্রতিবাদী উভয়েই শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই তর্ক উত্থাপন করিতেছেন, পৌত্তলিক তার বিরুদ্ধে ও সপক্ষে সমস্ত যুক্তিই শাস্ত্রকে দোহন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি খুব বলবান বলিয়া মান্য করা যায় না, পশুহনন ব্যাপার যদি বেদসম্মত, তবে বৈষ্ণবগণকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে এখনই খারিজ করিয়া দিতে হয়।

বৌদ্ধগণ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অর্থ কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ? অন্ততঃ অতি পুরাকালে এই ভাবের সাম্প্রদায়িক নামে ভারতীয় ধর্ম্মকে অভিহিত করা হইত না, মহাভারতে এবং অপরাপর প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নাম পাওয়া যায় না ; ধর্ম্ম কি? বৈশম্পায়ণের নিকট ইহাই জন্মেজয়ের প্রশ্ন ছিল, ধর্ম্ম যাহা নিত্য সনাতন, তাহাই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম. এদেশের সেই প্রাচীন ধর্ম্মকে যদি কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে হয় তবে তাহা আর্যধর্ম্ম উপাধি পাইতে পারে ; বৌদ্ধধর্ম্ম সেই আর্য ধর্ম্মেরই একটি শাখামাত্র, এবং এই হিসাবে ইহা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্য ধর্ম্মের পার্শ্বেই আর্য্যধর্ম্মের জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া স্থান লইবে।

বিদ্বেষপ্রণোদিত নিন্দাবাদ উদ্ধৃত করিয়া পার্থক্য প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া মিথ্যা ; বৈষ্ণবগণ শাক্তদিগকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিতেন, বৈষ্ণব ইতিহাসে তাহার সহস্র প্রমাণ আছে ; শাক্তগণ চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে ত্রিপুরাসুরের ত্রিমূর্ত্তি রূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বটুকভৈরবের নিকট গণপতির প্রশ্ন পাঠ করিলে তাহা জানা যায়। সুতরাং বৌদ্ধ বিদ্বেষ দ্বারা ইহার স্বাতন্ত্র্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। যাবাদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বলভদ্র মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতা মূর্ত্তি একত্র রহিয়াছে,—সেখানে পূজকগণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ এখন এক মন্দিরেই পূজা দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরোহিত বুদ্ধদেবের পূজক এবং শত শত বৌদ্ধ, হিন্দু পুরোহিতকে মান্য করিয়া বুদ্ধদেবের পূজা দিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে উহাতে অনেক দেশের ধর্ম্মের প্রভাব পড়িয়াছিল, সেই সমস্ত বিদেশীয় উপকরণ সমেত ইহা পুনরায় আর্য্য ধর্ম্মের কুক্ষীগত হইয়া গিয়াছে, যে স্থান হইতে ইহা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানের ধর্ম্ম ইহাকে পুনরায় আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয়ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন এই কথা

বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অখণ্ডকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, আজ আমরা অনায়াসে মনে করিতে পারি, সমস্ত বৌদ্ধ জগত, হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত। চীনে দশমহাবিদ্যার পূজা হইতেছে, কালীমূর্ত্তি, ব্রহ্মার মূর্ত্তি চীনে জাপানের বৌদ্ধগণ নিয়ত পূজা করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মেও আছে, বুদ্ধ স্বয়ং ভগবানের অবতার,—সনাতন আর্যধর্ম্মের শাখা প্রশাখায় কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সমস্তই একজাতীয় ; বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোন কালেও জাতিচ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধযুগ বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধ ইতিহাস প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া আমরা শুধু ঐতিহাসিক পাতক করিতেছি এমন নহে. ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া ঘরের লোককে বাহিরের বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছি, তাহাতে একটা নৈতিক অপরাধ আছে। বিদেশীদের প্ররোচনায় আমরা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতেছি ; মিঃ ওকাকুরা এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি নিবেদিতাও এইমত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন।

শিখেরা কি হিন্দু ?

সম্প্রতি অমৃতসরস্থ স্বর্ণমন্দিরের মহান্ত ঐ মন্দিরে বহুদিবসাবধি যে সকল হিন্দুদেবপ্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিল তাহা বরখাস্ত করাতে পঞ্জাবের হিন্দুগণ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মহান্তর এই কার্য্যে এক ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—শিখসম্প্রদায় হিন্দুদিগের অন্তর্গত কি না। ভারতের ইতিহাসে এ প্রশ্ন উত্থাপন আজ নূতন নহে, বহুবার ইহা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। পুনরায় স্বর্ণমন্দিরের অধিকারীর অবিমৃষ্যকারিতায় আবার সেই পুরাতন কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সে দিন মহান্তর কার্য্যের প্রতিবাদের জন্য অমৃতসরস্থ "সনাতন ধর্ম্মসভা" যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা হরবংশ লাল, শিখেরা যে হিন্দু তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি প্রাচীন নজির দেখাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই শিখসম্প্রদায়ের প্রধান ইতিহাসগ্রন্থ "সূর্য্য প্রকাশ" হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন "আমরা যে প্রশ্ন মিমাংসার জন্য আজ একত্র হইয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের দরবারে তাহা একবার আলোচিত হইয়া গিয়াছে।"

"শিখসম্প্রদায়ের তৃতীয়গুরু—অমরদাসের সমসাময়িক হিন্দুগণ তাঁহার বি
রাজদরবারে এক অভিযোগ আনয়ন করেন।"

অভিযোগের মর্ম্ম এইরূপ :—"আপনোং পনথ করহ বিখ্যাত বেদরীতী
ত্যাগন করিয়ো। অউর মতি আপনোপর চরিয়ো" ;—আপনি এক নবধর্ম্ম প্র
করিয়াছেন, বেদরীতী গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুগণ বলিতে চা
যে, হিন্দুর অবশ্য পালনীয় গায়ত্রী যখন তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন
অমরদাস হিন্দু নহেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নহে।
আকবরের আহ্বানে গুরু অমরদাসের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া, অমৃতসরের স্থাপ
গুরু রামদাস সম্রাট দরবারে ঐ অভিযোগের প্রতিবাদের জন্য উপস্থিত হইলে
সূর্য্যপ্রকাশে, এইরূপ বিবরণ আছে :—

"বোলে রামদাস সঙ্গ সাহ
পঠে গায়ত্রী হম তুম পাহ
অর্থ সমেত সুনাবহী সারী"
সভা কে বোচ পাঠ তিস পড়ে
পাপ পুন্ন সভ ইন সির চড়ে

তাহার পরে রামদাস সর্ব্বসমক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং তাহার সবিশে
ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন এবং দরবারে প্রকাশ করেন তি
একজন পরম হিন্দু।"

"সম্রাট আকবর তখন, গুরু অমরদাসের উপর যে মিথ্যা অভিযোগ আরোপি
হইয়াছে বুঝিয়া দরবারে তাঁহাকে একজন অকপট হিন্দু বলিয়া সাব্যস্ত করে।
বহুদিন পূর্ব্বে, শিখদিগের হিন্দুত্ব এইভাবে প্রতিপন্ন হয়।

"শিখদিগের বিরুদ্ধে শুধু এইমাত্র প্রমাণ আছে তাহা নহে, ব্রিটিশ শাসনে
প্রারম্ভে, শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একবার লাহোরে এক
সভায় আহূত হন, সভার উদ্দেশ্য ছিল, শিখগণ পূর্ব্বে কোন্ সাম্প্রদায়িক আইনে
দ্বারা শাসিত হইতেছিলেন তাহা সিদ্ধান্ত করা। তাহাতে স্থির হয়, শিখেরা
হিন্দু, অতএব হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আইনের দ্বারা তাঁহারা শাসিত হইবে।
(পঞ্জাব সিভিল কোড, তৃতীয় অধ্যায়।)

"পরে, ১৮৯৭ খৃঃ অঃ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্তর বাবা খে

বেদী এক মহতি সভায়, জাম্মুর মহারাজের সমক্ষে স্পষ্ট স্বরে স্বীকার করেন
শিখেরা হিন্দু।

"১৮৯৮ খৃঃ অঃ পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা রাজেন্দ্র সিং, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
ত্ত এক উপাধী গ্রহণকালে সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ;—কোন কোন
ন এরূপ গোলোযোগ উঠিয়াছে যে শিখেরা নিজেকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে
মত ; কিন্তু সেটী তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল, শিখ সম্প্রদায় হিন্দু হইতে বিভিন্ন নহে,
তেও পারে না। মহারাজা রাজেন্দ্র সিং একজন বিশিষ্ট শিখ, তিনি শিখ
দায়ের যে একজন নেতৃপদযোগ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহও নাই। তাঁহার
শিখেরা অমান্য করিতে পারেন না।"

সর্দ্দার দয়াল সিংএর সেদিনকার "উইল কেস" ও শিখগণকে হিন্দু প্রমাণিত
য়াছে। প্রিভিকাউন্সেলে সর্দ্দার দয়াল সিংকে হিন্দু স্থির করিয়া এ উইল-
দ্দমার নিষ্পত্তি হয়।"

লালা হরবংশ লালা যে কয়েকটী প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা অতি সারবান।
অমরদাস, দরবারে শত শহস্র জন সমক্ষে যখন নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া
াছেন তখন আধুনিক শিখগণ কি হিসাবে নিজেদের হিন্দুত্ব অস্বীকার করিবেন ?
যাহা নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, শিষ্যেরা তাহা পদে পদে বিধ্বস্ত করিবার
াস করিতেছেন ; এক্ষেত্রে আমরা শিখগণের গুরুভক্তির প্রশংসা করিতে পারিনা।
াব সিভিল কোডে শিখগণকে স্পষ্টস্বরে হিন্দু বলা রহিয়াছে, তাঁহারাও তদানুযায়ী
ন কানুনের দ্বারা শাসিত হইতেছেন ; তদ্ব্যতীত মহারাজা রাজেন্দ্র সিং,
ক্ষেম সিং প্রভৃতি ইদানীন্তন শিখসমাজের প্রধান ব্যক্তিগণও নিজেদের
ুত্বে সন্দিহান ছিলেন না। যে হিন্দুত্ব শিখদিগের রক্তে মাংসে মিশিয়া গিয়াছে
চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বর্জ্জন করা অসম্ভব। শিখেরা এককালে হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণের
প্রাণপণ করিয়াছিলেন—গুরু অর্জ্জুন দেবের দৃষ্টান্ত তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।
টেকবাহাদুর, আরংজেবের হস্তে হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের জন্য কি নির্য্যাতনই না
গ করিয়াছিলেন ; গুরু গোবিন্দ সিং চারিটি পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া নিজেও
ম কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন শিখ গুরুদিগের জ্বলন্ত
ুপ্রীতি আমরা এই ভাবেই শিখ ইতিহাসে দেখিতে পাই। কিন্তু আজ তাঁহাদের
্য বলিয়া যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহাদের এ দারুণ হিন্দু-বিদ্বেষে—শিখ-ধর্ম্মে
ক অর্পিত হইতেছে।

সমর্পণ।

আমার হৃদয়   তোমার চরণে
তুমি যদি লহ টানিয়া
বারেকের তরে   জীবন মরণে
কারণ লব না জানিয়া ;—
অনন্ত সাগর   তটিনীরে টানে
আপনার হৃদে রাখিতে,
বায়ু গাহে মৃদু   কুসুমের কানে
পরিমল তার মাখিতে ;—

তা'রা ত কখনো   করেনা বারণ—
দেয় শুধু প্রাণ সঁপিয়া ;
শুনিব না আজি   আমিও কারণ
দিব শুধু প্রাণ সঁপিয়া !

আমারো হৃদয়ে   প্রেম আছে, স্বামি,
তুমি যদি তাহা লহ গো—
শিরে করি তারে   তবদ্বারে আমি
রেখে আসি তুমি কহ গো ;—

শুকতারা জ্বলে   ধূসর উষায়
তোমার দীপ্ত শিয়রে ;
নবীন জীবনে   নবীন ভূষায়
আমি দিব দান প্রিয়রে ;—

বৃথা এতদিন   দিব ব'লে কারে
ঘুরিয়াছি কত খুজিয়া ;—
আমার দেবতা   আমারি দুয়ারে—
আমি ভ্রমিয়াছি খুঁজিয়া !

আজি হেরি তোমা   সহসা দুয়ারে
প্রাণ উঠিয়াছে ভরিয়া ;
বুঝিতে পারিনা   কি দিলে তোমারে
যাবে অশান্তি হরিয়া ;—

তরুণ তপন   তোমারি কারণে
উদয় অচলে উঠে গো ;
শরতের ধরা   বন উপবনে
কুসুমের প্রায় ফুটে গো ;—
প্রীতি প্রেম দিয়া   বাকি সব আর
কার হেতু আমি রাখিব ?—
আমারেই সঁপি   চরণে তোমার
তোমারেই শুধু রাখিব।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

আশা।

জন্মেছি তোমার কোলে, অয়ি মাতৃভূমি,
বেঁচে আছি লভি' তব স্নেহ অবিরল,
চোখে চোখে মোরে সদা রাখিয়াছ তুমি
ঘিরিয়া রেখেছে মোরে তোমার অঞ্চল।
সাঙ্গ যবে হ'বে খেলা, জীবন তপন
অস্তমিত হ'বে যবে পশ্চিম অচলে,
হে জননি শ্রান্তিহরা, জানি গো তখন
বিরাম লভিব তব স্নেহময় কোলে।
কি কাজ করিবে তব!—কোন্ উপহার
তোমার চরণে দিবে,—কি আছে সম্বল!
অযোগ্য পুত্রের, পরে তবু মা তোমার
স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ আছে অবিচল।
তাই আশা জাগে হৃদে—যদি কভু পারি
মুছাতে আঁখির তব এক বিন্দু বারি।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

চীনদেশে।

চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপশ্চিমের সভ্যতাভিমানী জাতিগণ যখন রণদুন্দুভি পিটিয়া দিয়াছিলেন, তখন ইংরাজ রাজার তরফ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এবং তাঁহাদের আহার্য্য সংস্থান লইয়া আমাকেও সেই অজ্ঞাত সুদূর দেশে যাইতে হইয়াছিল। কারণ, আমি কমিশেরিয়েটের বড়বাবু ছিলাম।

যাত্রাকালে বৃদ্ধ পিতামাতার সজলনেত্রে শুভকামনা, তরুণী স্ত্রীর ক্লিন্নমুখে বিরহবেদনা আমাকে একটু কাতর করিলেও তখন আমারা প্রাণে আনন্দ ধরিতেছিল না। তাহার কারণ, গৃহচত্বরের কীট বাঙালীর জীবনে পরের পয়সায় এত দেশ ভ্রমণ ও আশ মিটাইয়া প্রকৃত যুদ্ধ দেখা বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আমি বাল্যাবধি পর্য্যটনপ্রিয় ও কিছু বীরভাবাপন্ন ছিলাম। নভেলে প্রেমের সম্ভাষণ অপেক্ষা, ইতিহাসে বীরের অস্ত্রসম্ভাষণ আমার প্রিয়পাঠ্য ছিল। রাধাকৃষ্ণের ছবি অপেক্ষা কৃষ্ণার্জ্জুনের চিত্র আমার মনহরণ করিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাঙালীকে যুদ্ধ করিবার সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমাদের কাণের কাছে শতবর্ষ ধরিয়া ভীরুত্বের অপবাদ ঘোষণা করিয়া করিয়া সাহস-ক্ষুণ্ণ ও মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক বাঙালী ভীরু কি না ইহা দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া রণস্থলের দিকে চাহিতাম; যখন দেখিতাম সন্ধ্যার মলিনিমা উজ্জ্বল করিয়া "ছুটিল একটি গোলা লোহিত বরণ" তখন সে "আলোক পাইয়া আমি পুলকিত মন" না হইলেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা যে স্বাভাবিক থাকিত তাহা আমি শপথ করিয়া

বলিতে পারি। কিন্তু যুদ্ধসন্দর্শন আমার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিত না, কারণ হতভাগ্য আমাকে খাদ্যপেয়ের প্রহরী হইয়া রণস্থল হইতে দূরে থাকিতে হইত। ব্যস্ততার পার্শ্বে আমার অলস জড়জীবন বড় কুশ্রী বোধ হইত। আমার এমন কেহ সঙ্গীও ছিল না যাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে পারি।

আমার এক সঙ্গী ছিলেন লিয়াংফু। ইনি একজন চীনা ভদ্রলোক। ইংরাজেরা ইঁহাকে গোয়েন্দারূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই লোকটার পরিচয় পাইয়া অবধি সে আমার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনে মনে তাহাকে বলিতাম 'ওরে স্বদেশদ্রোহী ঘৃণ্যজীব, কোন্ স্বার্থের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতিকে বিদেশীর কাছে বলি দিতেছিস্। বাঙালী যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত-আয়োজন করিতেছে, আবার তোরা সেই ভুল করিতে চাস্। তোকে ধিক্, শত ধিক্!'

লিয়াংফু কিন্তু আমার সঙ্গে মিশিবার জন্য খুব চেষ্টা করিত। প্রশ্নপরম্পরায় আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। সে যত আমাকে বিরক্ত করিত, আমার মুখ তত বন্ধ হইয়া যাইত। তখন ভায়ার ছোট ছোট গোল-গোল চোখ দুটি বনবিড়ালের চোখের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর দেখাইত।

আমাদের তাঁবুতে মধ্যে একটা বড় ঘর ও দু পাশে দুটা ছোট কুঠরী ছিল। একটা কুঠরা আমার ও অন্যটা লিয়াংফু ভায়ার অধিকারে ছিল। লিয়াংফুভায়া প্রায়ই আমার কামরায় আসিয়া আমার কাগজপত্র ঘাঁটিয়া, বাংলা শিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া বড় উৎপাৎ করিত। আমি তাহার ঘরে কদাচিৎ যাইতাম। উভয়ের কুঠরীর মধ্যে বড় ঘরটিতে আমার আপিশ ছিল ও আশেপাশে নানাবিধ খাদ্য অখাদ্য দ্রব্য ছড়ান থাকিত।

তাঁবুতে দরজা আঁটিবার যো নাই। পরদা ফেলাই চরম আবরু।

লিয়াংফুভায়া প্রায় পর্দ্দা ফেলিয়া কি লেখা পড়া করিত। আমি স্বাভাবিক কৌতূহলে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতাম। প্রায়ই দেখিতাম ভায়া তুলিচিত্রিত কতকগুলি পাতলা কাগজ ঘরের উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একখানা কাগজ চিঠির আকারে ভাঁজিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতেছে।

সে বাহিরে গেলে আমি দূরে দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতাম। ভায়া আমার নিকট কেমন রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশদ্রোহীকে বিশ্বাস কি ?

আমি অনুসরণ করিতাম বটে কিন্তু সে বনবিড়ালের মত তিন লম্ফে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইত ; আমি অপ্রতিভের মত পায়ের লতা, কাপড়ের কাঁটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ও পাথরে টোক্কর খাইতে খাইতে কোন মতে শিবিরে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন দেখিলাম লিয়াংফুভায়া কি লিখিতে লিখিতে লেখা উপর ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া [illegible] কাঁদিতেছে। এদিকে হাতের কালীমাখা তুলিটা তাহার গালে দিয়া চীনা অক্ষর রচনা করিতেছিল। ভায়ার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। ক্ষণেক পরে মসিলিপ্ত কপোলে, সৈনিকদের বিদ্রূপহাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বাহির হইয়া গেল। আমি সেদিন সঙ্গে গেলাম না। ভায়ার কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ব্লটিং কাগজের শুভ্র কলেবরকে উল্কিচিত্রিত করিয়া বহু চৈন অক্ষর সোজা কাৎ হইয়া বসিয়া শুইয়া আছে। একখানা আয়নার সামনে ব্লটিং কাগজখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উল্টা অক্ষরের সোজা প্রতিচ্ছায়া হইতে অনেক অসংলগ্ন কথা বাহির করিয়া ফেলিলাম। মন আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। অহো দারুণ বিধাতা, আমার অদৃষ্টে যদি রণসম্ভোগ না লিখিয়াছিলে তবে সুলতানের অন্দরে খোজা প্রহরীর মত আমায়

শুধু তাহা আগলাইবার ভার কেন দিয়াছ ! এর চেয়ে প্রত্নতত্ত্বের শিলোৎকীর্ণ অদ্ভুত লিপি পাঠ করিতে দিতে, বা বঙ্গের প্রধান ডিটেক্‌টিভের পদ শোভা করিতে দিতে !

যাহা হউক, দগ্ধ অদৃষ্টের জন্য নিষ্ফল বিলাপ না করিয়া অসংলগ্ন বাক্যগুলিকে সংলগ্ন করিয়া অর্থবোধের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 'প্রিয়টিশি', 'বসন্তোৎসবের সময়', 'কমিশেরিয়েট বাবুর তাঁবু', 'আগুন', 'বারুদ' প্রভৃতি অর্থসম্বদ্ধ কথা হইতে ভায়ার চিন্তাপ্রণালীর একটা থেই ধরিতে পারিলাম না। চীনপ্রবাসে তদ্দেশীয় ভাষায় আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহাতে অতিকষ্টে বুঝিলাম, 'টিশি' অর্থে 'সুন্দরী'। ভায়ার প্রাণেও প্রেম আছে দেখিতেছি ; এই প্রেমের পশ্চাতে মস্ত একটা কিন্তুও আছে বোধ হয়।

রুষ্টরুষ মাঞ্চুরিয়া দখল করেন দেখিয়া অন্যান্য রাজাগণ চীনের প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া শান্তি ঘোষণা করিলেন। বীরগণের অস্ত্র-সম্ভাষণ থামিয়া গিয়াছে, এখন আমরা অবাধে সর্ব্বত্রই প্রায় বিচরণ করিতাম। যুদ্ধ দেখার সাধ যখন মিটিয়া গেল, তখন গৃহে ফিরিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমাদের ছাউনি য়েনলুন পর্ব্বতের প্রত্যন্ত প্রদেশে ছিল। কি দারুণ শীত ! চারিদিকে শুধু পাথর, গাছ-পালা, জঙ্গল। আমি এখানে একখানা "যাহোক-কিছু-একটা-দূতকাব্য" লিখিয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু অস্ত্ররণরণিভীতা কবিতাবধূ বঙ্গের নিরাপদ আম্র-মুকুলসুরভিত কুঞ্জের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সহসা শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, নৃশংস হত্যা বন্ধ হইবামাত্র কবিতার কোমল প্রাণে আনন্দের যে ঝঙ্কার সাড়া দিব দিব করিতেছিল, তাহা বাড়ীর এক পত্রে একেবারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ পাইলাম আমার পত্নী প্লেগ কবলিত হইয়াছেন। আমি বুদ্ধ একথা স্বীকার না করিলেও সেই

তরুণী যে আমার "প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" ছিল তাহা স্বীকা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। কিন্তু সকলের আনন্দে মধ্যে আমার ক্রন্দনটা অশোভন হইবে বলিয়া দরীমুখোচ্ছ্সিত উৎসমুখে আপাতত পাষাণ চাপা দিয়া রাখিলাম। কোন অবকাশে জল যে একেবারে উদ্গলিত হইত না, এমন বলিতে পারি না।

আমি শোকার্ত্ত মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য পঞ্চামুনি, বুদ্ধ প্রভৃতি দেবমন্দির ও লামা সন্দর্শনে যাইতাম। একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিলাম। মন যখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকে তখন অপর ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত দূর কি করিল তাহার বড় একটা হিসাব রাখে না। সহসা একটা কোলাহল আমার চমক ভাঙ্গিয়া দিল। দেখিলাম, বিস্তীর্ণ হরিৎ প্রান্তর। দূরে একটি চীনা রমণী ক্রন্দনরতা এবং কয়েকজন চীনা ও য়ুরোপীয় যুদ্ধরত। যুদ্ধাবসানে মৃতাবশিষ্ট কয়েকজন চীনা, প্রতিহিংসার লেলিহান্ সঙ্গিন জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমিই যে উহার লক্ষ্য তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। পশ্চাতে রমণীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'বিদেশী, পলাও'। আমি ফিরিলাম, রমণী হস্তসঙ্কেতে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল। যে দিকটায় দৌড়িলাম, সে দিকটায় বড় ঘন বন, প্রাণের ভয় ব্যতীত সে পথে আমি এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। কিছুদূর যাইয়া একখানি কুটীর দেখিলাম। রমণী আমাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বারোপান্তে উপ লাসনসন্নিবিষ্ট হইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া মাথায় কাণে পরিতে লাগিল আর গান ধরিয়া দিল। বিদেশী সঙ্গীত, দুর্ব্বোধবাক্যের মধ্যে কল্পনা জড়িত কি এক ভাব আমার মনে আনিয়া, আমাকে বড় মুগ্ধ করে; তাই আমার দেশে সামান্য গাড়োয়ানের কর্কশ কণ্ঠে হিন্দীগানও আমাকে বড় প্রীতি দেয়। আমি চীনা রমণীর কণ্ঠসুধা পান করিতে লাগিলাম

অবোধ্যগানের কল্পিত অর্থে আমার চিত্ত হারাইয়া গেল। কতক্ষণ যে ঘরে বদ্ধ ছিলাম বুঝিতে পারি নাই।

কিছুক্ষণ পরে একজন চীনা আসিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "টিশি, এদিকে একজন বিদেশীকে দেখেছ?" টিশি গান থামাইয়া বলিল 'কৈ? না।' পুরুষটা চলিয়া গেল। টিশির কণ্ঠ আবার বায়ুতরঙ্গে মদিরা ঢালিয়া দিতে লাগিল। এ ইকি লিয়াংফু ভায়ার টিশি?

আমি গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। টিশিরও কণ্ঠের বিরাম নাই। আবার একটা লোক আসিল, গান থামিয়া গেল, আমি অখণ্ড মনোযোগ দিয়াও তাহাদের অস্ফুট আলাপ শুনিতে পাইলাম না। কপাটের ফাঁকে চোখ দিয়া অতি কষ্টে দেখিলাম আগতপুরুষ স্বয়ং লিয়াংফুভায়া। ভায়া যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত শ্রবণসক্ষম উচ্চস্বরে বলিয়া গেল, 'এই চিঠিতে শেষ উপদেশ দিলাম; ধরা পড়ার ভয়ে নিত্য নূতন মতলব করিতে হইতেছে।' টিশি কিছু বলিল না।

টিশি আমার নিকটে আসিল। আমি ধন্যবাদ জানাইলাম। আমি যে লিয়াংফুকে চিনিতে পারিয়াছি তাহা বলিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল ব্যাকুলি করিতে লাগিল। 'আমি সংবৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এখানে একলা থাক'? টিশি ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল 'না'। আমি ঐ হাসিটুকু ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিলাম, তোমার স্বামী থাকেন'। টিশি রজত-ঘণ্টার মত মধুরহাস্যে মুখর হইয়া বলিল 'আমি কুমারী'। আমি অনুবাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'যিনি এখন তোমার সহিত কথা কহিয়া গেলেন, তিনিই তোমার প্রণয়ী, ভাবীস্বামী'। এবার টিশি আমাকে হাস্যতরঙ্গে প্লাবিত নিমজ্জিত করিয়া দিল। অনেক কষ্টে একটু দম

লইয়া বলিল, 'ও আমার ভাই'। হরি হরি! আমার সব রোমান্স মাটি হইয়া গেল। আমি অপ্রতিভ হইয়া প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলাম, 'টিশি, রাত্রি হইয়াছে, আমি যাই। যতদিন বাঁচিব, আমার কৃতজ্ঞতা, বাঁচিয়া ব্যক্ত করিবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়া, এই বনবাসিনী টিশির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইবে'! টিশি বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। দেখিলাম টিশি সকল অবস্থাতেই বড় মনোরম, তাহার নাম অন্বর্থ হইয়াছে। টিশি বলিল, 'আজ তোমায় বাঁচাইয়াছি, কাল হয় ত তোমার মৃত্যু ঘটাইব। যতদিন না দেশে ফিরিয়া যাও কৃতজ্ঞতা জানাইও না'। টিশির প্রত্যেক কথায় এমন একটা মোহিনী ছিল যে আমি তাহার মাদকতায় বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম 'টিশি, তোমার মত কোমলহৃদয়া কখন কাহারো মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না।' গম্ভীরা টিশি শুধু একটু হাসিল। রমণী! তুমি চিরদিনই জটিল রহস্যময়ী। টিশি বলিল, 'তর্কে প্রয়োজন নাই, দেশে ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলে বসন্তোৎসবের রাত্রে শিবিরে থাকিও না'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন টিশি'। টিশি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আমি ঐ টুকু বলিয়াই আমার অধিকার-বহির্ভূত ও কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। আর কিছু বলিব না, চল তোমায় বনের বাহিরে রাখিয়া আসি'।

শিবিরে ফিরিয়া সে রাত্রিতে আর ঘুম হইল না। নানা অদ্ভুত জটিল চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। আমার প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। লিয়াংফুভায়াকে অধিকতর রহস্যাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এখন কি কর্ত্তব্য? কাপ্তেন সাহেবকে বলিব? তাহাতে যদি আমার প্রাণদাত্রী টিশির কোন বিপদ হয়? তাহার নাম বাদ দিয়া বলিলেও যদি ঘটনাসূত্রে সেও জড়িত হইয়া পড়ে? মহা বিপদ।

টিশি উৎসব রজনীতে বাহিরে থাকিতে বলিয়াছে। সেই রাত্রে শিবিরে কোন বিপদ সম্ভাবনা। দূর হোক্, যাহা হইবার হইবে, শোকক্লান্ত মনে আর ভাবিতে পারি না।

উৎসবের দিন আসিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। আটটা বাজিল। এখনো কোন সূত্র বাহির করিতে পারিলাম না। সকলে উৎসবরত, আমি এ কি চিন্তায় পড়িলাম! বাহিরেই যাইব, না, কাপ্তেন সাহেবকে খবর দিব? উন্মনস্কভাবে বাহিরে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে একজন চীনা। লিয়াংফু মনে করিয়া উপেক্ষাভরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চীনা বলিল 'বিদেশী, তুমি শিবির ছাড়িয়া যাও নাই'? এমন মিষ্টস্বর ভায়ার চৌদ্দপুরুষে কাহারো ছিল না। এ স্বর টিশির। টিশির পুরুষের পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'টিশি তুমি এখানে'?

টিশি বলিল, 'লিয়াংফু আমার ভাই। সে তোমাদের নীচ গোয়েন্দা নহে; সে জননীজন্মভূমির লাঞ্ছনার প্রতিশোধপরায়ণ, আমরা সকল অত্যাচারীকে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প'।

আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন টিশির মুখের উপর স্থাপন করিলাম, বুঝিলাম সে মুখে রহস্যের আভাসমাত্র নাই। তখন বলিলাম, 'মাত্র তোমরা দু'টিতে এই বিপুলসৈন্য কিরূপে ধ্বংস করিবে?'

টিশি বলিল, 'লিয়াংফু সকল তাঁবুতে ডিনামাইট ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছে, উৎসবমত্ত প্রহরীগণ তাহা লক্ষ্য করে নাই। এখন শুধু একটি দেশালায়ের স্ফুলিঙ্গ'। টিশির হাতে একটা দেশালাই খস খস করিয়া উঠিল।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'তোমরা শুদ্ধ মারা যাবে যে'?

টিশি হাসিয়া বলিল, 'আমাদের মৃত্যুতে কাহারো ক্ষতি নাই, দেশের পরম লাভ। পরের পাদুকালেহী তোমরা, দেশের জন্য মৃত্যুর

অনির্ব্বচনীয় সুখ বুঝিতে পারিবে না। তুমি এখন পলাও, আমার বিলম্ব হইতেছে'।

আমি বলিলাম, 'আমি যদি তোমায় আগুন দিতে না দি'? টিশি অনায়াসে বলিল 'কটিবন্ধের ছোরা নিঃশব্দে তোমার রক্তপান করিবে'।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'পারিবে'? আমি বুঝিয়াছিলাম টিশি আমায় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিধাতা আমার অদৃষ্টে কমিশেরিয়েটের বাবুত্ব লিখিলেও আমার চেহারাখানা কালীঘাট বা আর্টষ্টুডিয়োর ছবির আদর্শে বিদ্রূপের তুলিতে অঙ্কিত করেন নাই।

টিশি বলিল, 'তুমি শিবির ছাড়িয়া যাও'।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'যাইব না, তুমি আগুন দিতে পার দাও'।

টিশি কাঁদিয়া ফেলিল। বড় অভিমানের স্বরে পাতলা লাল ঠোঁট দুখানি উল্টাইয়া উল্টাইয়া বলিল, 'তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, আজ বেশ ঋণশোধ করিলে। লিয়াংফু যখন জানিবে, আমি অগ্নিসংযোগ করিতে পারি নাই, মূঢ়া নারীর দৌর্ব্বল্যহেতু একজন বিদেশীর নিকট অবহেলে পরাজিত হইয়াছি, তখন আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে মৃত্যু শ্লাঘ্য নহে'।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, 'টিশি ক্ষমা কর। এতগুলি লোকের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আমি আমার তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না; সকলের প্রাণরক্ষা করিয়াও তোমাকে বিপন্ন করিতে পারিব না। তোমার সহিত আমিও মরিব। তুমি আগুন দাও'।

টিশি আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল 'বেশ'।

আমাদের পরামর্শ শেষ হইতে না হইতেই একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন সাহেব ও আরো কতকগুলি লোক

আসিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমি একটু থতমত খাইয়া গেলাম; টিশি স্থির গম্ভীর। আমি তাড়াতাড়ি টিশির হাত হইতে দিয়াশালাইটা লইয়া নিঃশব্দে আমার পকেটে ফেলিয়া দিলাম। কাপ্তেন সাহেব বলিলেন, 'বাবু আজ বড় বিপদ; সব তাঁবুতে তাঁবুতে ডিনামাইট ও বারুদ ছড়ান। লিয়াংফু আমাদের মিত্র নহে শত্রু; সে যখন আগুন দিবার উপক্রম করে তখন কয়েকজন সৈনিকের দৃষ্টিতে পড়ে; তাহারা নিরস্ত্র ছিল; তাহাকে ধরিতে গিয়া আহত হইয়াছে; সে পলায়ন করিয়াছে। আমি সকল তাঁবুতে সাবধান করিয়া দিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সকলগুলি বিস্ফূর্জ্জ স্থানান্তরিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন কোন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হয়'। তৎপরে টিশির দিকে ফিরিয়া বলিলেন 'এ কে'?

আমি বলিলাম, 'ইনি আমার একজন আলাপী, ইনি স্ত্রীলোক; আমাদের বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা এই আপনার উদ্দেশেই যাইতেছিলাম।'

টিশি অধর দংশন করিল।

কাপ্তেন সাহেব টিশিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কোন উপকার করিতে পারি?'

টিশি রোষে ক্ষোভে নিরুত্তর। আমি বলিলাম 'ইনি আমাদের সতর্ক করিয়া স্বদেশের বিরাগভাগিণী হইয়াছেন। ইঁহাকে আমাদের আশ্রয় দিতে হইবে।'

সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'সে ত অবশ্য। আর কিছু'। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'ভাগ্যে আমার সহিত ইঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাইত ইনি আমাদের সতর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। আমার জন্য আজ ইনি বিপন্না, ইঁহার ভার আমার প্রতি বক্‌শিশ করিয়া অনুগৃহীত করুন।'

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'কেন? তুমি ইহাঁকে লইয়া কি করিবে? তোমরাত ভিন্নজাতির সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ভয় কর।'

আমি বলিলাম, 'সাহেব, আমার যদি সেই ভয়ই থাকিত, তবে সাধ করিয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করিতে এই চীনামুলুকে আসিতাম না। আমি সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছি। ইহাঁকে দেশে লইয়া গিয়া পুনরায় সপত্নীক হইব ইচ্ছা করি।'

সাহেব খুব হাসিলেন। টিশি লজ্জায় মুখ নত করিল। আনন্দে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল। এবং আমার রুচি দেখিয়া বোধ হয় পাঠকের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানাটক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পথে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎকার।

সেই ধনুর্ভঙ্গ হ'তে বিষম ভৈরব ধ্বনি
স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া হইল নিঃসৃত।

প্রলয় মারুতোদ্ভূত কল্পান্ত-অনল-সম
জামদগ্ন্য-রোষানল হ'ল প্রজ্জ্বলিত।
অমনি সহসা মুনি রামের নিকটে আসি
হৈলা উপস্থিত॥

রবি-বিম্ব-বিনির্গত রক্তচ্ছটা-সম যাঁর
দৃষ্টি রোষদীপ্ত,
ক্ষত্র-কণ্ঠ-চ্যুত রক্তে অদ্যাপি কুঠার যাঁর
রহিয়াছে সিক্ত,

তীব্র ভাবে প্রবাহিত নিঃশ্বাস-পবন যাঁর
ভুবন-উৎপাৎ পুন করিছে সূচিত,
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ত্রিলোক-বিজয়ী সেই
জামদগ্ন্য হেথা দেখ আসি উপনীত॥

শিখা-স্পৃষ্ট-কঙ্কপত্র তূণদ্বয় পৃষ্ঠে আলম্বিত;
স্নিগ্ধ পূত ভস্মচিহ্নে বক্ষদেশ হয় অলঙ্কৃত;
রুরু-হরিণের চর্ম্মে হইয়াছে অঙ্গ আচ্ছাদন;
মৌঞ্জী-মেখলায় বদ্ধ অধোবাস মাঞ্জিষ্ঠা-বরণ;
পাণিতে কার্ম্মুক শোভে, অক্ষমালা, পিপ্পলের দণ্ড
—ওই দেখ আসিছেন জামদগ্ন্য তাপস প্রচণ্ড॥

আজন্ম ব্রহ্মচারী স্থূল-ভুজ-স্তম্ভে শোভে
ধনুর্গুণ-আঘাতের চিহ্ন সারি সারি।
সমস্ত ধরণী-চক্র করিয়াছিলেন জয়
—প্রশংসা-অক্ষয়-লিপি যেন গো তাহারি।
ঘন-অস্ত্র-ব্রণ-কিণ —বক্ষ তাঁর সুকঠিন,
সেই বক্ষে দিয়া শান্ তীক্ষ্ণীকৃত যাঁর বাণ,
ক্ষাত্রনৃপ মৃগরূপী —সে শিকারে যে কৌতুকী
সেই মুনি সুনিশ্চিত এবে হেথা উপস্থিত॥
সপ্তসিন্ধু সহ মহী কার্ত্তবীর্য্য হ'তে যিনি
করিলা অর্জ্জন,
পিতৃবধ-জাত কোপে ঘোর রণে কণ্ঠ তার
করিয়া ছেদন
কুঠার আঘাতে, যার সবেগে সহস্র বাহু
করেন খণ্ডন ;
—যে সহস্র বাহুদিয়া কার্ত্তবীর্য্য বীর
নিরোধ করিয়াছেন রেবা-নদী-নীর॥

(ক্রোধোদ্দীপ্ত পরশুরাম সন্দিগ্ধ হইয়া, এই হরধনু কোন্ ব্যক্তি ভগ্ন করিল ইহা বারত্রয় বলিলেন)

জামদগ্ন্য।—নিজ-পতি-অস্ত্র বলি' পার্ব্বতী অর্চ্চিল যারে
প্রীতির সহিত ;
যাহারে সাদরে নন্দী বাসুকীর নির্মোকে
করে আচ্ছাদিত ;
ত্রিপুর-ইন্ধন যাহা —সেই শঙ্করের ধনু
আমি বিদ্যমানে
সে কিনা করিল ভগ্ন যে জন এ পৃথিবীতে
খ্যাত রাম নামে॥
গর্ভ-হতে বার করি, খণ্ড খণ্ড করিয়াছি
ক্ষত্রিয়-সন্তান।

এক-বিংশতিবার ক্ষত্র-হীন করিয়াছি
এই ধরাধাম ;
সেই সে ক্ষত্রিয়-রক্তে পিতৃ-হ্রদ সংস্থাপিয়া
ক্রোধানল করেছি নির্ব্বাণ।
এ মোর প্রভাব যাহা জানে ভাল সর্ব্বজন
জান নাকি তুমি তাহা রাম ?
যে ভাঙ্গে হরের ধনু থাকিতে ধরণীমাঝে
এ পরশুরাম,
মোর যশচন্দ্রমারে করে যেই আচ্ছাদিত
কোথা সেই রাম ?

শ্রীরাম।—(সানুনয়ে)
আপনার বাহুবল কিম্বা হরধনু-বল
—কিছুমাত্র মোর কাছে
নহেক বিদিত ;
—সুতরাং অপরাধী ; ক্ষম' এই অপরাধ,
বালক-চেষ্টায় কিগো
গুরুজন নহেন হর্ষিত ?
দেখুন ভগবন্ !—
ছুঁইতে না ছুঁইতেই, হরধনু খানি
ভাঙিল আপনা হতে—কি করিব আমি ?
রত্নহার কি কুঠার যাই কণ্ঠে করি না গ্রহণ ;
জল কি কজ্জল নেত্রে ধরুক মোদের নারীগণ ;
যম কি স্বজন-মুখ যাই দেখি, নাহি তাহে ক্ষতি ;
তবু না প্রকটি মোরা বীরদর্প ব্রাহ্মণের প্রতি।
গো ব্রাহ্মণ বধ করা রঘুবংশী জনদের
নহেক বিহিত ;
শোনো গো পরশুরাম ! কুঠারে কাটো এ কণ্ঠ,
—কর যথোচিত॥

(রামের সহিত পরশুরাম যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে)

ক্ষমা কর মুণি !

হে ব্রাহ্মণ ! তব সহ যুদ্ধ করা দূরে থাক্
নাহি কহি সংগ্রামের কথা ;
হীনবল মোরা সবে সর্ব্ব-বলবান-মাঝে
তোমরা যে উচ্চতম মাথা।
রাজন্যের বল—এই এক-গুণ ধনুকই কেবল
আর নবগুণযুক্ত উপবীত ব্রাহ্মণের বল।
স্ত্রীগণের মাঝে যিনি অদ্বিতীয় বীরের জননী
তোমারো জননী সেই দেবী ভগবতী।
তব বাহু-বশীকৃত হলেন কার্ত্তিক যবে,
তাঁর মুখ দেখি হয়ে লজ্জান্বিতা অতি,
তবসম পুত্রলাভে
হল তাঁর স্পৃহা বলবতী ॥

লক্ষণ।—(পরশুরামের প্রতি সক্রোধে)

আজ হতে আর্য্য রাম নহেন অগ্রজ মোর,
তাঁহা হতে হইলাম
স্বতন্ত্র আমি অতঃপর।
রঘুকুল নৃপগণ যাহাই বলুন মোরে
দুষ্ট দ্বিজ দমনার্থ
হব আমি বদ্ধ-পরিকর ॥
দিনকর-কুলে রাম শ্রোত্রিয় ক্ষত্রিয় হ'তে
লভেছে জনম ;
বিশ্বামিত্র ঋষি হ'তে জৃম্ভকাদি দিব্য-অস্ত্র
করেছে গ্রহণ ;
সেই বংশে পাছে লোকে করে মোর অপযশ
তাই গুরু ব্রাহ্মণের প্রতি
অস্ত্র উঠাইতে আমি সঙ্কুচিত অতি ॥

পরশুরাম।—(শ্রীরামের প্রতি)

হর-ধনু ছিল ভগ্ন হর-ভুজ-নিপীড়ন-বলে ;
তুমি ত নিমিত্ত মাত্র —তব বীর্য্য কোথা এই স্থলে ?
এ ধনু "গরুড়-ধ্বজ" —যাতে আমি ক্ষত্রগণে
করিনু সংহার
কর দেখি আকর্ষণ, তাহ'লে বুঝিব, কত
শকতি তোমার ॥

সেধনু উঠায়ে রাম জুড়ি শর তায়
করিলেন আকর্ষণ মুহূর্ত্তে হেলায়।
সাক্ষাৎ কন্দর্প সম হল তাঁরে বোধ,
ভার্গবের হল সদ্য স্বর্গ-গতি-রোধ ॥

তাড়কারি রামচন্দ্র আকর্ষিলে সেই ধনু,
জনক-দুহিতা সেই সীতা
—অপাঙ্গ-আয়ত-আঁখি—
মনোভাব লুকাইয়া দেখেন ঈরিষা-ভরে,
—পুনঃ অন্য কন্যাসনে
পরিণয় হয় নাকি ॥

এই বীর জামদগ্ন্য যুঝি' কার্ত্তবীর্য্য-সনে
সহস্র সংখ্যক বাহু
ছেদিল তাহার।
কিন্তু তব করস্থিত ওই শর নিরখিয়া
ব্রাহ্মণ্যে অনুরক্ত
হইল আবার ॥
ধূর্জ্জটির ধর্ম্মপুত্র সেই সে পরশুরাম
—ক্ষত্রিয়-শোনিত-ক্ষুন্ন যাহার কুঠার
করিল পিচ্ছিল অতি সসাগরা বসুমতী,
ত্রিলোকে অভয় দান যে করিল আর,

তাঁর পদ কে করিতে পারিত গো অধিকার
যদি না এ রামচন্দ্র
সূর্য্য-বংশ অবতংশ
আবির্ভূত না হতেন ধরণী মাঝার ॥

রাম।—(জামদগ্ন্য-চরণে নিপতিত হইয়া)।

জমদগ্নি-হতে জন্ম পিণাকী যাঁহার গুরু,
যিনি হর-ভক্ত,
যাঁর বীর্য্য, যাঁর কর্ম্ম কোনরূপে নাহি হয়
বাক্যে পরিব্যক্ত,
দানে যাঁর সীমা নাহি যিনি সপ্তসিন্ধু-মহী
অকপটে করিলেন দান।
আপনি সে জামদগ্ন্য —আপনার কোন্ কর্ম্ম
অলৌকিক নহে, ভগবান্!
রামের প্রভাব জানি', গাঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া,
রামে তেজ করিয়া বিন্যস্ত,
সেই জমদগ্নি-পুত্র মহাক্ষত্র-বধ-হতে
তদবধি হলেন নিরস্ত ॥

রামে আলিঙ্গিয়া মুনি চলিলেন আপন আশ্রমে;
দশরথো চলিলেন অযোধ্যায় পুত্রদের সনে ॥
ভার্গবের স্বর্গগতি নিজ-বাণে করি' নিবারণ,
পিতৃ-মাতৃ-কুলজাত সাধুজনে করি' নিমন্ত্রণ,
মান্যতম বিপ্র, আর ক্ষত্রগণে পূজি' যথোচিত
পিতা-সাথে রামচন্দ্র নিজপুরী হৈলা উপনীত ॥

হেরিয়া জানকী রামে পীড়িত মদন-বাণে;
খররশ্মিমালি সূর্য্য, এই অবসরে
অস্তাচল-চূড়াদেশে উঠিয়া হরষভরে
নিপতিত হইলেন পশ্চিম সাগরে ॥

দিনমণি তৎক্ষণাৎ অস্তাচলে করিলে গমন
সুপক নারঙ্গ-তুল্য শশাঙ্ক পূরব দিকে
হল সমুদিত।
শয্যাগারে পশে রাম শুনি গুরুজনের বচন;
রামে আনন্দিত করি' জানকীও হইলেন
সেথা উপস্থিত ॥

রাঙায়ে পূরব দিক্, ক্লান্ত বিরহিণীদের
কর ন্যস্ত করায়ে কপোলে,
মুদিত করিয়া পদ্মে, বিকসিত কুমুদেরে,
উল্লসিত চকোর-সকলে,
নভ করি' তমোহীন, নাগলোক শোকান্বিত,
কন্দর্পের দর্প আরো
করিয়া বৰ্দ্ধন,
বিতরিছে নিশানাথ স্বকীয় কিরণ ॥

কুমুদ কলিকা-রাজি করি' প্রস্ফুটিত
যুবজন-হৃদয়েরে করি' প্রফুল্লিত
কামিনীগণের মান করি' উথলিত
চক্রবাক-দম্পতীরে করি আকুলিত,
জ্যোৎস্না-আলোক-রশ্মি করি' অঙ্কুরিত
দশদিক সমুদয় করি' ধবলিত
স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমা এবে হল সমুদিত ॥

শ্রীরাম।—(সখীর প্রতি)।

কুমুদের ক্লান্তি-হর, দিগ্-বালাদিগের দর্পণ,
আদিরস-দীক্ষা-গুরু, —চকোর-সুহৃদ এই
তুষার-কিরণ
হলে সমুদিত নভে, স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্ত ভুবন
কর্পূরে, চন্দনে কিম্বা পারদের রসে লিপ্ত
হল কি এখন?

(অনন্তর পিঞ্জর-স্থিতা সারিকা-কর্তৃক সখীগণের আশীর্বাদ পঠন ।)

চক্রবাক-ক্রীড়ানাশী তম-সৈন্য-সংহারক
চক্র-অস্ত্র সম ;
কান্তা-সম্ভোগের সাক্ষী গগন-সরসীজাত
রাজহংস যেন ;
কুমুদ-বন-বধূর নিদ্রা সদ্য যে করে নিরোধ,
স্মর-বাণ-শান যেই, জন্মদেশ যাহার ক্ষিরোদ,
সেই সে শশাঙ্কদেব গগনে উদয়
হোক্ তাঁর জয় জয়, জয় জয় জয় ॥

(সখীগণ প্রস্থান করিলে)

মদনের পঞ্চবাণ লোক মাঝে আছয়ে প্রসিদ্ধ
কিন্তু সে আমায় যেগো বহুবাণে করিতেছে বিদ্ধ ;
—এই কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে,
নম্রমুখী পুলকিত-তনু জানকীরে
—দ্বারের সমীপ-হতে—তুলি' নিজ অঙ্কে
লইয়া গেলেন রাম শয়ন-পর্য্যঙ্কে ॥
হৃদিস্থিত রামচন্দ্র হৃদয় হইতে পাছে
হন বিনিস্থত,
এই আশঙ্কায় যেন হরিণ-নয়না বালা
—কপট-নিদ্রিত—
রেখেছেন পাণিপদ্ম পয়ধরোপরি ;
তাহে কি অপূর্ব্ব শোভা আহা মরি মরি ॥
মদন-দহন-শুষ্ক চন্দনাক্ত কান্ত ক্লান্ত
কুচান্ত-উপর,
বসায়ে চরণগুলি, ঊর্দ্ধে বিস্তারিয়া পক্ষ,
বসেছে ভ্রমর ।

পুষ্পধনু কন্দর্পের পুঙ্খ-অবশিষ্ট
শর-সম এবে যেন হয় তাহে দৃষ্ট ॥
পৃথুল জঘন-ভার মৃদু মন্দ আন্দোলিয়া,
অলকান্ত "কর্ণপূর" মৃদু মৃদু সঞ্চালিয়া,
ভুজমূল প্রকটিত স্তন-লীলা প্রদর্শিয়া,
জনক-তনয়া সীতা —কপট নিদ্রিত—
নিজপতি রামচন্দ্রে করে প্রমদিত ॥
প্রেম-বশে স্পৃহা মনে, তবু ভীত ক্ষণে ক্ষণে
বালিকা-স্বভাব-বশে ।
লভিয়া সম্ভোগ-সঙ্গ আকুঞ্চিত করে অঙ্গ
নবব্রতী রতি-রসে ।
"আহা আহা !—না, না, না, না"— মুহু মুহু করে মানা
আলাপিয়া কথা ছল-ভরে ।
সুমধুর-স্মিত-হাসি কটাক্ষটি পরকাশি'
মনোভাব প্রকটিত করে ॥
রম্ভা-কর-সঞ্চারিত বীণা-তন্ত্রী সমুত্থিত
মৃদু বাণী সীতা-ওষ্ঠপুটে ;
ফুল্ল-পারিজাত-সম পরিমল নিরুপম
তাহা হতে চারিদিকে ছুটে ;
যে নারী প্রবীণা অতি, শুনি তাহা, রসবতী
নবীনা যুবতী হয়ে উঠে ॥
সীতা-নেত্র-ভঙ্গিমায় মৃগকুল বনে ধায়,
কটি হেরি' সিংহ পশে
গিরি-গহভরে ।
নিতম্বের হেরি' ভাব দূরে যায় দিঙনাগ,
মুখ-পদ্মে হেরি পদ্ম
পশে সরোবরে ।
হয় যদি অপমান, সাধুরা নিশ্চয়
জীবন অথবা বন করেন আশ্রয় ॥

রাম।—অয়ি প্রিয়ে! দেখ দেখ ঃ—

বদন দেখিয়া তব সরসী-কমল সব
ভৃঙ্গরূপ জপমালা জপে মন-দুখে।
বেণী হেরি' নাগপতি হইয়া লজ্জিত অতি
নিজ তনু লুকায়েছে আপন কঞ্চুকে॥
সুবর্ণ হেরি' ও-বর্ণ নিজ দেহ করিয়াছে
অনলে নিঃক্ষেপ।
মণি-বীজ দন্ত হেরি' দাড়িম্ব বিদীর্ণ হ'ল
করিয়া আক্ষেপ॥

সীতা করে মুহুর্মুহু মধুরতর বচন প্রয়োগ,
পূর্ণ-কাম রাম তাঁরে আলিঙ্গিয়া করেন সম্ভোগ।
যেরূপ সম্ভোগ রাম করিলেন আজ সীতাসনে
কেহ কভু করে নাই, করিতে নারিবে ত্রিভুবনে॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বজ্ঞ মিত্র।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হজ্‌সন্ নেপাল হইতে অনেক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া আইসেন। স্রগ্ধরাস্তোত্র ঐ সকল গ্রন্থের অন্যতম। উহাতে তারা দেবীর স্তব লিপিবদ্ধ আছে। এই হেতু ঐ গ্রন্থ তারাস্তোত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭টী শ্লোক বিদ্যমান আছে। প্রথম শ্লোক এইরূপ ঃ—

বালার্কালোকতাম্রপ্রবরসুরশিরশ্চারুচূড়ামণিশ্রী
সম্পৎ সম্পর্করাগানতিচিররচিতালক্তকব্যক্তভক্তী।
ভক্ত্যা পাদৌ তবার্য্যে করপুট মুকুটাটোপভুগ্নোত্তমাঙ্গ
স্তারিণ্যাপচ্ছরণ্যে নবনুতি কুসুমস্রগ্‌ভিরভ্যর্চ্চয়ামি॥ ১॥

উল্লিখিত শ্লোক দেখিয়াই বুঝা যায় স্রগ্ধরাস্তোত্রগ্রন্থ স্রগ্ধরা ছন্দে লিখিত। বস্তুতঃ ছন্দের নাম অনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। স্রগ্ধরা ছন্দ অতি দুরূহ। ইহার প্রত্যেক চরণ একুশ অক্ষরে নিবদ্ধ। ইহার স্বরসংস্থান* এইরূপ ঃ—

— — — — ⌒ — — ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ — — ⌒ —
— ⌒ — —।

স্রগ্ধরাস্তোত্রগ্রন্থের রচয়িতার নাম সর্ব্বজ্ঞ মিত্র। ইহাঁর জন্মভূমি কাশ্মীর। ইনি একজন দানশীল বৌদ্ধ ছিলেন। দানশীলতার জন্য ইহাঁর খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন। একদা তিনি ভিক্ষা করিতে করিতে রাজা বজ্রমুকুটের দেশে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথমধ্যে এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। উক্ত ব্রাহ্মণ উহাঁকে বলেন

---

* গুরুস্বর —। লঘুস্বর ⌒।

—"মহাশয়, আমি কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, কিছু ভিক্ষালাভের প্রত্যাশায় সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের নিকট যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ মিত্র অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"মহাশয়, ইহা কি আপনার কর্ণগোচর হয় নাই যে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে নিজে ভিক্ষার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন?" তাঁহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিরাশ হইলেন; তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ মিত্র উঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সাহায্য করিতেছি।"

এই সময়ে কোন সিদ্ধ পুরুষ রাজা বজ্রমুকুটকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, যদি আপনি শত নরমুণ্ডের উপর বসিয়া স্নান করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে।" তদনুসারে রাজা বজ্রমুকুট প্রত্যেক মনুষ্যকে তুলে স্থাপন করিয়া তৎপরিমাণ সুবর্ণের মূল্যে ৯৯টী মানুষ ক্রয় করেন। রাজা অপর একটী মানুষ ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র উঁহার নিকট যাইয়া আত্মদেহ বিক্রয় করিলেন। তিনি স্বদেহের বিনিময়ে যে সুবর্ণ পাইলেন তাহা পূর্ব্বোক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া উঁহাকে বিদায় দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র ও অপর ৯৯টী বধ্যপুরুষ বধ্যসরোবরে নীত হইলেন। তাঁহাদের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞমিত্র বিষণ্ণ হইলেন। তিনি আত্মরক্ষা ও অপর ৯৯টী পুরুষের জীবনরক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া তান্ত্রিক দেবী আর্য্যতারার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তারার স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি তারার স্তব করিতে করিতে যে ৩৭টী শ্লোক বিরচন করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান স্রগ্ধরা স্তোত্রগ্রন্থের ভিত্তি। সর্ব্বজ্ঞ

মিত্রের স্তবে প্রীত হইয়া তারাদেবী উঁহাকে ও অপর ৯৯ বধ্যপুরুষকে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে দৃষ্ট হইল উক্ত ১০০ জন বধ্যপুরুষ স্ব স্ব গৃহে নীত হইয়াছে এবং বধ্যসরোবরের তীরে উঁহাদের দেহের পরিমাণ সুবর্ণ রাশিকৃত হইয়া রহিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাজা বজ্রমুকুট বিস্মিত হইলেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

উল্লিখিত উপাখ্যানটি নিতান্ত আধুনিক নহে। উহা স্রগ্ধরা স্তোত্রের টীকায় লিপিবদ্ধ আছে। বিক্রমশীল মহাবিহারের রাজগুরু পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রীজিনরক্ষিত* এই টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের আদ্য চরণের প্রারম্ভে "বালার্ক" এই পদ বিদ্যমান থাকায় জিনরক্ষিত-কৃত টীকা বালার্কস্তুতি টীকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

উল্লিখিত স্রগ্ধরা স্তোত্র ও উহার টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ত্যাঞ্জুর নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তন্ত্রাধ্যায়ের "ল" পরিচ্ছেদে এই অনুবাদ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ লামা তারানাথ "ধর্ম্মের উৎপত্তি" নামক ইতিহাসগ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের উপাখ্যান কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাগ্‌সাম্ জোন্‌জাঙ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থেও (পৃঃ ১০২) এই বিকৃত উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* জিনরক্ষিত স্বপরিচয় প্রদান করিয়া টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

নত্বার্য্যতারাং জগদর্থসারাং ধর্ম্মকরা ধ্যেষণয়া সমাসাৎ।
বালার্ক মাত্রাস্য করোমি টীকাং স্ফুটামহং শ্রীজিনরক্ষিতঃ কৃতী। ১॥

টীকার শেষ ভাগে লিখিত আছে :—

বিধায় টীকাং যদলম্ভি শম্ভোগিরীশ সঙ্কাশমসীমশোভং।
শুভং ময়া তারিণি স্রগ্ধরায়াঃ স্তুতে জগত্তেন ভবাস্তু বুদ্ধম্॥

শ্রীসদ্বিক্রমশীল দেব মহাবিহারীয় রাজগুরু পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রীজিনরক্ষিত কৃত বালার্ক স্তুতি টীকা পরিসমাপ্তা॥

সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে তিনি মগধের নালন্দ মহাবিহারে বিদ্যাভ্যাস করেন। কথিত আছে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নালন্দ বিহারের ধ্বংস হয় অতএব সর্ব্বজ্ঞ মিত্র নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গের ২১০ শ্লোকে লিখিত আছে জিনাবতার সর্ব্বজ্ঞ মিত্র কয্য বিহারে অবস্থান করিতেন। লাট (গুজরাট) দেশের রাজা কয্য এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কয্য কাশ্মীরের সম্রাট্ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি ছিলেন। মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ মিত্র অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বজ্ঞমিত্রের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বজ্ঞমিত্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিরূপ প্রবলতা ছিল। এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের আবির্ভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ঘটে ও বৌদ্ধগণ হিন্দু সম্প্রদায়ে মিশিয়া যান।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা*।

(১)

একশত-ষাট্ জন আরোহী† সমেত ভাস্কো-ডা-গামার সেণ্ট গ্যাবরিয়েল, সেণ্ট রাফেল, সেণ্ট মিগেল এবং বেরিও পোত যখন সাগর বক্ষে ভাসিল তখন আরোহীবৃন্দ কম্পিতবক্ষে ঈশ্বরের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, আর তীরে দাঁড়াইয়া পর্ত্তুগালবাসী সকলেই মনে করিল ইহারা দেরেশ অর্থ নষ্ট করিয়া সমুদ্রের শীতল বক্ষে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে; ইহাদিগের মধ্যে হয় ত একজনও আর ফিরিবে না।

আগমন।

তখন য়ুরোপখণ্ডে আবিষ্কারের যুগ চলিতেছিল। ডা-গামার লিসবন নগরী পরিত্যাগের ঠিক পক্ষকাল পূর্ব্বেই জন কেবট (John Cabot) উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন,—ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বেই তিনি অষ্টাদশজন মাত্র সঙ্গী লইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের পথে ভারত আবিষ্কারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন।

রাজা ইমানুয়েল এবং ভাস্কো-ডা-গামা তাঁহাদের এই অভিযানকে

---

* এই প্রবন্ধ প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি :—

(1) History of British India—Sir W. W. Hunter.
(2) Portuguese Discoveries Dependencies—Rev. Alex. J. D. D'orsay.
(3) William Robertson's Works, Vol. XII.
(4) Roteiro the Journal of the Voyage of Vasco Da Gama by Sea to India in the year 1497—Alvarez Velpo.
(5) History of India—Meadows Taylor.

† D'orsay বলেন ১৬০ জন নহে, ২০৮ জন। কিন্তু Alvarez Velpo লিখিত দিনলিপিতে দেখা যায় ১৬০ জন। Sir W. W. Hunter, M. Taylor প্রভৃতিও এই মত পোষণ করেন।

ধর্ম্ম-যুদ্ধাভিযানস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। দেশদেশান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের যে প্রবলেচ্ছা একদিন রাজা হেন্‌রিকে কোষবিমুক্ত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ও ক্রশচিহ্নিত পতাকাস্কন্ধে লইয়া, রাজ্যমধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল—যে উদ্দাম আকাঙ্খা ১৪১৮ হইতে ১৪৯৮ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিতস্রোতের সহিত প্রবল বেগে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল, ইমানুয়েল তাহা সফলীকৃত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন।

রাজ্য বিস্তৃতি, বাণিজ্য এবং ধর্ম্মপ্রচার এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বুকে লইয়া ভাস্কো-ডা-গামা প্রায় একবৎসরকাল সমুদ্র বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে কালিকাটের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যৈষ্ঠের* অপরিচ্ছন্ন আকাশতলে সমুদ্রবক্ষে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ তপনের মন্দরশ্মিপ্রতিভাত ভারতবর্ষের অস্পষ্ট ছায়াময় বেলাভূমি আলেখ্যবৎ নিরীক্ষণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা পরম পুলকে নতজানু হইয়া পড়িলেন।

স্থান এবং কাল উভয়ই ভাস্কো-ডা-গামার অনুকূলে ছিল। তিনি যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন সমগ্র ভারতে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" প্রচারিত হয় নাই—তখনও মোগলরাজদণ্ডের ভয়ে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কম্পিত হইত না;—যে প্রদেশে ভাস্কো-ডা-গামা অবতরণ করিয়াছিলেন সে প্রদেশ তখন পর্ব্বত বেষ্টিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজণ্যবর্গের অধিকারভুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত;—বিশাল ভারতবর্ষের সহিত সে প্রদেশের সম্বন্ধ তখন অতি অল্পই ছিল।

হিন্দুসাম্রাজ্য চেরার অধিপতি চেরামন্ পেরুমল (Cheramán Perumál) যখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষালাভ

* Sunday, May 20, 1498.

করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণপ্রস্থাবলম্বনে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন সেই বিশাল চেরা-রাজ্যের অংশবিশেষ হিন্দু-'বিজয়নগর' সাম্রাজ্যরূপে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিল। চের-রাজ্যের সমুদ্রতারবর্ত্তী অংশ, যাহা মালাবার আখ্যায় ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত, তাহা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের মধ্যে তখন অনেক যুদ্ধ ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কালিকাটের জামোরিণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। জামোরিণ যদিও সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য সামন্তদিগের বন্ধুত্বলাভ করিয়াছিলেন তত্রাচ তিনি সাধারণতঃ 'সমুদ্র-রাজ' নামেই পরিচিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্য সুদূর বিস্তৃত ছিল।*

সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্যান্য রাজাগণ হীনশক্তি ছিলেন। হিন্দু-ভূগোলে ভারতবর্ষ যে ৫৬টা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত ছিল, কেরল বা চেরা সেই ৫৬ দেশের মধ্যে একটা। মালাবার আয়তনে কেরল দেশের একঅষ্টাংশ মাত্র ছিল। তৎকালে কালিকাট এবং কোচিন মালাবারের দুই প্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু আয়তনে ইহারা মালাবারের একষষ্ঠাংশমাত্র ছিল। কেরল সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর যখন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন, শুনিতে পাওয়া যায়, বিজয়নগরের অধীনে তিন শত বন্দর ছিল। সেই সকল বন্দরের কোনটীই কালিকাট অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল না।

ঈশ্বরানুগ্রহে পর্ত্তুগীজগণ প্রথমেই মালাবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালাবারই বাণিজ্যবিস্তার, স্বদেশসেবা,

* It was then the most flourishing place on the Malabar Coast, the Zamorin or Emperor making it the capital of a very extensive state.

Memoirs of Hindustan—J. Rennel, p. 27.

ধর্ম্মপ্রচার, নবসাম্রাজ্য সংস্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত স্থান ছিল ;—হয় ত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উপনীত হইলে ভারতে ভাস্কো-ডা-গামার এবং সেই সঙ্গে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিত না।

মালাবারের সামন্তগণ সংখ্যায় অত্যল্প ছিলেন, শক্তিতেও ক্ষুদ্র ছিলেন ;—তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র য়ুরোপীয় শক্তির সহিতও যুদ্ধে সমকক্ষ ছিলেন না। বৈদেশিক বণিক্‌গণ সর্ব্বদা মালাবার তীরে আশ্রয়লাভ করিত। সামুদ্রিকবাণিজ্য হইতেই মালাবারের সামন্তরাজকোষাগার গুলি পূর্ণ হইত ; তাই তাঁহারা বৈদেশিক বণিকদিগকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না বরং আগ্রহই প্রকাশ করিতেন।

খ্রীষ্টান এবং ইহুদিগণ বহুদিন হইতেই- তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে বাস করিতেছিল, সামন্তরাজগণ স্বদেশে বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্ন ঘটাইতেন না। মালাবারে তখন ধর্ম্মের বন্ধন অনেকাংশে শিথিল ছিল, তখন নানা ধর্ম্ম নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশে ব্যস্ত ছিল। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বণিকগণ তখন মালাবারে অবাধে বাণিজ্য করিবার স্বাধীনতা পাইত। উত্তর ভারতের ন্যায় মালেবারে তখনও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; তখন নেয়ারজাতি অর্দ্ধহিন্দু, নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যজাতি কোন ধর্ম্মই মানিত না, সামন্তগণও তখন অর্দ্ধহিন্দু বলিয়া পরিচিত। কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিয়া তখন মালাবার তীরে একটী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়াছিল—সে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ও হীনশক্তি ছিল; তবে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য ভারতীয় খ্রীষ্টানের ন্যায় * রাজাদিগের মন্ত্রীত্ব করিতেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

* In 1442 an Indian Christian acted as Prime Minister to the king of Vijaynagar.—The Suzerain Hindu State of Southern India.—Sir W. W. Hunter.
Cf. Voyage of Abd-er-Razak.

তাই যখন পর্ত্তুগীজ বণিকসম্প্রদায় মালাবার তীরে বাণিজ্য করিতে চাহিয়াছিল, তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ মহানন্দে তাহাদিগকে সে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। মালাবার উপকূল-স্থিত বন্দরগুলি সেকালে প্রাচ্যপ্রতীচ্য বাণিজ্যের সন্ধিস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। এমন কি মিসরীয় বণিকগণ, যাহারা সিংহলে অথবা মালাক্কা দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আসিত, তাহারাও ভারত মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পারস্য উপসাগর বা লোহিত সাগরের পথে মালাবারে জাহাজ না বাঁধিয়া যাইত না।

যখন সুদূর পর্ত্তুগাল হইতে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ আসিয়া ভারতের উপকূলে মহোল্লাসে পর্ত্তুগালের বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিল, তখন ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর যদিও ধনেজনে, সৌভাগ্যে সম্পদে, গৌরবে সম্ভ্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল তথাপি নবোত্থিত মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইত। মালাবার ও সমুদ্রতীর, বৈদেশিক বণিক্ ও বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তখন বিজয়নগরের ছিল না। বিজয়নগর তখন অন্তরে অন্তরে তেলিকোটার ভীষণ শ্মশানের জন্য প্রস্তত হইতে-ছিল—তখন তাহার অতুলসম্পদ, অমিতবিক্রম বোধ হয় তেলিকোটার অতি তীব্র চিতানলে চিরদগ্ধ হইবার জন্য ধীরে ধীরে মৌনাবলম্বনে মন্ত্রমুগ্ধ অজগরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল।

তখন দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য এক একবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল আবার সেই ভগ্নাবশেষের উপর নূতন নূতন মুসলমান সাম্রাজ্য নবোত্থান লাভ করিতেছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই ভামনি বংশ তখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল আর তাহার স্থানে আদিলশাহি বারিদসাহি প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমানসাম্রাজ্য সন্তর্পণে মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল।

উত্তর ভারতে তখন দুর্দ্ধর্ষ আফগান শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল; দিল্লি তখন পর্য্যন্তও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের বিভীষিকায় ভীত, তখন পর্য্যন্তও তৈমুরলঙ্গের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তৈমুরলঙ্গ-ঘূর্ণাবর্ত্ত দিল্লির যে ধ্বংশ সম্পাদন করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সেই ধ্বংশরাশি দূরে সরাইয়া ফেলিয়া মোগলগৌরব সম্যক্ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় নাই। দিল্লির সুলতানগণ তখন শক্তিহীনহস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন—স্ব স্ব রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার সাহস তখন তাঁহাদিগের ছিল না।

তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো-ডা-গামা যখন মালাবারে উপনীত হইলেন তখন তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করিলেন, জামোরিণ শুল্কের প্রত্যাশায় তাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়া লইলেন—তাঁহার প্রাসাদে ডাগামার অভ্যর্থনার আদেশ হইয়া গেল।

খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় আরবগণ তখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত। সে সময় 'মোফলাস্' বা 'ম্যাপিলাস্' নাম সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ বিবেচিত হইত—মালাবারে আরবদিগের স্বাধীনবাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল। মালাবারতীরবর্ত্তী আরব-সন্তানগণ তখন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একদল ভারতের শান্তিসুখে লিপ্ত হইয়া কোরাণের সহিত যে কৃপাণের একদিন অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিল; আর একদল কৃপাণ ও কোরাণে মহম্মদের শিষ্যত্বের পরিচয় দিতে ব্যস্ত ছিল। এই দ্বিতীয় সম্প্রদায় বানিজ্য অপেক্ষা ধর্ম্মের নামেই অধিক উল্লসিত হইয়া উঠিত—ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ পাইলে ক্ষিপ্তের মত হইত—কাফেরদিগকে দেখিতে পারিত না। আরবগণ দেখিল মালাবারে,—কালিকাটবন্দরে এক দল নবীন বণিকের আগমন হইয়াছে; তাহাদের বেশভূষা, আহার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি সবই নূতন। আরব

সন্তানগণ শুনিল কোথায় কোন সাগরপারে পর্ত্তুগাল, ইহারা সেই স্থান হইতে আসিয়াছে। তাহারা এই আগন্তুকদিগকে "ফিরিঙ্গি" আখ্যায় আখ্যাত করিল।

এই ফিরিঙ্গিবণিকসম্প্রদায়ের আগমন ইসলামসেবকদিগের ভাল লাগিল না। তাহারা বেশ বুঝিল যে, কালে লোহিতসাগরের পথে আরবের সহিত ভারতের বাণিজ্য "ফিরিঙ্গি" কর্ত্তৃকই লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিসে 'ফরিঙ্গি বণিক বিধ্বস্ত হইবে, বিতাড়িত হইবে, জামোরিণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে, তাহারা নিয়ত সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে মানসসিদ্ধির জন্য কি প্রকারে জামোরিণের মন্ত্রণাসভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সে কাহিনী পরে বর্ণিত হইবে।

এদিকে সেণ্ট গ্যাবরিয়েলের ডেকের উপর বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা তখন কত আকাশকুসুম দেখিতে ছিলেন, তিনি এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কি প্রকারেই বা বুঝিবেন?

(২)

ক্লান্ত, তরঙ্গবিধ্বস্ত, ঝটিকাতাড়িত, পর্ত্তুগীজগণ দেখিল তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে এক নূতন রাজ্যের মায়াদ্বার সহসা যেন মন্ত্রবলে উন্মোচিত হইয়াছে; এদেশে শীত নাই, কুয়াসা নাই, দারিদ্র্য নাই—এখানে সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য। তাহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিল মালাবারের নাগরিকগণ কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদিগের কেশ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ,—কেহ কেহ বা মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা জটাধারী। কেবল খ্রীষ্টত্বের * চিহ্নস্বরূপ কাহারও কাহারও মস্তকে একগুচ্ছ কৃষ্ণকেশ বাতাসে কম্পিত হইতেছে।

তালি প্যাগোডা।

* Alverez Velpo তাঁহারা দিনলিপিতে হিন্দুদগকে খৃষ্টান আখ্যায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রঃ লেঃ।

সেই দীর্ঘ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। "নেটিভ" দিগের কর্ণে বহু ছিদ্র, সেই সকল ছিদ্রে স্বর্ণ অলঙ্কার দুলিতেছে; তাহাদিগের কটি হইতে উর্দ্ধদেশ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কিন্তু যে বসনে কটিদেশ আবৃত তাহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। ধনবানদিগের এইরূপ পরিচ্ছদ—সাধারণলোকে যে যেমন ইচ্ছা সে তেমন বেশ পরিধান করে। রমণীগণ প্রায়ই কুৎসিতা, খর্ব্বাকৃতি এবং ক্ষীণাঙ্গী। তাহাদিগের কণ্ঠে ভারি ভারি স্বর্ণাভরণ প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে ক্রীড়া করিতেছে, বাহুমূলে বাউটী শোভিতেছে, পদাঙ্গুলে মূল্যবান প্রস্তরসন্নিবিষ্ট অঙ্গুরীকগুলি রৌদ্র কিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। দেখিতে কুরূপা হউক কিন্তু রমণীগণ কোমলস্বভাবা, ভদ্র, সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞ এবং অতিশয় লোভপরবশ।

ভাস্কো-ডা-গামা মালবারতীরে উপনীত হইয়াই অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন জামোরিণ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন। দুই জন ফিরিঙ্গি দূত সংবাদ লইয়া জামোরিণের নিকট উপস্থিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া বলিল 'পর্ত্তুগালের অধিপতি পত্রসহ তাঁহার একজন নৌ-সেনাপতিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজের আদেশমাত্রেই তিনি পত্র লইয়া রাজদরবারে আসিতে পারেন।' জামোরিণ তখন অধিক শুল্কলাভের আশায় উল্লসিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বহুমূল্য বস্ত্র উপহার দিয়া দূতদ্বয়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন এবং পর্ত্তুগাল নৌ-সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ মানসে স্বয়ং কালিকাটে যাত্রা করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ভাস্কো-ডা-গামা তের জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে জামোরিণের রাজসভায় গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পর্ত্তুগীজ ভেরীবাদক ভেরীনিনাদ করিয়া উঠিল—ধীর বাতাসে পর্ত্তুগালের বিজয়-নিশান ভারতের বক্ষের উপর উড়িতে লাগিল।

জামোরিণ একজন "ভালি" (রাজ্যের প্রধান অমাত্য) প্রেরণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ আপন আপন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পোত হইতে পতাকা-শোভী তরণী সহযোগে বেলাভূমিতে অবতরণ করিলেন। অবতরণ-ঘাটেই দুইশত যোদ্ধা লইয়া ভালি মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যোদ্ধৃপুরুষগণ সকলেই সশস্ত্র ছিল—কাহারও হস্তে কৃপাণ, কাহারও হস্তে শাণিত বর্ষাফলক, কাহারও হস্তে তীক্ষ্ণ কুঠার। সকলেই ডা-গামাকে বহু সম্মানের সহিত অভিবাদন করিল। রাজার আদেশে একখানি শিবিকা প্রস্তুত ছিল, * তিনি সেই শিবিকায় আরোহণ করিলেন, সঙ্গীগণ সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

কপ্পাকত্তার [Capua] ভিতর দিয়া কালিকাটের পথ। কপ্পাকত্তার একজন ধনাঢ্যের গৃহে সকলের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভোজনের জন্য তথায় অন্ন, ঘৃত এবং সুসিদ্ধ মৎস্য প্রস্তুত ছিল। কপ্পাকত্তা হইতে কালিকাটে যাইতে হইলে কিয়দ্দূর নৌকায় যাইতে হয়। তরণী প্রস্তুত ছিল,—ফিরিঙ্গিগণ আহার সমাপন করিয়া পুনরায় নৌকায় উঠিলেন।

তখন মালাবারের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত একটা ভয়ানক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই শুনিল সমুদ্রপার হইতে একদল অদ্ভুত জীব আসিয়াছে,—উহারা তাহাদিগেরই মত হাসে, তাহাদিগেরই মত কথা কহে, তাহাদিগেরই মত চলিয়া বেড়ায় কিন্তু উহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অভিনব, ভাষা অভিনব ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—উহারা ফিরিঙ্গি! স্বয়ং "ভালি" আসিয়া ফিরিঙ্গিকে মহা সমাদরে রাজসভায় লইয়া যাইতেছেন, সিপাহীগণ সশস্ত্র পাহারা দিতেছে! এই সকল শুনিয়া জনসাধারণের কৌতুহল এতই বর্দ্ধিত

* সে কালে আপন গৃহে শিবিকা রাখিবার জন্য রাজকর দিবার প্রথা ছিল। সুতরাং শিবিকা, সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পরিগণিত হইত বলিয়া অনুমান হয়।

হইয়াছিল যে তাহারা দলে দলে কেহবা ভেলায় চড়িয়া জলপথে, কেহবা পদব্রজে, কেহবা সাজসজ্জাবিহীন অশ্বপৃষ্ঠে তীরভূমি দিয়া শতে শতে, সহস্রে সহস্রে ছুটিয়া চলিতে লাগিল; এমন কি রমণীগণও ছোট ছোট শিশুসন্তানগুলি বক্ষে লইয়া "ফিরিঙ্গি" দর্শন মানসে সেই খালের তীর দিয়া ছুটিতেছিল;—সকলেরই মুখে এক কথা "ফিরিঙ্গি"! "ফিরিঙ্গি"!

তরণী হইতে অবরোহণ করিয়া ফিরিঙ্গিগণ সর্ব্বপ্রথমেই একটী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্দিরটী অতি বৃহৎ এবং খোদিতপ্রস্তরময়। মন্দিরের ছাদ ইষ্টক বিনির্ম্মিত। সিংহদ্বারের পার্শ্বে, অর্ণবযানের প্রধান গুণবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ একটী পিতলস্তম্ভ, সেই স্তম্ভের উপর একটী বিহগমূর্ত্তি স্থাপিত—দেখিলে মনে হয় যেন একটী মুরগী বসাইয়া রাখিয়াছে।* প্রবেশদ্বারের অপর পার্শ্বে আর একটী স্তম্ভ বিদ্যমান। ঠিক মধ্যভাগ সরু চুড়াবিশিষ্ট আর একটী মন্দির; ইহাও খোদিত-প্রস্তরে গঠিত। এই মন্দিরদ্বার এত সঙ্কীর্ণ যে কোনপ্রকারে একজন মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে। সম্মুখেই প্রস্তর বিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী পিত্তলদ্বারাভিমুখে প্রসারিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

সিংহদ্বারের প্রাচীরগাত্রে সাতটী ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই স্থানে বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা এবং তাঁহার সঙ্গীগণ প্রথম উপাসনা করিলেন। ফিরিঙ্গি বণিকগণ তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, যে দেবীমূর্ত্তি সমক্ষে তাঁহারা নতজানু হইয়া উপাসনা করিলেন সে মূর্ত্তি মেরির নহে তাহা গৌরীর।

---

* অনেক হিন্দু-মন্দিরের পুরোভাগে স্তম্ভের উপর গরুড়ের মূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকে, সেই জন্য সেই স্তম্ভের নাম গরুড়স্তম্ভ। গ্রঃ লেঃ।

ফিরিঙ্গিগণ কেহই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইলেন না, কারণ পূজক "কোয়াফি" (ব্রাহ্মণ) ভিন্ন কাহারও সে অধিকার ছিল না। এই সকল "কোয়াফি" দিগকে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন ইহাঁরাই এ চর্চ্চের 'বিশপ' বা 'ডিকন' বা 'প্রিষ্ট' হইবেন। তাঁহাদিগের এ ধারণা হইবার কারণও বিদ্যমান ছিল। পর্ত্তুগীজ 'ডিকন' দিগের "Stobs"এর মত কোয়াফিদিগের বাম-স্কন্ধের উর্দ্ধ এবং দক্ষিণ বাহুর নিম্নভাগ দিয়া এক গাছি সূত্র (ব্রাহ্মণের পৈতা) ঝুলিতেছিল।

কোয়াফিগণ তাঁহাদের নিয়মানুসারে ফিরিঙ্গিদিগের গাত্রে গঙ্গাবারি প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে চন্দন উপহার দিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এই অভিনব খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের রাজ্যে প্রত্যেক খ্রীষ্টানই কপালে, বক্ষে, কণ্ঠপার্শ্বে এবং বাহুনিম্নে এই চন্দন লেপন করিয়াছেন।

'চর্চ্চ' হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন মন্দিরগাত্রে অনেক সাধুদিগের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, কিন্তু এ সকল মূর্ত্তি বেলেম গির্জ্জার 'এপসল' দিগের মূর্ত্তির মত নহে। ইহাদিগের মস্তকে মুকুট, বাহু চারিটী, কাহারও কাহারও বা দশনগুলি এতই বৃহৎ যে বদন হইতে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। মন্দির গাত্রে এই সকল এবং অন্যান্য কুদৃশ্য মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; সেণ্টরাফেল পোতের কাপ্তেন ডোয়াম ডি সা মন্দিরাভ্যন্তরে উপাসনাকালীন ভাস্কো-ডা-গামাকে বলিয়াছিলেন "If these are devils, I adore the Living God." যাহা হউক ফিরিঙ্গিবণিকগণ মনে করিলেন এ নূতন দেশের ধর্ম্মমন্দিরও নূতন, সুতরাং সে বিষয় অধিক চিন্তা না করিয়া তাঁহারা হিন্দুর 'তালি প্যাগোডায়' নিশ্চিন্ত মনে মেরির আরাধনা করিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৩)

তালি প্যাগোডা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফিরিঙ্গিগণ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন পথিপার্শ্বে জনতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে পথ চলা দুঃসাধ্য। প্রধান অমাত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাদিষ্ট হইয়া মহা সমারোহে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জয়ঢাক, ভেরী, বংশী, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি লইয়া আরও অনেকে আসিয়াছিল। বন্দুকহস্তে সিপাহীগণ অগ্রে অগ্রে বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে চলিতে লাগিল, গুরু গম্ভীরে জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল, মালাবার তীর ও কালিকাট কম্পিত করিয়া ভেরী নিনাদিত হইল, বংশী, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়া "ফিরিঙ্গিবণিক"দিগের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিল—তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন স্পেন নরপতির অদৃষ্টে স্পেনে বসিয়াও এত সম্মানলাভ ঘটে না।

রাজদর্শন।

ক্রমেই জনস্রোত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—রাজপথে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না; শেষে সকলে গৃহের বাতায়নমুখে, ছাদের উপরে, এমন কি, কেহ কেহ বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইল। প্রায় দুই সহস্র সিপাহী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই কল-কোলাহলপূর্ণ জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গেল।

ফিরিঙ্গিবণিকগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে জামোরিণের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন—প্রবেশমুখে রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া লইয়া চলিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বশেষ দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ খর্ব্বকায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামাকে আলিঙ্গন করিলেন। ফিরিঙ্গিরা মনে করিলেন, ইনিই এই খ্রীষ্টানরাজ্যের 'বিশপ',—এ দেশের রাজপুরোহিত। এইরূপে ফিরিঙ্গিবণিকগণ জামোরিণের প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজসভা-

গৃহে যাহা দেখিলেন তাহাতে চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা মনে করিলেন এ দেশে এত সম্পদ, এত অর্থ, এত সমৃদ্ধি!

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সঙ্গীসহ ভাস্কো-ডা-গামা দেখিতে লাগিলেন কক্ষমধ্যে একখানি সবুজবর্ণের মখমল বিস্তৃত, সেই মখমলের উপর একখানি মূল্যবান গালিচা শোভা পাইতেছে আর তাহার উপর অতি সুন্দর সূক্ষ্ম তুষারধবল একখানি শ্বেত আস্তরণ চারিদিকে অনেকগুলি উপাধান। সেই সুন্দর শয্যার উপর একটী কারু-কার্য্যময় মসনদে সমগ্র মালাবারের অধিপতি কালিকাটের জামোরিণ পাত্রমিত্রসহ উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একটী বৃহৎ স্বর্ণপাত্র—তাম্বুল চর্ব্বনান্তে তিনি সেই স্বর্ণপাত্রে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতেছিলেন। জামোরিণের দক্ষিণভাগে আর একটা গোলাকার স্বর্ণপাত্রে বহুতর তাম্বুল এবং মুর দেশীয় কতকগুলি গোপ্যছুরিকা সজ্জিত ছিল। সেই স্বর্ণ-পাত্রটীর ব্যাস এত বড় যে উভয়বাহু প্রসারণ করিলে অতি কষ্টে উহা ধরিতে পারা যায়। তাম্বুলপাত্রের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া একজন অমাত্য মধ্যে মধ্যে জামোরিণের হস্তে তাম্বুল তুলিয়া দিতে ছিল। মসনদের উর্দ্ধদেশে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ তাঁহার অতুল সম্পদের অন্যতম পরিচয়স্বরূপ সভাগৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল।

যখন ভাস্কো-ডা-গামা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন জামোরিণ দেশপ্রথা অবলম্বনে যুগ্মপাণি উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন * এবং দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে সেই চন্দ্রাতপ নিম্নে আহ্বান করিলেন। তাম্বুলপাত্রবাহী এবং নিকট আত্মীয় ভিন্ন আর কেহই রাজার অত সন্নিকটে অগ্রসর হইতে

* By clasping his hands and raising them up towards heaven as the Christians do to God, and whilst raising them, opening and clenching his fists repeatedly.—The Journal.

পারিত না, তাই ভাস্কো-ডা-গামাও অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না। পুনরায় জামোরিণ সকলকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী একখানি শিলাসনে উপবেশন করিলেন।

যাঁহারা অপার সাগরপথে কোন্ অজানিত অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে নির্ভয়ে সহস্র সহস্র যোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসনতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসীম বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া জামোরিণ মোহিত হইয়াছিলেন—প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদেই ফিরিঙ্গিবণিকদিগের যথোচিত অভ্যর্থনার আদেশ দিয়াছিলেন। অবিলম্বে হস্তমুখপ্রক্ষালনের জন্য সুমিষ্ট শীতল বারি ও আহারের জন্য ফল-মূল আসিয়া উপস্থিত হইল। সভাগৃহে বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সহচরবর্গ যতক্ষণ হৃষ্টচিত্তে আহারে ব্যাপৃত ছিলেন, জামোরিণ আনন্দের সহিত তাহা দেখিতেছিলেন এবং পার্শ্বচরদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি গামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহারা সকলেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি; আপনার কি আবশ্যক তাহা ইঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলে ইঁহারাই সে সমুদয় আবশ্যকদ্রব্য আনিয়া দিবেন।"

ভাস্কো। "আমি পর্ত্তুগালাধিপতির দূত মাত্র। আমি মহারাজের জন্য দুইখানি পত্র লইয়া আসিয়াছি, উহা অন্যের নিকট দিবার আদেশ নাই। আমার প্রভু এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।"

জামো। "ভাল, চলুন আমরা কক্ষান্তরে যাই।"

পরমুহূর্ত্তেই জামোরিণ ও ডা-গামা অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় সুবর্ণখচিত মস্‌নদে উপবেশন করিয়া জামোরিণ পুনরায় ডা-গামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমার রাজ্যে আপনার কি প্রয়োজনে আগমন?"

ভাস্কো। "আমি পর্ত্তুগাল অধিপতির দূত। পর্ত্তুগাল অধিপতি সেই প্রদেশের অনেক রাজন্যবর্গ হইতে সমধিক সমৃদ্ধিশালী। পর্ত্তুগালের নরপতি জানেন যে ভারতবর্ষে তাঁহারই তুল্য, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নরপতিই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাই ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য তিনি প্রতিবৎসরই পর্ত্তুগাল হইতে জাহাজ প্রেরণ করিতেছিলেন। আমরাও সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছি। আমাদিগের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহা পাইবার প্রত্যাশায় আমরা ভারতবর্ষে আসি নাই—আসিবার প্রয়োজনও নাই। এতদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য অর্ণবযানের কাপ্তেনগণ দুই এক বৎসর ভারতবর্ষের অন্বেষণে সমুদ্রমধ্যে ঘুরিয়াই আহার্য্য নিঃশেষ হইলে ভগ্নমনে পর্ত্তুগালে ফিরিয়া যাইতেন। পর্ত্তুগালের বর্ত্তমান অধিপতি ইমানুয়েল এবার তিনখানি নবীন অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইয়া আমাকেই ভারতবর্ষানুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে না আসিয়া আমি যদি অর্দ্ধপথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম তাহা হইলে রাজা ইমানুয়েল আমাকে বধ করিতেন। তাঁহার সেইরূপই আদেশ ছিল। পর্ত্তুগাল অধিপতি, মহারাজের হস্তে প্রদান করিবার জন্য দুইখানি পত্র দিয়াছেন, আর মুখেও বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি ভারতের খ্রীষ্টান অধিপতির বন্ধু ও ভ্রাতা। পত্র দুইখানি আমি আগামী কল্য সঙ্গে করিয়া আনিব।"

জামো। "স্বাগত! আমার রাজ্যে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। পর্ত্তুগাল অধিপতিকে আমার ভ্রাতা এবং বন্ধুস্বরূপ পাইলে আমিও পরম পুলকিত হইব। আপনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন আমিও সেই সঙ্গে আমার একজন দূত প্রেরণ করিব।"

এইরূপ আরও অনেক কথাবার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িলে ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার সঙ্গীদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের বারান্দায় পিত্তল-নির্ম্মিত একটী বৃহৎ ঝাড়ে কতকগুলি দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপাবলিশোভিত বিস্তৃত বারান্দায় ডা-গামার সহচরগণ অধীরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। ফিরিঙ্গিবণিকগণ রাজনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন;—তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা সেই বৃষ্টির মধ্যে শত শত কৌতুহলী দর্শকমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। জামোরিণ প্রেরিত একজন সম্ভ্রান্ত মুর পথপ্রদর্শকস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। অনেক দূর পদব্রজে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সেই ধনাঢ্য মুরের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বাটীর ভিতর একটী উন্মুক্ত স্থানে একটী মঞ্চ রহিয়াছে, সেই মঞ্চের উপর ইষ্টক নির্ম্মিত ছাদ। কতকগুলি লেপ মঞ্চের উপর রক্ষিত হইয়াছে, দুইটী বৃহৎ ঝাড়ে তৈলের দীপ জ্বলিতেছে। দীপগুলি লৌহনির্ম্মিত—প্রত্যেকটীতে চারিটী করিয়া সলিতা, চারিটী অগ্নিমুখসদৃশ জ্বলিতেছে; সেই বৃহৎ প্রদীপ হইতে অতি তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে।

তথায় অল্পকাল অপেক্ষা করিতে না করিতেই ভাস্কো-ডা-গামার জন্য একটী অশ্ব আনীত হইল। অশ্বের কোন সাজসজ্জা ছিল না দেখিয়া ডা-গামা পদব্রজেই আপন গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইলেন—অশ্বারোহণ করিলেন না। তাঁহারা বিশ্রামাগারে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ হইতে তাঁহাদিগের কয়েকজন সঙ্গী ভাস্কো-ডা-গামার শয্যা ও কতক কতক নিতান্ত আবশ্যক জিনিসপত্র আনিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ফিরিঙ্গিগণ মহানন্দে তাঁহাদিগের মালাবারের প্রথম রজনী অতিবাহিত করিলেন। তখন কে জানিত যে এই বণিকসম্প্রদায় একদিন মালাবারে একচ্ছত্র বণিক বলিয়া জগতে সুপরিচিত হইবেন—একদিন পর্ত্তুগালের কাব্যে, ইতিহাসে জয়যুক্ত হইয়া তাঁহারা সমগ্র জ্ঞানীমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইবেন? তখন কে মনে করিয়াছিল যে একদিন ফিরিঙ্গির দুর্গে, দুর্গপ্রাকারে মালাবারতীর কণ্টকিত হইয়া উঠিবে—ইহাঁদিগের বাণিজ্যে ও বাণিজ্যতরণীসমূহে ভারতবর্ষের সহিত অন্য জাতির বাণিজ্যসম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িবে? তখন কে জানিত যে, যে মালাবারের অধিবাসীগণ আজ ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিল, রাজার অধিক সম্মান প্রদর্শণ করিল—যে জামোরিণ নূতন অতিথিদিগকে দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে আপন ভবনে, রাজসভাগৃহে তাঁহাদিগের অভিনন্দন করিলেন, অল্পকালমধ্যে তাঁহারাই মালাবার সিংহাসনের পরম শত্রুরূপে বজ্রনিনাদী-কামান হইতে অনলবর্ষণে মালাবার ধ্বংশ করিতে প্রয়াস পাইবেন—অবশেষে মালাবারে জাতীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া, পূর্ব্ব আতিথ্য স্মরণ পূর্ব্বক অধিবাসীদিগের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া সগর্ব্বে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবেন এবং পণ্যপূর্ণ শত শত বাণিজ্যতরণী পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন? কিন্তু কালে এইরূপই ঘটিয়াছিল।

(৪)

আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উদ্বেগে উদ্বেলিতহৃদয় ভাস্কো-ডা-গামা যখন ভারতবর্ষ-আবিষ্কারের গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাত সমুদ্রজলে অন্ধকার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, নরপতি ইমানুয়েলের উৎসাহবাক্যে হৃদয় মধ্যে বল সঞ্চয় করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নানা দেশের রাজন্যবর্গকে উপঢৌকন দিবার জন্য নানা সামগ্রীও সঙ্গে লইয়াছিলেন।

উপঢৌকন।

কোরিয়া (Correia) বলেন তখন ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে অনে বহুমূল্য সামগ্রী ছিল—বহুমূল্য পণ্যসম্ভারে সজ্জিত হইয়া ডা-গামা তরণী সমুদ্রে ভাসিয়াছিল। কোরিয়ার বর্ণনার সহিত আল্‌ভারেজে দিন-লিপির মিল দেখা যায় না। পর্ত্তুগাল পরিত্যাগের পর হইতে আল্‌ভারেজ দিন-লিপি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেই দিন-লিপি "রটেরো" (Roteiro) নামে জগতে পরিচিত। দিন-লিপি পাঠে জানা যায় ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী ছিল—দড়িদড়া, শৃঙ্খল, লঙ্গর, গুণবৃক্ষ প্রভৃতিও আবশ্যকের অতিরিক্ত ছিল কিন্তু তরণী সজ্জিত করিতে ইমানুয়েল অধিক অর্থব্যয় করেন নাই। সেকালে পর্ত্তুগালে একখানি সাধারণ অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে সকলপ্রকারে ব্যয় ৬১,১৪০ মুদ্রা লাগিত। *

পর্ত্তুগাল হইতে একবার ভারতবর্ষে আগমন ও প্রত্যাগমনের উপযোগী সমুদ্রপোতের ব্যয়ই যখন এত লাগিত, তখন যে অর্ণবযান সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল তাহার আয়োজনে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং বহুমূল্য উপঢৌকনে তরণী সজ্জিত করিবার জন্য ইমানুয়েল যে তখন অধিক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আর কাহার জন্যই বা তখন উপঢৌকনরাশি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন? যখন ভাস্কো-ডা-গামা পর্ত্তুগাল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন কি কেহ মনে করিয়াছিলেন যে কোন

* The ordinary cost of construction and equipment of a single vessel intended for India, with the pay of the Captain and crew *for one voyage*, was calculated at £4076.—Sir W. W. Hunter's History of British India, Vol. I.

ন তাঁহার সেণ্টরাফেল বা সেণ্টগ্যাবরিয়েল ভারতবর্ষের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইবে?

যাহা না হইলে চলিবেনা ডা-গামার সঙ্গে তখন তাহাই ছিল। য়েকটী অনলবর্ষী কামান, উপযুক্ত পরিমাণ গোলা বারুদ এবং আরবি ভাষাভিদ্ নাবিক, ইহাই ডা-গামা সঙ্গে লইয়াছিলেন। আর ছিল, অষ্টাদশজন হতভাগ্য রাজবন্দী তাহারা "ডিগ্রেডাড়ো" (Degradadors) নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকৃত গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত ইহাদিগের প্রত্যেকের উপরেই প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল। কোন নূতন স্থানে জাহাজ লাগিলেই প্রথমে ইহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইত। স্থানের অবস্থা, দেশের অবস্থা, অধিবাসীদিগের ব্যবহার ও চরিত্র প্রভৃতি নানা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারাই প্রথমে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে তীরে আসিত। অনেক সময় নূতন স্থানের নূতন অধিবাসীদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়া অনেককে প্রাণ বিসর্জ্জণ দিতে হইত। যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইত, পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশে বিপদের মধ্যে থাকিয়া সেই হতভাগ্য যখন নূতন দেশের ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দিত—তখন রাজার অনুগ্রহে তাহার মুক্তিলাভ ঘটিত। ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গেও তাই "ডিগ্রেডাডো" ছিল—তিনি আফ্রিকার উপকূলে অনেককে পরিত্যাগও করিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই প্রকারে সজ্জিত হইয়া ডা-গামা ভারত আবিষ্কারে যাত্রা করিয়াছিলেন; কোরিয়া বর্ণিত বহুমূল্য উপঢৌকনাদির কথা দিন-লিপিতে দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের পথে আফ্রিকার যে সকল স্থানে ডা-গামা জাহাজ বাঁধাইয়াছিলেন সেই সকল স্থানের অধিবাসীগণ দলে দলে সেই

অভিনবদৃশ্য দেখিবার জন্য বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সাগরতীরে আসি দাঁড়াইত। ডা-গামা তাহাদিগকে লোহিত বর্ণের টুপি, ছোট ছো ঘণ্টা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিতেন ;—তাহারা সেই সকল সামগ্রী বহুমূল্যজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিরদরদবিনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দিয়া প্রফুল্লচিত্তে করতালি দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং আ সকলকে ডাকিয়া দেখাইত 'দেখ আমি কি আনিয়াছি'! কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ কাচখণ্ডের বিনিময়ে ভাস্কো-ডা-গামা প্রচুর পরিমাণে কুক্কুট, মেষ, কপোত প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে যখন তিনি প্রথমে মোম্বাসায় পৌঁছেন তখন মোম্বাসার রাজার নিকটে একটী প্রবাল-শাঁখা পাঠাইয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার বহুমূল্য উপঢৌকন!

কালিকাটে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মেলিণ্ডিতে আসিয়া ডা-গামার সহিত তিনখানি ভারতীয় বাণিজ্য পোতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইস্থান হইতে একজন পথপ্রদর্শক লইবার মানসে তিনি মেলিণ্ডির মুসলমান অধিপতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন। তৎকালে মেলিণ্ডি একটী সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। মেলিণ্ডির মুসলমান অধিপতি নীলবর্ণের সাটিনের রাজবেশ পরিধান করিয়া, বহুমূল্য শিরস্ত্রাণে সুশোভিত হইয়া ডা-গামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে তখন গদি (cushion) দেওয়া দুইখানি পিত্তল-সিংহাসন এবং রক্তবর্ণের সাটিনের চন্দ্রাতপ আসিয়াছিল। তাঁহার শরীর-রক্ষক-ভৃত্যের কটিদেশে রৌপ্যকোষমধ্যে তীক্ষ্ণধার তরবারি ঝুলিতেছিল। ধনবান বন্ধুর সম্মানরক্ষার্থ ডা-গামা অবশ্য তাঁহাকে মূল্যবান্ উপহারই প্রদান করিয়াছিলেন। আল্‌ভারেজ লিখিয়া গিয়াছেন মেলিণ্ডির অধিপতির জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রেরিত হইয়াছিল :—একটী বৃহৎ অঙ্গরাখা, দুইটী প্রবাল-শাঁখা

একটী বিলাতী টুপি, দুইখণ্ড চারখানার-বস্ত্র (lambis), কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা এবং তিনটী জলপাত্র।

জামোরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরদিন প্রভাতে ভাস্কো-ডা-গামা বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলিই উপঢৌকন দিবার জন্য বাহির করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার সঙ্গে কোরিয়া-বর্ণিত মূল্যবান দ্রব্যাদিই থাকিত তাহা হইলে জামোরিণের জন্য বারখানি চারখানার-বস্ত্র, রক্তবর্ণের চারিটী হুড (hood), ছয়টী বিলাতী টুপি, চারিটী প্রবাল-শাঁখা, ছয়টী পাত্র এবং মধুপূর্ণ দুইটী ও তৈল পূর্ণ দুইটী সর্ব্বসমেত চারিটী ধাতু নির্ম্মিত কৌটা উপঢৌকন-স্বরূপ বাহির করিতেন না।* ভাস্কো-ডা-গামা হয়ত মনে করিয়াছিলেন এতগুলি দ্রব্য একত্রে দেখিলে জামোরিণ অবশ্য তৃপ্তই হইবেন।

রাজ্যের নিয়মানুসারে দুই জন প্রধান অমাত্যের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া কিছুই জামোরিণের নিকট প্রেরিত হইত না। তাঁহারা আসিয়া ভাস্কো-ডা-গামার রাজোপহার দর্শন মাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এ সকল সামগ্রীর কার্য্য নহে—এ সমুদয় রাজার নিকট পাঠাইতে পারা যায় না। মক্কার অতি দীনদরিদ্র আসিয়াও ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই জামোরিণ সমীপে উপঢৌকন পাঠাইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবর্ণ

---

* M. Taylor যে তালিকা দিয়াছেন তাহা একটু স্বতন্ত্র। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল :—

Four pieces of scarlet cloth, six hats, four branches of coral, six almasars, a parcel of brass, a box of sugar, two barrels of oil and one of honey, were selected from the stock, and, as may be supposed, these homely articles were laughed at. History of British India, p. 217.

পাঠাইবার প্রয়োজন। এই দীন উপহার গ্রহণ করিতে জামোরিণ নিতান্ত অক্ষম হইবেন। এ সকল দ্রব্য আমরা রাজদরবারে পাঠাইব না।”

রাজ-অমাত্যের কথা শুনিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আমি কনকস্তূপ সঙ্গে লইয়া এদেশে আসি নাই—ভারতে বাণিজ্য করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু পর্ত্তুগালাধীপের দূতরূপে আসিয়াছি। আমার যাহা আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী আমি জামোরিণের জন্য বাহির করিয়াছি। পর্ত্তুগালের নরপতি ইমানুয়েল এ সকল সামগ্রী প্রেরণ করেন নাই—এ সমস্তই আমার নিজের।* আবার যখন পর্ত্তুগালের দূত এদেশে আসিবেন তখন নরপতি ইমানুয়েল তাঁহার সহিত অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিবেন। যদি রাজাধিরাজ জামোরিণ নিতান্তই এ সকল সামগ্রী গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি আর কি করিব? বাধ্য হইয়া আমার জাহাজে ফিরিয়া যাইব।” রাজ-অমাত্যগণ সে কথা শুনিলেন না। এই সামান্য উপহার তাঁহারা কোন ক্রমেই জামোরিণের নিকট পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কতকগুলি মুর বণিক সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারাও বলিল “এ সকল সামান্য দ্রব্য জামোরিণের উপযুক্ত নহে।” ভাস্কো-ডা-গামা চিন্তান্বিত হইলেন।

নিরুপায় ফিরিঙ্গিবণিক শেষে বলিলেন “যদি তোমরা নিতান্তই আমার উপঢৌকন রাজগোচরে পাঠাইবেনা স্থির করিয়াছ, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। তাঁহাকে যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়া আমি আমার জাহাজে ফিরিয়া যাই।” তাহাও হইল না।

* কোরিয়া-বর্ণিত বহুমূল্য উপঢৌকনের কথা যে অলীক ভাস্কো-ডা-গামার কথাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। প্রঃ লেঃ।

এ বিষয় জামোরিণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা উত্তর দিবে বলিয়া প্রস্থান করিল। ডা-গামা হতাশহৃদয়ে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। অপেক্ষা করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, কেহই আর আসিল না। তাঁহার সহচরগণ “নেটিভের” বাঁশীর গান শুনিয়া, নৃত্য ও গীতে সে রজনী যাপন করিলেন। ডা-গামার হৃদয় নানাবিধ সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এদেশের লোক কি শঠ! কি প্রবঞ্চক!

পরদিন প্রত্যূষে পূর্ব্বকথিত মুরগণ আসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে রাজপ্রাসাদে লইয়া চলিল। তখন প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে শস্ত্রধারী সিপাহীগণ সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত ছিল। প্রাসাদ-কক্ষে প্রায় চারি ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর সংবাদ আসিল ডা-গামা দুই জন সঙ্গীর অধিক লইয়া রাজদর্শনে যাইতে পারিবেন না—সে দুইজনেরও পূর্ব্বে পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া একজন দোভাষী ও আর একজন সহযাত্রী সমভিব্যাহারে জামোরিণ-দরবারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কক্ষান্তরে জামোরিণের সম্মুখে নীত হইলে পর জামোরিণ কহিলেন—

“আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি গত কল্যই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কৈ আসিলেন না ত?”

ভাস্কো। “পথশ্রমে বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই। সে ক্রটী মার্জ্জনা করুন।”

জামো। “সে দিন আপনি বলিয়াছিলেন যে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী দেশ হইতে আসিয়াছেন; কিন্তু কৈ, আমার জন্য কিছুই আনেন নাই? যে পত্রের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও ত দিলেন না।”

ভাস্কো। "রাজাধিরাজ! আমি আপনার উপযুক্ত কোন দ্রব্যই সঙ্গে আনিতে পারি নাই; আমি ভারতবর্ষের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম মাত্র—এ কেবল আবিষ্কারের যাত্রা। যখন পর্ত্তুগালের জাহাজ পুনরায় এদেশে আসিবে তখন আপনার উপযুক্ত উপহারও অবশ্যই আসিবে। পত্রখানি আমার নিকটেই আছে, আজ্ঞা পাইলেই তাহা দিতে পারি।"

জামো। "কি বলিলেন? আপনি আবিষ্কার করিতে আসিয়াছেন? কি আবিষ্কার? পাথর না মানুষ? যদি মানুষ দেখিতে আসিয়া থাকেন তবে কিছুই সঙ্গে আনেন নাই, সে কি?"

* * * * *

এইরূপ কথোপকথনান্তর ভাস্কো-ডা-গামা নরপতি ইমানুয়েলের পত্র বাহির করিলেন। লিপিদ্বয়ের মধ্যে একখানি আরব্য ভাষায় লিখিত ছিল। পত্র পাঠে জামোরিণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া ডা-গামাকে ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান* করিয়া বলিলেন—

"আপনার দেশ হইতে কোন্ কোন্ সামগ্রী বাণিজ্যের জন্য রপ্তানী হইয়া থাকে?"

ভাস্কো। "নানাবিধ বসন, গম, লৌহ, পিত্তল প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই রপ্তানী হয়।"

জামো। কোনরূপ পণ্যদ্রব্য আপনার সঙ্গে আছে কি?"

ভাস্কো। "আজ্ঞা হাঁ। সকল প্রকার পণ্যেরই নমুনামাত্র সঙ্গে

* The letters sent by the king of Portugal, one of which was fortunately written in Arabic, were, however, honourably received by the Zamorin, who gave permission to De Gama to open trade.—History of British India—M. Taylor.

করিয়া আনিয়াছি; আদেশ পাইলেই জাহাজ হইতে নামাইয়া আনিতে পারি।"

জামো। "ভাল, আপনি সঙ্গীগণসহ অবিলম্বে জাহাজে গমন করুন। নিরাপদস্থানে জাহাজ রক্ষা করিয়া সুবিধামত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকুন।"

জামোরিণের ভরসা ছিল ফিরিঙ্গিদিগের অর্থে রাজকোষ অবিলম্বে পূর্ণ হইবে †, তাই তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই মালাবার তীরের সকল বন্দরেই ভাস্কো-ডা-গামাকে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিলেন; জামোরিণ সেইদিন যে ভ্রম করিয়াছিলেন বহুকালেও তাহার সংশোধন হয় নাই। ভাস্কো-ডা-গামা আশাতীত অধিকার লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন বটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য কতদিন স্থির ছিল? অতি অল্পকালমধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতে বাণিজ্য করিতে হইলে অগ্রে বল-সঞ্চয় করা প্রয়োজন। ফিরিঙ্গিবণিকদিগের সে কাহিনী ইতিহাসে সুপরিচিত।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

† The Zamorin of Calicut received them graciously and looked forward to an increased customs-revenue from their trade. —Sir. W. W. Hunter's British India.

ইংরাজস্বার্থ এবং দেশের হিত।

এদেশের যখন ভারতবর্ষ নাম ছিল, তখন অধিবাসীরা দেশটাকে আমাদের দেশ বলিতে পারিতেন। সেত অতি প্রাচীন কালের কথা ; ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্ব্বের কথা। তাহার পর দেশের নাম হইল হিন্দুস্থান, তখনও এদেশের অধিবাসীরাই দেশটাকে আমাদের দেশ বলিতেন ; কারণ যাহাদের পূর্ব্বনিবাস যেখানেই থাকুক, রাজা প্রজা সকলেই এদেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। এখন দেশের নাম বৃটিশ-ইণ্ডিয়া। প্রাচীন ভারতবর্ষ অথবা হিন্দুস্থানের অধিবাসীদিগের বংশধরেরা আর এ দেশকে আমাদের দেশ বলিতে পারেন না। বলিলে, রাজবিদ্রোহের উদ্যোগের অপরাধ হয় কি না, তাহা হাইকোর্টের সরকারী এড্‌ভোকেটকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়।

এদেশ, ভারতবর্ষ নহে, হিন্দুস্থান নহে—ইহা বৃটিশ ইণ্ডিয়া এবং আমরা তথাকার অধিকারহীন সানুগ্রহ-রক্ষিত প্রজা। এই অতি সহজ এবং সুস্পষ্ট কথাটি ভুলিয়া যাই বলিয়া, আমরা ইংরাজসরকারের অনেক বিধিব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃথা চিৎকার এবং নিষ্ফল আন্দোলন করিয়া থাকি।

পেটেণ্ট-ঔষধ-বিক্রেতা বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দেন, যে তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিলে "উপকার হইবে"। উপকার হইবে, একথাটি সত্য ; কিন্তু সে উপকার ক্রেতার কি বিক্রেতার, একথা বুঝিতে না পারিয়া অনেক বুদ্ধিহীন ক্রেতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইংরাজসরকার যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার শাসন এবং পালনের জন্য কোন বিধান করেন, তখন যদি কেহ লুপ্ত ভারতবর্ষ অথবা সাবেক হিন্দুস্থানের বংশধরদিগের হিত বা অহিতের কথা লক্ষ্য করিয়া উহার সমালোচনা করেন, তবে

তিনি নির্ব্বোধ। শাসনকর্ত্তারা কোন ব্যবস্থাকে যখন "উপকারী" বলেন, তখন উহাকে অহিতকর প্রপঞ্চ মনে করিবার পূর্ব্বে যদি "কাহার ?" এই বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেই মায়ামোহ কাটিয়া যাইবে।

যাহারা লোকবিশেষ বা জাতিবিশেষের উপকারের জন্য ব্যস্ত, তাহারা অদূরদর্শী। ইংরাজ দূরদর্শী ; তিনি সর্ব্বদাই বৃটিশ-ইণ্ডিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত। যদি ঐ মুখ্য কার্য্যের ফলে গৌণভাবে কোন জাতিবিশেষের উপকার হয়, ভালই ; না হইলেও ক্ষতি নাই। ইংরাজ বাহুবলে এদেশ জয় করিয়াছেন, কাজেই দেশটি যাহাতে চিরদিনের মত সুরক্ষিত থাকে, তাহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। এই শাসন এবং রক্ষাকার্য্যের সুবিধার জন্য রেল চাই, টেলিগ্রাফ চাই, ডাকবিভাগ চাই। মনে কর যদি আমরা সকলেই থিয়সফির মহিমায় যোগবল-সম্পন্ন হইতাম, এবং ঐ ব্যবস্থাগুলি আমাদের প্রয়োজনে না লাগিত, তাহা হইলেও সুদৃঢ় এবং শান্তিপূর্ণ একছত্র রাজত্বের জন্য ইংরাজকে ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইত। তোমার আমার সুবিধা এইরূপ সর্ব্বত্রই গৌণভাবে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী বলিয়া একটা জাতি গঠিত হওয়া উচিত কি না, ইহা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার উদার রাষ্ট্রনীতির সমস্যা নহে। আমরা যাহাকে বঙ্গদেশ বলিতাম বা বলিতে চাই, যদি সে দেশের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিভাগের লোকের ভাষা, অন্য বিভাগের লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলে, বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়, তবে একটা ক্ষুদ্র জাতীর কথায় কে কর্ণপাত করিবে ? ইংরাজের হিতকর হইলে, দেশটা দ্বিখণ্ডিত কেন, শতধা বিভক্ত হইতে পারে। উহাতে ক্ষুদ্র জাতিবিশেষের যে সকল অনিষ্ট হইবে, সেইগুলিই যদি শাসনের জন্য প্রয়োজনীয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা সযত্নে লক্ষ্য করিয়া নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে। আন্দোলনের সময় যখন

আমরা অনিষ্টগুলি (বৃটিশ ইষ্টগুলি) প্রদর্শন করিয়া বলিব
আমাদের যুক্তিগুলি অত্যন্ত অকাট্য, তখন নিশ্চয়ই বৃটিশ গবর্ণমে
মুখ লুকাইয়া হাসিবেন। একের অনিষ্ট যখন অন্যের ইষ্ট, তখ
আমাদের উপায় কি ?

যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়াকে ভারতবর্ষ বলিয়া স্বপ্ন দেখি, যখন পূর্ব্বসীমা
একটা প্রদেশকে বাঙ্গালিজাতির দেশ বলিয়া কল্পনা করি, তখন
গোলে পড়ি। বড় লাট যখন বলেন, যে আমরা আমাদের উপকা
যতটা না বুঝি তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক বুঝেন, তখন আমরা
উক্তবিধ স্বপ্ন এবং কল্পনার মোহে জড়িত হইয়া ভাবি, "যে মা'র চাইতে
ভালবাসে তাকে বলি একটু খারাপ কিছু"। কিন্তু লাট সাহেবের কথা
যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে। তিনি
"খারাপ কিছু" নহেন, তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার মঙ্গলময় বিধাতা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে যদি সেই কথাই হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট
তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না কেন ? এবং দেখিতে পাওয়া যায়, যে
উল্টাপদ্ধতিতে গবর্ণমেণ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করেন, যে বিধিবিশেষ
জাতিবিশেষের মঙ্গলের জন্যই রচিত। কেন যে গবর্ণমেণ্ট তাহা
করেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তিনি বাধ্য নহেন। সেটা তাঁহার
স্বভাব। এই স্বভাবের কথাটাও আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া
উচিত। দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় কি না, তাহা
অদৃশ্য কথা ; কিন্তু শাসনকর্ত্তাদের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে যে উহা
সুলভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ।

স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে ইংরাজজাতির একটা মৌলিক প্রকৃতির
প্রতি প্রথম লক্ষ্য করা উচিত। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাম্ভিক,
এবং পরের গুণ বা মাহাত্ম্য দর্শনে অত্যন্ত অনুৎসাহী। একথা অনেক
ইংরাজই স্বীকার করিয়া থাকেন ; ষ্টিভেনসন্ সাহেবের প্রবন্ধগ্রন্থে ইহার

ারিত আলোচনা দেখিতে পাই। এই জন্যই দেখিতে পাই যে,
ও এদেশ ইংরাজের, তবুও এদেশের প্রত্নতত্ত্ব অন্যান্য ইউরোপীয়
তির পণ্ডিতেরা যত উদ্ধার করিয়াছেন, ইংরাজেরা তাহার শতাংশের
াংশও করেন নাই। যাহাকে বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ বলে, প্রত্নতত্ত্ব
ারের জন্য নিঃস্বার্থ অনুসন্ধান বলে, সে ভাবটি প্রায়শঃ ইংরাজদিগের
ধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্নতত্ত্ব করিতে গেলে কোন
কটা শাসনকার্য্যের সুবিধা হয়, তবে ইংরাজ তাহা করিতে অগ্রসর
য়েন ; সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্নতত্ত্বটা ফুটিয়া উঠে, ভালই। শ্রীরাধা
খিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কদাপি তাঁহার কুঞ্জে আসেন না অথচ তাঁহার জন্য
লা না গাঁথিলেও নয়, তখন তিনি একদিন সজিনাফুলের মালা
াথিলেন। উদ্দেশ্য এই, যদি কৃষ্ণ আসেন, ভালই ; না আসিলে
াজিয়া খাওয়া যাইবে। ইংরাজের প্রত্নতত্ত্ব যে অনেক স্থলে এইরূপ
াহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। দৃষ্টান্তটি এই প্রবন্ধের বিশেষ উপযোগী ;
অবান্তর কথা নহে।

যদি দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে বা বানিজ্যের সুবিধার জন্য কেহ
কোন দেশে যায়, তবে দেশের লোকেরা কদাপি তাহাকে কোন
সংবাদ দিবে না। সেরূপ স্থলে যদি নিঃস্বার্থ ভৌগলিক অনুসন্ধান
আরম্ভ করা যায়, তবে ফললাভ হয়। ভৌগলিক তত্ত্বের নামে যদি
তিব্বতের পথঘাটের কথা ভাল জানা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চুম্বির মহিমা
এবং সুলভতার কথা বলা যায়, তাহা হইলে তিব্বত অভিযানের অনেক
পূর্ব্বেই অনুসন্ধানের সুফল ফলিয়া যায়। অনেক সময়ে এই নিঃস্বার্থ
অনুসন্ধানের অর্থ সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। বাঙ্গালার
ভাষাভেদ ঘটাইবার প্রস্তাবের বহুপূর্ব্বে গ্রিয়ারসন্ এবং রিজ্‌লি
বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা
তখন অনেকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ঐ নিঃস্বার্থ

তত্ত্বের দোহাই দিয়া পরে যে একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান করা হইবে ত
প্রায়শঃ কাহারো মাথায় প্রবেশ করে নাই। সংস্কৃত কখনও ক
কহিবার ভাষা ছিল কি না, এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ রাপসন্ (Rapso
সাহেব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ প
করিয়াছিলেন; এবং সুবিজ্ঞ টমসন্ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলে
গ্রিয়ারসনকে নাকি দেখাইতে হইবে, যে একালের বাঙ্গালা সাহিত্যে
ভাষা একটা কৃত্রিম ভাষা, এবং প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি রচি
হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিক উন্নতি হইবে, কাজেই তিনি সে
সভাতেও গোড়াপত্তন করিয়া রাপসনের প্রবন্ধের বিশেষ প্রতিবা
করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সাহিত্যের আদ
ভাষার চাপে মরিয়া গিয়া দেশময় একটা ভাষা কিরূপ প্রচলিত হইয়াছে
তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া যখন টমসন বলিলেন, যে সেকালের বিভিন্ন প্রাকৃ
ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃত ভাষার অতিশয় নৈকট্য, এবং যে কো
প্রাকৃত জানিলে অনায়াসে সংস্কৃত বুঝিতে পারা যাইত, তখন গ্রিয়ার্স
এবং ফ্লিট্ (Fleet) অনেক বাজে কথা বলিয়া, এবং ভারতবর্ষী
অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া একটা অযৌক্তিক প্রতিবাদ উপস্থি
করিলেন। ঐ দৃষ্টান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের সাহিত্যে
ভাষাকে অকৃত্রিম এবং উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইত
কাজেই এত বিতণ্ডা, এবং এতটা নিঃস্বার্থ ঐতিহাসিক গবেষণা
"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে", কথাটা এই সক
তত্ত্ববিদেরা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন।

যাঁহারা কোন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে এমন করিয়া দৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করেন
তাঁহাদের উদ্দিষ্ট কার্য্য কি আমরা কোন প্রকারে বাধা দিতে পারিব?
যতই আন্দোলন করি, যতই চিৎকার করি, কিন্তু,—ন্যায়াৎ পথঃ
প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ। তবে উপায় কি? যদি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার

লের জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আমরা পীড়িত হই,
আমরা করিব কি?

বঙ্গদেশে দেখিতে পাই যে অনেক অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর জাতি, ব্রাহ্মণ-
দিগকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ্য রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে।
ধোবারাও বিধবা বিবাহ দেয় না, এবং অবস্থা ভাল হইলে উহাদের
বিধবারা একাদশীও করে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এবং অনার্য্যবহুল
অন্যান্য স্থানে এখনও অনেক অনার্য্যেরা হিন্দু প্রতিবেশীর আচার এবং
ধর্ম্ম ধীরে ধীরে গ্রহণ করিয়া অল্লাধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের সহিত
অলক্ষ্যে মিলনের উপায় করিতেছে। বঙ্গ প্রভৃতি দেশের বিষময় ফল
দেখিয়া ইংরেজ সরকার এই মিলনকে প্রার্থনীয় মনে করেন না।
প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বের গভীর গবেষণা প্রদর্শন করিয়া রিজলী এবং
গেট সাহেব আদমসুমারির রিপোর্টে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে
হায় হায়! অনার্য্যেরা ভ্রমে পড়িয়া আপনাদের জাতীয়ত্ব হারাইতেছে
এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন নষ্ট করিতেছে। উহারা যখন দলে
দলে খৃষ্টান হয় তখন এই মহাত্মাদের অশ্রুপাত হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মণের
আদর্শ, স্বদেশের আদর্শ, গ্রহণ করিলে যত দুঃখের উদ্রেক হয়; এবং
ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের
উপর উচ্চশ্রেণীর প্রভাব যত কম পরিমাণে বিস্তৃত হয়, ততই তাহা বৃটীশ
সিংহের উদার রাষ্ট্রনীতির অনুকুল হয়। আমরা পথও চিনি ঘাটও
চিনি, ইতিহাসও বুঝি প্রত্নতত্ত্বও বুঝি, কিন্তু কি বলিব মরিয়া আছি।

মহাত্মাদের ভারতীয় ধর্ম্মজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম তাহা ১৯০১ সালের
সেন্সস্ রিপোর্ট হইতেই দেখাইতেছি। ঐ রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের
প্রথম ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস আছে।
শ্রীপঞ্চমী পূজাটা কি, ইহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সাহেব
বাহাদুর তাঁহার আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে পূজাটা কি?

আর্দালিও তাহার ইতিহাস দিল। আর্দালির মুখে শ্রীপঞ্চমীর ইতিহাস কথা শুনিয়া পাঠকেরা বিস্মিত হইতে পারেন বলিয়া কথা কয়টি রিজ্‌লি সাহেবের নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি :—

I asked one of the ordarlies what worship he had done on this particular occasion and he was good enough to give me, knowing that I was interested in the subject, a minute description of the ritual observed.

আর্দালির মুখে যখন শুনিলেন যে তাহারা দোয়াত সাজাইয়া পূজা করিয়াছিল, তখন সাহেবের বিস্ময় হইল ; তিনি ভাবিলেন যে "why it was that in the centre of the altar was placed as the principal fetish a common English glass inkpot with a screw-top." তিনি দেখিলেন যে আর্দালিরা কৃষক জাতি ; উহাদের লাঙ্গল পূজা করা উচিত, দোয়াত পূজা করিল কেন ? প্রথমে ইংরাজি টুকুই তুলিতেছি।

I asked my informant who is a small landowner, in one of the Hill States near Simla, what he meant by worshipping an imported inkpot when he *ought to have worshipped a country-made plough.* He admitted the anomaly, but justified it by observing that after all he drew pay from the department; that the inkpot was the emblem of the Government; and that he left the plough in the Hills. These are the lower aspects of Hinduism.

আর্দালিটার সিমলা অঞ্চলে কিছু জমি ছিল সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাহার যখন লাঙ্গল পূজা করা উচিত ছিল, তখন দোয়াত পূজা করিল কেন ? কি যে উচিত ছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের পূরো জানা ! আর্দালি স্বীকার করিল যে তাহার ভুল হইয়াছে। বটেই ত ! সে বেচারাকে যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, যে তুই পূজা না

করিয়া দোয়াতটা গিলিয়া খাইলি না কেন, তাহা হইলেও যে সে ভুল স্বীকার করিত তাহা সাহেব বাহাদুর বুঝিলেন না। কিন্তু যাহা হউক আর্দালি, সাহেবকে খুসী করিয়া দিল। সে বলিল, সরকার বাহাদুর যখন অন্নদাতা, তখন সরকারের পূজা করা চাই। বিলাতি দোয়াতটা গবর্ণমেন্টের প্রতিমা ; তাই উহার পূজা হইল। উহার রাজভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সাহেব যে উহাকে অচিরাৎ ডিপুটিগিরি দিয়া রায়বাহাদুর করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যদি রিজ্‌লি সাহেব তাঁহার প্রতিবাসীর বাড়ীতে সনন্দীভৃঙ্গী মহাদেবের পূজা দেখেন, তাহা হইলে অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন, যে তাহারা রিজ্‌লি, গেট্‌ এবং কর্জনের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে।

এই শ্রীপঞ্চমী পূজা প্রসঙ্গেও ব্রাহ্মণের উপর কটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। The Brahman recited various cabalistic formulæ, supposed to be texts from the Vedas...attacked a vast mass of sweetmeats......and ate as much as he could. হায়, ভারতের গরিব ব্রাহ্মণ ! মৃত, পদদলিত ব্রাহ্মণকে লইয়া আর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কেন সাহেব ? তুমি তামাসা করিলে তোমাকে উল্টাইয়া তামাসার কথা শুনাইতে যে সাহস পায় না তাহাকে লইয়া রঙ্গরস কেন ? তোমার sense of humour তো শ্রীপঞ্চমীর ইতিহাসেই জানা গিয়াছে ! তুমি অন্যায় করিলে যে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারে না, তাহাকে পীড়ন করা কাপুরুষতা।

এদেশের প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বে যাঁহাদের জ্ঞান এত প্রখর ; আর্দালি না থাকিলে যাঁহারা কোন তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহাদেরই গবেষণায় যদি বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ এবং অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তবে উপায় কি ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কোরিয়া-রমণী।

কোরিয়া দেশের অন্তঃপুরের সংবাদ যত কম পাওয়া য
তেমন আর কোন দেশেরই নহে। বাস্তবিকই কোরি
উপদ্বীপ যেমন কোন দেশেরই সংস্পর্শে নেই তেমনি তদ্দেশবা
স্ত্রীলোকগণেরও অন্তঃপুরের বাহিরে বহির্জগতের কারুর সঙ্গে কো
সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। সে দেশে স্ত্রী-অবরোধপ্রথা এত
কঠোর; এমন কি, চিকিৎসককেও কোরিয়া-রমণীর কক্ষে প্রবে
করিতে দেওয়া হয় না। জাপানী ডাক্তার মাসানো এই দৃঢ় অবরো
ভঙ্গ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকা
হইতে পারেন নাই। অবশেষে, নিজে যেখানে প্রবেশাধিকার পাইলে
না সেই কোরিয়ারমণীর অন্তঃপুরে আপনার স্ত্রীকে পাঠাইলেন
এবং চিরাবরুদ্ধ অন্তঃপুরে কি রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার আছে তাহা জা
করিয়া জানিয়া লইবার জন্য স্ত্রীকে আদেশ দিলেন। ডাক্তার-মহিলা
অনুকম্পায়, যে কোরিয়ার অন্তপুরের সংবাদ, যে রমণীর মুখচ্ছবি বায়ুর
অনধিকার ছিল ক্রমে তাহার অস্পষ্ট ছায়া সাধারণে প্রকাশিত হই
পড়িল।

কোরিয়ায় স্ত্রী-অবরোধ এত কঠোর হইলেও সেখানে স্ত্রী-সম্মা
অক্ষুণ্ণ আছে। স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা হন, ভবিষ্যৎ বংশের জন
বলিয়া তখন পুরুষের নিকট যেরূপ আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হন, তাহা
কোরিয়াবাসীর রমণীসম্মানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই কোরিয়াবাসীরা সদর দরজায় একটী দ
ঝুলাইয়া দেন। যদি পুত্র জন্মে তবে ঐ দড়ির শেষাংশে এক টুক
কয়লা এবং একটা পাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কন্যা জন্মিলে দড়ি অ
থাকে। কোরিয়া দেশের লোকেরা কন্যাকে সংসারের মধ্যে গণ্য করে

। যদি একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনার কয়টী সন্তান, তাহা
হইলে তিনি কেবল পুত্রের সংখ্যাই উল্লেখ করেন। খুব পীড়াপীড়ি
বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে তবে তাঁর কন্যা আছে কি না ও তার
সংখ্যার কথা জানা যায়। সাত বৎসর বয়স অবধি মেয়েদের নিজের
নামেই ডাকা হয়; তারপর তাদের আর কোন নাম থাকে না, কেবল
অমুকের কন্যা, অমুকের ভগ্নী, অমুকের স্ত্রী এই ভাবে পরিচিত হয়।

শিশু যখন সবেমাত্র হাঁটিতে শিখে তখন তার তত্ত্বাবধারণের
জন্য একটা কুকুরকে তার সঙ্গী করিয়া দেওয়া হয়। কুকুরটাকেও
এমন ক'রে শিক্ষিত করা হয় যে সদাসর্ব্বদা সে শিশুর সঙ্গে সর্ব্বত্র
যাওয়া-আসা করে, খেলিয়ে বেড়ায়। খুব গরীব হইলেও কোরিয়া
বাসীরা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। শিশুদিগের মানসিক শক্তির
বিকাশ সম্বন্ধে এ দেশবাসীর এক অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। তাহাদের
ধারণা, আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি-প্রভাবে বালকের মানসিক অবস্থাও
উজ্জ্বল হয়; সেইজন্য তাহারা কখনও ছেলেমেয়েদের ঘরের আলো
নির্ব্বাণ করে না।

আট বছর বয়স হইলেই ছেলে ও মেয়েদের আর একত্রে রাখিয়া
শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভবিষ্যতের কার্য্যোপযোগী নানারকম শিক্ষা
বালকেরা পায়। এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী কন্যাদের শিক্ষা কেবল ধর্ম্ম ও
নীতিবিষয়ক উপদেশ এবং পৈত্রিক ধর্ম্মানুসঙ্গিক আচার ব্যবহার
শিক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয়। আর দরিদ্রের কন্যা, কুটীরে বসিয়া পরিচ্ছদ
প্রস্তুত ও সূচের কার্য্য শিক্ষা করে। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা
সূচি-কার্য্যে খুব পটু। বার্লিণ ও ব্রুসেলের যাদুঘরে ইহাদের কৃত যে
সমস্ত সূচি-কার্য্য রক্ষিত আছে, তাহা দেখিলে ইহাদের দক্ষতা বেশ বুঝা
যায়। ইহাদের রেশমি কাপড়ের উপর জরির কারু-কার্য্য অতি সুন্দর
ও বিশেষ প্রশংসাজনক। বার্লিনের যাদুঘরে কোরিয়াদেশী শ্বেতবর্ণের

এক প্রকার পরিচ্ছদ রক্ষিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, কোরি
বাসীরা এ পোষাকের বড়ই পক্ষপাতী। পূর্ব্বে, ইহা শোক
পরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইত। একজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে এই শোক
বর্ণ পোষাক একাদিক্রমে তিন বৎসর কাল পরিবার নিয়ম। এ
সময়ে, দশ বৎসরের মধ্যে কোরিয়ায় তিনজন রাজার মৃত্যু হয়
তাহাতে দেশশুদ্ধ লোককে বারম্বার এই পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়
আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুত আছেই, তাহার উপর একজনের মৃত্যুতে তি
বৎসরকাল এই পোষাক পরিতে হয়, কাজেই অন্য পরিচ্ছদ পরিধান
করিবার অবসর কোরিয়াবাসীর অদৃষ্টে খুব কমই ঘটিত। সেইজন্য
মিছামিছি অপর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক
নাই বুঝিয়া কোরিয়াবাসীরা বারোমাস ঐ সাদা পোষাক পরিতে
আরম্ভ করে।

পোষাক প্রস্তুতের ভার স্ত্রীলোকদিগের উপরই আছে। পোষাক
পরিচ্ছন্ন করিবার এক অদ্ভুত প্রণালী আছে। পোষাক ধৌত করিবার
সময় তাহা ভিন্ন ভাগে খুলিয়া ফেলা হয় এবং ঐ দেশে যে কাপড়
কাচা কাষ্ঠদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহাতে খুব আছড়ান হয়—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাপড় হইতে এক প্রকার স্বর্ণাভা বাহির হইতে
থাকে। বর্লিন যাদুঘরে পোসাক কাচিবার একটা কাষ্ঠদণ্ড আছে
সেটা দেখিতে, একধার-চেপ্টা মাঝারি গোছের মদের বোতলের মত।

অন্য দুই এক জাতির মত এ দেশের বালকদের অপেক্ষা
বালিকারা একটু বেশি বয়সে পুষ্টাঙ্গী হয়, সেইজন্য প্রায়ই স্ত্রী স্বামী
অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হয়।

এ দেশের বিবাহপদ্ধতি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। বর প্রথমে
তাহার মনোনীত বালিকার পাণি প্রার্থনা করিয়া তাহার কোন বন্ধু
দ্বারা কন্যার পিতৃসমীপে একখানি পত্র পাঠায়। কন্যাপক্ষীয়েরা যথা

সময়ে সে পত্রের উত্তর দেয়। পাত্রের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে তখন উভয়ের জন্ম-কোষ্ঠীর আদান প্রদান হইতে থাকে। পাত্র ও পাত্রীর জন্মতারিখ লগ্ন দেখিয়া পঞ্জিকার সাহায্যে বিবাহের জন্য একটা শুভদিন ঠিক করা হয়। বিবাহকার্য্য কন্যার বাড়িতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সদর দরজার সিঁড়ির নিম্নে একটা স্থান ঠিক করা হয়, সেখানে বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত হয়। বিবাহের দিন বর নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্ব বা যানারোহণে পিতার সাহত কন্যা-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমে সদর দরজার বাহিরেই অবতরণ করে এবং উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া সেস্থান হইতে বিবাহস্থলে আগমন করে। পাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে নতজানু হইয়া তাহার সমক্ষে একটি হংসী উপহারস্বরূপ রাখিয়া দুইবার অভিবাদন করে এবং তাহার পরেই উঠিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া থাকে। পাত্রীকে এই হংসী প্রদান করিবার একটা কারণ আছে। শুনা যায়, এক বনে এক শিকারী একটি হংস বধ করে, সেই হংসের স্ত্রী তাহার ভর্ত্তার মৃত্যুস্থানে প্রত্যহ একবার করিয়া আসিত। হংসী উপহার দিবার অর্থ এই, যে পাত্রী ঐ হংসীর ন্যায় স্বামীভক্তিপরায়ণা হউক। উপহার প্রদান শেষ হইলে, বর ও কন্যা প্রতিজ্ঞামন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহারা বলে "আজ আমাদের কেশ বন্য হংসীর পুচ্ছের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; যদিচ ইহা কখন শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, তথাপি আজ আমরা পরস্পরে যেমন বিশ্বাসী, সোদন পর্য্যন্তও তেমন থাকিব।"

ইহার পরেই, পাত্রীকে কোরিয়ান্ রমণীর পূর্ণপরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। মুখে পাউডার মাখান হয়; ভ্রূযুগ চিত্রিত এবং ওষ্ঠ রঙান হয়। পারাডাইস্-পক্ষী-অঙ্কিত তিনটি বড় সোনার কাঁটা মাথার চুলে গুঁজিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে একটা হাল্কা টুপিও আঁটিয়া দেওয়া হয়। নানা বর্ণে চিত্রিত ঝকমকে কাঁচলি, বেগুনি

রঙ্গের সুদৃশ্য ওড়না, সাদা রঙ্গের চওড়া কোমর বন্ধ এবং একটি লা
টুকটুকে ঘাঘরা দিয়া কন্যার গাত্র আবরিত করা হয় তা ছাড়া, হাতে
সাদা কফ্, পায়ে সাদা রেশমি মোজা ও রেশমি জুতা, লাল সবুজ
বেগুনি রঙ্গের থাকে।

বিবাহ সময়ে, তিনজন সুসজ্জিত বাঁদির গাত্রে ভর দিয়া, ধীরপদে
পাত্রী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, নিম্নে বিবাহমণ্ডপে দণ্ডায়মান হয়। পাত্র
পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার মুখ হস্তস্থিত পাখাতে আবৃ
করে। এরূপ অবস্থায় পাত্রকে দুইবার অভিবাদন করিতে হয় এব
পাত্র ও পাত্রীকে দুইবার প্রত্যভিবাদন করে। তৎক্ষণাৎ দুইজ
বাঁদি, একটি লাল বস্ত্রে এবং আর একটি সবুজ বস্ত্রে আবৃত দুইটি
মদ্যপূর্ণ পেয়ালা বর ও কন্যাকে দিয়া যায়। তাহারা দুইজনেই
এক সময়ে একত্রে চুমুক দেয়। এই হইলেই বিবাহের নিয়ম স
শেষ হইয়া যায়।

তখন বর ও তাহার পিতাকে বিবাহভোজে ডাকিয়া আন
হয়, পাত্রীর আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই এ ব্যাপারে যোগ দেন
ভোজন শেষ হইলে বর নিজ বাড়িতে একলাই চলিয়া যায়। পাত্রী
তাহার পর এক শুভদিন দেখিয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করে।

এই সময় হইতেই কোরিয়ারমণীর কঠোর অবরোধবাস আরম্ভ
হয়। স্বামী ব্যতিত অপর কোন বিবাহিত পুরুষের সমক্ষে বাহির
হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ—এমন কি বাড়িরও কোন পুরুষের সমক্ষে
নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে কোরিয়ান্ রমণীদিগের প্রত্যহ রাজপথে বাহির
হইবার একটা প্রথা ছিল। অনেক রাত্রে, সহরের সব দরজা বন্ধ হইয়া
যাইলে পুরুষেরা নিজ নিজ কক্ষ হইতে আর বাহির হইতে পাইতেন না
তখন রমণীবৃন্দ পুরুষ-বর্জ্জিত রাজপথে বায়ু সেবন করিতেন। কখন

বা আমস্তক সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, ছোট কাগজের লণ্ঠনটী হাতে করিয়া এর-ওর-বাড়ি বন্ধুসম্মিলনে বাহির হইতেন। পুরুষরা নিজ শয়নকক্ষে আবদ্ধ থাকিতেন, আর রমণীগণ বৈঠকখানা আলো করিয়া বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। কিন্তু কোরিয়ান্ স্ত্রীলোকের ভাগ্যে বহুদিন এ সুযোগ রহিল না। অন্তঃপুর-পিঞ্জর হইতে বাহির হওয়া তাঁহাদের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমণীগণ একাকিনী রাজপথে, তস্করেরা এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; রাশি রাশি রত্নাভরণ চুরি যাইতে লাগিল। এ কার্য্যে বাধা দিবার পুলিশদিগেরও সুবিধা ছিল না। কাজেই তখন আপনা-আপনি সে প্রথা উঠিয়া গেল।

আজকাল কদাচিৎ কখন উচ্চবংশীয় রমণীকে অনেক রাত্রে স্বামী সমভিব্যাহারে সর্ব্বাঙ্গাবৃত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কখন কখন দিনেও পথে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদেরও আগাগোড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা।

তুকারামের আত্মকাহিনী।

গোড়ায় কি ভাবে ও কি উদ্দেশে তুকারাম দেবসেবায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহা তিনি নিম্নলিখিত "অভঙ্গে"* ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অকপট ব্যবহার, বিনয়-নম্রতা ও সত্যনিষ্ঠার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শোনো সাধুগণ সবে, —আমি যে পতিত অতি;
এত প্রীতি—এত যত্ন কেন কর আমা প্রতি?
সাক্ষী মোর অন্তরাত্মা —হয় নি মোর উদ্ধার;
এক ভাব ধরি আমি —অন্য লোকে ভাবে' আর।
সাংসারিক কষ্টে পড়ি' গরু চরাইনু মাঠে;
যথেষ্ট হ'ল না তাহে, তাই প্রবেশিনু মঠে।
সর্ব্বস্বান্ত বিধি-বশে; যা' কিছু ছিল আমার
ব্রাহ্মণে, যাচকে দিয়া করিনি ত্যাগ স্বীকার।
ছাড়িলাম আত্মজনে প্রিয়া, পুত্র আর ভাই,
তাই এই হীন দশা —মন্দবুদ্ধি আমি তাই।
না পারি' দেখাতে মুখ পশিনু বন-মাঝার;
হ'নু যে বিজন-বাসী এই শুধু হেতু তার।
দয়ামায়া গেল সব পড়িয়া পেটের দায়
ডাক্ দিলে কেহ, শুধু "হাঁ" বলি' দিতাম সায়।
পূজিতেন বাপ দাদা তাই পূজি আমি এবে
তুকা বলে, ভক্তিভাবে অন্যে যেন পূজে' দেবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "অভঙ্গ" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অনেক অভঙ্গে মিলও আছে।

ঘরের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আনছে—নিচ্ছে—খাচ্ছে, দরজায় দু'বেলা এঁটোপাত পড়ছে, "জয়-রাধে-কৃষ্ণ" হৃষ্টমুখে ফিরছে, খঞ্চিপোশ ঢাকা থালা মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে ঢুকছে, বাড়ীর ভিতর হ'তে বেরুচ্ছে, মান সম্ভ্রম এক রকম বেশ বজায় আছে;—মানুষ বেঁচে থাকতে বোঝা যায়না যে তার কত আয়, সঙ্গতি কত, চলবে কত দিন। জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মিয়েরা বা ঘনিষ্ট প্রতিবাসীগণ—"এই অহঙ্কার যায় ভেঙ্গে"—"এই প'ড়ে দেখ না দর্পে ছাই"—ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষের মত্ সতত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও লোকটার দিন দেখতে দেখতে এক রকম স্বচ্ছন্দে কেটে যায় এবং সে নিজেও মনে করে এবং পরিবারবর্গ ও অপর সাধারণেও ভাবে যে চিরদিনই তার এমনি যাবে। কিন্তু যেই লোকটা চোখ বুজে, গৃহসংসারের এক মাত্র "চাকরের" যেই অনন্ত "ফর্লো" ছুটি মঞ্জুর হয়, সেই বুঝা যায় সব ফাঁক সব ফরসা; সম্ভ্রমের ঠাটখানি বেচারা আপনি মাথায় করে বসে ছিল, অন্য খুঁটি ছিল না, আপনিও পড়লো ঠাটখানিও ভূমিসাৎ হলো। তখন দেখা যায়, মাগী বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে একশিশি মালিসের আরক খেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে, ছেলেপুলেগুলো কান্না ভুলে গিয়ে আপনা-আপনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি কচ্ছে, শেষ দশ টাকার নোটখানি ভাঙিয়ে আট টাকা জগবন্ধু ডাক্তারকে দেওয়া হ'য়েছে বাকি দুই টাকার জগস্থুপ এসেছিলো—এখন উপায়, সৎকার হয় কি করে? মনে করবেন না যেখানে বিশ পঁচিশ টাকা আয়ের উপর সব নির্ভর ছিল সেই খানেই এই দশা, দুশো আড়াইশো বা ততোধিকেও এই পরিণাম।

বিজ্ঞ মহাশয়েরা এসব অপরিণামদর্শিতার ফল, উড়ুন-চুড়ে লোকের হাল বলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়বেন না। চোখের পরদা রেখে সংসার করতে গেলে অনেক সময়েই ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায়; বিশেষ যাকে গোড়া থেকে চালা বেঁধে সংসার পাততে হয়েছে। তবে যে নিয়ে-নব্বুইয়ের ধাক্কা পেয়েছে অথবা টাকা জমাব বলে চক্ষুবুজে কোমর বেঁধে লেগেছে, তার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মিত্রজা একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরতেন, আসবার সময় তামাক খাওয়ার জন্য মোড়ের দয়েহাটা থেকে অকটু আগুণ চেয়ে আনতেন, অন্য পাত্রাভাবে গয়লারা আপনাদের চালের একখানা করে খোলা নিয়ে আগুণ টুকু মিত্রজার হাতে দিত; আমি দেখেছি কুড়ুনির মা (মিত্রজার গৃহলক্ষ্মী) একবার বর্ষাকালে সাত টাকা কয় আনার পুরাণো খোলা কলুদের খোকার মাকে বিক্রয় করেন।

এখন রাজু দে'কে শিল নোড়া ধুচুনি কুলো কিনে সংসার বাঁধতে হয়েছিল, তার উপর বেচারা অতি আহাম্মক, অর্থাৎ একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, দশজনের একজন হব বলে একটু অভিমানও ছিল, আবার কপালগুণে কুড়ুনির মার মত গৃহলক্ষ্মীও ছিল না; সুতরাং মতি চৌধুরীর খোঁঙারি ভাঙ্গিবার পয়সা কয় গণ্ডা কেড়ে নিয়ে ছিরে গেঁজেল যখন রাজুর জন্য খাট কিনে এনে তার জ্ঞাতি বান্ধব ও দেশস্থ লোকজনকে সংবাদ দিলে তখন প্রকাশ হলো যে মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাঁদের সকলের কুললক্ষ্মীগণই এককালে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছেন, (এই জন্যই স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, সময় অসময়ে কত কাজে লাগে দেখছ—আত্মীয়ের সৎকারে যাবনা বল্লে কতটা নিন্দে হতো, লক্ষ্মীদের গর্ভের উর্ব্বরতার দোহাই দিয়ে স্বামী বেচারীরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ রক্ষা পেলে)। অম্বিকে খুড়োর আজ তিন বৎসর গৃহশূন্য। সেই ঝড়ের রাত্রে রাজু একলা এক দিকে কাঁধ দিয়ে খুড়ীকে পুড়িয়ে আসে, সে সময়

খুড়ো মহাশয় শোকে বিহ্বল হওয়ায় ঘাটখরচা রাজু নিজে থেকেই নির্ব্বাহ করে, পরে পরিবারের অন্তিমকথা পড়লেই খুড়োর চোখ ছল-ছল করতো বলে চক্ষুলজ্জাগ্রস্থ ভ্রাতস্পুত্র আর এপর্য্যন্ত সে টাকার কথা মুখে আনতে পারে নাই, ঘড়া ঘটী বাঁধা দিয়েও যখন নিজের চিকিৎসার খরচ চালিয়েছে তখন পর্য্যন্তও না; কিন্তু আজ খুড়োর আপশোষের আর সীমা নাই; এমন দুর্ঘটন ঘটবে, রেজো আবাগে এত সকাল সকাল ফাঁকি দেবে জানলে কি উনি তরশুদিন বাতশিরার র‍্যায়রামের জন্য মালাইতলার তাগা ধারণ করেন। এখন তো আর উপায় নাই, বাবা-ঠাকুরের হুকুম শ্মশানের ধোঁয়া গায়ে লাগলেই চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে; রেজোর চৌদ্দপুরুষ তাঁর চৌদ্দপুরুষ তো আর ভিন্ন নয়, অলপ্পেয়ে ছোঁড়া বেঁচে থাকলে সে কখনই খুড়োকে তার সৎকার করতে যেতে দিত না; আহা হা রেজোরে! রেজোরে! তোর মনে এই ছিল, বুড়োকে কাঁদালি, পূজোর সময় এক জোড়া করে ধুতি চাদরটা দিতিস তাও আর পরতে দিলিনি—যাক্ যাক্ কেউ কারু নয়—খালি ভোজের বাজি—অসারে খলুসংসারে মিছে মায়া—এক পক্ষী নানা বৃক্ষে, ইত্যাদি, ইত্যাদি!!

যাকে দাহ করে একখান নূতন বস্ত্রও কোমরে উঠবেনা, যার শ্রাদ্ধে কেঁধেল ভোজনের ফলারটারও বড় আশা নাই, যাহ'তে আর কখনও কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই, যার স্ত্রীপুত্রের নাম সংসারের চেনা-পরিচয়ের খাতা থেকে চিরদিনের জন্য খারিজ হতে চল্লো, যার সৎকার করে এলে কথাটা পাড়ায় তোলাপাড়া হয়ে দুটো সুখ্যাতি হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, তার শববহন করে কাঁধে ব্যথা করতে ব্যবস্থা আমিতো কোন শাস্ত্রে দেখি নাই। ইংরাজি এটিকেটেও এ নিয়ম নাই। তা থাকলে যে হরেন এমন ভাল ছেলে, বিয়ে পাশ করেছে, ফুটবল খেলায় মেডিক্যাল কলেজের সাহেবের ছেলের দলকে জিতেছে,

এত পরোপকারী যে যুবতী বিধবাদের চুলের ফিতা বিতরণ করবা জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চাঁদা তুলেছে, নিমতলার কাঠগোলা আগুণ লাগবার রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেবের পাশে পাশে কুড়ুল লয়ে ছুটোছুটি করেছে, সুরেন বাঁড়ুর্য্যের জেল হ'তে এক মাস কামিজের উপর কাল ফিতা বেঁধে. খালি পায়ে বেড়িয়েছে; সেই হরেন আজ আপনার পি্তুত ভায়ের সৎকারের সময় নিজের হাল্লি কেন ল্যাম্পটা ঘাটে নে যাবার সময় দিতনা? যদি বলেন যে বৌমা রাত্রে ছাদে যাবেন কি হাতে করে—তা এর চেয়ে বড় বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন হরেন দেশের জন্য অনেকবার করেছে।

মতিটা মাতাল, ছিরেটা গেঁজেল আর কামারদের শিবেটাতো জন্মবখাট, তাই বাহাদূরী করে হরিবোল দে গেল! ঘোর কলি ঘোর কলি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম জাত-জন্ম কিছুই আর রইল না! কামার হয়ে কায়েতের মড়াটা ছুঁয়ে ফেল্লে, আর বামুনের ছেলে হ'য়ে মত্তেটা পৈতেগাছটার মানও রাখলেনা—স্বচ্ছন্দে গিয়ে খাট ধরলে। তা'কি জান, কেউতো এখন কাকেও মানেনা—আর কলিকাতা সহরে এক ঘরে ক'রে কাউকে শিক্ষা দেওয়ারও সুবিধা নাই। মাগীরইবা কি আক্কেল—ঐ রেজোর বৌএর, আবাগের বেটী স্বামীর পরকালটা ভাবলি না, অজাতককে দেহটা ছুঁতে দিলি। চুলোয় যাক্ চুলোয় যাক্—এই মাঝের বাড়ীর সঙ্গে দেশের খিড়্কির তেঁতুল গাছটা নিয়ে ডায়মণ্ড হার্ব্বরের মুন্সুবিতে যে মোকর্দ্দমাটা চলছে সেইটে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই—অম্বিকা খুড়ো শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে বাস করবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি অলক্ষণ! কোথাও কিছু নাই কিনা এক মৃত্যুর কথা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার নতা করে একটা পরিচ্ছেদ পূর্ণ করলে? অমন করে থেকে

থেকে মরার কথা মনে করে দিওনা বলছি, তাহ'লে ভাল হবেনা কিন্তু। আমি মরা দেখতে চাইনা, মরার কথা শুনতে ভালবাসিনা, যে পথ দিয়ে মড়া নিয়ে যায় সে পথ মাড়াইনা। মরার মূর্ত্তি চোখে পড়বার ভয়ে আমি কুমারটুলির ঘাটে ইঁট কিনতে যাইনা, দু'পয়সা চড়া দাম দিয়ে চাঁপাতলায় যাই তবু নিমতলার ঘাটে কাট কিনিনা। রাস্তা দিয়ে ঘোল ডেকে যায় আমি হরিবোল মনে ক'রে কাণে আঙুল দিই, হরিবোলের বিকট শব্দে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠে। একবার থিয়েটার দেখতে গিয়ে একটা লোক মরে সশরীরে স্বর্গে যাচ্চে দেখি, তা'তে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, একুশ দিন ভুগি, সেই অবধি আর নাট্যশালার দরজায় পা দিইনা। মরার কথা তোল কেন? ওকথা মনে করার প্রয়োজন কি? মরার কথা শুনলে কি আর কাজকর্ম্ম চলে, মরবার কথা মনে হলে কি আমি রাত্রি জেগে পিনালকোডের সেক্সন, প্রপার্টি-আইনের ডিশিসন মুখস্থ করে উকীলি পাশ করতে পারতেম। কে যেত মক্কেলের মাথা খেতে যদি মনে পড়তো যে মরতে হবে? পৈত্রিক ভদ্রাসন ভাগ করার জন্য যখন দাদাতে আমাতে উঠানের মাঝখানে দড়ি ফেলি তখন মরার কথা মনে হলে আমার হাত কাঁপিত না? হাঁ শুনেছি বটে কেউ কেউ মরে—কেউ কেউ কেন এমন অনেকে মরে, তা যারা মরে তারা মরে, আমার তাতে কি? এই আমি সিঁতের উপর সামলা এঁটে বুকের ছাতি ফুলিয়ে কাছারি যাই, ওয়াটের বুট পায়ে দিয়ে মস্‌মস্ করে বিশ্ সেকেণ্ডের মধ্যে হাইকোটের তেতলায় উঠি, আমার কি মরে যাওয়া সম্ভব? কত লোককে যে দেখে-নেব বলে শাসিয়ে রেখেছি—আমি মলে তা'দের জব্দ করবে কে? সিঙ্গিদের বাগান খানা ফোরক্লোজ করে নিতে হবে, ভট্টচার্য্যিদের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হবে, কবে বাবাকে মাসহারা দিয়াছিলেন বলে দাবি করে আজও অহঙ্কারে আমায় বাবু

বলেনা, তার নাবালক নাতিকে হ্যাণ্ডনোট কাটাতে হবে, আর উনি এলেন কিনা মরার কথা মনে করে দিতে। যদি পৃথিবীতে মরার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তা হলে বুড়োরা মরুক, রুগীরা মরুক, দুঃখী, ইতর, অভদ্রলোক মরুক, উপায়হীন, অধ্যবসায়হীন, উত্তেজনা-উদ্দীপনা-প্রতিভা-প্রতিষ্ঠাহীন দুর্ব্বল লোক মরুক। মৃত্যুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার দেহে বল কুলায় না, হৃদয়ে তেজ ধরে না, অভিলাষের অন্ত নাই, আশার শেষ নাই, সাধের সীমা নাই, প্রতিভা ছাপিয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে, অনুরাগ পায়ে ধরছে, সোহাগ গড়িয়ে পড়ছে। শরতশশীর আমার যৌবন দিন দিন ফুটে উঠছে, জ্যাকেটের বোতাম কাটছে, কুন্তলীন মেখে চুলের রাশিতে ঢেউ খেলতে আরম্ভ হইয়েছে, কটাক্ষে ভুবন লোটে, হাসিতে জ্যোৎস্না ফোটে, স্পর্শে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছোটে। শরতকে মাষ্টার রেখে ইংরাজি পড়াব, বিবি রেখে পিয়ানো শেখাব, খোঁপায় তার ক্যামেলিয়া দেব, গলায় মুক্তার শেলি দেব, কাণে হীরার দুল দোলাব। মাকে একবার কিছু খোরাকি দিয়ে কাশী পাঠাতে পাল্লে মনমোহিনীকে মোহিনী সাজে সাজিয়ে ভারি রাতে ফেটিং চড়ে বেড়াতে বেরুব, কখন বা দু'জনে ফুটন্ত চাঁদের আলোয় পানসির ছাতে গুণগুণ করে মৃদুমধুরস্বরে "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" গাইতে গাইতে ধীর তরঙ্গে দুলতে দুলতে ভাসতে থাকব। অনন্ত অনন্তকাল এই সুখ উপভোগ করবো। কেন করবোনা? আর আমি কেন? কে এ পৃথিবীতে মরবার কথা ভাবে? জজ যখন বেঞ্চিথেকে আসামীর উপর ফাঁসীর হুকুম দেন তখন কি তিনি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করেন, কৌন্সলি যখন ভদ্রলোককে সাক্ষীর কাটরায় অবমাননা করে তখন কি মরার কথা মনে করে, সাহেব যখন নেটিভের পীলে ফাটায়, নেটিভ যখন হ্যাট্ পরে সাহেব সাজে, জমীদার যখন

রাজা হওয়ার চাঁদার জন্য জমীদারী বন্ধক দেয় তখন কি তারা মরতে হবে মনে আনে, আর পুরোহিতঠাকুর যখন যজমানের শ্রাদ্ধের ষোড়শ লয়ে টানাটানি করেন তখন কি ব্রাহ্মণ নিজের শ্রাদ্ধের কথা ভাবেন? কিন্তু এরাও মলে মরতে পারে, যমের যদি এত গরজ তবে একে একে সবাইকে নিতে পারে, তা বলে আমায়ও যে মরতে হবে তার মানে কি? এই কোটী কোটী মনুষ্য, অসংখ্য অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলকে যদি মরতে হয়, দলে দলে পালে পালে সবাই যদি মৃত্যুর কবলে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি এই ভয়ানক ভিড়ের ভিতর থেকে, এই বিষম গোলমালের মাঝ থেকে একলাটী পাশ কাটিয়ে সরে থাকতে পারবোনা?—আমার জন্যই যে যম চোখ চেয়ে বসে আছে এমনতো আর নয়, তা সে বুঝবে, যম বুঝবে, আমার কত আশা, কত অভিলাষ, কত ভোগের পিপাসা, ভদ্রলোক একটা মানুষের মনের কথা বুঝবে, অত নজর করবেনা। মোদ্দাৎ তুমি আর মরার কথা তুল' না, একশবার ঐ কথা নিয়ে তোলাপাড়া কল্লে কার উপর দৃষ্টি পড়তে কার উপর পড়ে যাবে। ঐ মরার কথাটা ছেড়ে দিয়ে কি বলছিলে বল। লোকটা কে? রাজু দে—কৈ ভাল চিন্তে পাচ্ছি না যে; কোথায় বাড়ী, কি জাতি, কেমন লোক, কি করতো?—বেশী বর্ণনার ছটা চালাওতো এখন থাক, কাছারির বেলা হলো, ওবেলা এসে শোনা যাবে—যদি বাসায় মক্কেলের ভিড় না হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চন্দ্রোদয়* ।

উদিল শারদ শশী অমিত প্রভায়,
বেষ্টিত তারকাগণে সচিব সহায়,
বিছায়ি ভুবন'পরে জোছনা বিতান
অনেক সহস্রকরে শোভে দীপ্তিমান।
যেমন বিরাজে হংস স্বচ্ছ সরোবরে
যেমন বিরাজে সিংহ গিরীন্দ্র কন্দরে,
যেমন বিরাজে বীর সমর সঙ্গরে,
বিরাজিলা চন্দ্র তথা সুনিল অম্বরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* চন্দ্রশ্চ সাচিব্যমিবাস্থ কুর্ব্বন্
তারাগণৈ র্মধ্যগতো বিরাজন্
জ্যোৎস্না বিতানেন বিচিত্য লোকান্
অভ্যুত্থিতানেক সহস্র রশ্মিঃ
হংসো যথা রাজতি পুষ্করস্থঃ
সিংহো যথা রাজতি কন্দরস্থো
বীরো যথা রাজতি সঙ্গরস্থো
ররাজ চন্দ্রোঽপি তথাম্বরস্থঃ।

রামায়ণ।

এক না অনেক ?

বারোয়ারিতলায় হাতীর সং বাহির হইয়াছিল। করিবরের পদচতুষ্টয় পেণ্টেলুনে মণ্ডিত, প্রকাণ্ড শুণ্ড পেণ্টেলুনে আবৃত, সে বিপুল দেহ বিরাট অঙ্গরক্ষণীতে আচ্ছাদিত। দেহগৌরবে হস্তী চিরদিন মর্য্যাদাশালী, সুতরাং তাহার পেণ্টেলুনের বাড়া-বাড়ি দেখিয়া আমার মনে প্রীতির সঞ্চার হইবারই কথা। কিন্তু তাহার কামিজ সম্বন্ধে নিদারুণ দৈন্য দর্শনে আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছিল। হায়, যাহার এতগুলি পেণ্টেলুন তাহার গাত্রে একটী বই কমিজ ছিল না! করিবর সমগ্র মেলা পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্ময়পূলকিত মানব সন্তানগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উল্লাসধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। করিবর এইরূপে সমগ্র মেলা পর্য্যটন করিলেন। আমি কিন্তু এতক্ষণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই। অবশেষে তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ;—ও হরি! এই কি সেই হাতী? এই যে আমাদের বামা, শ্যামা, মাধো, সেধে আরও কে কে! চারিজন মনুষ্য চারি খানি পা, একজন লোক শুণ্ড, আর চারি জন মনুষ্য উদর, বক্ষ, পৃষ্ঠ মস্তক ইত্যাদি। এই আমাদের হস্তী, এই হস্তী দেখিবার জন্য এত উল্লাস এত ব্যগ্রভাব। আমাতে আর এই হস্তীতে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই, ইহার হস্তিত্ব কেবল বাহ্যাকারেই পর্য্যবসিত। ইহা দর্শন করিয়া আমার মনে জীবদেহের গঠণপ্রণালীর কথা সহসা জাগিয়া উঠিল। কতকগুলি প্রাণি-শরীর মিলিয়া যেমন এই হস্তীর দেহ গঠিত হইয়াছিল, মানব, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় প্রাণিগণের দেহও সেইরূপ কতকগুলি জীবদেহের সমবায়ে সংগঠিত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

আমরা সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, জীব-দেহ চর্ম্ম, মাংস, অস্থি-মজ্জা, রস প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এক খণ্ড চর্ম্ম এক খণ্ড অস্থি, এক খণ্ড মাংস দেখিলে আমরা অতি সহজেই সেগুলি চিনিয়া লইতে পারি। কিন্তু অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন আকারের শরীর-উপাদানের গঠণপদ্ধতির মূলে কি চমৎকার সামঞ্জস্য কি বিস্ময়কর বৈষম্যহীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। জীব-দেহের বিভিন্ন আকারের সমস্তগুলি পদার্থই কেবল কতকগুলি সজীব কোষ (cell) এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ দ্বারা গঠিত।

কোষগুলি কি? প্রটোপ্লেজম্ একপ্রকার অর্দ্ধতরল অর্দ্ধকঠিন পদার্থ, দেখিতে ঠিক জেলির ন্যায়। জীবশরীর এবং উদ্ভিদদেহস্থিত কোষ সমষ্টি ভিন্ন অন্যত্র এই পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়ণিক বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া দ্বারা ইহার উপাদান স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত উপাদানগুলি সমষ্টিকৃত করিয়া ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অদ্যাপি স্থির করিতে সমর্থ হন নাই। এই প্রটোপ্লেজম্ই জীব-দেহ গঠণের মূলপদার্থ। কোষগুলি এই পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। প্রটোপ্লেজম্ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন হইয়া সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত থাকে, এবং অস্থি, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি শরীর-উপাদানগুলি গঠণ করে। প্রত্যেক কোষই সজীব সুতরাং এক একটী কোষকে এক একটী কীট বলা যাইতে পারে। কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ কি? যে পদার্থ দুই কোষের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ বলা যায়। ইহারা কোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। এবং প্রত্যেক কোষের বহির্দ্দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কোষ সমূহের চাপে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ স্থলেই সূত্রবৎ। কোষের বহির্দ্দেশ হইতে বহুবার ক্ষরিত হইয়া বহুবিধ

সূত্র প্রস্তুত হয় এবং সূত্রগুচ্ছবৎ, কোষ-মধ্যবর্ত্তী-স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত কোষ-মধ্যবর্ত্তী-স্থানসমূহে অবিরাম রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, এবং রক্ত হইতে নানাবিধ পদার্থ কোষ মধ্যবর্ত্তী পদার্থে সংযোজিত হইতেছে। এই সমস্ত বাহ্যপদার্থ লিপ্ত হওয়াতে কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ স্থানবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া শারীরিক উপাদানগুলিকে স্থূল দৃষ্টিতে পথক্ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাণিগণের অস্থি কেমন কঠিন এবং শুভ্র, চর্ম্ম কেমন দৃঢ় অথচ নরম, মাংস কেমন স্থূল এবং কোমল! ইহার কারণ আছে। রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ম ফস্ফেট্ নামক একটী পদার্থ রহিয়াছে উহা দেখিতে চূণের ন্যায়। এই পদার্থ একত্র করিয়া চাপ দিলে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে। রক্তস্থিত এই পদার্থ কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থে অণুপরমাণুক্রমে সংযোজিত হইয়া অস্থির কাঠিন্য এবং শুভ্রতা বিধান করিতেছে। যে কোষ-সমূহে চর্ম্ম নির্ম্মিত হয়, উহাদের মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃঢ় সূত্রবৎ, এবং উহাদের মধ্যে কিরাটীন নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। এই জন্যই চর্ম্ম দৃঢ় এবং নরম। কিন্তু মাংসের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-সূত্রগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং কোমল হওয়াতে প্রাণিগণের মাংস ঈদৃশ স্থূল ও কোমল হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ কোষ ও কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থই শরীর গঠণের মূল উপাদান। যে শরীরে কোষের সংখ্যা যত অধিক, সেই জীব তত বৃহৎ। হস্তীর শরীরে অশ্ব অপেক্ষা অধিকতর কোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই হেতু হস্তীর আকার অশ্ব অপেক্ষা বৃহৎ। আবার অশ্বে কুক্কুর-শরীর অপেক্ষা অধিক কোষ বিদ্যমান, এই জন্যই অশ্ব কুক্কুর অপেক্ষা বৃহৎ। যত ক্ষুদ্র প্রাণী ততই কোষের সংখ্যা অল্প। কোষের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইয়া, আমরা অবশেষে এমন একটী আনুবীক্ষণিক প্রাণী দেখিতে পাই, যাহার দেহ কেবল একটীমাত্র কোষদ্বারা গঠিত। এই প্রাণীকে বৈজ্ঞানিকগণ "এমিবা"

নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাণীর শারীরিক ক্রিয়া বহুকোষ সমন্বিত প্রাণীশরীরের এক একটী কোষের শারীরিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুরূপ। জন্ম, আহার, বংশবৃদ্ধি এবং মৃত্যু কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই। এমিবা জলে সঞ্চরণ করে, জীবদেহের কোষপুঞ্জও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ। যে সমস্ত স্থানের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ কঠিন এবং সূত্রবৎ, সেই সকল স্থানের কোষশ্রেণী কঠিন এবং সূত্রবৎ কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থে বেষ্টিত ও আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বন্ধন বশতঃ স্থানান্তরিত হইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভ্রমণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। শোণিতের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ তরল, এ নিমিত্ত শোণিতস্থিত কোষগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে।

এমিবা জলে সঞ্চরণ করিবার সময়ে, নিকটস্থিত শরীরপোষণোপযোগী পদার্থ শরীরের ভিতরে লইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে; দেহস্থিত কোষগুলিও রক্ত হইতে শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। আমাদের ভুক্ত দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়; শোণিতের মধ্যেই কোষগণের খাদ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, কোষগণেরই পুষ্টি রক্ষার্থ আমরা আহার করি। শ্বাস-বায়ু ইহাদেরই পোষণের জন্য অবিশ্রান্ত রক্তশোধন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বলা বাহুল্য, রক্তসঞ্চালনকারী হৃদ্‌পিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, এবং পাকযন্ত্র, ইহারাও কোষপুঞ্জ এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত এবং রক্তদ্বারা পুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছে।

প্রাণীগণের শরীর, জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সেদিন আমরা উপেন বাবুকে ক্ষুদ্র বালকটী দেখিয়াছি; আজ তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে বালকেরা কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টাকে

দেখিবে অর্থাৎ হাতীটাই দেখিবে কি আমাদের উপেন বাবুর প্রকাণ্ড দেহটিই অবলোকন করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। ইহারও কারণ প্রাণিদেহের কোষসমষ্টি। কোষগুলির একটী দুইটীতে বিভক্ত হয়, দুইটী চারিটিতে বিভক্ত হয়, চারিটি আটটিতে বিভক্ত হয়; এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ দ্বিগুণিত হইয়া থাকে। জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত কোষসমূহের সংখ্যা এইরূপে বর্দ্ধিত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদেহও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই প্রকারে ক্ষুদ্রকায় শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বলিষ্ঠকায় যুবকরূপে পরিণত হয়। এমিবা নামক এক-কোষ-বিশিষ্ট প্রাণীর সংখ্যাও এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং এই পদ্ধতিতেই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, জীবদেহ এমিবা জাতীয় কতকগুলি কোষ অর্থাৎ কীটের দ্বারা গঠিত। এই যে কাণ্ডদেহ এই যে কুসুম-কোমল-লাবণ্য-শোভিত সুকুমার কলেবর, ইহার সমস্তই কীট রাশিতে পরিপূর্ণ, সমস্তই পুঞ্জীকৃত কীট! নরনারীর দেহে কীট, মুখে কীট, সর্ব্ব শরীরে পোকা কিল্‌-বিল্‌ করিতেছে!

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রাম বা শ্যামকে কিম্বা অশ্ব অথবা হস্তীকে একটি প্রাণী বলিতে আমাদের অধিকার আছে কি না? রামের মৃত্যু হইল; তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইয়াছে, শ্বাসযন্ত্র বায়ু আকর্ষণ করিতেছে না, এবং বক্ষঃগহ্বরস্থ বায়ু নির্গত হইতেছে না, স্নায়ুমণ্ডল নিশ্চেষ্ট ও বোধশক্তিরহিত হইয়াছে, সঞ্চলনশক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, শরীর শীতল হইয়া গিয়াছে এবং দেহখানি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভূপতিত রহিয়াছে দেখিয়া তুমি বলিবে রাম মরিয়াছে। তুমি সেই অবস্থাতেই তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিবে। কিন্তু যখন প্রাণিগণের দেহের কার্য্য রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনও তাহাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে প্রাণশূন্য হয় না, তখনও শরীর

গঠণকারী-কোষসমুদায় জীবিত থাকে। প্রাণীর মৃত্যু হইলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বহু কোষ তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় বটে, কিন্তু তখনও অধিকাংশ কোষই জীবিত থাকে এবং আহার বিহারাদি কার্য্যে সমর্থ থাকে। হৃদপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যন্ত্রনিচয় নিষ্ক্রিয় থাকা নিবন্ধন কোষদিগের খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব হয়। খাদ্যাভাব হইলে কাজে কাজেই কোষসমূহ ক্রমে জীবনহীন হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোষগণ কখন জীবনহীন হইয়া পড়িবে তাহার কোন অবধারিত সময় নাই। যখন পচনক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে জীবদেহস্থিত কোষপুঞ্জের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, যে যে স্থান পচিয়া যাইতেছে, সেই সেই স্থানের কোষগণ প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। যখন জীবদেহ সম্পূর্ণরূপ পচিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে, দেহটি সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন হইয়াছে। অতএব আমরা জীবদেহের ক্রিয়াবিকারজনিত মৃত্যুকে জীবের দৈহিক মৃত্যু, এবং কোষসমূহের মরণজনিত মৃত্যুকে আনবিক মৃত্যু নামে অভিহিত করিতে পারি।

জীবদেহগঠণকারী কোষ এবং কোষময় জীব, উভয়েই প্রাণী। এক একটি কোষের স্বাধীনবৃত্তি থাকিলেও, তাহারা কোষময় জীবের মস্তিষ্কের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। একজন সাহেব যখন মনে করে যে, তাঁহার একখানি ভ্রমরকৃষ্ণপাদুকাশোভিত অমলশ্বেতস্ফটীক ধবলচরণ উর্দ্ধে তুলিয়া কোনও কৃষ্ণাঙ্গের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে হইবে, অমনি তাঁহার পদগঠণকারী কোষশ্রেণী উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, এবং পর মুহূর্ত্তেই প্রবল বেগে কালা আদমীর পৃষ্ঠদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কৃষ্ণাঙ্গ যখন ইচ্ছা করেন যে তাঁহার দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া সবলে সাহেবের মুখমণ্ডলে পতিত হউক, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তগঠণকারী কোষসমূহ আকুঞ্চিত ও দৃঢ় হইয়া সাহেবের

নাসায় প্রবল বিক্রমে পতিত হয়। মস্তিষ্কই যাবতীয় প্রাণীর ইচ্ছা এবং শারীরিক ক্রিয়াসমূহের মূল কারণ। মস্তিষ্ক সেনাপতি, কোষগণ সেনাসমূহ। কোষসৈন্যগণ মস্তিষ্কসেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া দলে দলে যুগপৎ পরিচালিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, মস্তিষ্কই আমাদের জ্ঞান এবং মানসিক বৃত্তিনিচয়ের মূলাধার। জ্ঞান এবং বৃত্তিনিচয়ের গুণে কোষসমষ্টিগঠিতপ্রাণী, একটি কোষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির উন্নত জীব। দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই কোষময় জীবদেহে জীবাত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই জীবাত্মার আদেশে মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ফলতঃ মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুমণ্ডল সমস্ত শরীরে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং এই স্নায়ুমণ্ডল মস্তিষ্কের আজ্ঞাবহন করিয়া স্থানবিশেষের কোষসমষ্টিকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে। মস্তিষ্কও সজীব কোষসমূহ এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ দ্বারা গঠিত।

অতএব কোন প্রাণীকে আর "একটি প্রাণী" বলা চলে না। যাহাকে একটি প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সেই প্রাণিটী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সমষ্টি। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর একত্র সমবায়ে একটি উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এক একটি প্রাণীকে প্রাণিপুঞ্জ বলা যাইতে পারে।

শ্রীহেমন্তনাথ মহলানবীশ।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা মৃজাপুরের অন্তর্গত খারিয়র গ্রাম। এই গ্রামে একটি অতি পুরাতন মস্‌জিদ্ ভগ্ন অবস্থায় বিরাজিত আছে। এই মসজিদের নির্ম্মাতা কে, তৎসম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে;—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ্ একরাত্রের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মস্‌জিদের নির্ম্মাণপ্রণালী, ইষ্টকোপরি ক্ষোদিত লতা-পাতা ও ঝাড় এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের অজ্ঞতাই ঐরূপ অদ্ভুত প্রবাদের মূল বলিয়া অনুমিত হয়।

খারিয়রের মস্‌জিদ্।

এই মস্‌জিদের দৈর্ঘ্য ৪৬, বিস্তার ৩২ এবং বারান্দার ছাদের উচ্চতা ২৪ ফিট। পূর্ব্বে ইহার উচ্চতা আরও বেশি ছিল। অভ্যন্তর ভাগ বর্গক্ষেত্রাকার, ইহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ২০ ফিট। দেয়ালের ভিৎ ৬ ফিটের কম নহে। ইহাতে এখনও আটটি স্তম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের বেড় অন্যূন ১৬ ফিট হইবে। মস্‌জিদের ভিত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। নিম্নভাগ হইতে ৭ ফিট উর্দ্ধে ৬½ ইঞ্চ বিস্তারের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত আর একটি বন্ধনী আছে। অভ্যন্তর ভাগের ছাদ একটিমাত্র গুম্বজ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল তাহা এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বারান্দার ছাদে তিনটি গুম্বজ; দুই পার্শ্বের দুইটির কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মধ্যভাগের গুম্বজটি এখনও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল ইষ্টকের গাত্রে নানা প্রকার ফুল, লতা, পাতা ও ঝাড় ক্ষোদিত আছে।

মস্‌জিদের নিকটেই একটি ইষ্টক নির্ম্মিত আস্তানা আছে। লোকে ইহাকে বড়খাঁ-গাজিসাহেবের আস্তানা কহিয়া থাকে। গ্রামবাসী জনসাধারণ পীরসাহেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। গ্রামবাসী একজন লোকের মুখে পীরসাহেবের অমানুষীশক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প শুনিলাম।

গাজিসাহেবের আস্তানায় দুইখানি আরবী অক্ষর ক্ষোদিত প্রস্তর বসান আছে। গ্রামবাসী লোকের মুখে শুনিলাম, প্রস্তর দুইখানি মস্‌জিদে লাগান ছিল। মস্‌জিদ্ হইতে তাহা পড়িয়া গেলে পীরের আস্তানার খাদেম (সেবাইত) আস্তানার গাত্রে প্রস্তর দুইখানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি আমার প্রিয় বন্ধু বোন্‌হা নিবাসী মুন্সী মহম্মদ এহশান সাহেব পড়িয়া দিয়াছেন। ছোট খানি এখানে কেহ পড়িতে পারে নাই। প্রস্তর দুইখানির লিপি উদ্ধার হইলে তাহা হইতে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নিরাকৃত হইবার সম্ভাবনা।

কথিত মুন্সিসাহেব বড় প্রস্তর লিপিখানি পাঠ করিয়া তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

"নবি (প্ররিত পুরুষ) বলিয়াছেন, নবী আল্লা হইতে ও মস্‌জিদ্ নবী হইতে হইয়াছে। আল্লা নবী ও মস্‌জিদ্‌কে আমাদিগের স্বর্গের জন্য মৌজুদ করিয়াছেন।

এই মস্‌জিদ্ সৈয়দ সুলতান আশরফ হোশেইনীর পুত্র সুলতানশ্রেষ্ঠ সংসারকে ছায়াদানকারী জয়শীল নরপতি হোশেনশাহের (ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসন ও রাজ্যকে চিরকাল স্থায়ী রাখুন) রাজত্বকালে ৯০০ হিজরীতে গওশখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল।"

মস্‌জিদের নিকটস্থ আস্তানা সম্ভবতঃ গওশখাঁর সমাধি এইরূপ অনুমান করা যায়।

মুর্শিদাবাদজেলার গ্রামে গ্রামে বহু ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রহিয়াছে।

খারিয়রগ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে "শেখের দীঘি"। এই দীঘির দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল ও বিস্তার ½ মাইল। দীঘি খননের সন তারিখ ইত্যাদি সম্বলিত একখানি প্রস্তর-লিপি ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ পাড়ে ছিল। উহা এক্ষণে এসিয়াটিক মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই দীঘিটি হোসেন-সাহ খনন করিয়াছিলেন।

খারিয়র গ্রামের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে চাঁদপাড়া গ্রাম। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর সৈয়দ-আলাউদ্দিন-হোশেনশাহ এই গ্রামে স্বীয় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাহমানীরাজ্য সংস্থাপয়িতা হোশেনশাহ-বাহমনী সম্বন্ধে যেরূপ কিম্বদন্তী ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে, চাঁদপাড়া অঞ্চলে গৌড়েশ্বর হোসেনসাহ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল প্রবাদ হইতে সত্য মিথ্যা নিরাকরণ করা দুরূহ।

কথিত আছে, হোশেনসাহ স্বীয় বাল্যপ্রভু চাঁদঠাকুরকে চাঁদপাড়া গ্রাম একআনা মাত্র রাজস্ব ধার্য্যে প্রদান করিয়াছিলেন; তদনুযায়ী গ্রামের নাম "একআনা চাঁদ পাড়া" হয়। আজিও লোকে "চাঁদপাড়া" শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "এক আনা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

যাহাহউক, চাঁদপাড়া গ্রাম যে পূর্ব্বে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রামের ধ্বংশপ্রাপ্ত বহুল অট্টালিকা রাশিকৃত ইষ্টক স্তূপ প্রভৃতিই তাহার সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

খারিয়র গ্রামের দুইক্রোশ দক্ষিণে স্বনাম প্রসিদ্ধ "সাগরদীঘি"। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১½ মাইল এবং বিস্তারও অন্যূন ১ মাইল হইবে। "বিক্রমপুরের প্রাচীনকীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় "রামপাল দীঘি" সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সাগরদীঘি সম্বন্ধেও তদনুরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং উক্ত প্রবাদ হইতেই, দীঘির নাম সাগরদীঘি হইয়াছে, সাধারণের

এইরূপ বিশ্বাস। উক্ত প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না জানি না। বোধ হয় দীঘিটি বৃহদাকার বলিয়া উহার নাম সাগরদীঘি হইয়াছে। এই দীঘি প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা মহীপাল খনন করিয়াছিলেন।

কলেশ্বরের শিব-মন্দির

বীরভূমজেলার অধীন রামপুরহাটমহকুমার অন্তর্গত কলেশ্বর-গ্রাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। উহার দক্ষিণে, অনতিদূরে একটী প্রাচীন শিব-মন্দির আছে। মন্দিরটী, পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে, ও বামপার্শ্বে দক্ষিণাভিমুখে আরও দুইটী ক্ষুদ্র-ইষ্টকালয় আছে। মধ্যস্থলে এক অনতি বৃহৎ প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ; ও দক্ষিণে এক অতি সুন্দর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর তীরে, অনেকগুলি তালবৃক্ষ শ্রেণী-বদ্ধ-রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বিগত বৎসর বৈশাখ মাসে, আমার এক বন্ধুর বিবাহ হয়। বিবাহ যে গ্রামে হইয়াছে, তাহা কলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী; এবং আমাদের গ্রাম হইতে তথায় যাইতে হইলে কলেশ্বর-মন্দিরের নিকট দিয়াই যাইতে হয়। বিবাহের দিন অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় আমাদের বরযাত্রিক-দল, বিশ্রামার্থ ও শিব-সন্দর্শন-মানসে, উক্ত মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হ'ন। কিন্তু তৎকালে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, এজন্য সকলকেই তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

মন্দিরের সম্মুখদিকে এক উচ্চ, সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত বারাণ্ডা; এবং উঠান হইতে বারাণ্ডায় উঠিবার জন্য প্রশস্ত সোপানাবলী রহিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেও দুইটী বারাণ্ডা আছে;

কিন্তু সে দুইটীর বিস্তার, সম্মুখস্থ বারাণ্ডার বিস্তার অপেক্ষা অনেক অল্প।

আমরা বারাণ্ডায় না উঠিয়া, সর্ব্বপ্রথম সোপানেই বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে একজন পাণ্ডা; আরও জানিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা বার, এবং মন্দির-মধ্যস্থ শিব-লিঙ্গ, কলেশ্বর নামে অভিহিত। সে আমাদের নাম ও বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়াই বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি মন্দিরের দরজা খুলিয়া দিতেছি।" তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, আমরা বারাণ্ডায় উঠিলাম। তখন সে মন্দিরের সম্মুখস্থ দরজা খুলিয়া দিল। আমরা দরজার নিকটে গিয়া দেখি যে, সেস্থান হইতে মন্দিরের মেজে প্রায় ৮।১০ হাত নীচে; এবং মেজে নামিবার জন্য কতকগুলি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া, মেজে নামিলাম। নামিয়া দেখিলাম যে, মেজের ঠিক মধ্যস্থলে একটী শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শিব-লিঙ্গটী, মেজে হইতে সওয়া হাত উচ্চ এবং প্রায় একহাত পরিধি-বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। সমীপস্থ পাণ্ডার মুখে অবগত হইলাম, যে প্রত্যহ দিবাভাগে পাঁচ পোয়া পরিমিত আতপান্নের ও সন্ধ্যার সময় পাঁচসের করিয়া দুগ্ধের ভোগ হইয়া থাকে। এই "ভোগ" পাণ্ডাদিগকে দিতে হয়, এজন্য বৎসরে এক মাস করিয়া তাহাদের পালা আছে। পূজাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া যিনি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি পাণ্ডাদিগকে একশত চুয়াল্লিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে লোকটী মন্দির পরিস্কারাদি কার্য্য করে; এবং যে একটা লোক প্রাতে ও সন্ধ্যাবেলায় ঢাক বাজায়, তাহাদেরও প্রত্যেকের তিন বিঘা করিয়া দেবোত্তর-জমি আছে।

মন্দিরের মেজেটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু দেওয়ালের অনেক স্থানের চূণ খসিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকেও দুইটী দরজা, এবং মেজে হইতে দরজা পর্য্যন্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ি সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু দরজা দুইটীর অবস্থা এতদূর খারাপ যে সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দরজাগুলির কবাট, চৌকাট অতি সুন্দর। সমস্ত শালকাষ্ঠে নির্ম্মিত; এবং বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত। প্রত্যেক কবাটের উচ্চতা প্রায় ৫।৬ হাত, বিস্তৃত অন্যূন দুই হাত হইবে। এই তিনটী দরজা ভিন্ন মন্দিরের মধ্যে আলোক প্রবেশের অন্য কোনও উপায় নাই; তাহাতে আবার দুইটী দরজাও একরূপ অকর্ম্মণ্য। এজন্য মন্দিরমধ্যে দিনেও প্রায় অন্ধকার। আমরা যে সময়ে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং শীঘ্রই আমাদিগকে মন্দিরের বাহিরে আসিতে হইল।

তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই; কিন্তু রৌদ্র ফুরাইয়া গিয়াছে। কেবল মন্দিরের চূড়াদেশ ও তালবৃক্ষের অগ্রভাগগুলি, অস্ত-গমনোন্মুখ-সূর্য্যের হেমাভ-কিরণে এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সেই সময়ে মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা হইল। দেখিলাম যে মন্দিরটী ৬০।৭০ হাত উচ্চ; এবং দৈর্ঘ্যে ৩০।৪০ হাত, ও প্রস্থে ২০।২৫ হাত হইবে। যেরূপ ইষ্টকে গাঁথান হইয়াছিল, তাহা ১১ ইঞ্চ দীর্ঘ; এবং ৫॥০ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ৩৫০ ইঞ্চ বেধ-বিশিষ্ট। পূর্ব্বে যে বারাণ্ডার কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপরেও তদনুরূপ আর তিনটী বারাণ্ডা; বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভের উপর সংরক্ষিত; এবং মন্দিরের উত্তরদিকে, তথায় উঠিবার নিমিত্ত তিনহাত প্রশস্ত সোপানাবলী। সোপানারোহণ করিয়া, মন্দির-সংলগ্ন সেই

অত্যুচ্চ বারাণ্ডায় উঠিলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে, মন্দির নির্ম্মাতা শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

সম্মুখস্থ বারাণ্ডার উভয় পার্শ্বে, পরস্পর সম্মুখীনভবে (অর্থাৎ একটি উত্তরাভিমুখে ও অপরটা দক্ষিণাভিমুখে) দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির, এবং প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী করিয়া শিব-লিঙ্গ সংস্থাপিত রহিয়াছে। মুল মন্দিরটী সেই স্থান হইতেই ক্রমশঃ চূড়াকৃতি ধারণ করিয়াছে, এবং উহার গায়ে চুঁণের দ্বারা গঠিত নানাবিধ বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল সংলগ্ন হইয়া আছে। অপর দুইটা বারাণ্ডায় এ সমস্ত কিছুই নাই বটে; কিন্তু বারাণ্ডাগুলির প্রান্তভাগে যে ইষ্টকনির্ম্মিত কার্ণিশ ছিল তাহা যে অত্যন্ত মনোহর ধ্বংশাবশেষ দেখিয়াও একথা বেশ বুঝা যাইতেছে। শুনিলাম যে, সাধারণ লোকেই বলে, ঐ সম্মুখস্থ বারাণ্ডা-সংযুক্ত কানিশের ঠিক মধ্যস্থলে, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামজীবনের নাম খোদিত ছিল; এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।"* কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও এক কথা এই যে, কলেশ্বরের পাণ্ডারা যে সমস্ত দেবোত্তর জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহার একখানি অতি জীর্ণ দানপত্র আছে। তাহাতেও নাটোরাধিপতি † রাজা রামজীবনের নামোল্লেখ দেখা যায়। অতএব কলেশ্বর মন্দিরের সহিত যে রাজা রামজীবনের অতি নিকট সম্বন্ধ ইহা নিতান্ত মিথ্যা কথা নহে। নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবন যে কত বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও একথা বলিতে পারা যায় যে, একশত বৎসর মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন না। সুতরাং

* কলেশ্বর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে।
† নাটোর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

কলেশ্বর মন্দির যে একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর মন্দিরটী যে প্রাচীন তাহা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও ফাটিয়া গিয়াছে। এমন কি, যদি আর কিছুদিন মন্দিরটী অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে একবারে ভূমিসাৎ হওয়াই সম্ভব।

মন্দিরের সম্মুখে যে ভগ্নপ্রায় গৃহটী আছে তাহা ১০৷১১ হাত দীর্ঘ, ৫৷৬ হাত প্রশস্ত ও ৮৷৯ হাত উচ্চ হইবে। ঘরের জানালা বা দরজা কিছুই নাই; কেবল একটী উপর দিকে খিলানকরা প্রবেশ পথ আছে মাত্র। বামপার্শ্বে যে গৃহ আছে, তাহাও আকৃতিতে ঠিক ঐ প্রকার; তবে তাহার আরও ভগ্নাবস্থা। পূর্ব্বোক্ত গৃহে একখানি পাষাণে খোদিত দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি আছে; শেষোক্ত গৃহে সেরূপ কিছুই নাই। পূর্ব্বেই যে বটবৃক্ষের কথা বলিয়াছি তাহার নিকটে রাশি রাশি ইষ্টক পড়িয়া আছে; ইহাতে বোধ হয় যে, মন্দিরের নির্ম্মাণ-কালে উক্ত বৃক্ষের মূল-দেশ ইষ্টকদ্বারা বাঁধান হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে সহসা গভীর শব্দে কাঁসর-ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিয়া মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন আমরাও মন্দিরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় উঠিয়া নীরবে আরতি প্রভৃতি দর্শন ও শিব-বন্দনাদি শ্রবণ করিয়া ভক্তি-পুলকিত চিত্তে তথায় আভূমি প্রণত হইলাম। তদনন্তর রাত্রি প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তৃষিতের আবাহন।

শুষ্ককণ্ঠে, পিপাসায় হ'য়ে উর্দ্ধমুখ
চেয়ে আছে বিশ্ব-প্রাণ একান্ত উন্মুখ
আকাশের পানে।

কোথা, কোথা বারিধারা ?
আজি ধরা কাঁপিতেছে সুখ-শান্তিহারা
অসহ উত্তাপে।

ওই অসীম অম্বরে
বাস্পাকারে বারিরাশি আছে থরে থরে
অদৃশ্য সাগর সম। তাহে, এ তিয়াস
মেটেনা, মেটেনা কভু।

প্রতপ্ত নিশ্বাস,
কণ্ঠাগতপ্রাণ এই ক্ষিতি-বক্ষ হ'তে
উঠি'ছে প্রবলবেগে ;—সমীরণ-স্রোতে
কাঁপি'ছে প্রকৃতি আজি প্রলয়ের কোলে।
কোথায় জীবন-ধারা ? গগনের তলে
এস, এস কৃষ্ণ মেঘ ধীর গরজনে ;—
স্নিগ্ধ কর এ জগতী সফল বর্ষণে।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

সামযিক কথা।

পুণার হিন্দু-বিধবা-আশ্রম।

কয়েক বৎসর হইল পুণায় একটি হিন্দু-বিধবা-আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সমস্ত উচ্চবংশীয় হিন্দু বিধবাগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, তাহাদিগকে এই আশ্রমে রাখিয়া জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী মোটামুটী বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। পুণাসহরবাসী মহাত্মা ভাণ্ডারকার প্রমুখ অনেক মহোদয় ইহার পৃষ্ঠ-পোষক ও পরিচালক। এতদ্ব্যতীত মিসেস্ রানাড়ে, মিসেস্ তিলক প্রভৃতি অনেক শিক্ষিতা রমণী ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

এ আশ্রমে বিধবাগণ চারি প্রকার নিয়মে প্রবিষ্ট হইতে পান :—

(১) যাঁহাদিগের অভিভাবকগণ সমস্ত খরচ বহন করেন।

(২) যাঁহাদিগের অভিভাবক কেবল পরিচ্ছদ ও খুচরা-খরচ দেন।

(৩) যাঁহারা কোন প্রকার বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

(৪) আশ্রম যাঁহাদিগের সমস্ত ভার বহন করেন।

আশ্রমের যাবতীয় গার্হস্থ্য কর্ম্ম আশ্রমবাসী বিধবাগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অল্পবয়স্কারা এই ভাবে গৃহকর্ম্মে সুপটু হয়। জাঁতা পরিচালন ও পেসন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম শারীরিক সামর্থ অনুযায়ী ইহাঁদিগকে দৈনিক অর্দ্ধ-ঘণ্টার অনধিক কাল পর্য্যন্ত করিতে হয়। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে পাছে পড়া শুনার ব্যাঘাত হয় সেই জন্য সমস্ত দিনের মধ্যে দেড়ঘণ্টা কাল ঐ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সকলকে পালা করিয়া কাজ করিতে হয়।

ইহাঁদিগের দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। শয্যাত্যাগের জন্য প্রাতে সাড়েপাঁচটা হইতে সাড়েছয়টার মধ্যে তিনবার ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। বয়স্থাদিগকে ছয়টার পূর্ব্বে এবং অল্পবয়স্কাগণকে সাড়েছয়টার মধ্যে গাত্রোত্থান করিতে হয়। ঠিক সাড়েছয়টার সময় সকলে পালা অনুসারে সাংসারিক কর্ম্ম আরম্ভ করেন। স্নানাদি সমাপ্ত হইলে পাঁচ মিনিট কাল ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। কেহ কেহ

তুলসী-পত্র পূজা করেন, কেহ বা ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। তাহার পর দুই ঘ
পড়াশুনা হয়। দশটার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ে। এগারটার সময় স্কুল আর
হয়। আরম্ভে পনর-মিনিট কাল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে ; অনেক সময়
গীতা হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হয় এবং তদ্বিষয়ক আলোচনা
হইতে থাকে। যাঁহাদিগের পক্ষে গীতা-পাঠ শক্ত এমন অল্পবয়স্কাদিগকে কেবল
গীতার শ্লোক মুখস্থ করিতে দেওয়া হয়। ইহার পরে স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়
প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্কুল বন্ধ হয়। বৈকালে যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক কার্য্য
একটু-আধটু ভ্রমণের পর, ছয়টার সময় আবার সান্ধ্য-ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। রাত্রি
সাড়েসাতটার সময় পুস্তকাদি পাঠ আরম্ভ হয়। পাঠ শেষ হইলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা
নৈতিক গান গীত হইয়া থাকে। বয়স্থারা একটু অধিক রাত্রে শয়ন করেন এবং
তাঁহাদিগকে প্রতিরাত্রে নয়টার সময় একবার স্কুল "হলে" যাইতে হয়—সেখানে এক-
কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী গীত হইতে থাকে। দশটার সময় শয্যা-গ্রহণের নিয়ম।
ইহাঁদের কাহাকেও পারিবারিক আচার নিয়ম প্রতিপালনে বাধা দেওয়া হয় না।
উচ্চ ও নিম্ন জাতি বলিয়া এখানে কোন বিচার নাই। কেবল আহারের সময় তাহা
লক্ষ্য করা হয়—ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন পংক্তিতে উপবেশন করেন। সকলের জন্যেই
এক প্রকার আহারীয় প্রস্তুত হয়।

ইহাঁদিগকে প্রথম বৎসরে একটু-আধটু লিখিতে পড়িতে এবং সমান্য অঙ্ক-বিদ্যা
শেখান হয়। মারাঠী চতুর্থ-ভাগ পড়িতে পারিলে তবে কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল ও
ইংরাজী পড়ান হয়। ইতিহাস ও ভূগোল মানচিত্রের সাহায্যে মুখে মুখে শিক্ষা
দেওয়া হইয়া থাকে। সকলকেই ইংরাজী পড়িতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।
চতুর্থ-ভাগ শেষ হইলে ইংরাজি-উচ্চ-শিক্ষার উপযোগী পুস্তক পড়ান হয়। কিন্তু ভাষা
এবং গণিত শিক্ষার উপরই সমধিক দৃষ্টি রাখা হয়। এ সকলের সঙ্গে সূচী-কার্য্যও
শিক্ষা করিতে হয়। এ আশ্রমে নিয়ম আছে, সকলকেই নিজের পরিধেয় জামা
নিজেকেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই আশ্রমের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায়, যে গত বৎসর
ঐ আশ্রমে ৩৮ জন প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। আয়-ব্যয়ের-হিসাব তালিকায় দেখা গেল,
মোট আয় ৬৯৮২৯ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯১৮৮ টাকা। দুই এক বৎসরের মধ্যে
এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন এ আশ্রমের স্কুল ও বাস-বাটী নির্ম্মিত

য়াছে। চারিজন বিদুষী রমণী এই আশ্রমের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম
রিতেছেন। অনেকেও অর্থ সাহায্যে বিশেষ উপকার করিতেছেন।
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত অনেক হিন্দু-বিধবার ইহাতে উপকার হইবে আশা
য়া যায়। ইতিমধ্যে আশ্রম হইতে প্রায় কুড়িজন বিধবা স্বোপার্জ্জনে জীবিকা
র্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকেই শিক্ষকতা এবং ধাত্রীর
র্য্য করিতেছেন। এবং এখন আশ্রমে আরো পনর জন এমন শিক্ষিতা রমণী
াছেন যাঁহারাও উপার্জ্জনক্ষম।

গ্রন্থসমালোচনা।

অহল্যা বাই—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

অহল্যার জীবনে আলো ও ছায়ার তারতম্য বড় সুতীব্র। অজ্ঞাতনামা আনন্দরাও পল্লীপাঠশালায় কুমারী অহল্যার অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবিকার সংস্থান ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কে জানিত, প্রবল প্রতাপান্বিত মল্‌হররাও-হোলকার সেই অখ্যাত পল্লীতে শিবির স্থাপন করিয়া গ্রামপরিদর্শনচ্ছলে স্বীয় একমাত্র পুত্র খণ্ডেজির জন্য অহল্যা-বাইকে বধূরূপে মনোনীত করিয়া আসিবেন? এই ঘটনা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য, যেহেতু অহল্যা সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন না, তিনি শ্যামাঙ্গী ও কৃশদেহা ছিলেন, থাকিবার মধ্যে তাঁহার সুশ্যামমুখে একটি অখণ্ড পুণ্যের দীপ্তি প্রতিভাত ছিল, সেই দীপ্তি মল্‌হররাও-হোলকারকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই বিবাহ এরূপ অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব ছিল, যে অহল্যার পিতা আনন্দরাও হর্ষোচ্ছ্বাসে এই উপলক্ষে তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অহল্যাকে ভগবান্ সুখের জন্য সৃষ্টি করেন নাই, একবার সুখের উত্তুঙ্গশীর্ষে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় দুঃখের গহ্বরে নিক্ষেপ করিবেন, এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অহল্যা বিধবা হন; খণ্ডেজি কুম্ভেরীদুর্গ অবরোধকালে নিহত হইলেন, অহল্যা একটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়া রাজপ্রাসাদে ভিখারিণী সাজিলেন; তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মল্‌হররাওর কাতরোক্তিতে তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন।

স্বামীর অভাবে রাজপ্রাসাদ আর পর্ণকুটীর উভয়ই হিন্দুরমণীর নিকট তুল্য। কিন্তু অহল্যার পতিবিয়োগই চূড়ান্তকষ্টের কারণ হয় নাই,—ইহার অব্যবহিত পরেই মল্‌হররাও প্রাণত্যাগ করেন, এবং অহল্যার দুর্বৃত্ত পুত্র সিংহাসনে আসীন হইয়া নানাপ্রকারে মাতার মনঃপীড়ার কারণ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে সেই পুত্রটিও অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কন্যা মুক্তাসুন্দরী বিধবা হইয়া সহমৃতা

হইলেন, সুতরাং অহল্যার জীবনে সুখের কিছুই রহিল না। অন্য কোন রমণী হইলে এই শোকসাগরে ভাসিয়া যাইতেন; অহল্যা এই দুঃসহ শোকরাশিকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর হস্তে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য অরাজক দেখিয়া বহুব্যক্তি পাপ অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণার্থ বিপুলবাহিনী লইয়া ইন্দোরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অহল্যা সমস্ত রাজন্যবর্গকে সাহায্যার্থ আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিষম শোককে হৃদয় হইতে কিছুকালের জন্য অপসারিত করিয়া—শত্রুকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার শোকপাণ্ডুর মুখমণ্ডল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ক্ষণতরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন অহল্যা পুত্রশোকাতুরা অসহায়া বিধবা—তাঁহারা দেখিলেন তদবস্থায়ও অহল্যার কৃশ ও শোকশিথিল মুষ্ট উদ্যত হইয়া দৃঢ়ভাবে বল্লম ধরিতে কুণ্ঠিত নহে। যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই অসুরঘাতিনী এবং এই জন্যই অহল্যাকে তদ্দেশবাসীরা মূর্ত্তিমতী ভগবতী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

অহল্যা নামের সঙ্গে অন্নপূর্ণা ভাবটিই অধিকতর উদিত হয়,—তাহা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ভারতের এমন প্রসিদ্ধ তীর্থ নাই যে স্থানে অহল্যার অকাতর রত্নমুষ্টি বর্ষিত হয় নাই, সন্তানহারা মাতাকে জগতের সন্তানেরা আপনার করিয়া লইয়াছিল। যেখানে দুঃখীর কাতরোক্তি বা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়িত, অহল্যার পরদুঃখ-কাতরহৃদয় সেই দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত। তাঁহার মত দানশীলা রমণী এদেশে ঐতিহাসিকযুগে বিরল, তাঁহার মত নিষ্ঠা ও পবিত্রতা, অল্প রমণীই দেখাইতে পারিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা এই ছিল—যিনি পূজামন্দিরে ও অতিথি-শালায় দেবীরূপিণী তিনি কর্ম্মশালা বা রণক্ষেত্রে হইতে সুদূরে ছিলেন না—কর্ত্তব্যের আহ্বান যে দিক হইতে আসিত সেই দিকেই তিনি সাড়া দিতেন। কোন সময়, তিনি পূজার ফুল চন্দনার্দ্র করিয়া ভক্তিভরে ইষ্টদেবের চরণে স্থাপন-যোগ্য করিতেছেন, কখন বা আতুর ও দুঃখীকে সন্তানবৎ পালন করিতেছেন, কখন বা রাজসভায় মন্ত্রীদের বিচারশক্তিকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় সূক্ষ্ম অথচ সরল রাজনীতির পরিচয় দিতেছেন, কখনও বা যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইতেছেন। এই কর্ম্মশালায় তিনি বিশ্রাম প্রার্থনা করেন নাই, শোকদুঃখের আগুণে পুড়িয়া তাঁহার চরিত্র কষিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পুণ্যবতী রমণীর জীবনচরিত লিখিয়া যোগীন্দ্র বাবু আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দ্রৌপদী—শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত।

আধুনিক কবিগণের পেলব-কোমল পদাবলীর ভিতর অনেক সময় কোনও রূপ ফলপ্রাপ্তির ভরসা না পাইয়া পাঠকগণ কাব্যশাস্ত্রের প্রতিই কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কবিতা-পুস্তক হাতে পাইলেই ভাবেন, ইহার মধ্যে কতকগুলি ফুলপল্লব ও তারার বর্ণনা আছে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, জগদীশ্বরী দেবীর "দ্রৌপদী" সেই ধরণের কাব্য নহে। ইহাতে "ক্রোধবিস্ফূর্জ্জিত তাড়িত-প্রবাহ", "সহস্র-কর-বিধৃত-কলস-আবর্জ্জিত", "মৌঞ্জীর আখ্যাত" প্রভৃতি কথা আছে। পুস্তকখানি অভিধান দেখিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং পাঠ শেষে এই সমাসকণ্টকিত কাব্য-রাজ্য হইতে ফুলপেলবের বনে যাইবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না হইয়া যাইবে না; ফলপ্রাপ্তি না হইলেও সেখানে ফুল-পত্রের অভাব নাই, কিন্তু এ যে বেহদ্দ কাঁটার বন! গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্য-শালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধনশালার ভারগ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে—সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মহানাটক।

তৃতীয় অঙ্ক।

সীতা-সহ রামচন্দ্র কিছুদিন ভোগ-সুখ
সম্ভোগ করিলে যথোচিত,
অন্ধমুনি "শ্রবণে"র ভীষণ সে শাপ-কাল
ক্রমে আসি' হল উপস্থিত।
সহস্র-কিরণ-মালি সূর্য্যদেব অকস্মাৎ
ম্লান প্রভা করিল ধারণ;
মহা-অনর্থের হেতু সুপ্রচণ্ড উল্কাপিণ্ড
নভ-হতে হইল পতন;
ভূতধাত্রী বসুমতী থর থর বিকম্পিত,
দিগ্-ভাগ ধূসর-বরণ;
দিবসে বহুল তারা উদয় হইল নভে,
অসময়ে সূর্য্যের গ্রহণ;
রক্তময়ী বিন্দুবৃষ্টি, মধ্যাহ্নে কাকের ডাক,
কুক্কুরের ক্রন্দনের ধ্বনি;
চারিদিকে ফেরু-পাল বিচরিছে, মুহুর্মুহু
ঘোষে' ঘোর প্রলয়-অশনি॥
ইতি মধ্যে দশরথ রামের সুনীতি রাশি
করিয়া দর্শন,
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে তাঁহারে এবে,
হল তাঁর মন॥

সুমন্ত্র।—(বহির্নিসৃত হইয়া নাগরিকদিগের প্রতি)।

বার্দ্ধক্য হেরিয়া নিজ, আর রামে মনে করি'
রাজ্যভার বহনে সুক্ষম,

অভিষেক-মহোৎসব আদেশি' কহিল রাজা,

—আনন্দ করহ পুরজন !

রাম-অভিষেকে যত তরুণীর দল
প্রমত্ত উল্লাস-ভরে হইল বিহ্বল ;
তাহাদের বক্ষ-হতে স্খলিত হইয়া হেমঘট,
সোপান-উপরে পড়ি বাজি উঠে ঠঠং ঠঠং ঠট্ ॥

কৈকেয়ী।—(স্বগত) কি অনর্থ উপস্থিত ! (পরে রাজার নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে)।

মহারাজের জয় হোক্ !

দশরথ।—কৈকেয়ি ! এই খানে এসো।

কৈকেয়ী—(সভামধ্যে আসিয়া)।

রাজন্ ! রাজ্য-অভিষেক-হতে হওগো বিরত ;
নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলে এ নহে সঙ্গত :—
ভূ-পুত্রী যাহার পত্নী —শোনোগো নৃপতি !—
সে রাম কেমনে বল হইবে ভূপতি ?

তাছাড়া—এই বধূ সীতাই যত অমঙ্গলের হেতু। কেন না, এঁর আগমনের পর হতেই, পদে পদে মহোৎপাৎ-সকল দেখা যাচ্চে ; ওকে দূর করে দেও, আর আমাকে পূর্ব্ব-স্বীকৃত দুইটি বর প্রদান কর। প্রথম—সীতা ও লক্ষণের সহিত রামের বন-প্রয়াণ, দ্বিতীয়—ভরতের চক্রবর্ত্তিত্বে অভিষেক।

দশরথ।—হা রামচন্দ্র ! প্রাণাধিক্-প্রাণ ! তোমার উপর একি বিপদ উপস্থিত হল ! তোমার পত্নী ভূ-পুত্রী, তথাপি পৃথিবী-পরিগ্রহণ তোমার পক্ষে অনুচিত মনে করে', কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে নিবারণ করচেন। (মূর্চ্ছিত)।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) মহারাজেরও দেখছি এই অভিপ্রায় ; এখন তবে আমি স্বয়ং গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

(প্রস্থান।)

(রামের নিকটে আসিয়া)

শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক ! আমি আপনার ভৃত্য সুমন্ত্র, আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

বাসবের সখা সেই জরাগ্রস্ত রাজা দশরথ,
তব হস্তে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পিতে হইলে উদ্যত,
মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান করে যত পুরবাসী সবে,
কলাবতী বারাঙ্গণা মত্ত নৃত্য-গীতের উৎসবে ;
কৈকেয়ী শুনিয়া তাহা হয়ে উপনীত,
মাগিলেন দুটি বর পুরব-স্বীকৃত :—
অবলম্বি' বন্যবৃত্তি, শিরে ধরি' জটারাশি,
সীতা ও অনুজ-সহ হোক রাম বনবাসী
চউদ্দ-বৎসর।

সমুন্নত রাজ্য এই— সর্ব্ব-অনুচর-সাথে—
হউক বিন্যস্ত, মোর পুত্র ভরতের হাতে
—মাগি এই বর ॥

নৃপতি এ নিরদয় বচন শুনিয়া,
পড়িলেন ভূমিতলে বিহ্বল হইয়া ॥

এখন আপনার যেরূপ অভিপ্রায়। (সুমন্ত্রের প্রস্থান)

রাম।—(লক্ষণের প্রতি) ভাই লক্ষণ ! তুমি ততক্ষণ তোমার ভ্রাতৃ-জায়াকে নিয়ে অগ্রসর হও, আমি পিতাকে প্রণাম করে' এখনি আসচি।

পিতা দশরথে নমি', মাতৃগণে করিয়া প্রণাম,
মৈথিলী-লক্ষণ-সহ রাম বনে করেন প্রস্থান ॥
দেখিলেন সীতা যবে— বনে যাইতেছে রাম
পিতার আজ্ঞায়,
তিনিও যাবেন বলি' গেলেন শ্বশ্রূর কাছে,
লইতে বিদায়।

প্রথমে কৌশল্যা-পদে তার পর সুমিত্রার
পদযুগে করিয়া প্রণাম ;
পরে, শুক সারিকা, ও পিককুলে সম্বোধিয়া,
—রাম-সনে করিলা প্রস্থান ॥

কৌশল্যা।—(সীতার প্রতি)

জানকি বাছাটি মোর ! পালিয়াছ শিশুকালে,
বধূজন-উচিত নিয়ম ;
যৌবনে যেতেছ বনে, চরম বয়সে তুমি,
না জানিগো হইবে কেমন ॥

সুমিত্রা।—(লক্ষণ প্রতি)

দশরথ বলি' রামে করিবেক জ্ঞান,
ভাবিও সীতারে তুমি আমার সমান।
অযোধ্যা বলিয়া ভেবো অরণ্য-ভবন,
যথাসুখে এবে পুত্র করহ গমন ॥

(রামের প্রতি)

বালিকা জনক-সুতা, সুকুমার তোমরা দুজনে,
দক্ষিণের দিগ্বিভাগ পরিপূর্ণ নিশাচরগণে ;
তাই বৎস স্নেহভরে বারম্বার করি তোমা মানা
—নীতিতে সুদক্ষ তুমি —সে দক্ষিণে যেওনা যেওনা ॥
তোমারে মিনতি করি —মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর
রাম তুমি আমার ভবনে ;
কি জানি সহসা যদি পরিবর্ত্ত হয় সেই
উনমত্ত বৃদ্ধের বচনে ॥

পৌরগণ।—

যার নবগুণ গ্রাম সেই রাম ত্যজিলে এই নগরে,
হইল সজ্জনগণ নিমগন তরুণ-শোক-সাগরে ;
সপর্ব্বত ধরাতল টলমল তবু না টলে কৈকেয়ী,
কুলিশ বড়িশ প্রায় হায় হায় নারী-হৃদয় নিশ্চয়ি ॥

তিন চারি পদ গিয়া পুর-পরিসর-মাঝে
শিরীষ-কোমলা সীতা
সদ্য-শ্রান্ত শ্রমে,
বলিতে লাগিল রামে "আর কত দূর ?"—তাহে
প্রথমাশ্রু দেখা দিল
রামের নয়নে ॥

রাম।—(ধরণীর প্রতি)

অরুণ-দল-অঙ্গুলী চরণ-পঙ্কজ স্নিগ্ধ
চলিতে চলিতে সদ্য
হতেছে স্খলিত ;
পৃথ্বি ! তব কন্যা ইনি, ত্যজ নিজ কঠিনতা
যে স্থলে করেন সীতা
চরণ স্থাপিত।

জননি অবনি ওগো ! করহ শ্রবণ
—অরণ্যে জানকী আজি করেন গমন।

পথিক-বধূরা পথে সাদরে করিলে প্রশ্ন
"কুবলয়-দল-শ্যাম
কে ইনি তোমার ঠাকুরাণি"?
স্মিত-বিকসিত-গণ্ড, লজ্জায়-বিশ্রান্ত-নেত্র,
সীতা কহিলেন স্পষ্ট
"ইনি মোর পূজ্যপাদ স্বামী"।

"মৃদু-মৃদু চল' ওগো ভূমিতল কুশাঙ্কুর-ময় ;
বস্ত্রাঞ্চল দেও মাথে, ভানুতাপ খর অতিশয়।"
এইরূপে বধূগণ পথিমধ্যে ভাসি' অশ্রুনীরে
দিল উপদেশ, আর দেখিতে লাগিল জানকীরে।
প্রথম-পথিক এই রামচন্দ্র আজি এ কাননে,
অনুসরি' পদ তাঁর একা চলে সীতা তাঁর সনে।

দিগ্‌দিগন্ত পর্য্যটিয়া পথ-কষ্ট কিছু নাহি গণি'
চলে সীতা রাম-সাথে,
নবোদিত ইন্দু-সাথে ক্ষীণ-কান্তি যেমতি রোহিণী।

রাম।—(সীতার প্রতি)

সম্মুখে প্রস্তর-খণ্ড সারি সারি—কর পরিহার,
হেথায় কণ্টকী-লতা, আর কুশ-বনের বিস্তার ;
তাই বলি, ওগো দেবি, এ অরণ্য-স্থানে
উঠায়ে-উঠায়ে পা চল' সাবধানে।
বাঁকাইয়া গ্রীবাদেশ নত কর মাথা,
মস্তক-উপরে দেখ প্রসারিত লতা।
সম্মুখে দেখগো, এক মাতঙ্গ বিচরে,
এই খানে থামো দেবী ক্ষণেকের তরে।
যাহা চিন্তা করি মনে —হেথা হতে দূরে চলি যায় ;
মনেও না ভাবি যাহা —আসে তাহা সহসা হেথায়।
যে আমি বসিব প্রাতে বসুধার রাজ-সিংহাসনে,
জটিল তপস্বী হয়ে সেই আমি যাই কিনা বনে !

সুমন্ত্র।—(রামের অনুগমন করিয়া, পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দশরথের প্রতি)

আপনার কথা-মত রাজ্য ত্যাগ করি' অবিলম্বে
গেলা বনে রঘুবীর সীতা ও লক্ষণে লয়ে সঙ্গে।
পৃষ্ঠে তূণ, হস্তে আর ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ
রাম-ভদ্র-সাথে চলি' গিয়াছেন অনুজ লক্ষণ।

দশরথ।—অভিষেক-তরে আমি আহবান করিনু যাহারে
তারে কি না অবশেষে পাঠাইনু বনের মাঝারে।
আকারে বিকৃতি তার কি হল না জানি,
নারিনু করিতে লক্ষ্য কিছু মাত্র আমি।
হৃদয় হইতে বৎস করনি গমন,
সর্ব্বদিকে তোমারেই করি নিরীক্ষণ।

গিয়াছ চলিয়া বৎস করি অনুমান,
সন্তাপ-অনলে তাই দহে এই প্রাণ।
বনে গিয়াছেন রাম —সুমন্ত্রের মুখ-হতে শুনি',
শাপ-কাল সমাগত দশরথ মনে মনে গণি',
"হা রাঘব"—এই মাত্র উচ্চারণ করি' এক বার,
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি' তার পর না ফেলিল আর।

পৌরজন।—সূর্য্যকুলে জন্ম যার, ভূপালের অগ্রগণ্য,
দশরথ পিতা ;
সত্যপরায়ণা সতী অকপট প্রণয়িনী
যাহার সে সীতা ;
লক্ষণ অনুজ যার, বাহুবলে যার কেহ
নাহিক সমান ;
স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণু —বিধি হতে বিড়ম্বিত
হল সেই রাম ;
কি বিচিত্র, অন্য জনে যদি বিড়ম্বনা করে
বিধি হয়ে বাম।
স্বয়ং নারায়ণ বর, কন্যা নিজে লক্ষ্মী ভগবতী ;
ঘটক কৌশিক মুনি ; পুরোহিত বশিষ্ঠ সুমতি ;
শ্রীজনক কন্যাদাতা ; দান-কালে, একাদশ
রাশি-'পরে ছিল গ্রহগণ ;
কি কহিব হত-বিধি কি তোর ভবিতব্যতা
—রামো বনে করিল গমন !

মন্ত্রিগণ-আনীত ভরত ও কৈকেয়ী।

ভরত।—বল মা, কোথায় পিতা করিলা গমন ?
কৈকেয়ী।—গিয়াছেন, সুরপতি ইন্দ্রের ভবন।
ভরত।—কি হেতু গেলেন হায় তিনি স্বর্গলোকে ?
কৈকেয়ী।—স্বর্গধামে গিয়াছেন তিনি পুত্র-শোকে।

ভরত।—চার পুত্র মাঝে তাঁর, কোনটি বল' সে ?
কৈকেয়ী।—শোনো বলি—তুমি যার অনুজ বয়সে।
ভরত।—কি হল তাঁহার শীঘ্র বল মা আমায়।
কৈকেয়ী।—গিয়াছে চলিয়া সে যে অরণ্যসীমায়।
ভরত।—কেন, কেন ? কি কারণে ?
কৈকেয়ী। —রাজার আজ্ঞায়।
ভরত।—তিনি কি যাইতে বনে বলেন তাঁহায় ?
কৈকেয়ী।—বচনে আবদ্ধ হয়ে আমার নিকট।
ভরত।—কি ফল হইল লাভ, কহ মোরে ঝট্।
কৈকেয়ী।—ভরত! হইলে তুমি ধরণীর নাথ;
ভরত।—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! একি বজ্রপাত!
(স্বগত)

এই নীচাশয়া নারী হইয়াও সদ্বংশ-জাত,
খল ক্রূর অতিশয়— ব্যবহারে রাক্ষসীর মত;
রসাল-শোভিত বনে সুভীষণ বিষবল্লী-প্রায়
কেন গো কেকয়-সুতা আবির্ভূতা হইল হেথায় ?
গুরুজন-পাদপদ্মে ভক্তি-ভরে সদা যাঁর
মস্তক নোয়ায়,
যাঁর চারু রাজবেশ, বিশ্বজন আনন্দিত
হ'ত হেরি' যাঁয়,
অভিরাম সেই রামে মুনিবেশ পরাইল
কইকেয়ী হায়!

(শ্রীরাম-সমীপে ভরতের যাত্রা।)

মাল্য-সম পিতৃ-আজ্ঞা ধরি' নিজ-মস্তক উপরে
শ্রীরাম গেলেন বনে; তাঁর প্রতি গাঢ় ভক্তিভরে
লক্ষণো করিল ত্যাগ মাতা-সহ আত্মীয় স্বজনে।
ভরত।—তব সাথে—শোনো আর্য্য— থাকিব আমিও এই বনে;
লক্ষণ সে শিশু অতি— সে তোমায় সেবিবে কেমনে ?

আর শোনো, নৃপতিও সন্তাপিত হয়ে তব শোকে
ইহলীলা সম্বরিয়া গিয়াছেন চলি' স্বর্গলোকে।

শ্রীরাম।—(ভরতের প্রতি)

পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ হেরিবে নয়নে,
না করিবে লোভ কভু অপরের ধনে;
কোরো না মর্য্যাদাভঙ্গ শিষ্টাচার করিয়া লঙ্ঘন,
নীচ জন-প্রতি যেন ক্ষণমাত্র নাহি যায় মন;
রিপুগণ-প্রতি শৌর্য্য বিপদেতে ধৈর্য্য, আর
বিনয় সম্পদে,
—এই সাধুজন-মার্গ অনুসরি' চোলো ভাই
তুমি পদে পদে।
সজ্জন-সঙ্গম-বাঞ্ছা, পরগুণে অনুরাগ,
নম্রভাব গুরুজন-প্রতি;
বিদ্যায় আসক্তি দৃঢ়, লোক-অপবাদ-ভয়,
নিজপত্নী-পরে সদা রতি;
ভকতি ঈশ্বর-পদে, আত্ম-সংযমে বল,
দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহার;
—এ সব নির্ম্মল গুণ যাঁহার্তে বসতি করে
তাঁরে আমি করি নমস্কার।
"নর-সাধারণ এই ধর্ম্ম-সেতু সর্ব্বকালে করিবে রক্ষণ"
—নমি' নমি' পুনঃ পুনঃ, যাচে রাম ভাবী নৃপগণের সদন॥
ভরত।—হায় হায় জননী-গো! প্রজ্জ্বলিত হুতাশন
যত-ইচ্ছা দহুক আমায়;
বজ্র, শৈল, অসি, বাণ আঘাত করুক মোরে
—সে সমস্ত সহিব হেলায়;
কিন্তু না সহিতে পারি শ্রীরামচন্দ্রের এই
পাদপদ্ম-বিয়োগ-ব্যথায়।

রাম।—শোনো বলি, বনবাস — না করে ব্যথিত মোরে তত
—অথবা সে প্রেয়সীর — পাদপদ্ম-যুগলের ক্ষত—
যতটা ব্যথিত আমি — সেই পিতৃ-বান্ধব-প্রিয়জন
রামানুজ ভরতের — হেরি' রাজ্যে অরুচি ভীষণ॥

শিরে ধরি' জটাজাল, — বল্কল করিয়া পরিধান,
ভরত সীতার পদে — সাষ্টাঙ্গে করিলা প্রণাম।
ভরতেরে দেখি' সীতা — কাঁদিয়া উটিল তারস্বরে,
বিহঙ্গ-সঙ্কুল-তরু — বিকম্পিত উদ্বেগের ভরে।
শৈলেন্দ্র সে চিত্রকূট — সেও এবে হইয়া বিহ্বল
শত-প্রস্রবণ-ধারে — বরষিল নয়নাশ্রুজল।

শোনো বলি, তুমি আর্য্য, — রাজ্য কর অলঙ্কৃত,
আমি এ অরণ্য-বাস করিনু স্বীকার ;
পিতৃ-আজ্ঞা পালনের — ব্রতফল আমা হতে
করহ গ্রহণ তুমি, মোরে দিয়ে ভার।
—এইরূপ কহিলেও — রাম যবে নিজ রাজ্যে
ফিরিবারে না করিল মন
তখন ভরত, লয়ে — রামের পাদুকা-যুগ
অযোধ্যায় করিল গমন।
রামের পাদুকাযুগে — অভিষিক্ত করি' যথোচিত
ভরত আপন পুরী — নন্দীগ্রামে হইল উপনীত।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকি' রাম-আগমন
ভরত করেন এবে বসুধা পালন।
দেখিয়া আশ্রম দেশ, — চিত্রকূট-ভূমি ত্যজি'
চিরকাল তরে,
বিরাধেরে বধি' হেথা, — অগস্ত্যের কথা শুনি'
রাম অতঃপরে

পঞ্চবটী-বনভূমে করিয়া গমন
করিলেন তথা নিজ বসতি স্থাপন।
দণ্ডক-অরণ্য-স্থিত — তরুণ ময়ূর যত
* সশম্প জলদ বলি'
রামচন্দ্রে করি' অনুমান,
সুচারু-কলাপ-রাজি — কাঁপাইয়া ঘন ঘন
করিতে লাগিল নৃত্য
হর্ষভরে তারা অবিরাম।
রামের প্রেরিত হয়ে — অনুজ লক্ষণ যবে
স্বর্ণ-বর্ণ কর্ণিকার ফুল
আনিলা বিপিন-হতে — —করিলেন সীতা তারে
আপন ভূষণ কর্ণ-দুল।

সীতা।—(রামের প্রতি গমন সময়ে)।
তব পদ-রজ-মুক্ত — পাষাণ-গঠিত-দেহ
ধর্ম্মপত্নী অহল্যারে
লভিল গোতম।
বিন্ধ্যাদ্রি-প্রস্তরোপরি — বিচরিছ এবে নাথ,
আরো কত মুনি পাবে
কলত্র আপন।

(নদী দেখিয়া লক্ষণ নাবিককে আহ্বান করায় নাবিকের প্রবেশ।)

নাবিক।—(শ্রীরামের প্রতি)।
মানুষীকরণ রেণু — আছে ও-চরণযুগে
—সুপ্রসিদ্ধ এই কথা
সর্ব্বলোক-মাঝে।

---

* শম্পা = বিদ্যুৎ—সীতা বিদ্যুৎ-স্বরূপা।

ক্ষালন করিব আমি ও পদ-পঙ্কজ-তব,
কাষ্ঠ পাষানেতে প্রভু
কিবা ভেদ আছে ?
অহল্যা সে ভর্ত্তৃশাপে ধরিল পাষাণ-তনু ;
হয়তো এই তরীখানি
কোন মুনিপত্নী-শাপে এবে দারুময়ী।
তব পাদপদ্মস্পর্শ -অনুগ্রহ করি' লাভ
মানবী-তনুশ্রী নিজ—
করিবে ধারণ পুন এ তরী নিশ্চয়ি।

স্ত্রীমায়া বিস্তার করি' সূর্পনখা সমুদ্যত
চিত মোর করিতে হরণ।
—লক্ষণ বুঝিয়া ইহা তখনি নাসিকা তার
খড়্গ দিয়া করিল ছেদন।
রাবণ-ভগিনী সেই সূর্পনখা হইয়া কুপিত
খরদূষণাদি লয়ে পুন সেথা হল উপনীত।
করভ-দশন-রুচি স্মিতহাস্য ফুটিয়াছে
প্রেমভরে সীতার কপোলে ;
রঘুনাথ মুহূর্ত্তেক হেরি' সেই পুলকিত
উল্লসিত বদন কমলে,
নিশাচর-সৈন্যদের কোলাহল করিয়া শ্রবণ
নিজ জটাজুট-গ্রন্থি দৃঢ়রূপে করিলা বন্ধন।
চতুর্দ্দশ-সহস্রক প্রচণ্ড রাক্ষসগণে
এক বাণে সংহারিয়া শ্রীরাম সমরাঙ্গণে
ত্রিশিরা-রাক্ষস, খরে দুর্জয় দুষণে
—টঙ্কারিয়া ধনু, সবে বিনাশিলা রণে।
সীতারূপ হৃদ্যসুধা —সূর্পণখা-প্রমুখাৎ
করিয়া শ্রবণ
রাবণ ছলিতে রামে মারীচ-রাক্ষসে তথা
করিলা প্রেরণ।

মারীচ।—(স্বগত) যমদণ্ডের ন্যায় যাঁর দোর্দণ্ড, আর সমস্ত চণ্ডাংশু-বংশের যিনি আখণ্ডল স্বরূপ—তিনি সেই রামচন্দ্র। আর মহেন্দ্র-বিজয়ী এই লঙ্কেশ্বর। সুতরাং আজ আমার জীবন নিশ্চয়ই শমন-ভবনের অতিথি হবে।

মরিব রামের হাতে, রাবণেরো হাতে মোর,
জানিতেছি, মরণ নিশ্চয়।
উভয়েরি হাতে যদি —ললাট-লিপির বশে,—
আমাকে-গো মরিতেই হয়।
বরঞ্চ মরণ ভালো রাঘবের হাতে, তবু
রাবণের হাতে কভু নয়।

ভুঞ্জি স্বাদু ফলমূল কিছুকাল সেথা রাম
সীতা ও লক্ষণ সনে করিলে যাপন,
রাবণ-প্রেরিত এক কুরঙ্গ কনকময়
সহসা জনক-সুতা করিলা দর্শন।
"মৃগপতি-পরাক্রম তুমি যে গো প্রিয়তম
—অদ্ভুতাঙ্গ মৃগটিরে
দেও মোরে আনি।"
—জানকীর বাক্যে রাম লয়ে হস্তে ধনুর্ব্বাণ
স্বর্ণমৃগ পিছে ধায়
বাধা নাহি মানি'।

রাম।—দেখ ভাই লক্ষণ, আমি যতক্ষণ এই কনক কুরঙ্গকে হনন করে' না আসি, ততক্ষণ তুমি তোমার ভ্রাতৃ-জায়ার রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

এক হস্তে শর, আর অন্য হস্তে ধনু, রাম
করিয়া ধারণ,
লতা দিয়া বাঁধি জটা, করিতে লাগিলা বনে
মৃগ অন্বেষণ।
আসে মৃগ হস্ত-পাশে, চরিয়া বেড়ায় ঘাসে,
তবু তারে ছোঁয়া নাহি যায়।

থামে লভি' গুল্মলতা, আঘ্রাণিয়া কচি পাতা
পুনঃ পুনঃ চারি দিকে চায়।
যায় চলি যত্র-তত্র, শিঙে চুল্‌কায় গাত্র,
পলায় বা সুদূর দিগন্তে।
কভু বা দাঁড়ায়ে রয় কভু ছোটে বনময়
কভু বা সে অরণ্যের প্রান্তে।

সীতা।—মৃগ-অন্বেষণে নাথ বিলম্ব করেন কি কারণে?
এ ভীষণ বনভূমি পূর্ণ ক্রূর-নিশাচরগণে।
বারম্বার কহিতেছি, তবুও না যাও তুমি
জ্যেষ্ঠেরে খুঁজিতে;
কি আশ্চর্য্য হায় হায়! লক্ষণ, নাহি কি হয়
শঙ্কা তব চিতে?

ধনু-কোটি দিয়া আঁকি রেখা ভূমি-পরে,
রাখিয়া সীতারে সেই গণ্ডির ভিতরে,
পাদপদ্মাঙ্কিত সেই রাম-পদ করিয়া দর্শন
নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে চলিলেন সুমিত্রা-নন্দন।
স্বর্ণমৃগ-ছলনায় রামভদ্র অতি দূরে নীত
অনুজ লক্ষণ এবে তাঁর পিছে চলিলা ত্বরিত।
ভিক্ষু-বেশী রাবণ সে সুযোগ পাইয়া হেন কালে
ভয়ে ভয়ে সাবধানে পশে গিয়া সেই পর্ণশালে।
কি কষ্ট হা ধিক্ ধিক্! কহি এইরূপ
রাবণ গোপন করে আপনার রূপ।
রাম-পরিত্যক্ত বাণে প্রতিহত হ'ল যবে
কুরঙ্গ-হৃদয়,
মারীচ নামক রক্ষ তাহা হতে তৎক্ষণাৎ
হইল উদয়।
ভিক্ষুবেশী রাবণো সে রতন-কুণ্ডল-রাজি
স্বকপোলে করিয়া স্ফুরিত

কুম্ভকর্ণাগ্রজ সেই দশানন-মূর্ত্তি নিজ
ক্ষণমাত্রে করে প্রকটিত।
দিব্যবাণে যবে রাম হয়ে বদ্ধলক্ষ্য,
বিদ্ধ করিলেন সদ্য স্বর্ণমৃগ-বক্ষ,
ছদ্মবেশী ভিক্ষু সেই রাজা দশানন
সেই সে আশ্রম-দেশে করে আগমন।
"সূর্য্যকুল-অবতংশে! জনক-রাজর্ষি-বংশে
সাধ্বী বলি' তুমি গো প্রখ্যাত;
দেও মোরে ভিক্ষা সতি! —আমি যে ক্ষুধিত অতি"
—রাবণ কহিল এই মত।

সীতা কহিলেন:—
লও ভিক্ষা, করি দান এই নিরমালা-দাম
হরিপদরজ-বিমিশ্রিত;
সকল সৌভাগ্য-কেতু, সর্ব্ব-বাঞ্ছা সিদ্ধি-হেতু
জানিবে গো ইহারে নিশ্চিত।
(তুলসী প্রদর্শন)
কপট ভিক্ষুক ও গো! কটাক্ষ-ভঙ্গিতে তব
মনে হয়, আসিয়াছ
অন্বেষিতে অসতী ললনা।
ভিক্ষা দিতে সাধ্য নাই কৃতাঞ্জলি হয়ে তাই
কহিতেছি, কেন বৃথা
যাচিতেছ, কর মোরে ক্ষমা॥

রাবণ।—"হে ধর্ম্মিনি! দেও ওই নির্ম্মাল্য" "কহিলে রাবণ,
লক্ষণ-চিহ্নিত সেই রেখা, সীতা করিলা লঙ্ঘন;
অমনি রাবণ তাঁরে উঠাইল করতলোপরে;
রাম ও লক্ষণে সীতা ডাকিতে লাগিল সকাতরে।
বনে বনে করে রাম মৃগ অন্বেষণ
পিছে পিছে ধায় তার অনুজ লক্ষণ।

সীতা নীতা হল এবে' রক্ষপুরী লঙ্কাদ্বীপ পানে,
—ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রে জিনি' ইন্দ্রানীরে আনে যেই স্থানে।
কনক-বরণী সীতা হয়ে অতিশয় ভীতা
রামচন্দ্রে ডাকে সকাতরে।

কোথা হে রঘুনন্দন ত্রিলোক-জনবন্দন
রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে।

ওগো রাম রমণীয়! মহাবীর অদ্বিতীয়,
দেখা দেও, কর মোরে রক্ষা।

ওহে নাথ রঘুপতি আমি যে কাতর অতি,
কেন মোরে করিছ উপেক্ষা?

এইরূপে নানামত সীতাদেবী ভাষে'
দশানন লয়ে তারে উঠিল আকাশে।
স্থাপিত হইলে সতী রাবণের রথের উপর,
অঙ্গের ভূষণগুলি উন্মোচন করিয়া সত্বর
ফেলিলেন স্থানে স্থানে; —কোথাও বা নূপুর, কঙ্কণ,
কোথাও বা উত্তরীয়, কোথাও বা হার সুশোভন।

জটায়ু।—এদিকে শ্রীরামচন্দ্র হানিছেন মৃগোপরে
নিদারুণ বাণ;
অনুজ লক্ষণ বীর তিনিও তাঁহার পিছে
বনে ধাবমান;
ওদিকে জনক-সুতা ভিক্ষুকের করতলে
ভিক্ষা দেন আনি;
করি সঞ্চরণ ব্যোমে এ সমস্ত যুগপৎ
দেখিলাম আমি:—

মারীচ শীকারে ব্যগ্র রাম ও লক্ষণ বন-পথে
কেমনে এ হরিণাক্ষী আসিল গো রাবণের রথে।

রাবণ।—(জটায়ুকে আকাশ হইতে নাবিতে দেখিয়া)
একি গো মৈনাক-গিরি অব্যাহত মার্গ মোর
রোধিছে গগনে?

কোথায় শকতি তার? সে যে ডরে বাসবেরো
কুলিশ-পতনে!

গরুৎমান সেও ভালো জানে মোরে—তার সেই
প্রভুটির সনে।

হাঁ বুঝেছি জটায়ু এ জরাগ্রস্ত বিহঙ্গমপতি
মোর হাতে মরিবারে বাঞ্ছা এর হয়েছে সম্প্রতি।

জটায়ু।—(রাবণের প্রতি)

জন্ম তব ব্রহ্মকুলে, অর্চ্চণা করিলে হরে
নিজমুণ্ড করিয়া কর্ত্তন।
তোমার অসীম শক্তি —ওই তব বাহুদণ্ডে
বাসবেরে করিলে দলন।
কেলি-কন্দুকের-মত' হেলায় তুলিয়া তুমি
কৈলাস করিলা উৎপাটন।
তাই বলি, হে রাবণ লজ্জা কি হয় না তব?
—রাঘব-পত্নীরে তুমি
চোর-সম করিছ হরণ?

ব্রহ্মকুলে জন্ম তব তপশ্চর্য্যা অনুপম
অলৌকিক বীর্য্যের আধার।
ত্রিলোক-বিজয়ী তুমি, সুরাঙ্গনাদের স্বামী,
ঐশ্বর্য্য অহো কি অপার!
কি চাহ অধিক আর? সীতায় তুমি যে এবে
করিছ হরণ
—শোন্ ওরে পশুমতি! সবান্ধবে হবি তুই
সমূলে নিধন।

হে রাবণ অ-বিদুষ দোষ তব করিলাম ক্ষমা,
বীরপতি-রতা সীতা —ছাড়ো ওঁরে, করি এ প্রার্থনা।
জটায়ু আমার নাম, সখা মোর রাজা দশরথ,
তোমায় মিনতি করি, এই খানে রাখো তব রথ।

(জটায়ুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া রাবণ গমন করিলে)

পরদার-চোর ওরে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ধীরে ধীরে কোথা তুই করিস্ গমন ?
থাম্ ওরে থাম্ হেথা ; বাস যার মলয়াদ্রি-তটে
স্বয়ং জটায়ু সেই আসিয়াছে দ্যাখ্-রে নিকটে।
ছেড়েদে সীতারে তুই, নতুবা ও বক্ষ তব
প্রচণ্ড এ তুণ্ডে ছিঁড়ি
করি খান্ খান্,
তাহা হতে বিনিসৃত শোণিতের উষ্ণ ধারা
রক্তলুব্ধ গৃধ্রগণে
করাইব পান।

(সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ)

ভয় নাই বাছা সীতা, আমা-হতে দূরে যেতে
না পারিবে দুরাত্মা রাবণ,
দুর্বৃত্ত রাক্ষস ওরে ! রাঘব-পত্নীরে হরি'
কোথা তুই করিস্ গমন ?
চঞ্চুর প্রহারে, আমি —ধমনী সহিত—তোর
মুণ্ডগুলি করিয়া ছেদন।
নভস্তলে নিক্ষেপিয়া, যত দিক্‌পালগণে
উপহার করিব অর্পণ।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস ওরে ! হর-শির-অধিষ্ঠিতা
শশি-লেখা প্রায়
রাঘব-বধূ যে সীতা —তারে তুই চুরি করি'
যাস্‌রে কোথায় ?

গরুড় যেমতি সেই সুধাহারী নাগগণে
করিল নিধন
আমিও তেমতি তোর দীপ্তচূড়ামণি যুত
দশটি আনন
প্রখর নখরাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি', অদ্য
করিব ছেদন।
জানি তোমা দশানন ! প্রবল দোর্দণ্ডে ধ্রুব
উঠাইলে কৈলাস-পর্ব্বত।
সেই তুমি এবে কেন সীতারে সাগর-পারে
লয়ে যেতে হয়েছ উদ্যত ?
দিশি দিশি নিপতিত শরজাল হতে বুঝি
দূরে থাকিবার তরে
করেছ মানস ?
নির্লক্ষ্য-বাণযুদ্ধ নহেক তোমার যোগ্য,
সম্মুখ সমরে যুঝি'
দেখাও সাহস।

যুদ্ধ।

ভাঙে ধ্বজা, ভাঙে অক্ষ, ভাঙে যুগ, ভাঙে চক্র,
অশ্বগণে পক্ষি-রাজ নাশে'।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, টানাটানি করি' ধরে,
অপমান করে কটুভাষে।
কভু নীচে, কভু উর্দ্ধে মাতে' ঘোরতর যুদ্ধে,
পথরোধ করয়ে আকাশে।
রাবণ হইয়া ক্রুদ্ধ শিলাখণ্ড সম দৃঢ়,
চপেটা-আঘাত-এক করিয়া সবলে
পিষিলা বিহঙ্গরাজে ; স্বল্পপ্রাণ-অবশিষ্ট
জটায়ু সে নিপতিত হইয়া ভূতলে
—রাম ! রাম ! রাম ! রাম ! শুধু এই নাম,
মন্ত্র সম উচ্চারিল মুখে অবিরাম।

রথভঙ্গকারী সেই পক্ষিরাজে, রক্ষরাজ, হানি' এক চড়,
শ্বাসমাত্র-অবশেষ দেখি' তারে —বিলুণ্ঠিত ভূমির উপর,
সীতারে লইয়া শীঘ্র লঙ্কাপুরী করিয়া গমন,
অশোকের বনে তাঁরে সহরষে করিলা স্থাপন।

জটায়ুর।—দশরথ-সখা-ঋণ তিলমাত্র নারিনু শুধিতে;
রাবনের হস্ত হতে জানকীরে নারিনু রক্ষিতে;
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র না পারিনু করিতে দর্শন;
অকৃতী এ জটায়ুর ভাগ্যহীন বিফল জনম।

রাম।—একাকিনী জানকীরে রাখিয়া কুটীর-সীমায়,
আকুল হইয়া ভাই কেন তুমি, আসিলে হেথায়?

লক্ষণ।—আসিতে বিলম্ব তব হল' যবে বীর,
নারিনু থাকিতে শুনি'— কটূক্তি দেবীর।

মারীচ রাক্ষসে বধি' এক বাণে, কুটীরেতে ফিরি'
কি হইল রাঘবের পর্ণশালা সীতাশূন্য হেরি'?
মায়ামৃগ করি' বধ কুটীরে আসিয়া রাম
খোঁজেন সীতায়।
তিন কোণ শূন্য হেরি' নারিলা হেরিতে আর
চতুর্থ টী হায়।
মহাবীর শ্রীরামের বিক্রম কীর্ত্তন করি'
এ মহানাটক খানি রচিলা হনুমান।
শ্রীমধুসূদন মিশ্র রচিয়া তৃতীয় অঙ্ক,
"বৈদেহী-হরণ" এই দিল তার নাম।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা।

(৫)

সেকালে আরেবিয়া হইতে তাম্র, বোজোয়ার প্রস্তর, ছুরি, গোলাপজল, তুতিয়া, পশম-বস্ত্র, রক্তবস্ত্র, পারদ প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই কালিকাটে আমদানি হইত। বাণিজ্য-সম্বন্ধে মালাবার তীরে মুসলমানদিগের একাধিপত্য ছিল। তাহারা সর্ব্বদা ফিরিঙ্গি বণিকদিগের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। রাজার সহিত ভাস্কো-ডা-গামার বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের নিকট পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইল না।

রাজদরবারে পর্ত্তুগাল নাবিকের এত সম্মান,—তাহাদিগের উপর জামোরিণের এত অনুগ্রহ দেখিয়া, তাহারা বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিল। যখন তাহারা শুনিল, ফিরিঙ্গি বণিক শুধু কালিকাটে নয় মালাবার তীরে যত বন্দর ছিল সকল বন্দরেই তাহাদিগের ন্যায় বাণিজ্যের সমান অধিকারে অধিকারী হইয়াছে, তখন মুসলমান বণিক-সম্প্রদায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সীমা হইতে ফিরিঙ্গি-দিগকে যে কোন প্রকারে দূর করিবার চেষ্টায় তখন মুসলমানগণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

সে সময় সমুদ্রতীরে জলদস্যুভীতি অত্যন্ত প্রবল। দলে দলে জলদস্যু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীসংযোগে সমুদ্র মধ্যে এবং তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত; সুবিধা পাইলেই নিশ্চিন্ত বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণীসকল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত, —কাহাকেও বা হত্যা কাহাকেও বা গুরুতররূপে আহত করিত;—শেষে অগ্নিসংযোগে সেই সকল লুণ্ঠিত বাণিজ্যতরণী ভস্মসাৎ করিয়া

দিয়া অন্ধকারে সমুদ্রের ভিতর কোথায় লুকাইত তাহার সন্ধান হইতনা। ইহাতে যে কেবল বণিকদিগকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইত তাহা নহে, রাজকোষও ক্ষতিগ্রস্থ হইত॥

সেই সকল জলদস্যুদিগের সহিত অনেক সময় বণিকদিগের ও সিপাহীদিগের যুদ্ধ হইত। কিন্তু জলযুদ্ধে প্রায়ই দস্যুগণ বিজয় লাভ করিয়া বিজয়োল্লাসে বণিকদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিত। সময় বুঝিয়া মুসলমান বণিকগণ রাজঅমাত্যদিগের মধ্যে এই দস্যুভীতি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। অর্থে কিনা হয়*? অর্থবলে মুসলমান বণিক সম্প্রদায় রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে বুঝাইয়া দিল যে ফিরিঙ্গিরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে নাই—এদেশ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে; উহারা বণিক নহে—জলদস্যু—সাধারণ দস্যুদল অপেক্ষা সুসজ্জিত ও ভীতিপ্রদ!

দুঃভার্গ্যক্রমে ডা-গামার জাহাজ সাধারণভাবের ছিলনা—পোতমধ্যে কামান ছিল, গুলি-গোলা ছিল, অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। মুসলমানগণ এই সকল অর্ণবপোত ফিরিঙ্গিদিগের লুণ্ঠনব্যবসায়ের উপযোগী বলিয়া রাজঅমাত্যদিগের মতিভ্রম ঘটাইতে লাগিল! তাঁহারাও সন্দিগ্ধচিত্তে দেখিলেন, বণিকের সঙ্গে আবার এত অস্ত্র শস্ত্র কেন—এত কামান বারুদ কেন—এত যুদ্ধোপকরণইবা কেন? তখন ফিরিঙ্গিদিগের আচার ব্যবহার সবই যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহারা যেন মালাবারতীর লুণ্ঠন করিতেই আসিয়াছে। অমাত্যগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই জলদস্যু। ইহাদিগের অত্যাচারে হয়ত শীঘ্রই মালাবারের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,—বিদেশী বণিক

* They therefore bribed the ministers of the king to denounce the Portuguese Admiral as a piratical adventurer. D'orsay.

আর কেহ মালাবার তীরে আসিবেনা। তবেইত সর্ব্বনাশ! রাজকোষ পুষ্ট হইবে কেমন করিয়া? নানারূপ যুক্তি ও তর্কের পর শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে ফিরিঙ্গি, বণিকসম্প্রদায় নহে, দস্যুই নিশ্চিত—উহাদিগের তরণী বাণিজ্যের জন্য নহে—যুদ্ধের জন্য! সুতরাং উহাদিগকে বিতাড়িত করিতেই হইবে; কিন্তু তখন জামোরিণের আদেশে ফিরিঙ্গিগণ অবাধ-বাণিজ্য করিবার অধিকারী! রাজঅমাত্যগণ মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইয়া একটা উপায় নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; অর্থের জয় হইল!

এদিকে, ভাস্কো-ডা-গামা তখন পর্য্যন্তও এ সকল কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; জামোরিণের আদেশে তিনি প্রত্যুষে শিবিকা আরোহণে প্যান্ড্যারাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন,—প্যান্ড্যারাংএর সন্নিকটেই তাঁহার জাহাজগুলি বাঁধা ছিল। গামা শিবিকারোহণে ও সহচরগণ পদব্রজে যাইতেছিলেন। প্যান্ড্যারাংএ পৌঁছিতেই সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। ডা-গামা তখনই আপন জাহাজে যাইবার মানসে ভালির নিকটে নৌকা চাহিলেন কিন্তু তিনি গামার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিফল-মনোরথ ভাস্কো-ডা-গামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যদি এখনই নৌকা না দেন, তাহা হইলে আমি রাজার নিকটে যাইয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিতেছি। তাঁহারই আদেশ মত আমরা জাহাজে যাইতেছি জানিবেন।" বিরক্তির ভাব দেখিয়া রাজ-অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে সমুদ্রতীরাভি-মুখে লইয়া চলিল।

রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ইতিপূর্ব্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে সংবাদ দিবার জন্য গোপনে স্বদল হইতে তিন জনকে প্রেরণ করিলেন। ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল,—নৌকা আর মিলিল না; অগত্যা তাঁহারা একজন মুর নাগরিকের গৃহে আশ্রয় লইলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে কতকগুলি মুর সেইস্থানে আসিয়া উপনীত হইলে ডা-গামা তাহাদিগের নিকট তরণী চাহিলেন; তাহারা গোপনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া কহিল—"আপনি যদি আপনার জাহাজগুলি তীরের আরও নিকটে আনেন তবেই জাহাজে যাইতে পারিবেন।"

ভাস্কো। "যদি আমি এখন জাহাজগুলি নিকটে আনিবার আদেশ পাঠাই, তাহা হইলে আমার ভ্রাতা হয়ত মনে করিবেন, আপনারা আমাকে বন্দী করিয়া বলপূর্ব্বক এই আদেশ বাহির করিয়া লইয়াছেন। তিনি হয়ত তখনই জাহাজ খুলিয়া পর্ত্তুগাল অভিমুখে যাত্রা করিবেন।"

মুর। "আমরা অত জানিনা; আপনি যদি জাহাজ আরও নিকটে না আনিতে পারেন, তাহা হইলে জাহাজে যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করুন।"

ভাস্কো। "আপনারা কি জানেন না যে, আমি মহারাজের বিশেষ নিদেশ ক্রমেই জাহাজে যাইতেছি। আমাকে বাধা দিয়া যদি আপনারা রাজাজ্ঞার অপমান করেন, আমি অবিলম্বে রাজার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিব।"

মুরগণ হাসিয়া বলিল,—"রাজার নিকট যাইতে ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু সে পথ আমরা রুদ্ধ করিয়াছি; এই দেখুন চারিদিকের অর্গল দৃঢ়বদ্ধ—বাহিরে সিপাহীরা পাহারা দিতেছে!"

এতক্ষণে ভাস্কো-ডা-গামা বুঝিলেন যে তিনি সহচরবৃন্দসহ মুরহস্তে বন্দী। জাহাজগুলি তীরের নিকটে না আনিলে আর তখন মুক্ত হইবার উপায় নাই। ডা-গামা মুরদিগের কথাবার্ত্তায় অনুমান করিলেন জাহাজ নিকটে আসিলেই তাহারা সকলে হয়ত আক্রমণ করিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইবে, শেষে সকলের প্রাণবধ করিয়া পলায়ন

করিবে! ডা-গামা স্থির করিলেন, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক কিছুতেই জাহাজ কূলে ভিড়াইবার আদেশ দিবেন না।

ক্রমে ক্রমে ক্ষুৎপিপাসায় অনেকে কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য অথচ কোনরূপ আহার্য্য পাইবার উপায় নাই! মুরগণ হাসিয়া কহিল, 'মর আর বাঁচ, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; আমরা তোমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না।' সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ফিরিঙ্গিগণ হতাশভাবে আপন আপন অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের পূর্ব্বপ্রেরিত একজন চর জাহাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা হইতেই নিকোলস্-কোয়েলো নৌকা সংগ্রহ করিয়া তীরে অপেক্ষা করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র ডা-গামা অতি সঙ্গোপনে চর প্রেরণ করিয়া জাহাজ দূরে রাখিবার আদেশ জানাইলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়াই নিকোলস্ জাহাজগুলি দূরে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেকথা গোপন থাকিল না। ধূর্ত্ত মুরগণ অবিলম্বে তরণী লইয়া জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসিল!

পরদিনও মুক্তির কোন উপায় দেখা গেল না,—ফিরিঙ্গিগণ বন্দিভাবেই মুর-নাগরিকের গৃহে দিন যাপন করিলেন। উদ্বেগ, সন্দেহ, শঙ্কা তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ক্রমে রজনী অধিক হইতে লাগিল, শস্ত্রধারী সিপাহী-সংখ্যাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুক্ত তরবারি, তীক্ষ্ণ বাণ, সুদৃঢ় কার্ম্মুক, উজ্জ্বল কুঠার প্রভৃতি লইয়া সিপাহীগণ বন্দীদিগকে ঘিরিয়া রাখিল। তাহাদিগের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছিল। বন্দীগণ মনে করিলেন, ইহারা হয়ত গভীর নিশীথে সকলকেই বধ করিবে অথবা বন্দীভাবেই প্রত্যেককে পৃথক স্থানে প্রেরণ করিবে;—তখন

মুক্তির আর উপায় থাকিবে না। ফিরিঙ্গিগণ তখন একমনে ভাবিতে লাগিলেন—'হা ঈশ্বর! এ কি করিলে?'

এইরূপ শত্রুপরিবৃত সঙ্কট-সঙ্কুলস্থানে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী প্রভাত হইয়া গেল। কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া জানাইলেন, 'কোন বাণিজ্য তরণী মালাবার তীরে আসিবামাত্রই রাজবিধি অনুসারে তখনই বাণিজ্যদ্রব্যাদি তীরে নামাইতে হয় এবং নাবিকদিগেরও তীরে আসিয়া অবস্থান করিতে হয়। পণ্যগুলি নামান শেষ না হইলে কাহারও পোতমধ্যে যাইবার আদেশ নাই।'

রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা শুনিয়া ডা-গামা তৎক্ষণাৎ তাঁহার কতকগুলি অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও তীরে নামাইবার আদেশ দিলেন। তিনি মনে করিলেন ধূর্ত্ত মুরদিগকে এইবার ধূর্ত্ততায় পরাজিত করিব।

ভাস্কো-ডা-গামার বিড়ম্বনার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি সহচরবৃন্দসহ মুক্ত হইয়া আপন অর্ণবযানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট দ্রব্যাদি আর নামাইতে দিলেন না। যে সকল সামগ্রী তীরে নামান হইয়াছিল সে সমুদায় রক্ষার্থ দুইজন সহচর প্যান্ড্যারাংকুলে অবস্থান করিতে লাগিল।

জাহাজে ফিরিবার ৪।৫ দিন পরে ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের নিকট পত্র লিখিয়া সকল সমাচার জ্ঞাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন যে, রাজাজ্ঞায় যে সকল দ্রব্য জাহাজ হইতে তীরে আনিয়া রক্ষিত হইয়াছিল মুরগণ সে সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। পত্রোত্তরে জামোরিণ কয়েকজন বণিক এবং একজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রেরণ করিলেন। বণিকগণ দরদস্তর করিয়া পণ্যসম্ভার ক্রয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। জামোরিণ আরও আদেশ দিয়াছিলেন যে,

দুষ্টবুদ্ধি মুরগণ, ফিরিঙ্গি বণিকদিগের দ্রব্যাদির সন্নিকটে আসিলেই যে কেহ তাহাদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে, তাহার আর বিচার হইবে না! তখন পর্য্যন্তও ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের কোন কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই।

জামোরিণ প্রেরিত বণিকগণ প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিল বটে, কিন্তু কিছুই ক্রয় করিল না—কেবল লুণ্ঠন করিল। মুরগণ আর সে দিকে বড় অগ্রসর হইত না; যখনই কোন ফিরিঙ্গি কার্য্যব্যপদেশে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিত তখনই দলে দলে দুষ্ট মুরসম্প্রদায় দূরে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিত—"পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!!"

(৬)

প্যানড্যারাং উপকূলে ফিরিঙ্গি বণিকদিগের যে দ্রব্যগুলি নামান হইয়াছিল সে সমুদয় জামোরিণ-প্রেরিত বণিকগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বিব্রত হইলেন; তিনি বুঝিলেন এদেশে এসকল দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই,—তাই তিনি অবিলম্বে সে সংবাদ জামোরিণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

তখন জামোরিণ একজন 'ভালি' পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'রাজসরকারের ব্যয়ে কুলি-মজুরের পৃষ্ঠে ভাস্কো-ডা-গামার যাবতীয় পণ্যদ্রব্য কালিকাটে প্রেরিত হউক।' সুতরাং তাহাই হইল। কিন্তু জামোরিণের উপর নির্ভর করিয়াই ডা-গামা ক্ষান্ত থাকিলেন না; তিনি আদেশ করিলেন, দলের সকলেই এক একবার করিয়া কালিকাটে যাইবে এবং তথায় থাকিয়া জিনিষপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তখন রাজ্যমধ্যে একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—মুসলমান বণিকসম্প্রদায়ই তাহার মূল। তাহারা কোন ক্রমেই ডা-গামাকে বিদায় করিতে পারিল না দেখিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

শেষে, ক্রমে-ক্রমে জামোরিণের দরবারে পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গি বণিক সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। মক্কায় তখন পর্ত্তুগাল বণিকের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। যে সকল মুরবণিক মক্কা, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান হইতে কালিকাটে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করিত, তাহারা জামোরিণকে কোনক্রমে বুঝাইয়া দিল যে, এই ফিরিঙ্গি-জলদস্যু কালিকাটে থাকিতে,—কি মক্কা, কি ক্যাম্বে, কি আফ্রিকা কোন স্থান হইতেই, আর বণিক-সম্প্রদায় বাণিজ্য করিবার জন্য মালাবারতীরে আসিবে না। রাজ-অমাত্যগণ মুরদিগের অর্থ উদরস্থ করিয়া সেইরূপই প্রকাশ করিল। জামোরিণ দেখিলেন, তাইত! ফিরিঙ্গিদিগকে আশ্রয় দিয়া, বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া ভাল হয় নাই! ইহারা যদি কোন ক্রমে একবার মালাবারের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে;—বাণিজ্যশুল্কই জামোরিণের প্রধান ভরসা ছিল। জামোরিণ ভীত হইলেন,—সকলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তখন বিপন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।*

এদিকে ফিরিঙ্গি বণিকগণ প্রত্যহ একজন বা দুইজন করিয়া কালিকাটে যাতায়াত করিতে লাগিল। এইরূপে নাগরিকদিগের সহিত তাহাদিগের সদ্ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আলভারেজ তাঁহার দিন-লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"কালিকাটে যাতায়াত কালে খ্রীষ্টান (হিন্দু!) অধিবাসীদিগের নিকট আমরা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইতাম। যদি কোনদিন শয়নের বা

* But in short time, as if he (the zamorin) had been inspired with foresight of all the calamities now approaching India by this fatal communication opened with the inhabitants of Europe, he formed various schemes to cut off Gama and his followers.

W. Robertsons Works—vol. XII.

আহারের জন্য আমরা কেহ কেহ তাহাদিগের গৃহদ্বারে অতিথি হইতাম তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত প্রীত হইত। অনেকে রুটী এবং মৎস্য বিক্রয় করিবার জন্য জাহাজের উপর আসিত, আমরা সর্ব্বদা তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতাম। যখনই কোন নাগরিক তাহার শিশুসন্তান অথবা ক্রীতদাস সঙ্গে লইয়া জাহাজে আসিত, আমরা তাহাদিগকে আহার করিতে দিতাম। যাহাতে নাগরিকদিগের সহিত আমাদিগের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি হয় এবং দেশের মধ্যে আমাদিগের প্রশংসা ঘোষিত হয় সেই জন্যই আমরা প্রধানতঃ এই সকল করিতাম।

ভিখারীর দল আমাদিগকে বড়ই বিব্রত করিত। এমন কি কখন কখন রাত্রিতেও তাহারা আসিয়া জাহাজের উপর উপস্থিত হইত—আমরা নিরুপায় হইতাম; কিছুতেই তাহাদিগকে বিদায় করিতে পারিতাম না। সত্যই, এদেশের লোকসংখ্যা যত,—দেশে সে পরিমাণ আহার্য্য নাই। জাহাজের পাইল সংস্কারের জন্য অনেক সময় আমরা তীরে যাইতাম। মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য তখন পকেটে বিস্কুট থাকিত। আহারের সময় বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ ভিক্ষুক এত আসিয়া জুটিত যে তাহারা আমাদিগের হস্ত হইতে সেই বিস্কুট কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিত;—আমরা শুধু চাহিয়া দেখিতাম আর প্রায় সমস্ত দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম।

যখনই আমরা কালিকাটে যাইতাম তখনই প্রকাশ্য বিপণীতে বিক্রয়ের জন্য নানা রকম দ্রব্য লইয়া যাইতাম। সে সমস্ত আমাদিগের নিজস্ব,—সরকারী নহে। টিন, কামিজ, বলয়, ছোট ছোট ঘণ্টা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আমাদিগের ছিল। কিন্তু সে সকল জিনিষের দাম হইত না। আমরা নিতান্ত অল্প মূল্যে সে সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ফেলিতাম। আবশ্যকবোধে কেহ এসকল দ্রব্য ক্রয় করিত না। সুদূর "পর্ত্তগালের জিনিষ" এই বলিয়া যাহা বিক্রীত হইত

মাত্র। ক্রয় বিক্রয় শেষ হইলে যখন আমরা জাহাজে ফিরিতাম তখন আমাদিগকে কেহই কিছু বলিত না,—আমরা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতাম।”

যাহা হউক, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সদ্ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা স্থির করিলেন, এখন আর আশঙ্কার কারণ নাই; এখন একজনের জিম্মায় কতকগুলি জিনিষপত্র রাখিয়া সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। সেই মর্ম্মে ডা-গামা জামোরিণের নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাকে কতকগুলি সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

ডিওগো-ডিয়াজ (Diogo Diaz) ভাস্কো-ডা-গামার পত্র লইয়া জামোরিণ-দরবারে গিয়াছিলেন। চারিদিন বসিয়া থাকিবার পর জামোরিণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল; জামোরিণ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি চাও?”

প্রত্যুত্তরে, ডিওগো-ডিয়াজ ডা-গামার পত্র বাহির করিয়া জামোরিণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন যে, তিনি তাঁহার জন্য কতকগুলি উপঢৌকনও সঙ্গে আনিয়াছেন।

জামোরিণ পরুষভাবে কহিলেন, “আমি সে সকল জিনিষ কিছুই দেখিতে চাহি না,—পণ্যরক্ষকের নিকট রাখিয়া যাও। যদি তোমাদিগের ‘য়্যাডমিরাল’ কালিকাট পরিত্যাগ করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে বলিও আমি তাঁহার নিকট ছয় শত জিরাফিন্ (৪০ পাউণ্ড ১০ শিলিং) চাই। যে বিদেশী কালিকাটে আসিয়া বাস করে তাহাকে ইহাই দিতে হয়,—কালিকাটের এইরূপ নিয়ম।”

জামোরিণের আদেশ শুনিয়া ডিওগো সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। চিন্তাকুল ডিওগো যখন রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন তখন আরও কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী প্রাসাদ

হইতে বহির্গত হইয়া ফিরিঙ্গিদিগের গুদামে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তখন পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষার জন্য কয়েকজন মাত্র ফিরিঙ্গি অবস্থান করিতেছিল। কর্ম্মচারীগণ তথায় সিপাহী-পাহারা বসাইয়া আদেশ দিল, বন্দী-ফিরিঙ্গিগণের মধ্যে কেহ যেন গুদামের বাহির হইতে না পারে, নগরমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত হইল কেহ যেন তরণী লইয়া ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজের নিকট না যায়। নিয়মভঙ্গের জন্য বিশিষ্ট দণ্ডেরও ব্যবস্থা যে না হইয়াছিল এমন বোধ হয় না।

হতভাগ্য বন্দীগণ ভাস্কো-ডা-গামার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কে সংবাদ লইয়া যাইবে,—কেই বা তরণী দিবে? অবশেষে একটী বালক স্বীকৃত হইল। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। সন্ধ্যা অতীত হইলে সেই বিশ্বাসী বালক ধীবরদিগের একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে রজনীর অন্ধকারে অলক্ষিতে জাহাজে যাইয়া উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিঙ্গিগণ শুনিল আবার কয়েকজন বন্দী হইয়াছে!

ভাস্কো-ডা-গামা সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া জানিলেন, ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবার জন্য জামোরিণ মুরবণিকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধাতিসহকারে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ভাস্কো-ডা-গামা শিহরিয়া উঠিলেন। দুই দিবস ধীরে ধীরে চলিয়া গেল,—ডা-গামা কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। তীর হইতে কোন নৌকাই আর জাহাজের নিকটে আসিল না।

ডা-গামা আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সহচরদিগের বিপদে আকুলহৃদয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তৃতীয় দিবসে, চারিটী বালক কতকগুলি মূল্যবান্ প্রস্তর বিক্রয়ার্থ জাহাজে আসিল। ডা-গামা তাহাদিগের এতই যত্ন করিলেন যে বালকচতুষ্টয় মুগ্ধ হইল এবং প্রত্যাগমনকালে গামার বন্দী বন্ধুদিগের জন্য পত্র লইয়া গেল।

যখন নাগরিকগণ দেখিল, ফিরিঙ্গিগণ জামোরিণ কর্ত্তৃক অত্যাচার পীড়িত হইয়াও সেই বালক কয়েকটীকে কিছুই বলে নাই বরং যত্ন করিয়াছে তখন আবার ক্রমে ক্রমে দুইজন দশজন করিয়া ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি লইয়া পূর্ব্ববৎ ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজে গমনাগমন করিতে লাগিল। যাহারাই আসিত, ডা-গামা এবং তাঁহার সহচরগণ তাহাদিগকেই অবস্থাতিরিক্ত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল।

যখন সকলের মনেই বিশ্বাস জন্মিল যে, ফিরিঙ্গিগণ কিছুতেই কাহারও সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবে না অথবা কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিবে না তখন একদিন প্রায় ২৫ জন লোক জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইল; ডা-গামা অনুসন্ধানে জানিলেন উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে ছয়জন কালিকাটের সম্ভ্রান্ত নাগরিক। ডা-গামা এই সুযোগ ত্যাগ না করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১২।১৩ জন লোককে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ভীত দর্শকবৃন্দ ড-গামার আদেশে পত্র লইয়া তীরে গমন করিল।

মুরগণ যখন শুনিল যে, কালিকাটের কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বন্দীরূপে ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজে আবদ্ধ হইয়াছে তখন তাহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীরে, বন্দীকৃত ফিরিঙ্গি বণিকদিগের অনিষ্টাশঙ্কা কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। দুই একদিন পর ডা-গামা পুনরায় লিখিলেন,—"আমরা পর্ত্তুগাল চলিলাম, কিন্তু সত্বরই আবার কালিকাটে ফিরিয়া আসিব; তখন তোমরা দেখিও আমরা জলদস্যু কি অন্য কিছু।"

পত্রপ্রেরণান্তর ডা-গামার অর্ণবযান নোঙ্গর তুলিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল; তীরে দাঁড়াইয়া কালিকাটের ব্যথিত অধিবাসীবর্গ এবং ব্যগ্র মুরবণিকসম্প্রদায় দেখিতে লাগিল, ফিরিঙ্গিগণ সহচরদিগকে শত্রুরাজ্যে

পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিতেছে,—আর অল্পক্ষণ পরেই হয়ত দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

ভাস্কো-ডা-গামার অদৃষ্ট! তিনি ভারতবর্ষের ছায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বাতাস উঠিয়াছিল, থামিয়া গেল,—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ডা-গামা জাহাজ বাঁধিতে বাধ্য হইলেন; মুরগণ দেখিল এখনও সময় আছে।

(৭)

জামোরিণ, রাজপ্রাসাদে ধূর্ত্ত মুর এবং অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হয়ত ফিরিঙ্গিনিধনোপায়নির্দ্ধারণে ব্যগ্র ছিলেন এমন সময় তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ কৌশলে তাঁহার কতকগুলি বিশিষ্ট প্রজাকে বন্দী করিয়া পর্ত্তুগাল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। সদলবল ভাস্কো-ডা-গামার নিধন বা ফিরিঙ্গি-দলন করিবার যে কল্পনা তিনি মনে মনে করিয়াছিলেন এক নিমেষে তাহা ভাসিয়া গেল। জামোরিণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ডিওগো-ডিয়াজকে আহ্বান করিয়া মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন,—

"ডিওগো! য়্যাডমিরাল আমার লোকজনদের বন্দী করিলেন কেন?"

ডিওগো। "মহারাজ! আপনার আজ্ঞায় আমরা বন্দী হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ ঘটিয়াছে।"

জামোরিণ অবশেষে সকল অপরাধ তাঁহার পণ্যরক্ষকের স্কন্ধে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—

"ডিওগো, তোমার বন্ধুদিগকে লইয়া তুমি জাহাজে ফিরিয়া যাও। য়্যাডমিরালকে বলিও তিনি যেন আমার লোকজনদের ছাড়িয়া দেন।

আমার রাজ্যমধ্যে তিনি যে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিতে কহিয়াছিলেন উহাদিগের সঙ্গে যেন সেটাও প্রেরণ করেন। তুমিত এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ না,—তোমাদিগের পণ্যসম্ভার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া এই দেশেই কিছুকাল বাস করিবেত ? যাহা হউক, এই পত্রখানা লইয়া যাও; য়্যাডমিরাল যেন ইহা তাঁহার নরপতির হস্তে প্রদান করেন।"

ডিওগো-ডিয়াজ জামোরিণের কথামত লৌহলেখনী-সংযোগে তালপত্রে সেই লিপিখানি লিখিতে লাগিলেন ;—

"ভাস্কো-ডা-গামা নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার রাজ্য হইতে আমার রাজধানীতে আসিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহারে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার রাজ্যমধ্যে দারুচিনি, অভ্রক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মসল্লা এবং নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়। আপনি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লোহিত রং পাঠাইবেন।"

* * * * *

উক্ত পত্র লইয়া ডিওগো-ডিয়াজ এবং তাঁহার বন্ধুগণ ভাস্কো-ডা-গামার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন পর্য্যন্ত ডা-গামা সুবাতাসের অপেক্ষায় জাহাজ বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন। ডা-গামা সহচরদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিলেন না, কালিকাটের গুদামে যে সকল দ্রব্য ছিল সে সমুদয় সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। বন্দী বিনিময়ে কালিকাটের বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুক্ত হইলেন, —তীরে যে সকল দ্রব্য অরক্ষিত অবস্থায় রহিল তৎসমুদয়ের প্রতিভূস্বরূপ অবশিষ্ট দ্বাদশজন বন্দী মুক্তি লাভ করিতে পারিল না।

মন্দ মন্দ বাতাস বহিতে লাগিল,—ডা-গামার জাহাজ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। ক্রোধোন্মত্ত মুরগণ ৭০ খানি সুসজ্জিত তরণী লইয়া জাহাজের অনুসরণ করিল। সেই সকল তরণীতেও কামান

ছিল ; মুরগণ তরণীগাত্রে গুলিনিক্ষেপ করিবার ছিদ্র মধ্যে পশম দিয়া ও লালবস্ত্রে ছিদ্রের মুখগুলি আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামা মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিলেন ; তাঁহার অর্ণবযান হইতে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল—শত্রুপক্ষ আর অধিকক্ষণ টিকিতে পারিল না। সেই সময়ে ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজগুলি সমুদ্র মধ্যে অনেক দূর ভাসাইয়া লইয়া গেল, আক্রমণকারীরা হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। সেই দিন, সেই কোন্ এক মুহূর্ত্তে "ফিরিঙ্গি বণিক" ভারতবর্ষের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল—যদিও সে বহুদিন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সুবাতাসে ভাস্কো-ডা-গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন,—কর্ত্তব্যপালনে যে আত্মসুখ হয় ডা-গামার তাহা সম্পূর্ণই হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ আনন্দে মত্ত হইয়া ভারত মহাসাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সুদূর স্বদেশাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার দুইখানি জাহাজ ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইল,—তাঁহার অর্দ্ধেক নাবিক সাগরের শীতল গর্ভে স্থান লাভ করিল।

ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় লিসবন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। অভিযানে যে ব্যয় হইয়াছি তাহার ৬০ গুণ লাভ হইল দেখিয়া পাশ্চাত্য বাণিজ্যজগতে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সমগ্র পর্ত্তুগাল আনন্দে মাতিয়া উঠিল, গৃহে গৃহে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, নরপতি ইমানুয়েল উচ্চপদমর্য্যাদায় ভাস্কো-ডা-গামাকে ভূষিত করিলেন। তাঁহার শুভাগমন সংবাদে যখন সমস্ত দেশ আনন্দে সজীব হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সমুদ্রের জলহীন বেলাভূমিতে বসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বীরসহচরদিগের

মৃত্যু স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। সে তপ্তঅশ্রু আর কেহ দেখিল না—দেখিবার অবসরও প্রাপ্ত হইল না; কারণ একদিন যে ভারতে বাণিজ্যকল্পে পর্ত্তুগালের সহস্রাধিক অর্ণবপোত * যাতায়াত করিত, ভাস্কো-ডা-গামা তাহারই প্রথম বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন।

তখন পর্ত্তুগালের প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয়মধ্যে যেন একটী নবশক্তি সঞ্জীবিত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের পথে উৎসাহিত করিতেছিল; ইমানুয়েল তখন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

কেবল যে পর্ত্তুগালই এই আবিষ্ক্রিয়া নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহা নহে; য়ুরোপের সকল জাতিরই আগ্রহদৃষ্টি তখন ভাস্কো-ডা-গামার উপর নিপতিত ছিল। ভারতবর্ষের ধনসম্পদে দিকে সকলেরই দৃষ্টি ছিল,—সকলেই তখন সে কনক-স্বপ্নে মুগ্ধ; তাই ভারতবর্ষ গমনের এই নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল দেখিয়া য়ুরোপীয় বাণিজ্য-জগতে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল; ভারত-মহাসাগরের সুবর্ণ-তীরে যে সকল অমূল্য নিধি পড়িয়াছিল কে সে সমুদয় আহরণ করিবে, তখন পাশ্চাত্য জাতির মনে এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল! তখনকার যুগে যে জাতি সর্ব্বাগ্রে যে দেশ আবিষ্কার করিতে পারিত সে দেশের বাণিজ্যে সেই জাতিরই পূর্ণ অধিকার হইত,—পর্ত্তুগাল তাই ভারতের দিকে প্রলুব্ধদৃষ্টিতে চাহিতেছিল—একশত মুদ্রায় ছয় সহস্র মুদ্রা লাভ সুতরাং কাহারইবা না লোভ হয়?† যে কোহিনুর এতদিন ইমানুয়েল স্বপ্নে দেখিতেন এখন তিনি

* See W. Robertson's Works, Vol. XII.

† Correia estimates the king of Portugal's profit on Vasco-da-Gama's expedition at *six thousand per cent;* although *the spices brought back were not of the first quality.* ডা-গামা যদি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত আরও অধিক লাভ হইত।

যেন উহা বক্ষে ধারণ করিলেন আর উহার বিমল আভায় সমগ্র পর্ত্তুগাল আলোকিত হইয়া উঠিয়া য়ুরোপখণ্ডকে চমৎকৃত করিল।

ভাস্কো-ডা-গামার লিসবন প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লিসবন নগরের বাজার দর নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

		£.	s.	d.
All spice	per ℔.	o	o	3
Cinnamon	„	o	3	2
Cloves...	„	o	3	$6\frac{3}{4}$
Ginger	„	o	2	$1\frac{1}{4}$
Mace	„	o	5	$2\frac{3}{4}$
Nutmegs	„	o	1	$8\frac{11}{12}$

নিম্নে আলেকজান্দ্রিয়ার বাজার দর প্রদত্ত হইল ঃ—

[১০ ফানুয়েন = 1*s.* $4\frac{1}{5}d$].

All spiceper	128 ℔s.	15 Fanoens.
Cinnamon	„	£1. 16*s.* 6*d.*
Cloves	„	20 Fanoens.
Ginger	„	11 Fanoens.

[তৎকালে কালিকাটে ৫ কুইণ্টাল অথবা ৬৪০ পাউণ্ডের দাম—২০ ফানুয়েল।]

Nutmegs	per 128 ℔s.	16 Fanoens.
Wax	„	25 „
Musk ... ৩⅓ মাসা অথবা ৫০ গ্রেন	„	1 „
Incense	per 129 ℔s.	2 „

[মক্কায় ৫ কুইণ্টাল অথবা ৬৪০ পাউণ্ডের দাম—২ ফানুয়েন]।

তখন কার ১ ফারাজেলা (Farazella) গড়ে ওজনে ৩০ পাউণ্ড এবং ১ ক্রুজাডো (cruzado) গড়ে ২ শিলিং ৩ পেন্স হিসাবে।

কালিকাটে।

(১৪৯৮ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর)

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ হন্দর অথবা ১ মন ১৪ সের ৭½ ছটাক তাম্র ...	০	২৫	২⅕
১ পাউণ্ড গোলাপজল	০	০	২$\frac{৭}{১০}$
৩০ পাউণ্ড তুতিয়া	১	১১	৬⅓
১ খানি লৌহ ছুরি	০	০	১¾

লিসবন এবং ভিনিস্ উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিতে লাগিল। ডা-গামার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভিনিসিয়গণ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে। যে অর্থে, যে ধন-সম্পদে তাহাদিগের স্বদেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহারা বুঝিল যে সে ধনরত্ন আর তাহাদিগের নহে,—এখন তৎসমুদয় পর্ত্তুগালের। আর পর্ত্তুগাল দেখিল অনন্ত অপার রত্নাকরের কোন্ এক প্রান্তসীমায় তাহাদিগের জন্য কত অজ্ঞাত ধনরত্ন যেন এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এক মায়ামন্ত্র বলে সেই অনন্ত ধনরত্নরাশি লাভ করিয়াছে,—যেন এতদিন তাহারা নিদ্রিত ছিল, কমলার কোমল-কমলকর-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল অমূল্য রত্নরাশি তাহাদিগের গৃহদ্বার আলোকিত করিয়া সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে,—এখন কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়!

কভিলহাম একদিন যাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা

ইংলণ্ডে।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ হন্দর অথবা ১ মন ১৪ সের ৭½ ছটাক তাম্র ...	৩	১৪	৬ (১৫৭৬ সাল)
৬ পাইন্ট গোলাপজল	৩	৩	০ (১৫৩৬ সাল)
১ হন্দর তুতিয়া	১	৫	২¾ (ঐ)

কালিকাটে।

(১৪৯৮ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর)

১ খণ্ড পশম বস্ত্র	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
Camlet	০	১৫	৯
৩½ ফিট রক্তবস্ত্র	০	৪	৬
৩০ পাউণ্ড পারদ	১	২	৬

ইংলণ্ডে।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ খণ্ড Camlet...	০	১৫	৯ (১৫৩৬ সাল)
১ গজ রক্তবস্ত্র	০	৫	০ (ঐ)
৩০ পাউণ্ড পারদ...	১	২	৬ (ঐ)

এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। এখন পর্ত্তুগালের সম্মুখে একটী অতি-বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সেই কর্ম্মক্ষেত্র বহুকাল ধরিয়া পর্ত্তুগালের কামানগর্জ্জনে বিকম্পিত হইয়াছিল, বহুকাল পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী পূর্ণ করিয়া রত্ন তুলিয়া দিয়াছিল, বহুকাল ধরিয়া তাহার চরণ সেবায় নিযুক্ত ছিল। পর্ত্তুগালের দুরদৃষ্ট যে, সে এত সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিল না। একদিন যাহার বাণিজ্যতরণী উত্তমাশয় অন্তরীপ হইতে ক্যাণ্টন নদীতীর পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকল বন্দরেই যাতয়াত করিত,—একদিন যে বাণিজ্য রক্ষার্থ ফিরিঙ্গিগণ অগণিত দুর্গ, পরিখা, কুঠি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আজি ভারতবর্ষে তাহাদিগের অতি দরিদ্র চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে;—গৌরবশ্রীর ভস্মাবশেষমাত্র এখন পর্ত্তুগালের বিজয়কাহিনীর স্মৃতিটীকে সন্তর্পণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

একদিন এই ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের বাণিজ্য, অবাধ ও অপরিসীম ছিল,—পর্ত্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে কেহই ছিলনা। ফিরিঙ্গি বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিত সে সকল দ্রব্যের মূল্য নিরুপণ, বিক্রেতার ইচ্ছাধীন ছিলনা,—ক্রেতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত; একদিন তাহারা যে ভারতবর্ষ হইতে যাহাই অমূল্য, যাহাই দুষ্প্রাপ্য, যাহাই আবশ্যক তাহাই লইয়া যাইত তাহাতে কথাটী বলিবারও কেহ ছিলনা,—আজ তাহাদিগের কথা স্মরণ করিলে দুঃখ হয়;—পর্ত্তুগালের অধঃপতনের জন্য সহানুভূতি হয় না, কারণ সে আপনার চরণে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছিল,—গোয়ায় রাজ্য সংস্থাপন করিয়া নিজের ধ্বংশের পথ সুপরিস্কৃত করিয়াছিল! জগতের ইতিহাসে সেরূপ ধ্বংশ-কাহিনী বিরল নহে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ঘরের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গেছে—গেছে—গেছে? কি পরিচয় দিলে? উকিল বুঝি —ও বাবা, তা কে জানে, তা হলে কি ছাই আমি মরার কথা তুলি! কি সর্ব্বনাশ! একেবারে জেরার চোটে, বক্তৃতার দাপটে, আমায় অস্থির করে তুলেছিল আর কি। বাস্তবিক, কাজটা আমার ভাল হয় নাই; জোয়ান ছোকরা ওরা, যৌবনের শ্রাবণে টল্‌-টল্‌ প্রাণের কিনারা ছাপিয়ে উঠেছে, একুল ওকুল তর্‌তর্‌ টল্‌ টল্‌ কচ্ছে, যে দিকে চাও লালে লাল, একটানা পেয়ে বাসনার পানসি এখন আশার সাগরের দিকে নক্ষত্রবেগে ছুটেছে, এ সময় বানচালের কথা ভাল লাগবে কেন?

তা যাক্‌, এখন গেছেতো আবার এলেই কি জেরা তুলবে, এই বেলা যা বল্‌ছিলেম তা বলে নিই।

রাজচন্দ্র দে—দাস দে—কায়স্থ, বাড়ী দক্ষিণ-ডায়মণ্ডহারবরের এলাকায় কি একটী গ্রামে। অনেক কষ্ট পেয়ে সুপারিশের সুপারিশ তস্য সুপারিশ নিয়ে, বড় বাবুর কাছে দেড় বৎসর হাঁটাহাঁটি উমেদারি করে, তাঁর ছেলের কাপি লিখে দিয়ে, কাল মেয়েকে পরী বলে, মাথায় ক'রে বাজার বয়ে, অবশেষে বাবুর এক জায়গার একজনকে সঙ্গে করে শ্রীক্ষেত্রে রূপ দেখিয়ে এনে তারই অনুগ্রহবলে শিয়ালদহের রেলে মালগুদামে রাজচন্দ্রের একটী ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকরী হয়।

লোককে বাধ্য করিতে রাজচন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল নয়—বাধ্য করা, লোকের মনস্তুষ্টি করা, পরের কাজ

মাথায় করিয়া লওয়া, অভ্যাসগুণে তাহার স্বভাব,—স্বভাব কেন বলি, বাতিকের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। অপরের জন্য পরিশ্রম করায়, হ'লো সে কাজে নিজের অবস্থা মত দুই চারি পয়সা খরচ করায় রাজচন্দ্রের রাগ অপমান কষ্ট বা বিরক্তি দূরে থাকুক বরং কেউ তাহাকে দায়ে অদায়ে না ডাকিলে তাহার মনে একটু অভিমান হইত। যাহার সঙ্গে একটু ভাল, রকম জানাশুনা হইল, সে যে দে-মহাশয়কে পর ভাবিবে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। তা ইহাতে ছোট বড় বিচার ছিল না। রবিবারের অবকাশ উপেক্ষা করিয়া, যেমন উল্লাসের সহিত সাহেবের ঘোড়ার শুকনো ঘাস কিনিবার জন্য রাজচন্দ্র বাগবাজারে ছুটিত তেমনি উল্লাসের সহিত একটা কুলির মায়ের হাঁপানির ঔষধ আনিতে মালপাড়ায় দৌড়িত, বরং শেষ কার্য্যের জন্য সেরূপ সুবিধা বুঝিলে রাহা-খরচটা নিজের গাঁট হইতে দিত। যার এমন স্বভাব, সে কেননা মাস দুই তিনের মধ্যে আফিশে পসার জমাইয়া ফেলিবে? এমন সৌখিন দোকানীর খদ্দেরের অভাব কি? নীলু বাবুর একটী সুবিধা দরের দেরাজ চাই, রাজচন্দ্র আনিয়া দিবে; ভৈরব ঘোষ এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া বাড়ী যাইবে, রাজচন্দ্র তার মার্কা দেওয়ার কাজ চালিয়ে দেবে; নিবারণ বাবু তেমন দর-দস্তর করিতে জানেনা কে তার বাড়ীর মাসকাবারের বাজারটী করে দেয়, দে মহাশয়কে কর্‌তে হবে; ম্যাজ সাহেবের মেমের প্রথম পক্ষের বাবালোকের দুধ খাবার জন্য দুটী গাই কিনতে হবে, রাজু বাবু কো বোলাও; নিতাই সরকারের মামীকে গঙ্গাযাত্রা করা হয়েছে ঘাটে রাত্রি জাগিবার লোক পাওয়া যায় না, নয়টার পর খাওয়া দাওয়া সেরে এক পো চোরবাগানের তামাক হাতে করে দে-মহাশয় না ডাকিতেই হাজির। আবার জিবু পইণ্টস্‌ম্যান একজনের কাছে টাকা পাবে, নালিশ না কল্লে আদায় হয় না, গরীব মানুষের হয়ে

সমন আর সফিনাগুলি রাজুবাবু না মেহেরবাণী কল্লে কে বাহির করে দেয়? আর বড় বাবুর তো এবাড়ীর ওবাড়ীর সমস্ত কাজ রাজচন্দ্রের উপর বরাত। আফিশের একটু মুরুব্বিগোছ লোকেরা দে- মহাশয়ের নাম দে-গিন্নি রেখে দিলেন।

কিন্তু যেমন পৃথিবীর একদিকে যখন সূর্য্যের আলোক পড়ে অপর দিকে তখন অন্ধকার অত্যাচার করে, তেমনি মানুষের অদৃষ্টচক্রের সম্মুখে যখন কিরণ ক্ষরে পশ্চাতে তখন কালী ধবে। আমরা একদিক চক্‌চকে দেখে চারদিক্ জলজলাট বলি। মানব-শ্যামচাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে যখন শুকের দল হাতনেড়ে গান করে,—"আমার কৃষ্ণের বামে চূড়া হেলে" পেছন হতে সারির দল তখনই চোখ ঠেরে সুর ধরে,— "আমার রাধার চরণ পাবে বলে—নইলে হেলবে কেন?" কোন লোক যখন একদিকে সুখ্যাতি, সুনাম, স্নেহ, ভালবাসা পায়, অন্যদিকে তখন তাহার কুৎসা, কলঙ্ক, হিংসা, দ্বেষ করিবার দল আড়ালে মহলা দিতে থাকে। সুতরাং একবৎসর পরে, যদুবাবু "গুডস্ ক্লার্ক" হয়ে গোয়ালন্দে বদলি হওয়ায় ম্যাজ সাহেব নিজে যখন রাজচন্দ্রকে ৩৫৲ টাকা মাহিনা করে তাঁর কর্ম্মে বসাইয়া দিলেন; মাপ, ওজন ও চালানের প্রায় সম্পূর্ণ ভার হাতে পড়াতে যখন তার কিছু কিছু উপরি আয় হইতে আরম্ভ হইল তখন ঐ আফিশের মধ্যেই রাজচন্দ্রের গুটিকয়েক শত্রু হইল।

রাজচন্দ্রের উন্নতিতে ইঁহাদের কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তথাপি একজন নূতন লোকের,—বাহিরের লোকের, স্বল্পদিবসের মধ্যে এরূপ পদ-বৃদ্ধিতে এত অধিক সম্মানে তাঁহারা আপনা-আপনি অপমানিত ও প্রপীড়িত মনে করিলেন। কল্যকার যোগীর আগুল্‌ফ-চুম্বিত জটাবর্দ্ধনে অনেকেরই নৈতিক ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়। জলের ঘরে, ট্রামগাড়ীতে, মেসের বাসায় মধ্যে মধ্যে মিটিং বসিয়া রাজচন্দ্রের বংশলতিকা, জন্মপত্রিকা, আকৃতি-প্রকৃতি, রীতিনীতি, চাল-চলন,

আহার-ব্যবহার, আয়ের খাতা, মনের কথা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা হইতে লাগিল। হারান চাটুর্য্যে বল্লেন, কেমন আমি তখনই বলেছিলুম যে অমন চেহারা যার, সে কখন ভাল লোক হয় না। এখন রাজচন্দ্র ময়ুর থেকে নামিয়াও আসেন নাই, কি দাঁতখামাটীমারা চোরাও না; আফিশের দশ জনের দশ রকম চেহারার মধ্যে তাহারও এক রকম ছিল, মুখ-ভাবে কোন বিভীষিকার লক্ষণও ছিল না অথবা আকৃতিতে বিধাতা কিছু বিশেষ কদর্য্যতার শিলমোহর ছাপিয়াও দেন নাই; তবে লোকে নাকি অনেক সময় মন দিয়া মুখ দেখে, চোখ দিয়া নয়। রাজচন্দ্র যখন পনেরটী টাকায় ভর্ত্তি হয় তখন চাটুর্য্যে ম'শায় তাহার মুখাকৃতি কিরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা অবশ্য এক্ষণে স্মরণও নাই এবং এ সম্বন্ধে তিনি তখন কোন মতও ব্যক্ত করেন নাই কিন্তু যখন এক বৎসরের মধ্যে তাহার ৭০।৭৫ টাকা মাসিক আয়ের সম্ভাবনা হইল তখন নিশ্চয় স্থির করিলেন যে, মুখখানা পুরো বদমায়েসী মাখা ছিল, এবং একথা তিনি আপন ইচ্ছায় সুস্থ-শরীরে খোসমেজাজে সাধারণে প্রচারও করিয়াছিলেন। মথুর পাল বল্লেন যে, বাবা! ও আর মুখ দেখা-দেখি কি? দক্ষিণে লোক মাত্রেই বদমায়েস চিরকাল জানা আছে। বস্, এর উপর আর কথা নাই। আগ্রা থেকে আলিপুর পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রীঘরে ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে যতগুলি বিশিষ্ট লোক ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছেন, ইঁহাদের সকলেরই নিবাস দক্ষিণ; আর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এ তিন দিকে যার পানে চাও সেই তৈলঙ্গ স্বামী, বিশেষতঃ হুগলী জেলা, যেথান্ হ'তে আমাদের পাল-মহাশয় কষ্ট স্বীকার ক'রে শুভাগমন করিতেছেন। যেমন কাশীতে মরিলে শিব হয়, ব্যাস কাশীতে দেহত্যাগ করিলে গাধা হয়, বিলাতে জন্মিলে "বৃটিশ বরণ্" হয় তেমনি কলিকাতার দক্ষিণে বাস হইলেই লোকে জুয়াচ্চোর বদমায়েস হয়। প্রমাণেরও অভাব নাই,

—দক্ষিণদিক হইতে জাহাজ প্রবেশ করাইয়াই ইংরাজেরা ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন; ভাগীরথী কলিকাতার দক্ষিণাভিমুখী হইয়াই পবিত্রতা হারাইয়াছেন, মধুর সলিলে লবণ প্রবেশ করিয়াছে; দক্ষিণা বাতাস অঙ্গে লাগিয়া কত কুলবতীর কুল টল্‌মল্‌ করিয়াছে; ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে জরিমানা দিতে হয় দক্ষিণা; আর শ্রীযুক্ত চিত্রচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের দপ্তরখানার মোকাম দক্ষিণ। সুতরাং, অদ্যকার সভায় স্থির হইল যে, দক্ষিণদেশবাসী বিভীষণ বদনধারী রাজচন্দ্র দাস দে (সত্য কায়স্থ কি না এ বিষয়েও অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণ সভ্যের সন্দেহ রহিল) একজন ভয়ানক ভণ্ড ও প্রকৃষ্ট পাষণ্ড। সভাপতি চাটুর্য্যে মহাশয়ের প্রস্তাবে সমবেত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল যে, রাজচন্দ্রের মিষ্টালাপ মিছরির ছুরী; তাহার পরোপকার প্রবঞ্চনা; সে দস্তুরির লোভে নালুর দেরাজ কিনিয়া দিয়াছিল; বিলক্ষণ লাভ আছে, না হ'লে নিবারণের চাল ডাল কি অমনি থামকা কিনিয়া দেয়; পইণ্টস্‌ম্যানের মকদ্দামার তদ্বিরে উকিলের নামে ডবল টাকা আদায় করিয়াছিল; সাহেবের আর বড় বাবুর যে মন যোগায় সে কেবল তাঁহাদের হাত করিয়া আফিশের আর পাঁচজনের মাথা খাইবার জন্য; ভৈরব ঘোষ ছুটী লওয়াতে তার হয়ে বস্তায় মার্কা দেগেছিল বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার কোন সর্ব্বনাশের জোগাড় করে রেখেছে; আর নিতাই সরকারের মামীর গঙ্গাযাত্রার সময় যে কয়দিন রাত্রি জাগিয়াছিল সে নিতাইকে মতলব দিয়ে একখানি জাল উইল প্রস্তুতের জন্য। রাজু দে একজন পাকা জালিয়াত; টেবিলে বসে, হাত খালি থাকিলেই জোচ্চোরটা ব্লটিংয়ের উপর পঁচিশ রকম ছাঁদে দুর্গানাম লিখে, হরবেরকম হরপের হাত তৈয়ার করে; চাটুর্য্যে মহাশয় দীনুকে, জগবন্ধুকে, হালদারকে ভাদুড়ীকে আরও কত লোককে এ কাণ্ড কতদিন দেখাইয়াছেন।

এতদূর অসৎ লোক জানিয়াও চাটুর্য্যে মহাশয়ের দল যে আজও

রাজচন্দ্রকে ফাইফরমাজ করেন, দায়ে অদায়ে ডাকেন বা হাত দিয়া জিনিষটা পত্রটা কিনাইয়া লয়েন সে তাঁহাদের নিজের নিজের প্রাণে কোনরূপ কোরকাপ নাই বলিয়া।

মোদ্দাৎ নিন্দাই করুন আর খুঁতই ধরুন, চক্রান্তই পাকান আর চুল্‌লিই লাগান, যে বলের বেগ ধারণ করিয়া রাজচন্দ্রের অদৃষ্টচক্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সমস্ত শক্তির ক্ষয় হইবার পূর্ব্বে তাহার গতিরোধ করিতে সম্মুখীন হইলে, রোধকারীর অঙ্গ চক্র-সংঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত বা চক্রতলে নিপতিত হইয়া পিণ্ডীকৃত হইতে হইত। যদি কেহ দূর অন্তরাল হইতে প্রস্তরখণ্ডাদি নিক্ষেপ করিত তবে রাজচন্দ্রের দল্‌দলে-হৃদয়, পায়ে-ধরা-প্রাণ, তাহা আবর্ত্তনের পথে পড়িবার পূর্ব্বেই, রবারের ন্যায় আপন কোমল কোলে লুফিয়া লইত। রাজচন্দ্র জানিত যে কাজ ফাঁকি দিলে আপনি ফাঁকি পড়িতে হয়, আফিশের সঙ্গে তার কাজের সঙ্গে মাত্র সম্বন্ধ, সাহেবেরা বেতন রাজচন্দ্রকে দেয় না তাহার কাজকে দেয়, সে আরও বুঝিত যে মনীব যাহাকে সর্ব্বদা খোঁজে সেই বড় চাকুরে, সুতরাং সে কাজ খুঁজিয়া বেড়াইত; আপনার নাই, পরের নাই; বাঁধাধরা নাই, মাপাযোকা নাই; কাজ যেখানে লোক খুঁজিয়া বেড়াইত, আলস্য-অভিমানশূন্য রাজচন্দ্র সেইখানেই হাজির। অমুকে কর্ম্ম করে না আমি কেন করিব, সবাই ফাঁকি দিয়া বেতন লইবে আর আমিই বুঝি পরিশ্রম করিয়া মরিব. একথা রাজচন্দ্রের মুখে ছিল না। একেতো পরের উপকার করা, অন্যের জন্য পরিশ্রম করা রাজচন্দ্রের প্রকৃতিগত অভ্যাসই ছিল, তাহার উপর সে এইটুকু বুঝিতে পারিত যে, লাভালাভ শুধু টাকায় খতাইতে হয় না, অন্যরূপেও খতান যায়। প্রতিকার্য্যেই যে, কোন-না-কোন রূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, অভিজ্ঞতা জন্মে ইহাকে সে একটা লাভ মনে করিত; আর শ্রমপটুতা ও কার্য্যদক্ষতা যে উপরওয়ালার দৃষ্টিতে

পড়িত তাহাও সে বিশেষ লাভ জ্ঞান করিত ; আর সর্ব্বোপরি, কার্য্য কারণে, পরিশ্রম সফল হইলে, যে শরীরে স্ফুর্ত্তি ও মনে মনে একটু আনন্দ হইত তাহাকে সে পরম লাভ জ্ঞান করিত।

সাহেবেরা প্রাতে আফিশে আসিয়া দেখিতেন যে, রাজচন্দ্র আগে আসিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছে, আবার যখন তাঁহারা অপরাহ্নে গাড়ীতে উঠিতেন তখনও দেখিতেন যে রাজচন্দ্র কাজ করিতেছে। মিছামিছি কাগজ নাড়া নয়, সত্যই কাজ করিত। একবার বাকি পড়িলে ইহজন্মে ছিট মরে না, এক ঘণ্টা আলস্যের সুখ ভোগ করিলে দশ ঘণ্টা খাটিয়া দুঃখ ভোগ করিতে, মাথা বকাইতে হয় এইগুলি বুঝিয়া রাজচন্দ্র হাতে কাজ ফেলিয়া রাখিয়া যাইত না। রাজচন্দ্রের ন্যায় নিশ্চিন্তে নিদ্রার সুখ ভোগ আফিশের অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটিত। এই সকল কারণে ইংরাজ বাঙালী সকল কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষেই রাজচন্দ্র আফিশের মধ্যে একজন বিশেষ আবশ্যকায় লোক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সকল কাজেই রাজচন্দ্রকে ডাক, সকল সময়েই তার খোঁজ। "ভাগ্যে রাজচন্দ্র ছিল" "দে মহাশয় না থাকলে কি হইত" "এ সময়ে রাজ-চন্দ্রের হাত খালি থাকিত" এইরূপ কথা তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত। আবার সামান্য অসুখের ছুতা বা প্রয়োজনের নতা করিয়া সে ছুটী লইত না, নিতান্ত অপারক না হইলে কামাই করিব না তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এই ব্যাধিমন্দির শরীরে কে জানে কবে কি মহা বিকারের দুর্গোৎসব হইতে পারে, সংসারে কোন দিন কোন গুরুতর প্রয়োজন হইবার সম্ভব, এই ভয়ে সে ছুটীর প্রার্থনা ভবিষ্যতের জন্য চাপিয়া রাখিত। গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে উদ্ধার করার পর দুর্য্যোধন যখন অর্জ্জুনকে বর দিতে চান তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মতে পার্থ সময়ান্তরে বর মাগিয়া লইব বলিয়া বিদায় হয়েন।

মহাভারতে এই বিষয়টী পাঠ করিয়া রাজচন্দ্র প্রয়োজনের জন্য ছুটী

বাঁচাইয়া রাখিতে শিক্ষা করে। রাজচন্দ্রের এরূপ আচরণে আফিশের অনেক বাবুই তাহার উপর বিরক্ত হইত ; চাটুর্য্যে মহাশয় বলিতেন, এই দক্ষিণে ব্যাটা সকলকার মাথা খাইতে বসিয়াছে। কিন্তু অনেকে যে আপনার মাথা আপনি খাইয়া বসিত, কেবল রাজচন্দ্র যে তাহাদের হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া সাহেবদের কোপ দৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইয়া দিত, প্রতিদিন ইহা চক্ষে দেখিলেও স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া চাটুর্য্যে মহাশয়ের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিত না। ইয়ং বেঙ্গলের দল, কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই বলিয়া রাজচন্দ্রের নিন্দা করিত, তোষামদকারী বলিয়া তাহাকে উপহাস করিত ; রাজচন্দ্র হাসিয়া বলিত খোষামদটা কাকে বল দাদা ? নোংরা কাজ ত কখন কিছু করিনি, যাতে জাত যায় ধর্ম্মহানি হয়, কি কায়স্থসন্তান বা ভদ্রলোকের পক্ষে লজ্জাস্কর এমন কোন কাজ কত্তে আমাকে কেউ কখনও বলেওনি আমিও করিনি। তবে কথাটা হচ্ছে এই, না হয় আমি কিছু বেশী খাটি, সাধ্যায়ত্ত হলে সময় সময় পরের কাজটা করি, তা এ যদি খোসামদ হয় তা হ'লে আমি নাচার। আর স্বাধীনতার কথা যা ব'লছ তা যখন গোলামি ত্যাগ করিবার অবস্থা হবে তখন স্বাধীন টাধীন হওয়ার চেষ্টা দেখা যাবে, এক সঙ্গে সর্দ্দি, গর্ম্মি আমার ধাতে সহ্য হয় না ভাই।"

এখন আফিশের লোকে, রাজচন্দ্রের উপর যে দোষই চাপাক আর সে নিজে তার যা'ই কৈফিয়ৎ দিক্, কার্য্যতঃ মনের সত্য স্বাধীনতা শিয়ালদহ আফিশের কেরাণীকুলের মধ্যে রাজচন্দ্রের ন্যায় অল্প লোকেরই ছিল। আড়ালে সাহেবকে "ডোণ্ট কেয়ারই" করুণ আর মুখে চাকরীতে "কমিট নো নুইসেন্স,"ই করুন দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত সকলের প্রাণটাই খুঁত খুঁত করত ; আর সাহেব ডাকচে বলে চাপরাশী সাহেব এসে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালে অনেকেরই বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠত। কিন্তু রাজচন্দ্র হাল্কা মনে খর

পায়ে আফিশে আসিত, স্ফূর্ত্তি করে কাজ করিত নিতান্ত আলস্য বোধ হলে আধঘণ্টাকাল চেয়ারে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিয়া লইত। তা সাহেবই দেখুন আর যিনিই দেখুন; আবার ছুটির পর হাস্য মুখে বাসায় যাইত। চাপরাশী সাহেবেরা দে-বাবুর মুখের সামনে বড় বেশী করিয়া দাড়ী নাড়িতে পারিত না, তিনি সামনে এসে পড়লে খাতির করে হুঁকো-টা মুখ থেকে নামিয়ে ধরতো। আর সাহেবের কাছে কাহারও জন্য কোনরূপ উপরোধ অনুরোধ করিতে হইলে রাজচন্দ্রই "স্বাধীন বাবুদের" একমাত্র ভরসা ছিল। রাজচন্দ্রের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা, নৈতিক নির্ভীকতা ও সৎসাহসের সুদৃষ্টান্ত আরো অনেক সময় দেখা গিয়াছে। একবার স্বরস্বতী পূজার সময় কিছু আবশ্যকীয় কার্য্যের ভিড় পড়াতে ম্যাজ সাহেব তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন বাবুকে পূজার দিনে আফিশে আসিতে বলেন, বাবুরা একটু খুঁৎমুৎ করাতে সাহেব তাঁহাদের বেতন বুঝিয়া কাহারও দুই টাকা কাহারো এক টাকা "এক্স্‌ট্রা" মঞ্জুর করেন। ম্যাজ সাহেব অনেক দিন এদেশে থাকাতে দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার অনেকটা বুঝিতেন। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের জাতি জানিয়া তিনি বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত দিনে আসিতে বলেন নাই কিন্তু "যাহার খাই তাহার কাজ বজায় রাখিব ইহাতে মা স্বরস্বতী চটেন চটুন" বলিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় স্বেচ্ছায় আফিশে আসেন ও ছুটীর দিনে ফাঁকতালে ২৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লয়েন। রাজচন্দ্র জোড়-হস্তে সাহেবকে নিবেদন করে "যে, হুজুর আমায় কাল ক্ষমা করিতে হইবে, সরস্বতীপূজার দিন হিন্দুর কাগজ কলম স্পর্শ করা নিষেধ, আমি বাল্যকাল হইতে প্রতিবৎসর উক্ত দিবসে উপবাস করিয়া অঞ্জলী দিয়া থাকি, কাল আমি লেখা পড়ার কার্য্য করিতে পারিব না; বরং দুইটা বাতি অনুমতি করেন তো আজ আমি রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া যতটা পারি কার্য্য করিয়া যাই। যে রাজচন্দ্র কখনও কোন

অনুমতি উপেক্ষা করে নাই, রবিবারে বা অপর ছুটীর দিনে আসিতে বলিলে আপত্তি করে নাই; জ্বর গায়ে পাল্কী করিয়া আফিশে আসিয়াছে সে আজ স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মুখের উপর লেখনী স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল দেখিয়া সাহেব কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, বুঝিলেন যে সত্যই ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া সে এরূপ আপত্তি করিল; তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা শাসন বা প্রলোভনে কিছুতেই টলিবার নহে; সুতরাং তাহাকে অবকাশ দিলেন। একে জোড়-হস্তে হুজুর সম্বোধন তাহার উপর আবার এক্স্‌ট্রা না লওয়া, রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে স্বীকার ইহা অপেক্ষা ভীরুতা দাস্যপনা কি হইতে পারে? যাহোক, এক্স্‌ট্রা লইয়া কার্য্য করিতে যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন নব্য বাবু রাজচন্দ্রের নীচাশয়তা দেখিয়া গা টেপা-টিপি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরবৎসরও সরস্বতী পূজার দিন সকলকে আফিশে আসিতে হইল কিন্তু এবার এক্স্‌ট্রার হার অর্দ্ধেক; রাজচন্দ্রের ছুটী। জল খাবার ঘরে মহা আন্দোলন হইল; চাটুর্য্যে মহাশয় সেকাল ও একালের সাহেবদের চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিলেন; ট্যালিক্লার্ক গোপালেন্দ্র মোহন পরামাণিক "ফেয়ারপ্লে" স্বাক্ষর করিয়া মিরারে সাহেবদের গালি দিয়া খুব কড়া এক পত্র লিখিলেন। তৃতীয় বৎসরে এক্স্‌ট্রা নগদ আর কিছুই হইল না কেবল "অলরাইট বাবুজ, নথিং লাইক ওয়ার্ক" বলিয়া ম্যাজ সাহেব সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। চতুর্থ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই সারকুলার বাহির হইল যে, সমস্ত হিন্দুপূজাপার্ব্বনেই সকলকে আফিশে আসিতে হইবে কেবল দুর্গোৎসবের সময় যাহাদের বাটিতে পূজা তাহারা চারিদিন মাত্র অবকাশ পাইবে, আর রাজচন্দ্রকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পূজার দিনই আফিশে আসিতে হইবে না। হুলুস্থূল বাধিয়া গেল; মিরার, ষ্টেটস্‌ম্যান্, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রেরিত-পত্রের ছড়াছড়ি

হইল, চাটুর্য্যে মহাশয় দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, ইংরাজ রাজত্বের অবসানের আর বিলম্ব নাই, এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক রুষেরা আসিতেছে, তাহারা বাঙালীকে গবর্ণর-জেনেরল করিবে; অর্থাভাবে যাহাদের পৈত্রিক দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়াছে সরকার হইতে খরচ দিয়া তাহাদিগের পূজা নির্ব্বাহ করিয়া দিবে; প্রতিবৎসর দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ, বিবাহ করিবার স্কলার্শসিপ পাইবে; রেলওয়ে কেরাণীদের দশবৎসরে পুরা পেন্সন হইবে; সপ্তাহে রবিবারতো আছেই বৃহস্পতিবার ও মুসলমানদের সন্তোষার্থ শুক্রবারেও সমস্ত আফিশ বন্ধ থাকিবে এবং তাহারা খোসামুদে লোকের উপর বড় চটা সুতরাং তাহাদের চাকরী দিবে না, অবশ্য তিনি রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলেন নাই। নীলুবাবুর ছোট ভাই মাস দুই হইল একখানি বাঙ্গলা কাগজ বাহির করিয়াছিল তাহাতে বড় বড় অক্ষরে "অত্যাচার-রেল সাহেব-দের" হেডিং দিয়া এক দীর্ঘ আর্টিকেল ছাপাইয়া দিল; গোপালেন্দ্র বাবু নবমীর রাত্রে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গরাণহাটার মোড়ে কাদা-মাটী করায় দশমীর দিন তাঁহাকে সংযম করিয়া লালবাজারে থাকিতে হয়, সেদিন মোটেই কাজে আসিতে পারেন নাই, একাদশীর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিজল গ্রহণের পর বেলা একটা বাজাইয়া আফিশে প্রবেশ করায় সাহেব তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তিন মাস চেষ্টার পর নূতন চাকরীর জোগাড় করিতে না পারিয়া অমিততেজা গোপালেন্দ্র পরামাণিক ইংরাজের দাসত্ব আর করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশহিতৈষী হইলেন। বড়বাবুকে বলিয়া কহিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রকে আনিয়া পরামাণিকের পরিত্যক্ত টুলে বসাইয়া দিলেন। যাঁহারা অত্যাচার সহ্য করিয়াও চাকরী করিতে লাগিলেন তাঁহাদের প্রতিবাসী ও বন্ধুগণের মধ্যে যাহাদের শালা শালী-পো প্রভৃতি আত্মীয়গণ বা নিজে বেকার অবস্থায় ছিল তাহারা পরামর্শ

দিলেন যে, তোমাদের যদি একটুও মানুষের চামড়া গায়ে থাকে তবে ধর্ম্মঘট করিয়া সকলে আফিশ ছাড়িয়া দাও। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাবুগণ কর্ম্মত্যাগ না করাতে উক্ত প্রতিবাসী ও বন্ধুগণ নৈরাশ্যের বিরক্তিতে বাবুদের ছোটলোক বলিয়া গালি দিলেন এবং বড় আশায় লিখিত দরখাস্তগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। একদিন রাজচন্দ্র ম্যাজ সাহেবকে ভাল মেজাজে পাইয়া তাঁহাকে বাবুদের অসন্তুষ্টির কথা জ্ঞাপন করেন, এবং পূজার ছুটী না দিলে ভাল দেখায় না বলেন। ম্যাজ সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যাঘাত হইতে পারে এই বিবেচনা করিয়াই আমরা আফিশের কার্য্য ক্ষতি করিয়া সকল পূজায় ছুটী দিতাম, কিন্তু যখন দেখা গেল যে অতিরিক্ত টাকা পাইলেই অনেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়িয়া আফিশে আসিতে পারেন তখন কি জন্য আমরা তাহাদিগকে আর ছুটী দিব; কৈ তোমায় তো জোর করিয়া আফিশে আসিতে বলা হয় না? [ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সংকল্প।

তরুণ প্রভাতে পশিয়া, জননি,
তোমার ফুলের বনে ;
খেলাধূলা লয়ে কাটাইনু বেলা,
তোমারে পড়েনি মনে।

যেমনি তোমার স্নেহের বচন
শুনেছি, অমনি ভেঙ্গেছে স্বপন,
ছুটিয়া এসেছি ফিরিয়া জননি,
তোমার গৃহের কোণে।
খেলাধূলা লয়ে ভুলেছিনু মাগো
তোমায় পড়েনি মনে !

ডাক আরবার জননি আমায়
অমিয়-মধুর বোলে,
স্নেহ বরষিয়া করুণ নয়নে
তুলিয়া লওগো কোলে।
ধূলি ধূসরিত এদেহ আমার
মুছে দাও মাগো আঁচলে তোমার ;
প্রসাদীকুসুমে গাঁথা মালাখানি
পরাইয়া দাও গলে।
স্নেহ বরষিয়া জননি, আমায়
তুলিয়া লওগো কোলে।

বিজয় মন্ত্র শিখায়ে আমারে,
সাজায়ে নবীন সাজে,
দাও পাঠাইয়া হে জননি, মোরে
বিশ্বসমাজ মাঝে।

প্রেম দিয়া দ্বেষ করি যেন জয়,
সংগ্রামে যেন নাহি পাই ভয়,
সুখে দুখে তব কল্যাণ মোর
হৃদয়ে যেনগো রাজে।
পাঠাইয়া দাও জননি, আমায়
বিশ্ব সমাজ মাঝে।

পরের দুয়ারে নাহি যাই যেন
লইয়া ভিক্ষাঝুলি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন মা আমার
চক্ষে না দেয় ধূলি।
তোমার দৈন্য দেখি কোন দিন
ভক্তি যেন গো নাহি হয় ক্ষীণ,
নিজ হীনতায় কভু যেন তব
গৌরব নাহি ভুলি।
পরের দুয়ারে নাহি যাই যেন
লইয়া ভিক্ষা ঝুলি।

দিবা অবসানে একদা যখন
ফিরিয়া আসিব ঘরে,
জানি, মাগো, তুমি পথপানে চাহি
থাকিবে আমার তরে।
নানাদূর দেশে করি বিকি-কিনি
যদি কোন ধন নিয়ে আসি জিনি,
চরণে নমিয়া সঁপিব সকলি
তোমার চরণ পরে ;
দিবা-অবসানে একদা যখন
ফিরিয়া আসিব ঘরে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বুশিদো।

(জাপানের মর্ম্মস্থান)

অল্পকালের মধ্যে জাপানীদিগের প্রভূত বলবীর্য্য ও উন্নতি দেখিয়া আমরা মনে করি বুঝি উহা য়ুরোপীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও বাহ্য অনুকরণের ফল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহাদের উন্নতি, নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুশিদোই সেই ভিত্তি। সম্প্রতি কোন জাপানী পণ্ডিত, "বুশিদো"—এই নামে একটি অতীব উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশের সার মর্ম্ম নিম্নে দিতেছি—

"বুশিদো" শব্দের অর্থ ক্ষাত্র ধর্ম্ম ; অথবা যে সকল নীতি-তত্ত্ব জাপানী যোদ্ধৃবর্গের শিক্ষা করিতে হয় ও তদনুসারে স্বকীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাই "বুশিদো"। ইহা নীতি-তত্ত্বের কোন লিপিবদ্ধ সংহিতা নহে ;—কোন কোন যোদ্ধা ও জ্ঞানি-জনের মুখ-নিঃসৃত কতকগুলি বীজমন্ত্র অথবা মূলসূত্র মুখপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে এই মাত্র।

যে সময়ে সামন্ততন্ত্র জাপানে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন "সামুরাই" (সামরিক ?) অর্থাৎ জাপানী ক্ষত্রিয়বর্গ জাপানী-সমাজে অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। উহারা "বুশি" নামেও অভিহিত হইত। যুদ্ধই উহাদের কৌলিক বৃত্তি। উহাদের যেরূপ দায়িত্ব, তদনুসারে কতকগুলি বিশেষ অধিকারও উহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যুদ্ধে ন্যায়-পথ অবলম্বন করিবে—ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে—এই কথার মধ্যে আদিম কালের সমস্ত নীতি নিহিত। যুদ্ধ-ব্যাপার আসলে অমঙ্গল হইলেও, উহা হইতেও কতকটা মঙ্গল প্রসূত হয় সন্দেহ নাই। সুস্থ সবল প্রকৃতির নিকট "পলাতক", "ভীরু",—এই কথাগুলি যেরূপ

নিন্দার কথা, এরূপ আর কিছুই নহে। নীতির ভিত্তি না থাকিলে, যুদ্ধ একেবারেই পাশবতায় পরিণত হইত। য়ুরোপেও খৃষ্টধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়া, "শিভ্যাল্‌রি"কে কতকটা আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ল্যামার্টিন বলেন ;—আদর্শ খৃষ্টান-"নাইটের", ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও কীর্ত্তি—এই তিনটি মর্ম্মস্থান।

"বুশিদোর" মূল-প্রস্রবণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যতর।

অদৃষ্টের উপর প্রশান্তভাবে নির্ভর করা, যাহা অনিবার্য্য তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করা, দুর্ঘটনা ও বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকা,—ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা। একজন তলোয়ার খেলার ওস্তাদ্ ছাত্রদিগকে তলোয়ার শিক্ষা দিতেন, যখন দেখিলেন তাঁহার এক ছাত্র, যতদূর শিখিবার তাহা শিখিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে এই কথা বলিলেন ;—"আমার নিকট যাহা শিক্ষা পাইবার তাহা পাইয়াছ, এখন যাহা শিখিতে বাকি তাহা "জেনের" নিকট অর্থাৎ ধ্যানের নিকট শিক্ষা কর"। জাপানীরা এই ধ্যানের শিক্ষাও বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা বৌদ্ধধর্ম্ম দিতে পারে নাই, তাহা শিন্তোধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে। যেরূপ রাজভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, পিতৃপুরুষদিগের স্মৃতি-পূজা,—শিন্তোধর্ম্ম শিক্ষা দেয় এরূপ শিক্ষা আর কোনও ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। এই ধর্ম্ম, সামুরাইদিগের উদ্ধত স্বভাবে একটু নম্রতা বিধান করিয়াছে। শিন্তোধর্ম্ম, খৃষ্টানদিগের ন্যায়, মনুষ্যের "প্রকৃতি-গত পাপ-প্রবণতা" স্বীকার করে না, প্রত্যুত তাহার মত এই যে, মানব-আত্মা স্বরূপতঃ দেবোপম বিশুদ্ধ ;—এই মানব-আত্মা হইতেই দেব-বাণী শ্রুত হয়। বোধ হয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, শিন্তোধর্ম্মে, পূজার বিগ্রহ কিংবা পূজার উপকরণ কিছুই নাই। মন্দিরের মধ্যে, কেবল একটা সাদা-সিধা আয়না ঝোলানো থাকে। ইহা ছাড়া আর কোন সাজসজ্জা নাই। তাৎপর্য্য এই :—এই দর্পণই বিশুদ্ধ মানবহৃদয়ের আদর্শ স্থল ; মানবহৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বও তাহাতে সহজে পতিত হয়। অতএব, এই স্বচ্ছ দর্পণে, যখন তোমার নিজ ছায়া দেখিতে পাও, তখন উহা তোমাকে এই কথাই বলে :—"আপনাকে আপনি জান"; এই আত্মজ্ঞান নিজ শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে ;—ইহা অন্তর্দৃষ্টি-সম্ভূত জ্ঞান।

গ্রীক্ ও রোমকের মধ্যে তুলনা করিয়া মম্‌সেন বলিয়াছেন ;—"যখন গ্রীকেরা পূজা করিত তখন তাহারা উর্দ্ধে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, কেন না, বিশ্বালোচনাই তাহাদের পূজার বিষয় ছিল ;—এবং রোমকেরা যখন পূজা করিত তখন তাহারা মস্তক অবগুণ্ঠিত করিত ; কেন না, অন্তর্দৃষ্টি ও ধ্যানই তাহাদের পূজার পদ্ধতি ছিল"। কিন্তু জাপানীদিগের মধ্যে, এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা, নৈতিক চৈতন্য অপেক্ষা, জাতীয় চৈতন্যই সমধিক জগ্রত হইয়াছে। শিন্তোধর্ম্মের প্রকৃতি-পূজা হইতেই, জাপানীরা দেশকে অন্তরের অন্তরে বালবাসিতে শিখিয়াছে ; শিন্তোধর্ম্মের পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই, বংশ-পরম্পরা অনুসরণ করিয়া অবশেষে উহারা সমস্ত জাতির মূল-প্রস্রবণ—সেই রাজ-পরিবারে উপনীত হইয়াছে। জাপানীর নিকট স্বদেশ—শুধু "ফলবতী বসুমতী" কিংবা "শত খনি রত্নের নিধান" নহে—তাহা হইতেও অধিক ;—উহা দেবতাদিগের—পিতৃ-পুরুষদিগের দেহান্তরিত আত্মার পবিত্র নিবাস-ভূমি। উহাদিগের নিকট রাজা শুধু পার্থিব রাজা নহেন—তিনি এই পৃথিবীতেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁহার শরীরে, শক্তি ও দয়া একাধারে বিদ্যমান।

নিরবচ্ছিন্ন নীতিতত্ত্বগুলি জাপানীরা কংফুচুর উপদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে, পিতা-পুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ

কংফুচু বিবৃত করিয়াছেন তাহা জাপানী জাতির স্বাভাবিক সংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুকূল বলিয়া, জাপানীরা উহা পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল। চীন হইতে এই সকল মত জাপানে প্রচারিত হইলে পর, তাহা আরো দৃঢ়ীভূত হয়—এই মাত্র।

কংফুচুর পরেই, সামুরাই-সমাজের উপর মেঞ্চুর অসীম প্রভাব। মেঞ্চুর সাধারণতন্ত্র-পরিপোষক মতগুলি, সহৃদয় ব্যক্তিগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; কিন্তু সেই সকল মতের প্রচারে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, উহা সামুরাইর হৃদয়ে স্থায়িভাবে প্রবেশ লাভ করে।

এই কংফুচু ও মেঞ্চুর গ্রন্থাবলি যুবকদিগের মুখ্য পাঠ্য পুস্তক, এবং তর্কবিতর্কের সময়, বৃদ্ধদের নিকট সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা শ্লাঘার বিষয় ছিল না। এইরূপ গ্রন্থপাণ্ডিত্যের উপহাস-সূচক একটা জনপ্রবাদ জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাঁহারা আদর্শ-সামুরাই, তাঁহারা এইরূপ পণ্ডিতকে "গ্রন্থগন্ধী মূর্খ" বলিয়া অভিহিত করেন। কেহ কেহ এইরূপ পাণ্ডিত্যকে সেই দুর্গন্ধ উদ্ভিজ্জের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন—যাহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ কাথিত ও শোধিত করিয়া লইতে হয়। সামুরাইদিগের ধারণা—শুধু জানা, জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে নহে—পরন্তু জ্ঞানী হওয়াই জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবনে প্রয়োগ করিতে না পারিলে, জ্ঞানের সার্থকতা নাই। তাই চীন-দার্শনিক ওয়ান্-ইয়াং-মিং পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন:—"জানা ও কাজ করা একই কথা"।

সামুরাই-চরিত্র উক্ত দার্শনিকের উপদেশেও, অনেকটা উপরঞ্জিত। ওয়ান্-য়াং-মিং-এর লেখায়, এই ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়

যথাঃ—"প্রথমে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার মঙ্গলভাবের অনুসরণ কর"। মিওয়াশিশাই নামক তাঁহার একজন জাপানী শিষ্য এইরূপ বলেন:—"আমাদের স্বরূপ-সত্তার আধ্যাত্মিক জ্যোতি—বিশুদ্ধ, উহা মনুষ্যের ইচ্ছাবলে বিকৃত হয় না। যাহা ভাল, ও যাহা মন্দ—তাহার জ্ঞান স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়া আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয়;—তখন উহাকে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিনামে অভিহিত করি;—সে জ্যোতি সাক্ষাৎ স্বর্গ হইতে আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হয়"।

বুশিদো-ধর্ম্মের মূল-প্রস্রবণগুলি যাহাই হউক, তাহা হইতে কতকগুলি অতীবসরল নীতি-তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে। সেবিষয় বারান্তরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিহারে সতী-আস্থান।

খগোল-দানাপুর রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ উত্তরমুখী হইয়া দানাপুর ক্যান্টোন্‌মেণ্ট ভেদ করিয়া, শন-গঙ্গা সঙ্গমে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার উত্তর প্রান্তে, ভাগীরথী তীরে, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে। বামে দানাপুর-ছাউনী, দক্ষিণে কালীবাড়ী। এই কালীবাড়ীর পশ্চাতে শোন-গঙ্গার সংযোগস্থল। উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোন ভূমির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এক সুউচ্চ বালুকাবৃত মৃত্তিকাস্তূপের উপর একখণ্ড অর্দ্ধ-প্রোথিত, সিন্দুর-রঞ্জিত প্রস্তরফলক লক্ষিত হয়। ইহাকে সতী-আস্থাম বলে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগতা স্নানপরায়ণা রমণীগণ, সেই ত্রিবেনীস্নানান্তে, ঐ 'সতী-আস্থানের' প্রস্তরফলকে, দুগ্ধ, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

বৈশাখের প্রখর গ্রীষ্মের দিনে, একদা রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণের পিতামহী, সরস্বতী, কলাবতী ও রাম-অনুগ্রহ প্রভৃতিকে লইয়া একখানি বয়েল-বাহিত এক্কাগাড়ী করিয়া, শোন-গঙ্গা-সঙ্গমের ত্রিবেণীতে স্নান করিল; এবং পূর্ব্বকথিত 'সতী-আস্থানে' দুধ, গঙ্গাজল ও সিন্দুর দিয়া পূজা করিয়া, নিকটবর্ত্তী মহুয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যতই বেলা হইতে লাগিল, বৈশাখ-শেষের প্রখর সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তীর্ণ করিয়া যেন চারিদিক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। স্ত্রীলোকগণ তখনই স্নান করিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে দরদরিত ঘর্ম্মধারা পতিত হইতেছে। রাম-অনুগ্রহ পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া কহিল,

"নানি, বড়ী পিয়াস্!"

বৃদ্ধা লোটা হইতে সুমিষ্ট সরবৎ বাহির করিয়া পৌত্রকে পান করিতে দিল। বৃদ্ধ গাড়োয়ান রামচরণ বলিল, "মাইজী! এই সেই 'সতী-আস্থান'। আপনার কি কিছু মনে পড়ে? সেই সেদিনের কথা—"

কলাবতী আগ্রহ সহকারে বাধা দিয়া বলিল,

"কি, কি, নানি বলনা—বলনা—"

বৃদ্ধা কিছু গর্ব্বমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কেন, তোরা কি শুনিস্ নাই—আমার পিতামহীর সতীদাহ হইয়াছিল, এইখানে আমার পিতা পাথর দিয়া এই 'আস্থান' বাঁধাইয়া দিয়াছেন?"

কলাবতী বলিল, "না, তুমি বলিয়াছিলে একদিন বলিব, কিন্তু সেই অবধি আমাদের শুনা হয় নাই।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে আজ অনেক দিনের কথা—আমার ভাল মনে হয় না—তখন আমার বয়স ৫।৭ বৎসর মাত্র। সব ধোঁয়া ধোঁয়া যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে। কিন্তু তারপর পিতামাতার মুখে অনেক

বার শুনিয়াছি। রামচরণ গাড়োয়ান তখন কিছু বড় হইয়াছিল,—উহার অনেকটা মনে আছে। কিন্তু সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নয়—বাড়ী গিয়া সন্ধ্যার পর শুনিস্।"

সেইদিন সন্ধ্যার পর, খগোলের রামরূপের অন্তঃপুরে, এক নাতিবৃহৎ রমণীসভামধ্যে, রাম-অনুগ্রহকে ক্রোড়ে লইয়া, বৃদ্ধা তাহার পিতামহীর সতীদাহকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। কিরূপে তাহার পিতামহের মৃত্যু হইল, কিরূপে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা নিতান্ত কাতর হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, কিরূপে সকলে, বিষাদমগ্ন হইলেও তাহার পিতামহী হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, নানারূপ বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিতা হইতে লাগিলেন, সীমন্তদেশ সিন্দুর ও পদদ্বয় অলক্তরাগ রঞ্জিত করিলেন, এবং সধবার লক্ষণ সকল ত্যাগ করা দূরে থাকুক, তাহা অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন; কিরূপে তদ্দর্শনে সকলেই বুঝিল যে, তিনি স্বামীসঙ্গে সহমৃতা হইবেন; কিরূপে তাহার আত্মীয়-স্বজন, শিশুপুত্রকন্যা ফেলিয়া তাঁহাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিল; কিরূপে তিনি সকলের স্নেহ মায়া ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহগামিনী হইতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন; এই বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ গল্পনিপুণা বৃদ্ধা বিনাইয়া বিনাইয়া, কখন হাস্য, কখন করুণ, কখন বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের দীর্ঘগৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিল, আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

একজন হিন্দু বিধবার সতীদাহ হইবে, এই সংবাদ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় নিমেষমধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দানাপুর, খগোল, ফুলবাড়ী, মিঠাপুর, বাঁকিপুর, বেগমপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে দলে-দলে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক আসিয়া, সতী-আস্থানের সেই

বৃহৎ ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা চিত্র-বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া, নাসাগ্র হইতে ভ্রূললাট কপোল ও কেশ পাশের সীমন্তরেখার সীমান্তভাগ পর্য্যন্ত সিন্দুররঞ্জিত করিয়া, তদুপরি মোমলেপন পূর্ব্বক অভ্রখণ্ড সকল সজ্জিত করিয়া ললাটে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর 'টিকলি' সাঁটিয়া, বিবিধ বর্ণের ও বস্ত্রের কাঁচুলি, চোলি, আঙ্গিয়া, ফতুয়া, কোর্ত্তা আঁটিয়া, জরির কিনারাদার, বুটিতোলা রঙ্গীন ওড়না দ্বারা দেহলতা আবৃত করিয়া, সতী-আস্থানের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। দানাপুর ক্যানটোনমেণ্ট হইতে অনেকগুলি দেশীয় ও গোরা সৈনিক এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-সৈনিক-কর্ম্মচারী ও সাহেব-ডাক্তার ঘোটকারোহণে এবং কয়েকজন ইংরাজমহিলা হস্তীপৃষ্ঠে হাওদায় বসিয়া, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ইতর ভদ্র, কেহ হাতীতে কেহ ঘোটকা-রোহণে, কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ এক্কা করিয়া, কেহ বয়েল গাড়ীতে, কেহ পালকী করিয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্ভিন্ন বালিকারা ক্রোড়ে উঠিয়া, বালকেরা স্কন্ধে চড়িয়া, অবশিষ্ট অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পদব্রজে আগমন করিয়া, সেই বিস্তৃত শোন-গঙ্গাসঙ্গমের দোয়াব ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অসংখ্য ইতরসাধারণলোক, নিকটবর্ত্তী সুবৃহৎ মহুয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। অদূরে প্রকাণ্ড চন্দনকাষ্ঠরচিত চিতাস্তূপ স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া, ধূপ, ধূনা, শালশর্জ্জরস, গুগ্‌গুল, হোমাদ প্রভৃতি সুগন্ধি দাহ্যমান পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া, দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে, মহাভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। অবাধে বায়ু চলাচলের জন্য চিতার নিম্ন ভাগটা কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর মত শূন্য রাখা হইল।

ক্রমশঃ লোকারণ্য, হাতী ঘোড়া, দেশীয় বিদেশীয় প্রভৃতির জনতা

এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, কেবল কৃষ্ণবর্ণ মস্তক ও বিবিধ বর্ণের পাগড়ী, টুপি, মুরেঠার অনন্ত সমুদ্র। জনসঙ্ঘের কলরব, অশ্বগণের হ্রেসাধ্বনি, গজযুথের বৃংহতি, সেই বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষকে পরিপূরিত করিয়া, আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

সহসা সেই লোকারণ্য ভেদ করিয়া, 'সতীরমণী' আত্মীয়স্বজন ও পাঁড়েজী (পুরোহিত) প্রভৃতি পরিবৃতা হইয়া, তথায় আসিয়া, উপস্থিত হইলেন,—সঙ্গে স্বামীর মৃতদেহ। সতীর পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্র ও বেশভূষা। বিচিত্র মূল্যবান খট্টার উপর শায়িত শবদেহ, আত্মীয়স্বজন কুটুম্বগণের স্কন্ধোপরি স্থাপিত। সেই শববাহী আগন্তুকগণ ও সতীর সহগামী পরিজনবর্গ, সেই বহুজনাকীর্ণ প্রান্তর ও সেই সুসজ্জিত প্রকাণ্ড চিতা দৃষ্টে মনের আবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"বোলো, রাম নাম সত্য হ্যায়!" তখন শত-সহস্র নরনারীকণ্ঠ, এককালীন একসঙ্গে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া শোন-নদ, গঙ্গা-নদী, আকাশ, প্রান্তর ও বহুজনাকীর্ণ শ্মশানভূমি আকুলিত করিয়া তুলিল।

তখন দর্শকবৃন্দ সতীর মস্তকে ও শবদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ কুসুমমালা, কেহ পুষ্পস্তবক, কেহ ফুলের গোড়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কলাবতীর পিতামহীর বয়ঃক্রম তখন ৫।৭ বৎসর মাত্র। তিনি জননীর ক্রোড়ে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সেই বিশাল জনসমুদ্র ও সুবৃহৎ চিতাস্তূপ প্রভৃতির কথা সামান্য ক্ষীণ আলোকরেখার ন্যায় তাঁহার অতি অল্পমাত্র মনে ছিল। তিনি ভয়ে, সন্ত্রস্ত মানসে জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিলেন।

সতীর বয়স তখনও চল্লিশ অতিক্রম করে নাই। তিনি গ্রামের

মধ্যে অসাধারণ সুন্দরী ও স্থির-যৌবনা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত সৌন্দর্য্য, এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারভূষিত দেহ-কান্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে পূর্ণবয়স্কা যুবতী বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা, তাঁহার অঞ্চলের অগ্রভাগ স্পর্শ করিবার জন্য নিকটে আসিতে লাগিল। বিহারের সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, সেই পুণ্যবতী সতীর বস্ত্রাগ্র স্পর্শ করিলে, তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হইবে, এবং ডাকিনী, যোগিনী, ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতির কু-নজর হইতে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের কখন কোনরূপ অমঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না। তিনি সকলকেই বিনা আপত্তিতে তাঁহার ওড়নার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে অনুমতি দিলেন।

সেই বিশাল অনন্তজনসমুদ্রের অনবরত গভীর কল্লোল, ঐ প্রত্যক্ষ কালের করালকবলতুল্য প্রকাণ্ড চিতারাশি, যাহা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে তাঁহার মৃতপতির সহিত ভস্মসাৎ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার পুত্র কন্যা ও স্বজনগণের অবিরল অশ্রুধারা, দর্শকবৃন্দের আবেগপূর্ণ ভীষণ চীৎকার প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া সেই সতীর কোমল হৃদয় কিছুমাত্র হেলিল না, দুলিল না, টলিল না।

সেই বিধবার এবম্বিধ নির্ভীকতা দেখিয়া, উপস্থিত ইউরোপীয় দর্শকবৃন্দ সন্দেহ করিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোককে অহিফেন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া, উহার চৈতন্য হরণ করা হইয়া থাকিবে। দানাপুর-ছাউনীর উর্দ্ধতম কর্ম্মচারী কার্ণেল সাহেব, খগোলের গির্জ্জার পাদরী সাহেব, বাঁকিপুরের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী কাপ্তেন সাহেব,* সিভিল সার্জ্জন, এসিটান্ট সার্জ্জন প্রভৃতি গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ তখন অগ্রসর হইয়া, সেই বিধবাকে ঘেরিয়া

* বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কাপ্তেন সাহেব বলিয়া থাকে।

দাঁড়াইল; এবং ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও বিধবার আত্মীয়গণদ্বারা মাদক সেবনে, বিধবাকে অর্দ্ধাপহৃতচেতন করা হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য দুইজন বহুদর্শী সরকারী ডাক্তারদ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করান হইল। তাঁহারা উভয়েই একমত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, যাহাতে মাদকতা বা অচৈতন্য আনয়ন করে, এরূপ কোন পদার্থের কার্য্য,—তাঁহার দেহমধ্যে লক্ষিত হইতেছে না।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন সাহেব তখন ভাবিলেন, যে, বিধবার অনিচ্ছায় তাহার আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণগণ জোর করিয়া তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন :—

দেখো, আওরৎ, তুম আপনা খসমকে সাৎ জান্ দেনেকো নেহায়েৎ মোস্তায়েদ হো। ক্যা তুম ইস্ কাম আপনা খুসীসে করতী হো, ইয়া, তুমকো ব্রামিন্ লোক, আউর তোম্হারা খান্দান্ জুলুম্ জবরদস্তিসে করওয়াতা হ্যায় ? তুম্ বেশক জানো, কি আগর্ চে তুম্ ইস্ কাম করনেমে জেরাসাভী ইন্কার করোগী, তো হাম সরকার কোম্পানি ইংরাজ বাহাদুরকে তরফসে তোমারা জান আউর মাল জাল দাউলৎ বাঁচানেমে জামিন হোতেহেঁ। আউর যো লোক তুমকো ফুসল্যাতা হ্যায়, উন্সবকো জেলখানাকা দরওয়াজা দেখলানেমে একরার করতেহেঁ।"

রমণীর উত্তর স্থির, ধীর এবং হিন্দুসতীরমণীজনোচিত। তিনি অচল অটল ভাবে কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া, তাঁহার সহগামিনী হইতেছি। কেহ আমাকে মরিতে বলে নাই—বরং আত্মীয়-স্বজন আমাকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল! স্বামীধনে বঞ্চিতা যে নারী, নারীজন্ম তাহার মিথ্যা—আপনি আমার মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিউন—আমি বাঁচিতে ইচ্ছুক আছি।"

তৎশ্রবণে একজন ইংরাজ পাদরীমহিলা অগ্রসর হইয়া 'সতী'কে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভদ্রে! কেন কুসংস্কারপরবশ হইয়া দুর্লভ জীবন-রত্ন বলিদান দিতেছ?

সতীরমণী, "রাম কহো! রাম কহো!" বলিয়া কর্ণযুগল হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। যেরূপ দার্ঢ্যের সহিত তিনি তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্প প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজমহিলার বীরহৃদয় চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

—তিনি দেখিলেন, তাহার পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনবর্গের সামান্য পার্থিব স্নেহবন্ধন ছিন্ন করাত দূরের কথা, জ্বলন্ত চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন করিতে, রক্তমাংস জড়িত দেহে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে পর্য্যন্ত হিন্দুসতীর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, অটল স্বামী-অনুরাগ অচল ধর্ম্মবিশ্বাস, অমানুষী হিন্দুদেশাচার, দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া শারীরিক যন্ত্রণার স্বাভাবিক অনুভূতিকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এইসব ব্যাপার হইয়া গেলে, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণসমভিব্যাহারে সেই সতীরমণী সজ্জিত চিতার চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে চাউল ও কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত জলপাত্র হইতে দর্শকবৃন্দের গাত্রে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদেশের সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে, সতীদাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সতীরমণীর হস্তপ্রক্ষিপ্ত শান্তিবারিবিন্দুস্পর্শে পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয় ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহের শান্তি বিধান হইয়া থাকে!

তারপর তিনি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমূহ উন্মোচন করিয়া একে একে আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং

মৃদুহাস্যের সহিত, তাহার জন্য শোক বা দুঃখ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে মন্ত্রপূতঃ প্রজ্জ্বলিত দীপদণ্ড প্রদান করিলে, তিনি চিতাদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিলেন। তৎপরে বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত তাঁহার পতির মৃতদেহ, চিতার চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া, পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপিত হইল। তখন, ঘোর তমিস্রাময়ী চতুর্দ্দশী যামিনীতে সাবিত্রী সতী যেরূপ গভীর অরণ্যানীমধ্যে, সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃশ্য সেই গভীর লোকারণ্যমধ্যে, সজ্জিত চিতাভ্যন্তরে দৃষ্টিগোচর হইল। শুষ্ক তৃণ ও কণ্টক দিয়া চিতার দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তদ্দর্শনে, পূর্ব্বকথিত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণ আপত্তি করিয়া কহিলেন যে, চিতায় অগ্নিপ্রদত্ত হইলে, সেই অশিক্ষিতা হিন্দুবিধবা ভয়ঙ্কর শারীরিক কষ্ট অনুভব করিয়া, তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে, শেষ মুহূর্ত্তেও সেই অগ্নিময় কারাগার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে, সুতরাং জোর করিয়া যেন চিতাদ্বারা বন্ধ করিয়া না দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাদের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হইল। পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, কোন শিশুর সামান্য শক্তিহীন হস্তও সেই ক্ষণভঙ্গুর আবরণকে অনায়াসে উদ্ঘাটিত করিতে পারে। সেই সতীর অসাধারণ স্থিরতা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অচল অটলভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তখন সেই বিশাল শোন-গঙ্গা সঙ্গমের বিস্তৃত শ্মশানক্ষেত্রে সমাগত শত সহস্র নরনারী একবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—যেন কাহারও নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত পড়িতেছে না। এদিকে, একটি সামান্য দীর্ঘনিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই সতীর সুউচ্চ চিতামঞ্চ হইতে শ্রুতিগোচর হইল না। পরিশেষে একটী কুণ্ডলীকৃত ধূমরেখা, সেই চিতাগ্র হইতে পরিদৃশ্যমান হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটী সুদীর্ঘ অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা

বিস্তার করিয়া, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল নীলাকাশে বিদ্যুৎগতিতে উড্ডীয়মান হইল। সেই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে সমাগত লোকারণ্য হইতে শত-সহস্র নরনারীকণ্ঠে চীৎকার শব্দ উঠিল, "বোলো রাজা রামচন্দ্র কি জয়! জয়, জয়, সতী মায়ী কি জয়!! জয়, জয়, জয়, নরসিংজী কি জয়!!!" সঙ্গে সঙ্গে ঘোররোলে বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ইংরাজ দর্শকবৃন্দ চক্ষে রুমাল দিয়া সতীদাহ প্রথার উপর অভি-সম্পাত প্রদান করিতে করিতে হস্তী ও ঘোটকারোহণে নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

রাজসাহীর বাঘা-মস্‌জিদ।

রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ জে, এস্, কারষ্টেয়ার্স (J. S. Carstairs) মহোদয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৮৬ নম্বর পত্রযোগে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট বাঘার জোম্মা-মস্‌জিদ এবং কুসম্বির-মসজিদের বিবরণ সম্বলিত এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কারষ্টে-য়ার্স মহোদয় মস্‌জিদ দুইটীর প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত মস্‌জিদ দুইটীর বর্ত্তমান অবস্থাও অতি শোচনীয়। রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার মস্‌জিদের প্রতিকৃতি দুইখানি ও রিপোর্টটি অতি সযত্নে মহাফেজখানায় রক্ষা

করিয়া আসিতেছেন। সেরেস্তাদার মহাশয় নিজেও মোসলমান, কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতীয়ের কীর্ত্তিরক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আলী রাজসাহীতে কোনো কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেরেস্তাদার মহাশয়ের অনুগ্রহে মহাফেজখানা হইতে ঐ রিপোর্ট ও প্রতিকৃতির নকল করিয়া লইয়া যাইয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মস্‌জিদের প্রতিকৃতি দুইটী অতি জরাজীর্ণহেতু অস্পষ্ট হওয়ায় সোসাইটীর সম্পাদক তাহা মুদ্রিত না করিয়া কেবল রিপোর্টটুকু ১৯০৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট হইতে মস্‌জিদ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির হইলেও তাহা ভিত্তিশূন্য। কিন্তু আলো-চনায় প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে ভাবিয়া আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টখানি অনূদিত করিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট এইরূপঃ—* * * সর্ব্বপ্রথম বাঘার পুরাতন মস্‌জিদ উল্লেখ যোগ্য। শুনা যায়, ইহা নাকি হিজরী ৯৩০ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের ছাদের উপর দশটী চূড়া (domes) আছে, তাহা বাহির হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে, ঠিক মধ্যস্থলে চারিটী প্রস্তরের থাম আছে তদুপরি খিলান দ্বারা সমগ্র মসজিদের ছাদটী রক্ষিত।

এতৎসংলগ্ন প্রতিকৃতি হইতে খিলান ও থামের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইবে।* পশ্চিমের দেওয়ালে মৌলানাগণের উপাসনার নিমিত্ত তিনটী সুচিত্রিত বেদী আছে। মধ্যটি কেবল ইমামের জন্য। মসজিদ ৫৪ ফিট দীর্ঘ, ৪৫ ফিট প্রস্থ; ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াল ৭ ফিট পুরু

---

* এই প্রতিকৃতি বিনষ্টপ্রায়, আমার নিকট গত ভূমিকম্পের পূর্ব্বের একটী ফটো আছে, তাহা সময়ান্তরে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিল।—লেখক।

(thick)। দূর হইতে উহা যেন লোহিত ইষ্টকের বর্ত্তুলাকার গোলা বলিয়া মনে হয়। * * * মসজিদের মধ্য-দ্বারের উপর একটী লিপি খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই :—

মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে —যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পরমেশ্বরের নিমিত্ত একটী স্থান প্রস্তুত করে, সে তাহার পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গে ভগবানের নির্ম্মিত স্থান পায়। এই জোম্বা মস্জিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন প্রতাপান্বিত ও সদাশয় সম্রাট, তিনি আবার এক সম্রাটেরও পুত্র। তিনি সাংসারিক ও পারলৌকিক যাবতীয় কার্য্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম—আবুল মোজ্জাফর নুজারাৎ শাহ (আবু-ল—মোজ্জাফর নুজারৎ শাহ)।—ভগবান যেন তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। ভগবান যেন তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশ ও সাম্রাজ্য চিরকাল নিরাপদে রাখেন। ৯৩০ হিজরী।

বাঘাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনপ্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় :—গৌড়ের এক সম্রাট ঢাকা যাইবার কালে বাঘায় শিবির স্থাপন করেন। পরে একটু আগুণের প্রয়োজন হওয়ায় সম্রাটের ভৃত্যগণ লোকালয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। ধূমরাশি আকাশপথে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহারা তদনুসারে অগ্রসর হইয়া এক জঙ্গলের নিকট উপনীত হয়, তথায় তাহারা দেখে যে, একজন ফকীর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্তচিত্তে ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। ফকীরের চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। সম্রাটের অনুচরগণ তথা হইতে অগ্নি লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাটসকাশে ফকীরের কথা নিবেদন করিল। সম্রাট আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফকীরকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন অনুচরগণের কথা সত্য। তৎপরে সম্রাট ফকীরের ধ্যানভঙ্গের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফকীরের নাম—সাহ মহাম্মদ দুল্লা

(শা মহাম্মদ-দৌল্লা)। সম্রাট বিনীতভাবে ফকীরকে বলিতে লাগিলেন, —"হে মানবেশ্বর! আপনার দাসগণ ঢাকায় যাইবে কি এই স্থানেই অবস্থান করিবে?" ফকীর উত্তর করিলেন,—'তুমি এখানে একদিন অপেক্ষা কর।' তদনুসারে সম্রাট একদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। সেই দিবসেই সন্ধ্যার সময় ঢাকা হইতে সম্রাটের নিকট সংবাদ আসিল,—'যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আপনারই জয় হইয়াছে। সম্রাট অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভৃত্যগণকে বলিলেন,—'দেখ, এখানে একজন মহাপুরুষ আছেন।' তৎপর তিনি ফকীরের নিকট যাইয়া প্রচুর পরিমাণ ভূমি লাখেরাজস্বরূপ দান করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ফকীর কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া বলিলেন,— 'জাঁহাপনা! আপনার দাস ওসকল কথা আর শুনিবে না। যে ব্যক্তি সংসারের সহিত একবার সম্পর্কশূন্য হইয়াছে, সেকি পুনরায় সে মায়াতে আবদ্ধ হইতে চায়? আপনার এ অনুগ্রহ আপনার দাসের পুত্রের উপর প্রদর্শিত হউক্' তাঁহার পুত্রের নাম—হজরত মৌলানা দানেশ মাণ্ড ছিল। সম্রাট তাহাকেই ২২০ খানি মৌজা নিস্করুরূপে দান করিলেন। মৌলানা দানেশ মাণ্ডের পুত্র আবদুল ওহেব। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁকেই ১০৩৩ হিজরীতে দিল্লীর সম্রাট শাজাহান, রাজসাহী জেলা দিয়া যাইবার কালে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য মসজিদের পার্শ্বস্থিত জমি লাখেরাজ দান করেন। শুনা যায়, জমি দানের সম্বন্ধে অন্য কোনো সর্ত্ত নাই, কেবল লিখিত আছে যে, লাখেরাজের আয় হইতে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে। তাঁহার বংশধরগণ লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ভয়ে নাকি সনন্দের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন সর্ত্ত করেন যে, উহার অর্দ্ধেক ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয়িত হইবে এবং ঐ সম্পত্তি কেবল ঐ পরিবারের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবে। আবদুল ওহেবের পুত্র

মহাম্মদ রফিক প্রথম রইস (বাঘার মাতোয়াল্লীকে রইস বলে) বা মস্‌জিদের সেবাইত হন।

মস্‌জিদের উত্তর প্রান্তে তিনটি সমাধি বিদ্যমান আছে। মস্‌জিদের নির্ম্মাণ-ভার যে দারোগাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছিল, উহা নাকি তাহাদেরই সমাধিমন্দির। উহারই সন্নিকটে বাঘাপরিবারের মৃতব্যক্তির সমাধি-ক্ষেত্র। ঐ সকল সমাধিমন্দিরে স্থপতি-কার্য্য-কুশলতার কিছুমাত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারষ্টেয়ার্স সাহেবের রিপোর্টে বাঘা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। রাজসাহী জেলার লস্করপুর পরগণায় বাঘার জোম্মা মস্‌জিদ এবং ঐ বৃহৎ পুষ্করিণী অবস্থিত। এই পরগণা বহুপূর্ব্বে পুঠিয়ার ঠাকুর এবং নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজাদিগের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সরকার বারবকাবাদের (Barbakabād) শাসনাধীন ছিল। বিলমাড়িয়া (বর্ত্তমান লালপুর) ষ্টেশনের অধীন বাঘা অবস্থিত। নাটোর মহকুমার মোতালক এবং রামপুর বোয়ালিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে রাজসাহী জেলার বিলমাড়িয়া ও নাটোর থানার অধীন মুসলমান আমলের বহুতর নিস্কর ও আয়মা আছে। এই সকল আয়মা ও নিস্কর ভূমি মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক স্বজাতীয়ের প্রতিপালন ও স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে প্রথম গৃহীতার বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল ভূমি বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বশেষে নানারূপ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় ঐ সকল ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই হিন্দু ভূম্যাধিকারগণের হস্তগত হইয়াছে।

মস্‌জিদে সুন্দর অক্ষরে ২৪$\frac{1}{8}$ ইং লম্বা ও ৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি প্রস্থ স্থানের মধ্যে তিন লাইনে একটী লিপি আছে। তাহার ভাবার্থ এই :—

ভগবানের শান্তিকণা ও আশীর্ব্বাদ-ধারা যে মহাপুরুষের উপর বর্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন,—"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ভগবানের নিমিত্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন, তিনি তদনুরূপ ভগবানের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যে আবাসস্থান প্রাপ্ত হন। এই জোম্মা মস্‌জিদ এক মহাপ্রতাপান্বিত ও সদাশয় সোলতান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, ঐ সোলতান আর এক সোলতানের পুত্র ছিলেন। সোলতান হোসেন শাহ অল-হোসেনির পুত্র সোলতান নসিরুদ্দীন ওয়াজুদ্দিন আবুল মজ্জাফর নুশারৎশাহ। ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন জয়যুক্ত করুন। হিজরী ৯৩০ সাল।"

দিল্লার সম্রাট শিকান্দর লোদির সমসাময়িক সোলতান আলাদ্দীন হোসেন শাহ। তাঁহার পুত্র আবুল মোজ্জাফর নসিরুদ্দীন নুসারৎসাহ, ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (৯২৫—৯৩৯ হিজরী) পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। মৌলবী আবদুল আলী লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে ৯৩০ হিজরীতে (১৫২৩ খৃঃ অঃ) বাঘার মস্‌জিদ নির্ম্মিত ও পুষ্করিণী খনিত হয়। ইহা মস্‌জিদের উৎকীর্ণ লিপি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বাঘার অনতিদূরে—মকদমপুর গ্রামে তৎকালে অলবক্স বরখারদার লস্করি বাস করিতেন, তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও প্রাচীন-কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বাঘার খোন্দাকার পরিবার বিশেষ সম্মানশালী। লোকে বলিয়া থাকে শাহদৌল্লা, বোগদাদের আব্বাজী খলিফা হারুন-উল-রসিদের বংশাবতংশ। শাহদৌল্লা বোগদাদ হইতে চলিয়া আসিয়া লস্করপুরের জায়গীরদার অনবক্স বরকরদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পরিবারকে 'অর্দ্ধপরিবার' বলে, যে হেতু 'তিনি বোগদাদ হইতে একাকী আসিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে,—'মনুষ্য স্ত্রীলাভ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-মনুষ্য থাকে। বিবাহ হইলে পূর্ণ-মানব হয়।'

বাঘার সুবৃহৎ আয়মার আয় নানাজনে নানারূপ বলেন। মিঃ আদাম তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, রাজসাহীর কালেক্টরের মতে উহার আয় ত্রিশ হাজার টাকা। মৌলবী আবদুলআলীর মতে বাৎসরিক আঠার হাজারের উপর। এই সম্পত্তি সুচারুরূপে বন্দোবস্ত ও শাসিত হয় না।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে জোম্বা মস্‌জিদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিন দিকের দেওয়াল এখনো দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সম্মুখের বা পূর্ব্বদিকের দেওয়াল এবং ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সরকার হইতে দাতব্য-সূত্রে বাঘার বৃহৎ জলাশয়টীর পুনঃসংস্কার আরম্ভ হয় কিন্তু অল্পদিন কায চলিতেই বৃষ্টি পড়ায় কার্য্য বন্ধ হয় এবং তদবধি তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, মস্‌জিদ রক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্ত আয়মা দান থাকিলেও মস্‌জিদটি এই ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া কালের কঠোর নিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রমজান-ইদের সময় বাঘায় একটি মেলা বসে, তথায় প্রচুর পরিমাণে আম্র পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

খেয়াল খাতা।

খেয়ালপঞ্চক।

(১)

খেয়ালে চাহে বালক হতে বুড়ার মত বড় ;
জ্যাঠার জামা চসমা জোড়া যদিও পড়-পড়।
তুলিয়ে লাঠি চালতে ছুটি হুঁচট্ খেয়ে পড়ে,
তবু না-ছোড় ! চলিছে, জোর এতই ছোট ধড়ে!

জেতার মত কেতাটি খাসা, কেতাবে হাঁক্ ডাক্।
ঢংটি যেন হংস সম, কে বলে কালো কাক ?
হাঁসেরা খালি হাসিয়ে খুন শুনিয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্ ;
ছুঁইলে টুঁটি ভূতলে লুটা করেন ক্যাঁক্ ক্যাঁক্।

(২)

মাতাল কহে বোতল ছুঁড়ি শুঁড়কে দিয়ে গালি :—
"বিধাতা যদি সরিত-হ্রদ ভরিত মদ ঢালি,
"পুষ্ট ভুঁড়ি তুষ্ট শুড়ি, থাকিতনাত তোর,
"এসব ঠাট দোকান পাট উঠেত যেত চোর !"

খাইয়ে লাথি ফুলায়ে ছাতি কহেন বীর হেঁকে,
"স্বাধীন যদি করিত বিধি, নিতাম আজি দেখে !
"পরিয়ে জুতো উল্টা গুঁতো লাগালে যাব জেলে,
"নহিলে কিহে আমারে কেহ পারিত যেতে ঠেলে ?"

(৩)

শিকারী কহে ফুকারি,—সবে চমকে শুনি ডাক !
"বনের কাঁটা ফেলিলে কেটে এখনি মারি বাঘ।
"কর্ণ ধরি দন্ত করি করিতে পারি কিক্ !"
দেখিয়া গোঁপ, কহিছে লোক, "শিকারী বটে, ঠিক্ !"

গৃহিণী কাঁদে, নহিলে বেঁধে রাখিত ঘরে কেটা ?
অস্ত্র নাই আমার ভাই, আর এক ল্যাটা সেটা !
নহিলে কিরে পোষাক পোরে এমনি থাকি বোসে ?
দেখ্‌তে পেতে উঠ্‌ত মেতে যুদ্ধ বাঘে মেষে !

(৪)

খেয়ালে কহে শেয়াল "ওগো, কুকুর হল অরি ;
"নহিলে কিরে সিংহটারে কদাপি আমি ডর্রি ?
"তুলিয়ে ধূয়া—হোক্কা হুয়া, তাড়ায়ে দিতে পারি ;
চেনাও আছে বনের মাঝে গর্ত্ত সারি সারি।

পাতিয়ে সভা, করিতে "জবা" পারি ত আমি অরি ;
পুলিশগুলি, কুলীশ তুলি আসে যে, হরি হরি !
কণ্ঠ রবে ডঙ্কা মেরে সকলে যদি উঠি,
জাহাজ চড়ি, সিন্ধু তরি শত্রু যাবে ছুটি !

(৫)

কহেন কবি,—"এবারে ভবি ভুলিবে,—নাহি ভুল ;
"জ্যাপের জয়ে মোদের ভয়ে ভাগিবে অরিকুল।
"শিষ্য যদি নস্ত করি করিল রুষ লোপ,
"গুরুরা তবে উড়িয়ে দেবে বাষ্পে ইউরোপ।"

যুদ্ধ বিনা, শুদ্ধ কিনা—মোদের যশ-গন্ধে
ভাগিল ভূত। আর্য্যসুত, ঘুমাও মহানন্দে।
সাঙ্গ হল ইঙ্গলীলা, বঙ্গ হল উচ্চ ;
ধূলাটা ঝেড়ে শয্যা পেড়ে আরামে নাড় পুচ্ছ !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চুট্‌কী-সাহিত্য।

সকল দেশের সাহিত্যেই চুট্‌কীর আদর আছে, বিশেষতঃ ফরাসী ভাষায় এই প্রকারের সাহিত্য অতুলনীয়। Rochefoucauld, La Bruyere প্রভৃতি রসিক লেখকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য চুট্‌কী (Maxims) ফরাসী ভাষার অলঙ্কার। দেখা-দেখি ইংরাজী ভাষায়ও এই ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছে। বেকনের মত মহাজ্ঞানীও এই প্রণালীতে কতকগুলি apopthegms লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তবে সেগুলিতে ফরাসী-সাহিত্যোচিত সরসতা নাই। "সুইফট"এর রসাল লেখনীও এই ধরণের চুট্‌কীর সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেগুলি, বেকনের রচনা অপেক্ষা সুপাঠ্য হইলেও ফরাসী-ভাষার চুট্‌কীর ন্যায় মোলায়েম হয় নাই। ফরাসী ভাষার ল্যাটিন ভাষার সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃই হউক, ফরাসী সাহিত্যে যেরূপ সরসতা ও কোমলতা দেখা যায়, ইংরাজী সাহিত্যে সেরূপ নাই। ইংরাজী গদ্য কিছু কঠোর, কিছু একঘেয়ে, ইহাতে ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্র ভঙ্গী নাই। বোধ হয়, এই জন্যই ফরাসী ভাষায় চুট্‌কী সাহিত্যের এতটা খোলতাই হয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নৈকট্য সম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃই হউক, বাঙ্গলা ভাষারও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা, সরসতা ও ভাষালালার বিচিত্র ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আশা হয়, প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরণের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নরচরিত্রের বা মনুষ্যজীবনের কোনও একটা জটিল তত্ত্ব সরল ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশেষত্ব ; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না,

ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য্য থাকিবে না, চাইকি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়। আমাদের কেমন প্রকৃতি আমরা লিখিতে গেলেই লম্বা চওড়া গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক গবেষণা আসিয়া পড়ে, অথবা কবিতার আবেগ উচ্ছ্বাস দশ যোজন ধরিয়া উদ্গীর্ণ হইয়া পড়ে। চুট্‌কী লেখাটা আমাদের মাথায় আসে না, আমরা skull-capএর আদর বুঝিনা; মস্তকের শোভাসমৃদ্ধি দেখাইতে ৪০ গজ থান দিয়া পাগড়ী বানাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া বিরাট্ বুদ্ধিমান্ 'হবচন্দ্র রায়ের গবচন্দ্র মন্ত্রী, সাজিয়া বসি। চুট্‌কী লিখিতে কেমন মায়া করে, এত বড় প্রতিভাটা তুচ্ছত্রে মাটী করিব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে শূন্যে ভ্রাম্যমাণ সৌরজগৎ সৃষ্টি করিতে বিধাতা যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সুন্দরীর নাসিকার দোদুল্যমান ক্ষুদ্র মুক্তাটির নির্ম্মাণে তাহা অপেক্ষা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলাইদহের পদ্মা।

(অপরাহ্ন)

আবার বৈকালে, ও-পারের চরায় এসে বোট্ লাগালেম। বালীর চরা ধুধু কর্‌চে। চমৎকার দৃশ্য! ঢেউয়ের রেখার দাগ কে যেন এঁকে রেখেছে ;—পাখির ডানায় পালোকগুলি যেমন থাকে-থাকে সাজানো থাকে, এ ঠিক্ সেই রকম। আমি যখন চরায় ন্যাম্‌লেম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ ;—একটি গোল সোনার থালের মত। আর সে তেজ নেই, সে ঝাঁজ নেই ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে টুপ্ করে' দিগন্তে ডুবে গেল। সমস্ত আকাশ নীলবর্ণ ; কেবল পশ্চিম দিগন্তে, দিনমণি একটু রক্তিম আভা রেখে গেছেন। আমার মাথার উপর গাং-চীলের ঝাঁক্ চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; আর, "টিউ-টিউ" করে' মহা কলরব কর্‌চে। মনে হয় যেন, উহারাই সৃষ্টির একমাত্র জীব। উহাদের কলরবের মধ্যে, বিজনতার নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশি অনুভব করতে লাগ্‌লেম। মাথার উপর দশমীর চাঁদ। দিগন্তে পদ্মা রেখাবৎ দেখা যাচ্ছে। এরূপ সুদৃশ্য অনেক দিন উপভোগ করিনি।

(রাত্রি)

কাল্‌-রাত্রে আবার চরে নেবে বেড়াতে লাগ্‌লেম। একাদশীর চাঁদ, আকাশে বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে। গোটা-কতক তারা ছোটো-বড়—আকাশের এদিকে ওদিকে ছিটোনো ; নীচে সাদা বালি ধূ ধূ কর্‌চে ;—জ্যোৎস্নার আলোয় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ;—কে যেন ধপ্‌ধপে বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। ইচ্ছা হয় এইখানে গড়াগড়ি দি,—শিশুর মত অসঙ্কোচে গড়াগড়ি দি। এইরূপ দৃশ্যের মধ্যেই প্রকৃতির মাতৃভাব উপলব্ধি হয়—প্রকৃতিকে মা বল্‌তে ইচ্ছা করে। আবার সেই গাং-চীলের কলরব ;—আর একদিক্ থেকে, মধ্যে মধ্যে মাঝিদের

গ্রাম্য তান শোনা যাচ্চে। বালির উপর ঢেউয়ের রেখা সারি সারি আঁকা;—সমস্তই লহরী-লীলার চিহ্ন। সেই সব তরঙ্গ এখন কোথায়? শুধু তাদের কতকগুলি পদচিহ্ন রয়ে গেছে। সে চিহ্নও আর বেশিক্ষণ থাকবে না। মানব-জীবনেরও খেলা এইরূপ! এই শুভ্র বালু-চরের চারিদিকে পদ্মা-নদীর দূরবর্ত্তী জলরেখা, নীল পাড়ের মত দেখা যাচ্চে;—দূর দিগন্তে, গ্রামের হরিৎ-শ্যামল তরুরাজি ঝালরের মত শোভা পাচ্চে।

(প্রাতঃকাল)

আজ প্রকৃতির কি চমৎকার শোভা! মেঘ, এখনও অনেকটা আকাশ ছেয়ে আছে। সূর্য্যের প্রকাশ নাই—শুধু তার আভা, মেঘ ভেদ করে' এক এক-স্থানে ফুটে বেরিয়েছে। কোথাও মেঘ-মালা নানাবর্ণে রঞ্জিত। ইন্দ্রধনুর কিয়দংশ প্রকাশ হয়েছে—অবশিষ্ট অংশ কালোমেঘের মধ্যে বিলীন। ইন্দ্রধনুর ছায়া পদ্মা-নদীর স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। নদী নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত; যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেখানকার অস্ফুট তট-রেখা মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের আলোকে, উজ্জ্বল রজত-রেখার মত দীপ্তি পাচ্চে। চারিদিক্‌কার ছায়াময়ী আভার সহিত কি সুন্দর বৈসদৃশ্য! তটের উপর একটি নারিকেল-বৃক্ষ স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান;—যেন অবাক্ হয়ে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌চে। পাপিয়ার পিউপিউ, কোকিলের কুহুধ্বনি দূর হতে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হয়ে এই স্তব্ধতার সৌন্দর্য্যকে দ্বিগুণিত কর্‌চে। দূর তটের কোলে, নদীবক্ষে, দুই একখানি ডিঙ্গি বিশ্রাম কর্‌চে। ক্রমে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল; বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হ'ল, বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। প্রাতঃকালে, এরূপ মনোহর বিচিত্র দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। (দৌনকলিপি)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি ও কাব্য।

১। শকুন্তলা।

নাটক কাব্যের মাথে খ্যাত লোক মাঝে,
নাটকের মাথা হেঁট শকুন্তলা কাছে;
শকুন্তলে চতুর্থাঙ্ক হয় নামাঙ্কিত,—
শ্লোক চার শুন তা'র ভুবন প্রথিত।

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক স্তত্র শ্লোক চতুষ্টয়ং।

শকুন্তলা চতুর্থ অঙ্কের শ্লোক চতুষ্টয়ঃ—

(১) তনয়াবিচ্ছেদ।

আজি যায় শকুন্তলা হৃদয় উতলা হল তাই,
কণ্ঠ স্তব্ধ অশ্রুজলে চিন্তায় নয়নে দৃষ্টি নাই।
আমি ত অরণ্যবাসী স্নেহে মোর হেন বিকলতা
কন্যার বিচ্ছেদকালে না জানি গৃহীর কত ব্যথা!

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্ত কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ।

(২) বিদায়।

আগে তোমাদের জল না করিয়া দান,
কখন যে করে নাই নিজে জলপান,
কুসুম ভূষণ সজ্জা বড় সাধ যার
স্নেহে পাতাটিও তবু ছেঁড়েনি লতার;

তব পুষ্পাগমে যে গো আনন্দে আকুলা,
পতিগৃহে যায় আজি সেই শকুন্তলা।
ঐ দেখ যায় বাছা, আঁখি জলে ছায়,
দেহ গো দেহ গো ওরে স্নেহের বিদায়।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডণাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবং।
আদ্যেবঃ কুসুম-প্রবৃত্তি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাং।

(৩) রাজার প্রতি উপদেশ।

আমরা সংযমী মুনি, উচ্চ কুল তোমার রাজন্—
আত্মজনে না শুধায়ে এ বালা তোমারে দিল মন,
এই বুঝে কোরো এরে অন্য পত্নী সমান যতন—
তার পরে ভাগ্য আছে—কি কহিবে বধূ-বন্ধুজন!

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম ধনান্ উচ্চৈঃ কুলং চাত্মনঃ
ত্বয্যস্যাং কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাং।
সামান্য প্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যো বধূবন্ধুভিঃ।

(৪) বধূর প্রতি উপদেশ

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি পরে রোষ ভরে হোয়োনা নির্ম্মম!
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়োনা আত্মহারা,
গৃহিণীর এই ধর্ম্ম, কুলনাশী অন্য রূপ যারা।

শুশ্রূষস্ব গুরূণ্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তু বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাকুলস্যাধয়ঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেণু।

দীপাবলিতে আমরা দুয়ারে, ছাদে, জানালায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে দি, তার পর দিন থেকে সারা বৎসর ঘরের কোণে শুধু একটি প্রদীপ জ্বলে। কোজাগর পূর্ণিমায় আকাশে শুধু একা চন্দ্র দপ দপ করে জ্বলতে থাকে আর লক্ষ লক্ষ তারা সবগুলি একেবারে মিলিয়ে আসে! আমরা যেদিন বহু আড়ম্বরে বাহিরের অজস্র আয়োজনে দেবতার পূজা করি, তার পরে শূন্য হৃদয়ে তার ম্লান স্মৃতি জেগে থাকে—আর নিরায়োজনে দেবতার আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়ে চিরজীবনের অনন্ত আগ্রহ ও অশেষ আকাঙ্ক্ষা সব একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়।

মহা সমারোহে বরযাত্রী চলেছে। কত বাদ্যভাণ্ড কত প্রদীপ কত আলো কত লোকজন হাঁক ডাক কলরব! সেটি যখন আমাদের সম্মুখ হ'তে চলে গেল, অমনি চারিদিকে গাঢ়তর অন্ধকারে ছেয়ে এল, পথ একেবারে নীরব জনশূন্য বলে বোধ হতে লাগল, যেন শেষাঙ্কের যবনিকা পতন! কিন্তু তখনিতো অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মশা।

বঙ্গখ্যাত শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আমি প্রশিষ্য। আমিও পরমগুরুর মত অহিফেনসাধন জীবনের সার করিয়াছি। এবং সেইজন্য তাঁহার সিদ্ধি অর্থাৎ আফিঙের খেয়ালটা আমাতেও কিছু বিকশিত হইয়াছে। আফিং কামধেনু, কল্পতরু যেন আজকালকার মাসিকপত্রের লেখক; তাহার নিকট যাহা চাহ তাহাই পাইবে;—বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব মায় কবিতা ও ছোট গল্প প্রভৃতি যাহা যত কিছু আছে, সকলের সমাধান তাহার নিকট নিমেষের মধ্যে পাওয়া যায়। মৌতাত একটু চড়িলে ত' কথাই নাই। এ হেন আফিঙের প্রসাদে দিব্যজ্ঞান আমার চিত্তায়ত্ত। ইতি উপক্রমণিকা।

অথ কথারম্ভ।

এক দিন আফিং থাইয়া বসিয়া আছি, নেশাটা তাপযোগে তাপমান যন্ত্রের পারদের মত একটু একটু করিয়া চড়িতেছিল, দুনিয়া স্বর্গে পরিণত হইতেছিল, এমন সময় একটা মশা কাণের কাছে আসিয়া গান ধরিল 'পূঁ-উঁ-উঁ'! আমি বিরক্ত হইয়া তাড়াইয়া দিলাম; আবার অপর কাণে আসিয়া গাহিল 'পূঁ-উঁ-উঁ-উঁঃ'। এতক্ষণে আমার নেশাটা বেশ পাকিয়া আসিল, আমি দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মশার সেই মধুর গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

"পুঁ-উঁ-উঁ-উঁঃ"। আবার মশা গাহিল; তাহা আমার কাণে নিপুণ-হস্তের বীণাতন্ত্রীঝঙ্কারবৎ বাজিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম উহা অর্থশূন্য শব্দ নয়; বীণার আওয়াজে গীতকথার সংযোগের মত আমি তাহাতে গূঢ় অর্থ বুঝিতে লাগিলাম; আমি মাশকভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলাম। পেত্নীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেমন ভূতকালের অদ্ভুত

শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন, আমিও তেমনি মাশকভাষার ভাবোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম।

আমি পাদ্যঅর্ঘ্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া স্বাগত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে গায়ক, তুমি কে"? মশক তাহার স্বাভাবিক মধুর স্বরে উত্তর করিল, "হে সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অজ্ঞাত কিছু না থাকিলেও, আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছি, আপনি প্রণিধান-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। লোকে চলিত ভাষায় আমাকে 'মশা' কহিয়া থাকে; এবং পণ্ডিতগণ আমাকে মশক কহেন।"

আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "হে মশে বা মশক, তোমার ঐ নামের অর্থ কি, আমায় বিস্তারিত করিয়া কহ, আমার জানিতে বড় কৌতূহল হইয়াছে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া মশক কহিল, "হে অহিফেন বিনাশন, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ আমার নাম 'মশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কারণ আমি শব্দ করিয়া থাকি; কিন্তু এরূপ ব্যুৎপত্তি যে প্রমাদপূর্ণ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; আমা হইতে অধিক শব্দকারী শত শত জীব মশক না হইয়া কেবল আমি মশক হইলাম কেন? ইঁহাদের যুক্তিতর্কেরও অসদ্ভাব নাই; কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাচীন নিরুক্তবাদী শাকটায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক; তিনি বলেন, "নাম একটা অর্থশূন্য চিহ্নমাত্র; যেমন দেখা যায়, আমরা সম্মান বা ঘৃণা প্রদর্শন করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, বা কুক্কুর গর্দ্দভ প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকি।" তাঁহার মতে কাক ও কুক্কুটের নাম তাহাদের শব্দানুকরণে রক্ষিত। ঔপমন্যব কিন্তু এই মত গ্রাহ্য করেন নাই; তিনি গুণ হইতে নামকরণ স্বীকার করেন। যাস্ক কিন্তু উভয় মতই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন "শব্দ এক এক পদার্থের এক এক বিশেষ গুণ লইয়া বিশেষ ভাবে 'স্বভাবতঃ' রচিত হইয়াছে;

আবার, একবার একটা নামে একটা অর্থ সংযুক্ত হইয়া গেলে তাহার আর 'নড়চড়' হয় না; 'সকৃৎ উচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি।' গার্গ কিন্তু এ সকল মতের বিরোধী; তিনি আমার মতই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গাদাস, গণ্ডগোল দেখিয়া লিখিয়াছেন "শব্দেন উচ্চার্য্যমানেন যৎ বস্তু প্রতিপাদ্যতে, তস্য শব্দস্য তৎ বস্তু জ্ঞায়তাম্ অর্থ সংজ্ঞয়া ইতি প্রাঞ্চঃ। এবম্ অস্মাৎ শব্দাৎ অয়ম্ অর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিঃ ইতি তার্কিকাশ্চ। তৎজ্ঞানস্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ, অতএব শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাৎ ব্যবহারতশ্চ ইতি প্রাঞ্চঃ। ইত্যাদি।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। অতএব আমি যাহা বলিব তাহা ভ্রমাত্মক একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না।"

আমি ধৈর্য্যসহকারে মশকের এই দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ গবেষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম, 'হে প্রচণ্ড পণ্ডিত, হে সুমধুর শব্দকারিন্ মশক, তবে তোমার ঐ মধুর নাম কি নিরর্থক সংজ্ঞা মাত্র? কল্পতরুবৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও কি শব্দার্থবোধে অপারক হইয়াছেন?"

মশক কহিল, "হে মিষ্টভাষিন্, শব্দতত্ত্ব লইয়া Adam Smith, Dugald, Stewart, Hamilton, Liebniz, MaxMuller, Sayce প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বহু কচকচি করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমার নামার্থ প্রতিপন্ন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমার মতে 'মশা ও মশক' 'মহাশয় ও মোসাহেব' শব্দের অপভ্রংশ শব্দ মাত্র। দেখুন, বঙ্গে 'মহাশয় শব্দ' চলিত কথায় 'মশায়' রূপে ব্যবহৃত হয়; 'মশায়' শব্দের দেহ-সঙ্কোচে 'মশা' হইয়াছে। যখন লোকে বলে 'মশায় বড় উৎপাত করিতেছে,' তখন আমার নামের অপেক্ষাকৃত অভগ্নরূপ দেখা যায়।"

আমি মহাশয় মশাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "হে সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া মহাশয় ব্যক্তি উৎপাত করিতে পারে, আমায় বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বল।"

মশা কহিল, 'হে অহিফেনভোজী, আপনি আফিঙের মাত্রা একটু চড়াইলেই একথা জলবৎ হইয়া যাইত; যাহাই হউক কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইংরাজ 'rules India for India's good' নিঃস্বার্থভাবে ভারতহিতের জন্য ভারত শাসন করিতেছেন; অতএব তাঁহারা নিশ্চিতই মহাশয়; ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কে তাড়ায়? এই মহাশয় যখন রোগীকে চিকিৎসকের মত ভারতের শাসন ও শোষণ কার্য্যটা ভালরূপেই করেন; যখন দুর্ভিক্ষের দিনে দরবার তামাসায় অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়, যখন প্রভুর লাথি ভারতীয়ের অঙ্গে পড়িলেই ডাক্তার ও জজের বিচার-বিদ্রূপে বেচারার প্লীহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা মহাশয়ের উৎপাত প্রত্যক্ষ করি।"

আমি কহিলাম, "হে মহাশয়, তোমার উদাহরণ আমার ভ্রম নিরসন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি তোমার ব্যুৎপত্তি কথা শেষ কর।"

মশক কহিতে লাগিল, "হে পুরুষপুঙ্গব, 'মহাশয়' হইতে 'মশার' উৎপত্তি প্রমাণ করিলাম; এক্ষণে 'মোসাহেব' শব্দ হইতে ইহার উদ্ভব প্রদর্শিত হইতেছে। 'মোসাহেব' শব্দ কর্ত্তিতকলেবর হইলে হয় 'মোসাহে'; তাহা কিছুদিন ব্যবহৃত হইলে যখন লোকে ইহার প্রাচীন আকার বিস্মৃত হইল, তখন পণ্ডিতগণ উহা সম্বোধন পদ স্থির করিয়া 'হে মোসা' রূপেও ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরে অব্যয়ের ব্যয় হইলে জমা খরচ করিয়া দেখা গেল শুধু অবশিষ্ট আছে 'মোসা', কালে তাহা 'মসা' বা 'মশা' হইল, তখন কেহ কেহ আমাকে স্বল্পকায় দেখিয়া 'কন্' প্রত্যয় যোগে করিলেন 'মশাক'। এবং

আরো যখন দেখা গেল আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তখন আমার ‘আকার’ নাই বলিয়া আমি হইলাম ‘মশক’। আমি ভাষাতত্ত্বের সার কথা বর্ণনা করিলাম, বুঝিলেন কি ?”

আমি কহিলাম, ‘হে শব্দতত্ত্ববারিধে, হে তত্ত্বাম্বুধি, সব শুনিলাম, বুঝিলাম, তৃপ্ত হইলাম। কিন্তু একটু কিন্তু আছে। একটা কিম্বদন্তি আছে তোমরা নাকি গুরুব্যবসায়ীদিগের পূর্ব্বপুরুষ বা প্রেতাত্মা বা এইরূপ-একটা-কিছু। একথা প্রকৃত কি ?”

মশা কহিল, “হে মহাত্মন্, ডারুইন-তত্ত্বে এ প্রশ্ন মীমাংসিত হয় নাই; কিন্তু আমরা যে মোসাহেব কুলের পিতৃপুরুষ তাহা ডারুইনের কোন ছাত্র শীঘ্রই জগতে প্রচার করিবেন, এরূপ সংবাদ আমি পাইয়াছি।”

ইহা আকর্ণন করিয়া আমি আনন্দ-রোধিত গদগদকণ্ঠে কহিলাম, ‘হে মহাশয় মোসাহেব, তোমার জ্ঞানসাগরের লহরীলীলা অবলোকন ও তাহার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। তোমার বালাই লইয়া আমার মরিতে ইচ্ছা—”

মশক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, “হে মদেকাশ্রয়, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন; অমন কথা মুখে আনিবেন না। হে অহিফেন্-ধ্বংসকারিন্, আপনার মত স্থিরভাবে আর কেহ আমার দংশন সহ্য করে না, অতএব হে মদাহার, আপনি মরিবেন না, আমার হুলের দিব্য।”

আমি খুব গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, ‘হে অনন্যাশ্রয়, আমি তোমার জন্য প্রাণধারণ করিব। দধিচীমুনি পরোপকারের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, আর আমি পরোপকারের জন্য “যে কোরেই হোক রাখিব এ জীবন”। এক্ষণে বল, তোমার মহাশয় ও মোসাহেব নাম-দ্বয়ের সার্থকতা কিসে” ?

মশক কহিল, “হে পরোপকারিন্, শ্রবণ করুন”। অনন্তর, বার-কয়েক আমার মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া, তান-লয়-বিশুদ্ধ রাগিণী ভাঁজিয়া, মনীষাবোধক ঘাড় নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল। “হে মদীয়ানুগ্রাহক, আমি মহাশয়, কেননা, আমি শোণিত শোষণ করি। যে শোণিত শোষণ করে সেই মহাশয়। তাহা না হইলে দরিদ্রের শোণিতসম অর্থ শোষণ করিয়া ইংরাজ ‘রাজা’ কেন, জমিদার ‘হুজুর’ কেন, বঙ্গের ছোটলাট ‘প্রজার মা বাপ কেন’? পুনরায়, আমি মোসাহেব;—কানে দুইটা মিষ্ট কথা শুনাইয়া রুধির শোষণে প্রয়াসী। আমি মোসাহেব, আপনার কর্ণে সুমধুর তোষামোদ অনেকক্ষণ হইতে ঢালিতেছি, ব্যাকরণাভিধান হাঁটকাইয়া বহু দীর্ঘ বিশেষণ সংগ্রহ করিয়া শুনাইয়াছি, আমায় কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ শোণিত পান করিতে অনুমতি করুন। আমি অতি সন্তর্পণে আপনার গাত্রে হুল ফুটাইব, ততক্ষণ আপনি আপনার হস্তে স্বায়ত্ত-শাসন করিবেন। এ স্বায়ত্তশাসন আপনি অবশ্যই করিবেন, কারণ আপনারা ইহা বিদেশীর প্রসাদরূপে পাইবার জন্য কিরূপই না লালায়িত, কিরূপই না লাঞ্ছিত; আপনি বিনা লাঞ্ছনায় প্রদত্ত অধিকার সাহ্লাদে প্রয়োগ করিবেন আশা করিতেছি”। ইহা কহিয়া মশক সুমধুর পূ-পাঁ ধ্বনি করিয়া আমার নেত্র সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

আমি তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলাম, “হে মহাশয় মোসাহেব মশক, হে শ্রবণরঞ্জন গুঞ্জনকারিন্, হে বুভুক্ষু হিতৈষিন্; হে পরোপকারিন্, তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি আমার দেহ হইতে, কিঞ্চিৎ স্নেহপরবশ হইয়া, শোণিত সংগ্রহ করিবে; কিন্তু হে মশে, আমাকে ক্ষমা কর; আমি একে রক্তহীন বাঙালী, তাহাতে আবার অহিফেনসেবী, আমার রক্ত কোথায়? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চেষ্টা দেখ”।

মশক কহিল, "হে সত্যবাদিন্, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ,—কেন না "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"। ইহা আপনার দেশের প্রধান নীতিজ্ঞের উক্তি। এই নীতির অনুসারী আপনার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ চক্ষের সমক্ষে গোরার হাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনা, স্বদেশীয়ের অপমান নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিয়া থাকেন। যদি কখন চিত্তে বিকার ঘটে তাহা প্রায়ই নিম্নগা নদীর মত শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" নীতির সম্মান রক্ষার জন্য। ইহা হইতে বাস্তবিকই প্রমাণ হয় যে, ভারতের ধমনীতে শোণিত বহে না; যাহা বহে তাহা অতি তরল, অতি শীতল, কিন্তু দেব, আপনাতে যেটুকু শোণিত পাইব, তাহাই আমাকে লইতে হইবে, আপনি নিরীহ-চূড়ামণি। আপনার দেহে আমি ইচ্ছামত হুল ফুটাইব, অথচ আপনি ইচ্ছামত বাধা দিতে পারিবেন না; ভারতের রাজা প্রজার সম্বন্ধের মত এমন সুখ আর দ্বিতীয় কৈ? অতএব হে শান্ত, আপনার কর্ণে আরো তোষামোদ বর্ষণ করিতেছি "পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ", অধীন অনন্যগতি মুখাপেক্ষীকে নিরাশ করিবেন না।"

আমি মশার এই দীর্ঘ যুক্তিগর্ভ বক্তৃতায় প্রীত হইয়া বলিলাম, "অহো তোমার বিচারশক্তি! বাহবা তোমার বাগ্বৈদগ্ধ্য! হায় হায়, আমাদের দেশের বাগ্মিতার পশ্চাতে যদি এতটুকুও কর্ম্মের চেষ্টাভাস থাকিত! হে বাগ্মী, তোমার যুক্তি নিঃসন্দেহ অতি সৎ; আমি অলস সুতরাং অসমর্থ, সুতরাং অকর্ম্মণ্য, সুতরাং নরাধম, সুতরাং মুখসর্ব্বস্ব এবং আমাদের দেশে মুখসর্ব্বস্বের অভাব নাই; তুমি আমায় ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাইতে পার; ভায়াদের সোরগোল দেখিয়া ভীত হইও না; মশা মারিতে অমন কত কামান পাতা হয়, কিন্তু শুধু ফাঁকা আওয়াজ, আমার আফিঙের মত একটা গুলিও ছুটে না। মা ভৈঃ, তুমি ইংরাজের মত সকল সোরগোল, সকল কাতরবাণী অগ্রাহ্য করিয়া জোরে হুল ফুটাইয়া রক্ত চুষিয়ো"।

মশা কহিল, "হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভো, আজ কাল আর ফাঁকা আওয়াজ নাই, আওয়াজটা দমে ভারি হইতেছে। ঘুষির বদলে ঘুষি, লাথির বদলে লাঠি, দুর্জ্জয় সার্জ্জনের পৃষ্ঠমার্জ্জন বঙ্গে চলিত হইয়াছে। হুলের বদলে চড় যদি চলিত হইয়া থাকে, তবেইত' প্রভু প্রতুল"।

আমি কহিলাম, "অয়ি ভীরু, ঐ গুলা exception; exception proves the rule, তুমি স্বচ্ছন্দে অভিযান কর"।

মশা কহিল, "প্রভু, নীতিজ্ঞেরা বলেন,—

"যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেব হি"

আমি মশার এই সংস্কৃত ও নীতিচর্চ্চা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া হাস্যবিকচবদনে কহিলাম, "সন্তুষ্টোঽস্মি, বরং বৃণু"।

মশা শুনিয়া উৎপক্ষ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কহিল, "আমাকে আপনার শোণিত পান করিতে আজ্ঞা করুন"।

কেশবের সহিত যুদ্ধে বিক্রমপ্রীত মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় কেশবকে বরপ্রার্থনা করিতে বলায়, কেশব যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন "তোমরা আমার বধ্য হও," এবং অসুরদ্বয় নিজপণে বদ্ধ হইয়া প্রার্থিত প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল, তেমনি আমিও বলিলাম "তথাস্তু"।

মশা আহ্লাদে অধীর হইল; আমার প্রতি ধাবিত হইল; আমার গণ্ডে আসিয়া হুল বিদ্ধ করিল। আমি বহুক্ষণ সহ্য করিলাম। অবশেষে দেবী-যুদ্ধে মহিষাসুরের মত কাতর হইয়া কহিলাম "হে মশে, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। তোমার তীক্ষ্ণ হুল সম্বর সম্বর। শোষণ-কার্য্যের এই খানে ইতি কর, মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রাণে মারিও না"।

মশক দৃক্‌পাতও করিল না। আমি কাতর হইয়া আমার শ্রীকর-কমল কিঞ্চিৎ বলসহকারে গণ্ডে যোজনা করিলাম। মশক "পুঁক্" করিয়া উড়িয়া গেল! আমারো চপেটাঘাতে চমক হইল। আমি

মশার একমাত্রিক 'পুঁক্' শব্দের অর্থ বুঝিলাম ; পাণিনীয় ব্যাকরণের এতটুকু সূত্রের এতখানি কার্ত্তিকব্যাখ্যার মত তাহার অর্থ বুঝিলাম যে, মশা কহিয়া গেল "রে নির্ব্বোধ, রে হস্তিমূর্খ, আমি তোমার রুধির শোষণ করিবই ; এতক্ষণ যে মিষ্ট কথার ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলাম, তাহা আমার পল্বলগোষ্ঠীর ডাঁশ, মাছির নিকট সাধু হইবার জন্য। তুমি যতদিন কাপুরুষতা-অহিফেন না ছাড়িবে, ততদিন আমার কার্য্যে বাধা দিতে আসিলেই 'মশা মারিতে গালে চড়' অনিবার্য্য হইয়া রহিবে"!

শ্রীঅহিফেনানন্দ।

সামরিক কথা।

ভারতের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধির প্ররোচনায় ভারত-সচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে যে সম্মত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গবাসীগণ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই এ বিষয়ে আপন আপন হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকল্পে

বঙ্গবিভেদে বাঙ্গালী-দের মৌখিক আন্দোলন।

কি করা আবশ্যক স্থির করিবার নিমিত্ত টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয় উল্লেখ করেন, এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ও মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সদস্য সভায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মোগল কিম্বা পাঠানদিগের রাজত্বকালে এমন ভয়ানক বিপদ এদেশের অদৃষ্টে ঘটে নাই, স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের পর যে সদয় অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা যদি আজ রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাও ইহার তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া ধারণা হইবে। আজ হইতে নিত্য দুঃখ আমাদের জীবনের সঙ্গী হইল, এবং আমাদের প্রাণপণ শক্তিদ্বারা সম্মুখে যে বিচ্ছেদকারী মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বলেন, অদৃষ্টের একি বিভ্রাট! ঠিক যে সময়ে, রাজপুত্র আসিতেছেন বলিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার প্রজাদিগের একান্ত অসহায় দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া এবং তাহাদের মতামত, ইচ্ছা অনিচ্ছা রাজপুরুষদিগের নিকট কত তুচ্ছ এবং মূল্যহীন ইহাই নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত প্রমাণ করিয়া এই অভিনব অনুজ্ঞা প্রচার করা হইল। রাজপুত্র ও পুত্রবধূ আসিবেন এবং চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ প্রজাবর্গ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিবে সত্য কিন্তু তাহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং কাতর অশ্রুজলে উৎসবের শুভ আলোক ম্লান করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অসহায় দুর্ব্বল প্রজার ব্যাকুল চেষ্টার

এতদিনে শেষ হইল—রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ যে অঙ্কের যবনিকা পতন হইল ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের অভিনয় কোন দেশে কোন কালে হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন বঙ্গদেশের মানচিত্র বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই; কেন না শতাব্দী পরে আর তাহার কোন আবশ্যক হইবে না।" "অসহায় প্রজার চেষ্টার অন্তের" কথা শুনিলে "যে জাতি যে ব্যবহারের যোগ্য ভগবান তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটাইয়া দেন" এই প্রবাদ-বাক্যটি স্মরণ হয়। যদি চেষ্টার অন্তের সময়ই আসিয়া থাকে তবে বঙ্গের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা উচিতই হইয়াছে। চেষ্টার অন্তের কাল না আসিয়া এখনি চেষ্টার আরম্ভের কাল আসিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস! এক সময় শোনা গিয়াছিল, এই বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবেন সে প্রস্তাবের কি হইল? অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রশ্ন আছে; পত্রিকা বলেন, রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় বিবিধ উৎসবাদির জন্য ৬৮,৭৩৬ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিবার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবাসী কত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন? বঙ্গদেশবাসী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধ আন্দোলনের অপেক্ষা রাজপুত্রের অভ্যর্থনার জন্য যদি অধিকতর উৎসুক থাকেন তবেই এ দুর্দ্দিনে রাজপুত্র রাজধানী কলিকাতা মহা নগরীতে পদার্পণ করিতে ভরসা পাইবেন।

বম্বে-মেয়েদের রাজপুত্রের অভ্যর্থনা।

বম্বে-মেয়েদের রাজপুত্রের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে বম্বের "মারহাট্টা" পত্রিকা নিম্নলিখিত তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

বম্বের দেশীয় ভদ্রমহিলাগণ একত্র হইয়া রাজকুমারকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া স্থির করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, সে বিষয় আমাদের সমালোচনা শ্রুতিকঠোর হইতে পারে তবুও বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দু'চার কথা বলিতে হইবে। পার্সী মহিলাগণ সকল বিষয়েই বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগের সহিত মেলামেশায় রাজভক্তির দোহাই দিয়া কিছু করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক ও অগ্রসর হইয়া আছেন; কাজেই তাঁহারা যে একার্য্যে উদ্যোগী হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে তবে হিন্দু মহিলাগণও ইহাতে যে যোগ দিয়াছেন,—দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কেবল আশ্চর্য্যের নহে অতিশয়

দুঃখের বিষয়। রাজনৈতিক হিসাবে অবশ্য করণীয় যাহা আছে তাহা হতভাগ্য পুরুষদিগের অধিকারে থাকাই ভাল, নারীগণকে সাধ করিয়া আর তাহার মধ্যে লিপ্ত হইবার সার্থকতা দেখা যায় না। সংসারক্ষেত্রে প্রতিদিনের জীবনে এমন অনেক কাজ আছে যাহার ভার তাঁহারা গ্রহণ করিলে স্বামীদিগের পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হইতে পারে। কোন বুদ্ধিমান হিন্দুস্বামীর পক্ষে, তাঁহার স্ত্রীর বিদেশী পর-পুরুষের সম্মুখে অভিনন্দন পত্র লইয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কখনই প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। তা সে পুরুষ যতই উচ্চ পদস্থ হউন না কেন। আমাদের দেশীয় শিক্ষিতা নারীগণ, যাঁহারা দেশের উপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিদিন জীবনপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি কিন্তু আবার যখন দেখি কেহ কেহ নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া সময়ের বৃথা অপব্যয় করিতেছেন তখন স্বতঃই মনে হয়, যে দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে শিক্ষা দিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত করা হইয়াছিল সে দিন আমাদের মহা দুর্দ্দিন। এই সকল হুজুগের জন্য পুরুষেরাই অনেকাংশে দায়ী। কারণ অনেক স্থানে দেখা যায়, রাজানুগ্রহের আলোকে অন্ধ হইয়া বাহ্যাড়ম্বরকেই যথার্থ কাজ বলিয়া তাঁহারা ভ্রম করেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে নারীগণকে কিয়দংশে দূরে রাখাই যে সৎ বিবেচনার কাজ তাহাও ভুলিয়া যান্। এই আমাদেরই কালে সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া অনেক অদ্ভুত হাস্যজনক ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে;—তবে এবারকার এই অভিনব প্রস্তাবের নিকট পূর্ব্বের আর সকল ব্যাপার হার মনিয়াছে। এতদিনে দেশীয় স্ত্রীনেতাদিগকে বলা আবশ্যক হইয়াছে যে, অযথা অকাজে সময়ক্ষেপ না করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করাই ভাল—ঘরে অনেক কাজ পড়িয়া আছে তাহাই সুসম্পন্ন হউক—রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত অভিনন্দন পত্র লইয়া বিদেশী রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূকে স্বাগত অভিবাদন জানাইবার জন্য সবেগে আপলো-বন্দরে দৌড়িবার আবশ্যক নাই।

মাতৃভূমির প্রতি।

অয়ি মাতৃভূমি!
লহ পাদ্য অর্ঘ্য আজ দিতেছি চরণে;
তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি আজি শুভক্ষণে
হেরেছি সকলে;—
তাই আজ প্রাণপণে তোমার অঙ্গন তলে
আনন্দাশ্রু জলে,
মিলেছে বালক বৃদ্ধ, মিলেছে যুবক প্রৌঢ়জন
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গায় দেবি! তোমার বোধন;
দরিদ্র সম্পন্ন ধনী এক পুণ্য বেদী ঘিরি'
তব পদ চুমি'
গায় আজি "জাগো মাতৃভূমি!"

হে বঙ্গ জননি!
ঘনায়ে আসিছে ক্রমে বড়ই দুর্দ্দিন;
শাণিত বিপদ রাশি উদ্যত স্বাধীন
ঘুরে ভদ্রবেশে।
বিপন্ন হৃদয়গুলি রাজদ্বারে ঘুরি ফিরি'
সর্ব্ব অবশেষে
পাইতেছে জীবনের সনাতন বরেণ্য আশ্রয়,
খুঁজি লইতেছে সবে জননীর অদ্বৈত আলয়;
আজ দেবি! খুলে দিলে তব প্রাণ ভূমিতলে
যে তীর্থ শক্তির,
দান তাহা শুধু জননীর।

দারুণ ব্যথায়,
অয়ি মাতঃ, তব নাম শুধু পড়ে মনে ;
তব বরাভয়দীপ্ত কুটির অঙ্গনে
তোমার আশ্বাস
আজ জাগিয়াছে বুকে ;—তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি
আজি স্বপ্রকাশ !
অন্ধ প্রেতভূমিসম কুণ্ডলিত রাজপথ ছাড়ি
আজ ফিরিতেছে মাতঃ, তব পানে বঙ্গ নরনারী ;—
সংকল্প করিনু আজ—দিব পূজা সবে মিলি
জননী তোমায়,
সুখে দুঃখে সহস্র ব্যথায়।

আশীষে তোমার
হৃদয়ে যে অগ্নিকণা উঠিয়াছে জ্বলে'
সবে মিলি প্রতিপদে সেই হোমানলে
ঢালি হবনীয়
তাহারে উজ্জ্বল করি রাখিব তোমার গৃহ
করি রমণীয়।
চাই মোরা দৈব সুখ ; হীনতার সর্ব্ব অবসান ;
প্রাণবলে করিব গো জীবনের ব্রত সমাধান !
ছাড়ি ছদ্ম আড়ম্বর জননী মঙ্গলময়ী
চিনিব তোমায়—
ভুলিবনা আর বিমাতায় !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

নির্ব্বাসিত।

(১)

তাহার নাম ছিল বিধুভূষণ, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে আদর করিয়া বিদ্যাভূষণ বলিয়া ডাকিত। কেননা বিদ্যার সহিত বিধুভূষণের এমন একটা অকৈতব প্রেম জন্মিয়াছিল যে বিংশবর্ষ অতিক্রম করিতে বসিয়াও সে গ্রামস্থ ছোট বিদ্যাকুটীর অর্থাৎ গুরু-মহাশয় গোলাম হাজরার পাঠশালার মায়া ছাড়িতে সমর্থ হইল না।

প্রতিবাসীরা যখন দেখিল বিধুর পাঠশালা-মায়া আপনা আপনি ছাড়িবার নহে, তখন সকলে মিলিয়া একদিন এই বিদ্যালয়গামী নবজাত-শ্মশ্রু যুবকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সেই দলের ভিতর সপুত্র রামধন চাটুয্যে, সপৌত্র হরিরাম ঘোষাল, ও সশিষ্য পঞ্চানন তর্কনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিধুভূষণ রামধনের পুত্র রামরূপের হাতে খড়ি দিয়াছিল, দিন দুই চারি তাল পত্রে 'ক-খ' লিখাইয়াছিল। সেই রামরূপ বি,এ পাশ করিয়া দুইদিন পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছে।

হরিরামের পৌত্র নিধিরামেরও ভাগ্যে, দুই একদিনের জন্য বিধুভূষণের ছাত্রত্ব ঘটিয়াছিল। সে বালকও গত বৎসর মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সুতরাং বিদ্যাভূষণের যশঃসৌরভ তাহার গ্রামের চারিপাশে দশবারো খানা গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

যুবক বিদ্যাভূষণের পাঠশালায় যাইতে লজ্জা বোধ হইতনা বলিয়া, পাড়াপড়শীর এ দৃশ্য দেখিতে যে লজ্জা বোধ হইবে না, এরূপত কোন কথা নাই ! সকলেইত আর বিদ্যাভূষণের মত নির্লজ্জ নহে।

তাঁহারা প্রথমে বিধুর মা বিন্দুবাসিনী দেবী ওরফে বিন্দী বামণীকে

ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কথা রাখিল না। পরন্তু পুত্রের দৈনন্দিন উন্নতিতে তাঁহাদের অভদ্রোচিত ঈর্ষা দেখিয়া, সে যত পারিল তাঁহাদের আচরণের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। বিন্দু বুঝিয়াছিল, তাহার পুত্র যে দিন পাঠশালা হইতে বাহির হইবে, সে দিন সে একটী ছোটখাটো চাণক্য পণ্ডিত হইয়া, এই ইংরাজীপড়া ছোঁড়াদিগের ঈর্ষান্বিত বাপগুলার মুখে কালী লেপিয়া দিবে।

কিন্তু ঈর্ষান্বিত বাপগুলা বিদ্যাভূষণকে চাণক্য হইবার অবকাশ দিল না। তাঁহারা আজ তাহার বিদ্যামন্দির গমনের পথরোধ করিতে বদ্ধপরিকর।

রামধন চাটুয্যে বিধুর বগল হইতে শিশুবোধ-কথামালার পুঁটলীটা বাহির করিয়া লইলেন, হরিরাম কাড়িয়া লইলেন দোয়াতটা, আর তর্কনিধি পশ্চাৎ হইতে বিধুর বাহুমূলদ্বয় ধরিয়া, জোর করিয়া তাহার মুখটা বাটীর দিকে ফিরাইয়া দিলেন। আর বলিলেন—

"আঁটকুড়ীর ছেলে! তোমার জন্য আমরা যে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিনা। আর যদি কোনও দিন তুমি পাঠশালার দিকে মুখ ফিরাও তাহা হইলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিব।"

পুস্তকের পুঁটুলি ও মস্যাধার পথপার্শ্বের নালার কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত হইল।

ব্যাপার দেখিতে বহুলোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। গোবিন্দ গোলাওয়ালা বলিল—"আমি ঠাকুরকে বহুদিন হইতে নিষেধ করিয়া আসিতেছি। আমার দোকানে একটা মুহুরীগিরি পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।"

চন্দ্র তরফদার বলিল—"আমার নাতী বলে, 'আমি বিদ্যাভূষণ ঠাকুরদাদাকে বোধোদয়ের পড়া বলিয়া দিই।'"

পাকড়াশীদের ছেলে কেষ্টাটা অমনি ট্যাঁক করিয়া বলিয়া উঠিল—"সেদিন গুরুমহাশয় বিদ্যাভূষণ কাকাকে 'নীল-ডাউন' করিয়া দিয়াছিলেন।"

কেবল গুরুমহাশয় গোলাম হাজরা সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞদিগের এ অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়া আসিল। বিধুভূষণের ছাত্রত্বে তাহার অনেক প্রকারের লাভ ছিল। গুরুভক্ত যুবক তাহার গৃহের অনেক কাজ করিয়া দিত। আর বিন্দুবাসিনীর কাছে, পুত্রের অচিরে চাণক্যত্ব প্রাপ্তির আভাষ দিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চালটা, ডালটা, গুড়টা, নারিকেলটা লাভ হইত। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আসিয়া গোলামের ভাগ্যে বিজ্ঞগণের তিরস্কার ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে বিন্দুবাসিনীর করুণ রোদনে পাড়ার নরনারী প্রবুদ্ধ হইয়া, কারণ জানিতে গিয়া বুঝিল, বিদ্যাভূষণ মনের দুঃখে গ্রামত্যাগ করিয়াছে।

(২)

বিন্দুবাসিনী রামধন চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিকন্যা। তাহার পিতা তাহাকে এক কুলীনের হাতে সমর্পণ করিয়া কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' মহাশয়ের বিন্দুবাসিনী ছাড়া আরও অনেক স্ত্রী ছিল। যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদেরই গৃহে গতিবিধি করিতেন। বিন্দুর পিতার তেমন সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং এই স্বামি-বিয়োগ-বিধুরার ভাগ্যে কদাচিৎ স্বামি-সন্দর্শন সুখ ঘটিত।

কিঞ্চিদধিক উনবিংশবর্ষ পূর্ব্বে এই বহুবল্লভ ঠাকুরটী জায়ারূপিণী বিন্দুবাসিনীকে একটী আত্মজ রত্ন দান করিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিধুভূষণের আর পিতৃপরিচয় ভাগ্যটা ঘটিয়া উঠে নাই।

বিন্দুবাসিনী বারোবৎসর পর্য্যন্ত স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, যুগশেষে হাতের লোহা ফেলিয়া, সিঁথের সিন্দুর মুছিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিন্দুর সংসারে এখন তাহার প্রিয়পুত্র বিধু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই মাতা ও পুত্রের কোনও প্রকারে দিনযাপন হইত। এই পুত্রই বিন্দুর একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশা। সেই পুত্র পাড়ার বিজ্ঞজনকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিল, সুতরাং অভাগিনীর মনোবেদনার আর সীমা রহিল না। সে প্রভাতে উঠিয়াই আত্মীয়গণের নাম লইয়া রোদন করিতে লাগিল।

তর্কনিধির স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"বুড়ো মিন্‌সে! তুমি দলের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে কেন?"

তর্কনিধি মহাশয় সে সময় একটী হুঁকায় মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে আকাশের কোন অরুণতরঙ্গাকুলিত দৃশ্যের দর্শনলাভাশায় ঊর্দ্ধনেত্রে তন্ময়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর প্রশ্নের যে কি উত্তর দিয়াছিলেন, বিন্দুবাসিনীর আর্ত্তরবপূরিত আমাদের বধির কর্ণে তাহা প্রবেশলাভের সুবিধা পায় নাই।

(৩)

বিধুভূষণের বুদ্ধি যাহাই হউক, কিন্তু সে শান্তপ্রকৃতির বালক বলিয়া গ্রামের ভিতরে তাহার একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। শুধু তাই নয়, বিধু পরকে আপনার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সেবাতৎপর ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কখন বিপদে পড়িলে বিধু ভিন্ন সে বিপন্মুক্তির উপায় ছিলনা। রাত্রে কাহারও ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছে, পল্লীগ্রামের গুল্মবহুল বন্যমধ্যস্থ সরীসৃপসঙ্কুল পথে সেই অন্ধকারময় রাত্রে গ্রামান্তরে কে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিধবার ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, তখনও পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই—কে তাহাকে খুঁজিতে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। কোন গৃহস্থকন্যার আজ হাটে যাইবার লোক নাই, বিদ্যাভূষণ তাহার জন্য জিনিষ আনিতে হাটে চলিল। কেহ সদ্যপ্রসূতা গাভীটীর সন্ধান পাইতেছে না, বিদ্যাভূষণ তাহাকে খুঁজিয়া আনিল।

বই কাড়িয়া লইবার জন্য বিধু যে দেশত্যাগ করিবে এটা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং বিধুর অদর্শনে দুই একজনের আমোদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, গ্রামস্থলোকের অধিকাংশই দুঃখিত হইল। স্বয়ং তর্কনিধি মহাশয় ত অপ্রতিভ। মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর তিরস্কার শুনিয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

বিধুভূষণ গ্রামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। এইজন্য তর্কনিধি মহাশয় তাহাকে একমাত্র কন্যা ক্ষমাসুন্দরীকে দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। মেয়েটী তাঁহার শেষ জীবনের এবং আদরের;—বিবাহ দিয়া তাহাকে চোখের অন্তরাল না করিতে হয়, এইটীই তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য ক্ষমাসুন্দরীর দানের কথা তিনি মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি গৃহিণীর কাছে কথাটা পড়িয়াছিলেন মাত্র। সেই অবধি তর্কনিধিগৃহিণী অন্নদা দেবী বিধুভূষণকে কতকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক এক দিন স্বামীর টোলে পড়িতে আসিয়া, যখন বিধু পাঠ ফেলিয়া, ক্ষমাসুন্দরীর খেলার ঘর রচনায় নিযুক্ত হইত, তখন ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্মান্তরের দাম্পত্য জীবনের একটী ছবি দেখিতে পাইতেন। বিধুর নির্ব্বাসনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া, নিত্য সময়ে অসময়ে স্বামীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তর্কনিধি মহাশয়ের বিধুর উপর ক্রোধ হইবার যথেষ্ট কারণ

ছিল। তিনি বিধুকে মানুষ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিন কয়েক, তিনি তাহাকে পাঠশালা হইতে আনাইয়া নিজের টোলের ছাত্রবৃন্দের ভিতর বসাইয়া দিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের দুই একটা সূত্র তাহার কণ্ঠাধঃকৃত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কনিধির শত চেষ্টায়ও বিধুর কোমল রসনা দিব্যকাঠিন্যযুক্ত—'সহর্ণের্ঘঃ' 'আদিগোচ্চোর্ণুব্রীঃ' 'ড্রোট্রোর্ঘশ্চানু,' প্রভৃতি বোপদেব বাক্যের রস গ্রহণে সমর্থ হইল না। দরিদ্র রসনা বার দুই তিন দন্তাহত ও রক্তাক্ত হইয়া, তিনদিন নিরীহ যুবকের আহারের ব্যাঘাত উৎপাদন করিল। সন্তানবৎসলা বিন্দুবাসিনী আবার তাহাকে গুরুমহাশয়ের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিল। তর্কনিধিও নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহার পাঠশালা হইতে শুভ নিষ্কৃতিলাভ দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার ক্ষমার এগার বৎসর পার হইয়া গেল, গ্রামে তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহই আর অবিবাহিত রহিল না। ইতিমধ্যে রামধনের পুত্র তিনটা ইংরাজী পাশ করিয়া ফেলিল, হরিরামের পৌত্রও ইংরাজীতে লায়েক হইতে চলিল; তথাপি আঁটকুড়ীর নন্দন বিধুভূষণ পাঠশালা হইতে বাহির হইল না। তর্কনিধি ক্রোধে বিধুর বিদ্যার্জ্জনের পথরোধ করিতে রামধনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

(৪)

বিধুর নির্ব্বাসনে রামধন চট্টোপাধ্যায়ের একটু স্বার্থ ছিল। তর্কনিধি-গৃহিণী কথাপ্রসঙ্গে একদিন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাছে, ক্ষমার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়-পত্নী, ক্ষমার মা'র নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীকে সে কথাটা বলিয়া উদরাধ্মানের ও অগ্নিমান্দ্যের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল।

তাহার কারণ তর্কনিধি মহাশয়ের বেশ দু'পয়সা সঙ্গতি ছিল। সেই সম্পত্তির অধিকারিণী ওই একমাত্র কন্যা। ক্ষমা দেখিতে যদিও ততটা সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার স্মরণ মাত্রেই তর্কনিধির লোহার সিন্দুক ভেদ করিয়া আর একটা যে অপরূপ সৌন্দর্য্য মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে ঢাকাই মসলিনের মত জড়াইয়া তাহাকে আরব্যোপ-ন্যাসের পরী করিয়া তুলিয়াছিল, চাটুয্যে মহাশয় অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার চেয়ে অপ্সরার রূপ কত বেশি। ফলে চিন্তা করিতে করিতে, ত্রিদিবকামিনীদিগের হরিচন্দনপুষ্পরেণু-সম্পৃক্তা শ্রী ক্ষমার রূপের কাছে মলিন হইয়া গেল। এমন সর্ব্ব-লাবণ্যময়ী কন্যা, তাঁহার কন্দর্পকান্তি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামরূপ বাবাজীবন বর্ত্তমান থাকিতে কিনা শ্রীহীন গণ্ডমূর্খ বিধুভূষণের হাতে পড়িবে!

ক্ষমার দুঃখে তাঁহার প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। আর অদূর ভবিষ্যতের এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার পিতৃপিতামহসঞ্চিত অর্থের অযথা ব্যয় তাঁহার কল্পনাচক্ষে জাগিয়া হৃদয়টাকে বড়ই প্রপীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি কেমন করিয়া তর্কনিধির কাছে কথাটা পাড়েন! একে তিনি কুলীন, তাহার উপর ছেলের রূপগুণের কথা শুনিয়া কত দিগ্‌দেশ হইতে কত 'হট্টমালার' সম্বন্ধ কথা লইয়া কত ঘটক নিত্য তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেছে। সবার উপর কথাটা নিজে পাড়িলে বিবাহের পণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নিরুপায়ে চট্টোপাধ্যায় প্রিয়বন্ধু হরিরামের সাহায্যার্থী হইলেন।

তখন রামরূপ বি, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, আর বোকা বিধুভূষণ তর্কনিধির টোলে বসিয়া, 'ষ্ঠুভিষ্টস্যদাস্তটোঃ' বাক্যটা রসালবীজবৎ মুদিতনয়নে চর্ব্বন করিতেছে। এমন সময় হরিরাম

রামরূপের দূরদেশ যাত্রার শুভদিন দেখাইবার ছলে তর্কনিধির কাছে উপস্থিত হইল।

(৫)

তর্কনিধি তখন 'দান্তটোঃ'-রূপ আঁটিটী বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম গলছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষমার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে অসার খলুসংসারের উপর চটিয়াছেন, এবং তাহাকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ফেলিবার জন্য হুঁকা হাতে করিয়াছেন।

দু'টা একথা সেকথা—'তিথ্যমৃতযোগ' 'উত্তরে যোগিনী'—বারবেলা, কালবেলার পর, হরিরাম রামরূপের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"রামরূপ বি, এ পাশ দিতে কলিকাতায় যাইবে, তাই তার বাপ আপনার কাছে যাত্রার দিনটা দেখাইতে পাঠাইয়াছেন।"

তর্কনিধি বাম হাতে হুঁকা ধরিয়া, দক্ষিণ হাতে পাঁজি লইলেন। হরিরাম কথাটা শুনাইয়াও তর্কনিধির মুখে কোন ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না। তর্কনিধি পাঁজির পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রার শুভদিন বাহির করা দূরে থাকুক, সমস্ত পাঁজির ভিতরে তিনি একটা দিন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি রামরূপ ও বিদ্যাভূষণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে বিনির্গত এক বিরাট মায়া পাঁজির পাতে পাতে অঙ্কিত দেখিতেছিলেন।

তামাক টানিতে টানিতে হরিরাম বলিলেন—"আহা! রামরূপটী কেমন ছেলে!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। দিন দেখায় তর্কনিধি ব্যস্ত ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর হরিরাম আবার বলিলেন—"আহা কেমন ছেলে!"

তর্কনিধি বলিলেন—"বাঁদর।"

হরিরামের চক্ষু কপালে উঠিবার আয়োজন করিল। "সেকি তর্কনিধি! অমন সোণার ছেলে বাঁদর!"

যাহাকে ভালবাসি তার সহস্রদোষ থাকিলেও, যদি কেহ তাহার এক-আধটা কাল্পনিক গুণও সময় বুঝিয়া শুনাইয়া দেয়, তাকে বুঝি সব দিতে ইচ্ছা হয়। বিধুকে তর্কনিধি একটু আন্তরিক ভালবাসিতেন। তাই হরিরামের কথাটা বিধুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিলেন—

"তোমরা সবাই বল সোণার ছেলে, কিন্তু আমি হতভাগ্যের জন্য হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়া মরিলাম। সাতদিনে একটা সূত্র উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না।"

হরিরামের ধড়ে প্রাণ আসিল। হুঁকার একটা টানে আপাদমস্তক ধূমপূর্ণ করিয়া, তর্কনিধিকে সেটা ফিরাইয়া দিয়া, ধূম্রমিশ্রিত অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি বিদ্যাভূষণের কথা বলিতেছিনা, রামরূপের কথা বলিতেছি।" তর্কনিধি তখন নিজের ভ্রম বুঝিলেন। তাঁহার অপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অশাস্ত্রীয় ক্রোধ হৃদয়ে পুনঃ সঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও দুইই সমান।"

হরি। কেমন করিয়া?

তর্ক। বিদ্যালাভ না হইলে, বাঁদর না হইয়া কি হইবে?

হরি। সেকি তর্কনিধি মহাশয়! বালক এই বয়সে যে তিনটা পাশ করিয়া ফেলিল।

তর্ক। করিয়া ভূত হইল! সে আমাকে শিখাইতে আসে। আমি একদিন ছাত্রদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি—সূর্য্য নিত্য কেমন করিয়া ঘুরে বুঝাইতেছি—এমন সময় জ্যাঠা ছেলেটা কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল, পৃথিবী ঘুরিতেছে। কালকের ছেলে,

সে তর্ক করিয়া আমাকে বুঝাইতে চায়। আরে মূর্খ! পৃথিবী যদি ঘুরিত, তাহা হইলে, এতদিনে তোর বাবার তেএঁটে মাথার সঙ্গে তোর কচি মাথার ঠোকর লেগে ঘী বাহির হইয়া পড়িত।

হরিরাম স্বকীয় ঘটকালীর বিফলতা রামধনকে জ্ঞাত করিলেন।

(৬)

রামরূপের বি, এ পাশের খবর আসিয়াছে। বিদ্যাভূষণের, টোল ছাড়িয়া পাঠশালায় আবার "প্রমোসন" হইয়াছে।

হরিরাম আবার তর্কনিধির কাছে যাতায়াত করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে রামরূপ সম্বন্ধে একটা আধটা সুবিধামত কথা বলিতেছেন। একদিন তিনি বলিলেন, রামরূপকে জেলার বড় সাহেব ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তর্ক। বেশ।

হরি। তিনি বলেন, তোমাকে আমার এখানে একটা চাকরী দিতে ইচ্ছা করি।

তর্ক। খুব সদিচ্ছা।

হরি। কিন্তু রামরূপ চাকরী করিতে রাজী হইতেছে না।

তর্ক। কেন?

হরি। সে বলে, আমি একেবারে হাকিম হইব।

তর্ক। বটে!

হরি। কাজে-কাজেই সাহেব সেকহ্যাণ্ড করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

সেকহ্যাণ্ডের অর্থ বুঝিয়া তর্কনিধি বলিলেন—"তাহাকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিয়ো। কেননা সাহেবেরা অখাদ্য খায়।"

সুতরাং সেবারেও হরিরাম বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। আর একদিনের কথা—

হরি। পাঁইতাড়ার রাজার মেয়ের সঙ্গে রামরূপের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

তর্ক। শুনিয়া সুখী হইলাম।

হরি। মেয়ের বাপ্ একটা জমীদারী দিবে বলিয়াছে।

তর্ক। আহা বাঁচিয়া ভোগ করুক!

হরি। কিন্তু তাহার বাপ রাজী হইতেছে না।

তর্ক। তার দুর্ব্বুদ্ধি।

হরি। মেয়েটী কালো।

তর্ক। রূপ লইয়া কি ধুইয়া খাইবে! তুমি তাহাকে রাজী হইতে বল।

হরি। বলিয়া দেখিয়াছি।

তর্ক। কথা শুনেনা।

হরি। বলে, ছেলে কালো মেয়ে বে করিতে চায় না।

তর্ক। ও! আজকালিকার ছেলে, বাপের পছন্দে তার পছন্দ হয় না। সাধে কি আর দেশে এত আফিনের দর চড়িয়াছে।

আফিনের সঙ্গে মেয়ে-পছন্দের কি সম্পর্ক বুঝিতে না পারিয়া, হরিরাম বলিল—"আপনার ক্ষমাটী দিব্য মেয়ে।" তর্কনিধি আনন্দের আবেগে হাস্য করিলেন।

হরি। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, অমন সুলক্ষণযুক্ত মেয়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তর্ক। তবু কয়দিন মা আমার রোগা হইয়া গিয়াছে।

হরি। কেন—কোন অসুখ করিয়াছে কি?

তর্ক। তাতো বুঝিতে পারিতেছি না।

হরি। বিবাহযোগ্য হইল—বিবাহ দিতেছেন না কেন?

এমনি সময়ে ক্ষমা একটী সুন্দর খাঁচা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তর্কনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাঁচা কে দিল রে?"

ক্ষমা বলিল—"বিধুদাদা তইরি করিয়া দিয়াছে।"

তর্কনিধি অমনি বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগাটার অশেষ গুণ। ক্ষমার পুতুলের জন্য এমন সুন্দর ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন থয়েরের বাগান রচিয়াছে যে, দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু মা সরস্বতী কেন যে ছোঁড়াটার উপর বিরূপ তা' বুঝিতে পারিলাম না।" হরিরাম বলিলেন—"বোধ হয় ছোকরা আরজন্মে রাজমজুর ছিল।"

বিদ্যাভূষণ আরজন্মে যাই থাকুক সেদিনও হরিরাম কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া, তিনি রামধনের দৌত্য কার্য্যে ইস্তফা দিলেন।

রামধনের জেদ বাড়িল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তর্কনিধির কাছে কিছুও যদি না পাই, তথাপি তাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব।

তিনি নিজে যাইয়া তর্কনিধির কাছে প্রস্তাব করিলেন। প্রথম দুই চারিদিন কোনও উত্তর পাইলেন না। একদিন তর্কনিধি বলিলেন—'ভাবিয়া দেখি,' অপর একদিন বলিলেন—"আমি বেশী কিছু দিতে পারিব না।"

রামধন বলিলেন—"আপনি হরিতকী দক্ষিণা দিয়া কন্যা দান করিলে, তাই আমার যথেষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক তর্কনিধি একদিন নিজচক্ষে দেখিলেন, রামধন পাঁচ হাজার টাকা পণ ও সেই সঙ্গে সুন্দরী কন্যাদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ এইবারে ফাঁপরে পড়িলেন। এবং মনের আবেগে বিদ্যাভূষণকে মনে মনে অজস্র গালি দিলেন। তারপর গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন—"রামরূপের সহিত ক্ষমাসুন্দরীর বিবাহ দিব।"

মেয়ে দেখিতে দেখিতে ডাগর হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং অন্নদাসুন্দরী বিদ্যাভূষণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন এইমাত্র,—বিবাহে 'না' বলিতে পারিলেন না।

বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের একমাস পরে, একটা সুতহিবুক যোগে ক্ষমাসুন্দরীর সঙ্গে রামরূপের বিবাহ হইয়া গেল। বিধুভূষণের জননীর সেদিনকার সান্ধ্য রোদন, রামধনের গৃহিণীর শঙ্খধ্বনিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

(৭)

ইহার পর পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসরে রামরূপ এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর ক্ষমাসুন্দরী শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বার পঞ্চাশ যাতায়াত করিয়াছেন। তাহার কারণ, তর্কনিধির নিকট হইতে শুদ্ধমাত্র একটী হরিতকী দক্ষিণা লইয়া, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাটীকে পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিতকীটী কোন অবস্থাপন্ন হইবে, সেটা পাকা-দেখার সময় স্থির হয় নাই। সেইজন্য বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গৃহিণীর অনুরোধে একটী পক্ক হরিতকীর দাবী করিয়া বসিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকুল বজায় রাখিতে, বিদ্যাভূষণের অপমানের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পঞ্চসহস্র রজতখণ্ড বৈবাহিককে দান করিয়াও পাঁচবৎসর মধ্যে পক্ক হরিতকীর ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না।

মধ্যে মধ্যে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর, পুত্রবধূটীর উপর তাগাদা পড়িত। আজ বৎস রামরূপ গাউন পরিয়া কলিকাতায় বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে ডিপ্লোমা আনিতে যাইবে। তর্কনিধির পূর্ব্বজন্মার্জিত ভাগ্যে

জামাতার সে শোভা দেখিবার যদি সাধ থাকে, ত এখনি একশত টাকা দান করুক। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কন্যাকে ঘরে লইয়া যা'ক্। আমি আবার পুত্রের জন্য অন্য ভাগ্যবতীর অনুসন্ধান করি। আজ পুত্রকে হাকিম করিবার জন্য স্বয়ং রাজরাজেশ্বরীর নিকট হইতে সনন্দ আসিতেছে। সেই সনন্দ আনিতে হইলে, বাছাকে চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া বড়লাটের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহাতে তর্কনিধির কন্যারই ভবিষ্যতের বাঁধা সুখ। সুতরাং এই অমূল্য পদমর্য্যাদার সুখটী লাভ করিতে, পাথেয়স্বরূপ যে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হইবে, তাহা তর্কনিধি ভিন্ন অন্যে দিতে যাইবে কেন?

কাজেই মাঝে মাঝে ক্ষমাকে অর্থের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহে যাইতে হইত।

বারম্বারের তাগাদায় তর্কনিধির প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। অথচ বিচারদণ্ড হাতে করিলে, বাছার কচি হাতের কবজীতে ব্যাথা লাগিবে বলিয়া, রামরূপের হাকিম হওয়া হইল না। আর জেলা-কোর্টে ওকালতী করিতে গিয়া, তাহার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গেল বলিয়া তাহার ওকালতীতেও সুবিধা হইল না। জজ সাহেব একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ইস্কুল-মাষ্টারীর চেষ্টা কর। একটা তুচ্ছ অর্থহীন ফাঁকা কথা লইয়া মেয়েলী ঝগড়া করা তোমার ন্যায় বীর পুরুষের কার্য্য নয়।"

সাহেবের আদেশ অমান্য করা ভদ্রতার সীমা বহির্ভূত বলিয়া, রামরূপ মাষ্টারী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘরে ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বুঝিলেন, স্বামী না বুঝিয়া একটা অলক্ষণা কন্যা গৃহে আনিয়াছেন। সুতরাং এরূপ কন্যার বাপ ও মা—দুইজনেই যখন তাহার লক্ষণহীনতার জন্য দায়ী, তখন হয় তারা পুত্রের কোন একটা চাকরীর ব্যবস্থা করুক, না হয় 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' শাস্ত্রবাক্যটার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য, রামরূপকে কতকগুলি টাকা দিয়া যে কোন একটা কারবারে নিযুক্ত করুক।

তর্কনিধি বৈবাহিকার এই সৎপ্রস্তাবে আপনাকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। এবং বৎস রামরূপকে একদিন নিকটে পাইয়া বলিলেন, "বৎস! এখন তোমার জ্ঞানমাহাত্মের পরিচয় পাইতেছি। এখন বুঝিতেছি, পৃথিবীই অহর্নিশি ঘুরিতেছে।"

(৮)

রামরূপ কিন্তু এ সত্য বাক্যের সার গ্রহণে অসমর্থ হইল, এবং শ্বশুরের প্রতি কুপিত হইয়া, মায়ের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিল, বলিল—"ও টুলো বামুনের সঙ্গে যদি আর সম্পর্ক রাখ, তাহা হইলে আমি দেশত্যাগী হইব।" চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"যদি বাছার আমার আবার বিবাহ না দাও, তাহা হইলে গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

রামধন মনে মনে বুঝিলেন—"এ বড় মন্দ কথা নয়। অর্থোপার্জ্জনের এমন সুগম পন্থা এতকাল বিস্মৃত হইয়াছিলাম কেন?

দেশের দুর্ভাগ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার অবসর পাইলে অনেক সময়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। পুত্রের পুনর্ব্বিবাহের কথা রামধনের মনে জাগিতে না জাগিতে, পাত্রীর সন্ধান মিলিয়া গেল। সন্ধানদাতা হরিরাম ঘোষাল। রামরূপের প্রথম বিবাহের দৌত্যকার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া, তর্কনিধির উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল। সেই ক্রোধের ফলে, তিনি ক্ষমাসুন্দরীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। পাত্রীর পিতার অবস্থা ভাল নয়। এইজন্য কন্যাটীকে বয়স্থা করিয়া, তিনি কোন বিপত্নীকের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন এই সর্ব্বগুণাধার সপত্নীকের সন্ধান পাইয়া, তিনি

অনিশ্চিত বিপত্নীকের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিরামের সঙ্গে মিশিয়া অভাগিনী ক্ষমার সর্ব্বনাশে অগ্রসর হইলেন।

এ কথা তর্কনিধি ও অন্নদাসুন্দরীর কাণে উঠিতে বাকী রহিল না। কন্যার দুঃখে মর্ম্মপীড়িত হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্রাহ্মণ-দম্পতী ছুটিয়া আসিলেন! কিন্তু ফল হইল না। কন্যা ক্ষমার এত বয়স পর্য্যন্ত পুত্রহীনতার দোহাই দিয়া, তিনি কুলধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট,—তর্কনিধির মিনতিতে কর্ণপাত করিলেন না। তর্কনিধি, কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

ক্ষমা এতকাল দেবতারও কাছে মনোভাব প্রকাশ করে নাই। বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের পর হইতে এই এতকাল পর্য্যন্ত সে সুখী কি দুঃখী, অন্যের জানা দূরে থাক্, তাহার পিতা মাতা পর্য্যন্তও জানিতে সমর্থ হন নাই। রামরূপের বিবাহের পর হইতে তর্কনিধির সংসারে এই যে এত ঝড় চলিয়া গিয়াছে, সে সকল ঝড়ের প্রকোপ কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সহ্য করিয়াছেন। অপমানে, শ্বশুর শাশুড়ীর তিরস্কারে, অর্থের জন্য নিত্য পীড়নে—এমন কি দাম্ভিক স্বামীর হৃদয়-হীনতায়—কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সমমর্ম্মী প্রতিবাসী-প্রতিবাসিনীরা তাহাকে বোকা মেয়ে বলিত।

একদিন ক্ষমাসুন্দরী অন্যমনে অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অন্নদাসুন্দরী স্বামীকে বলিতেছিলেন—"জামাইকে ব্যবসায় করিতে টাকা দিলেই যদি বিবাহটা বন্ধ হয়, ত কিছু টাকাই দাওনা কেন?"

ক্ষমা অন্তরাল হইতে কথা শুনিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া, বাহিরে আসিয়া বলিল—"সর্ব্বস্ব দিলেও তাহাদের মন পাইবে না, আমার যা হইবার তা হইয়াছে। তোমরা কেন বৃদ্ধ বয়সে ভিখারী হইবে।"

তর্কনিধি মর্ম্মবেদনায় গালে হাত দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে-

ছিলেন। ক্ষমা বলিল—"কাঁদেন কেন বাবা! মূর্খের হাতে পড়িলে দুঃখে দিন যাইবে বলিয়া, আপনি পণ্ডিতের হাতে আমাকে দিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্ট, তাহাতেও আমার দুঃখ ঘুচিল না।"

তর্কনিধি বলিলেন—"মা! নিরপরাধ ব্রাহ্মণসন্তানকে অপমানিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়াছি। এ আমার সেই মহাপাপের ফল।"

ক্ষমা বলিল—"আমারও বোধ হয় তাই। ইহাদের টাকা দেওয়া অপেক্ষা, আপনি তাহার দরিদ্রা জননীকে টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

অন্নদাসুন্দরী বলিলেন—"ঠিক কথা। ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিয়াছে।"

ক্ষমা। সে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবে না জানি। কিন্তু তার মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বিস্মিতনেত্রে ব্রাহ্মণ, কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। "মা! আমার সঙ্গে কাশীবাস করিতে পারিবি?"

ক্ষমা। সেত আমার সৌভাগ্য। অরণ্যে বাস করেন ত, আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।

(৯)

পরদিন প্রাতঃকালে তর্কনিধি, অর্থদানে ও ক্ষমাপ্রার্থনায় বিধুর নির্ব্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া দেখেন, বিন্দু দ্বার বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার পাড়ার লোকে কেহই তার খবর দিতে পারিল না। দুই এক দিন তাহার অপেক্ষা করিয়া, যখন দেখিলেন বিন্দু আসিল না, তখন কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া ব্রাহ্মণ কাশী যাত্রা করিলেন।

তার পরদিন বৎস রামরূপের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধের শঙ্খধ্বনি হইল। স্থির হইল, একপক্ষ পরে বিবাহ হইবে। চট্টোপাধ্যায়ের

যথেষ্ট প্রাপ্তি না হইলেও, নানা জাতীয় হিসাবে কন্যার পিতার নিকট হইতে, প্রায় দেড়হাজার টাকার দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা রহিল।

তৎপর দিন অন্যমনস্কে ষ্টেট্‌সম্যানের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভটা পরীক্ষা করিতে গিয়া রামরূপ দেখিল, রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য একজন এম,এর প্রয়োজন। বেতন একশত টাকা।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রামরূপ উক্ত গ্রামের উদ্দেশে এক খানা দরখাস্ত নিক্ষেপ করিল।

সপ্তাহমধ্যে টেলিগ্রামে প্রত্যুত্তর আসিল—"আবেদন গ্রাহ্য হইল, পত্রপাঠ রওনা হউন।"

বিদ্যুৎগতিতে এ শুভসংবাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। সকলে বলিল—"কন্যা কি সুলক্ষণা।"

বাধ্য হইয়া চট্টোপাধ্যায়কে ভাবী বৈবাহিককে জানাইতে হইল,—"দিন কয়েকের জন্য বিবাহ স্থগিত থাকুক। কেননা তাহার সুলক্ষণা কন্যার গুণে রামরূপ বাবাজীবনের হাকিমীর মত একটা চাকরী জুটিয়াছে। সেই পদ হইতেই বাবাজীবনের দুই দিন পরে জজ হইবার সম্ভাবনা।"

(১০)

কর্ম্মস্থানে যাইয়া অবধি রামরূপের সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। উত্তম আহার, সুন্দর বাসস্থান,—চাকরে নিত্য পরিচর্য্যা করিতেছে—অথচ এক পয়সা খরচ নাই। ইস্কুলের সেক্রেটারী প্রতিদিন তত্ত্বাধান করিতেছেন।

রামরূপ পিতাকে লিখিলেন—"বড়ই সুখে আছি।"

পিতা লিখিলেন—"তাতো আছ; কিন্তু বিবাহের কি? কন্যার পতা আসিয়া নিত্য তাগাদা করিতেছে।"

রামরূপ উত্তর দিলেন—"বিদ্যালয়ের মালিকের সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছু লিখিতে পারিতেছিনা।"

"তবে দেখা কর।"

"তিনি এখন কাশীতে—শীঘ্রই এখানে আসিবেন।"

পাঠক মনে রাখিবেন, এ উত্তর প্রত্যুত্তর চিঠিতে চলিতেছে।

দিন কয়েক পরে, পিতা পত্র পাইলেন—"মালিক কাশী হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে পত্রে তাঁহার মনোভাব জানিয়া বুঝিয়াছি যে, ইস্কুলটী নূতন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, তিনি এখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তবে একান্তই যদি আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি এই স্থানেই বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। এখানে আপনাদের সামান্যমাত্রও অসুবিধা হইবে না। আমার মনীব যেমন ধনবান, তেমনি সদাশয়। গ্রামের লোকও অতি ভদ্র।"

(১১)

আজ সন্ধ্যার পর রামরূপের সহিত মালিকের সাক্ষাৎ হইবার কথা। কাল ভাবীশ্বশুর, কন্যাকে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইবেন, সঙ্গে তাহার পিতা ও উভয়পক্ষীয় দশ পনেরো জন লোক আসিবে। রামরূপ উত্তম বেশভূষা করিয়া, মনীব প্রেরিত লোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, এমন সময় গোলাম হাজরা গুরুমহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাম। একি, গুরুমহাশয়! আপনি এখানে?

গো। আমি তোমাকে তোমার মনীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইতে লইতে আসিয়াছি।

রাম। আপনি এখানে কি সূত্রে আসিয়াছেন?

গো। নিকটেই আমার একটী ছাত্র আছে, আমি তাহার কাছে

আসিয়াছিলাম, আসিয়া শুনিলাম, এখানে তোমার বিবাহ হইতেছে। আমার সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—আমার গর্ব্বের সামগ্রী। তোমার বিবাহ আমি দেখিতে আসিব না ?

রাম। আমার মনীবের সহিত আপনার আলাপ কিসে হইল ?

গো। তাঁর স্বামী আমার ছাত্র।

রাম। আমার মনীব কি স্ত্রীলোক ?

গো। স্ত্রীলোক।

রাম। তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া দেখা করিব ?

গো। তাঁহার স্বামী নিকটে থাকিবেন।

গুরুমহাশয়ের সঙ্গে রামরূপ মনীব-দর্শনে চলিল।

(১২)

রামরূপের বাসা হইতে মনীবের বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা—যে রামরূপকে দেখিল, সেই তাহাকে সম্যক অভিবাদন করিল। মনীবের বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর বাগান। সেই বাগানের মধ্য দিয়া অট্টালিকা প্রবেশের পথ। পথের দুই ধারে সারি সারি প্রস্তরমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পরেই রেলিং। রেলিংএর পরে পথের উভয় পার্শ্বে শিল্পকার্য্যময় তৃণগালিচার মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় আলেখ্যলিখিতবৎ পুষ্পবৃক্ষ। দৃশ্য দেখিয়া রামরূপ মুগ্ধ হইল। ফটকের উভয়পার্শ্বে, পথের মধ্যে স্থানে স্থানে এবং বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতলে যাইবার সমস্ত সোপান পথে সুন্দর বেশ পরিয়া, আশাসোঁটা হাতে অনেক ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। রামরূপ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি সকলে সসম্ভ্রমে সেলাম করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া রামরূপ বিস্ময়ে যদি আত্মহারা না হইত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইতে পারিত,—"আমিই এ অট্টালিকার মালিক।"

হাজরা-মহাশয় তাহাকে একটী সুন্দর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করাইল, এই খানেই তাহার মনীবের সহিত সাক্ষাৎ।

মনীবকে দেখিয়াই বিস্মিত যুবকের মাথা ঘুরিয়া গেল। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! "ক্ষমা! তুমি এখানে ?"

ক্ষমা। পতি-পরিত্যক্তা এরূপ স্থানে আসিবার যোগ্য না হইলেও ভাগ্যবশে এখানে আসিয়াছি।

রাম। আমি যাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেছি, তিনি কই ?

এবারে গুরুমহাশয় ক্ষমার হইয়া কথা কহিলেন। "তিনি তোমার ওই সম্মুখে।"

ক্ষমা ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাতে একতাড়া কাগজ দিল। দিয়া বলিল—"এই সমস্ত দলিলে লিখিত সম্পত্তি আমার ভাবী-সপত্নীকে যৌতুক দিয়ো।"

রামরূপ দলীলে দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ না করিয়াই, ক্ষমার পায়ে ধরিতে অগ্রসর হইল। ক্ষমা বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রামরূপ বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা, এ নরাধম স্বামীকে ক্ষমা করিয়া নামের স্বার্থকতা রক্ষা কর।

"তুমি ক্ষমার গুরু, তোমার উপর ক্রোধ করিবার ক্ষমার অধিকার কি ?"

রামরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—"কে আপনি ?"

"আমি নির্ব্বাসিত।"

এখন যদি তর্কনিধি আসিয়া রামরূপকে বলিতেন যে—"বৎস রামরূপ পৃথিবীই ঘুরিতেছে," তাহা হইলে বৎস রামরূপ বোধ হয় আর শ্বশুরের উপর ক্রোধ করিত না। পৃথিবী ঘোরার কথা রামরূপ কেতাবেই পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে গতিশীলা

ধরার বিদ্যুৎবেগে আত্মপরিক্রমণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হাজরা বলিল—"বৎস রামরূপ! বিদ্যাভূষণ তোমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ কর।"

ক্ষমা বলিল—"বিধুদাদা, তোমাকে একদিনে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন।"

(১৩)

এখন এই বিদ্যাভূষণের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির ইতিহাসটা না বলিলে গল্পটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বিদ্যাভূষণ বাটী হইতে বাহির হইয়া, এক এক্সিকিউটিব ইনজিনীয়র বাবুর পাচক কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইনজিনীয়র বাবু সে সময় এসেনসোলের কাছে দামোদরের উপর এক পুল তৈয়ার করিতেছিলেন। বিধুর পড়াশুনাটা সুবিধামত না হইলেও, বাল্যকাল হইতেই স্থাপত্যকার্য্যে তাহার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল।

একদিন তাহার প্রভু এক সহকারী সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া, পুল নির্ম্মাণ কার্য্যের একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। বিধু সেই সমস্যাটা পূরণ করিয়া দিয়াছিল। সাহেবজাতি গুণগ্রাহী। তদ্দণ্ডেই তিনি বিধুকে আপনার অধীনে একটা কনট্রাক্‌টারী কাজ দিলেন। আর একদিন সাহেবের অনুরোধে বিধু একটী ঘরের প্ল্যান করিয়া সাহেবকে নিজশক্তির পরিচয় দিবার অবকাশ পায়। এই সদাশয় সাহেবের অনুগ্রহে বিধুভূষণ অল্পদিনের মধ্যেই একজন বড় কনট্রাক্‌টর হইয়া পড়িল।

বিধু এইস্থানে কিছু জমী সংগ্রহ করে। ভাগ্যবশে তাহার ভিতরে পাথুরে কয়লার খনি বাহির হইল। অর্থাৎ ভাগ্য বছর পাঁচেকের ভিতরেই বিধুকে লক্ষটাকা আয়ের সম্পত্তি করিয়া দিল।

এতদ্ভিন্ন বিধুর দুই দুইটা কয়লার খনিতে নিত্য প্রায় পাঁচশত টাকার কয়লা উঠিতেছে।

বাটী হইতে বাহির হইয়া বিধু নাম গোপন করিয়াছিল। পাছে গ্রামের লোক জানিতে পারে, এইজন্য সে মাকে পর্য্যন্ত নিজের সন্ধান দেয় নাই। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিধু অতি অল্পদিন হইল মাকে আনাইয়াছে।

ক্ষমাকে বিধু দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিল। আর গোলাম হাজরা গুরুমহাশয়, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল।

বলা বাহুল্য, ক্ষমাসুন্দরী, রামরূপ, গোলাম হাজরা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি বহু আত্মীয়ের অনুরোধে, কন্যার বিপন্ন পিতার মর্য্যাদা ও কুলরক্ষার্থ, করুণার্দ্র বিধু নবাগত বালিকাকে আপনার পঞ্চবৎসরের উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া লইল।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

তুকারামের আত্মকাহিনী।

তুকারাম, দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িয়া, নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার করা দূরে থাকুক, তাহাই তিনি সৌভাগ্যের সোপান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একটি অভঙ্গে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভালই হইল, দেব !—হ'নু দেউলিয়া,
ভালই—পাইনু কষ্ট দুর্ভিক্ষে পড়িয়া ;
সেই কষ্টে পড়ি' করি তোমায় চিন্তন,
সংসার হইল মোর অস্পৃশ্য বমন।
ভালই—আমার স্ত্রী বড়ই কর্কশা,
ভালই—আমার হ'ল এহেন দুর্দ্দশা।
ভালই—সমাজে মোর হ'ল অপমান,
ভাল হ'ল—সব গেল—ধন, ধেনু, ধান।
ভালই—করিনি আমি লোক-লাজ-ভয়,
ভালই—লইনু দেব—ও পদ-আশ্রয়।
ভালই—করিয়াছিনু দেবালয়ে বাস,
স্ত্রীপুত্রের 'পরে করি' উপেক্ষা প্রকাশ।
তুকা বলে—ভালই—করিনু একাদশী,
ভজনে কাটানু রাত হইয়া উপোসী ॥

তুকারামের স্ত্রী, তুকারামের আচরণে কোপাবিষ্ট হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেন তাহা নিম্নলিখিত অভঙ্গগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১)

আমার সম্বন্ধে শুধু হ'ল সে সন্ন্যাসী,
ছাড়িল কি কিছুমাত্র অন্য ভোগ-রাশি ?

সহজে আসিয়া জোটে সর্ব্বসুখ তার,
অপমান দূর শুধু হ'ল না আমার।
কার্ পত্নী হয়ে এবে সংসার করিয়া
আপদ-বিপদ আমি রহিব সহিয়া ?
ছেলেদের দিব কিবা ?—খাবে যে আমারে ;
হ'ত ভাল যদি যে'ত সবগুলো মরে'।
ধুয়ে-পুঁছে নিল, কিছু না রাখিল ঘরে,
গরুটি নাই যে মেজে নিকোই গোবরে।'
তুকা বলে ;—হতভাগি ! নাহি দেখ ভেবে
স্বেচ্ছায় বহিয়া বোঝা কেন কাঁদো এবে ॥

(২)

পূর্ব্ব জন্মে ছিল শত্রু হেন হয় বোধ,
—এ জন্মে স্বামী হয়ে লয় তাই শোধ।
এই দুঃখ কত আর রহিব সহিয়া,
হাঁ-করি অন্যের পানে থাকিব চাহিয়া ?
দূর হ' * বিঠ্ঠল তুই—কি করিলি বল্ ?
—তো-হতে মোদের-সব কি হ'ল মঙ্গল ?
তুকা বলে :—পত্নী মোর কোপের আবেশে
কাঁদে কভু গুমরিয়া—কভু ওঠে হেসে ॥

(৩)

এক বস্তা শস্য যদি ঘরে এল হায়,
ছেলেদের তবু কিছু খেতে নাহি দেয় ;

---

* তুকারামের ইষ্টদেবতা।

পরের পেটয়া ভরে—সেই সে অপ্লেয়ে গৃহ-চোর ;
তুকা বলে ঃ—দিতে গেলে—মুচড়িয়া ধরে হস্ত মোর।
হত্তভাগি ! পাপ তোর আছে যা’ সঞ্চিত
—তা-হতেই এই সব দুর্ব্বুদ্ধি নিশ্চিত ॥

(৪)

কি খাবি এখন তুই বল্ বাছা মোরে,
বাপ তোর করে বাস মন্দির-ভিতরে।
মস্তক ভূষিত করে, কণ্ঠে পরে মালা,
নিজ ব্যবসায় ছাড়ি’ থাকয়ে নিরালা।
ভরায় আপন পেট—নাহি চাহে আমাদের পানে,
হস্তে করতাল লয়ে হাঁ-করিয়া গায় দেব-স্থানে।
কি করি আমরা এবে ?—সে যে বনে করেছে প্রবেশ ;
তুকা বলে, ধৈর্য্য ধর—এখনো হয়নি সব শেষ ॥

(৫)

গেছে সে হয়েছে ভাল—মিলিয়াছে আর সমুদায় ;
পেট ভরে’ খাব এবে—হোক্ শুষ্ক রুটি—কিবা তায়।
আমি হতভাগী তারে বকিয়াছি কত কটুভাষে ;
তুকা বলে ! কটু বটে—কিন্তু তবু মোরে ভালবাসে ॥

(৬)

নাহি চাহে কোন কিছু ব্যবসা করিতে
বিনাশ্রমে পেট ভরি’ চায় যে খাইতে।
শয্যা হতে উঠিয়াই ধরিয়া কর্ত্তাল
সর্ব্ব-সাথে মিলি’ করে শব্দ বিট্‌কাল।

জীবন্তে মরিয়া আছে—নাহি কোন লাজ,
সংসার দেখে না কিছু—মাটি হয় কাজ।
তাদের পত্নীরা পেয়ে ঘোর মনস্তাপ,
মাথা খুঁড়ে মরে, আর দেয় অভিশাপ।
তুকা বলে ঃ—সব ঠিক্—এ-ত সমুচিত,
মাথা পাতি’ লও যাহা ললাটে লিখিত।
“এই সব লোক কেন আইসে হেথায় ?
নাহি কিগো উহাদের কোনো ব্যবসায় ?”
দেবের সম্বন্ধে বিশ্ব আমার সোদর,
কিবা ব্যয় দিতে মিষ্ট কথায় উত্তর ?
বহু মিনতিতে যারে নাহি আনা যায়
সেও আসে প্রীতি-ভরে আমার হেথায়।
তুকা বলে ঃ—হতভাগী না চিনে ভূষণে,
শূনী-সম তেড়ে যায় সবার পিছনে ॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিব্বতদেশের বজ্র ভৈরব।

গত তিব্বত-যুদ্ধের সময়ে তিব্বত হইতে যে সকল আশ্চর্য্য বস্তু আনীত হইয়াছে তন্মধ্যে বজ্র ভৈরবের চিত্রফলক অন্যতম। গ্যাংচির সন্নিহিত কোন বৌদ্ধ বিহারে ইহা সংরক্ষিত ছিল। গ্যাংচি বিধ্বস্ত হইবার পর উহা ইংরেজ সৈন্যগণের হস্তগত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটীর আগষ্ট মাসের অধিবেশনে আমি ঐ ফলকখানি প্রদর্শন করি। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৩/৪ হস্ত এবং বিস্তার ১৩/৪ হস্ত। উহা চীন দেশীয় শিল্পের রীতি অনুসারে সুরক্ষিত ও সুচিত্রিত। ফলকের সম্মুখভাগে ক্রোধশীল বজ্র ভৈরবের মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার সাধনের মন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ।

চিত্রফলকখানি তিব্বতের কারগুপ্যা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। অধুনা উহা বারাকপুরের সিবিল সার্জন পার্শিব্যাল লোপেজের অধিকারে বিদ্যমান আছে।

শিব বা রুদ্রের অন্য নাম ভৈরব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৪১ ও ৬১ অধ্যায়ে অষ্ট ভৈরবের উল্লেখ আছে। উহাতে বজ্র ভৈরবের নাম দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু সংহার ভৈরবের উল্লেখ আছে। হিন্দুগণের সংহার ভৈরব ও বৌদ্ধগণের বজ্র ভৈরব বোধ হয় একই দেবতা। অতএব হিন্দুমতে বজ্র ভৈরব রুদ্রের নামান্তর বা রূপান্তর। কিন্তু তিব্বতবাসীগণ তাঁহাকে পরমকারুণিক অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্যন্তর বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রুগণকে পদদ্বারা বিমর্দ্দিত করিয়া হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার মস্তক প্রকাণ্ড, উদর স্ফীত এবং পদ হ্রস্ব। তাঁহার চক্ষুঃ তিনটী, উহা রক্তবর্ণ; কুকুরের ন্যায় দন্ত; লোলায়মান জিহ্বা; কূর্চ্চ এবং নেত্রলোম পীতবর্ণ। তাঁহার সমস্ত শরীর সর্পদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং

শরীরের চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা বিরাজমান। নরমুণ্ড তাঁহার শিরোভূষণ এবং গলদেশ মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোভিত। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস আরম্ভ হয় তখন বুদ্ধদেব স্বপ্রচারিত ধর্ম্ম শত্রুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বজ্র ভৈরবকে উহার রক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম আরম্ভ হয়।

বজ্র ভৈরবের বামপার্শ্বে তাঁহার শক্তি বিরাজিত। ইঁহার নাম কালী। ইঁহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও হস্তে অসি।

কালীর নিম্নেই তাল বেতাল। উহাদের দেহে কঙ্কাল আছে কিন্তু চর্ম্ম নাই। উহারা নরমুণ্ড ভক্ষণ করে ও অস্থি লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করে।

ফলকের উপরিভাগে আদি বুদ্ধ বজ্রধরের মূর্ত্তি। তিনি যোগাসনে আসীন। তাঁহার নিম্নে মহাযোগী তিলোপা উপবিষ্ট। তিনি বজ্রধরের সাক্ষাৎ শিষ্য। তিলোপার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য নরোপা এবং তাঁহার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিলোপা নরোপা ও অতীশ ইঁহারা তিনজনেই ভারতবর্ষের লোক। অতীশের জন্মভূমি বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। বজ্রধরের বাম পার্শ্বে কারগুপ্যা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ মার্পা ও তাঁহার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য সুবিখ্যাত মিলরেপা। মার্পা ও মিলরেপা তিব্বতদেশের লোক হইলেও ইহাঁরা ভারতীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন।

ফলকের পশ্চাদ্‌ভাগে ওঁ আং হূং এই বীজমন্ত্র ১৬ বার লিখিত। এই মন্ত্রের প্রভাবে দশবিধ দৈহিক মল অমৃতে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন এই পার্শ্বে বজ্রভৈরব সাধনের মন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই :—"হে কালান্তক বজ্রভৈরব আমার এই উপহার গ্রহণ কর। আমার শত্রু বিনষ্ট হউক, বিঘ্ন দূরে যাউক, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার মঙ্গল কর। হে ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনি, তোমরা এখানে আগমন কর, এখানে উপবেশন কর, আমাকে রক্ষা কর, এই উপহার গ্রহণ কর। হে বজ্রভৈরব তুমি পুরাকালে বুদ্ধের সমক্ষে বলিয়াছিলে তুমি তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। অতএব তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তুমি বুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা কর, এবং ধর্ম্মের শত্রুগণকে ধ্বংস কর। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীকে রক্ষা কর। জীবগণের প্রতি করুণা বর্ষণ কর এবং যোগ সিদ্ধি লাভ করুক।"

বজ্রভৈরব অতি ভীষণ দেবতা। ইনি সন্তুষ্ট হইলে ইহকালে সুখ ও সম্পদ লাভ হয় এবং পরকালে নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার ঘটে তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। এই হেতু লামাগণ সর্ব্বদা বজ্রভৈরব ও তাঁহার সহচর ভূতপ্রেতগণের ভয়ে কম্পিত কলেবর। ঐ ভূতপ্রেতকে সুপ্রসন্ন করার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা মন্ত্র তন্ত্রাদির আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, গত তিব্বত যুদ্ধের সময়ে লামাগণ বজ্রভৈরব সাধন করিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর উহাঁর ক্রোধ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্যাংচিতে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল বেথুন প্রভৃতি এইখানে নিহত হন।

বজ্র ভৈরবের ফলকে নররুধিররঞ্জিত অঙ্গুলিচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সুখ।

হে রাজন, এ সংসারে সুখ যারে বলে
তাহা তুমি দাওনি আমারে, দৃপ্তবলে
কাড়িয়া লয়েছ তার সর্ব্ব আয়োজন
মুহূর্ত্তের মাঝে, তবুতো আমার মন
পার নাই অসুখী করিতে, আপনি সে
তোমার অসীম কান্ত নীলাম্বরে মিশে,
তব চন্দ্র সূর্য্যালোক বসন্ত পবন
তব ছায়াপথ প্রান্তে গ্রহ অগণন
সুন্দর ভুবন তব অপার সাগর
নিত্য অভিনব ধাতু ভূধর নির্ঝর
অন্তহান সৌন্দর্য্যের সমুদ্র মন্থিয়া
আনন্দ সঞ্চয় করি এসেছে ফিরিয়া!
বহুদূর তীর্থযাত্রী ভক্তের মতন
ফিরিল নির্ম্মাল্য বহি, পরিপূর্ণ মন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অমঙ্গল।

এস অমঙ্গল, তোমাকে বরণ করিয়া গৃহে লইব। এতদিন তোমায় চিনি নাই, তাই তোমা হইতে দূরে রহিয়াছি,—রহিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তুমি দূরে থাকিতে দাও নাই।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতে আজি তোমার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব। মঙ্গল এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গৃহে গৃহে আজি তোমার ধ্বজা উড়িতেছে; গৃহে গৃহে করুণ আর্ত্তনাদ আজি তোমায় অভিবাদন করিতেছে। রুগ্নদেহ, শীর্ণকায়, হৃতসর্ব্বস্ব লক্ষ নরনারী হৃদয়ের অস্থিমজ্জা দিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতেছে। পুত্রগতপ্রাণা একমাত্র পুত্র তোমার চরণে বলি দিয়াছে। পতিব্রতা পত্নী হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামী-ধনে তোমার পূজা করিয়া অশ্রুজলে নিয়ত তোমার চরণ অভিষিক্ত করিতেছে; অন্নহীন কঙ্কালসার কোটী কোটী মানব ভিক্ষাখর্পরে তোমায় তর্পণ করিতেছে; ব্যধিপ্রপীড়িত অসংখ্য লোক মৃত্যুদ্বারে দাঁড়াইয়া তোমারই জয়ধ্বনি গাহিতেছে। বহুদিন হইতে আমরা তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। তোমার অপ্রিয় যাহা কিছু আমাদের ছিল, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। শতশত বৎসর হইল এ ভারতে যদ্দ্বারা মঙ্গলের অর্চ্চনা হইত, সমস্তই আমরা ত্যাগ করিয়াছি। সংযম,—যাহা এই ভারতেরই বিশেষত্ব ছিল, অনেক দিন তাহা ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। স্বার্থত্যাগ,—যাহাতে আমাদের পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল বহুদিন আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রীতি,—যাহা প্রতি গৃহস্থের গৃহ পূর্ণ করিয়া অপরিচিত অভ্যাগতকে গৃহে আহ্বান করিয়া লইত, এবং ইতর জীবে পর্য্যন্ত অজস্র প্রবাহিত হইত তাহা আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। সন্তোষ

—যাহা আমাদিগের পিতামহগণকে শাকান্নে তৃপ্ত করিয়া মহত্তর বিষয়ে মনঃসংযোগ করাইত, আমরা জন্মের মতন তাহা হারাইয়াছি। এই সমস্তেরই ফলস্বরূপ যে অনিন্দনীয় স্বাস্থ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের প্রতি গৃহ প্রতি পল্লী অলঙ্কৃত করিত, সে আমাদিগকে অভিসম্পাত দান করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন অশান্ত স্বার্থপর মন, রুগ্ন দেহ ও ছিন্ন কন্থা লইয়া তোমায় অভিবাদন করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

তুমি অনন্ত ক্ষমতাশালী ও বহুরূপী। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও দারিদ্র্যরূপেই তুমি এতদিন পরিচিত ছিলে; অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতা রূপ এক নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া তুমি ভারতে বিরাজ করিতেছ। তুমি ছদ্মবেশী; মঙ্গলের মূর্ত্তি ধরিয়া ভারতসন্তানকে প্রলুব্ধ করিতেছ, আমরা দলে দলে তোমার পশ্চাৎ ছুটিয়াছি; বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি; তুমি কোথায় লইয়া যাইবে, কে জানে?

আমাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তুমি দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এক নিবিড় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। শান্তিনিকেতন পল্লীগ্রামগুলি সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ ছিল, আজি সেখানেও তুমি পাশ্চাত্য সভ্যতারূপে প্রবেশ করিয়া নিবিড় বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছ। আজি আর তথায় দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান শাকান্ন ভোজন করিয়া,—শুভ্র উত্তরীয় গায়ে, চন্দন চর্চ্চিত ললাটে রাজধানীর ভোগবিলাস তুচ্ছ করে না। বিলাসলালসা, অর্থ-পিপাসা আজি পল্লীগ্রামের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজি দলে দলে লোক রাজধানীর অভিমুখে অর্থলোভে ধাবিত হইতেছে আর নিয়তির কঠোর নিষ্পেষণে পীড়িত হইয়া বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতেছে। অত্যন্ত অনাবশ্যক নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া, তাহারই পরিপূরণার্থ আমরা অমূল্য জীবন অতিবাহিত

করিতেছি, আর অকৃতকার্য্য হইয়া মনস্তাপে জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছি। আজি সে চিত্তের বল নাই, মহদ্বিষয়ে মনঃসংযোগের প্রচার নাই। যাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই তাহাই না পাইয়া আমরা কাঁদিয়া মরিতেছি—আর যাহা অতীব প্রয়োজনীয়, তাহাই অবহেলা করিতেছি।

আজি আর ব্রাহ্মণকণ্ঠনিঃসৃত বেদগান সায়াহ্ন ও প্রত্যূষ গগনে উত্থিত হইয়া বিধাতার চরণপ্রান্তে মিলাইয়া যায় না। আজি আর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া ভিক্ষাভাণ্ডকরে তপোবন আশ্রয় করে না। জীবনমধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইলে গৃহস্থগণ আজি আর বিধাতার চরণে বাণপ্রস্থাশ্রমে আত্মজীবন উৎসর্গ করেনা। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকলেরই আজি এক চিন্তা,—অর্থ। বিধাতা আজি সিংহাসনচ্যুত, অর্থ তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সেই চিত্তোন্মাদকর, বিলাসসহচর অর্থের অনুগ্রহলাভেও আমরা বঞ্চিত। তাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাহীন বলিয়া করুণ বিলাপে আমরা নভস্তল পরিপূরিত করিতেছি। সে বিলাপ বিধাতার চরণে পৌঁছায় না। সে বিলাপে আন্তরিকতা নাই—আত্মবিস্মৃতি নাই; জননীস্বরূপা জন্মভূমির দুঃখে আমরা কাঁদিতে জানি না; স্বদেশভক্তি কাহাকে বলে, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, স্বদেশপ্রেমিকশিরোমণি প্রতাপসিংহ যখন জননীর দুঃখে বিগলিতহৃদয়ে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন—তখন তিনি সর্ব্বত্যাগী ভিখারী। বড় সাধের চিতোর শত্রুকরতল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই বলিয়া, যুদ্ধের পর যুদ্ধে মোগলকে পরাস্ত করিয়াও তিনি পর্ণকুটীরবাসী। ভুলিয়া গিয়াছি, শিবজী যখন জননীর নামে সমগ্র মহারাষ্ট্র এক করিয়া সমস্ত ভারতের একীকরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার

পতাকা ছিল সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন। গুরু গোবিন্দসিংহ যখন মহাপ্রাণ শিখজাতি গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন—তখন তিনি ছিলেন মহা বৈরাগী। যখন ভারতের সুখের দিন ছিল—বহু বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক যখন এক পতাকাতলে সমস্ত ভারতবর্ষ সমবেত করিয়াছিলেন—তখনও তিনি ছিলেন ভোগসুখ বিতৃষ্ণ রাজর্ষি। মহারাজ শিলাদিত্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃসম্বল হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। আর সেই লোকাতীত মহাপুরুষ—বত্রিশ বৎসরে যিনি জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত আজিও যাঁহার নাম অচলাভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়, যিনি প্রকৃতই স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে কাঁদিয়াছিলেন, এবং বহুমতবাদে বহুধা বিচ্ছিন্ন আর্য্যজাতিকে পুনরায় অদ্বৈতবাদমূলক বৈদিক ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবিনশ্বর একতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই যোগিসত্তম শঙ্করাচার্য্য নবম বৎসর বয়সে সংসারের ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জননীর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আজি সেই প্রতাপ, শিবজী, গোবিন্দের জন্মদেশে, সেই অশোক শিলাদিত্যের কর্ম্মভূমিতে, সেই শঙ্করপূজিত ধর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা বক্তৃতার পৈশাচিক অভিনয় করিয়া মাতৃভক্তির বীভৎস অনুকরণ করিতেছি। দেশদেশান্তরানীত বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমরা জননীর নামে আত্মগৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেছি—আসুরিক আচরণে জননীর লজ্জা বর্দ্ধন করিতেছি।

তাই অমঙ্গল, জননীর লজ্জাবনত মর্ম্মদাহক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে চাহিয়া তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আমাদের সম্মুখে তোমার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদের আত্মাভিমান ও সুখলিপ্সা বিদূরিত করিয়া দাও। আমাদের প্রীতিধারাকে প্রকৃত পথে প্রধাবিত করিয়া আমাদের অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট কর।

যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা যাহা ভালবাসিয়া আসিতেছি তাহা সব কাড়িয়া লও। আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, তুমি মূর্ত্তিমান্ বিধাতার অভিশাপ, আমাদের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্যে স্বীয় গদা উত্তোলন করিয়াছ। আমাদিগকে কল্যাণময়ী তপস্বিনী জননীর উপযুক্ত সন্তান করিয়া দাও। আমাদিগকে শিখাও বিলাসোপকরণে ভিখারিণী জননীর পূজা হয় না। তোমার কঠোর তাড়নে যদি আমরা বাহ্যজগতের অধীনতাপাশ মোচন করিতে সমর্থ হই, জননীকে প্রকৃত ভক্তি করিতে শিখি, তাহা হইলে পার্থিব যাবতীয় কল্যাণ আমাদের অধিগত হইতে বিলম্ব হইবেনা।

জীবন অভিনয়।

(১)

মলিনার জন্মদিনে তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার জন্য এক একটী উপহার লইয়া আসিয়াছেন; জনার্দ্দনও একটী উপহার আনিয়াছে। জনার্দ্দন সম্পর্কে মলিনার কেহ হয় না। সে তাহার পিতার বন্ধুপুত্র মাত্র, তবে বাল্যকাল হইতে এখানে যাতায়াত করে, তাই নিঃসম্পর্ক হইলেও মলিনার পিতা মাতা তাহাকে পুত্রতুল্য আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য, সে মলিনাকে ভালবাসে। মলিনার পিতা মাতা ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন; জনার্দ্দন যদিও ধনীপুত্র নহে, কিন্তু বংশে সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান; বি-এ দিয়া বি-এল পড়িতেছে, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলে ভবিষ্যতে সে যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইবে এরূপ তাঁহারা আশা করেন।

মলিনার কিন্তু জনার্দ্দনকে ভাল লাগে না। জনার্দ্দন সদা সর্ব্বদা তাহার ভালবাসা দিয়া মলিনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায় ইহাতে তাহার অতিশয় বিরক্ত বোধ হয়। মলিনা বাগানে ফুল তুলিতেছে, হঠাৎ জনার্দ্দন আসিয়া তাহাকে একটি সুন্দর ফুল আনিয়া দিল। মলিনা বাজনা বাজাইতেছে, হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, জনার্দ্দন গৃহকোণে চুপ করিয়া বসিয়া মলিনার বাজনা শুনিতেছে; মলিনা পাঠ মুখস্থ করিতে করিতে কোন স্থানে কোন কথার একটা অর্থ বুঝিতে পারিতেছেনা—অভিধানখানা খুলিতেও কষ্ট বোধ হইতেছে, হঠাৎ ঠিক সময়ে জনার্দ্দন আসিয়া হাজির। আবশ্যক হইলে মলিনা জনার্দ্দনের নিকট হইতে সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হয় না, তবে এজন্য জনার্দ্দন তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। সেবা করা দাসের ধর্ম্ম; কিন্তু সেবা গ্রহণ করিয়া কোন্ প্রভু কবে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন!

যাহা হউক, জনার্দ্দনের এরূপ শত অপরাধও মলিনা মার্জ্জনা করিতে পারিত, যদি হতভাগ্য যুবক জনার্দ্দন না হইয়া ললিত, মোহন বা এইরূপ কোন শ্রুতি-মধুর নাম ধারণ করিত। যখন মলিনা ভাবে লোকে তাহাকে মিশেস জনার্দ্দন বলিবে—তখনি এমন বেতর বেসুরা সুরে কথাটা খট করিয়া তাহার প্রাণে লাগে, যে তাহার বাজনার সমস্ত সুরগুলা একসঙ্গে বেসুরা বাজিলেও তাহার কাণে তাহা তত কঠোর লাগে না। তাহাদের বাগানের মালীর নাম জনার্দ্দন; ভদ্রলোকের এ নাম তাহার বিবেচনায় অসহ্য।

সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, নামে কি আসে যায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কবিও ভুল করিয়াছেন, শব্দেরও মাহাত্ম্য আছে বইকি! হায়! জনার্দ্দনের পিতা মাতা যদি ভবিষদ্দর্শক হইতেন!

জনার্দ্দন, মলিনার জন্মদিনে, নিরতিশয় আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে একটী মুক্তার ব্রোচ আনিয়া টেবিলের অন্যান্য উপহার দ্রব্যের নিকট রাখিল।

মলিনার মাতা ব্রোচটি হস্তে তুলিয়া লইয়া, দেখিয়া বলিলেন, বাঃ বেশত! বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া মলিনার স্কন্ধবস্ত্রে তাহার অঞ্চল আবদ্ধ করিয়া দিলেন।—সেই হইতে মলিনা প্রতিদিনই সেই ব্রোচটি পরিত। আর এই উপহারে প্রতিদিন মলিনাকে সজ্জিত হইতে দেখিয়া জনার্দ্দন যে কিরূপ আনন্দলাভ করিত তাহা সে ভিন্ন অন্যে কেহ বুঝিত না।

(১).

মলিনা এণ্ট্রেন্স দিবার পর পিতার সহিত পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালে বাড়ী ফিরিল। মলিনার পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নামিলেন, গাড়ী মলিনাকে লইয়া তাহাদের বাটী অভিমুখে চলিল।

বসন্ত কাল, সুন্দর বাতাস বহিতেছে—রাস্তার দুই ধারের বড় বড় ফুল গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা, পাখীর কূজনে চারিদিক গীতিময়—এই সুদৃশ্য সুন্দর প্রভাতের ন্যায় মলিনার নব উন্মেষিত হৃদয়েও সুখের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমে গিয়া এবার শিশিরকুমারের সহিত মলিনার নূতন আলাপ হইয়াছে, মুগ্ধপ্রাণে তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাটী প্রবেশ করিল। বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকিবা মাত্র মলিনা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, জনার্দ্দন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সুখস্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। চিরদিন কি জনার্দ্দনই তাহার নয়নপথ এইরূপে অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে!

গাড়ী সিঁড়ির পাশে লাগিল; মলিনা নামিতে না নামিতে জনার্দ্দন প্রফুল্ল হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মলিনা কেমন আছ?" মলিনা গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুষ্কমুখে উত্তর করিল—"ভাল।" ইত্যবসরে জনার্দ্দন তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া—তাহার অঙ্গবস্ত্রে সেই ব্রোচটি না দেখিয়া বলিল "মলিনা সে ব্রোচটি যে পর নাই?" মলিনা চলিতে চলিতে উত্তর করিল—"হারাইয়া ফেলিয়াছি," বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া গেল। সম্বৎসর ধরিয়া বহুকষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া তবে জনার্দ্দন একশত টাকার এই ব্রোচটি কিনিয়াছিল; তাহার ত্যাগস্বীকার কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া মলিনা কিরূপ তাচ্ছিল্যভাবে সেই হৃত দ্রব্যের উল্লেখ করিল! সে কথায় জনার্দ্দনের একখানি বক্ষপঞ্জর যেন শতচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মলিনা উপরে চলিয়া গেল, জনার্দ্দন তাহার নয়নের অনলাশ্রু-রাশি অঙ্গুলিদ্বারা সজোরে ভূমিনিক্ষিপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর? সেকি মনে মনে মলিনার নিকট চিরবিদায় লইয়া জন্মের মত সগর্ব্বে সে বাটী ত্যাগ করিয়া গেল? হায়! তাহা নহে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে হৃদয়মধ্যে যে প্রফুল্লতারাশি বহন করিয়া সে মলিনাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল সেই প্রফুল্লতা মাত্র বিসর্জ্জন দিয়া বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে সে আবার মলিনার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল।

এইত জীবন অভিনয়।

কেহ কাঁদে কেহ হাসে দাঁড়াইয়া পাশে পাশে
তবুও কাহারো কেহ নয়!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মহানাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

রাম। কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও কিছু না হেরি
পদচিহ্নাবলী ;
নাহি কি হেতায় সীতা ? অন্য পর্ণশালে তবে
গেছেন কি চলি' ?
আমি নহি সেই আমি ; —আমি যদি হইতাম
সত্যই রাঘব,
সীতার বিয়োগ-দুঃখ ক্ষণমাত্র সহ্য করা
হত অসম্ভব।
যে মোর হাতের যষ্টি পরণশালার,
ভূতলে যে সমুদিত চন্দ্রলেখা-প্রায়,
যে ছিল এ জীবনের অবলম্ব-শাখা
—সীতা, সীতা, কোথা তুমি দেও মোরে দেখা।
আমারে-যে কইকেয়ী পাঠালেন বনে
করিলেন ঠিক্ কাজ— এবে ভাবি মনে।
"আছে মৃগ হিরণ্ময়"— হেন বুদ্ধি যার
বনেতেই বাস করা উচিত তাহার।
হৃদয় বিদীর্ণ শোকে, ভূ-রজে রঞ্জিত যবে রাম,
বনিতা-বিয়োগানলে অতিশয় সন্তাপিত-প্রাণ,
নিজ-কান্তা সম পৃথ্বী তাঁহারে অচিরে
আলিঙ্গন করে যেন আপন পতিরে।

(এই সময়ে মুনিগণের বাক্য।)

রাজ্যনাশ, বনে বাস, সীতার হরণ, আর
পিতার বিয়োগ,
—এই ফল চতুষ্টয় রামচন্দ্র এক সঙ্গে
করিলেন ভোগ।

হেম-মৃগ অসম্ভব তবু মৃগে লুব্ধ হ'ল রাম ;
আসন্ন বিপত্তি-কালে পুরুষের বুদ্ধি হয় ম্লান॥
কর্ম্মের অধীন বুদ্ধি, কর্ম্ম নহে বুদ্ধির অধীন ;
সুবুদ্ধি যে রাম সেও অনুসরে' সুবর্ণ হরিণ॥
রাজ্যচ্যুত করাইয়া বনবাস ঘটাইয়া,
বিসম্বাদ করাইয়া
রাক্ষসাদি সনে,
বুদ্ধিরে ছলনা করি' মায়ামৃগ রূপ ধরি,'
দারা-হারা করাইয়া,
ঘুরাইয়া বনে,
অতি দুষ্ট শঠ বিধি —রাম যে গুণের নিধি
—তাঁহারেও ঘোর দুঃখে
ফেলিল কেমনে !

রাম।—(ভূমি হইতে উত্থান করিয়া।)
প্রিয়ার অধর-সুধা আস্বাদন করিনু না মুখে ;
শিরীষ-কোমল তনু প্রেমভরে না ধরিনু বুকে ;
ওরে রে লজ্জার বাধা ! কণ্ঠ ছাড়ি যারে তুই চলি ;
দে তুই কাঁদিতে মোরে —"জানকি-জানকি" শুধু বলি॥
হা ! প্রাণ-বল্লভা মম ! হা ! জনক-কুলের পতাকা !
মম-নেত্র-চকোরের কমনীয় নব-ইন্দু-লেখা !
এইরূপ রামচন্দ্র করিয়া বিলাপ নানামত
কুটীরের চারিধারে ভ্রমিতে লাগিলা অবিরত॥
হেথা আমি আলিঙ্গন করেছিনু—হেথায় চুম্বন ;
—হেথায় করিনু গণ্ডে কস্তূরীর পত্র-বিরচন ;
নেহারিয়া এই সব নেত্রানন্দ বিহারের স্থান
প্রেয়সীর বিরহে কি শতধা হয় না এই প্রাণ ?

(পুনর্ব্বার পর্ণশালা অবলোকন করিয়া।)

কমল-কোরক-আঁখি প্রিয়ারে যেথায় আমি
আলিঙ্গিনু সেই এই স্থান ;

সেই চন্দ্র-বদনের মধুর অধর-সুধা
হেথা আমি করেছিনু পান ;
এই সব পুষ্প হ'ত রঙ্গ-রসে বিমর্দ্দিত ;
—কোথা প্রিয়ে করিলে প্রস্থান ?
সুরম্য-সলিলে ওগো গোদাবরি ! দেখেছ কি
তুমি জানকিয়ে ?
কমল তুলিতে কিম্বা বিনোদন-তরে তিনি
গেলেন কি নীরে ?
এইরূপ প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে, প্রতি নদে
প্রতি গিরি, মৃগ ও ময়ুরে
জিজ্ঞাসা করিয়া সবে —কোথা মৈথিলী বলি'
শ্রীরাম বেড়ান ঘুরে ঘুরে ॥
পর্ব্বতস্থ তরুগণ !— বহুল কুসুম-যুত
বায়ুভরে সদা ঘূর্ণমান—
জিজ্ঞাসিছে তোমাদের —ব্যাকুলাত্মা শোকদগ্ধ
দশরথ-পুত্র এই রামঃ—
বিম্ব-ওষ্ঠী চারুনেত্রা গজ-গতি দীর্ঘকেশী
মমহৃদি-স্থিতা সেই
সুমধ্যা সীতায়
হৃদয় হইতে মোর কোথায় কে লয়ে গেল
তোমরা কি দেখিয়াছ
বলগো আমায় ॥
শোনো বলি হে ভুজঙ্গ ! —তরু-পল্লবের প্রায়
যাহার সে চঞ্চল-রশনা,
বন্ধুক-কুসুম-সম শোভে যার নেত্র দুটি,
বায়ুভোজী ওহে তুঙ্গ-ফণা !
—দেখনি কি সম্প্রতি পথমধ্যে স্থিতা
সেই মোর চন্দ্রমুখী প্রিয়তমা সীতা ?

সেই এ নর্ম্মদা নদী ; সেই এ নিকুঞ্জস্থলী ;
সেই এই বন ;
সেই এই মহীধর ; সেই এই মলয়জ
সুমন্দ পবন ;
সেই সব সরোবর ; কিন্তু নাহি হেরি হেথা
প্রাণ-প্রিয়তমা
সেই মোর জানকীরে —পয়োধর-ভারে যে গো
মন্থর-গমনা ॥
একে তুমি কৃশোদরী তাহে কুচভার-নম্র,
সহ্য নাহি হয় তব
বহুল ভ্রমণ।
দোলা-আরোহণেতেও হইতে যে শ্রান্তকায়,
কেমনে করিলে তুমি
এবে অতিক্রম
এ সব অজ্ঞাত দেশ ;— কানন, নির্ঝর, গিরি,
বিবর,—শ্বাপদ, মৃগ
যেথা অগণন ॥
তন্ন তন্ন অন্বেষিয়া কন্দরে কাননে,
দেখিয়া দেখিয়া যত নগবল্লীগণে,
স্মরি স্মরি' নিজকান্তা ও তাঁর ভূষণ
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাম করি' বিচরণ,
কান্তা-তরে সকাতরে করেন ক্রন্দন ॥

(সীতাকে না পাইয়া রাম)

সিংহ তব—কটিদেশ, হাসিটি—কুসুমাবলী,
কুরঙ্গী—নয়ন তব, কান্তিটি—চম্পক-কলি,
পিক তব—কণ্ঠস্বর মাধুর্য্য—অরণ্য-লতা,
গজরাজ—গতি তব নিল তোমা-হ'তে সীতা !
এরা সবে, লীলাপটু, বিভাগ করিয়া
সমস্ত সৌন্দর্য্য তব নিল কি হরিয়া ?

(সীতার নূপুর প্রাপ্ত হইয়া)

নেত্র মোর তৃপ্ত হল সীতা-সম হেরি' এই
সুশোভন নূপুর সীতার।
শোন বলি হে লক্ষ্মণ! খুঁজিয়া বাহির কর
এইরূপ অন্য অলঙ্কার॥

লক্ষ্মণ। জানি না কেয়ুর আমি নাহি জানি কোন্‌টি বা
তাঁহার কঙ্কণ;
নূপুরটি শুধু চিনি —নিত্য আমি করি তাঁর
চরণ বন্দন॥

(কিয়দ্দূর যাইয়া সীতার পতিত উত্তরীয় দেখিয়া রাম)

রাম। যে, দ্যূত-ক্রীড়ায় পণ, প্রণয়-কৌতুকে যারে
করি কণ্ঠ-ডোর;
ব্যজন—সুরত-অন্তে, নিশীথ কলহ-কালে
যেই শয্যা মোর,
—মৃগনয়নীর সেই উত্তরীয় খানি
বিধিবশে এই দেখ পাইলাম আমি॥

(চন্দ্র দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।)

রাম। লক্ষ্মণ, আশ্রয় কর তরুতল, ওই দেখ
উদিল তপন।

লক্ষ্মণ। নিশাকালে সূর্য্যোদয়? না না, রঘুপতি—চন্দ্র
উদিছে এখন।

রাম। এ কথা কেমনে ভাই জানিলে লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। ওই দেখ কুরঙ্গরে করেছে ধারণ।

রাম। হা প্রেয়সি কোথা তুমি কুরঙ্গনয়নে!
হা! জানকি! হা! জানকি! অই চন্দ্রাননে!

(চন্দ্রের প্রতি রাম।)

শীতরশ্মি চন্দ্র তুমি, —কেন তবে করিতেছ
মোরে দগ্ধ, বরষিয়া
অনল কিরণ?
শরে তোমা খণ্ড খণ্ড করিতাম, যদি তুমি
না হইতে জানকীর
মুখের মতন?

(স্মৃতিভ্রংশে রাম লক্ষ্মণের উক্তি প্রত্যুক্তি।)

রাম। কে গো তুমি?

লক্ষ্মণ। ওগো নাথ রঘুনাথ! আমি তব
কিঙ্কর লক্ষ্মণ।

রাম। আমি কেবা শীঘ্র বল;

লক্ষ্মণ। দাদা তুমি মহাবীর
রঘুর নন্দন।

রাম। কেন এ বিজন বনে?

লক্ষ্মণ। দেবীকে গো ইতস্ততঃ
করিতেছি মোরা অন্বেষণ।

রাম। কোন্ দেবী? কেবা তিনি? জনক-নন্দিনী সীতা?
তারে তুমি খুঁজিছ এখন?
হা প্রেয়সি! হা জানকি! বিচ্ছেদের ভয়ে, নাহি
পরিতাম কণ্ঠদেশে হার;
এখন মোদের মাঝে হইয়াছে ব্যবধান
—নদ, নদী, পর্ব্বত, পাথার॥
সহিলাম অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পিতার
বিয়োগ দুঃসহ;
সহিনু বিপিন-বাস, কিন্তু না সহিতে পারি
সীতার বিরহ।

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর   নয়নের অমৃত-অঞ্জন,
ও অঙ্গ-পরশে গাত্রে   মাখা হয় স্নিগ্ধ চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর   মুক্তাহার-মসৃণ-শীতল
প্রিয়ার যা' সবই প্রিয়   অসহ্য সে বিরহ কেবল।
বহ' বায়ু যেথা প্রিয়া;   —পরশি' কান্তায় মোর,
আমারেও কর পরশন।
তুমি বিনা কেবা আর   রক্ষিবে আমায় বল'
—এতে তবু পাইব জীবন।
প্রিয়ার বিরহ হতে   চিন্তার বিপুল শিখা
এবে সমুত্থিত;
দিবারাত্রি তনু মোর   দহিতেছে, প্রেমানল
হয়ে প্রজ্জ্বলিত॥
দক্ষিণে মলয় বহে,   সম্মুখেতে প্রসারিত
সুবিপুল বন;
বামদিকে ভৃঙ্গধ্বনি,   পশ্চাতে সে সুদুঃসহ
চকার ক্রন্দন;
অন্তরে বিরহানল;   —পঞ্চাগ্নি মাঝে থাকি'
ধ্যানেতে মগন
অতিদীর্ঘ রাত্রিগুলি   কোনরূপে করিতেছি
আমি যে যাপন॥
চন্দ্র সে প্রচণ্ড এবে,   মৃদুগতি সমীরণ
বজ্রের সমান;
মালাতে সূচির জ্বালা,   চন্দন স্ফুলিঙ্গ সম
হয় অনুমান;
আলোক আঁধার-সম,   পরাণো বিধির বশে
হল গুরুভার।
প্রমদা-বিয়োগ-কাল   প্রলয়কালের মত
সম্মুখে আমার॥

দুর্জ্জয় নির্দ্দয় স্মর!   প্রফুল্ল-পঙ্কজ-বাণ
কর সম্বরণ;
ত্যজ ধনু, আমা প্রতি   পৌরুষ প্রকাশ করি'
কিবা প্রয়োজন?
প্রেয়সী-বিয়োগ-জাত   হুতাশনে দগ্ধ মোর
শরীর এখন।
মৃতকে প্রহার করা   বলীর নহেক ধর্ম্ম
কহে বুধগণ।
তোমার ও-পঞ্চবাণ   আপুঙ্খ হয়েছে মগ্ন
এ মোর হৃদয়ে;
বিরহ-অনল-দগ্ধ   তনু-সাথে তাহারাও
গেছে ভস্ম হয়ে।
তাই বলি, হে মদন!   নিরস্ত্র এখন তুমি
না পারিবে আমারে জিনিতে;
তব শরাঘাতে দুঃখী   আমিই হইনু বটে
—অন্যে কিন্তু হল সুখী ইথে॥

(বিকসিত অশোক-তরুতলে বিশ্রাম করিয়া)

নব পল্লবেতে তুমি   হয়েছ আরক্ত,
আমিও প্রিয়ার গুণে   দেখ অনুরক্ত।
তোমার নিকটে আসি'   জুটিতেছে শিলীমুখগণ,
স্মর-মুক্ত-শিলীমুখ   আমাতেও হতেছে পতন।
কান্তা-পদাঘাতে তুমি   হও প্রস্ফুটিত,
আমিও সে পদাঘাতে   হই প্রফুল্লিত।
সকল বিষয়ে তুমি   তুল্য হে অশোক,
কেবল আমারে বিধি   করিল সশোক॥

(এমন সময়ে দৈবাৎ মার্ত্তণ্ডমণ্ডল অস্তগত হইলে শ্রীরামচন্দ্র, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-রশ্মির ন্যায় পূর্ব্বদিকে উদয়ন্ত অচণ্ড-রশ্মিমণ্ডল চন্দ্র-মণ্ডলকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি)

রাম। দেখ দেখ হে লক্ষ্মণ! তরুশিরে জ্বলে দাবানল,
নিবারণ কর উহা ঢালি দিয়া নির্ঝরের জল।

লক্ষ্মণ। কোথা দাবানল আর্য্য? উদয়-অচলে শশী
উঠিছে এখন।

রাম। বল দেখি তুমি তবে —ধূম কেন পুরোভাগে
করেছে ধারণ?

লক্ষ্মণ। নহে উহা ধূম আর্য্য, ধরণীর ছায়া মাত্র
হয়েছে পতন।

রাম। হায় হায়! কোথা তুমি ধরণি-দুহিতা,
হা জানকি!—হা জানকি! মইথিলি!—সীতা।
সীতা অন্বেষণে রাম নাহি যান যেই যেই স্থান
মনে হয় তাঁর, বুঝি সেখানেই সীতা বিদ্যমান।
যে যে গৃহে ভিক্ষু নাহি করয়ে গমন
—অন্নে পরিপূর্ণ দেখে সেই সে ভবন॥

(এইরূপ দৈববশে সীতা-গত-প্রাণ রামচন্দ্র গো-গবয়-গজ-শার্দ্দূল-সিংহাদি ভীষণ জন্তু-সমাকীর্ণ বিশাল-তাল-তমাল-পরিপূর্ণ বনস্থলীতে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন)

সীতা অন্বেষণে গিয়া দেখিলেন রাম
পক্ষিরাজ জটায়ুর ওষ্ঠাগত প্রাণ।
"জানকীরে হরিয়াছে রাক্ষস রাবণ"
—এই বলি'তখনি সে ত্যজিল জীবন॥
দশরথ-মিত্র আর শত্রু-নিসূদন
সেই জটায়ুরে চিনি' শ্রীরাম তখন
এই কথাগুলি মাত্র কহিলেন তাঁয়;
—"হা তাত! হা তাত!—একি—একি হল হায়!"

(পারলৌকিক কৃত্য সমাধা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জটায়ুর প্রতি)

নিজ তেজে তাত! তব স্বর্গে হল গতি;
যাও তুমি! স্বস্তি হোক্! কিন্তু গিয়া তথি,
সীতা-হরণের বার্ত্তা বোলো না পিতায়।
আমি যদি রাম হই —কহিনু তোমায়—
স্বল্পদিনে, দশানন —বন্ধুগণ সাথে—
নিজেই বলিবে তাঁরে লজ্জানত মাথে॥

(কিয়দ্দূর গিয়া রাবণের ভগ্ন রথ দেখিয়া)

কিরূপে ভাঙিল তাত রক্ষোরাজ রাবণের রথ?
তীক্ষ্ণ চঞ্চু-নখাঘাতে বন্ধন হইল বুঝি শ্লথ?
হা জনকরাজপুত্রি! দশানন-করীর মাথায়
জটায়ু-সিংহেরে তুমি দেখিয়াছ—ধন্য তুমি তায়।

(সীতা হৃতা হইয়াছে—জটায়ুর বচনে নিশ্চয় করিয়া আপনাকে তিরস্কার)

রাজ্য নাশ, বনে বাস, হৃতা সীতা, মৃত পিতা, হায়।
—ইহার একটি দুঃখে মহাসিন্ধু শুখাইয়া যায়।
সিন্ধু-সম এক-দুঃখ না হইতে-হইতে গো পার
অন্য এক দুঃখ আসি' উপস্থিত হইল আমার।
এখন বুঝেছি আমি— কিছুমাত্র নাহি ইথে ভুল
—একটি অনর্থ সেও রন্ধ্র পেলে হয় গো বহুল!
কৈকেয়ী করিলেন ভরতেরে রাজ্যে অভিষেক
—ঠিক্-ই করিলেন তিনি, নাহি ইথে অন্যায় তিলেক।
যে জন রক্ষিতে নারে আপন ঘরণী
—কেমনে করিবে রক্ষা সমগ্র ধরণী?
উচিত করিলা পিতা বনে মোরে করিয়া প্রেরণ;
এবুদ্ধিও নাহি মোর— কোথা মৃগ, কোথা বা কাঞ্চন॥
সাগর-কীরতি হ'ল সগর হইতে,
গঙ্গা-কীর্ত্তি ভগীরথ করিলা অর্জ্জন।
ভাল কীর্ত্তি রাখিনু-গো আমি অবনীতে
—এক ভার্য্যা না পারিনু করিতে রক্ষণ॥

যাহার প্রাপ্তব্য যাহা মনুষ্য তা পায়,
দেবতাও নাহি পারে নিবারিতে তায়।
তাই ত করি না শোক, হই না বিস্মিত,
না হয় ললাট-লিপি কভু অপনীত ॥

(পান্থের প্রতি)

পরিণয়-কাল হতে আমারি লালিত যেই
—সুবংশ-উদ্ভবা সেই তন্বী সুতরুণী,
স্পর্শ-সুখাবহা, গৌরী, —কে হরিল তারে পান্থ ?
—সে যে গুণবতী, নিত্য-হৃদয় হারিণী ॥

পান্থ। হে ভিক্ষুক সে কি তব পরিণীতা আপন কামিনী ?
রাম। তা হ'তে অধিক মোর —প্রাণপ্রিয়া, যষ্টি-স্বরূপিনী ॥

সীতা মোর অর্দ্ধ-হৃদি করেন দহন ;
অপরার্দ্ধ করে দগ্ধ রাজা দশানন।
প্রবল মদনানল এক অর্দ্ধে জ্বলে ;
অপরার্দ্ধ কবলিত দীপ্ত রোষানলে।
দুয়েরি প্রভাব তুল্য—অনুরূপ গুণ ;
—একটি তুষের, অন্য ঘুঁটের আগুন ॥

খুঁজিতেছি চন্দ্রাননে —বিমুখ সে নিদারুণ বিধি ;
তবে কি ভুলিব তারে ? —সুগভীর প্রেম যে বিরোধী।
ভক্ষিব গরল তবে ? —কুলের কলঙ্ক হবে তায় ;
শান্তিরে ভজিব কি গো ? —কুটিল ধনু যে অন্তরায় ॥
প্রিয়া দূরে—দুঃখ নাই, দুঃখ নাই—প্রিয়া মোর হৃতা ;
এই দুঃখ শুধু মোর —রয়েছে এ ধনু এবে বৃথা।
কৃশত্ব-জনিত মাংস গেল চলি ক্ষিতির সকাশ ;
কান্তার হরণে, তেজ গেল চলি, বায়ুতে—নিঃশ্বাস।
আকাশে মিশিল তনু বিরহে হইয়া তন্ময় ;
বজ্রপ্রাণ রামচন্দ্র তাই সে এখনো বাঁচি রয় ॥

(শ্রীরামচন্দ্র সেখান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া অগৌরবচন্দন কর্পূর মৃগমদ-কুঙ্কুম চম্পকাদি কুসুম-বহুল-গন্ধোত্থিত বায়ুভোজী-ভুজঙ্গ-ফণা-মণির উপর, কামিনী-লোচন-গঞ্জন খঞ্জনকে দেখিয়া)

বামদিকে বসি' কাক সূচে মোর মরণ বিপদ ;
দক্ষিণে ভুজঙ্গ-শিরে খঞ্জন সে—রাজত্ব-সম্পদ।
জানকী-হরণ চেয়ে কি বিপদ আছে বল' আর ?
খঞ্জন দর্শনে ব্যক্ত রাজ্য-লাভ এদিকে আবার।
রাজ্য ও মরণ-মাঝে শ্রেয় সে মরণ
মরণই শরণ মোর মরণই শরণ ॥

("কবন্ধ" দর্শন করিয়া)

"কে গো এই জন ? —যোজন-বিস্তৃত বাহুদ্বয়ে
আক্রমিয়া বন-মার্গ কবলিত করে জীব-চয়ে।"
লক্ষ্মণ কহিলে ইহা —রামভদ্র অমনি তখন
গর্ভ-কদলীর মত কণ্ঠ তার কারিলা ছেদন ॥
রাম-শরে গতপ্রাণ "কবন্ধ" পবিত্র হয়ে
দিব্য দেহ তখনি সে করিল ধারণ।
পরে, তার কথা-মত শ্রমণ-আশ্রম-দেশে
হনু-সনে শ্রীরামের হইল মিলন।
সীতার উদ্ধার-কাজে, সুগ্রীব সবলে তাঁর
করিবেন সহায়তা—করে অঙ্গীকার।
শ্রীরামো বালীর বধে হইলে স্বীকৃত, পরে
কপীন্দ্র সুগ্রীব-সনে হল সখ্য তাঁর ॥
ঋষ্যমুক-পরবতে নিঃসহায় করিয়া ভ্রমণ,
সমদুঃখী সুগ্রীবের সখ্য রাম করিলা অর্জ্জন ॥
চরণ-অঙ্গুষ্ঠ-দিয়া সুদূরে নিঃক্ষেপ করি'
গিরিসম-গুরুভার
"দুন্দুভি"-দানব-কঙ্কাল,

দ্রুত-হস্ত রামচন্দ্র   এক বাণে, ঘোর শব্দে
সর্ব্ব-জনে বধিরিয়া,
করিলেন ভেদ সপ্ততাল ;
ইথে বালীবধ আশা   হইলা বর্দ্ধন
কপি-রাজ সুগ্রীবের   মনে বিলক্ষণ ॥

(তাল-বেধ-সময়ে শ্রীরাম বাণের প্রতি)

বিশ্বামিত্র-পদে যদি   থাকে মোর সতত ভকতি,
যদি বিপ্রজন- রাষ   কিছু নাহি থাকে মোর প্রতি,
আর, যদি নাহি থাকে   মন মোর অন্য নারী'পরে,
সপ্ততাল ভেদি,"শর !   পশ'গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥
রামচন্দ্র সপ্ততালে   নিহত করিল বিনা-দোষে
—শুনিয়া একথা বালী   প্রজ্বলিত হয়ে ঘোর রোষে,
গিরি-গহ্বর-হতে   হইয়া নিঃসৃত,
সমর-অঙ্গনে আসি'   হল উপস্থিত ॥

তারা ত্যজি কণ্ঠ-হার   —স্খলিত-কবরী-ভার—
রহে গিরি-শিখরের পরে।
বালীর মরণ রণে   ইচ্ছা করে মনে-মনে
—বিয়াকুল মদনের শরে।
বালী বড় বিসম্বাদী,   সম্ভোগের প্রতিবাদী,
মরিলেই ঘুচে যে বালাই ;
রামের নারাচ-বাণ   লউক বালীর প্রাণ
—মনে মনে তারা যাচে তাই ॥

লক্ষ্মণ। সসাগরা পৃথ্বীমাঝে   বালী-সম বলী কেহ
নাহি ত্রিভুবনে।
লোক-মুখে শুনিয়াছি   এই কথা, তাই মোর
শঙ্কা হয় মনে ॥

রাম। (হাসিয়া)
লক্ষ্মণ ! কোরনা ভয়   ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র
আমি বিদ্যমানে।
সাধুরে ত্যজিয়া, ভয়   আশ্রয় করয়ে গিয়া
অসাধুর স্থানে ॥

বালী। রঘুরাজ-পুত্র ওগো   বাণ তুমি করহ গ্রহণ,
তব বজ্ররূপে আমি   অবতীর্ণ ইন্দ্রের নন্দন।
দুন্দুভি-দানবে আমি   করেছি নিধন
পাঠাইব তোমারেও   যমের সদন ॥

(উভয়ের যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। (সুগ্রীবের প্রতি)
আর্য্য-বাণে হয়ে বিদ্ধ   বালী এবে লুণ্ঠিত ধরায় ;
দেবেরা বরষে' পুষ্প   দেখ এবে আর্য্যের মাথায় ॥

বালী। সুগ্রীব করিতে পারে   যে কার্য্য তোমার
আমি কি করিতে নারি   সে কার্য্য উদ্ধার ?
বিনা দোষে কেন মোরে   করিলে সংহার ?
মুক্তাফলতরে গজ—   মাংস-তরে মৃগ,—লোকে
করয়ে নিধন ;
বাহুবল পরাক্রম   জানাবার তরে সিংহে
করয়ে হনন ;
কিন্তু বল দেখি মোরে,   জরাগ্রস্ত শাখামৃগ-প্রতি
বাণ বিমোচন করা   —একি নীতি তব রঘুপতি ?

রাম। স্বেচ্ছাচারি রে বানর !   এই দণ্ড দিনু তোমা
—করিয়াছ ধরম লঙ্ঘন ;
নিজ ভ্রাতৃ-ভার্য্যা—"তারা"   সুগ্রীব কপির দারা
তারে তুমি করিলে হরণ ॥
পাপীরে না করি ক্ষমা   —ক্ষত্র আমি,—মহাবংশধর,
করিও না পরিতাপ   যাও চলি' স্বর্গে কপীশ্বর !

বালী। আপনি রঘুবংশাবতংস শ্রীমান রামচন্দ্র, আপনার প্রসাদে আমি মহাবীরোচিত গতি লাভ করলেম।—এই বৎস অঙ্গদ তোমারি দাস।

(স্বর্গারোহণ)

সদ্য বিদ্ধ করি' বাণে বালীরে শ্রীরামচন্দ্র
সাক্ষাৎ সমরে,
সন্তার্য্যা কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য সমর্পণ করিলেন
সুগ্রীবের করে ॥
জলদের ঘোর রবে বিদলিত দিক্-চক্রবাল
উদ্দাম মূরতি ধরে ;— যাপিবারে এই বর্ষাকাল
মাল্যবান পর্ব্বতের শিখরস্থ বনে
শ্রীরাম করেন বাস লক্ষ্মণের সনে ॥

ইতি বালী-বধ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরের কথা।

নবম পরিচ্ছেদ।*

"অতি-ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়াবে। অতি বাড় বেড় না ঝড়েতে উড়াবে॥" গ্রাম্য কবি বৃক্ষেন্দ্র হেঁয়ালিতে মনুষ্যকে এই উপদেশটি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যমাকৃতি বৃক্ষেরই বা নিস্কৃতি কই? লোকে নিকট দিয়া যাইলেই অধিকাংশ সময়ে বিনা প্রয়োজনেও তাহার ডালটা ভাঙ্গিয়া বা পাতাটা ছিঁড়িয়া চলিয়া যায়। রাজচন্দ্র রাজপদও পায় নাই ধনকুবেরও হয় নাই, দারিদ্র্যের ধূলি-শয্যা হইতে একটু মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল মাত্র; ইহাতেই জ্ঞাতি কুটুম্ব, কর্ম্মসঙ্গী, প্রতিবেশী প্রভৃতি অনেকেই তাহার শাস্তি-গুল্মের শাখা ভঙ্গ ও পত্র ছিন্ন করিয়া আপনাদিগের অনিষ্টসাধক প্রবৃত্তির সাধন করিতে লাগিলেন।

আপনারাও অনেক রাজচন্দ্র দেখিয়াছেন, অনেকে রাজচন্দ্রের অবস্থায় পতিতও হইয়াছেন; অম্বিকা-খুড়ো, চাটুর্য্যে, রায়-গিন্নিরাও আপনাদের যে নিতান্ত অপরিচিত তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না; তথাপ যে ইহাদের কথা লইয়া এতগুলি পৃষ্ঠা পূরণ করিলাম তাহার কারণ, সম্মুখে উপবিষ্ট জীবিত ব্যক্তির চিত্রপটও লোকে আগ্রহের সহিত আমোদ করিয়া দেখে; এবং নিত্য সঙ্গীর অবয়বেরও অনেক অলক্ষিত দোষগুণ আমরা অনেক সময়ে প্রথমে পটের সঙ্কুচিত পরিসরে প্রতিফলিত দেখিয়া চমকিত হই। ইহা ভিন্ন লিপিবিস্তারের আরও একটী কারণ আছে, সেটি "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা

---

* গত জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় চতুর্থ হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ "রায়গৃহিণী" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরিয়া। অন্তে নাহি বুঝে, থাকে ছল ছল চাহিয়া॥" সে গূঢ়তত্ত্ব আপনারা বুঝিতে পারিবেন না, কর্ত্তাভজার ইশারার ন্যায় আমরা পরস্পর বুঝিয়া মুখ-টিপিয়া হাসিয়া লইলাম।

এদিকে যেই যা বলুক আর যেই যা করুক রাজচন্দ্রের দিন চলিতে লাগিল। ভালই চলিতে লাগিল। সংসারে অনাটন নাই, পরিবারের গায়ে বিশ-ত্রিশ ভরি সোণা উঠিয়াছে, দেশের রাস্তার উপর দুই চারিটী কোঠা হইয়াছে। গ্রামের একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ঘাট মেরামতও রাজচন্দ্রের নিজব্যয়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। কেহ বা আবার ক্লেশ করিয়া যথার্থ বন্ধুভাবে কলিকাতায় একখানি ছোট-খাট বাটী করিতে পরামর্শও দিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে দেশের পৈতৃকবাস একেবারে উঠিয়া যাইবে; "আমিও যদি টেনেটুনে সম্পর্কটা রাখি ছেলেপুলেরা আমার অবর্ত্তমানে আর সে পাড়াগাঁ মুখও হবেনা" মনে ভাবিয়া রাজচন্দ্র মাসে মাসে ভাড়া গনিয়াও কালকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। আহার ব্যবহার লোক-লৌকিকতা রক্ষা ব্যতিত আর একটী বিষয়ে রাজচন্দ্রের প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ব্যয় হইত। সৌখিন ফলমুলাদি বিক্রেতা বা মনোহারী প্রভৃতি ফেরিওয়ালাগণ প্রায়ই রাজচন্দ্রের বাটী হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিত না। হিতৈষী সুহৃদগণ অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া অনুযোগ করিলে রাজচন্দ্র উত্তর করিত যে, যেমন ভিক্ষুককে রিক্তহস্তে ফিরাইতে নাই তেমনি উহাদিগকেও বিমুখ করিতে নাই; উদরান্নের জন্যইতো গরিবেরা মাথায় মোট লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরে, বিক্রীত দ্রব্যের লভ্যই উহাদের ভিক্ষা, অন্ন-মুষ্টির একমাত্র উপায়; সৌখিন-দ্রব্য না ক্রয় করিলে আমার সংসার চলিতে পারে বটে কিন্তু সকলেই যদি ঐ কথা বলে তাহা হইলে উহাদের সংসার চলিবে কেমন করিয়া। শিল্পীও নিরন্ন হইবে। অল্প বিস্তর সকলেই সাধ্যমত নির্দ্দোষ বিলাসের সাহায্য করায় বিশেষ হানি নাই। অর্থ-শাস্ত্রের নীতিতে এই যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হৃদয়-শাস্ত্রের সুবর্ণময় পৃষ্ঠায় এ সূত্রটি যে মুকুতাখচিত অক্ষরমালায় রচিত সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বামীর কাজ কর্ম্মের সুবিধা হইলে ভবসুন্দরী যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন তখন তাঁর একমাত্র পাঁচ বৎসরের মেয়ে হরিদাসী কোলে। সকলেই মনে করিয়াছিল যে ঐ একটী হইয়াই দাসীর মার বিয়ান বুঝি বন্ধ হইল। কিন্তু শরীরের সুস্থেই হউক, মনের স্ফুর্ত্তিতেই হউক অথবা অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির মনে বিষয়াধিকারী লাভের বলবতী বাসনা হওয়ায় তাহার আকর্ষণেই হউক, কলিকাতায় আসিবার দেড়বৎসর পরেই রাজচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী স্বামীকে একটী নবকুমার উপহার দেন। মেয়েটির ন্যায় ছেলেটিও হরির-লুট মানিয়া হওয়ায় নাম হইল লুটবিহারী। আমাদের গল্পের নায়কের অংশ অনেকটা এহ লুটবিহারীর দ্বারা অভিনীত হইবে।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে হরিদাসীর বিবাহ হয়; জামাইটি দোজপক্ষে, নিতান্ত বৃদ্ধ নয়, তবে লোকে যাকে "যেমনি বর তেমনি কনে" বলে তেমন সাজন্ত-গোছ হয় নাই। রাজচন্দ্র গহনাগাটি বরাভরণ ইত্যাদি গৃহস্থ-ভদ্রলোকের দেয় সমস্তই যথাসাধ্য বরকন্যাকে দিয়াছিল, তবে বরপক্ষ হইতে কোনরূপ নগদ অর্থের দাবী হয় নাই। জামাইটীর নাম কেশব, বয়স ত্রিশের কিছু উপর, পশ্চিমে একজন হিন্দুস্থানী রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টরের অধীনে কর্ম্ম করিত। সংসারের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষের একটী শিশুপুত্র, পুনঃপরিগৃহিতা এই দ্বাদশীদারা আর অভিভাবিকা-স্বরূপ এক সপুত্র বিধবা মাতুলানী। বেতনের আয়ে এক রকম কায়-ক্লেশে সংসার চলিয়া যাইত, ঋণ করিতে হইতনা, সঞ্চয়ও ছিলনা। যা'হোক প্রজাপতির কৃপায় হরিদাসীর স্বচ্ছন্দে স্থিতির একটা ব্যবস্থা

হয়ে গেল। এদিকে লুটবিহারী ক্রমে নিমফল কোমরপাটা ছাড়াইয়া কাপড়ের কসি আঁটিতে শিখিল। ভবসুন্দরীর অনুরোধে রাজচন্দ্র লুটুর জন্য চাঁদনি থেকে পিনাফোর কিনিয়া দিয়াছিল; আবার ভবসুন্দরী ছয়বৎসরের সোণারচাঁদকে স্বামীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, সিঁথর ঘোমটা সরিয়া যাইতে দিয়া সেই অর্থনাশী বিমল হাসি হাসিলেন। রাজচন্দ্রকে ব্রাউন-হলাণ্ডের নিকার-বোকার কিনিতে হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজপ্রাসাদে ফ্যাসানের ছাঁচ প্রস্তুত হয়, সঙ্গতি বুঝিয়া কেহবা তাহা হইতে সোণা ঢালিয়া কেহবা কাদা চাপিয়া ছাপ তুলিয়া লয়। সাহেবি চাল অবলম্বন করিতে বিলাতযাত্রার অপেক্ষা করেনা, কিম্বা ইংরাজী মেজাজ ধাতে বসাইতে কলেজি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ধরাতলে নরপতি জনসাধারণের পূজ্য; শরীর ও সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিতে করিতে রাজদণ্ড মন, হৃদয় ও আত্মার উপরও প্রভূত প্রভুতালাভ করিয়া বসে। যে চরণ দর্শনে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, সেই গৌরবময় চরণের মহামহিম অধিকারীকে আদর্শ-স্থানীয় করিতে লোকের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় ও যাঁহার কৃপাকণার প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া মানব দেবকৃপাকেও অবহেলা করে, তাঁহার পথের পথিক হইতে কাহার না লালসা হয়? "ধর্ম্ম অবতারের" ধর্ম্ম প্রজামাত্রকেই আকর্ষণ করে। সমগ্র হিন্দুজাতি যে একদিন ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায় নাই, বা আজও যে তাহারা খৃষ্টের কল্যাণে কৃষ্ণকে বিসর্জ্জন দেয় নাই ইহাই সনাতন ধর্ম্মের অখণ্ড সত্য ও অদ্ভুত শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু দেবোপাসনা ব্যতিত মানবের অন্য ধর্ম্ম আছে। শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, পারত্রিক প্রত্যেক ক্রিয়াই এক একটী ধর্ম্ম। গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ সহজেই অনুকরণসাধ্য। বৈরাগ্য অপেক্ষা বিলাস শীঘ্র অভ্যস্ত হয়, রাজার বাহ্য সম্পদই প্রজার চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। রাজানুচর, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ই প্রথমে ভূপতির বেশভূষা, ভাবভাষা, আচারব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ঐ রাজপ্রসাদ উহাঁদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ লয়েন। তদুচ্ছিষ্ট ইতরসাধারণে বাঁটিয়া লইয়া আপ্যায়িত হয়। রাজসেবাকারী সামান্য ভৃত্যগণও নিতান্ত স্বল্পসম্প্রদায়ের আদর্শ-স্থানীয় হয়না।

মিরজাই পরিহিত প্রবীন, আজ কেন কামিজধারী নবীনের নিন্দা করেন? এক্ষণে যেমন কতক বাবুকে দেখিলে ফেরঙ্গ-কুল-ভূষণ "প্যারেরা-রোজ্যারিও" "ব্যাসেধ ব্যারেগা" বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনি অনেক বনিয়াদি বড়মানুষের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া প্রাচীরলম্বিত তৈলপট গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্গীয় কর্ত্তাদিগকে মিরজারহমৎ, মৌলবীফজল, খাজেআবদার, প্রভৃতি বলিয়া বিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। এখনকার শিক্ষিত লোকে যেমন দশটা বাঙ্গলা কথা কহিতে ছয়টা ইংরাজার বুকনী দিয়া থাকেন, পূর্ব্বেকার ভদ্রলোকেরাও তেমনি কথাবার্ত্তায় লিখনপঠনে এত অধিক যাবনিক ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, ব্যবহারবলে বিস্তর পার্শী, উর্দ্দূ কথা এক্ষণে বঙ্গীয় আভিধানিক শব্দমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অন্দরমধ্যে, রন্ধনশালায়, শয়ন-কক্ষেও অনেক রসুন-রস-সিক্ত কথা আজ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিতেছে। আর ভাষার ছটায় বাঙ্গলা দলিলাদি যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহার তো কথাই নাই। এখনও যদি কেহ "জয়ালদে" "জেওজে" আদি বাদ দিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কোন লেখাপড়ার মুসবিদা করেন তাহা হইলে সেকেলের বিষয়কর্ম্মী লোকের নিকট তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর হয়। স্বর্গীয় কর্ত্তারা পোলোয়া, কালিয়া, কোরমা, কোপ্তার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা তাহার সহিত হাঁসের

ডিমের আমলেট, চিংড়িমাছের কাটলেট এবং নিতান্ত পক্ষে কাদা-চিংড়ির পোটেটো-চপ্ যোগ করিয়া দিয়া এক প্রকার তিলকাঞ্চনে কার্য্য সারিয়া লইতেছি। তবে সেকালের লোকে যবন-জন-প্রিয়-ভোজ্য হিন্দুর প্রচলিত উপকরণে হিন্দুপাচকের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন, বাবুর্চির প্রসাদ বা নিষিদ্ধ মাংসাদির ভক্ষণের কথা বড় বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না, এক্ষণে সেটার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

ইহার কারণ, বোধ হয়, মুসলমান নৃপতিগণ নিজ ধর্ম্মে সমধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া হিন্দুস্থানে ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেন এবং ঐ কার্য্যের জন্য অনেকে হিন্দুদিগের প্রতি বল-প্রয়োগ ও অত্যাচারাদিও করিতেন। কিন্তু বলের আঘাত বল উৎপাদন করে, আঘাতী বলঘাতি পদার্থে কতকটা আপনার শক্তি ঢালিয়া দেয়, এবং অত্যাচারীর অগ্নিও পীড়িতকে খানিকটা উত্তেজিত করে, সেইজন্য হিন্দুরাও মুসলমানের ধর্ম্মের ধমকে একটু বিশেষ জিদের সহিত স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। পরস্পরের অনুকরণের মধ্যেও বিপরীত আচরণ তাহার সাক্ষ্য। এক্ষণে, ইংরাজ কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, ইংরাজের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু বোধ হয়, বিজ্ঞানবিদ্ চতুর ইংরাজ জানিতেন যে, বলপ্রয়োগ অপেক্ষা এই ঔদাসিন্য হিন্দুর ধর্ম্মভিত্তি আল্গা করিয়া দিবে। একদিকে ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুরাজা প্রদত্ত ইন্ধন নাই, অপর দিকে বিধর্ম্মী শক্তির ফুৎকার নাই, সুতরাং ধর্ম্মনাশের আতঙ্ক হইতে নিস্কৃতি পাইয়া হিন্দু যেমন অতর্কিত অবসরে আরাম করিবে অমনি তাহার আধ্যাত্মিক অগ্নিটুকুর উপর আপনা-আপনি ছাই পড়িয়া যাইবে। আবার তাহার উপর ইংরাজী সাহিত্যের জ্বলন্ত মোহিনীমায়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল; বিলাতবাসিনী উত্তপ্ত সুরা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, বিলাতী পাদরীগণ অবসর বুঝিয়া নেপথ্য হইতে বুকে পেটে হাত বুলাইতে

লাগিলেন, সুরম্য সাজে বিলাতী ভোজ্য সুলভে সুপ্রাপ্য হইল, আর এই চারিপোয়ায় পুষ্করা প্রাপ্ত হইয়া আমরা প্রেতত্ব লাভ করিলাম। এই রাজানুকরণের তরঙ্গে ভাসিয়া পড়িলে কাহারও বিশেষ ক্ষুব্ধ বা অপ্রতিভ হইবার প্রয়োজন নাই। জোয়ার ভাটায় পার আছে, কিন্তু বন্যার হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অপর কোন জাতি হইলে যে সব বড় বড় মহা তুফান আসিয়াছিল কোন কালে ভাসিয়া যাইত এখন তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। তবে হিন্দুজাতির নাকি বনিয়াদ বড়ই মজবুত খুব গভীরখাতে পাকা মসলার গাঁথুনি তাই আজিও আসল ইমারত টলে নাই; চূড়াটা, কার্ণিসটা বারাণ্ডাটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাত্র। যদি জাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, পরগাছা পরিচয়ে যদি লজ্জা হয়, বনিয়াদি বংশ বলিয়া যদি বুক ফুলাইবার গর্ব্ব থাকে, তাহা হইলে এস ভাই, ইঁট-পাটকেল কুড়াইয়া ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করিয়া লই। কাজ কি পরের এগার ইঞ্চি পকমিলে? নয়ইঞ্চি গাঁথুনীর জোরটাতো একবার দেখিতে পাইতেছ! নাই বা মিলিল হাল-ফ্যাসানি; সেকেলে রকমে বারাণ্ডা বাহির কর। যে দেখিবে সেই তোমার নিজ বাড়ী বলিয়া চিনিতে পারিবে। এই ঘোর বিপজ্জয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র রক্ষাই বাহাদুর; মহাপ্লাবনের মাঝখানে অচল অটল দাঁড়িয়ে থাকাই বীরত্ব। অনুকরণের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া উন্নতি নয়—দৌর্ব্বল্য; পুরাতন পাকা ইমারতের কোন্ ভাঙিয়া নূতন সরঞ্জামে সংস্কার করিতে যাইওনা, মিলও খাইবেনা মজবুৎও হইবে না! আর যদি বনিয়াদ শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিয়া হালফ্যাসানে নূতন করিয়া গাঁথ তাহা হইলে রঙচঙে চকচকে একটা কোটা খাড়া হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা তোমার বলিয়া কেহই চিনিবে না; আর একটা ভাদ্দুরে কোটালের বানে টিকিবে কিনা সন্দেহ।

ইংরাজী চাল হ্যাট্‌কোটও নয়, চেয়ার টেবিলও নয়। অন্তঃসারশূন্য বাহিরের চাকচিক্যই ইংরাজী চালের মুখ্য সার। ভিতর ভুয়া, বাহিরে

লম্বা চাল। আর কিছু হউক-না-হউক লেকাপাখানি দুরস্ত মাফিক চাই। আমার বোধ হয়, ইংরাজচরিত্র অধ্যয়ন করিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন হয় না, একবার মাত্র উহাঁদের ওয়েষ্টকোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অনেকটা বোঝা যায়। যত বড় সাহেবই হ'ন না কেন, সম্মুখ-ভাগের কাপড় অপেক্ষা ওয়েষ্টকোটের পশ্চাৎ ভাগের কাপড় নিকৃষ্ট হইবেই হইবে। কামিজের কলার কফেও এ গূঢ় রহস্য আছে। অবশ্য ইংরাজচরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে, আমি এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি না। আমরা যাহার অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, সংক্রামতা-দোষে যাহা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইংরাজের সেই সামাজিক বা সাধারণ নৈতিক চরিত্র অনেকটা তাঁহাদিগের হৃদয়বিরাজী ওয়েষ্ট-কোটের ন্যায়। এবং এই চরিত্রলক্ষণ অনুকৃত তদনুকৃত অনুকরণানু-কৃত হইয়া ক্রমে দেশের জলবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাই আজ আমরা দেখিতে পাই যে, এই বঙ্গের নিভৃত কোণে অতিদূর পল্লীগ্রামের চাষা, যে কখনও ইংরাজি শুনে নাই, সাহেবের 'সা' দেখে নাই, হয়তো কামিজ-পরা বাবুজীকেও প্রত্যক্ষ করে নাই, সেও দানাপুরের জুতা পায়ে দিয়া ধান কাটিতেছে। তাহার প্রতিবাসী শিউলী রঙ্গীন-রেপার গায়ে দিয়া খেজুর গাছে চড়িতেছে। তাই দেখিতে পাই, ময়রার দোকানের বালক গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পরিধানে গামছা, স্কন্ধে তৈলমলিন আর্দ্র বস্ত্র, কিন্তু ঘাড়ের চুল সাহেবিধরণে স্কোয়ারভাবে কাটা, আর ললাটে আলবার্ট ওল্টাইয়া পড়িয়াছে। তাই শুনিতে পাই যে, কাঙালীকলুর ছেলে পরিচয় দিতেছে যে, তাহার নাম ক্ষীতীন্দ্রভূষণ স্যাডর্খাঁ, আর কেওরা-বৌ সন্ধ্যাবেলা সপ্তমে চিৎকার করিয়া জটাফেলা অর্দ্ধবাসা লম্বোদরী কন্যাকে ডাকিতেছে,—অম্বালীকে—ও—ও—ও—ও—ভাতারখাকী—অম্বালীকে—এ—এ—এ।

এখন রাজচন্দ্র আর ভবসুন্দরী এঁদের দুজনেরই চালচলন খুব সাদাসিদে, বেশ পুরাণো হিন্দুয়ানী ধাঁচের। তবে লুটবিহারি যে গলায় বুটীকাটা দোলাই বেঁধে ধামী করে জলপান খাবে এটা মায়ের প্রাণে সহ্য হবার নয়। পাড়াগাঁয়ে হ'লে যা-হতো তা-হতো, কিন্তু কলিকাতা সহরে, ছেলেকে এমন অবস্থায় রাখ্‌লে লোকে দেখে বল্‌বে কি! ঐ বোসেদের ছেলেগুলি কেমন কোটপেণ্টুলেন পরে স্কুলে যায়, মাথার টুপিগুলি পর্য্যন্ত ঠিক সাহেবের মত। অই ভট্‌চার্য্যিদের মেজ-বৌএর মেয়েটীকে ঘাঘরা টুপি-টুপি পরিয়ে যখন ঠেলাগাড়ী করে ঝি বেড়াতে নিয়ে যায় তখন কি সুন্দরই মানায়। কে বলবে যে ভট্‌চার্য্যি-বামুনের ঘরে অমন মেয়ে জন্মেছে? ঠিক্ যেন মেমের মেয়ে। আর কত গেরস্ত-ঘরের বৌ-ঝি যে এখন দিনরাত মেমেদের মত সেজেগুজে থাকে! সেদিন ডাক্তারগিন্নি নাতির আইবুড়ো-ভাতের নেমতন্ন কত্তে এসেছিলেন, একটা তাকিয়ার খোলের মত কি ভেতরে পোরে তার ওপর বোম্বাইশাড়ী ঘাঘরার মতন করে ঘুরিয়ে পরেছেন, গায়ে জরির কাজ-করা মখমলের বডি, কাণে পান্নার ইয়ারিং; আবার আমাদের গঙ্গাজল-তোলা উড়ে ভারী মিন্‌সের যেমন আছে তেমনি কপালের ওপরকার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, আর রগে এঁড়ো সিঁথে। দেখ, এখন এসব হয়েছে, তা আমি নিজের জন্যেতো কিছু বলি না, আমার ওসব সখও নেই সাধও নেই, মেয়েটাকে ছেলেবেলাও তেমন সাজাতে-গোজাতে পারি নাই, এই গুঁড়োটুকো যাহোক্ এদ্দিনের পর ভগবান্ দিয়েছেন। আর তুমি এখন দিলেও দিতে পার তাই বলি। আর লটুরও বড় হলে দুঃখ থাকবে যে ছেলেবেলায় সাজতে-গুজতে পায়নি। এই রকম ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র দৃষ্টান্তাদি দ্বারা ভবসুন্দরী স্বামীর নিকট হইতে ছেলের জন্য ইংরাজী পোষাক, প্যারাম্বুলেটারগাড়ী ধর্ম্মতলার বিস্কুট প্রভৃতি আদায় করিতেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

ভারতের পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণী লইয়া ফিরিঙ্গি বণিক ভাস্কো-ডা-গামা যে বৎসর লিস্‌বনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার পর বৎসর পর্ত্তুগাল-অধিপতি ইমানুয়েল এইরূপ ঘোষণা প্রচার করেন,—'ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতীয় বাণিজ্যের আমরাই আবিষ্কর্ত্তা,—ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের। কিন্তু পর্ত্তুগালের প্রত্যেক অধিবাসী এবং আমাদের নিদেশ পত্র লইয়া পর্ত্তুগালস্থ বৈদেশিকগণ সকলেই এক ভাবে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারিবে।'

সৌভাগ্যবান বৈদেশিক বণিকদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া যে এমন ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় নহে; কারণ বাণিজ্যের মরসুমে তাহাদের লাভের এক চতুর্থাংশ পর্ত্তুগালের রাজ-কোষাগারে প্রদান করিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার জন্য আক্ষেপের বিশেষ কারণ ছিল না; তখন ভারতবর্ষ অশেষ রত্নের আকরস্বরূপ বলিয়া পরিচিত ছিল—তখন সাগরাম্বরা ভারতের এক মুষ্টি ধূলিও অর্থলুব্ধ বৈদেশিক বণিকসম্প্রদায়ের চক্ষে মহামূল্য বলিয়া মনে হইত। ভাস্কো-ডা-গামার ভারতাভিযানে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, একবার ভারতবর্ষে গমনাগমনে যে ব্যয় হয়, লাভের অংশ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক,—প্রায় ষাট গুণ। সুতরাং এই অবস্থায় বাণিজ্য-লব্ধ ধনরত্নের এক চতুর্থাংশ রাজ-কোষাগারে প্রদান করিয়া সিংহাসনকে তুষ্ট রাখিতে কাহার অনিচ্ছা ছিল?

এতদিন পর্য্যন্ত ইমানুয়েল তাঁহার কল্পনামুখর নয়নে সমৃদ্ধি-শালিনী ভারতবর্ষের শুধু মোহিনী আলেখ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে ও হর্ষে

দিনযাপন করিতেছিলেন; তখন পর্য্যন্তও তিনি এ চিন্তা মনে স্থান দিতে সাহস করেন নাই যে এক দিন সেই ভারতবর্ষ পর্ত্তুগালের সিংহাসনতলে মস্তক অবনত করিবে! কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরই ইমানুয়েল প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আর নহে, এইবার ভারতবিজয়ের আয়োজন করিতে হইবে—এইবার কল্পনাকে অতল সাগরসলিলে নিমজ্জিত করিয়া সত্যের সুবর্ণ মন্দিরদ্বার সগৌরবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমগ্র বিশ্বকে সগর্ব্বে দেখাইতে হইবে—ভারতবর্ষ আমার।'

ইমানুয়েল আর কালবিলম্ব করিলেন না; যথাসম্ভব সত্বর ১৩খানি বাণিজ্যপোত সজ্জিত হইল—পর্ত্তুগালের সাহসী কুশলী নাবিকগণ সেই সকল পোতের অধ্যক্ষ হইয়া কামান, গোলা, বারুদ প্রভৃতি লইয়া সুদক্ষ পথপ্রদর্শকের ইঙ্গিতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। বিধর্ম্মী "নেটিভ"দিগকে চিরঅন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য ১৬ জন ধর্ম্মযাজক দয়াপরবশ হইয়া ভারতযাত্রায় যোগ দিলেন! এই পোত-বহরের কাপ্তান পিড্রু অল্‌ভারেজ যখন কালিকাটে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন জামোরিণ পুলকিত চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। হায় রে বাণিজ্য-শুল্কের মোহিনী মায়া!

পিড্রু অল্‌ভারেজ সমুদ্রতীরে একটী কুঠী সংস্থাপন করিয়া সহর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আরব বণিকগণ পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল—প্রথম দর্শনেই ফিরিঙ্গিকুলের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই; এখন তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল ফিরিঙ্গি পিড্রু সমুদ্রমধ্যে একখানি আরব-জাহাজ ধৃত করিয়া জামোরিণের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং কালিকাটের বন্দরেই একখানি মুসলমান-বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিয়া পণ্যসংগ্রহে সত্বর হইলেন! আরব বণিকসম্প্রদায় বুঝিল যে এক হস্তে শাণিত কৃপাণ ও অপর হস্তে

ক্রশ লইয়া যে ফিরিঙ্গিকুল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে তাহারা সহজ লোক নহে! আরবদিগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের জীবন-মরণ-কলহ উপস্থিত হইল।

মহাশক্তি মহম্মদও রিক্তহস্তে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই—তাঁহার শিষ্যগণ কৃপাণ এবং কোরাণের আমরণ সম্বন্ধ ভালরূপেই বুঝিয়াছিল; তাই বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত, প্রতিহিংসাব্যাকুল কতকগুলি আরব একদিন পর্ত্তুগালের কালিকাটে প্রতিষ্ঠিত কুঠী আক্রমণ করিয়া প্রধান কুঠিয়াল এবং ৫৩ জন অনুচরকে হত্যা করিল। ফিরিঙ্গিবণিকের লোহিততপ্ত শোণিত সেই দিনই প্রথম ভারতবর্ষের পাদমূল রঞ্জিত করিয়া ফিরিঙ্গির ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিল! পিড্রু এ অপমান বিস্মৃত হইলেন না—দ্বাদশখানি আরব-জাহাজ ধ্বংশ করিয়া কোচিন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অন্তর্বিবাদ ভারতের ইতিহাসে চিরপরিচিত। সেই সেকালেও কোচিন এবং কালিকাটে সৌখ্য-সম্বন্ধ ছিল না। কোচিন-রাজ দেখিলেন বিধাতা যদি সুযোগ মিলাইয়াছেন কেন তাহা হেলায় পরিত্যাগ করিব। তিনি পিড্রুর সহিত মৈত্রী করিলেন; পিড্রু কল্পতরু হইয়া বর দিলেন 'একদিন অবশ্যই তোমাকে জামোরিণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব—আমরা থাকিতে ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের?' কোচিন-রাজ কালিকাট-রাজসিংহাসনের সুখস্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় সুবিধা-দামে পিড্রুর নিকট নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিলেন; বিনা বিবেচনায় তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন—কোচিনতটে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভারতমহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পিড্রুর মনোবাসনা পূর্ণ হইল। কুইলন, কানানোর প্রভৃতির অধিপতিগণও পিড্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; পিড্রু

অলভারেজ মহাবিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, মালাবারতীর ছাড়াও ভারতবর্ষে বহুতর বাণিজ্যোপযোগী বন্দর আছে! পিড্রু মনে মনে ভাবিলেন, এ সকল বন্দর একদিন পর্ত্তুগালেরই হইবে! মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করিয়া পর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পিড্রু অল্‌ভারেজ দুর্ভাগ্যবশতঃ (?) এবং ভ্রমক্রমে (?) কোচিনের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গেলেন—এ ভ্রম সঙ্গতই হইয়াছিল, কারণ তখন কোচিনের কুঠীতে কয়েকজন ফিরিঙ্গি বণিক কুঠিয়ালস্বরূপ অবস্থান করিতেছিল?

ইমানুয়েল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; পিড্রু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই জোয়াও-ডা-নোভা [João da Nova] চারি খানি জাহাজ লইয়া মালাবার তীরে পিড্রুর পদাঙ্কানুসরণে ব্যস্ত হইলেন। কালি-কাটের লুণ্ঠিত বিদগ্ধ বাণিজ্যতরণীসমূহ হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উত্থিত হইয়া মালাবারতীরে ফিরিঙ্গি পরাক্রম বিঘোষিত করিতে লাগিল! নরপতি ইমানুয়েল দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দুইটী পথ প্রশস্ত রহিয়াছে—শান্তি কিম্বা সমর! হয় মালাবার তীরের বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া, নয় কালিকাটের ধ্বংশসাধনপূর্ব্বক আরব বণিককুলকে ভারত হইতে উৎখাত করিয়া ভারতে একচ্ছত্র বাণিজ্যের বিস্তার করা। খ্রীষ্টান ইমানুয়েল চিন্তান্বিত হইলেন, কি গ্রহণ করিবেন—অলিভশাখা না, সুশাণিত রক্তপিপাসু কৃপাণ? বাণিজ্য-বিস্তারকালে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে দাঁড়াইয়া কে কবে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে? ইমানুয়েল কৃপাণ তুলিয়া লইয়া কৃতার্থ হইলেন; তাই ভারত-মহাসমুদ্রের সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় কুড়ি খানি জাহাজ লইয়া ভারতে পর্ত্তুগালপতাকা প্রতিষ্ঠামানসে যাত্রা করিলেন।

অধিক দিন নহে, পঞ্চবর্ষপূর্ব্বে যখন তিনি চারি খানি জাহাজ লইয়া টেগাস্তার হইতে ভারতযাত্রা করিয়াছিলেন তখন সমগ্র

পর্ত্তুগাল নিরাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া ইমানুয়েলের কার্য্যের ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছিল—সেই জীবনান্তকারী অভিযান হইতে ডা-গামাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য পর্ত্তুগালের অধিবাসীগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কত না চেষ্টাই করিয়াছিল! কিন্তু এখন আর তাহা হইল না; ডা-গামা পর্ত্তুগালের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গর্ব্বিত চিত্তে প্রসন্ন হৃদয়ে ভারতযাত্রা করিলেন; বেলেম-মন্দিরে বিজয়ঘণ্টা নিনাদিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামার অভিনন্দন করিল। ডা-গামা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন শুধু আবিষ্কার করিতে, এবার যাত্রা করিলেন সেই সুনীলসাগরজলবিধৌত ভারতের তীরে ক্রশ এবং কৃপাণের সাহায্যে আবিষ্কার ভিত্তি দৃঢ় করিতে, কমলার পূর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পর্ত্তুগালের রাজকোষ পূর্ণ করিতে—তাই সেবার, দেশের অর্থনাশ আশঙ্কা করিয়া পর্ত্তুগালবাসীগণ দুঃখে ক্ষোভে ডা-গামাকে যেমন অভিশাপ দিয়াছিল, এবার তেমনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সেদিনে আর এদিনে কত প্রভেদ!

পর্ত্তুগালের কর্ম্মপথ এতদিনে অরুণ-কিরণ-সমুজ্জ্বল হইয়া সাধারণ-জনগণকে কর্ত্তব্যপালনে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল—পর্ত্তুগীজগণ অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অসীম উৎসাহসহকারে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক বাহু বাণিজ্যের এবং অপর বাহু শোণিতরঞ্জিত রণদেবীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া পর্ত্তুগালের কর্ম্মব্যাকুলতা, উন্নতিমার্গে ধাবিত হইল—সে অপ্রতিহত বেগের সম্মুখে দুরতিক্রম্য বাধা-ব্যতিক্রম দরীমুখোচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় নিমেষে ভাসিয়া গেল। সম্মুখে কর্ম্মের অনন্ত যশোবিমণ্ডিত সুবর্ণপথ, পশ্চাতে মূর্ত্তিমান উৎসাহস্বরূপ নরপতি ইমানুয়েল—কর্ম্মে এবং বাক্যে, কৌশলে এবং বিচক্ষণতায়, দার্ঢ্যে এবং ধৈর্য্যে সর্ব্বদা পর্ত্তুগালকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন; তবুও তাঁহার বুদ্ধি এবং বীর্য্য, কৌশল এবং উৎসাহ সমস্তই

নিষ্ফল হইত, যদি কর্ম্মের প্রকৃত ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনপণে বিজয়লাভ করিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকিত। কিন্তু ইমানুয়েলের শিক্ষিত চক্ষু, লোক নির্ব্বাচনে সুদক্ষ ছিল, তাই ডা-গামার প্রথম অভিযানের পর চব্বিশ বৎসর মধ্যেই মালাক্কা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

তখন মালাক্কার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী বন্দর আর ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এসিয়ার পূর্ব্ব এবং পশ্চিমভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তখন মালাক্কা এসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। মালাক্কায় তখন চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়ার সকল রাজ্যের বাণিজ্য তরণী দেখা যাইত—এদিকে আবার মালাবার, সিংহল, করোম্যাণ্ডল এমন কি বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদায় পর্য্যন্ত বাণিজ্যব্যপদেশে মালাক্কায় যাতায়াত করিত। অধিক দিন নহে, চব্বিশ বৎসরের মধ্যেই পর্ত্তুগাল, সেই মালাক্কায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; শুধু ইহাই নহে, গোয়া এবং ডিউ নগরে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক মালাবারতীরে একাধিপত্য করিতেছিল এবং লোহিত-সাগরের পথে মিসর ও ভারতের বাণিজ্যের বিষম বাধা ঘটাইয়া পর্ত্তুগালের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সেই পরম উৎসাহী ইমানুয়েল কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামা ১৫০২ খৃঃ অব্দে পুনরায় কালিকাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। আরবদিগের পূর্ব্ব শত্রুতা ডা-গামার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি জামোরিণের বন্ধুতা ও অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া,—যে কালিকাট একদিন তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিয়াছিল, রাজার অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল—সেই কালিকাটের উপর অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন! আরবদিগের বাণিজ্যতরণী যাহা তীরে ছিল, সে সমুদয় ধ্বংশ করিয়া ফেলিলেন! ডা-গামা যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা কতকাংশে সফল হইয়াছিল বটে,

কিন্তু তাঁহার নামের সহিত নৃশংস অত্যাচারকাহিনী এমনি সংযুক্ত হইয়াছিল যে ফিরিঙ্গি বণিকের নামে লোকে নিদারুণ শঙ্কিত হইত—তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরাজবর্ণিত নৃশংস হায়দার আলিও ভাস্কো-ডা-গামার ন্যায় অত্যাচার করিতে পারেন নাই—অথচ হায়দারের ইতিহাস রচনাকালে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন!

ডা-গামা বিপুল বিক্রমে কালিকাটে উপনীত হইয়া কালিকাটের পোতবহর ধৃত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে আটশত নাবিক বন্দীকৃত হইল। ডা-গামা মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত সাগরসলিলে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের বাহুযুগল, কর্ণদ্বয় এবং নাসিকা অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন! যদি তিনি এই খানেই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলেও বুঝিতাম তাঁহার পাষাণকঠিন অ-মানুষিক হৃদয়েও মনুষ্যত্বের অতি ক্ষীণ চিহ্নও বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তিনি সেই সকল ছিন্ন বাহু, রক্ত-সিক্ত নাসাকর্ণ একত্র করিয়া বৃক্ষের রাশিকৃত শুষ্ক পত্রসহ জামোরিণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন! কেন? রাজপদে উপঢৌকনস্বরূপ;—জামোরিণ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহার করিবেন বলিয়া*! এ কাহিনী শুনিলে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস ধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অনন্তকাল এই ভীষণ অত্যাচার-কাহিনীর সত্যতা সপ্রমাণ করিবে। চিরকাল কহিবে, এই পৈশাচিক কাণ্ড ফিরিঙ্গি বণিকেরই যোগ্য—অন্য কাহারও নহে।

যখন এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তখন বোধ হয় ডা-গামা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, একদিন জামোরিণ রাজপ্রাসাদে উপাদেয় ফল-মূলে তাঁহাদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কালিকাটের কোন কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের এবং ধনাঢ্যের গৃহে একদিন ডা-গামা

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

ক্ষুধায় আহার পাইয়াছিলেন, পিপাসায় বারি পাইয়াছিলেন—বিশ্রামের জন্য শয্যা এবং আশ্রয় পাইয়াছিলেন! তাহারই উপযুক্ত পুরস্কার-স্বরূপ ফিরিঙ্গি বণিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার কালিকাটের ধ্বংশসাধনে উদ্যত হইয়া নিরপরাধ নাবিকদিগের রক্তসিক্ত ছিন্ন বাহু, ছিন্ন কর্ণ, ছিন্ন নাসা ব্যঞ্জন রন্ধনের জন্য রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে যশস্বী হইয়াছিলেন*!

হতভাগ্য "নেটিভ"দিগের মধ্যে আর যাহারা বন্দী হইয়া বিচারের জন্য ডা-গামার নিকট আনীত হইয়াছিল, কঠিন কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাহাদিগের দশন-পংক্তিগুলি ভাঙ্গিয়া, সেই ভগ্নদশনখণ্ডগুলি তাহাদের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল! অত্যাচারের উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও এরূপ অত্যাচারপ্রক্রিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় কি না সন্দেহ।

সংবাদবাহী একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ দুরদৃষ্টক্রমে ফিরিঙ্গি সর্দ্দারের কবলে নিপতিত হইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় প্রাণটুকু রক্ষার জন্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, সে সন্দেশবহ নহে—গুপ্তচর! হতভাগ্যের আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু তাহার এইখানেই যন্ত্রণার শেষ হয় নাই; ফিরিঙ্গিসর্দ্দার পৈশাচিকতায় উন্মত্ত পিশাচকেও পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণের ওষ্ঠ এবং কর্ণদ্বয় কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর একটী কুক্কুরের সদ্য কর্ত্তিত কর্ণ সেই হতভাগ্যের ছিন্ন কর্ণস্থানে লাগাইয়া দিয়া ডা-গামা তাহাকে জামোরিণের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন!! হায় ব্রাহ্মণ! তালি প্যাগোডায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমরাই না একদিন এই রাক্ষসতুল্য, হিংস্রস্বভাব ফিরিঙ্গিসর্দ্দারকে কত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গৌরীর মন্দিরে চন্দন উপহার দিয়াছিলে—

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-মুখে তোমরাই না একদিন এই নরপিশাচের জন্য সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিয়াছিলে ?

যেমন সর্দ্দার তাহার অনুচরগুলিও তেমনি উপযুক্ত ছিল। একদিন ভিন্‌সেন্টি সোদ্রি নামক এক ফিরিঙ্গি একজন শ্রেষ্ঠ মাননীয় আরব বণিককে নিতান্ত অকারণে অথবা কল্পিত কারণে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিতে করিতে অচৈতন্য করিয়াছিল; তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় সেই চৈতন্যহীন হতভাগ্যের বদনবিবরে আবর্জ্জনারাশি প্রবৃষ্ট করাইয়া তদুপরি একখণ্ড শূকরমাংস স্থাপনপূর্ব্বক মুখ বাঁধিয়া দিয়াছিল* ! শুনিতে পাওয়া যায়, সেই মন্দভাগ্য আরব বণিক নাকি একদিন মহামান্য (!) ভিন্‌সেন্টি সোদ্রিকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিল বলিয়া সেই ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের সন্দেহ হয়! কেহ কেহ বলেন, অপমানজনক বাক্যপ্রয়োগের এই কাহিনী আত্মাভিমানী সোদ্রীর সম্পূর্ণ রটা কথা—ইহার মূলে কোন সত্য নাই! ঐতিহাসিক হণ্টার তাই বলিয়াছেন—

"*The Portuguse cruelties were deliberate rather than vindictive.*"

প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মানুষ যখন অত্যাচার করে তখন তাহার ক্ষমা বা একটা কৈফিয়ৎ আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বিনা কারণে, শুধু অত্যাচার করিব বলিয়া অত্যাচার করে তাহার কখনই ক্ষমা নাই—সে ব্যক্তি মানব-বিচারের আমলে আসিবারও যোগ্য নহে।

অমানুষিক অত্যাচারের স্রোতে সমগ্র মালাবারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ডা-গামা বিজয়োল্লাসে পর্ত্তুগালে ফিরিয়া গেলেন। এতদিনে হিন্দু জামোরিণ বুঝিতে পারিলেন, ফিরিঙ্গিগণ তাঁহার বন্ধুতার সম্মান কতদূর রক্ষা করিয়াছে—কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিয়াছে! এতদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন বাণিজ্য-শুল্কলাভের প্রত্যাশায় কি বিষম আপদই বরণ করিয়া লইয়াছেন। এখন তাঁহার মনে হইল যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলমান বণিকগণ ফিরিঙ্গিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল—মালাবার-তীর হইতে তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট কত না সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিল,—তখন তাহাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া কি বিষম ভ্রমই করিয়াছেন!

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

আরব বণিক্‌সম্প্রদায় পূর্ব্বাপরই ফিরিঙ্গিবিদ্বেষী ছিল—তাহারা এই সকল ভীষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অত্যাচার-নিহত আরবদিগের প্রতি শোণিতবিন্দু কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রতিশোধ ভিক্ষা করিতে লাগিল—মহম্মদের সুশাণিত খড়্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। রোষোন্মত্ত, ক্ষুব্ধ, আরবগণ ফিরিঙ্গির বন্ধু কোচিন-রাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া পর্ত্তুগীজ কুঠিয়ালদিগকে কাড়িয়া লইতে চাহিল। কোচিনরাজ শরণাগত ফিরিঙ্গিদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন—যুদ্ধ কলহ, বিপদ প্রভৃতি গ্রাহ্য করিলেন না।

এদিকে ডা-গামা ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে মালাবারে অনাথরোদন সমুত্থিত করিয়া কোচিন, কানানোর, কুইলন এবং কাটিকালায় বাণিজ্যের সুদৃঢ় বন্দোবস্ত করিয়া দুইটী নূতন কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন; রাজার আদেশক্রমে কানানোরের কুঠীতে বৃহৎ কামান, বারুদ গোলা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণসমূহ সংগৃহীত করিয়া ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; পাছে গোলা-গুলি দেখিয়া কানানোরের সুপ্ত অধিবাসীবৃন্দ অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। কোচিনরাজ কালিকাটের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না—ফিরিঙ্গিবণিকের পৈশাচিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়াও সতর্ক হইলেন না—জামোরিণের সিংহাসন তখন কোচিনরাজকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিয়তি বক্র হইলে কে কি করিবে ?

মালাবারের এবং আরবদিগের প্রদীপ্ত অভিসম্পাত মস্তকে লইয়া ফিরিঙ্গি ডা-গামা লিসবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে যিনি ফিরিঙ্গির কর্ত্তা হইয়া ভারতে আসিলেন তিনিও ডা-গামার পদাঙ্কানুসরণ করিতে বিরত হইলেন না—সে কাহিনী পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

"বয়কট" এবং "স্বদেশীয়তা"।

গত ৭ই আগষ্ট টাউনহলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা করে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন না গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙ্গালী বৃটিশ মাল বয়কট (boycott) কর্‌বে। তার পরে, অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ আস্ত থাকুক্ কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবল মাত্র স্বদেশী বস্তু ব্যবহার কর্‌বার পণ ছাড়ব না। একদলের মতে বয়কট-ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজার অধিকার বজায় রাখা। অপর দলের মতে—"স্বদেশীয়তা" শুধু একটা অর্থ-নীতির চাল, উদ্দেশ্য,—প্রজার দারিদ্র্য মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকী আমাদের সকলের নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা দুয়ে মিলে একটা ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীয়তাই বল,—সাধারণের কাছে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিষটা কি চাই, কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল আছে তাই নিয়েই চিৎকার কর্‌তে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যাঁর মনোভাব এই যে, তাঁর মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এই রকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ দুই একই জিনিষ, কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে ত সে পার্থক্য কোথায় সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ আমি "স্বদেশীয়তা" সম্বন্ধে দুটি চারটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্তু প্রচারের কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হ'ল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য্য সকল জিনিষ বিদেশ থেকে আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এইরূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের মত শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের একটী প্রধান কারণ সেত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এ কথাও কেউ অস্বীকার কর্‌বেন না। এ সব জেনেশুনেও দু'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেননি। আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন মিছি মিছি economical laws এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা নিজেদের অদৃষ্ট দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা ভগবানের হাত দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে; তাদের দুর্দ্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিই নি। আমাদেরও তাতে বিশেষ দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি-কোটি ইতরসাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির

উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্ত কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে supply, তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি কর্‌তে পারিনে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগৎকে আমরা কায়দা কর্‌তে পারিনে। পিপাসা বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হ'লে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্তু চোখ নেই, সেই জন্য কলেগড়া জিনিষ আমাদের কাযে লাগে, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাযের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম; Economy ছেড়ে aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশী শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না; এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের "স্বদেশীয়তা" এই অবস্থায় ছিল।

এখন বয়কটে আসা যাক্। বয়কটের অর্থ হচ্ছে, তোমার জিনিষ ছোঁব না। তুমি সস্তাতেই দাও আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিষ কিন্‌ব না। ফি রকম জিনিষ যদি বেশি দামে

কিন্‌তে হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিষ কিন্‌ব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে জিনিষ না পাওয়া যায় তাহলে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয় তাও স্বীকার, আমাকে নানারকম স্বার্থত্যাগ কর্‌তে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা বিশেষ কোন আঘাত না লাগ্‌লে জন্মায় না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্ত্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্ দূর ভবিষ্যতে তাঁতি, ছুতোর, কুমোর, কামারের অবস্থা একটু ভাল কর্‌বার জন্য বর্ত্তমানে নীজে দুরবস্থায় পড়্‌তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালীমাত্রেই বৃটিশ মাল বয়কট কর্‌ব এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই, বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দুদিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল Economicsএর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব এ দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তারা পার্টিসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের উপায়স্বরূপ মনে করি। ইংরাজজাতের পকেটে টান পড়্‌লে, চাই-কি বাঙ্গালীর প্রতিও তাঁদের নজর পড়্‌তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটের জন্ম। আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব ইংরাজের কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশী চিজ—

সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মঘট করা দোকান-পাট বন্ধ করা প্রভৃতি, রাজার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা। এই ধর্ম্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের হাতে একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট কর্‌বার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্ম্মঘটও চিরকাল রাখা যায় না, বয়কটও চির-কাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধান উপায় দেশে জিনিষ প্রস্তুত করা। পরের কিন্‌ব না বলায় কোনই লাভ নেই, যদি-না নিজের মাল বাজারে ফেল্‌তে পারি। সুতরাং স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার, স্বদেশী বস্ত্র প্রচার করা নয়, প্রস্তুত কর্‌বার উপর নির্ভর কর্‌ছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয়। স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতিস্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেকটা স্বজাতিবৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চ্চা করবার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায়। যে উদ্দেশ্যে একায করা তার যতদিন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না হয়ে যায় ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্ত্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটে কৃতকার্য্য হই, যদি ইংলণ্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্ব্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক, কি মিছে, তা'বলবার আমাদের অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে, বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের "স্বদেশীয়তা" প্রাণলাভ করেছে। এই ঝোঁক আমরা কিছুদিন রাখতে পার্‌লেই আমাদের স্বদেশী শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কার্য্য আরম্ভ করা

গেছে অর্থ-নৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ কর্‌বো। উপরে যা বললুম তার সারমর্ম্ম এই ;—যাঁরা বলেন, বয়কট, রাজনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক ; যাঁরা বলেন, "স্বদেশীয়তা" অর্থনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক। আর আমরা আপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুইই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ ; আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

অভয়বাণী।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভয় হও, আমরা তোমাদিগের উৎসাহে বাধা দিব না, তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। তোমাদিগের যিনি জননী, তিনি আমাদিগেরও জননী ; মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমরা যে সঙ্কল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরাও ধারণ করিলাম ; তাঁহার সেবার জন্য তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমরাও গ্রহণ করিলাম।

বঙ্গরমণী কবে কোন্ কঠোর ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে? পর দুঃখ নিবারণ অভিপ্রায়ে, পিতাভ্রাতাপতিপুত্রের মঙ্গলকামনায় ইহকাল, পরকালের হিতার্থে চিরদিন তাহারা কঠোর ত্যাগস্বীকারে শরীর পতন করিয়া আসিতেছে। আর আজ জন্মভূমির পূজায় কষ্ট স্বীকারের ভয়ে তোমাদিগের সহিত যোগদানে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে?

তোমরা নির্ভয় হও, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আজ আমাদের মহোৎসব। আজ পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী,

পতিপত্নী সকলে মিলিয়া আমরা মহাব্রত ধারণ করিতেছি ; এত পুণ্য, এত আনন্দ আমাদের স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত। এই পুণ্য, এই আনন্দলাভের জন্ত কোনও কঠোরতা স্বীকার করিতেই বঙ্গরমণী কষ্ট বোধ করিবে না।

কিন্তু এ ব্রত অভূতপূর্ব্ব ব্রত। ইহাতে উপবাস নাই, শরীর পতন নাই, কোন কষ্টই নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই ব্রত ! তবে তোমরা কিজন্ত মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব ? বিলাতী চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখারুলি পরি, বিলাতি সাবান, বিলাতি সুগন্ধীদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান ও চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মত চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতি লেশ না দিয়া দেশী চিকণ লাগাইয়া পরি, সূক্ষ্ম বিলাতি মজলিন ও পায়নাপল প্রভৃতির বদলে, দেশের চেলি বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই আর বিলাতি সুলভ শাড়ির বদলে, সামান্ত বেশিদরের শাড়িই ব্যবহার করি, তাহা কি ত্যাগস্বীকার ? না কোন কষ্টনামবাচ্য ? অবশ্য গরীবলোকের পক্ষে সুলভ বিলাতি বস্ত্রের বদলে সামান্ত চড়াদরের দেশী বস্ত্র কেনাও কষ্টকর। কিন্তু আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য, এক ব্রত। একের অর্থ অন্তের পরিশ্রম মিলিত করিয়া তাঁহারা দেশের কলকারখানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিভেদে সকলেই দেশীবস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। এসময় আমরা ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরণীগণ, যদি বিলাতি তেল, বিলাতী সুগন্ধী, বিলাতি জ্যাকেট, এবং অন্তান্ত নানাবিধ সৌথিন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তবে কত অপব্যয় নিবারণ করিতে পারি এবং এইরূপে সঞ্চিত অর্থ দেশের উন্নতিতে প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে আমরা কতদূর সহায়তা করিতে পারি ? দেশের কার্য্য করিবার, স্বামীভ্রাতা

পিতাপুত্রের সহায়তা করিবার এই সুযোগ, এই অবসর কোন বঙ্গরমণী না হাস্য মুখে গ্রহণ করিবেন।

আশ্বিন মাসে মা আসিতেছেন, এসময়ে নূতন বস্ত্র পরিধান আমাদের চিরন্তন প্রথা, কিন্তু তোমরা যদি দেশীবস্ত্র যোগাইতে না পার তাহা হইলে এসময়েও আমরা নূতন বস্ত্র পরিব না। আমাদের বংশানুক্রমে রক্ষিত পুরাতন চেলি বারাণসী পরিয়া এমন কি অভাবপক্ষে আমরা পুরাতন ধৌত বস্ত্র পরিয়াই দেবীকে প্রণাম করিব, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিব, তথাপি এসময়েও আমরা বিলাতি বস্ত্র পরিব না। আমরা বুঝিয়াছি ইহাতেই দেবী ভগবতী অধিক সমাদৃতা হইবেন ; তাঁহার পূজার যথার্থ ফল হইবে। অতএব হে বঙ্গসন্তানগণ, আমি তোমাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বঙ্গরমণীর পক্ষ হইতে এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছি যে তোমাদিগের সঙ্কল্পই আমাদিগের সঙ্কল্প, তোমাদিগের ব্রত আমাদিগেরও ব্রত। তোমরা নির্ভয় হও, তোমাদের প্রতিজ্ঞা অটল রহুক, তোমাদিগের ব্রত অবাধে উদ্যাপিত হউক।

ব্রতধারিণীদিগের পক্ষে নিবেদিকা

কোন ব্রতধারিণী।

গান।

বড় হংস সারং—ঝাঁপতাল।

শতকণ্ঠে কার গান, জননীর পূতনাম
অক্ষত রাখিব মান, লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত,
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিনু এই শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ
মায়ের হীনতা লাজ, হবে দূর পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম
এই অস্ত্র এই বর্ম্ম, আমাদের মুক্তি পথ।
নমোনম বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

খেয়াল খাতা।

কণিকা।

আশা ও নিরাশা।

রবির প্রথম আলো জাগে গিরিশিরে,
শেষ রশ্মি মিশে যায় সাগরের নীরে,
নবজীবনের আশা অতি উচ্চে জ্বলে,
নিরাশার অবসান অকূল অতলে!

স্মৃতি।

বর্ষাদিনে পথ আর ভাল নাহি লাগে
ভাল লাগে নিভৃত ভবন
দুর্দ্দিনে স্বপন ভুলে নব-অনুরাগে
স্মৃতি লয়ে কাটাই জীবন!

বাঙ্গালীর পরীক্ষা।

১। ভাবের ঠেলা।

এক একটা ভাবের ঠেলায় অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়া যায়। এইবার বঙ্গাঙ্গভঙ্গব্যাপারে বাঙ্গালী, ভাবের সম্বন্ধে [illegible]র মাঝ-গাঙ্গে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদেশী বস্তু বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্যজাত ব্যবহার করার সংকল্প আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কতিপয় খেয়ালী লোকেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এইবার বিজাতীয় অঙ্কুশের পীড়নে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মাথার টনক নড়িয়াছে। রাজধানী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত প্রধান নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে যে তুমুল উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ ভাব যদি স্থায়ী হয় তবে বাঙ্গলার ললাটলিপিতে জর্জ্জ নাথানিয়েল কার্জ্জন তাহার মহা মিত্র বলিয়া লিখিত ছিলেন।

২। চরিত্রগঠন।

Sow an act, reap a habit;
Sow a habit, reap a character;
Sow a character, reap a destiny.

আমরা হিন্দুরা এ কথা বিশেষরূপে মানি। একবার কৃতকর্ম্ম সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া বারম্বার তাহার আবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে। এইরূপেই অভ্যাসে চরিত্র গঠন হয়। ব্যক্তিগত কর্ম্মের ন্যায় জাতীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ বহুজনে সমষ্টিতে কৃতকর্ম্ম আমাদের জাতীয় চারিত্র্যের, জাতীয় দৃঢ়তা, সাহস ও অটল প্রতিজ্ঞতার বীজ বপন করিবে। কর্ম্ম যত তীব্রতার সহিত কৃত হয়, তাহার ফলও তত তীব্র ও শীঘ্র প্রকটিত হয়। তাই বাঙ্গালীর এবারকার ভাবের তীব্রতায় জনিত যে কর্ম্ম তাহা বাঙ্গালীচরিত্রে তীক্ষ্ণ ও গাঢ় রেখা অঙ্কিত করিবে, এবং সেই সংস্কার আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

এবার আমরা বস্তুতঃ কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, জাতীয় সমৃদ্ধি বিষয়ে কোন্ কোন্ বস্তু লাভ করিয়াছি তাহা একবার ঠাহরাইয়া দেখি :—

১। বিদেশীয় জিনিষ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পালন-চেষ্টায় আত্মসংযমরূপ মহাশক্তিমান্ বীজ হইতে চরিত্রবলরূপ মহা-ফললাভ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহার ভিতর সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও আত্মশ্রদ্ধা গূঢ়নিবিষ্ট রহিয়াছে।

"জিতং জগৎ কেন?
—মনো হি যেন।"

আমরা যদি য়ুরোপের নানামোহিনীমূর্ত্তিধারিণী, নানা হাব-ভাব বিলাসিনী, নানাকৌশলজালবিস্তারিণী শিল্প-মায়াবিনীর কুহকে বিচলিত-মনা না হই, যদি আত্মজয়ী হই, যদি প্রতিজ্ঞায় অটল থাকি তবে পৃথিবী জয় আমাদের করায়ত্ত। এই তপস্যাপ্রভাবে নিখিল ঐশ্বর্য্য আমরা লাভ করিতে পারিব। তাহার সামান্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হইতেছে।

২। স্বদেশীয় জিনিষ ব্যবহার। ইহাতে দেশের শিল্প ও শিল্পীর উন্নতিপূর্ব্বক দেশের ধনলাভ ও দেশের অর্থ দেশেই স্থিতির মহাসূচনা রহিয়াছে।

৩। যৌথকারবার খুলিয়া কাপড়ের কলস্থাপনা। ইহাতেও ধনলাভ ও ঐক্যবললাভ!

৪। কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানার জন্য কতিপয় ধনীর স্বতন্ত্রভাবে মূলধন নিয়োগ। ইহাতেও ফল ধনলাভ ও সদ্দৃষ্টান্ত!

৫। অকুতোভয়তা। এই ব্যাপারে রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষাপ্রজা সকলেরই প্রকাশ্য ভাবে যোগদান দেওয়ায় ও বদ্ধপরিকরতায় যে সাহস ও অকুতোভয়তার পরদা খুলিয়া গিয়াছে তাহা আর একটি মহা নৈতিক লাভ, এবং তাহার ফল বহুবিস্তৃত।

৩। মিত্রের শঙ্কা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বম্বের মারহাট্টা পত্রিকা নিম্নলিখিতরূপ শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"যত কিছু বলা-কওয়ার ছিল, সব ত বলা কওয়া হইল; তার পরেও এই একটি গুরুতর প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়া গেল যে, আমাদের বাঙ্গালী ভায়ারা টাউনহলের মিটিংয়ের চতুর্থ প্রস্তাবের দ্বারা যে ঘোরতর আন্দোলন অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই আন্দোলন কি প্রকারের হইবে? তাঁহারা চতুর্থ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, আইনী পথে আন্দোলনের দ্বারা যতদূর করা সম্ভব, বঙ্গবাসী সাধ্যানুসারে তাহা করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। অর্থাৎ আইনসঙ্গত যতপ্রকার আন্দোলন হইতে পারে বাঙ্গালীজাতি সে সমুদায়ের আশ্রয় লইতে এবং তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞাটা আমাদের মনে কেমন একটু উদ্বেগ জন্মাইতেছে। কারণ, এই অঙ্গীকারে বাঙ্গালীজাতি বিষম পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তাঁহারা বাঙ্গালীজাতির আন্দোলনের প্রগাঢ়তা এমন কি, এই আন্দোলনের ফলাফলের পরিমাপে বঙ্গবিভাগ ব্যাপারের দোষগুণের বিচার করিবেন। একরকমে বলিতে গেলে বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধীয় মতামতটা এখন আড়ালে পড়িয়া গেল, এখন হইতে সমস্ত ভারতবাসীর চক্ষু কেবল বাঙ্গালীজাতির কার্য্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকিবে। দর্শকস্থানীয়েরা এইরূপ বিচার করিবে:—ইহা স্বীকৃত যে, বঙ্গদেশে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদপ্রস্তাবের অপেক্ষা গুরুতর বিপদ কখনও ঘটে নাই; এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এরূপ অবস্থায় আইনী পথের স্বাভাবিক সঙ্কোচের ঊর্দ্ধে তাহাদের সাফল্যের সঙ্কোচ হইতে পারে না। সুতরাং যদি বাঙ্গালীজাতি এবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন তবে যে শুধু আইনী আন্দোলনে ফললাভের আশা অতঃপর ভারতবর্ষের পক্ষে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে তাহাই নহে, পরন্তু সকলেই বলিবে বাঙ্গালীজাতি অবশেষে নিজের অঙ্গীকারে নিজের যে দুঃখ ডাকিয়া আনিল তাহা নির্দ্দয় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত দুঃখ হইতেও গুরুতর।"

৪। শঙ্কা নিবারণ।

আজ "মারহাট্টা" স্বীকার করিতেছেন—"বাঙ্গালীজাতি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আশ্চর্য্য তেজ ও সমবেতশক্তির পরিচয় দিতেছেন।"

জাপানীরা প্রথমেই যখন দুই একটা মহাযুদ্ধে রুসিয়ার অক্ষৌহিণীকে পরাজিত করিলেন, যখন চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল, তখন স্বজাতির আন্তরিক কল্যানদর্শী জাপানী সচিবগণ কিন্তু জাপানীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"এখনও তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয় নাই, গর্ব্বমদে মত্ত হইও না, অপ্রমত্তভাবে কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাও।"

বাঙ্গালীর পরীক্ষাও এখনও শেষ হয় নাই, সবে আরম্ভ হইয়াছে; তবে জগতের চক্ষে এবার তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ উদ্ভাসিত হইতেছে। জগৎ যেন প্রতারিত না হয়, আমরা নিজেরা যেন নিজেকে বঞ্চনা না করি,—এ দৃঢ়তা, এ কার্য্যকারিতা, এ কুতোভয়তা যেন আমরা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি।

তাই বলি মন জেগে থাক্
পাছে আছেরে শ্বেত চোর!
কালী নামের অসি ধর্, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি ব্রিটনে তোরে কর্‌তে পারে জোর॥

শ্রীসরলা দেবী।

———

খেয়াল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালী জ্যাঠা হইয়া গিয়াছে। জ্যাঠা বাঙ্গা সোজা চক্ষে কাহারও প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। সরলভাবে, উদারভাবে কোন একটা জিনিষের সমালোচনা করিতে পারিবে না। তাহার কারণ হইতেছে, জ্যাঠা হইলে বুড়া হয়, বুড়া হইলেই দূরদৃষ্টি (Long-sight) হয়, কাছের সামগ্রীটা তাহারা চক্ষে দেখিবে না—এইটে আমাদিগের দাদার কথা।

দাদা আসিয়া বলিলেন—ভাই! তোমাদের আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। জ্যাঠা উত্তর দিল—কোঁকর কোঁ,—আমাদিগের মৌলভি-দাদা আসিয়াছেন। জ্যাঠা একটা গাহিয়া উঠিল,—"নাথ! তোমার যে ভালবাসা, মৌলভি দাদার—পোষা।"

দাদা বলিলেন—মিথ্যার জন্য প্রাচ্যজাতি চিরপ্রসিদ্ধ। জ্যাঠার চক্ষু প্রাচ্য ছাড়িয়া পাশ্চাত্যে চলিয়া গেল—কেন না নিকটেত দেখিতে পাইবে না—দেখিল, পাশ্চাত্য-নীতিরূপ তক্রসমুদ্রে সত্য-মৎস্ত খাবি খাইয়া বেড়াইতেছে, আর লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ড হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টরের চূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে বসিয়া সত্যবানগণ সেই মৎস্তটীকে ধরিয়া তাহার মস্তক উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দাদা বলিলেন,—তোমাদের কলিকাতার উন্নতি না করিয়া আমার প্রাণ স্থির হইতেছে না। কলিকাতাকে প্রাচ্য-জগতের রাণী যদি করিতে পারি তবেই আমার জীবন স্বার্থক! জ্যাঠা মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িল। ভ্রাতুষ্পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যেষ্ঠতাত! বসিয়া পড়িলে কেন?

জ্যাঠা—পাতকোর উন্নতি কি প্রকারে হয় আগে আমাকে বুঝাইয়া দাও।

দাদা—যতই খুঁড়িতে থাকিবে ততই পাতকোর উন্নতি হইবে।

জ্যাঠা—আমি কলিকাতার উত্তরাংশের একটী সুনির্ম্মিত পথের সেইরূপ উন্নতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।

দাদা—বুঝিয়াছি, ওঠ।

জ্যাঠা—আমার কটীদেশ পর্য্যন্ত ধরণীগর্ভে, তুমি এক গাছি তৃণ-জাতীয় মানদণ্ড লইয়া আইস।

দাদা বলিলেন—জ্যেষ্ঠতাত! তোমাদের ভাষাটা বড় বেশি মিষ্ট। জ্যেষ্ঠতাত বুঝিলেন, ইহাতে কটুতিক্তকষায়রস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে; দূরদর্শনে দেখিলেন, সাধের বাঙ্গলা ম্যাকমিলন, লংম্যান্, ব্ল্যাকি প্রভৃতি ইংরাজী-ছাঁকুনির সাহায্যে ছাঁকিয়া মিছরির দানাগুলি জলীয় ভাগ হইতে পৃথক করা হইতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল কথা, জ্যাঠা ভ্রাতুষ্পুত্রের ভালবাসাআলিঙ্গনটী একদিনও সুবিধার চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। নিরুপায়ে দাদার ভালবাসা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভালবাসাভ্রমরতাড়িত দাদা সাগর-তীর হইতে হিমালয়ের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বলচিত্তে বলিতেছেন—আহা জ্যেষ্ঠতাত! আমার ঠাকরুণদিদির কি সুকোমল সুশ্যামল অঙ্গ! জ্যাঠা হরিস্মরণ করিতে করিতে চক্ষু কপালে তুলিলেন আর গাহিলেন,—

নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে
কালী হলি মা রাসবিহারী।
নিজ তনু আধা গুনবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী এবে পীত ধটী
এলোচুল চূড়া বংশীধারী।
আগে সমর তরঙ্গে নেচেছিলি শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি॥

জ্যাঠা।

বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী-বিষ্ণু সংবাদ।

মাথার উপর বঙ্গ-সাগররূপ টানাপাখার তরঙ্গ দুলিতেছে, শয্যা অতি সুশীতল অনন্তদেহ, লক্ষ্মী তাঁহার সুকোমল পদ্ম-হস্তখানি গায়ে বুলাইতেছেন; কাজেই বিষ্ণু মহাসুখে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সহসা চঞ্চলার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতি প্রস্তাবনা।

লক্ষ্মী—(বিষ্ণুর গায়ে ধাক্কা দিয়া) ওগো, ওঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর—(বিষ্ণুর গম্ভীর নাসিকা গর্জ্জন)। ওঠ ঠাকুর, স্তোত্র পাঠ কচ্চি ওঠ। মধুমুরনরকবিনাশন—নাঃ, হুঁস্‌হঁ নেই! রমানাথ! লক্ষ্মী-পতি! একি বেজায় ঘুম! একটু পায়ে সুস্‌সুড়িদিয়ে দেখি—ও ঠাকুর ওঠ সুধাপান কর।

বিষ্ণু—আঃ, বড্ড জ্বালচ্ছে; দুশ বছরও পুরো নয়, এরি মধ্যে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে! দাও, চোখবুঁজেই একটুখানি সুধা খেয়েনি। (তথাকরণ)

লক্ষ্মী—দুশ বছর ছেড়ে তুমি দু-হাজার বছর ধরে ঘুমোও; কিন্তু ঠাকুর বড় বিপদ, একবার ওঠ।

বিষ্ণু—মেয়ে মানুষের ওই দোষ; কেবল ভূমিকা। চট্‌করে বলে ফেল না, কি হয়েছে।

লক্ষ্মী—একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ—

বিষ্ণু—বলি, আগেত কানপেতে শুনি।

লক্ষ্মী—শুন্‌লে হবে না—দেখ্‌তে হবে!

বিষ্ণু—ঘুম ভাঙাবার ফিকির দেখ! আমি তাকিয়ে তোমার রূপ দেখ্‌লেই হয়েছে আর কি! লক্ষ্মীটি, বলে ফেল, শুন্‌ছি।

(সহসা দূরে চড়্‌ চড়্‌ শব্দ)

লক্ষ্মী—ওই ঠাকুর—গেল গেল সব গেল! বাঙ্‌লা দেশটা ফেটে দুখানা হয়ে গেল!

বিষ্ণু—আঃ, বেজায় বদ্‌খৎ আওয়াজ। সরস্বতীকে একটুখানি বীণা বাজাতে বলত!

লক্ষ্মী—হায় ঠাকুর, সে কি আর আছে! একবারত ঘর সংসারের খবর নেবে না, কেবলই ঘুমুবে।

বিষ্ণু—সেকি, সরস্বতী নেই কি রকম?

লক্ষ্মী—একটা দৈত্যি তাকে টপ্‌ করে গিলে ফেলেছে—

বিষ্ণু—দৈত্য, দৈত্য! তাইত। নামটা কি?

লক্ষ্মী—উনিবরষটি-একৃট!

বিষ্ণু—নামটা বেজায় কট্‌কটে! নারদকে খবর দেওত, পুরাণ খুলে দেখুক, এ আবার কোন্ অসুর!

লক্ষ্মী—একি তোমার প্রত্নতত্ত্বের সময় হল? একবার ওঠ ঠাকুর,—মধুমুরনরকবিনাশন,—

বিষ্ণু—এ নূতন দৈত্যটার নামে কিন্তু এমন মিঠে কবিতা রচনা হয় না; শব্দটার ট বর্গ আর—

লক্ষ্মী—এবার ধল্লে অলঙ্কার শাস্ত্র! হা কপাল!

বিষ্ণু—অলঙ্কারের মায়া কাটিয়েছ নাকি? তাই বাঙলা দেশের উপর এতটা মমতা বটে? তারা তোমার পূজা বন্ধ করে দিলে, অর্দ্ধনগ্না বর্ব্বর রমণী বলে অপমান কল্লে; তার উপর আবার সেই গাউন-পরা মেঞ্চেষ্টার-নন্দিনাকে তোমার আসনে বসিয়ে দিলে এখন সেই দেশের উপর এত মমতা!

লক্ষ্মী—তাইত বল্‌ছিলাম ঠাকুর, একবার তাকিয়ে দেখ; কি ছিল, কি হয়েছে! গয়াসুর মাথা তুল্লেও এমন হয় না! (একটু ক্রন্দন) হাজার হোক্‌ ওরা আমারি পেটের ছেলে। একদিন অপমান করে ছিল বটে, আবার আমার পায়ে ফুলচন্দন দিচ্চে।

বিষ্ণু—সেই সুসভ্য পোষাকপরা বিলাতী-সুন্দরীকে তাড়িয়ে?

লক্ষ্মী—তবে আর বল্‌ছি কি ঠাকুর।

বিষ্ণু—একেই বলে মেয়েমানুষ। এই অভিমান, এই অনুরাগ! সাধে তোমাকে লোকে চঞ্চলা বলে? ফের দেখ্‌বে দু মাস না যেতে যেতেই বাঙ্গালীরা ও মাগীর কুহকে পড়্‌বে। রাক্ষসী কত মায়া জানে। কখনো ধমকাবে—কখনো আদর কর্‌বে। তারপর তোমার ওই জলা দেশের ছেলেগুলো! ওদের যত মিষ্টি কথা সব কবিতায়। মাতৃভক্তি ওদের বক্তৃতার সামগ্রী।

(নেপথ্যে—"বন্দে মাতরং")

লক্ষ্মী—মন যে বড় চঞ্চল হচ্চে, আমি যাই!

বিষ্ণু—যেওনা। স্বরস্বতীকে গিলে খেয়েছে; তোমাকে জেলে দেবে। শুনতে পাচ্চনা, যে ঐ 'বন্দে মাতরং' বড় চড়াসুরে ধরেছে অল্পেই গলা ভেঙে আস্‌বে; তখন আবার পুণর্মুষিক হয়ে পড়বে। আমি চোখ্‌বুজে আছি বলে আওয়াজটা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি। আমার কথা শোনো—৫।৬ মাস পরীক্ষা করে দেখ, যে সত্যিসত্যিই ওরা মলিনবসনা মারপ্রতি ভক্তিমান্‌ হয়েছে কি না।

লক্ষ্মী—যে আজ্ঞে ঠাকুর। (বিষ্ণুর পদসেবায় প্রবৃত্তা)

[বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও নিদ্রা]

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

আমি একদিন আফিঙের মাত্রা চড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম, কাজেই নেশাটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল। ইহা সায়ংকালের কথা। প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলাম, তখনো অনেক কথা মস্তকে ঘুরপাক খাইতেছিল। আমি দেখিতে লাগিলাম, যক্ষ ও যুধিষ্ঠির বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে যেন কেমন-কেমন দেখিতেছিলাম। মস্তকমধ্যে দীর্ঘ আলবাল, তাহার সম্মুখে ললাটোপরি জলাবতারণিকা; অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি, গায়ে শার্ট, পরনে কোঁচান কালাপেড়ে ধুতি, হাতে অতি সূক্ষ্ম ছড়ি, এবং মুখে একটা ধূমোদ্গারী বর্ত্তিকা। আমি প্রথমে আমার চক্ষুকে প্রত্যয় করিতে পারি নাই; পরে কিঞ্চিৎ গবেষণা খাটাইয়া, পেত্নীতত্ত্বের শরণ লইয়া স্থির করিলাম, যুধিষ্ঠির কলির প্রারম্ভের জীব, ইঙ্গবঙ্গের সাজ পরিবেন বিচিত্র কি?

শুনিলাম, যক্ষ বলিলেন, "আমি দুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, আমি যথাজ্ঞান উত্তর দিব; কিন্তু ত্বরা ও সংক্ষেপ করিবেন, আমায় 'ইভনিংওয়াক্' করিতে যাইতে হইবে।"

যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

যক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন? কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন? এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?"

যুধিষ্ঠিরকে বেশ রসিক দেখিলাম। তিনি বলিলেন, বিজ্ঞান আদিত্যকে উন্নমিত করেন; কারণ পূর্ব্বে ধারণা ছিল, তিনি আফিসের কেরাণীর মত পৃথিবীর আফিসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া

মরেন, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানসাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, আদিত্য কেরাণী নহে, আফিসের বড়সাহেব, তিনিই সকলকে আপনার চতুর্দ্দিকে ঘুরপাক খাওয়াইতেছেন। গ্রহগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবীর গতি ও ছায়া তাঁহাকে অস্তমিত করেন। এবং তিনি মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

যক্ষ কহিলেন, “পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? এবং কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “স্ত্রী পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর এবং শ্যালক আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর; বিদ্যুৎতরঙ্গ বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী; ভারতের শত্রু তৃণ অপেক্ষাও বহুতর।”

যক্ষ কহিলেন, “গৃহবাসীর মিত্র কে? প্রবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “গৃহবাসীর মিত্র স্ত্রী। প্রবাসীর মিত্র ডাকহরকরা। আতুরের মিত্র চিকিৎসক। এবং মুমূর্ষুর মিত্র যম।”

যক্ষ কহিলেন, “কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ইংরাজের হৃদয় নাই, তাহারা মৃতকল্প ভারতের হৃৎপিণ্ড সজোরে বুটের তলে পেষণ করিতেছে; ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ঋণ বেগে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দরিদ্রের দুহিতৃসংখ্যা এবং পুত্রবান্ পিতার বরপণ আদায়ের আকাঙ্ক্ষা বেগে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।”

যক্ষ কহিলেন, “ধর্ম্মের চরম স্থান কি? যশের চরম স্থান কি? স্বর্গের ও সুখের আশ্রয় কি?”

যুধিষ্ঠির বলিলেন, “ধর্ম্মের চরমস্থান গৃহিণীর সন্তোষ; যশের চরম স্থান পেট্রিয়ট বলিয়া পরিচিত হওয়া; স্বর্গ ও সুখের একমাত্র আশ্রয় স্বদেশ ও স্বদেশীর হিতে প্রাণপাত করা।”

যক্ষ কহিলেন, “উপজীবিকা এবং প্রধান আশ্রয় কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দাস্য ও ভিক্ষা ভারতবাসীর প্রধান উপজীবিকা। বিদেশী রাজাই তাহাদের প্রধান আশ্রয় স্থল।”

যক্ষ কহিলেন, “ধন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ধন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজ; ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা; লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজের বুট-লাঞ্ছিত [illegible]ল্লব; সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ।”

যক্ষ কহিলেন, “ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান; এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজসেবা; ঐ ধর্ম্মই সর্ব্বদা ফলবান্; এবং দুর্ব্বলের সঙ্গে সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না, যথা—ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত ইংরাজ রাজার সন্ধি।”

যক্ষ কহিলেন, “ব্রাহ্মণ, নট, নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা, ইঁহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হিন্দুমতে বিলাতযাত্রা অনুমোদন জন্য ব্রাহ্মণকে; স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য নট ও নর্ত্তককে; আপনার প্রশংসা প্রচারের জন্য ভৃত্যকে এবং অক্ষরমালা সংগ্রহের জন্য রাজাকে দান করা আবশ্যক।”

যক্ষ কহিলেন, “লোক কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে? এবং কি জন্যইবা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পরিচ্ছদে লোক আবৃত ও অন্ধকারে অপ্রকাশিত থাকে। এবং এপর্য্যন্ত কোন কলম্বস স্বর্গ বলিয়া কোন রাজ্য আবিষ্কার করে নাই ও কোন রাবণ তাহার সিঁড়ি তৈয়ার করে নাই বলিয়া লোকে স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়।”

যক্ষ কহিলেন, "জল কি ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "একভাগ অম্লজান ও দুইভাগ উদজানের যে রাসায়নিক সম্মিলন তাই জল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে H_2O."

যক্ষ কহিলেন, "দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "নিরীহ, শান্ত, নিরস্ত্র প্রজাকে বিদ্রোহী প্রতিপন্ন করা, সাহেবের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াও তাহাকে কিছু না বলা এবং ম[illegible]ক শালীনতাহীন বাহিরের ঘোমটা-টানাই দম্, ক্ষমা ও লজ্জার প্রকৃত লক্ষণ।"

যক্ষ কহিলেন, "দান ও জ্ঞানের লক্ষণ কি ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "একগুণ দিয়া সংবাদপত্রে চারিগুণ কীর্ত্তন দানের লক্ষণ এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতের পুঁথি বেমালুম সমালুম নকল করিয়া মাসিকে প্রবন্ধ প্রকাশই জ্ঞানের উত্তম লক্ষণ।"

যক্ষ কহিলেন, "কোন্ শত্রু দুর্জ্জয় ; কোন্ ব্যাধি অনন্ত ; কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রেম দুর্জ্জয় শত্রু ; স্ত্রীলোকের মানব্যাধি ও ভারতের দুর্ভিক্ষব্যাধি অনন্ত। যে আমার প্রশংসা করে সেই সাধু এবং যে আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করে সেই অসাধু।"

যক্ষ কহিলেন, "পণ্ডিত কে ? মূর্খ কে ? নাস্তিক কে ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ইংরাজ পণ্ডিত। ভারতবাসী মূর্খ—ত্রিশকোটি লোক সহস্রবৎসর পরপদলেহী। তাহারাই নাস্তিক, নিশ্চেষ্ট জনের ইহকালও নাই পরকালও নাই ; আরো তাহারা যিশু ভজে না।"

যক্ষ কহিলেন, "হে মতিমন্, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়, শীঘ্র বল।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে ব্যক্তি ধনী হইয়াও স্বদেশহিতে বদ্ধমুষ্টি, কিন্তু রাজা চাঁদার খাতা খুলিলেই সর্ব্বস্ব পণ করেন, তিনিই অক্ষয়নরকে গমন করিয়া থাকেন।"

যক্ষ কহিলেন, "প্রিয়বচন কহিলে কি লাভ হয় ? বিবেচনাপূর্ব্বক

কার্য্য করিলে কি লাভ হয় ? বহু মিত্র হইলে কি লাভ হয় ? এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হয় ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রিয় কথা কহিলে ঘৃণার্হ হইতে হয়, লোকে তোষামোদা মনে করে। বিবেচনা করিতে করিতে কার্য্যের সুযোগ ফস্কাইয়া যায়। বহুমিত্র ব্যক্তির অর্থনাশ হয়। এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি 'ভণ্ড' নামে পরিচিত হয়।"

যক্ষ কহিলেন, "সুখী কে ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এব[illegible]ই বা কি ? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেই তোমার হত[illegible] ওয়াকে বাধা দিব না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বধূদ্বিতীয় ব্যক্তিই সুখী। ক্ষুদ্র জাতি বৃহত্তর জাতির নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, চক্ষের তাড়নায় হৃৎকম্প ও বেপথু জন্মাইয়া দেয়, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে। রেলপথই সুন্দর পথ ; এবং দুর্ভিক্ষ ও প্লীহাবিদারই ভারতবাসীর প্রাত্যহিক বার্ত্তা, বৈজ্ঞানিকের নিকট আকাশতরঙ্গই বার্ত্তা।"

যক্ষ কহিলেন, "হে বুদ্ধিমন্, তুমি আমার সমুদয় প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কে ? এবং সকলের মধ্যে ধনী কে ইহা নিরূপণ কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "জাপানই পুরুষ এবং মার্কিণের রকাফেলা[র] সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।"

আমার সমস্ত শুনিয়া বড় অসহ্য হইল ; আমি "দূর—" বলি[য়া] যুধিষ্ঠিরের কাণ ধরিলাম। কঠিন পদার্থে হস্তস্পর্শ হওয়ায় আমা[র] চমক ভাঙ্গিল ; চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি, আমি আমার নপ্তৃপ্রবরে[র] কর্ণ ধারণ করিয়া আছি এবং সে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, "ঠাকুর[দা] ছেড়ে দেও ; তোমার সমস্ত [illegible]ত্তর দিয়াছি ; সন্ধ্যা হই[ল] বেড়াইতে যাই।" আমি যুধিষ্ঠিরের বদলে আমার নব্য নাতিকে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম। নাতি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

[illegible]

উদ্ভট।

টেকো বীর।

দীপ্ত শির টে[illegible] [illegible]র রৌদ্রের জ্বালায়
বেলতলা গিয়ে [illegible] শীতল ছায়ায়,
হঠাৎ ভাঙ্গিয়া বেল পড়ে নেড়া মাথে,
অভাগা যেথায় যায় বিপৎ সাথে সাথে।

খল্লীটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈ: সন্তাপিতে মস্তকে
বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাৎ বিল্বস্য মূলং গতঃ
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিত স্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ।

বিষ্ণুর ঘরকন্না।

ভার্য্যা এক স্বভাবতঃ বড়ই মুখরা, (সরস্বতী)
অপর চপলা বালা নাহি দেন ধরা, (লক্ষ্মী)
বিশ্বজয়ী পুত্র এক দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, গরুড় বাহন,
এসব ঘরের দুঃখে বিদারিত হিয়া,
কাষ্ঠ হয়েছেন হরি ভাবিয়া ভাবিয়া।

একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোহপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনঃ পন্নগারিঃ
[illegible] সগরচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।

প্রিয়বচন কহিলে কি লাভ হয়?

জামাতা।

সদা বক্র অসন্তুষ্ট, যত সাধো তত রুষ্ট,
তোষামদে কভু তিনি নাহি হন রাজী!
নিত্য কন্যারাশিস্থিত, চিত্ত অব্যবস্থিত,
দশম গ্রহটী যেন জামাতা বাবাজী।

সদা বক্রঃ সদা রুষ্টঃ সদা পূজামপেক্ষতে
কন্যারাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমোগ্রহঃ।

লোভী।

চেয়ে থাকে অর্থপানে, লোভী সে বিপদে চক্ষু মুদে,
ভাবেনা লগুড়াঘাত, বেড়ালের লক্ষ্য শুধু দুধে।

লোভাবিষ্ট নরোবিত্তং বীক্ষতে নৈবচাপদং
দুগ্ধং পশ্যতি মার্জ্জারো যথা ন লগুড়াহতিং।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক কথা।

চন্দ্রের পরিবর্ত্তন।

সাধারণ বিশ্বাস যে চন্দ্রের উপরিভাগ বহুকাল একই অবস্থায় আছে, আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনা তবুও চন্দ্রবিদ্গণ ইহার বিরুদ্ধ মতেরই পক্ষপাতী। অধ্যাপক পিকারিং বলেন সূর্য্য-রশ্মির নিয়ত চঞ্চল পরিবর্ত্তনে আলোছায়ার আন্দোলনবশতঃ সুস্পষ্টরূপে কিছু দেখা যদিও বড় কঠিন তবু ইহা নিশ্চয় যে আগ্নেয় উপদ্রব পৃথিবী অপেক্ষা এখনও চন্দ্রলোকে অধিক বর্ত্তমান। অধ্যাপক টার্ণার বলেন চন্দ্রলোকে এখনও যে নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে উহা মঙ্গলগ্রহের পয়ঃপ্রণালীসমূহের অপেক্ষা নিশ্চিত এবং প্রমাণ নিরপেক্ষ। গত জুলাই মাস হইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, অধ্যাপক পিকারিং এই সময়ে চন্দ্রগোলকে একটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন; এই পরিবর্ত্তন ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও সহজে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা প্লেটো নামে অভিহিত হইয়াছে। প্লেটো, জ্যোতির্ব্বিদগণের সান্নিবেশ আলোচনা ও লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রয়বিংশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ষ্টানলি উইলিয়মস এ গোলকের পূর্ব্বভাগে, কেন্দ্রস্থলের ঈষৎ উত্তরে এক প্রশস্ত উজ্জল আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন দক্ষিণভাগে ক্ষীণতর আলোকমালা এবং সমস্ত গোলকটি দুগ্ধবৎ আলোকোচ্ছ্বাসে প্লাবিত দেখা গিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বরুণগ্রহের দক্ষিণে একটি পর্ব্বতের গহ্বর পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সহসা তাহা শুভ্র বাষ্পরাশির মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতে দেখিয়াছিলেন। সারবনো আর একটি আগ্নেয় পর্ব্বত লক্ষ্য কালে তাহাকে কিছুক্ষণ সুস্পষ্ট দেখেন, আবার কিছুক্ষণ পরে শুভ্র বাষ্পরাশির মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়া যায় তাহার পর আবার অনিয়মিত ভাবে বারম্বার আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। অনেক কারণ বর্ত্তমান আছে যাহাতে মনে হয় পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রলোকে দ্রুততর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পক্ষকালব্যাপী চান্দ্র-জগতে দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হয় আবার চান্দ্রদিবসে ৩০০ ডিগ্রী

পর্য্যন্ত অতি প্রখর তাপের প্রকোপে শুভ্র অগ্নিপূর্ণ সঙ্গীহীন চন্দ্রগ্রহের এক ... ভিন্ন, ল্যাঙ্গলী প্রমান করিয়াছেন যে, ... ০ ডিগ্রীর নীচে থাকে। প্রকৃত বলে ... নিশ্চিত পারি যে চন্দ্রলোকে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন না ... ; তবে জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা আবিষ্কার করিতে এত ... শ্রম করিয়া

উচিত কথা।

আমেরিকান রিভিউ অব্ রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আর, এন জনষ্টন ব্রিটিশ কনসল লিখিত মরক্কো এবং ফ্রান্সের অধিকার (অবস্থিত) সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানকার সকল রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলমান পুরোহিতদিগের হস্তে তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে একজন এই ভাবে আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন —হে খৃষ্টান বল তোমরা আমাদের নিকট কি চাও? আমরা কি তোমাদের টাকা ধারি? আমরা কি তোমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছি? আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য আমরা কি তোমাদের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিলাম? আমরা কি বারম্বার সে কার্য্যে বাধা দি'নাই? তোমরা বলিতেছ আমাদের দেশে শান্তি নাই, আমাদের দেশে সুশাসনের অভাব, আমাদের রাজা দুর্ব্বল—তাহাই যদি হয় তাহাতে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? সে ভাবনাতো আমাদেরই অধিক। যে বাষ্পীয় পোতগুলি তোমাদের এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহারাও অনায়াসে আবার তোমাদের স্বদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইতে পারে। তোমরা আমাদের এমন কি উপকার করিয়াছ যাহার জন্য তোমাদের ভাল না বাসিলে আমাদের ঘুম হইবে না? আমরা কখনো জল ভিন্ন অন্য পানীয় ব্যবহার করিতে জানিতাম না সেই আমাদের অনেককে তোমরা মদ খাইতে শিখাইয়াছ—লুকাইয়া শতকরা শত টাকা লাভে আমাদের বিদ্রোহীদিগের মধ্যে বন্দুক বিক্রয় করিয়া যে অশান্তির কথা লইয়া এতখানি করিতেছ তাহা তোমরাই সৃষ্টি করিয়াছ। প্রথমে আমাদের সম্রাটকে প্রলোভনে

...াছ—এখন কিনা বলিতেছ রাজ্যশাসনে
...হুক? হে হিতৈষীগণ আমরা তোমাদে
...তেছি ... পুস্তকে আমা আমাদের প্রতি ...
...ধর্ম্মির ... মরা কখনো য়িহুদী কিম্বা খৃষ্টানদিগে
...—হে ... গণ তোমরা কখনো বিধর্ম্মীদিগের আশ্র
...রা বিদ্রোহ ...নে আমাদের সম্রাটকে সহায়ত
...মরা মনে করিয়াছ তোমাদের হাত দিয়া আম
...ধর্ম্মভ্রাতাদিগকে বধ করাইব? কখনই নহে! আমরা
...ত্বর এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম এখন কি করি
তবে তাহাই হোক! আমরাও আমাদের দেশে আমাদের আত্মী
সাধু-মাহাত্মা এবং আমাদের জীবন্ত ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে ...
ও আমাদের এই প্রভেদ, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তোম...

কুসুমকামিনী পুস্তকালয়।
১২ ই ... ...
১৩০১ সালে স্থাপিত
পুস্তক নং
শ্রীনলিনীরঞ্জন ...

ভারতী
২৯ শ বর্ষ
কার্ত্তিক - চৈত্র
১৩১২
ব. সা. প. গ্র.

১৩১২ সালের

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

উত্তরার্দ্ধ

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
অনন্ত জীবন	শ্রীশশধর রায় এম,এ,	৬৪১, ১০৪৬, ১১৫২
..গ্নিহোত্রীর প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত	৯৯১
..চারীর প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	১০৮৭
..এয় (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি,এ	৬৩৫
..মাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার	শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল শ্রীরোহিনী কুমার সেন গুপ্ত শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য	৬৪৬, ৮৫০, ৯৩৯
..ধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর	৮৭৩
ঋণ শে.. বাধন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮০১
কণিক..ন-বদল (প্রহসন)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯৯২, ১০৮৯
গোরা..রের কথা	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৬৬৭, ৭৯১, ৮৬৬, ৯৮৩
..ান জাহাজের যাত্রী	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৬৭৭
..ীবন-সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০৫২
..কার কাটরা	শ্রীআজিজর রহমান্	৯৮৯
..ল, লুন, লকড়ি	শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী এম, এ	৯০৫, ১০৭১
..তাম্রলিপ্তী	... ...	১০৫৪, ১১২৯

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
দশভুজা (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন	[illegible]
দিদি-হারা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী	৭
দোললীলা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	১১৫
নৌচালন বিদ্যা	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৮৩
নরবলি	শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী	৯৬
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ	৭৫৪, ১১১২
পাণিনি-তত্ত্ব	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ	৯২৬
প্রত্যাগমন (কবিতা)	শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন	৬৫২
প্রতারিত (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০২৫
ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ	৭৪০, ১০৩৩
বত্রিশ সিংহাসন	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬২৫
বুশিদো	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৩৬
বর্ণচিত্র	শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী	৬৫৪
বঙ্গ নারীর রাখী বন্ধন (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী	৬৬৫
বন্দনা (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৭০৫
বঙ্গ ভাষার উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম	শ্রীপরেশনাথ সেন	৭২৯
ভিক্ষা (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯৯
ভয় নাই (কবিতা)	... ...	৯৮
মহানাটক	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬০৪, ৭০৭, ৮২২, ৮৯৭, ১০২০, ১১২৪

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
…তৃ পূজা (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৭৩৯
…গালিনী চরিত্র	শ্রীপ্রমথনাথ সেন	৭৬৪
…াতৃ পূজা	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	৯৭৩
…াখী বন্ধন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৬
রমণীর স্বদেশ-ব্রত	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	…১৪
রাসদাস ও তাঁহার পত্নী	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮৭৮
সমসাময়িক ভারত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৭০, ৮০৩, ৯৫৬, ১০১৩, ১১৪৩
স্বদেশের প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৮৪৭
সুপ্রভাত (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৮৯৩
সম্মোহন-বিদ্যা	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৯৪৬, ১০৮২, ১১৫৫
সাময়িক কথা	... ...	১১৭৬

খেয়াল খাতা।

ঋণ শোধ (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮৬
কণিকা	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮৩, ১১৭৩
গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮২
ঘুঘু	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১১৬৫
চুট্‌কী	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০১, ৮৮৭, ১১৬৭
…লনা	শ্রীব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ সেন	৬৮২
…ান (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮৬

(৪)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
নাম	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৮৮
বসন্তের উদয় (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১১৬
বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব	শ্রীজোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৬
বিবিধ কবিতা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৩, ৮৯০, ১১৭
বৈয়াকরণ-বৈঠক	শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক	৬৬

আকাশ হইল এবে   ছিদ্রময় কটাহের প্রায়,
তাহা হতে জলকণা   পড়ে ঝরি অজস্র ধারায়॥
মন্দ মন্দ বহে বায়ু,   মেঘদল করে গরজন,
চমকে বিজুলি-লতা,   ময়ূরেরা করয়ে কূজন ;
—এইরূপ দৃশ্য মাঝে   অবস্থিত রঘুর নন্দন,
মূর্চ্ছাই হইল তাঁর   এ সময়ে একাবলম্বনী।

রাম।— হরধনু-ভঙ্গ-রুষ্ট   পরশুরামেরে পূর্ব্বে
মোর সাথে, রণমাঝে করিয়া দর্শন,
শঙ্কা-শশাঙ্ক-ম্লান   হয় যাঁর মুখ-পদ্ম
—সে সীতারে হয় মোর সতত স্মরণ॥
সুস্নিগ্ধ শ্যামল-কান্তি   নভোমাঝে সঞ্চরয়ে
বলাকার শ্রেণী ;
বহিয়া সলিল-কণা   বহে বায়ু, খ্যালে শিখী
করি' কেকাধ্বনি ;
কঠোর-হৃদয় অতি   আমি রাম—সব করি সহ্য ;
সীতার কি হবে আহা !   দেবি ওগো ! থাকো ধরি' ধৈর্য্য।
নীলোৎপল মনে করি'   তব নেত্রোপরে,
বন্ধুক-কুসুম ভাবি'   ও তব অধরে,
পদ্ম ভাবি' পাণিতলে,   মধুক-কুসুম ভাবি'
ও তব কপোলে,
আত্মীয় স্বজন ভাবি'   ঘন নীল ওই তব
কবরী-কুন্তলে,
উড়িয়া বসিছে আসি   দুর্নিবার মধুকরগণ ;
—আর কোন্ স্থান তব   হে তরুনি করিবে রক্ষণ ?
কর্ত্তব্যে সচিব মোর,   কিঙ্করী করমে,
ধরম-ব্যাপারে পত্নী,   ধরিত্রী ক্ষমায়,
স্নেহেতে জননী-সম,   কামিনী শয়নে,
চিরসখী সহচরী   সঙ্গিনী ক্রীড়ায়,
এ হেন প্রিয়া সে মোর   —কহিনু তোমায়।

এ ভুবন-মাঝে যেই মন্মথ-জীবন-ঔষধি,
রমণীর শিরোমণি, মম কুল-দেব-প্রতিনিধি,
নেত্রোৎসব নারীদের, মত্তগজ-গতি যেই,
চারু চন্দ্রাননা,
—জানকী প্রিয়া সে মোর কষ্টে কাটাইছে কাল
কোথায় বলনা॥

আর দেখ লক্ষ্মণ !
"এ হেন সূরজ-কুলে জন্মে নাই কোন একজন
যার পত্নী, কামুকেরা কোন-কালে করিল হরণ"
—এইরূপ বলাবলি পরস্পর করে মুনিগণ ;
তাঁহাদের মুখে শুনি' কুলাঙ্গার রামের চরিত
ইন্দ্র-অর্দ্ধাসনস্থিত পিতা মোর হবেন দুঃখিত॥
নৃপাত্মজ রামচন্দ্র— তাঁর পত্নী সীতা
পঞ্চবটী বনে থাকি' হইলেন হৃতা ;
—এই কথা জন মাঝে হইয়াছে চারিদিকে
বহুল প্রচার
—শুনিয়া বলেন রাম :— "কোথা ধনু কোথা ধনু
ধনু সে আমার ?"
পরে রাম, মহাতেজা লক্ষ্মণেরে করি' আহবান
পাঠাইলা সুগ্রীব-সদন ;
লক্ষ্মণ তথায় গিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ-তরে
স্কন্ধাবার করিলা স্থাপন।
শ্রীরাম আছেন বনে ; প্রেরিত হইনু এবে
কপিবর-পুরী মাঝে
আমি এ লক্ষ্মণ।
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে আসি', কহিলা লক্ষ্মণ সেই
কপিবর সুগ্রীবেরে
রামের বচন।

"রাম"—এই শব্দ শুনি' বিস্মিত ও সচকিত
বানর প্রমত্ত
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে —"রাম নামে কোনো কিছু
আছে কি পদার্থ ?"

লক্ষ্মণ।—ওগো কপিপতি :—
বিশ্বামিত্র-হিত-তরে যজ্ঞ-কার্য্য সমাপিতে
যে করিলা তাড়কা নিধন ;
জানকী-লাভের আশে হরধনুর্ভঙ্গ যেই
অনায়াসে করিলা সাধন,
ভর্গবে করিলা জয়, মারীচ রাক্ষসেরে যে
এক বাণে বধিল হেলায়,
বালিরে করিল নাশ, —সেই সে রাঘব সিংহ
আহবান করেন তোমায়॥
শ্রীরাম-চরণের আদেশ তোমাকে আমি জ্ঞাপন করচি, শ্রবণ কর :—
যে বাণে বালিরে আমি করেছি নিহত
এখনো সে বাণ আছে অটুট অক্ষত।
সুগ্রীব ! এখনো কর প্রতিজ্ঞা পালন,
কোরো না বালীর তুমি পথানুসরণ॥

সুগ্রীব।—(আসিয়া) দেখুন নরেশ্বর !
এই যে মোদের চির-বানর-স্বভাব অবনীতে,
—আমি তো ছাড়িতে চাই—মোরে সে যে না চাহে ছাড়িতে॥
দগধ বিদগ্ধ হোক কাঞ্চন তবু না ছাড়ে
কান্তমূর্ত্তি তার।
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোক স্বাদুতা তবু না ছাড়ে
ইক্ষু আপনার।
ঘৃষ্ট হোক বারম্বার চন্দন না ছাড়ে নিজ
চারুগন্ধ তবু ;
প্রাণান্তেও সজ্জনের প্রকৃতি, বিকৃত ভাব
নাহি ধরে কভু॥

(শ্রীরাম সুগ্রীবকে দেখিয়া)

ভরতে দিলেন রাজ্য   পূজ্যপাদ পিতা,
দশানন সম্প্রতি   হরি লয় সীতা ;
—এইরূপ চিন্তা করি'   ব্যাকুল-পরাণ
কাঁদিতে লাগিল রাম   ত্যজি' ধনুর্ব্বাণ।

সুগ্রীব।— প্রথ্বী-আদি সবে-মাত্র   চৌদ্দ ভুবন,
একমাত্র নভস্তল   —নাহি অন্যতন ;
এই অল্প-পরিমাণ   ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
কোথায় লুকাবে সীতা ?   —বল' দেখি মোরে।
অবশ্য পাইব মোরা তাঁহার সন্ধান !
কেন তবে রঘুপতি ত্যজ ধনুর্ব্বাণ ?

রাম।— মহৎ বিপদ আসি' হলো উপস্থিত,
কোন-মতে স্থির থাকা নহেক উচিত !
শঙ্কা ত্যজি' লঙ্কাপুরে করিয়া গমন
ফিরিয়া আসিতে পুন কে পারে এখন ?

অঞ্জনা-নন্দন এই কপিকুলোদ্ভব হনুমান
লঙ্কায় প্রেরণ-যোগ্য—দেও আজ্ঞা, কহে জাম্ববান।

(হনুমান রামকে প্রণাম করিয়া)

হনুমান।— বিশাল প্রাকার যার   —শোভে যেথা বহুল তোরণ,
সেই লঙ্কা নগরীকে   করিব কি হেথা আনয়ন ?
অথবা সমস্ত সৈন্য   তথায় লইয়া
লঙ্কাপুরী উর্দ্ধে আমি   ধরিব তুলিয়া ?
কিম্বা উচ্চ পরবত   হেলায় করিয়া উত্তোলন,
তাহা-দিয়া করিব কি   সুদুস্তর সাগর বন্ধন ?
কি করিব বল' দেব,   আমি তব আদেশের বাধ্য,
এ মোর বাহুর কাছে   নাহি প্রভু কিছুই অসাধ্য॥

রাম।— তেজের মহত্ব তব   এই বাক্যে হে মারুতি
হ'ল উদ্‌ঘোষিত ;
বৃথায় করিবে শ্রম,   কেবা জানে আছে কিনা
জানকী জীবিত॥

কূর্ম্ম যার মূল সম,   আলবাল যাহার সাগর,
দিক্‌দশ লতা যার,   পল্লব যাহার জলধর,
নক্ষত্রাদি চন্দ্র সূর্য্য   যাহার প্রসূন ফল-রূপ,
সেই ব্যোম-মহীরুহ   আছে এই করতলে, ভূপ।"
মারুতির এই কথা   শুনিয়া সহসা রঘুপতি,
সীতা অন্বেষিতে আজ্ঞা   দিলা তারে হয়ে হৃষ্ট অতি॥

হনুমান।— কোথায় অযোধ্যাপুরী,   রাম বা কোথায়,
আইলা দণ্ডক-বনে   পিতার আজ্ঞায়,
কোথায় মারীচ নামে   স্বর্ণময় ছদ্মবেশী মৃগ,
জানকী-হরণ কোথা,   রাম মিত্র কোথা বা সুগ্রীব,
জানকীর অন্বেষণে   আমি কিনা হইনু প্রেরিত ;
—যাহা অসম্ভব তাও   —ক্রূর বিধি করে সংঘটিত॥
লঙ্কা নামে আছে পুরী   সুদুস্তর জলধির পারে,
জানকীও অবস্থিতা   সেই লঙ্কা-নগরী-মাঝারে।
শতেক যোজন-হতে   যেই পারে করিতে দর্শন
এ হেন "সম্পাতি" হতে   এ সমস্ত শুনি' বিবরণ,
অতি ক্ষুদ্র এ শরীরে   কেমনে সাগর হব পার
তাই ভাবি' নিজ তনু   করে হনু এমনি বিস্তার
যাহে ব্যাপ্ত হল ব্যোমে   বিপুল কুন্তল জটা তার।
বীর শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ-পদরজ করিয়া স্মরণ,
জাম্ববানে নতশিরে করিয়া বন্দন,
সেনাপতি-পদযুগ আলিঙ্গণ করি',
অশ্রুমুখ সুহৃজ্জনে সান্ত্বনা বিতরি',

"মহেন্দ্র"-শিখর পরে হয়ে অধিষ্ঠান,
উদ্যত লঙ্ঘিতে সিন্ধু বীর হনুমান।

উত্তাল লাঙ্গুল-ধ্বজ উত্তোলিয়া গগন-মণ্ডলে,
গতি-বেগে দুই ভাগ করি' দিয়া জলদ-পটলে,
জঙ্ঘা-সঞ্চালন-ভরে জলনিধি করি' উচ্ছলিত,
(পৃষ্ঠদেশে কত জন্তু সুভীষণ আছে অধিষ্ঠিত)
সিন্দুর-অরুণ-রুচি তনু-হতে তেজচ্ছটা
দূর হতে করিয়া বিস্তার,
উদ্ভাসিত করি' তুলে দীপ্ত-সূর্য্য-বিম্ব-সম
দিক-বারণের চারি ধার ॥
প্রথমে কিরীট-রত্ন, ললাট-তিলক তার পর,
কণ্ঠ-হার-মধ্যমণি অলোকিত হয় অনন্তর।
ক্রমে ভানু একে-একে এই সব করি' সমুজ্জ্বল
শেষে উদ্ভাসিত করে মারুতীর চরণ-কমল ॥
পরে বীর হনুমান, সলিল-স্তম্ভিত-দৃষ্টি
জলচরগণে
আকুল করিয়া তুলি', —দিক মুখরিত করি'
প্রখর গমনে,
সাগর লঙ্ঘিতে সেই খগপতি গরুড়ের-মত
উঠিতে প্রচণ্ডবেগে নভস্তলে হইল উদ্যত ॥
লাঙ্গুলে সুরঙ্গ দেবে করিয়া বেষ্টিত,
মস্তক-কিরীটে শশী করি' কবলিত,
জটাজূটে মেঘজালে করিয়া বিধূর,
দন্তের ছটায় করি' তারা-গর্ব্ব চূর,
ভীম-অট্টহাস-সহ হয়ে পার জলধি-মণ্ডল,
লঙ্ঘন করিল আর লঙ্কেশের প্রতাপ-অনল ॥
একাকী যাবেন নাকি হনুমান রাবণের কাছে
মহা কোলাহল-ধ্বনি ওঠে তাই কপি-সৈন্য-মাঝে ॥

সুরসা-নাগিনী-মুখে প্রবেশিয়া,—তাহা-হতে
হইয়া নির্গত,
সিন্ধু-মাঝে আবির্ভূত মৈনাক-পর্ব্বতে করি'
পূজা বিধিমত ;
নভোমার্গ-রোধকারী নিশাচরী সিংহিকায়
করিয়া নিধন
পবন-নন্দন হনু লঙ্ঘিয়া জলধি, করে
লঙ্কায় গমন ॥
নিশাতে লঙ্কায় গিয়া জানকীরে অন্বেষিয়া
সর্ব্বত্র অতীব যতনে,
গৃহে গৃহে, জলে স্থলে, বিটপে, বৃক্ষের মাঝে,
কুম্ভকর্ণ-রাক্ষস-ভবনে,
ইন্দ্রজিত-গৃহমাঝে, কন্দরে গহ্বরে বনে,
করিয়াও বহুল সন্ধান
কোথাও সে জানকীর না পাইয়া দরশন
চিন্তিত হইল হনুমান।

হনুমান।— রাবণের মাতা, ভ্রাতা পত্নী, মন্ত্রী, সচিবাদি
সুবিখ্যাত যত পুত্র—সবার আলয়,
লঙ্কেশের শ্রীমন্দির, নিভৃত বিহার-ভূমি
অন্বেষণ করিলাম সর্ব্বদেশময় ;
—কুত্রাপি না পাইলাম সীতারে খুঁজিয়া আমি,
মনে মোর তাই এই শঙ্কা উপস্থিত।
বুঝি বা জনক-সুতা রাবণের ভয়ে ভীতা
সাগর-লঙ্ঘন কালে জলে নিপতিত।
সঙ্কুচিয়া নিজতনু, শরৎ-চন্দ্রিকা-ধৌত
মহাদীপ্তি-সমুজ্জ্বল-সৌধ-সুশোভিত
লঙ্কাপুরী নিরখিয়া, পরে অশোকের বনে
জানকীরে নেহারিয়া রাক্ষসী-বেষ্টিত

অশোকের তরু পরে করি আরোহণ
রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে পবন-নন্দন ॥
কোথা কুল অকলঙ্ক আয়তাক্ষী জনক সুতার,
আর কোথা রাক্ষসের সঙ্গজাত অপবাদ তাঁর ॥
তাই বলি, জীবলোকে এসব কেবল
পূরব-জনমকৃত করমের ফল ॥

(রাবণ স্বয়ং আসিয়া সীতার প্রতি)

রাবণ।— হে সুন্দরি চন্দ্রাননে! প্রাণ-সঞ্জীবন মহৌষধি!
বাঁচাও পরাণ মোর প্রাণেশ্বরি, মনমথ-নদি ॥
একমাত্র মুখে রাম সুললিত মুখ তব
করেন চুম্বন;
চুম্বিবে বিচিত্রভাবে তব ওই মুখ, মোর
দশটি আনন।
তাই বলি হে মানিনি ছাড় তব পণ।
পূরাও প্রাণের তৃষা, বাঁচাও জীবন ॥
জনক-নন্দিনি ওগো! কুমন্ত্রি তাপস কোন
নিশ্চয় কুবুদ্ধি এই
দিয়াছে তোমায়;
সুরগণ-মুকুটেতে ঘৃষ্ট যার পাদপদ্ম
সেই আমি দেখ এবে
নমি তব পায়।
তবু ওই মর্ত্ত্য কীটে তব অনুরাগ?
আশ্চর্য্য! বুঝিতে নারি তব মনোভাব ॥
ত্যজ মান এবে সীতা রাজাদর করহ গ্রহণ।
দেখ আসি' স্বর্ণ লঙ্কা', লঙ্কেশের বাঁচাও জীবন ॥
এক-ন্যূন শত পত্নী ত্যজি' মন্দোদরীর সহিত
সমস্ত এ রাজ্য, তব সেবায় করিব নিয়োজিত ॥

পুরাকালে মহেশ্বর করিলা যাহার মুণ্ড
মাথায় ধারণ।
সেই সব মুণ্ড দেখ তব পদে হে সুন্দরি
হইল স্থাপন।
অবজ্ঞা আমারে তুমি কর কি কারণ?

সীতা।— যার কারা-গৃহে মূঢ় বহুদিন করিলি যাপন
—সেই কার্ত্তবীর্য্য বীরে যে করিল সংগ্রামে নিধন,
শম্ভূহতে যার শিক্ষা সর্ব্বমন্ত্র বেদ বিদ্যাত্রয়ী,
—আমার জীবন-নাথ সে পরশুরামের বিজয়ী ॥
পড়িয়া সে দশানন জানকী-চরণতলে
করে ধরি' পাদপদ্ম এই কথা তাঁরে বলে ॥
বাসব্‌ও যাঁহার পদে হয়েছে লুণ্ঠিত
সেই আমি তব পদে হয়েছি পতিত ॥
তবু আমাপ্রতি তুষ্টি না হল তোমার,
তোমারে তুষিতে বল' কি করিব আর?
শুনি' রাবণের বাক্য নম্রাননা সীতা কহে
তৎক্ষণাৎ হয়ে অতি রুষ্ট;—
রাবণের মুণ্ডে যবে গৃধ্রপদ হবে ন্যস্ত
তখনি হইব আমি তুষ্ট ॥
বায়স গরুড় মাঝে আছে যে অন্তর,
বনে—সিংহ-শৃগালের সাথে।
খদ্যোত রবিতে যেই ভেদ পরস্পর,
সেই ভেদ তোতে রঘুনাথে ॥

(রাবণ চলিয়া গেলে ত্রিজটার প্রতি)

সীতা। ত্রিজটে! তোমায় আমি এই কথা জিজ্ঞাসি এখন।—
নীতিজ্ঞ নৃপ-শেখর এমন যে রাজা দশানন
পরনারী-মোরে কেন বন-হতে করিল হরণ?

ত্রিজটা।— মনমথ-শরাহত হয় যেই—সীতা!
—বল দেখি মোরে,—তার নীতি থাকে কোথা?
যাবৎ পুরুষ কোন নাহি হয় কাম-শরাহত।
তাবৎ বিশিষ্ট বলি' লোকমাঝে হয় সে প্রখ্যাত॥

যার বক্ষে হল জীর্ণ বজ্রীর সে কুলিশ প্রচণ্ড,
হরি-চক্র হ'ল বক্র, যমদণ্ড হ'ল খণ্ড খণ্ড,
পাশী বরুণের পাশ একেবারে হ'ল বিদলিত,
—সেই লঙ্কেশের বক্ষে কামশর হইয়া পতিত
না হইল ভগ্ন, কিন্তু মগ্ন হয়ে করে অবস্থান।
না জানি সে কোন শাখী যার পুষ্প—সখি!—পুষ্প বাণ॥
শিরীষ-কুসুমপ্রায় সীতার হৃদয়ে যেই বাণ
মগ্ন হওয়া দূরে থাক্ ভগ্ন হয়ে হল খান খান
সেই মনমথ বাণ বজ্রজয়ী রাবণ হৃদয়ে
আপুঙ্খ প্রবেশ করি' দেখ এবে রহে মগ্ন হয়ে।
রামের মহিমা ইথে পরিব্যক্ত হয় বিলক্ষণ;
আপন অর্দ্ধাঙ্গে দেখ অলক্ষিতে করেন রক্ষণ॥

হনুমান।—(সীতাকে দর্শন করিয়া)
কে তুমি বলনা মোরে ওগো পদ্মপলাশ-লোচনা,
পীতবর্ণে-সুরঞ্জিত কৌশেয়-বসন-পরিধানা,
তরুর শাখার পরে পৃষ্ঠদেশ করিয়া নির্ভর,
কেগো তুমি অনিন্দিতা বলদেখি আমারে সত্বর।
কি হেতু ও-নেত্র হতে শোক-বারি ঝরে অবিরল?
—আহা যেন জল-ভরা পদ্মপত্র করে ঢল ঢল॥

সীতা।— জনক বিদেহ-পুত্র —ওগো আমি, তাঁহারি দুহিতা,
ধীমান্ সে শ্রীরামের ভার্য্যা আমি—নাম মোর সীতা।
শত্রুঘাতী সেই রাম -রঘুবংশ ও জনক
-কুলের রক্ষক।

ধর্ম্মেরো রক্ষিত তিনি —তাঁহাতেই হয় রক্ষা
এই জীবলোক॥
বেদ-আদি ধনুর্বেদে নিষ্ঠা তাঁর আছে বিলক্ষণ;
বৃহৎস্কন্ধ, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, সুপ্রশস্ত-মন॥

হনুমান।—(মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া)
* সু-বর্ণ সু-বর্ণ এই সু-বর্ণ-অঙ্গুরী
পাঠাইলা রামচন্দ্র শুনগো সুন্দরি

হনুমান।—মা জানকি!
সীতা।— —কে গো তুমি?—শাখামৃগ?—কাহার প্রেরিত?
হনুমান।— পাঠাইলেন রামভদ্র।
সীতা। —হস্তে একি?
হনুমান।— অঙ্গুরি মুদ্রিত।
নিজকরে অঙ্গুরীটি, লয়ে সীতা, করি' আলিঙ্গন
প্রেম-অশ্রু বিসর্জ্জিলা—গাত্রে হল পুলক-উদ্গম।

সীতা। মুদ্রা, প্রিয় সখি মোর, আছত গো ভাল?
মুদ্র। জানকি! কুশল মোর—রামেরো কুশল।
সীতা। সত্য কি আমারে সখি প্রাণনাথ করেন স্মরণ?
প্রোষিতা সীতার কথা কখন কি করেন ভাষণ?
মুদ্রা।— "আমার বিরহে সীতা কোথা এই দীর্ঘকাল
করেন যাপন?"
—এই তাঁর জল্পনা এই তাঁর মন্ত্রণা,
ধ্যান অনুক্ষণ।
এইরূপে শুখাইছে দেহখানি তাঁর,
আর হয় থাকি-থাকি মূর্চ্ছা বারম্বার।

---

* সু-বর্ণ=উৎকৃষ্ট রং যার সু-বর্ণ=উৎকৃষ্ট "রাম" নাম-অক্ষর যাহাতে লিখিত; সুবর্ণ=স্বর্ণ।

সীতা। বল' সখি অঙ্গুরীয়, —ভাল তো আছেন রাম
লক্ষ্মণ-সহিত ?

অঙ্গুরী।— আছেন কুশলে তাঁরা, চিন্তায় হয়োনা সীতা
বিয়াকুল-চিত।
ও-নামে ডেকো না মোরে নামান্তরে এবে তুমি
কোরো সম্বোধন।
তোমার বিরহে রাম বহুদিন হতে মোরে
বলেন কঙ্কণ॥
রাম-প্রতিবিম্ব ছিল অঙ্গুরীয়-মণির উপরে,
দেখিতে লাগিলা তাই সীতাদেবী কতই আদরে।
বুঝি বা আমারি-মত চিন্তাজ্বরে তাঁরো এই দশা
—এইরূপ ভাবি' সীতা মূরছিতা হইলা সহসা॥

হনুমান।— প্রতিদিন অতিদীন রামে হেরি' রতিহীন,
দ্বিধা যে হলনা গিরিবর
তাহার কারণ এই অশনি-কঠিন সে যে,
বজ্রপাত সয়েছে বিস্তর।
পৃথিবীও না হইল ফাটি' দুই খান
—কেননা সে "সর্ব্বংসহা" ধরে এই নাম॥

(আশ্বাসিত করিয়া)
কিবা দূর ইন্দুমুখি রাম-শর-কাছে ?
কপি-সেনাপতিদের দুর্গম কি-আছে ?
তোমা প্রতি আজ দেবি অদৃষ্ট প্রসন্ন,
কুপিত লক্ষ্মণ-কাছে রাক্ষস নগণ্য॥
যাঁহার নিকটে চন্দ্র দিনেশ-কিরণ সম তায়,
সলিল—স্ফুলিঙ্গবৎ, কর্পূর—কুলিশের প্রায়,
শশিকলা *শম্পা সম, বায়ু বাড়বানলের মতো,
চন্দন যাঁহার কাছে দাবানলরূপে প্রতিভাত

* শম্পা=বিদ্যুৎ।

—সেই রাম-সন্নিধানে লয়ে যাও এ মোর সন্দেশ,
এখনি করহ যাত্রা বিলম্ব কোরো নাকো লেশ॥
দিয়ো গো একটি ফল শ্রীরামের চরণকমলে,
দুটি ফল দিয়ো তুমি সেথাকার সৈন্যদলবলে,
একটি সুরম্য ফল দিবে কপি-সেনাপতি-হাতে,
লক্ষ্মণে একটি ফল —মোর শত আশীর্ব্বাদ সাথে,
তারপর, সৈন্যমাঝে তুমি যে গো সুধীর-প্রকৃতি
তুমিও একটি ফল খেয়ো বৎস এ মোর মিনতি॥

সীতা।— কি করে' তুমি সাগর পার হবে বল দিকি ?

হনুমান।— তোমার প্রসাদ আর পবন-প্রসাদে,
আর তব ভরতার চরণ-প্রসাদে,
—এ তিন প্রসাদে আমি হয়ে বলীয়ান
লঙ্ঘিব সমুদ্র তুচ্ছ গোষ্পদ-সমান॥

সীতা-সম্ভাষণ-অন্তে কাননটি ভাঙিবারে
হনুমান হইয়া উৎসুক,
গলিত-নখর-দন্ত শীর্ণকায় অতি বৃদ্ধ
দ্বিজচ্ছলে ধরে ছদ্মরূপ,
শুক্ল-কেশ বৃদ্ধ হয়ে বন সন্নিকটে গিয়ে
রক্ষিজনে মন্দ মন্দ
কহিল বচন :—
ওহে ভাই ! ভূমিপতি একটি অমৃত ফল
যাচি আমি, কৃপা করি'
কর বিতরণ।

(হনুমান-কর্ত্তৃক প্রমদ-বন ভগ্ন হইলে রাবণের প্রতি উদ্যানপাল)

উদ্যানপাল।— যে অরণ্যে মন্দমন্দ বহে সমীরণ,
সূর্য্য যেথা ভয়ে-ভয়ে বরষে' কিরণ,
মেঘ যেথা জলদানে সর্ব্বদাই হন ভীত অতি,
ভাঙিলে প্রাচীর যার বিশ্বকর্ম্মা যান দ্রুতগতি,

ভগন করিল সেই সুললিত বন,
কোথা-হতে কপি এক আসিয়া রাজন্ ;
লাঙ্গুলে উপাড়ি' তরু নিষ্ঠুর বানর কোথাকার
সুরম্য এ কেলীবন ভাঙ্গি' করে সব চুরমার্।
যতেক উদ্যান-পাল সবারেই ফেলিল বধিয়া,
আমি মাত্র বার্ত্তা দিতে দৈবক্রমে আইনু বাঁচিয়া।
লঙ্কাপুরী মাঝে আসি' পবন নন্দন
প্রকাশ করিল যবে উৎকট বিক্রম,
কি কি দশা রাবণের বল দেখি হল উপস্থিত ?
"বধিয়াছে" শুনি' রাজা কোপে প্রজ্জ্বলিত ;
"কপি"—শুনি' লজ্জা-বশে নত হল মাথা ;
"লঙ্ঘিল হেলায় সিন্ধু" শুনি এই কথা,
কাঁপি উঠিলেন ভয়ে —কাঁপে তাহে কর্ণের কুণ্ডল ;
"রামদূত কপি"—শুনি ; হইলেন ঈর্ষার বিকল॥

(অক্ষ নিহত হইলে ও ইন্দ্রজিৎ অগ্রে যাত্রা করিলে পারিপার্শ্বিক)

পারিপার্শ্বিক।— প্রাকার তোরণময়ী অলক্ষ্য এ লঙ্কাপুরী,
—এক কপি-বীর আসি পশিল হেথায় ;
রাবণ-কুমার অক্ষ হইয়া অতীব রুষ্ট
কুমারের অভিমুখে ঐ দেখ ধায়॥

(অক্ষ নিহত হইলে ও ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করিলে)

কুমার অক্ষেরে তুই কি প্রকারে বধ করি
কোথায় পলালি ওরে
বানর অধম ?
দশানন-আজ্ঞাক্রমে আজিকে বধিবে তোরে
দর্পোদ্ধত মেঘনাদ
রাবণ-নন্দন॥

রাম-আগমন-বার্ত্তা সীতা-কাছে নিবেদন করি',
সান্ত্বনা প্রবোধ আদি দিয়া তাঁরে বহুক্ষণ ধরি,
রামের প্রত্যয় তরে সীমন্ত-মণিটি তাঁর
করিয়া গ্রহণ,
ভাঙ্গি অশোকের বন. অক্ষ-আদি রক্ষোগণে
হনুমান করিয়া নিধন,
রাবণেরে দেখিবারে স্ববন্ধন ইচ্ছা করি'
সৌম্য মূর্ত্তি করিল ধারণ॥

রাবণ।— ওরেরে বানর দূত ! একি অদ্ভুত কাণ্ড
—একি আচরণ ?
জলজন্তু-পরিবৃত দুস্তর জলধি এই
তরঙ্গ-ভীষণ
কেমনে লঙ্ঘিয়া এলি বিনা-রথে, কেবা তোরে
করিল প্রেরণ ?
বল্ তুই—করিতেছি অভয় প্রদান।
বধিব না,—কহ মোরে কিবা তব নাম॥

হনু।— বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থিত
লক্ষণের সনে ;
সীতা-অন্বেষণ-কার্য্যে পাঠালেন মোরে তিনি
আদর যতনে।
লঙ্ঘিয়া শম্ভুর বর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী যেগো
তুমি দশানন
তুমি কি জান না মোরে, আমি কপি হনুমান্
পবন-নন্দন ?
মহাবল বালি বীরে করিয়া বিনাশ,
কপি-সেনাদলে দিয়া সান্ত্বনা আশ্বাস
সদানন্দ জয়ী কৃতী সখা সুগ্রীবেরে রাম
সিংহাসনে বসাইয়া, করি' কপি-রাজ,

আর চিন্তি' দেব-বাক্য —"জানকী-হরণ-হেতু"—
তব কালরূপে এবে করেন বিরাজ ॥

রাবণ।— রাম-দূত ওরে কপি ! "বালি-ছাড়া নাহি বলী"
বল' কোন্ মুখে ?
আমি বীর দশানন —এই কথা কহ তুমি
আমার সম্মুখে ?

হনু।— বালি-কক্ষ-মাঝে থাকি হয়ে ছিল তোমার যে
হেলন দোলন,
পুনঃ সেই দশা তব একটু দেখিতে ইচ্ছা
হয় হে রাজন্ ॥

রাবণ।— কে তুই বানর ওরে ?

হনু।— তব পুত্র-হন্তা, লঙ্কা-স্বামি !
কোদণ্ডের দীক্ষা গুরু খর-ঘাতী রামদূত আমি।
এই মোর সুকঠোর দোর্দণ্ডের ঘায়
কোথা থাকে চিত্রকূট —মেরু বা কোথায় ?
একটি রাবণ হয়ে কি কহিছ তুমি ?
—কোটি রাবণে যে আমি কীট তুল্য গণি।
একা আমি হনুমান্ পবন-নন্দন কপি,
কোটীশ্বর তুমি দশানন।
তোমারে জিনিয়া আমি মম প্রভু-প্রণয়িনী
জানকীরে লইতে সক্ষম।
তবে কিনা, সুগ্রীবেরে বসুমতী দান করি'
রামচন্দ্র মহাশক্তিমান,
আপন দক্ষিণ হাতে তোমা বধিবেন তিনি
—করিলেন বচন প্রদান।
রাবণ রাক্ষসাধম পশু ওরে ! মূর্খের অধম !
শীঘ্র কর্ গর্ব্ব ত্যাগ, হিত-তরে বলি এ বচন ;—
জানকীরে দিয়া অগ্রে শ্রীরাম-চরণ-যুগ
মাথায় করি লহ ;

এইরূপে নিজ রাজ্য অকণ্টক করি' রাখ
পুত্র পৌত্র-সহ ॥
রক্ষিবারে চাস্ যদি পুত্র পৌত্র আপনারে
—ভ্রাতৃবর্গ কুটুম্বক
সৈন্য পরিজন,
আর এ উজ্জ্বল রাজ্য ; —স্বেচ্ছাক্রমে, মহবীর
রামহস্তে জানকীরে
করহ অর্পণ ॥
লোকনাথ শ্রীরামের প্রিয়ারে না দিস্ যদি,
শোন্‌রে রাবণ,
—দেখিবি রামের মুখ, জলধি হইবে বন্ধ,
আর কপিগণ
আক্রমিবে লঙ্কাপুরী —ভ্রাতৃবন্ধু আত্মীয়ের
দেখিবি মরণ।
অধিক বলিব কিবা, ততক্ষণ তুই হেথা
রাজা লঙ্কেশ্বর,
—না আসেন যতক্ষণ বিশ্বজয়ী মহাবীর
রাম রঘুবর।
মহাবীর রামচন্দ্র আসিলে হেথায়।
লঙ্কামাঝে লঙ্কেশ্বর থাকেন কোথায় ?

রাবণ।— (ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত)

বিভীষণ। রুক্ষবাদী যেই দূত— দণ্ড তার শোনো গো রাজন—
কশাঘাত, বৈরূপ্য, দাগ-দেওয়া, মস্তকমুণ্ডন।
দৃষ্ট নাহি হয় কভু শাস্ত্রাদিতে দূতের নিধন ॥

অপিচঃ— লাঙ্গুল্‌ইতো কপিদের একমাত্র সাধের ভূষণ ;
জ্বালাইয়া দেও তাহা —দগ্ধ হয়ে করুক গমন ॥
কাটিতে উদ্যত যবে— "বধযোগ্য নহে দূত"
—এই বিভীষণ-বাক্য
শুনিয়া রাবণ

বিরূপ করিয়া দিতে ঘৃত-সিক্ত বস্ত্রে বাঁধি
হনুর লাঙ্গুলে অগ্নি
করিল অর্পণ ॥

বিভীষণ। অগ্নি হ'ল প্রজ্জ্বলিত আজ্ঞা কর জলদেরে
—সুপ্রচুর অম্বুরাশি করুক বর্ষণ।
বহিছে পবন, কিন্তু তব আজ্ঞা বশে নহে
তোমায় কহিনু আমি—শোনো গো রাজন ॥
এই বাক্যানলে যথা দহিল রাবণ-হৃদি
লঙ্কাপুরীও তথা হয় নি দহন ॥

বাড়ব-অনল-সহ সাগর যেমন,
তপনমণ্ডল-সহ যেমতি গগন,
বিদ্যুৎ-অঞ্চল-সহ জলদ যেমতি,
ললাটের নেত্র-সহ যথা পশুপতি,
প্রলয়াগ্নি-সহ যথা কল্পান্তের কাল,
ইন্দ্র-ধনু-সাথে যথা জলদের জাল,
ধ্রুব-মণ্ডলের সাথে মেরুগিরি যথা
পুচ্ছ-সহ হনুমান বিরাজেন তথা ॥

হনু।— নির্লজ্জ রাবণ ওরে! রাম লক্ষ্মণের সাথে
না করিয়া সম্মুখ-সংগ্রাম,
অসাক্ষাতে চুরি করি' হরিলি সীতারে তুই
—যিনি সদা ভয়ে কম্পমান।
হর্ম্ম্য প্রাসাদ আদি বরগৃহে-পরিপূর্ণ,
ব্যাপ্ত লোকজনে
কাঞ্চন-স্ফটিক-রত্ন —মুক্তামতী লঙ্কা, তব
চক্ষের সামনে
দগ্ধ করিতেছি আমি —দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ তুই
দেখ্‌রে নয়নে।

তৃষার্ত্ত জনদের গৃহেগৃহে সঞ্চারিয়া
সেই সে আগুন,
উল্কামুখী-মুখ হতে বাহিরি'—প্রভাব তার
হইয়া দ্বিগুণ,
সমস্ত সে লঙ্কাপুরী করিল দহন,
কার্ সাধ্য শিখা তার করে নিবারণ ॥

রাবণ।— শীঘ্র রক্ষা কর্ ওরে অশ্বশালা, হস্তিশালা,
শ্রীগৃহ, শয্যা গৃহ আর
নিবাস ও ধনালয়; প্রবল পবনে দেখ
দীপ্তানল হয়েছে বিস্তার।
ধূম্রব্যাকুলিত-নেত্র যুবতীজনেরা সবে
বক্ষস্থলী করিছে তাড়ন;
বালবৃদ্ধ নারী যত বিহ্বল হইয়া ভয়ে
হাহা রবে করিছে ক্রন্দন ॥

ঘোর হুতাশনে দগ্ধ লঙ্কাপুরী হেরিয়া রাবণ,
জল যাচি,' দশমুখে জলধিরে করে সম্বোধন :—
নীরধি অম্বুধি, ওগো! অপাংনিধি পয়োনিধি
অম্ভোধি, পয়োধি এসো হে বারিধি বারানিধি!
হে নিকুম্ভ! কুম্ভোদর! কুম্ভকর্ণ আর,
তোমাদের কুম্ভনাম নামমাত্র সার;
অনল করিছে গ্রাস মন্দোদরী-গেহ,
জল আনি' নিবাবেনা তোমরা কি কেহ?

টুটিল বন্ধন নিজ সুরজ-মণ্ডলগ্রাসী
বীর হনুমান;
মৃতপ্রায় জানকীরে সঞ্জীবনী মহৌষধি
করিল প্রদান;
বধিল রাক্ষস-সৈন্য ভৎর্সিল দশাননে
কঠোর ভাষায়,

প্রজ্বলিত পুচ্ছ দিয়া আগুন জ্বালায়ে দিল
সমস্ত লঙ্কায়।
এইরূপে কপি-কার্য্য করি' সমাপন,
জানকীর কাছে হনু করয়ে গমন।
আসিয়া অশোকবনে বলিল সীতায়
লঙ্কা দগ্ধ হল দেবি, দাও গো বিদায়॥
আরোহণে দক্ষ হনু বেলাদ্রি-শেখরোপরি
করি' আরোহণ
—পূর্ব্বাচলে সূর্য্য যথা —মহাসিন্ধু-অম্বুরাশি
করিল লঙ্ঘন।
সেই বেগ-ভরে বায়ু হয়ে উৎপাদিত
সমস্ত সাগর-জল করিল ক্ষুভিত।
নাগেন্দ্র বাসুকি আদি বাহিরিয়া সিন্ধুগর্ভ-হতে
কীর্ত্তি-হার-রূপে লগ্ন হল হনুমানের কণ্ঠেতে॥
মহা বেগবান হনু পবন-নন্দন
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে লঙ্কা করিল দহন॥
জানকীরে নানামতে করি আশ্বাসিত
জাম্ববান আদি-সাথে হইল মিলিত॥
তাদের নিকটে সব লঙ্কা-কথা করি' নিবেদন,
সুগ্রীবের প্রিয় স্থান মধুবনে করিয়া স্মরণ
ভুঞ্জিতে তথায় সবে হৃষ্ট মনে করিল গমন।
যা ছিল সঞ্চিত মধু করিতে লাগিল তারা পান;
রক্ষক সে দধিমুখ মানা করি' হল হতমান।
বলবান্ বানরেরা প্রহার করিল দধিমুখে,
অভিযোগ করিবারে আসিল সে সুগ্রীব-সম্মুখে॥
ইতি—সন্দেশাহরণ নামক পঞ্চম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বত্রিশ সিংহাসন।

চলিত ভাষায় দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার নাম বত্রিশ সিংহাসন। এই গ্রন্থ কালিদাস কৃত বলিয়া সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা কালিদাসেরই রচিত বটে, কিন্তু যাঁহার সুধানিষ্যন্দনী লেখনী হইতে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আবির্ভাব হইয়াছে, এ গ্রন্থ সে কালিদাসের রচিত নহে; ইহার প্রণেতা ভোজ-রাজীয় কালিদাস।

মধ্যভারতে মৌ-ছাউনী হইতে বরোদা রাজ্যে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে মণ্ডু নামে একটি রাজধানী আছে। ঐ রাজধানীতে একটি মিত্ররাজ রাজ্য করেন। এই রাজবংশটি অতি প্রাচীন। মণ্ডুর বর্ত্তমান নরপতি ভোজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব রাজধানী ধারা নগরীতে বিদ্যমান ছিল। তজ্জন্য এখনও সরকারী চিঠিপত্রে ইঁহারা "ধার রাজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ধারা নগরীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ভোজ-প্রবন্ধ ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ধারা নগরীর বর্ণনা আছে। মণ্ডু হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে পর্ব্বতোপরি ধারা নগরীর শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিত পাষাণনির্ম্মিত অট্টালিকা ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং সুদীর্ঘ জলাশয় সকল অদ্যাপি সেই প্রাচীন হিন্দুরাজধানীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। মণ্ডুতে এখন যে সকল মনোহর দেবালয় অট্টালিকা ও মহম্মদীয় মস্‌জীদ দেখা যায়, তাহাও নাকি ঐ প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের কিয়দংশ দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

ভোজের পূর্ব্বপুরুষদের রাজ্যারম্ভকাল ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহারা ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।" কাহার কাহারও মত এই যে, বিক্রমাদিত্যের বংশেই ধারানগরীর অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যে সকল নরপতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভোজরাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভোজরাজ যে অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যাবত্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোজরাজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় ধারানগরীর অধিশ্বর ভোজেরও একটি নবরত্নসভা ছিল। উক্ত সভায় কালিদাস প্রভৃতি নয়টি সদস্য ছিলেন। এই ভোজরাজীয় কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের বয়স্য কালিদাসের সমানধর্ম্মা না হইলেও কবিত্বসম্পদে একান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাণ বিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক এবং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা তাঁহার লেখনী নির্গত। শ্রুতবোধ ছন্দোনিয়ামক গ্রন্থ এবং অপর পাঁচ খানির মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ব্যতীত সব কয়খানিই কাব্য। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাকে 'আখ্যায়িকা' বা 'কথা' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই এই প্রবন্ধের বর্ণনীয়, তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার সংস্কৃত, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সংস্কৃতের ন্যায় মধুর এবং অনায়াসগম্য। যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সংস্কৃতে অধিকার আছে, তিনিই বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন যে তান্ত্রিক মতোক্ত নরবলি, শবসাধনা প্রভৃতি প্রবলভাবে বিদ্যমান

ছিল তাহা গ্রন্থপাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে আড়ম্বরপ্রিয়তা, অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস, অবরোধপ্রথার বাড়াবাড়িও নিতান্ত অল্প ছিল না। যদিও এই গ্রন্থোক্ত গল্পগুলি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত, তথাপি উহা পাঠে সে সময়ের সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র মনোমধ্যে সমুদিত হয়। গ্রন্থখানি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য ও ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজের চরিত্র কথায় পরিপূর্ণ। ভোজের চরিত্র অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কত উন্নত ছিল, তাহাও বিশেষভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ঐ গ্রন্থরচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইল।

উজ্জয়িনী নগরীর কথা কে না জানেন? যে সময় সেই সুপ্রসিদ্ধ নগরীতে রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত সেই সময় কোন মন্ত্রশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ নানাবিধ কঠোর অনুষ্ঠানদ্বারা ভুবনেশ্বরীদেবীকে প্রসন্ন করিয়া একটি ফল প্রাপ্ত হন। ঐ ফলের গুণ এই, যে ঐ ফল ভক্ষণ করিবে তাহার জরা কিংবা মৃত্যু হইবে না। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব ফল ভক্ষণ করিতে গিয়া চিন্তা করিলেন, আমি দরিদ্র, অমর হইয়া কি করিব? বরং এই ভিক্ষাবৃত্তির হস্ত হইতে যত শীঘ্র অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই মঙ্গল। বরং কোন পরোপকারী ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিলে জগতের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমাদের রাজা পরোপকারে সদা অনুরক্ত, অতএব তাঁহাকেই ইহা প্রদান করিব। ইহা ভাবিতে ভাবিতে গিয়া সেই ব্রাহ্মণ রাজা ভর্ত্তৃহরিকে ঐ ফলটি প্রদান করিলেন। রাজা ভর্ত্তৃহরি ব্রাহ্মণকে বহুবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়া ঐ ফল গ্রহণ করিলেন। রাজার মহিষী অনঙ্গসেনা যুবতী এবং অদ্বিতীয় সুন্দরী; তিনি রাজার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা। রাজা ভাবিলেন "আমি বাঁচিয়া থাকিতে যদি অনঙ্গসেনা মরিয়া যায়, তাহা হইলে কোন প্রকারেই আমি তাহার

বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিতে পারিব না, অতএব এই ফল অনঙ্গসেনা-কেই প্রদান করি।" তাহার পর তিনি অনঙ্গসেনাকেই উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মহিষীর আবার অন্য একটি মাথুরিক (জুয়াখেলার অড্ডাধারী) প্রণয়ী ছিল, তিনি তাহাকে ঐ ফলটি দিলেন। ঐ ব্যক্তি অপর একটি প্রিয়তমা দাসীকে উহা অর্পণ করিল। ঐ দাসীর একটি গোয়ালার সঙ্গে ভাব ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল দিল। তাহার আবার এক গোময়ধারিণী (ঘুঁটে ওয়ালী) প্রণয়পাত্রী ছিল, সে তাহাকে উহা প্রদান করিল।

তাহার পরদিন সেই গোময়ধারিণী গ্রামের বাহির হইতে ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া ঘুঁটের ঝাড় মাথায় রাজপথে আসিতেছিল, ঐ ফলটি তাহার ঘুঁটের ঝুড়ির উপরে বসান ছিল। সেই সময় রাজা ভর্তৃহরি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি কৌতুহলপ্রযুক্ত হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়াই ঘুঁটের ঝাড় হইতে ফলটি তুলিয়া লইলেন। তাহার পর, সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ! সেইরূপ ফল আর কি পাওয়া যায়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহারাজ! সে যে দেবতার প্রসাদলব্ধ, তাহা আর কোথায় পাওয়া যাইবে?" রাজা তখন ফলটি দেখাইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ফল ভক্ষিত হইয়াছিল কি না?" রাজা বলিলেন "আমি উহা ভোজনের নিমিত্ত আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা অনঙ্গসেনাকে দিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "তবে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।" তাহার পর রাজা, মহিষী অনঙ্গসেনাকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অনঙ্গসেনা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কম্পিত-কলেবরে বলিলেন, "তাহা মাথুরিকে দিয়াছিলাম।" রাজা ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন এই সেই ফল। তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন:—

"মনোহর রূপযৌবনে পুরুষের অভিমান করা বৃথা। কারণ পুরুষ যতই রূপবান কিংবা গুণবান্ হউন না কেন, রমণীর চিত্তহরণে তাঁহার শক্তি নাই। এ বিষয়ে কন্দর্পই প্রমদাগণের প্রভু, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন রমণীগণের দ্বারা তাহাই করাইতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মন্ত্রিসমাজ ও প্রজাবর্গের পরিতোষবিধানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কোনও সময়ে এক দিগম্বর আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ! আমি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাশ্মশানে অঘোর-মন্ত্র দ্বারা হোম করিব, অতএব আপনাকে উত্তরসাধক (সহায়) হইতে হইবে"। রাজা সেই দিগম্বরের নিকট উত্তরসাধক হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। উক্ত দৈব কার্য্য সম্পন্ন করায় তাঁহার প্রতি বেতাল (কোনও দৈববলসম্পন্ন যক্ষ) প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার প্রসাদে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইল। তাহার পর হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে, বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকথা দেবলোকে পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। দেবরাজের সভায় রম্ভা এবং উর্ব্বশী নিয়মিত রূপে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই উভয় নর্ত্তকীর মধ্যে কে নৃত্য কার্য্যে অধিক নিপুণা, এই কথা লইয়া দেবতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। কতকগুলি দেবতা রম্ভার এবং কতকগুলি দেবতা উর্ব্বশীর নৃত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কিছুই নির্ণয় হইল না। এই সময় নারদের পরামর্শে দেবরাজ, এই বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত বিক্রমাদিত্যকে আনয়নের জন্য মাতলি সারথিকে

পাঠাইলেন। কারণ, সে সময়ে ত্রিভুবনে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কেহই নৃত্যগীতবিশারদ ছিল না। রাজা বিক্রমাদিত্য অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে দেবরাজের রঙ্গালয়ে দুইদিন মহাসমারোহে নৃত্য হইল; রঙ্গক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন রম্ভা ও দ্বিতীয় দিন উর্ব্বশী নৃত্য করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য, উর্ব্বশীর নৃত্যেরই অধিক প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকেই জয় প্রদান করিলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই রম্ভা ও উর্ব্বশীর নৃত্যের মধ্যে ইতর-বিশেষ কি বুঝাইয়া দিন; কারণ আমাদের ত উভয়ের নৃত্যেই মন মোহিত হইয়াছিল"। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য, নৃত্যশাস্ত্র-সংক্রান্ত একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উর্ব্বশীর নৃত্যের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিলেন। দেবরাজ, উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রত্নাদিদ্বারা বিক্রমাদিত্যকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং গমনকালে একখানি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সিংহাসন উপহার প্রদান করিলেন। ঐ সিংহাসনের সোপানে বত্রিশটি পুত্তলিকা আছে, সিংহাসনে আরোহণ কালে তাহাদের মস্তকে পা দিয়া আরোহণ করিতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ সিংহাসনসহ উজ্জয়িণীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর, শুভদিন ও শুভলগ্নে নানাবিধ দৈব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বহুদিন রাজা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িণীর সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকাল অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় ছিল। ভারতবর্ষে বহু নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খ্যাতিলাভ অল্প রাজার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্য যখন পরিণতবয়সে উপনীত, সেই সময়ে একদিন সহসা ভূমিকম্প, দিগ্‌দাহ ও উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাজা শঙ্কিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে আহ্বান করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বলিলেন,—"মহারাজ! এ সমস্ত অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ, ইহাতে এই জানা যায়, অদ্য পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই মহারাজের হন্তা হইবে"। রাজা তৎক্ষণাৎ নানা দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন। একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ! প্রতিষ্ঠান নগরে (পৈঠানে) এক কুম্ভকারের গৃহে কোন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী কন্যা বাস করিতেন। সেই বালিকা কন্যার গর্ভে নাগরাজের ঔরসে ঐ দিবস আশ্চর্য্য লক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে "শালিবাহন"। এই সংবাদে বিক্রমাদিত্যের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, ক্রমে ক্রমে সেই সন্দেহ ভয়ে পরিণত হইল। শালিবাহন কেবল কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে একদিন বিক্রমাদিত্য খড়্গহস্তে প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর, যেই সেই বালক শালিবাহনের মস্তকে খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন, অমনি খড়্গ হস্তচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে পতিত হইল। শালিবাহনও নিরস্ত না থাকিয়া সবলে বিক্রমাদিত্যের মস্তকে যষ্টির আঘাত করিলেন। বিক্রমাদিত্য উহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন।

উজ্জয়িণীতে হাহাকার উত্থিত হইল। বিক্রমাদিত্যের অনেক পত্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অগ্নিপ্রবেশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "রাজা অপুত্রক, রাজ্যাধিকারী কে হইবে? অতএব দেখ রাণীদের মধ্যে কেহ যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন"। তাহার পর, অনুসন্ধানে জানা গেল এক রাণী গর্ভবতী আছেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহার গর্ভাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, আকাশ হইতে এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইল, "এ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্য করিতে পারেন, এরূপ নৃপতি ভূমণ্ডলে নাই, অতএব এই স্বর্গীয় সিংহাসন কোন সুক্ষেত্রে

নিক্ষিপ্ত হউক”। মন্ত্রীরা তাহাই করিলেন। কোন সদ্যঃকৃষ্ট পবিত্র ক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিলেন। তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়া গেলে ভোজরাজ মালবরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ধারানগরীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। একদিন তিনি সৈন্যসামন্তসহ মৃগয়া করিতে করিতে বনের নিকটস্থ এক শস্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রে প্রচুর চণক হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের উচ্চভূমিস্থিত মঞ্চে বসিয়া পাখী উড়াইতেছেন। মঞ্চস্থিত ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখিবামাত্র দূর হইতে আদর সহকারে বলিতে লাগিলেন “রাজন্! আসুন, এখানে উপবেশন করুন, অদ্য আপনি আমার অতিথি, আপনাকে বড় ক্ষুধার্ত্ত দেখা যাইতেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক চণকফল ভক্ষণে ক্ষুধানিবৃত্ত করুন।” রাজা ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া চণকভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ পাখী তাড়াইয়া যেই নীচে নামিলেন অমনি তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন “রাজন্ এ কি করিতেছেন, কেন এই গরীব ব্রাহ্মণের শস্য নষ্ট করিতেছেন? অন্যে অপরাধ করিলে আপনি তাহার শাসন করিবেন, আপনি যদি স্বয়ং অপরাধ করেন, তাহা হইলে কাহার নিকট অভিযোগ করিব? রাজা উহা শুনিয়া লজ্জিত ও ফলভক্ষণে বিরত হইলেন। আবার যেই ব্রাহ্মণ পাখী তাড়াইবার জন্য মঞ্চে উঠিলেন, অমনি তাঁহার সুমতি উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে পুনরায় আদর সহকারে ফলভক্ষণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা যেই ফল ভক্ষণ করিবেন, ব্রাহ্মণ তখন নীচে নামিয়াছিলেন, অমনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি চারিবার এইরূপ করাতে রাজার মনে হইল “এই ব্রাহ্মণ যখন মঞ্চে অবস্থান করেন, তখন ইঁহার মনে হয়,' লোককে দিব, খাওয়াইব; আবার মঞ্চ হইতে নামিলেই

স্বাভাবিক বুদ্ধি উপস্থিত হয়। অতএব আমি এই মঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখিব।” তাহার পর, তিনি কৌতূহলপ্রযুক্ত সেই মঞ্চে উঠিলেন, অমনি তাঁহার মন বিশ্বপ্রেমে আর্দ্র হইল; রাজা ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে জগতের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা যায়, কিসে লোকের সর্ব্ববিধ অভাব নিরাকরণ করা যায়, কিসে জগতের লোককে সুখী ও সন্তুষ্ট করা যায়? এমন কি, তখন তাঁহার মনে হইল, কেহ যদি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহ প্রার্থনা করে, তাহাও তিনি দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাহার পর, রাজা ভোজমঞ্চ হইতে নামিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রের কোন মাহাত্ম্য আছে, নতুবা মঞ্চে আরোহণ করিলে আমার অন্তঃকরণ ঐ রূপ উদারভাবসম্পন্ন হইবে কেন? অনন্তর রাজা বহুধন দান করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া লইলেন। তাহার পর, খনকদ্বারা নিম্নভাগ খুঁড়িলে এক দিব্য সিংহাসন বাহির হইল। রাজা ঐ সিংহাসন রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু উহা এতই ভারবোধ হইল যে, কেহ উহা নড়াইতে পারিল না। তাহার পর ব্রাহ্মণগণের উপদেশে ঐ ক্ষেত্রে বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া সেই দিব্য সিংহাসনের উদ্দেশে পূজা ও হোম করিলেন। অর্চ্চনা শেষ হইয়া গেলে সিংহাসন একান্ত লঘু বলিয়া বোধ হইল। রাজা সিংহাসন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া আস্থান-মণ্ডপে স্থাপন করিলেন। তাহার পর, শুভদিন দেখিয়া সেই সিংহাসনের সোপানস্থিত প্রথম পুত্তলিকার মস্তকে পা দিয়া উঠিতে যাইবেন, অমনি পুত্তলিকা মনুষ্যোচিত ভাষায় বলিতে লাগিল, ‘রাজন্, এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি অদ্ভুত শক্তিশালী ছিলেন, যদি আপনি তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন। নতুবা করিবেন না। রাজা ভোজ বলিলেন, “মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরূপ

গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বর্ণন কর, তখন পুত্তলিকা গল্পচ্ছলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণন করিতে লাগিল এবং গল্প শেষ হইলেই দিব্যরথে আকাশে চলিয়া গেল। পুনরায় ভোজরাজ যেই দ্বিতীয় পুত্তলিকার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতে গেলেন অমনি সেও পূর্ব্বোক্তরূপ গল্পচ্ছলে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। এইরূপে বত্রিশটি পুত্তলিকা বত্রিশটি গল্পে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া তিরোহিত হইলে রাজা ভোজ সেই সিংহাসনে আরোহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ঐ দিব্য সিংহাসনের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

আশ্রয়।

সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে
দিগ্‌দিগন্ত ঘিরে,—
এখনো ভ্রান্ত কে আছিস্ বসি
শূন্য নদীর তীরে!
এখনি ঘনায়ে আসিবে আঁধার,
আশ্রয় কোথা মিলিবেনা আর,
চিরস্নেহময়ী জননীর কাছে
আয়, ঘরে আয় ফিরে।
সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে
দিগ্‌দিগন্ত ঘিরে।
চেয়ে আছে মাতা কুটীর দুয়ারে
জ্বালিয়া প্রদীপ খানি,
আরতি শঙ্খে ওই শোন তাঁ'র
শুভ আহ্বান বাণী।
মা আমার শত অপরাধ ভুলি'
সন্তান বলে' কোলে লয়ে তুলি'
সান্ত্বনা করি' অঞ্চল কোণে
অশ্রু মুছাবে ধীরে।
এখনো ভ্রান্ত কে কাঁদিস্ বসি
নির্জ্জন নদী তীরে!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

"বুশিদো"।

২

জাপানী নীতি।

বুশিদো অর্থাৎ জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে যে নৈতিক গুণ প্রসূত হইয়াছে এবং "বুশিদো"-র গ্রন্থকার jnazo Nitobe উহাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। প্রথম—ঋজুতা। ছলনা, প্রতারণা, সর্ব্বপ্রকার কুটীল ব্যবহার এই সমস্ত, সামরাইদিগের নিকট যেমন ঘৃণিত এমন আর কিছুই নহে। তবে, সামরাইগণ ঋজুতার যেরূপ অর্থ করেন, আমরা হয়ত ঠিক্ সেই অর্থে শব্দটী ব্যবহার করি না। একজন প্রখ্যাত সামরাই অথবা "বুশি," ঋজুতাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—"বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অবিচলিতভাবে কোন কার্য্য অনুসরণ করাকেই ঋজুতা বলে ;—যখন মরণ উচিত মনে হইবে তখন মরা, যখন আঘাত করা উচিত মনে হইবে তখন আঘাত করা"। আর একজন ব্যাখ্যা করেন :—ঋজুতাই সেই অস্থি যাহা দেহকে দৃঢ় ও সিধা করিয়া রাখে। অস্থি ব্যতীত, মস্তক যেমন পৃষ্ঠদণ্ডের উপর খাড়া থাকিতে পারে না, হস্ত যেমন নড়িতে পারে না, পদ যেমন দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ ঋজুতা ব্যতীত, শুধু গুণে কিংবা বিদ্যায় সামরাই হওয়া যায় না। যদি শুধু ঋজুতা থাকে, তাহা হইলে আর কোন গুণ না থাকিলেও কিছুই যায়-আসে না।" এমন কি—সামন্ত-তন্ত্রের শেষভাগে যখন জাপান দীর্ঘকাল শান্তি সম্ভোগ করে, এবং সেই অবসর-কালে যখন নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ও ললিত কলার

অনুশীলন জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও, "গিশি" (খাঁটি লোক) এই আখ্যাটি—বিদ্যা ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য নামগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। জাপানের যে "৪৭ জন সত্যনিষ্ঠ পুরুষ" তত্রত্য লোকশিক্ষার প্রধান উপকরণ—তাহাদিগকে জাপানীরা চলিত ভাষায় "গিশি" বলে।

যে যুগে, ধূর্ত্তামি, নীচ ফন্দি, মিথ্যা কথন—সামরিক কৌশল নামে চলিত, সেই সময়ে এই পুরুষোচিত গুণটি উজ্জ্বলতম মণির ন্যায় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—সকলেই এই দুর্লভ গুণের যারপর-নাই প্রশংসা করিত। ঋজুতার বুৎপত্তিসম্বন্ধে "বুশিদোর" গ্রন্থকার যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই :—"গিরি" অর্থাৎ ঋজুতা,—স্বকীয় মূল-অর্থ হইতে অল্প অল্প ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকৃত অর্থে পরিণত হইয়াছে। "গিরি"র মূল অর্থ—যথার্থ জ্ঞান ; কিন্তু কাল-সহকারে, উহাতে সামাজিক কর্ত্তব্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে ; যে কর্ত্তব্যগুলি লোক-মত ও লোকাচারের দ্বারা অনুশাসিত সেইসব কর্ত্তব্যকেই জাপানীরা এখন "গিরি" বলে।

গোড়ায় উহার অর্থ ছিল—বিবেকানুমোদিত বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য। যেমন পিতামাতার প্রতি "গিরি", জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি "গিরি", কনিষ্ঠদিগের প্রতি "গিরি" ইত্যাদি। কেননা, "যথার্থ জ্ঞান",—অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি, আমাদিগকে যাহা করিতে বলে তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ কর্ত্তব্যগুলি ভালবাসা হইতে প্রসূত হয় ; কিন্তু যেখানে ভালবাসা কোন কারণে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেইস্থলে কর্ত্তব্য আসিয়া, কঠোর গুরুমহাশয়ের ন্যায় শাসন করিয়া কাজ আদায় করে। "বুশিদোর গ্রন্থকার বলেন, এই যে কর্ত্তব্যজ্ঞান—ইহা কৃত্রিম সামাজিক অবস্থার ফল—সভ্যতার ফল। এই কৃত্রিম সমাজনীতির অনুশাসনে, সামরাইদিগের বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকৃত হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম

দেশাচারে পরিণত হইয়াছে। যেমন, প্রথম-জাত সন্তানকে বাঁচাই জন্য, অন্য সন্তানগুলিকে নষ্ট করিতে হইবে—ইহা একটি কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই সকল কর্ত্তব্য, দেশাচারের অনুরোধে, লোক-ভয়ে অনুষ্ঠিত হইত। পক্ষান্তরে, ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসের প্রকৃত ভাব সামরাইর অন্তরে আছে বলিয়াই এখনও "গিরি" হইতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই ; নতুবা, এই "গিরি" কেবল বাগ্‌জাল, জল্প, কপটতা ও ভীরুতার আশ্রয় হইয়া থাকিত।

২। দ্বিতীয়—ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসিকতা। কর্ত্তব্যের উদ্দেশে, ন্যায়ের উদ্দেশে, ধর্ম্মের উদ্দেশে যে সাহস প্রদর্শিত হয়, সেই সাহসই সদ্‌গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য। কংফুচু, তাঁহার ন্যায়-প্রকরণ-গ্রন্থে, স্বকীয় অভ্যস্ত রীতি অনুসারে অভাবের দিক্ দিয়াই, সাহসিকতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন ;—"যাহা কর্ত্তব্য তাহা জানিয়াও যদি না করা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে সাহসের অভাব প্রকাশ পায়"। বুশিদোর গ্রন্থকার বলেন,—ভাবপক্ষে এই তত্বটি ব্যক্ত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ;—"উচিত কাজ করাকেই সাহস বলে"। সকল প্রকার বিপদকে আলিঙ্গন করা, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়া,—সাধারণতঃ ইহাই সাহস-নামে পরিচিত। এইরূপ সাহসকেই, সৈনিকেরা প্রশংসা করে ; কিন্তু জাপানীদের ক্ষাত্রধর্ম্মে এইরূপ সাহসের প্রশংসা নাই। অযোগ্য কার্য্যের উদ্দেশে যে মৃত্যু—সে মৃত্যু "কুক্কুরের মৃত্যু"। মিতো বলেন :—"রণক্ষেত্রে, যুদ্ধের উন্মত্ত সংঘর্ষের মধ্যে, যে-সে লোক অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু যখন বাঁচিয়া থাকা উচিত তখন বাঁচিয়া থাকা, যখন মরা উচিত তখন মরিতে পারা—ইহাই প্রকৃত সাহসের কাজ।" পাশ্চাত্যদিগের ন্যায়, জাপানীরা নৈতিক সাহস ও দৈহিক সাহসের পার্থক্য বহুকাল হইতে অবগত আছে।

ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহস, নির্ভীকতা—এই যে সব গুণ,—ইহা দ্বারা

জাপানী বালকদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। মাতৃক্রোড় ছাড়িবার পূর্ব্বেই, শিশুদিগের নিকট বীরত্বের কথা অবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যদি কোন বালক কোন শারীরিক ব্যথায় কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার মাতা তাহাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করেন :—"এই সামান্য ব্যথায় আবার কান্না?—কি ভীরুতা! যুদ্ধে যখন একটা হাত কাটা যাবে, কিংবা যখন "হারাকিরি" করতে হবে, তখন কি হবে বাছা?" সেন্দাই প্রদেশের, অনাহার-ক্লিষ্ট বুভুক্ষু বালক-রাজকুমারের কথা জাপানীদের মধ্যে খুব প্রচলিত। সেই উপাখ্যান-মূলক কোন নাটকে, রাজকুমার তাঁহার ভৃত্যকে এইরূপ বলিতেছেন :—"এই যে নীড়ের মধ্যে ছোট ছোট চড়াই-শাবক দেখিতেছ, দেখ উহারা হল্‌দে ঠোঁটগুলি খুলিয়া কেমন হাঁ করিতেছে ; আবার দেখ, উহাদের মা আসিয়া এখন উহাদিগকে দানা খাওয়াইতেছে। শাবকগুলি কেমন আগ্রহের সহিত—কেমন সুখে আহার করিতেছে! কিন্তু, কোন সামরাইর উদর যদি খালি থাকে, তাহা হইলে ক্ষুধিত হওয়াও তাহার পক্ষে লজ্জার কথা।" শিশু-চিত্তহারী জাপানী উপকথার মধ্যে, এইরূপ ধৈর্য্য বীর্য্যের উদাহরণস্বরূপ অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদিগকে সাহসী ও নির্ভীক্ করিবার ইহাই একমাত্র উপায় নহে। পিতামাতারা, অতীব কঠোরভাবে—এমন কি নিষ্ঠুরভাবে—বালকদিগকে এমন সব কাজ করিতে বলেন যাহাতে বিশেষ সাহস আবশ্যক। সামরাইরা দৃষ্টান্তচ্ছলে বলেন :—"দেখ, ভল্লুকেরা শাবকদিগকে পর্ব্বতের উপর হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেয়," সামরাইসমাজে, পিতামাতারা শিশুদিগকে কখন কখন উপবাসী করিয়া রাখেন, কখন বা ঠাণ্ডা জায়গায় ফেলিয়া রাখেন ; উদ্দেশ্য—যাহাতে উহারা ধৈর্য্য ও কঠোরতায় দীক্ষিত হয়। কখন কখন, একটা সংবাদ দিয়া আসিবার জন্য, বালকদিগকে এমন সব লোকের মধ্যে

পাঠান হয় যাহারা একেবারেই অপরিচিত। শিশুদিগকে সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়; প্রাতরাশের পূর্ব্বেই, পাঠ অভ্যাস করিতে হয়; খুব শীতের সময়ে, খালি-পায়ে হাঁটিয়া গুরু-গৃহে যাইতে হয়। প্রতি মাসে একবার কিংবা দুইবার উহারা দলে-দলে আসিয়া একত্র হয়, এবং সারা রাত জাগিয়া, প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে উহাদের নিজ নিজ পাঠ উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করে; সর্ব্বপ্রকার ভীষণ স্থানে,—বধ্যভূমিতে, শ্মশানে, "ভুতুড়ে" জায়গায় যাওয়া,—বালকদিগের একটা খেলার মধ্যে পরিগণিত। যে সময়ে, বধ্যদিগের প্রকাশ্যস্থলে মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল, তখন সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য, ছোট ছোট ছেলেদের সেইখানে পাঠান হইত; শুধু তাহা নহে, অন্ধকার রাত্রে সেই স্থানে গিয়া, দেহ-চ্ছিন্ন মুণ্ডটির উপর, তাহাদিগকে একটা চিহ্ন দিয়া আসিতে হইত। এই বিষয়ে জাপানীরা, কঠোরতার শিক্ষায়, প্রাচীন গ্রীশের স্পাটানদিগকেও হারাইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—এই শিক্ষার ফলে, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরেই বিদলিত করা হয়। কিন্তু "বুশিদো"র অন্যান্য নীতিউপদেশের প্রভাবে, ইহার কুফল কতকটা নিবারিত হয়। সেই নীতিউপদেশগুলি কি—তাহা বারান্তরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনন্ত জীবন।

অতি প্রাথমিক জীবগণের (Protozon) দেহ এক একটী জীব-কোষে গঠিত হইয়াছে। ঐ জীব-কোষ জীব-বস্তুতে (Protoplasm) পূর্ণ থাকে। কোষের ভিন্ন ভিন্ন অংশস্থিত জীব-বস্তু প্রায় একই প্রকার, কারণ উহার জীবনব্যাপার জটিল নহে। তবে কোন কোন স্থানের জীব-বস্তু অপর স্থানের জীব-বস্তু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবাপন্ন। এইরূপ একটী কোষের দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত তাহাকে এক-কৌষিক* জীব বলে। আর এইরূপ একাধিক জীবকোষে যে জীবদেহ গঠিত হয় তাহাকে বহু কৌষিক† জীব কহে। বহুকৌষিক জীবগণের দেহের প্রত্যেক কোষ এক-কৌষিক জীবের অনুরূপ। কিন্তু উহাদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কারণ উহাদিগের জীবনব্যাপার জটিল, এবং দেহের পৃথক পৃথক প্রদেশ পৃথক পৃথক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।‡ এক-কৌষিক জীব বহু-কৌষিক জীবে উন্নত হইতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অতি নিম্নশ্রেণীস্থ এক-কৌষিক জীব হইতে ক্রমে বহু-কৌষিক মানবদেহ পর্য্যন্ত গঠিত

---

* Unicellular.

† Multi-Cellular.

‡ Amœba and Varticella are unicellular, each being made of one cell or morphological unit. These animals therefore possess diverse parts in virtue of the specialization, or differentiation, of the protoplasm of single cells. Hydra, on the other hand, is multicellular, being made up of very numerous cells, each of which is morphologically equivalent to an Amœba. These cells, are modified in various ways, just as part of a single cell may be modified, for the performance of diverse functions.—Davis Tent, Book of Biology, pp 139-40.

হইয়াছে। কিন্তু এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কোষস্থ জীব-বস্তুর এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অংশ যেন নির্লিপ্ত ভাবে বসিয়া থাকে, সে কোন পরিবর্ত্তনেই যোগ দেয় না। সেই অংশ একাবস্থই থাকিয়া যায়। এই কোষ অথবা কোষাংশই বংশরক্ষক-কোষ (Reproductive cell)।* পরিবর্ত্তনসময়ে মূলকোষ ইহাকে পৃথকরূপে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া দেয়। বহু-কৌষিক জীবগণের দেহস্থ প্রত্যেক জীব-কোষ হইতে জাব-বস্তুর সূক্ষ্মাংশ ক্ষরিত হইয়া† একস্থানে সঞ্চিত হয়; এবং তথা হইতে যথাকালে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অপত্যরূপে বর্দ্ধিত হয়। উভয় স্থলেই বংশরক্ষক-কোষ নির্লিপ্ত ও অপরিবর্ত্তিত। জীব-দেহ, কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল কিন্তু বংশরক্ষক কোষ এক ভাবেই (Unicellular) রহিয়া গেল। বহুদেহ বহুভাবে উৎপন্ন হইল, ও চলিয়া গেল, কিন্তু বংশরক্ষক কোষকে যুগযুগান্তর হইতে মূলতঃ এক ভাবেই রাখিয়া গেল। এই জন্যই দেহকে অকিঞ্চিৎকর ও পরিবর্ত্তনশীল বলে, আর বংশরক্ষক-কোষের বাহনমাত্র বিবেচনা করা যায়। এই বংশরক্ষক-কোষ পিতৃদেহ হইতে সিঞ্চিত হইয়া পুত্ররূপে, এবং পুত্রদেহ হইতে পৌত্ররূপে, এইরূপ বংশানুক্রমে জীব-প্রবাহ স্থির রাখিতেছে। এক দেহ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একাংশ দ্বারা অপর দেহ গঠিত করিয়া যাইতেছে। এ ধারা অনন্ত।

* At an early stage * * * reproductive cells are set apart. These remain simple and undifferentiated, preserving the structural and functional traditions of the original germ-cell. These cells and the results of their division are but little implicated in the differentiation which makes the multi-cellular organism what it is. Geddest Thomson, The Evolution of Sex, pp. 261-2.

† এই গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন। Admidst all these differentiations they bear a charmed life.

এক্ষণে প্রাথমিক জীব হইতে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমজ (Protozon) শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহস্থ কোষ বিভক্ত হইয়া নূতন জীবে-দেহ গঠিত করে। একটী কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইল; ঐ বিভক্ত অংশদ্বয়ের প্রত্যেকটী আবার বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল। উহার প্রত্যেকটী আবার বিভক্ত হইল; এবং ঐ প্রত্যেক বিভক্তাংশ পুনরায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল।* সুতরাং কোনটীই মরিল না। উহার দেহ যথা সময়ে বিভক্ত হইয়া অন্য জীব-দেহ গঠিত করিল,† এইমাত্র। উহা কেবল বংশরক্ষক কোষ; উহার প্রত্যেক অংশই বংশ রক্ষা করে। ঐ কোষ বিভক্ত হইবার পর আয়তন যে পরিমাণ ক্ষুদ্র হয়, তাহা অচিরেই পূরণ হইয়া যায়। এমন স্থলে মৃত্যু কোথায়? কোন অংশই মরিল না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে। মৃত্যু তখনও জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রাথমিক জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই। তবে কেহ টিপিয়া মারিলে, কিম্বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে অবশ্যই তাহাদিগের মৃত্যু হয়। মৃত্যু তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। জীবনে ও মরণে তখনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। এক কৌষিক জীবগণের দেহ কেবল একটী বংশরক্ষক কোষ মাত্র। উহার প্রত্যেক অংশই বংশরক্ষা করে। তদ্ভিন্ন পৃথক দেহ নাই সুতরাং মরিবে কি? ক্রমে জীবদেহ যখন আরও উন্নত হইয়া উঠিল, তখন বংশবৃদ্ধির প্রণালী কিছু পরিবর্ত্তিত

* য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ। বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥ ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—৪।১।

† "The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and non-essential, destined merely to carry for a time and nourish the * * unicellular eggs"—[the egg cells and spremcells.] Ray Sankarta.

হইল। তখন জীবকোষ আর বিভক্ত হয় না; উহার কোন অংশ স্ফীত হয় এবং সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়া পৃথক জীবদেহে পরিণত হয়। মূল জীবকোষ যেমন তেমনই থাকে। এই সময় মৃত্যু জীবরাজ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে কোষ স্ফীত ও পরিত্যক্ত হইয়া নূতন জীবদেহ গঠিত করে তাহা পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া যায়।* এই অবস্থাকে মৃত্যু না বলিলেও মুমূর্ষু অবস্থা বলা যাইতে পারে। ঐ জীবন-মৃত অবস্থাতেই উহারা দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। অবশেষে উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীগণের উপর মৃত্যু একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ইহাদিগের দেহস্থ ক্ষুদ্র কোষ পরিত্যক্ত হইয়া অপর জাতীয় কোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু বংশরক্ষাকার্য্যে এতাদৃশ বলক্ষয় হয় যে, সেই সুযোগ পাইয়া মৃত্যু আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। ইহাদিগের দেহ পৃথক, বংশরক্ষক-কোষ পৃথক। সুতরাং দেহ মরে; মৃত্যু দেহকেই আশ্রয় করে। বংশরক্ষক-কোষ অমর। জীবরাজ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ শ্রেণীতে বংশরক্ষককার্য্যে এত অধিক শক্তি ব্যয়িত হয় যে উহারা অনেকেই ঐ কার্য্য অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বংশরক্ষা করিয়া উহারা আর জীবিত থাকিতে পারে না। উহাদিগের পুংজাতীয়গণের এই অবস্থা বিশেষ বিবেচ্য। আর স্ত্রীজাতীয়গণের অবস্থা বিবেচনা করিতে কর্কট শ্রেণীর কথা সহজেই মনে উদয় হয়। কর্কট স্বীয় দেহের রসাদি দ্বারা অপত্য পোষণ করিতে নিজে এতই শক্তিহীনা হইয়া যে, আর জীবিত থাকিতে পারে না। বংশবৃদ্ধি কার্য্যে পিতা

* আধুনিক কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন যে প্রাথমিক জীবেরও পুনঃ কোষবিভাগবশতঃ শক্তিহীনতা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কালক্রমে উহা আর বিভক্ত হয় না। কিন্তু এমত এখনও গৃহীত হয় নাই।

অপত্য পোষণকার্য্যে মাতার অত্যন্ত শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। মৃত্যুও সেই অবসরে জীবরাজে সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে। নতুবা পারিত কিনা সন্দেহ। যতদিন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কোষ বহুবিভক্ত হইয়া জীবরাজ্যে বংশবৃদ্ধি করিত, ততদিন মৃত্যু (স্বাভাবিক মৃত্যু) প্রবেশ করিতে পারে নাই। শেষে জীবগণ এক-কৌষিক অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নত হইয়া বহু-কৌষিক হইলে এবং উহাদিগের আবশ্যকীয় ক্রিয়াসকল দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশগত হইলে, দেহের শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। একের শ্রমাধিক্যের ক্লান্তি অন্য কোষকে আক্রমণ করিয়াছে; একের শক্তিহীনতা অন্যকে অভিভূত করিয়াছে। তাহাতেই কালক্রমে বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যু জীবরাজ্যের সহচর হইয়া উঠিয়াছে। বহুকৌষিক জীবের দেহ মরে,* কিন্তু এক-কৌষিক জীবের পৃথক দেহ না থাকায় উহার মৃত্যু নাই। যাহা হউক, বহু-কৌষিক জীবের দেহকেও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। যে দেহকে মারিল তাহাকে সম্পূর্ণ মারিতে পারিল কৈ? সে মরিবার পূর্ব্বেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপত্যরূপে রাখিয়া গেল। সুতরাং জীবপ্রবাহ এবং দেহপ্রবাহ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল। মৃত্যু বাস্তবিক জীবদেহকে কিছুই করিতে পারিল না। আর, আত্মা? সে ত পিতৃরূপে গিয়া পুত্ররূপে আগত হইল মাত্র। কেবল এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ অবলম্বন করিল মাত্র। সুতরাং এ প্রবাহ অনন্ত। মৃত্যুর এস্থলে কোনই আধিপত্য নাই।

শ্রীশশধর রায়।

* If death do not naturally occur in the Protozon, it is evident that it cannot be an inherent characteristic of living matter. Yet it is universal among the multicellular animals. Death, we may thus say, is the price paid for a body. * * * By a body [illegible] meant a complex Colony of Cells, in which there is more or [illegible] division of labour, where the component units are no longer, [illegible] the protozon, in possession of all their faculties; but through [illegible]ion of labour have only restricted functions and limited [illegible]rs of self-recuperation.—Geddes and Thomson, The evolution of Sex, p. 260.

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

রাজসাহী জেলায় মান্দা থানার এলাকায় কুসম্বিগ্রামে একটী মস্‌জিদ আছে। ইহার আকার প্রায় বাঘার মস্‌জিদের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং ইষ্টকের পরিবর্ত্তে প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। কুসম্বি মস্‌জিদের ছয়টী চূড়া এবং অভ্যন্তরভাগের ঠিক মধ্যস্থলে দুইটী থাম আছে।

কুসম্বি-মস্‌জিদ।

ইহার খিলান বাঘা-মস্‌জিদের ন্যায়; লম্বা ভাবে নয়টী এবং তের্চা ভাবে অটটী খিলান আছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক কোণে দুইটী করিয়া ছোট জানালা এবং পূর্ব্বদিকে তিনটী দ্বার বর্ত্তমান আছে। পশ্চিম-দিকে মৌলমাদিগের উপাসনার নিমিত্ত ঘন সবুজবর্ণের প্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যময় দুইটী সুন্দর বক্রাকৃতি বেদী বর্ত্তমান। মস্‌জিদটী প্রায় ৪০ হস্ত লম্বা, ৩০ হস্ত প্রস্থ এবং দেওয়াল প্রায় পৌনে পাঁচ হাত গম্ভীর। মস্‌জিদের বহির্ভাগে স্থপতিকার্য্যকুশলতার কোন নিদর্শন নাই। মধ্যম প্রবেশদ্বারে এই লিপিটী খোদিত আছে,—"মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—'যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চ্চনার নিমিত্ত পৃথিবীতে স্থান করিয়া দেন, তিনি শেষের সেই বিচারের দিনে ভগবান কর্ত্তৃক পরিতুষ্ট হন',—ভগবান তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করুন। এই মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন ক্ষমতাশালী এবং সদাশয় সম্রাট্, তিনি সাংসারিক ও পারলৌকিক কার্য্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম আবুল মোজাফ্‌ফার বাহাদুর, পিতার নাম সোলতান মহম্মদ গাজী। পরমেশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশ ও সাম্রাজ্য নিরাপদে রাখুন। তিনি গৌরবদৃপ্ত প্রভাবশালী সম্রাট ও প্রভূত সেনানীর অধীশ্বর ছিলেন। ৯০৩ হিজরীতে সোলেমনরাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

মস্‌জিদের ভিতরে পশ্চিমপার্শ্বে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বেদীর উত্তরে,

প্রথমে আরোহণোপযোগী সিঁড়িসমন্বিত একটী মঞ্চ এবং তথা হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা প্রস্তরময় দর্‌গহ' (Dorgāh) আছে। স্তম্ভগুলি প্রকাণ্ড; ছাদের উপর গুরুভার জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া সমগ্র মস্‌জিদটিকে ধরণীবক্ষে পাতিত করিবার জন্য ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতেছে। রাজসাহী জেলার এই মস্‌জিদটী অতীব প্রাচীন ও সুন্দর। মস্‌জিদের সংলগ্ন প্রায় ৭০ বিঘাব্যাপী বৃহৎ একটী পুষ্করিণী স্বচ্ছসলিল বুকে করিয়া টল্‌টল্ করিতেছে। মসজিদ ও পুষ্করিণীটী পুনঃসংস্কার হইলে ইহা একটী বেশ দর্শনীয় স্থান হয়। শুনিতে পাই, উহার কর্ত্তৃত্বভার নাকি একজন হিন্দু মোক্তারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। মোক্তার মহাশয় এদিকে যে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা মস্‌জিদ ও পুষ্করিণীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যায়।

মস্‌জিদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনশ্রুতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে;—কালিসফা (রাজসাহীর একটী পরগণা) নিবাসী চিলমন (Chilman) মজুমদার নামক এক জমাদার নিরূপিত সময়ে খাজনা দিতে না পারায় নবাব কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। আশ্বিন মাস,—বঙ্গদেশ শারদীয়া উৎসবে উন্মত্ত। এই আনন্দের সময়ে একদা রজনীতে মজুমদার, কারাগৃহে বসিয়া মনের আবেগে অতি করুণ-স্বরে গান গাহিতেছেন, তাঁহার সেই সঙ্গীতের সুমোহন স্বর-লহরী অনন্ত আকাশ-পথে বায়ুতাড়িত হইয়া নবাবের এক বেগমের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরদিবস প্রত্যুষে নবাব, বেগমের মুখে এই সঙ্গীতের বিষয় অবগত হইয়া, বন্দীকে সম্মুখে হাজির করিতে কারাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। অধ্যক্ষ, মজুমদারকে নবাবসকাশে উপস্থিত করিলে নবাব বলিলেন,—তুমি মোসলমানধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যে বেগমকে গানে বিমুগ্ধ করিয়াছ, সেই বেগমকে বিবাহ কর। মজুমদার প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ

করিলে, নবাব তাঁহার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে মজুদার জীবনরক্ষার অভিপ্রায়ে নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মোসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সোলেমন খাঁ নামধারণপূর্ব্বক বেগমকে বিবাহ করেন। তৎপরে বেগম সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলেন যে তাহাদের স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছুই নাই। ইহাতে সম্রাট তাহাদিগকে কালিগাঁ পরগণা লাখেরাজস্বরূপ প্রদান করিয়া সনন্দ দিলেন এবং একপ্রহরের মধ্যে তাঁহারা যত টাকা লইতে পারেন তাহা রাজ-কোষ হইতে লইতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে বেগম তাহার নব-স্বামী কোষাগারে প্রবেশ করিয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ লইতে সক্ষম হইলেন তাহা সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে তাহারা কুসম্বী গ্রামে উপনীত হইয়া পুরাতন বাস্তুভিটার নিকট একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং নিবিড় জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মনুষ্যের অগম্য স্থান হইয়া আছে। পরে তাঁহারা যে একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন তাহাও পূর্ব্বোক্ত-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে এই আলোচ্য মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। খাঁ, দুইটী পুষ্করিণী খনন করান; একটী হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাঁহার গুরুঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন এবং অপরটী তাঁহার বেগম সোণাবিবির নামানুযায়ী সোণাদিঘী নামকরণ করেন। সোণাবিবি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন, এই পুত্র বহুদিবস সুখেস্বচ্ছন্দে তাঁহাদের বিপুল ধনৈশ্বর্য্য ভোগ দখল করে। কিন্তু সলিমের প্রপৌত্রের রাজ্য সময় দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ লুটতরাজ দ্বারা কালীগাঁ পরগণা অধিকার করিয়া লন। পরে এই পরগণা ইংরেজরাজের হস্তগত হইলে কতিপয় জমীদার তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লন।

এই দিঘীর জল অতি পরিষ্কার। উহাতে কোন সেওলা বা জঙ্গলাদি জন্মে নাই তদ্ধেতু এবং শীতঋতুতে জলের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত

বেশী হওয়ায় লোকে অনুমান করে যে, উহার গহ্বরে ধাতু প্রোথিত আছে।”

রামপুর-বোয়ালিয়ার উত্তরে নওগাঁ মহকুমারে পশ্চিমে আত্রাই নদীর তীরে মান্দাগ্রাম অবস্থিত। এই মান্দারের প্রায় চারিমাইল দক্ষিণে কুসম্বি গ্রামে কুসম্বি-মস্‌জিদ অবস্থিত আছে*। দুঃখের বিষয় এই পুরাতন মস্‌জিদটি অতি শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। ছয়টী চূড়ার মধ্যে এখন মাত্র তিনটী অবশিষ্ট আছে, তাহাও অভগ্ন নহে। দেওয়ালগুলি খাড়া হইয়া আছে সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছে। খিলানের উপর রক্ষিত একটী প্ল্যাট্‌ফরমের উপর মস্‌জিদের ভিত্তি সংস্থাপিত; নীচের এই খিলানের ভিতর গমনাগমনের সরু রাস্তা ছিল। নানারূপ আগাছা দ্বারা এই পথ অবরুদ্ধ হইলেও পথের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। মস্‌জিদটি ভগ্নপ্রবণ হইলেও ১৮৯৭ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইতে মস্তকের তিনটী চূড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ঐ চূড়ার পতনাঘাতে দুইটী ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই ভূমিকম্পের সময় ইহার নিকটে ‘তাজিয়া’ মিশিল সমবেত হইয়াছিল। প্রস্তরের সিঁড়ি বহিয়া ‘মিম্‌বারে’ পৌঁছুছান যায়, কিন্তু তথায় যাওয়া এখন নিরাপদ নহে।

মস্‌জিদের পশ্চাৎভাগে ঘনতৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে গড়খাই, ছোট পুকুর এবং মোসলমান-ওমরাহদিগের ইষ্টক-নির্ম্মিত ২।৩টী আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

* এই স্থান হইতে ৬।৭ মাইল দূরে রাজসাহীর অন্তর্গত বাগমারা থানার অধীনেও অনেকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী, সমাধি ও দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাদারিগঞ্জ গ্রামে দুইটী এবং নমাজ গাঁয়ে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। তৎসমুদয়ের বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

মিঃ কারষ্টেয়ার্স গ্রামবাসীদিগের নিকট শুনিয়া মস্‌জিদের উৎপত্তির যে বিবরণ তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় কি না? তৎকালে মুর্শিদাবাদনগরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গৌড় নগরীর প্রাধান্যই অত্যধিক ছিল। জমীদারগণ রাজস্ব-আদায়কারী নবাবকর্ম্মচারীর বিষ-নজরে পড়িলে নানারূপে বিড়ম্বিত হইতেন, তাহাও সত্য। ইহাতে কিছুই বিস্ময়কর ব্যাপার নাই। সোণাবিবি নাম যদি সত্য হয়, তবে বোধ হয় সে বেগম ছিল না, খুব সম্ভবতঃ বেগমের দাসী হইবে। পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতিটি বোধ হয় নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বিকৃত হইয়া থাকিবে—পূর্ব্বোক্ত জমীদারটি সুন্দর গান-বাজনা করিতে পারিতেন। সোণাবিবি তাহার সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নবাবের নিকট তাহার মুক্তির মিমিত্ত এবং তাহার সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। সোণাবিবি মোসলমান রমণী এবং জমীদার হিন্দুপুরুষ, কাজেই নবাব এই বিসদৃশ্য সন্মিলন অনুমোদন করেন নাই। জমীদার ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করিলে নবাব তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষরূপে বিদায় করেন। প্রস্থানকালে রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল ধনরত্ন ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত ৩২৭ খানি গ্রামসহ কুসম্বীমৌজা জায়গীর দান করেন। বন্দী জমীদারটী যদি নবাবের কোনো বেগমকে মুগ্ধ করিতেন তবে বোধ হয় তিনি এভাবে নিষ্কৃতি পাইতেন না। কোনো নবাবই বেগমের প্রার্থনাক্রমে তাহাকে পরপুরুষের করে অর্পণ করেন না।

নীচে যে লিপিটি উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যায় যে, এই মস্‌জিদ বাঘার মসজিদ নির্ম্মাণের প্রায় ৩৫ বৎসর পর ৯৬৬ হিজরীতে (১৫৫৮-৯ খৃষ্টাব্দে), শূর আফ্‌গান পরিবারের মহাম্মদশাহ ঘাজীর পুত্র সোলতান গিয়াসউদ্দীন আবুল মজাফর বাহাদুর সাহের রাজত্বকালে সোলাইমন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

সোলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরশাহ ৯৬২ হইতে ৯৬৮ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সোলাইমন মস্‌জিদ নির্ম্মাণের উপকরণসমূহ, বিধ্বস্ত এবং অব্যবহার্য্য হিন্দুমন্দিরাদি হইতে সংগ্রহ করেন কিন্তু নূতন ও ব্যবহার্য্য মন্দিরগুলি রক্ষকল্পেও যত্ন করিয়াছিলেন।

রাজসাহির ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কুসম্বাতে যাইয়া এই মস্‌জিদ দেখেন। তিনি বলেন যে, মস্‌জিদের ভিত্তি-গাত্রে যে প্রস্তর-লিপিখানি ছিল তাহা কালপ্রভাবে স্থানচ্যুত হইয়া মস্‌জিদের মধ্যম প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ঝুলান ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানা যায় যে, ঐ শিলা-লিপিখানি খুদীমুন্সি নামক এক গ্রামবাসী লইয়া গিয়াছে, এখন উহা ঐ মুন্সির বাড়িতেই আছে।

মৌলবী আবদুলওয়ালী বলেন যে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংশাবশেষ রক্ষার নিমিত্ত এখন উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, সেই সঙ্গে এই প্রাচীন মস্‌জিদটির সংস্কার করিয়া ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করা উচিত।

উক্ত শিলা-লিপিখানির অর্থ এইরূপ,—"ভগবান সেই মহাপুরুষের প্রতি শান্তিকণা বর্ষণ করুন, যিনি বলিয়াছেন,—'যে পরমেশ্বরের সম্মানার্থে পরমেশ্বরের অর্চ্চনার নিমিত্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গে তদনুরূপ পরমেশ্বরের নির্ম্মিত আবাসস্থান প্রাপ্ত হয়।' মহাম্মদশাহ গাজীর পুত্র মহামহিমান্বিত ও সর্ব্বগুণান্বিত সোলতান গিয়াসউদ্দীন (Ghiyasu-d-Dunyawa-din) আবুল মোজাফর বাহাদুর শাহের রাজত্ব সময়ে (ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং তাঁহার মর্য্যাদাও প্রভাব বর্দ্ধিত করুন), ৯৬৩ শালে সোলাইমন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রত্যাগমন।

খোল্ মা খোল্ মা দ্বার, বহুদিন পরে
আজি এ তামস-রাতে উল্কার আলোকে
পথ চিনি, পুরাতন মাতৃগৃহে পুনঃ
ফিরিয়া এসেছি ; মোরা কোটি পুত্র তোর,
নহি মা অতিথি ; স্নেহে ডেকে নেগো ঘরে।
নাহি সুখশয্যা পর্ণগৃহে তোর ?—তাহে
ক্ষতি কি মা ? আজ ধর্ম্মদ্বেষ জাতিগর্ব্ব
ভুলি, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলি সহোদর সবে
তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি ;
নাই থাক্ সুখ শয্যা, তাহে ক্ষতি কিমা ?
অন্ন নাই ঘরে ?—তাহে দুঃখ কি মা তোর ?

মুষ্টি অন্ন যাহা আছে তাই দেগো আজ
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ
মিটাইব পূর্ণ করি প্রবল এ ক্ষুধা।
কোটি হস্তে ভরা শস্যে করিব শ্যামল
অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি।
স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দূরে মহার্ঘ বসন
ভিক্ষুকের বেশে, মাগো, এসেছি আমরা ;
খুলেদে খুলেদে দ্বার, অয়ি স্নেহময়ী।
বিদেশীবসনে আর ঘুচাতে পারি না লাজ
দেমা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড জীর্ণাঞ্চল হতে
পাইয়া মায়ের দান মিটাই বাসনা।

দীন হয়ে দীন গৃহে কাটাইব দিন
তবুও অঞ্চলে তোর অচঞ্চল হয়ে
বাঁধা রব কোটি পুত্র প্রেমের বন্ধনে ;
কে পারিবে মাতৃভক্তে বিভক্ত করিতে ?
কাঙ্গালিনী হলি, ও মা সন্তানবৎসলা,
সন্তানের অযতনে ; বঙ্গের জননী !
সদর্পে করেছি পণ কোটি কণ্ঠে মিলি
আজি হতে তোর দৈন্য স্বহস্তে ঘুচাব
সাজাব স্বদেশী পণ্যে আপন আপণ
পূর্ণ করি ; তুচ্ছ করি বিদেশী বিভব
পুত্রার্জ্জিত ধনে মার অভাব মিটাব,
আবার বসাব তোরে কমল আসনে।

ঐযে খুলিল দ্বার, মার মৌনমুখে
ঈষৎ হাসির রেখা ; হস্ত প্রসারিত
স্নেহে ; দেমা পদধুলি অধম সন্তানে।
আয় ভাই, ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
স্বার্থ করি বলিদান মার পদাম্বুজে,
তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প বঙ্গজননীরে
অর্ঘ্য করি দান ; ঘুচাই দুর্গতি ;
গগন ভরিয়া বলি "বন্দে মাতরম্,"
"বন্দে মাতরম্"—পুনঃ "বন্দে মাতরম্"।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

বর্ণচিত্র।

আমরা বহুপূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে রেখা-চিত্রের মূল সূত্রগুলির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অদ্য প্রকৃতির অনুকরণে চিত্রে কেমন করিয়া বর্ণ-বিন্যাস করিতে হয় তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের বক্তব্য কেবল 'আদর্শ' অঙ্কন লইয়া। রেখাচিত্র হইতেই হউক, কিংবা বর্ণচিত্রের আদর্শেই হউক, অথবা ফোটগ্রাফ দেখিয়াই হউক—ছবি দেখিয়া ছবি আঁকা, অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, অল্পপরিসরের মধ্যে বস্তুর আকৃতি ও তদুপরিস্থ আলোছায়া বা বর্ণবৈচিত্র্য সমস্তই সমতলের উপর নির্দ্দিষ্ট করা থাকে, একটু কর-কৌশলে-'মাছিমারা' গোছের নকল করিলেই হইল! কিন্তু পদার্থকেই আদর্শ করিয়া সমতলক্ষেত্রে তাহার চিত্র অঙ্কন করা কঠিন কাজ—শুদ্ধ সীমারেখাদ্বারা প্রতিকৃতি আঁকিতেও বিশেষ কলা-কৌশল আবশ্যক; আলো ছায়ার পাতনে আরও একটু পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়; পরে বস্তু-নিহিত নানা বর্ণের বিন্যাস করা তাহা অপেক্ষাও শক্ত; পরিশেষে কল্পনার সাহায্যে কবিত্বময় চিত্র পরিস্ফুট করা সম্পূর্ণই প্রতিভাসাপেক্ষ।

যাহা হউক, কোন পদার্থের যত অংশ প্রত্যক্ষ আলোক পায়, এবং যাহা দর্শকের চক্ষে এই আলো প্রতিফলিত করে, চিত্রে তাহা শ্বেত বা উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে; আর যে সকল অংশে পূর্ব্ববৎ সমগ্র আলোক না পড়ে তাহা ঊনাধিক ঘোরালো দেখায়, এবং তাহা ছায়ামিশ্র বর্ণে চিত্রিত করিতে হয়। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের উজ্জ্বলতা ও কৃষ্ণবর্ণের মলিনতা দ্বারাই চিত্রকরগণ উচ্চাবচ পদার্থচয়ের একটা ধাঁ-ধাঁ ফুটাইয়া তুলেন।

মনে করুন, একটি রক্তজবা কিংবা লাল গোলাপ সীমারেখায় সূচিত করা হইয়াছে, এক্ষণে রং ফলাইতে হইবে। আপনি লোহিত-বর্ণসিক্ত তুলিকায় ফুলদলগুলি উন্মীলিত করিতেছেন; তাহাতে ছবিটি একটানা রঙ্গে মোটামুটি ঠিক হইবে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না—কারণ, ছায়াপাতে দলগুলির অধোভাগ ঘোরালো হইয়া আছে, তাহা ছাড়া লক্ষ্য করিলে উপরিভাগেও আলোর সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য অনেক ধরা পড়িবে। সুতরাং লালফুল আঁকিতে অংশবিশেষে লোহিতবর্ণকে ঈষৎ বিকৃত করিয়াই লইতে হইবে, এবং অন্য বর্ণের আভাও ফলাইতে হইবে। আবার হরিদ্বর্ণের পত্রাবলি-সংবলিত পুষ্পের চিত্রে অনুরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনও আবশ্যক।

যদি একটি রং অন্য একটি রঙ্গের পার্শ্বে স্থাপিত হয়, তবে ইহা যে কেবল নিজে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে, পার্শ্বস্থিত বর্ণটিকেও পরিবর্ত্তিত করে, সুতরাং উভয় বর্ণই তাহাদিগের স্বকীয় 'রূপ' হইতে বিভিন্ন দেখায়। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, রঞ্জিত বস্তুদুটির 'আকার' পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু চক্ষুর সৃষ্টি কেবল শ্বেতবর্ণ দৃষ্টির নিমিত্তই হইয়াছে—সেই জন্য আমাদের চক্ষু, দর্শনকালে পর পর কতকগুলি 'ক্রম' অতিক্রম করে বলিয়াই বর্ণসমূহের দিকে তাকাইলে তাহারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া 'বোধ' হয়। সুতরাং আলেখ্য আদর্শের 'প্রতীয়মান' বর্ণ অনুকরণ করিলে ভুল হয়; চিত্রণের সময়ে 'আসল' বর্ণগুলি ধরিতে পারা চাই—নচেৎ তিন নকলে আসল 'খাস্তা' হইয়া যায়।

এইজন্যই একজন ফরাসী চিত্রকরের মূল মন্ত্র ছিল—'আদর্শের অনুকরণ সূক্ষ্মভাবে করিতে হইলে উহার লক্ষিতরূপ হইতে অনৈক্য করিয়াই আঁকিতে হয়।' আমরা এই প্রবন্ধে বর্ণবৈলক্ষণ্যের সাধারণ নিয়ম অনুসন্ধান করিব, এবং চিত্রে তাহার কিরূপ প্রয়োগ

করিলে বর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

রেখাঙ্কণের মত Perspective অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের উপরেই বর্ণচিত্রের ভিত্তি স্থাপিত। শুদ্ধ সীমারেখাদ্বারা বস্তুর স্বরূপ সর্ব্বদা ছবিতে পরিস্ফুট করা যায়না—উহাতে আলো ছায়ার সম্যক বিন্যাস না করিলে উহা স্পষ্ট কি অস্পষ্ট, উজ্জ্বল কি মলিন, পুরঃস্ফীত কি অনুদ্গত ইত্যাদি ছবিতে বুঝাইবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, বর্ণচিত্রে সীমারেখা পৃথক কোন রেখাপাতে সূচিত হয় না—যাহা এক বর্ণকে অন্য বর্ণ হইতে পৃথক্ করে তাহাই সীমারেখা। আলো ও ছায়া অর্থে শুধু শাদা ও কালো ধরিলেই চলিবে না—যে কোন একটি রঙ্গের মধ্যে শাদা (কিংবা জল) মিশাইয়া আলোর দিকে লওয়া যায়, আর কালো মিশাইয়া ছায়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের বর্ণেই অসংখ্য রকমের আলোছায়া ফুটান যায়। বিশুদ্ধ বর্ণের এইরূপ বিভিন্ন পরিবর্ত্তনকে আমরা 'জিল' বলিব—শাদা মিশাইয়া পাতলা হইলে বলিব জিল কমিল, আর কালো মিশাইয়া মলিন হইলে বলিব জিল গাঢ় হইল। এইজন্যই কোন শিল্পী শুধু শাদা-কালোর আলোছায়াদ্বারা, কিংবা মাত্র একটি বর্ণের লঘু ও গাঢ় জিল প্রয়োগে (যেমন ফোটগ্রাফে, অথবা কাষ্ঠ ও ধাতুফলকে খোদিত ছবিতে) পদার্থের আলেখ্য যথাবৎ অঙ্কিত করিলেও তাঁহাকে 'বর্ণ-বিশারদ' (Colourist) এই গৌরবের আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আরও একপ্রকারে বর্ণের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়। কোন বিশুদ্ধ বর্ণে অন্য এক বর্ণের 'অল্প' পরিমাণ মিশাইলে উহা আর বিশুদ্ধ বর্ণ থাকে না—যেমন নীল রঙ্গে সামান্য একটু লাল রং দিলে উহা ঠিক বেগুনি রংও হয় না, অথচ উহাকে খাঁটি নীলবর্ণও বলা যায় না—আমরা এই পরিবর্ত্তিত রঙ্গের একটি নাম দিব 'আভা'। সুতরাং

এখানে ঐ মিশ্রবর্ণকে 'নীলাভা' বলিতে পারি, অর্থাৎ মিশ্রবর্ণের যে উপাদানটি স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয় তাহাকে সেই বর্ণের "আভা" বলা যায়।

কিন্তু চিত্রকরগণ নীল, পীত, লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ ও ইহাদের দুটি দুটি বর্ণের সমপরিমাণে মিশ্রিত হরিত্, ধূমল, কপিল (কমলা) এবং ইহাদের আভা সকলকেও বিশুদ্ধ বর্ণই বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিশুদ্ধ বর্ণে কালো রং মিশাইয়া উচ্চতম জিল হইতে গাঢ়তম জিল পর্য্যন্ত যত রং সে গুলিকে 'বিভক্ত' বর্ণ বা 'ভাঙা' রং বলা গিয়া থাকে। আরও একটি কথা আছে—মূল বর্ণ তিনটি কোন বিশেষ অনুপাতে মিশাইলে কালো রং উৎপাদিত হয় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং একটুখানি নীল রং যদি পীত ও লোহিতে দেওয়া যায় তবে যে একটু কালো রং উৎপাদিত হয়, তাহাতেই কমলা রং ভাঙিয়া যাইবে। এইরূপে হরিত ও ধূমলকেও ভাঙা যায়।

আলোক হইতেই যাবতীয় রঙ্গের উৎপত্তি। আলোক দ্বিবিধ, প্রাকৃত ও কৃত্রিম। প্রাকৃত আলোক সূর্য্যদেব রৌদ্রাকারে প্রদান করেন, উহা শাদা। জ্বলন্ত পদার্থ হইতে কৃত্রিম আলোক পাওয়া যায়, উহা সচরাচর রঙ্গিল। আলোক আবার দুই প্রকারে পদার্থ সমূহে পতিত হয়। রৌদ্র যদি সাক্ষাৎভাবে পড়ে তবে তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' আলো, আর যদি ছড়াইয়া পড়িয়া পদার্থ সকলকে তাহাদের স্বকীয় বর্ণে উদ্ভাসিত করে তবে তাহাকে 'ব্যাপ্ত' আলোক বলে।

আমরা সকলেই জানি এই ব্যাপ্ত দিবালোক সর্ব্বদা শুভ্র নহে—আবহের অবস্থা পরিবর্ত্তন, মেঘের উদয় অনুদয় প্রভৃতি কারণে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ আভা, প্রভাতের অনীল মলিনতা, চৈত্রের ধূলি-ধূসরতা প্রভৃতি নানারূপে ব্যাপ্ত দিবালোক আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়।

সূর্য্যালোক ত্রিকোণ কাচ ফলকের দ্বারা বিশ্লেষিত হইলে যে সকল বর্ণ উৎপাদন করে তাহাই বিশুদ্ধ বর্ণের আদর্শ। রামধনুর বর্ণও বিশুদ্ধ। সে গুলি প্রধানতঃ ক্রমান্বয়ে এই—

লোহিত কমলা পীত হরিত নীল ধূমল।

এই বিশ্লেষিত বর্ণগুলির সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন, কারণ ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া নানা আভা উৎপাদন করে। অনেকে রামধনুতে সাতটি বর্ণ ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ নীল ও ধূমলের মধ্যে মহানীল (indigo) বর্ণও পৃথক্ গণনা করেন। যাহা হউক, যেমন একটি প্রদেশের ভাষা ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ভাষায় পরিণত হয়, যেমন বৎসরের একটি ঋতু দাগ না কাটিয়া, তারিখ না আঁটিয়া আর একটি ঋতুতে আস্তে আস্তে বেমালুম মিলিয়া যায়, তেমনি এই বর্ণশ্রেণীর এমন একটি স্থান আছে যেখান হইতে 'খাঁটি' লাল আরম্ভ হইয়া ক্রমে পীতে যাইতে যাইতে মধ্যপথে 'খাঁটি' কমলার রঙ্গে, পরে ধীরে ধীরে 'খাঁটি' পীতে পরিণত হয়। পীত আবার ক্রমে সবুজ হইতে হইতে মাঝখানে 'খাঁটি' সবুজ হইয়া পরে আস্তে আস্তে 'খাঁটি' নীলে যায়—শেষে এই নীলের পরে লালের দেখা হওয়াতে ক্রমশঃ নানা ধূমলাভা হইয়া মিলাইয়া যায়।

শাস্ত্রমতে ধরিতে গেলে, উপযুক্ত পরিমাণে নীল, পীত, লোহিতের মিশ্রণে সাদা আলো হয়। এই তিনটি বর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মিশানও যে কথা, দুইটির মিশ্রিত বর্ণে তৃতীয়টির মিশ্রণও তাই। যদি লাল, সবুজের সঙ্গে মিশাই তবেও যে ফল, নীল ও পীতের সহিত মিশাইলেও সেই ফল; কেননা, সবুজ যে নীল ও পীতের মিশ্রণেই উৎপন্ন। যে রং অন্য রঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া শাদা আলো উৎপাদন করা যায়

তাহাদিগকে পরস্পর অনুপূরক বর্ণ বলে। সুতরাং লোহিত ও হরিত, নীল ও কপিল, পীত ও ধূমল পরস্পর অনুপূরক।*

পরস্পর অনুপূরক বর্ণগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একখানি শাদা কাগজ টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছে। ঘরের দুটি জানালা পরস্পর সম্মুখীন ভাবে খোলা আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যাপ্ত দিবালোক আসিতেছে; এখন একখানি রঙ্গিল কাচ এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে তাহার ভিতর দিয়া রঙ্গিল আলো কাগজখানির উপর প্রতিফলিত হইতে পারে। তার পরে এক টুকরা কাঠ কাগজের উপরে রঙ্গিল কাচের কাছে রাখিলে কাগজের উপরে যে ছায়া পড়িবে তাহা কি কালো দেখাইবে? না; যে রঙ্গের কাচ দিবে তাহার অনুপূরক রঙ্গের ছায়াই পড়িবে—অর্থাৎ লাল কাচ দিলে সবুজ ছায়া, নীল কাচ দিলে কমলা-রঙ্গের ছায়া, সবুজ কাচ দিলে লাল ছায়া হইবে।

কাচের কলমে বিশ্লেষিত বর্ণসকল পুনর্ব্বার স্থূলমধ্য কাচপুটক (lens) দ্বারা একত্রীভূত করিলে শাদা আলোক হয়, কিন্তু নীল, পীত, লোহিত বর্ণের উপাদান একত্র করিলে কখনও শুভ্র বর্ণ হয় না; খুব ঠিক অনুপাতে মিশাইলেও নয়—তাহা কৃষ্ণ বা ধূসর হইয়া উঠে। মূল বর্ণের দ্রব্য মিশ্রণে যে বর্ণক হয়, (pigment) তাহা তত বিশুদ্ধ হয় না। স্বভাবজাতই এমন অনেক বর্ণক পাওয়া যায়, অথবা নানা কৃত্রিম এমন অনেক বর্ণক প্রস্তুত হইতে পারে যাহাদের বিশুদ্ধি পূর্ব্বোক্ত বর্ণক অপেক্ষা অধিক। চিত্রকরগণ প্রায় সমস্ত বর্ণকই স্বয়ং মিশাইয়া প্রস্তুত না করিয়া বর্ণব্যবসায়ীর কাছে ক্রয় করিয়া থাকেন। যাহা হউক, নিজে মিশাইয়া বর্ণক প্রস্তুত করা সম্বন্ধে

* মনে রাখিবার নিমিত্ত পরস্পর অনুপূরক বর্ণ গুলির যথাক্রমে হরিলাল, নীলকমল, তেলে-বেগুণে বা হলুদবেগুণ, অথবা এইরূপ অন্য এক একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে।

একটি কথা বলিয়া রাখি। মনে করুন, বিশুদ্ধ সবুজের আবশ্যক, তজ্জন্য নীল ও পীত একত্র মিশাইতে হইবে। এখন নীলাভ পীত এবং পীতাভ নীল লইলেই ভাল ফল পাওয়া যাইবে; নীল কি পীতের সঙ্গে লাল আভা থাকিলে একটু ধূসর উৎপাদিত হইয়া সবুজ খারাপ হইয়া যাইবে। এইরূপ কমলা রং প্রস্তুত করিতে লাল ও হলুদের মধ্যে নীলের আভা না থাকে, এবং ধূমল প্রস্তুত করিতে লাল নীলের মধ্যে যেন পীতের আভা না থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কেন দৃষ্ট হয় তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পাতাটি কেন সবুজ, ফুলটি কেন লাল, চুলগাছি কেন কালো কে বলিবে? বৈজ্ঞানিক বলেন যে, দ্রব্য সকল কতকগুলি রঙ্গের আভা গ্রহণ করে অর্থাৎ ব্লটিং কাগজের মত চুষিয়া লয়—চাই কি হজম করিয়াই ফেলে, আর কতকগুলি রং প্রতিফলিত করে বা ফিরাইয়া দেয়। এই গৃহীত বর্ণ সর্ব্বদাই প্রতিফলিত বর্ণের অনুপূরক। যথা—

প্রতিফলিত বর্ণ ...	লোহিত ...	পীত ...	নীল
গৃহীত বর্ণ ...	নীল + পীত	লাল + নীল	পীত + লোহিত

প্রতিফলিত বর্ণ ...	সবুজ	ধূমল	কমলা
গৃহীত বর্ণ ...	লাল	পীত	নাল

সমস্ত বস্তু হইতেই রঙ্গিল আলোক ছাড়া শাদা আলোকও প্রতিফলিত হয়। পদার্থের আকৃতি, উজ্জ্বলতা বা মসৃণতা অনুসারে এই শ্বেত আলোকের তারতম্য হইয়া থাকে। অমসৃণ শাদা বস্তু হইতে, তদুপরি পতিত আলোকে যত রং যে পরিমাণে আছে তত রং সেই পরিমাণেই প্রতিফলিত হয়, আর কালো বস্তু তত রং সেই পরিমাণেই

গ্রহণ করে। তবে কালো দেখা যায় কেমন করিয়া? উহা হইতে শাদা আলো কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসে বলিয়াই উহা আমরা দেখিতে পারি।

বর্ণ-বৈলক্ষণ্য ত্রিবিধ। (১) নানা বর্ণের বস্তুসকল একই সময়ে দেখিলে তাহাদের রং ও জিল পরিবর্ত্তিত হয়। (২) আবার কোন বর্ণের এক বা একাধিক বস্তুর দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইলে ঐ সকল বস্তুর যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তাহার রং বস্তু-নিহিত বর্ণের অনুপূরক। (৩) কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া অন্য একটি বর্ণের বস্তু দেখিলে অনুপূরক বর্ণটির ঝোঁক থাকিবেই, তৎসঙ্গে নূতন বস্তুটির রঙ্গও দেখা যাইবে।

এই সকল বৈলক্ষণ্য কেন লক্ষিত হয়? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের চক্ষু কেবল শুভ্র আলোক দেখিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই জন্য যখন কোন উজ্জ্বল রঙ্গিল আলো চোখে পড়ে, তখন চক্ষের আর এমন একটি আলোর কথা 'মনে' পড়ে, যাহা সেই আলোর সঙ্গে মিশিলে শ্বেত আলোক উৎপন্ন করিতে সক্ষম। এই দ্বিতীয় 'স্মৃত' আলোক সর্ব্বদাই প্রথমটির অনুপূরক।

একটি লাল গোলাপ দেখিতেছি; চক্ষু অবিলম্বে সবুজ দেখিতে উৎসুক হইল, এবং বাস্তবিকই সবুজকে 'স্মরণ' করিতেছে; এখন একখানি শাদা কাগজের দিকে তাকাইলেই লাল ফুলটির বদলে উহার মৃদু সবুজ ছায়া দেখা যাইবে। ইহাই অনুক্রমে পরিবর্ত্তন। আচ্ছা; লাল গোলাপটির পানে একটু বেসিক্ষণ চাহিয়া থাকি ত। বাঃ! গোলাপটির রং যে একটু ধূসর হইল। তা হবেই ত, কারণ 'স্মৃত' সবুজের যোগেই লাল ম্লান হইয়াছে। ইহাই সমসাময়িক পরিবর্ত্তন। এখন পীতবর্ণের নিকটে লাল ফুলটি রাখিয়া দেখা যাক কি হয়,—আগেকার মত সবুজ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হলুদকে একটু

সবুজ আভা বিশিষ্ট করিয়া দিল। বেস, এখন আগে পীতবর্ণ ই দেখি পরে লাল দেখিব। হলুদের অনুপূরক হচ্ছে বেগুণ, তাহা লালে মিলে নীল হইয়া গেল—অর্থাৎ পীত লোহিতের কাছে নীলের অনুপস্থিতি দেখিয়া তাহারই চেহারা চোখে পড়িল! ইহাই মিশ্র বৈলক্ষণ্যের দৃষ্টান্ত।

এই জন্যই কোন চিত্রকর যদি উজ্জ্বল লাল রঙ্গের পরিচ্ছদ চিত্রণে নিযুক্ত থাকেন, তবে এক ঘেয়ে দৃষ্টিতে চক্ষু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে তাঁহার বাঞ্ছিত বিশুদ্ধ বর্ণ অনায়ত্ত হইয়া উঠে। আবার সবুজ বর্ণের প্রতি খানিক দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া হইলে উহা আয়ত্ত হয়।

কোন বস্তুর 'জিলে'র পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে হইবে। জিলের ন্যূনাধিক্য হইলে, সন্নিহিত দুইটি পদার্থের উজ্জ্বল অংশ উজ্জ্বলতর ও ঘোরালো অংশ আরও ঘোরালো হয়। এইরূপ জিলের বৈলক্ষণ্য রঙ্গিল পদার্থের মত ধূসর বর্ণের পদার্থেও দেখা যায়। দুইটি রঙ্গিল পদার্থ পাশাপাশি থাকিলে এবং তাহাদের জিল বিসদৃশ হইলে, পদার্থদ্বয়ের রং যতদূর সম্ভব ভিন্ন হইয়া গিয়া এই বৈসাদৃশ্য বাড়িয়া যায়।

অতএব চিত্রকর কেবল পাশাপাশি স্থাপনের দ্বারা দুই রঙ্গের গুণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। তিনি উভয়েরই গুরুত্ব বাড়াইতে, অথবা একটিকে জব্দ করিয়া অন্যটির গৌরব বাড়াইতে পারেন। যেখানে আদর্শের বর্ণসকলের মধ্যে কোন সুখজনক সামঞ্জস্য না থাকে, সেখানে চিত্রকর নিজের ইচ্ছামত, ব্যবহার্য্য বর্ণসমূহকে আদর্শ-নিহিত রঙ্গের সহিত সঙ্গত করিয়া সন্তোষদায়ক ফল পাইতে পারেন।

এক্ষণে, শ্বেত কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের সঙ্গে কোন্ কোন্ বর্ণের সামঞ্জস্য হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। কোন রঙ্গিল বস্তুর পাশে শাদা রং রাখিলে সেই রং সবল ও উজ্জ্বল হয়, পরন্তু উহার অনুপূরক মনো-

মধ্যে উদিত হইয়া শ্বেত বর্ণের সহিত যুক্ত হয় এবং উহাকে ঈষৎ রঙ্গিল করিয়া দেয়। শাদা ও কালো পরস্পর অনুপূরক; সেইজন্য এই দুই বর্ণ দূরে দূরে থাকিলে যতটা বিভিন্ন বোধ হয়, কাছাকাছি থাকিলে তদপেক্ষা অধিক বোধ হয়। কারণ, সকল বস্তু হইতেই রঙ্গিল-আলো ও শাদা-আলো উভয়ই প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত শ্বেতবর্ণের সান্নিধ্যে রঙ্গিল পদার্থ হইতে প্রতিফলিত শাদা রঙ্গের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়।

কোন রঙ্গিল বস্তুর কাছে কালো থাকিলে কালো হইতে প্রতিফলিত শাদা, কালোর সন্নিহিত বর্ণের অনুপূরক গ্রহণ করে। যদি গভীর বর্ণ স্থাপিত হয় তবে কমলা বা হলুদের মত উজ্জ্বল অনুপূরক উৎপন্ন হইয়া কালোকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কিন্তু বেগুনি বা সবুজের মত গভীর অনুপূরক কৃষ্ণবর্ণকে সবল ও বিশুদ্ধ করে। যদি সবুজ রং কালোর কাছে থাকে তবে 'লাল' অনুপূরক উদিত হইয়া কালোকে লোহার মরিচার মত করিয়া তুলে। কালোর কাছে যে রংই থাকুক তাহা নীচু দেখাইবে; কেবল কমলা, হলুদ ও ধূমল বর্ণের সঙ্গেই কালোর ভাল মিল পড়ে।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নীলদেহে পীত বসন, শ্রীরাধিকার স্বর্ণাঙ্গে নীল বসন ও অন্যান্য দেব-দেবীর শরীরে যে সকল পরিচ্ছদ কল্পিত হইয়াছে তাহা বর্ণ বৈলক্ষণ্য ও অনুপূরক বর্ণোদয় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। তবে পটে ও প্রতিমায় সাধারণতঃ ঐ সকল বর্ণের যে 'চিত্তির' প্রকটিত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র। আর, সংস্কৃতের কৃষ্ণ, নীল, পাটল পিঙ্গলাদি বর্ণের উপমা দেখিয়া আদর্শ বর্ণ ঠিক করাও কঠিন বটে। মূল বর্ণগুলি ধূসরের নিকটে থাকিলে তাহাদের উজ্জ্বলতা ও বিশুদ্ধতা বাড়ে। নীল ও ধূমলের মত গভীর রং ও জিল ধূসরের কাছে থাকিলে সান্নিধ্য-সামঞ্জস্য হয়; আর, লাল,

কমলা, হলুদ এবং সবুজের পাতলা জিলও ধূসরের পাশে থাকিলে বৈলক্ষণ্য-সামঞ্জস্য হয়।

পরিশেষে বক্তব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সাবধানে একত্রীভূত করিয়া সমগ্র আলেখ্যখানির উন্মীলন করিতে হয়—তা বর্ণবিন্যাসের বেলাই হউক, অথবা অঙ্কনের রেখাপাতের সময়েই হউক। অংশগুলি পৃথকভাবে যতই সুন্দর হোক না কেন, যেমনই ঠিকঠাক হোক না কেন, ন্যূনাধিক্য বা বৈলক্ষণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সামঞ্জস্য না করিলে প্রকৃত 'ছবি' হয় না। অনেক চিত্রকর যে কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন না, তাঁহাদের ছবির অংশ গুলি যে ফোটগ্রাফের দলবদ্ধ চেহারার মত সকলটিই প্রধান হইতে চাহে, তাহার কারণ এই একত্রীকরণ নৈপুণ্যের অভাব! যেমন লিখিতে শিখিলেই 'লেখক' হওয়া যায় না, তেমনি আঁকিতে জানিলেই 'চিত্রকর' হওয়াও সকলের ভাগে ঘটে না। ফলতঃ রচনায় কবিত্ব ও চিত্রে 'ছবিত্ব' ফুটান একই প্রকারের জিনিস।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

বঙ্গনারীর রাখীবন্ধন।

অনুপমা আর্য্যবামা করহ স্মরণ!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমনে জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন!
ব্রতশীলা আর্য্যবালা আছিল কেমন!
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
ফেরে, শুনে আর্য্য-সতী
করেছিল পুরদ্বারে অর্গল যোজন
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!
সে দিন স্মরণ করে,
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে,
ঘরে পরে সমাদরে করহ প্রেরণ
সুপবিত্র স্নেহসূত্র—রাখীর বন্ধন।
ভোল হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্রমূলে বিরাট জীবন
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রাখীবন্ধন।

স্বর্গ হ'তে দেবগণ, পুষ্প বৃষ্টি কর।
প্রতিগৃহে বঙ্গনারী হুলুশঙ্খ ধর।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এ কলঙ্ক লেখা,
বঙ্গের ললাটে আর নাহি যাবে দেখা।
হিন্দু মুসলমান কিম্বা স্বদেশী খৃষ্টান,
পূর্ব্ব কি উত্তরবাসী নাহি ব্যবধান,
সব ভাই, এক ঠাঁই এক মন প্রাণ,
সমস্বরে বঙ্গবাসী গায় এক গান।
ঘরে ঘরে কোলাকুলি গলা-গলি আজ,
মাতৃদত্ত উত্তরীয় মোটা শুভ্র সাজ।
জন্মভূমী জননীর আশীর্ব্বাদ লয়ে,
সগৌরবে দাঁড়ায়েছে সবে এক হ'য়ে।
নবপ্রাণে সঞ্জীবিত বঙ্গবাসীগণ,
দেখ সবে, করে আজ এ রাখীবন্ধন।

ঘরের কথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রেলওয়ে আফিষে রাজচন্দ্রের প্রায় পনর বৎসরের কিছু উপর কর্ম্ম করা হইল; বড় বাবুর দাস্যবৃত্তি করিয়া যে রাজচন্দ্রের প্রথম চাকরী হয়, সেই রাজচন্দ্রের চেষ্টা ও অনুরোধে এক্ষণে অনেক গুলি লোক ঐ আফিস হইতে নিজ নিজ অন্ন উপায় করিতেছে। উচ্চপদ, সচ্ছল উপার্জ্জন এবং সর্ব্বত্র সম্ভ্রম সত্ত্বেও রাজচন্দ্রের পূর্ব্ব-স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই নম্রতা, সেই সকলের সঙ্গে সখ্য, সেই পরের কাজে ধাওয়া-ধায়ি, সেই পরের অভাবে মুক্তহস্ত। পঞ্চান্ন পার হওয়ায় চাটুয্যেমহাশয় তিনবার সাহেবের নিকট হইতে কর্ম্ম পরিহার করিবার জ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনবারই রাজচন্দ্রের উপরোধে সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যান। কিন্তু রাজচন্দ্রের দ্বারা চাটুয্যেমহাশয় যতই অধিক পরিমাণে উপকৃত হইতে লাগিলেন, ততই যেন বেচারীর উপর ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে, রাজচন্দ্রের মুখ দেখিলেই বাধ্যবাধ্যকতার কথা স্মরণ হইয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত ও তিনি মুখ ফিরাইয়া লইতেন। চল্লিশ বৎসরের রাজচন্দ্রের পরমায়ুর আধিক্য দেখিয়া ষষ্ঠি-অতিক্রান্ত ষষ্ঠীর-দাস চাটুয্যেমহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। এজন্য চাটুয্যেকে বিশেষ দোষী করা যায় না, কারণ হস্তী যেমন আপনার আয়তন দেখিতে পায় না মনুষ্যও তেমনি নিজের বয়সের পরিমাণ দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মণ ভ্রমেও ভাবিতেন না যে তাঁহার ইহসংসারের মিয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে। একবার কর্ম্মত্যাগের বিজ্ঞাপন পাইয়া তিনি রাজচন্দ্রের

আশ্রয় লইতে তাহার বাটীতে যান এবং তাহার পুত্রকে আদর করিয়া বলেন যে "লুটুবাবু, তোমার বাপ হতে তো কিছু হলো না তুমি বাবা বড় হয়ে যখন তোমার বাপের কর্ম্মে বাহাল হবে তখন যেন এ বুড়োকে ভুলো না।" রাজু যদি সিয়ালদহ হইতে বদলী হইয়া অন্যত্র যায় বা অপর কোন আফিষে কর্ম্ম হয়, তাহাতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার দু' এক টাকা বেতনও বৃদ্ধি হয় তাহাও চাটুয্যে ম'শায় কষ্টেশ্রেষ্টে সহ্য করিতে পারেন; কিন্তু নিত্য উপকারী ও উপকৃতের একস্থানে এক সঙ্গে অবস্থিতি, সতত পরস্পরের সন্দর্শন, উপকৃতের পক্ষে ইহা একেবারে অসহনীয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। রাজচন্দ্র, চাটুয্যের সঙ্গে কখনও মুরুব্বিয়ানা করিত না, কখনও তাহাকে কোনরূপে অসম্মান করিত না বরং যথারীতি ধীর নম্র ব্যবহার করিত; কিন্তু ব্রাহ্মণ সেই বিনম্র সম্ভাষণ, ভদ্র ভাবকে শ্লেষ বলিয়া মনে করিতেন। একটা কথা বলা হয় নাই। যে বড়বাবুর অনুগ্রহে রাজচন্দ্রের চাকরী হয় তিনি আর আফিষের বড় বাবু নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল, একদিন ফাল্গুন মাসের শেষে তিনি আফিষের হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া বাসন্তী-বায়ু-বিতাড়িত ধূলিকণা সেবনে প্রাণ পুলকিত ও মিউনিসিপ্যাল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে বাটী প্রত্যাগত হইলে পর, মুসম্মৎ ওলাবিবি আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিল যে কেরাণীজনক শ্রীযুক্ত চিত্রচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার হিসাব নিকাশ চুকাইবার জন্য মসীসিক্ত লেখনী হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে তথায় যাইতে হইবে। বড়বাবু বাঙ্গালী চরিত্রগত দীর্ঘসূত্রতাবশতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ব্যস্ত হইয়া একজন বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন; বাবুটি গুপ্তমহাশয়ের ষ্ট্যাবলিস্-মেণ্ট-খাতাভুক্ত, এখানকার পরিচয় ডাক্তার। ভদ্রলোকটী বড়বাবুকে গুপ্ত-আফিষে পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ওলাবিবির কৃপায় বাবুর অন্তঃস্থল অনবরত পরিষ্কার হইতেছিল। ডাক্তার বাবু খড়ীমাটী* গুলিয়া তথায় চুনকামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিজের পকেটস্থ শিঙ্গা দেখাইয়া তাহা ফুঁকিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুষার ঢালিয়া মস্তকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা করিয়া দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাহাতেও বড়বাবু গোঁ গোঁ করেন, তখন তিনি একমোহর কুলমর্য্যাদা দিয়া একজন শ্বেতপুরুষকে আনাইলেন, ইনি চিত্রগুপ্তের সূর্য্যবংশাবতংশ প্রভু প্রবরের জ্ঞাতি। পুরুষবর আসিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই বড়বাবু, তাড়াতাড়ি একটা বেলেস্তারার ওয়েষ্ট-কোট গায়ে দিয়া দুর্গা-শ্রীহরি করিলেন। সাহেবের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বাড়ীতে হরি-বোলের তরঙ্গ উঠিল। কয়েকটা কামিনী কি জানি কি বুঝিয়া চিৎকার করায় সাহেব তাহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিয়া বীরপদভরে রথারোহণ করিলেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে তিনি যে কাল আর উহাদের বাড়ী কুলমর্য্যাদা লইতে আসিবেননা এই শোকে উহারা রোদন করিতেছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

* Chalk mixture.

সমসাময়িক ভারত

ও

জাতীয় আন্দোলন *

(এনেষ্ট পিরিউ প্রণীত)

ভূমিকা।

অ্যামষ্টার্‌ডামের "সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্জাতীয় কংগ্রেস-সভার" বহুদেশ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমবেত হয়। সেই সভায়, পাশাপাশি-উপবিষ্ট রুশ্‌ ও জাপানীরা, প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করিয়াছিল—একজন খর্ব্বকায় বৃদ্ধ, তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম আকর্ষণ করে নাই। মুখবর্ণ শ্যামল, খাঁটি বিদেশী সুন্দর পলিত কেশ। তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কিরূপ বিদ্বেষী, তাহা তিনি বিদ্যুৎ-স্ফূরিত ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ;—"ভারতবাসীদিগকে, সরকারী কাজ কর্ম্মে একটী সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, নিয়মের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে সামান্য মজুরের অবস্থায়—কুলির অবস্থায় পরিণত কর হইয়াছে !" এই খর্ব্বকায় বৃদ্ধের অদ্ভুত বিদেশী নাম :—দাদাভা নৌরোজি। তিনি বম্বে হইতে আসিয়াছেন। যাহাদের মৃতদেহ "নিঃশব্দতার মন্দির"-চূড়ায় নিক্ষিপ্ত ও গৃধ্রগণ-কর্তৃক কবলিত হই থাকে—তিনি সেই অগ্নি-উপাসক পার্শি জাতির অন্তর্ভুক্ত। ই

---

* L'Inde contemporaine
et
C movement national—Enest Pirion.

ারতবর্ষের "জাতীয়"-দল-প্রেরিত প্রতিনিধি। এইরূপে, "লিয়াও-ইয়াং"-দ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে,—সকলের চিত্ত বিচলিত করিয়া, ভারতবর্ষ জগতের রাষ্ট্রিক রঙ্গভূমে অতর্কিতভাবে প্রবেশ লাভ করে।

হিন্দুস্থান !—প্রাচ্য ভূপ্রান্তের একটি প্রায়দ্বীপ। এই দেশের সম্বন্ধে, রোপ অনেকবার অনেক চিন্তা-আলোচনা করিয়াছে। যে দেশ ৪০ ৎসর পূর্ব্বে অবরুদ্ধ ছিল, রহস্যতিমিরে আবৃত ছিল—হঠাৎ এক সময়ে ক্তদ্বার হইল, রূপান্তরিত হইল ; রিউস-নদীর উপর, কোন সুপ্রভাতে ঠাৎ যেমন একটি সেতু স্থাপিত হয় (পৌরাণিক কথা) সেইরূপ বিশ্বকর্ম্মার ঐন্দ্রজালিক বিরাট কারখানা হইতে সদ্য বাহির হইয়া ভারত মস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিনের পর, এসিয়ার এই ভূখণ্ড একটু যেন "গাঁজিতে" আরম্ভ হইয়াছে! এতদিন, যে অসংখ্য লোকপুঞ্জ, গঠনহীন একটা বিশাল পিণ্ডাকারে অবস্থিতি করিতেছিল, —অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া, এখন উহা আপনাকে অল্পে অল্পে গড়িয়া তুলিতেছে,—সজীব করিয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষকে জানিবার জন্য, বেশির-ভাগ কতকগুলি পর্য্যটক ও পণ্ডিতেরই ঔৎসুক্য হইয়া থাকে। যখন ভারতের অভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যায়,—যখন শুনা যায়, যাত্রাপথে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য অনাহারে মরিতেছে—তখনই এক একবার, মুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে ; (তাই, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়—অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হয়) কিন্তু তাহার পর, ভারতের কথা আর কেহ মনেও করেনা। আজ বলিয়া নয়—কাল বলিয়া নয়—চিরকালই ভারতের ধন শোষিত হইয়া আসিতেছে। এই রহস্যময় স্বপ্নদর্শী ভারতীয় জনপুঞ্জ মনে করে—ইহাই তাহাদের অদৃষ্ট-লিখন, এবং এই মনে করিয়াই তাহারা অদৃষ্টের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। এক প্রভুর পর আর এক প্রভু আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে ; এই সাময়িক প্রভুদের প্রতি,

ভারতের সাধারণ প্রজাপুঞ্জ, সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ভারতের দেহ মায়াবাদে নাস্তিত্ববাদে জর্জ্জরিত হইলেও, উহারই মধ্য হইতে, ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত নব্যবংশীয়েরা, গভীর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া, ইংরাজের উৎসবে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই নব্যভারত বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন বর্ণকে, আপনার দিকে আহ্বান করিতেছে—হিন্দু, পার্শি, মুসলমান। এই নব্যভারতের সংবাদপত্রাদি আছে, কংগ্রেস আছে, সভাসমিতি আছে, বক্তা আছে, নেতা আছে। উহাদের এইমাত্র দাবি,—যে পর্য্যন্ত না ইংরাজেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে, "ভারতবাসীর জন্যই ভারত", তাবৎ উহাদের রাজ-পরিষদে অন্ততঃ ভারতবাসীর জন্য যেন একটা আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহারা এই কথা বলে, তাহারা একটি ক্ষুদ্র দল। ক্ষুদ্র দল?—সংখ্যায় ক্ষুদ্র হইলেও, জ্ঞানদীপ্ত ও বিলক্ষণ প্রভাবশালী। এখন যে জাপানকে দেখিতেছ—ইহা ত ৩০ বৎসরের মধ্যে (রাষ্ট্রিক জীবনের পক্ষে নিতান্ত স্বল্পকাল) সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অজ্ঞাতসারে ও বিনা-অনুমোদনে, শুধু কতকগুলি লেখক ও রাজমন্ত্রির দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। বর্ণভেদপ্রথার জননী ভারতভূমিতে আজকাল যে জাতীয়ভাবের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা অভিনব হইলেও অপ্রত্যাশিত নহে। অধুনা ভারতে যে কেন্দ্রগত-শাসন-প্রথা দৃষ্ট হয়, উহা নবপ্রবর্ত্তিত;—পূর্ব্বে উহা ছিল না। ভারতের পূর্ব্বাবস্থা একবার কল্পনা করিয়া দেখ:—শৃঙ্খলা-রহিত, সংমিশ্রিত, গঠনহীন, কোলাহলময় মানব-জনতা;—স্বতন্ত্র-শাসিত গড়বন্দি গ্রামসমূহ;—যাহারা কেবল রাজস্বগ্রাহী রাজপুরুষের দ্বারাই তাহাদের দূরবর্ত্তী রাজাকে জানিত; সে সময়ে ভারতের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে কি মোগল-শাসন, কি পূর্ব্ববর্ত্তী বিদেশীয়দিগের আক্রমণ—কোন-কিছুই উহাকে সমগ্রভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অধুনা, দেশের একটা কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, একজন প্রভু হইয়াছে, সমস্ত দেশ এক-শাসনের

ধীন হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও লৌহবর্ত্ম, পত্রতরণ-কার্য্যালয়, তাড়িৎবার্ত্তাবহ প্রভৃতি,—এই সকল জীবনের ভিনব সৌকর্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া, অনিবার্য্য একতার নিত্য-সহায় ও হকারী হইয়াছে। তখন ভারতের লোক, গ্রামের ভিটাতেই বদ্ধ থাকিয়া, র্গের মধ্যে অবস্থিত হইয়াই জন্মাইত, বাঁচিত, মরিত; গ্রামই তাহাদের ক্ষুদ্র স্বদেশ ছিল; এক্ষণে উহারা অপেক্ষাকৃত একটি বিস্তৃত মাজের আভাস পাইয়াছে; তাহারই অঙ্গীভূত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিতেছে, এবং তাহার সহিত,—ইচ্ছাক্রমে হউক বা অনিচ্ছাক্রমে হউক—আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে বিদ্যুৎ-তার-যোগে, সংবাদাদি চারিদিকে দ্রুত পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে তাহারা জানিতেছে,—স্বকীয় গ্রামের বাহিরেও ভারতবর্ষ আছে; এমন কি, ভারতের বাহিরেও এশিয়া আছে।

আমি এ কথা বলিতেছিনা, ভারতের ইতরসাধারণের মনে, জাতীয় একতার ভাব স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস, দেশের ভিতরে ভিতরে এই ভাবটি অন্তঃসলিলে বহমান। যদি কোন দিন, সেই প্রচ্ছন্ন স্রোতের মুখে, একটি কূপ-খননের নলযন্ত্র মাটির মধ্যে নিহিত করা যায়, তাহা হইলে সেই স্রোতের জল, মূল-প্রস্রবণ হইতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উপরে উঠে। যাহাই হোক, এখানে একটি সুগঠিত জাতীয় দল প্রস্তুত হইয়াছে; সেই জাতীয় দলের একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যানুক্রমণিকাও আছে; তাহারা কি চাহিতেছে—তাহারা বেশ জানে। অনেকে বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও একথা নিশ্চিত, তাহাদের প্রভাব কলিকাতা ও লণ্ডনে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে, এই কংগ্রেস-দলের বাগ্মী-বক্তৃতা আমি শুনিয়াছিলাম। সেই সময়েই এই গ্রন্থ লিখিবার কল্প-

আমার মনে প্রথম উদয় হয়। এই গ্রন্থখানি শুধু যে আমার পুস্তক-পাঠের ফল তাহা নহে; পরন্তু, মূল-প্রস্রবণ হইতে, সাক্ষাৎভাবে সংগৃহীত তথ্য হইতে আমার মনে যে সকল সংস্কার উৎপন্ন হয়—ইহা তাহারও ফল।

হাঁ, আমি সাহসপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি, দেশীয় লোকের মতামতের প্রতি আমি কর্ণপাত করিয়াছিলাম! অত্রত্য ইংরাজদিগের মতামত একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত। আমরা যে ভাবে বুঝি তাহারা সে ভাবে বুঝে না; তাহারা অন্যরূপ বুঝে।

যেরূপ উদ্ধত অবজ্ঞার সহিত ইংরাজেরা "নেটিভের" মতামত গ্রহণ করে, তাহা আমার জীবনে কখন দেখি নাই। আরাম-কেদারায় সুখাসীন, সরকারী-কর্ম্মচারী একজন ইংরাজের নিকট যখন আমি "ন্যাসানাল কংগ্রেসের" কথা পড়িলাম, তখন,—আমার মনে পড়ে—তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; তাহার পর অর্দ্ধ মুদ্রিতলোচনে তিনি বলিলেন; "কি! তাহাদের এই সমস্ত পাগ্‌লামি তুমি শুনিলে?" আমার সে সময়ে লজ্জায় মরিয়া যাওয়া উচিত ছিল! শিষ্ট-সমাজে যদি কেহ কোন চাষা-লোকের গল্প করে, তখন সে, শ্রোতার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাদের জল্পনা আমি যে ঔৎসুক্য-সহকারে শুনিয়াছিলাম, তজ্জন্য—সেই ইংরাজের কথা শুনিয়া, আমার মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। যদি আমি আর কিছুদিন এখানে থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও, ত্রিশকোটি অনাহার-ক্লিষ্ট লোকের পার্শ্ববর্ত্তী এই "জেণ্ট্‌ল্‌মেন"দের, "খাতির-নদারদ্" প্রশান্ত ঔদাসীন্যের অংশভাগী হইতাম......

টানা-পাখার নীচে, ঠাণ্ডা কাছারি-ঘরে বসিয়া, কাছারির ইংরাজ কর্ত্তাটি কথা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া, বেশ ঘোরাল-রকমের বাক্যবিন্যাস করিয়া

কেন। এই সকল শূন্য অঙ্কের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিগণ, যাহারা, শুধু লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট আনিতেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিষম উপদ্রবের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছে—তাহাদের কথা, তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে না। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, এই সব কথা শুধু টুকিয়া রাখিতেছেন; তিনি বেশ প্রশান্ত-ভাবে তাঁহার রিপোর্টে লিখিতেছেন;—"যেমন একদিকে, মালের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে"। তাঁহার এই রিপোর্ট আবার গীতি-কাব্যের ভাব ধারণ করে,—যখন তিনি উহাতে কার্পাসের গুণ বর্ণনা করেন, ব্রিটানীয় শিল্পোদ্যমের জয় ঘোষণা করেন, এবং সাক্ষাৎ বিধাতার বিধান বলিয়া "ব্রিটানিকী শান্তির" মহিমা কীর্ত্তন করেন......

ইংলণ্ড, ভারতকে কি দান করিয়াছে—জাতীয় দলের লোকেরা তাহা জানে এবং ভারতের নিকট ইংলণ্ড কি পাইয়াছে—তাহাও তাহারা বিলক্ষণ জানে। ইংলণ্ডের এই দানগুলি অঙ্গীকারের আকারে বদ্ধ; এই অঙ্গীকার বাক্যগুলি মধ্যে মধ্যে নবীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে; এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিন্দুছাত্র এইগুলি কণ্ঠস্থ করে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, উদার-নৈতিক মহানুভব ইংরাজেরা স্বকীয় উদার-নীতির খাতিরে, য়ুরোপীয় উন্নত শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার কিয়দংশ ভারতবাসীকে দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ভারত-বাসী তাহা অনায়াসে ও অবিলম্বে আত্মস্থ করিতে পারিবে। এই উদার কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, ভারতীয় যুবকবৃন্দের প্রার্থনার পূর্ব্বেই তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এক্ষণে সেই উদার-নীতি-বীজের ফল ফলিয়াছে; তাই, এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণ উদারনৈতিক দলের এত পক্ষপাতী।

তাই তাহারা উদার-নীতির দোহাই দিয়া ও উদার-নীতির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রশ্নটি স্বভাবতই সকলের জিহ্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবার কি সমস্ত ভারত সমবেত হইয়া, সেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করিবে? শিখ্ ও গুর্খা সৈন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে যে আবার উত্থান করিবে—ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। যাহারা এখনকার জাতীয় আন্দোলনের নেতা—তাহারা প্রায়ই উকিল-কৌন্সলি কিংবা অধ্যাপক। ২০ বৎসর কাল হইতে, সমস্ত য়ুরোপ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবার কোন্ চাট্নি দিয়া ভারতকে উদরস্থ করা হইবে—রুসীয়া চাট্নি, না ইংরাজি চাট্নি? ভারত বেশ বুঝিয়াছে, এখন আর কেহ তাহাকে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু অধুনা, প্রাচ্য ভূখণ্ডের শেষপ্রান্তে ঝটিকা-গর্ভ এক খণ্ড মেঘ উঠিয়াছে যাহা ১৮৮ খৃষ্টাব্দে কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই,—সেটি জাপানী মেঘ। উহা কি কোনো দিন, ভারতের উপর আসিয়া অশনি-নিনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িবে? ভবিষ্যৎবক্তারা ইহার উত্তর দিবেন। আপাততঃ দেখা যাইতেছে জাপানী ষড়যন্ত্র, নিঃশব্দে অলক্ষিতভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে;—ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এই ক্ষুদ্র বিজয়ী জাতির বিজয় ঘোষণা মহা-আড়ম্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীন জাহাজের যাত্রী।

জাহাজে যে চীনেম্যানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন তাঁর কাছে অনেকগুলি চীনভাষায় লিখিত বই ছিল। যেমন হ'য়ে থাকে, তিনি যেমন ফুল ভালবাসেন তেমনি বইও ভালবাসেন। বইগুলিকে অতি যত্ন করে রেখেছেন। বইগুলির পাতার ভিতর ফুলের পাপড়ী দেওয়াছিল। আমিও অমনি রাখি। ওই খানেই ফুল রাখিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হয়।

ছোট পাতলা একপিট ছাপা কাগজে নির্ম্মিত এই চীনে বইগুলি দেখে আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল সে গুলি মাথায় রাখি, বুকে করি। নিজে বুঝিবার তো সাধ্য নাই! তবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে একখানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং (Quotation) উদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে পুস্তক ছিল। তাহার দু'একটির ভাব নীচে উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাষায় কতকটা ঐরূপ ভাবের বচন জানা আছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাহাও লিখিলাম।

"বিনয় ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণস্বরূপ।" চীন দেশীয় স্ত্রীলোককে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে পারিবে! এমন স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র রমণীজাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই।

আর একটী প্রবাদের এইরূপ অর্থ,—"অসময়ে অতিথি আসিলে সে শত্রুর (তাতার) অপেক্ষাও কষ্টদায়ক হয়।" চীন দেশের লোক মোটেই অতিথি-পরায়ণ নহে; ভাই মরিলে ভাই কাঁদে না, অতি নিকট আত্মীয়ের দুরবস্থায় অর্থসাহায্য করে না। লোকে লোকারণ্য বলিয়া যে দেশে জীবিকা অর্জ্জন অতি কষ্টসাধ্য, সে দেশে অতিথি-সৎকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্।" প্রদীপ নিবিয়া গেলে আর তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে? একথার মর্ম্মান্তিক তাৎপর্য্য প্রাচীন চীনেরাও বুঝিয়াছিল।

আর একটী প্রবাদে, মা ছেলেকে সদুপদেশ দিতেছেন। উহার ভাব, ঠিক নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটীর মত,—

"সুশীলোভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নগা যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমা যাতি সম্পদঃ॥"

বড়ই সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ নীতিকথা। পিতার কোলে উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ধ্রুবের ঠোঁট ফুলিতেছিল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সুচরিত্র হও, ধর্ম্মপরায়ণ হও, সকল লোকের—সকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা হইলে জল যেমন সর্ব্বদা নিম্নগামী হয়, সকল সুখ-সম্পদও উপযুক্তবোধে তোমাতেই আসিবে।"

ব্যথিত-হৃদয়ের উক্তি আর একটী শ্লোকের ভাব কতকটা নিম্নলিখিত শ্লোকের ন্যায়,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

কি আশ্চর্য্য! এই সকল নানাদেশের লোকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থাবিশেষে আমরা যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। এখন দেখিলাম, লোকে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক একই সুরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হয়।

তার মধ্যে আর একখানি পুস্তকে দেখিলাম, পুস্তক উৎসর্গ করিবার স্থানে যাহাকে উৎসর্গ করা হইতেছে তাহার নামোল্লেখ নাই,—কেবল লেখা আছে, "চির আরাধ্য—তোমাকে।" যেন গভীর অনুরাগের স্রোত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে—যে কারণেই হোক মুখ ফুটে বলিবার যো নাই।

আর একখানি পুস্তক কোন চীনমহিলা রচিত। চীন-জাপান যুদ্ধে তাঁহার প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আক্ষেপ ক'রে লিখেছিলেন। কোন ভাবুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছত্রের নীচে দাগ দিয়াছেন দেখিলাম। একটী ছত্রের অর্থ সরল ভাষায় এইরূপ,—

"হে প্রিয়জন! তোমার মধুর স্মৃতি এ জনমে ভুলিবার নয়।"

ঠিক যেন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের এই সরল উক্তিটীর মত,—

"তুমি যে দিয়েছ দেখা
পাষাণে তা আছে লেখা,
হৃদয় ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নয়।"

যখন সেই চীনেম্যানটীর নিকট এইসব পুস্তকসম্বন্ধে কথা কহিতেছিলাম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি সুমধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্ত্রীলোকেরা দূরে থেকে তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাঁশীর স্বর যেন কাঁদ-কাঁদ স্বরের মত। আর এত সুস্পষ্ট, ঠিক যেন কে কার নাম ধ'রে ডাকৃচে। তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে আসছিল। আর সুদূর আকাশের এক প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত জ্বলছিল।

এবার একটি বিপত্নীক চীনেম্যানের কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাঁহাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তাঁহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে।

অন্য সকলের মত নয়; বেশভূষায়—তাঁহার অবহেলা, এবং দৃষ্টি শূণ্যময়।

এক দিনেই তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহাস জানিলাম। তিনি একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার সওদাগর। দেহ ক্ষীণ। বয়স ৩০।৩ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সর্ব্বদা লোকের জনতা ছেড়ে একা একধারে ব'সে থাকতেন। কাহারও সহিত মিশা নাই—কাহারও সহিত কথা নাই; কেবল অসীম সমুদ্র ও অনন্ত নাল আকাশের দিকে চেয়ে সময় কাটাতেন; কেবল একটি পরিচিত সমবয়স্ক চীনেম্যানের সহিত কখন কখন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে কথার ভাব চোখের জল ছাড়া কান্নারই রূপান্তর।

আজ দুই বৎসর হলো তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আঠার দিনের একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চ'লে গেছেন। মাতৃহীনা মেয়েটিকে তিনি মার নামেই ডাকেন। প্রথম প্রসবের পরই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবু এখনও কেবলই বলেন—"যদি এ চিকিৎসা না ক'রে অন্য চিকিৎসা ক'রতাম হয়তো তিনি ভাল হতেন।"

জীবনে যেন বিষম বিপ্লব ঘ'টেছে—ইহজন্মের মত চারিদিক শূন্য হ'য়ে গেছে। হাত থেকে রুমাল উড়ে গেলে কুড়াইয়া লইতেন না, বৃষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিয়া বসিতেন না। খাবার ঘণ্টা পড়িলেও খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ ব্যথা লেগেছে যে—সে কথা, সে প্রসঙ্গ, একবার তুল্‌লে হয়—অমনি সবাকার সামনেই ছেলে মানুষের মত আকুল হ'য়ে কাঁদেন।

ঘড়ির চেনে হাতীর দাঁতে আঁকা একখানি ছোট রমণী মূর্ত্তি তাঁর বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের মত। আর তুষার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোণ পুষ্পের মত সাদা।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

খেয়াল খাতা।

তুলনা।

আমরা চোখের সাম্নে যা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই তারই সঙ্গে সব তুলনা করি। পূর্ণিমার চাঁদ আমরা প্রতিমাসেই দেখি, তাই সুন্দ রমণীকে 'পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা' বলে থাকি। সেই রকম, কাে রংএর উপমা দিতে গেলে অমানিশার কথা উল্লেখ করি। আম কাউকে কদাকার দেখলে তাকে 'বাঁদর-মুখো' 'ছুঁচো-মুখো' ব থাকি। আর মাষ্টারমশাইরা ছাত্রদের প্রায়ই 'গাধা' বলে সম্বো করে থাকেন। আমরা কেন যে এরকম করি তা বুঝিনে। কুৎসীৎ মানুষ 'বাঁদরমুখো' হয় তা হ'লে সুশ্রী বাঁদর 'মানুষ-মু হবে না কেন? সাধারণ (General) এর সঙ্গে বিশেষ (particu এর উপমা দিব, না বিশেষের সঙ্গে সাধারণের উপমা দিব। অমাব নিশি একটী, পূর্ণিমার চাঁদও একটী; তাহাদের সঙ্গে এতগুলো নরনা তুলনা দিব কেন? আর সমস্ত 'বানর' 'ছুঁচোর' মুখের সঙ্গেই তোমার আমার মুখের তুলনা দিব কেন? কোন্‌টা সঙ্গত?

বিবিধ কবিতা।

হাস্যাস্পদ।

বিচারক পক্ষপাতী, মানী পরাধীন,
কৃপণ ঐশ্বর্য্যশালী, গৃহী ধনহীন
সুখী পরবশ, বৃদ্ধ নহে তীর্থাশ্রিত,
মূর্খ উচ্চকুল, রাজা কুমন্ত্রি-চালিত,
বেদান্তী সে দুরাচার, স্ত্রীর বশ নর,
ইহা হ'তে হাস্যাস্পদ কি আছে অপর?

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ, পরবশোমানী, দরিদ্রোগৃহী,
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ, সুখী পরবশো, বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ,
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ, কুলভবো মূর্খঃ, পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ, কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে?

লক্ষ্মীছাড়া।

নিত্যকরে তৃণচ্ছেদ, ভূমি পরে নখেতে লিখন,
হেলা পাদ প্রক্ষালনে, অযতনে দন্তের মার্জ্জন,
বদনের মলিনতা, রুক্ষ কেশ, নিদ্রাদি সন্ধ্যায়,
অত্যাহার, বিবস্ত্রশয়ন, হাস্য কথায় কথায়,
পিঁড়ার উপর বাদ্য, স্বদেহেও বাদ্যের তাড়ন,
ধনেশেও ছাড়ে লক্ষ্মী, হেন যদি তার আচরণ।

নিত্যংছেদস্তৃণানাং, ক্ষিতিনখলিখনং, পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং, বদনমলিনতা, রুক্ষতামূর্দ্ধজানাং,
দ্বে সন্ধ্যে জাপি নিদ্রা, বিবসন শয়নং, গ্রাসহাতিরেকং,
সাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং, হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং।

কাক কোকিল।

কাক কালো পিক কালো, দোঁহামাঝে কোথায় অমিল?
বসন্ত সময় এলে কাক কাক, কোকিল কোকিল।

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কোভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্ত সময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

চোর না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।

মৃণালের তন্তু দিয়া সর্প কি বাঁধিবে?
শিরীষকুসুমবৃন্তে হীরা কি বিঁধিবে?
মধুবিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর?
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর?

ব্যালং বালমৃণাল তন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ভেত্তুং বজ্রমণিং শিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতি
মাধুর্য্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষীরাম্বুধেরীহতে
নেতুং বাঞ্ছতি যঃ সতাং পথি খলান্ সূক্তৈঃ সুধাস্যন্দিভিঃ

মৌনই শোভন।

ভালই করেছ পিক চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে
মৌনই সেথায় শোভে ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং।

দেব দুর্ব্বল ঘাতক।

অশ্ব নয়, গজ নয়, তারা বলবান্
কে কোথায় শুনিয়াছে ব্যাঘ্র বলিদান,
দেবী পূজা তরে নর ছাগ হন্তারক
জানাইত আছে দেব দুর্ব্বল-ঘাতক।

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈয়াকরণ-বৈঠক।

সভাপতির বক্তৃতা।

"মঙ্গলাচরণ চাই সকল ক্রিয়ায় ;
মোদের জাতীয় এই প্রাচ্য প্রথা, ক্রমে
হইতেছে লোপ, প্রতীচীন সভ্যতায়।
স্বরবর্ণ লিখিবার পূর্ব্বে, পাঠশালে
সিদ্ধিরস্তু উচ্চারণ করিতে হইত ;
প্রথমে গণেশাঙ্কুর হইত লিখিতে
হলবর্ণ-হস্তলিপি-সাধন-সময়ে।
গণপতি সিদ্ধিদাতা লেখক প্রবীণ ;
তাঁহারে স্মরিয়া ছাত্রগণ পাঠশালে
ভূষাকালী তালপত্রে শরের কলমে
শিখিত লিখিতে ভাষা অতি অল্প ব্যয়ে।
অর্থনীতিবিশারদ পূর্ব্বপুরুষেরা
কিরূপ ছিলেন তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ
পাইতেছি এইরূপে সকল বিষয়ে।
একখণ্ড চকমকি-প্রস্তরে তাঁহারা
অবলীলাক্রমে সপ্তপুরুষ ক্রমশঃ
কাটাইয়া গিয়াছেন—ক্লেশ পান নাই
অগ্নির অভাবে কভু ; এখন আমরা
তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি লয়ে
উড়াইয়া ফেলিতেছি সাগরের পারে
দীপকাষ্ঠে, তাম্রকূটবর্ত্তিকা-সেবনে!

(কতিপয় সভ্যের চুরট ত্যাগ)

জ্বলেনা সে কাষ্ঠ ভাল, কত নষ্ট হয়
বর্ষার সময়ে, কিন্তু কভু শুনি নাই
চকমকি অগ্নিদানে হয়েছে বিমুখ।
লাল, পীত, নীল, কাল বিবিধ বর্ণের
বিবিধ প্রকার কালী, লেখনী, কাগজ
সাগর লঙ্ঘিয়া দেশ ফেলেছে ছাইয়া,
দেশের শুষিছে অর্থ ভাবিনা ত তাহা।
বিলাতী বলিয়া বরং করিয়া বড়াই
ঔৎকর্ষের পরিচয় দিতে যাই মোরা।
মসৃণ কাগজ কিবা চাক্যচিক্যময়!
কেমন সুন্দর কালী!! অয়স লেখনী!!!
—কিন্তু জীর্ণ হয়ে পড়ে লেখনী সত্বর,
লেখ্য হ'তে কালী লোপ হয় অল্প দিনে,
কাগজও উইয়ের স্তূপে হয় পরিণত।
পূর্ব্বেকার মত কিন্তু পাইনা দেখিতে
সুন্দর হাতের লেখা ; বুঝিতাম বায়
সার্থক হতেছে এবে, যদি হস্তলিপি
করিত উন্নতি লাভ সেই অনুপাতে।
অজস্র যেতেছে চলে, বিদেশে কেবল
অর্থরাশি, স্বদেশের দারিদ্র্য বাড়ায়ে।

(শুনুন-শুনুন)

দ্বিতীয় প্রস্তাব এবে করিতে সভায়
প্রথম বৈয়াকরণে করি অনুরোধ।"

(করতালি ধ্বনি—সভাপতির আসন গ্রহণ ও তদনন্তর প্রথম বৈয়াকরণের দ্বিতীয় প্রস্তাব হস্তে উত্থান।)

প্রথম বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"সভাপতি মহাশয়, সভ্যভ্রাতাগণ,
দ্বিতীয় প্রস্তাব এই করি নিবেদন।
ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, ড়, ঢ়, য়,
এই গুলি একেবারে লোপ করা হোক।
দুইটি "ব"য়ের কোন প্রয়োজন নাই,
অতএব একটিকে দেন অব্যাহতি।
"জ" ও "য"র মধ্যে থাক একটি যে হয়।
তিন "শ"র দুই জন লউন বিদায়।
এইরূপে দশটি অক্ষর কমাইয়া
করুন সহজসাধ্য ভাষা আপনারা;
অদ্যকার এইমাত্র প্রস্তাব আমার।"

দ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"কথিত প্রস্তাব আমি করি সমর্থন।
ঙ, ঞ, শ, ষ, ন, য, এ কয় অক্ষর
প্রাকৃত ভাষায় নাই জানেন সকলে,
পালিতেও নাই শ, ষ; বাঙ্গালায় এবে
অনুস্বর পুরাইবে "ঙ"য়ের অভাব
—যেমন বাঙ্গলা=বাংলা, কিঙ্কর=কিংকর;
করিবে অভাব পূর্ণ "ন"য়েতে "ঞ"য়ের,—
চঞ্চল=চন্‌চল যথা ঝঞ্ঝট=ঝন্‌ঝট;
সম্পূর্ণ সমর্থ "ন" লইতে "ণ"র ভার।

ড়, ঢ়, য়, কেবল ড, ঢ, য, এর বিকার
প্রভেদ ফুটুলিমাত্র—এতিন অক্ষর,
সংস্কৃতে পৃথক নাই লক্ষ্য করিবেন।
দুটি "ব" বাহুল্যমাত্র, কোন ক্ষতি নাই
একেরে উঠায়ে দিলে। "জ" ও "য"র মধ্যে
"য" রাখিতে হয় শুধু "য়"এর কারণ।
এক "স" পূরাবে আর দু"শ"র অভাব।
উপযুক্ত এ প্রস্তাব; কিন্তু এ সভায়
পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যাহা
তাহাতে গৃহীত ইহা হইবে, এরূপ
আশা করিবার নাই ভরসা আমার।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন :—

"উষ্ণীষের ব্যবহার পুরাকালে ছিল,
এক্ষণে তাহার স্থান শ্যামলা পিরিলি
প্রভৃতি পাগড়িগুলি করে অধিকার।
ভবিষ্যতে টুপি, স্বীয় আধিপত্য, ক্রমে
বিস্তার করিয়া, ধ্বংস করিবে সমূলে
বিভিন্ন পাগড়িকুল। শত বর্ষ পরে,
লজেঞ্জিসে হরিলুট চলিবে যখন,
টুপিধারী হিন্দুগণে দেখিয়া তখন,
পাগড়ি বা উষ্ণীষের কথা পুরাতন
কে স্মরণ করাইয়া দিবে সভ্যগণ,
"ঙ" যদি অন্তর্হিত হয় ভাষা হ'তে?
অতীত ও অনাগত মধ্যে দাঁড়াইয়া
যতদিন রবে ভাষা ততদিন "ঙ"

জাতীয় পরিচ্ছদের নমুনা মাথায়
করিয়া করিবে পূর্ব্ব গৌরব প্রচার।
পুরাতন পরিচ্ছদগৌরবের লোপ
করিতে চাহি না আমি ওরে বধিয়া।
পৃষ্ঠেতে পালান "ঞ"র—সেও দেয় হায়,
এ জাতির প্রকৃতির পরিচয় সদা!
পালে পালে পুত্র-কন্যা-ভারে প্রপীড়িত
বাঙ্গালীজাতির কথা ঘোষিছে নীরবে!!
অসময়ে সংসারের ভার স্কন্ধে করি
নাই আর কোন জাতি, এ জাতি ব্যতীত,
দুর্ব্বল প্রকৃতি, হেন উদ্যমবিহীন!
জাতীয় প্রকৃতি নাহি হয় যতদিন
সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন—ততদিন ঞ
শতমুখে নিন্দাবাদ করুক মোদের।
"ড়, ঢ়, য়"—"ড, ঢ, য"এর বিকার কেবল—
যথার্থ একথা—ভেদ ফুটুলি সুধুই।
ফুটুলি ব্যতীত আর কি আছে এমন
জাতীয় সম্বল বল, সভ্য ভ্রাতাগণ?
তাহাও পশ্চাতে, নহে সম্মুখে কখন।
"ড-ঢ-য" হইতে যিনি পৃথক "ড়ঢ়য়ে"
করে দিয়াছেন, তিনি অতি বুদ্ধিমান—
দেখেছেন, বুঝেছেন, একান্তে থাকিয়া
বাড়িতেছে এ জাতির কলহ কেবল।
গৃহবিসম্বাদে তাই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া
পাছে নষ্ট হয় ভাষা ভাবিয়া যেজন

দিয়াছেন করিয়া পৃথক ওদের,
তাঁরে আমি দিই শত শত ধন্যবাদ।
দুটি "ব"র বটে কোন নাই প্রয়োজন,
তিন "শ" বলিছে কিন্তু—"শ' ষ' স' এখন—
তারপর হ, অর্থাৎ নানা অসুবিধা
পুনঃ পুনঃ সহ্য করে চল, হে সজ্জন,
যদ্যপি হইতে চাও সিদ্ধ মহাজন।
শুনিয়া ওদের মুখে এই উপদেশ
নাই কিছু মাত্র ইচ্ছা কোনই অক্ষরে
তুলে দিতে ভাষা হ'তে। তাই এ প্রস্তাব
গ্রহণ করিতে নাই আগ্রহ আমার।

মূর্ত্তিউপাসক বলিলেন :—

"আমার একটি প্রশ্ন আছে এ প্রস্তাবে।
"ন" ও "ণ" এদের মধ্যে কোন্‌টি থাকিবে?
সেইরূপ—"য" ও "জ"র কোন্‌টি চাহেন?
তিনটি "শ"এর মধ্যে কোনটি রহিবে?
পূর্ব্বাহ্নে জিজ্ঞাসা করি' সংগ্রহ করেছি
সমস্ত সভ্যের যত মতামত আমি।
কারো চক্ষে "ন" লেগেছে বড়ই সুন্দর,
কেহ বা বলেন "ণ" অতি মনোহর;
সেইরূপ—"জ" ও"য"য়ে হয়েছে দুদল।
তিন "শ" বেঁধেছে, তিন দলে সভ্যগণে,
নিজনিজ সৌন্দর্য্যেতে মোহিত করিয়া।
বেধেছে বিষম গোল কঠিন সঙ্কট।
এ গোল সহজে মিটে না দেখি উপায়।

যে যা'রে সুন্দর দেখে সেই তা'রে সেবে ;
সৌন্দর্য্য-নিরাকরণ করিতে কখন
পারে নাই কেহ কভু যুক্তি তর্ক দিয়া,
তখন কিরূপে আমি অন্যে অনুরোধ,
করি বল স্বীয় প্রিয়দর্শন ত্যজিয়া
অন্য বর্ণে দৃষ্টিপাত করিতে সহসা ?
পারি না করিতে যাহা নিজেই কখন
পরকে করিতে তাহা বলা অকারণ।
যে যা'র সৌন্দর্য্যে মজিয়াছে, সভ্যগণ,
সে তারে রাখিতে এবে করিবে যতন
প্রাণপণে। অতএব সভ্য বন্ধুগণ,
একমত হয়ে সবে এ প্রস্তাব এবে
প্রত্যাহার করে নিন—মম অনুরোধ !"

মন্ত্রসাধক বলিলেন :—

"সৃষ্টিতত্ত্বমূলে শব্দ—শব্দ হ'তে সব,
ইহা সনাতন গূঢ় বিবর্ত্তন-নীতি।
কণ্ঠতালু মূর্দ্ধা আদি ভিন্ন স্থান হ'তে
প্রতি অক্ষরের হয় ভিন্ন উচ্চারণ।
সেই উচ্চারণ, শব্দ কিম্বা স্বর বল,
করে সংক্ষোভিত ব্যোম। সে স ক্ষোভে হয়
বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি,—তাই অক্ষরের
অভিধান বর্ণমালা। প্রতি বর্ণমূলে
সংখ্যা সদ্য বিরাজিত—নিষেধ এসব
যোগের রহস্য বলা। দৃষ্টি-প্রকরণ

চাহেন বুঝিতে যদি তবে যোগপথ
অনুসর' ধীরভাবে কিছুকাল ধরি।
তখন বুঝিতে আর রবে না সন্দেহ
কি মহান্ অত্যদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার !
অতীন্দ্রিয় জগতের কি সূক্ষ্ম নিয়ম ! !
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল সৃষ্টি হয় কি প্রকারে ! ! !
সংস্কৃত অক্ষরগুলি নহে কাল্পনিক।
এই বিশ্বে বর্ণন্যাস হ'তে পারে যত
তাহা সব সংস্কৃত-অক্ষরে নিহিত
আছে অতি সূক্ষ্মরূপে,—হয় বিকসিত
উচ্চারণে ক্রমান্বয়ে ; তাই এই ভাষা
সম্পূর্ণ সুন্দর বলে বিদিত ধরায়।
প্রত্যেক বর্ণের স্বর পৃথক্ পৃথক্।
স্বর ঠিক হ'লে মন্ত্র হয় কার্য্যকরী
অন্যথায় বিঘ্ন হয় জানে যোগীগণ।
তাই তাঁরা বারম্বার প্রণবোচ্চারণ
স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে করেন নিষেধ।
কিন্তু হায় এবে দেখি যথায় তথায়
প্রণবের ছড়াছড়ি হতেছে ভাষায় !
বিষয়-কলুষচিত্তে, মলিন এ দেহে
প্রণব ধ্বনিত হয়ে, আনিছে সতত
রাশি রাশি বিঘ্ন, ধ্বংশ করিতে ভারতে।
সভ্যগণে তাই আমি করি অনুরোধ
বর্ণ-বিপর্য্যয় যেন না ঘটান কেহ।
করুন বরং সবে এরূপ প্রস্তাব,—

যাহাতে বর্ণগুলির ঠিক উচ্চারণ
প্রচলিত হয় শীঘ্র এ বঙ্গ ভাষায়।
মন্ত্রস্তোত্রগুলি ক্রমে হতেছে মুদ্রিত
দেশীয় ভাষায়, কিন্তু উচ্চারণ দোষে
হবেনা তাহাতে কিছু মাত্র ফলোদয়।
মাতৃভাষা আমাদের এখনও শিশু
করুক সে সংস্কৃতমাতৃস্তনপান।”

রসায়নরসিক বলিলেন ঃ—

“অতি ভয়ঙ্কর কথা “মাতৃস্তন্যপান” !
উক্ত কথা পোষকতা করিয়া আমরা
প্রসিদ্ধ পাশ্চত্য বুধসমাজে নিন্দিত
হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিনা পোষণ !
কে না জানে স্তন্যপানে দুগ্ধের সহিত
দেহে হয় নানা রোগ, পাপ, সংক্রামিত ?*
সংস্কৃতের স্তন্যপানে বহু অশ্লীলতা
ক্রমে হবে সংক্রামিত ভাষার শিরায়।
ভাষা হ’তে সঞ্চারিত হইয়া সে পাপ

* “Dr. Bronzet (Surl' Education Médicinale des infants i… 165) has such a bad opinion of human mother, that he expres… a wish for the state to interfere and prevent them from suckl… their children, lest they should communicate immorality a… disease ! A still more determined pessmist was the famous chem… Van Helmont who thought life had been reduced to its pres… shortness by our imborn propensities and proposed to substit… bread boiled in bear and honey for milk, which latter he c… “brute's food.” and Vide encyclo : Britannica.

জাতীয় চরিত্র ক্রমে করিবে নির্ব্বাণ
এখনো যা কিছু আছে ক্ষীণ তেজকণা।
হইবে ক্ষীণায়ু ভাষা, অল্পায়ু জাতির।
দুগ্ধপান ব্যবস্থার প্রস্তাব সহসা
কি সাহসে এ সভায় হ’ল উত্থাপিত
বুঝিতে পারি না আমি ! “পশুর যে খাদ্য”
দিয়া তুলে তাহা মা’র মুখে, সভ্যগণ,
মাতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা দেখাতে কি চা’ন ?
অথবা কলির এই ধর্ম্ম অনুরূপ !
আমরা কলির চেলা—সে ধর্ম্ম এখন
করিব সকলে প্রাণ-পণে সংরক্ষণ !”
এত বলি রোষ ভরে সভাস্থল ত্যজি
রাজমার্গে দ্রুত বক্তা আসি উপস্থিত।
পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে এসে কতিপয়
ধরিয়া তাঁহারে ফিরাইল সভ্যাবলী।

তখন বেধেছে গোল সভায় বিষম ;
ছাড়াইয়া ভদ্রতার সীমা এক কালে
উঠেছে সপ্তমস্থরে বহুকণ্ঠস্বর।
কারওবা মুখের শিরা উঠেছে ফুলিয়া ;
কা’রও বা লোহিত নেত্র উঠেছে কপালে।
সে তুফান থামাইতে উঠিয়া তখন
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যথা ঃ—
“সভ্যগণ, ক্ষান্ত হ’ন। এ মহাযজ্ঞের
এখনও অনেক বাকী পূর্ণাহুতি দিতে।

অনুরোধ করি সবে, যেন আমাদের
যজ্ঞ পণ্ড নাহি হয় রাগ অভিমানে।
সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্ফারিত নেত্রে
চেয়ে আছে সবিস্ময়ে এ সভার প্রতি
করিয়া স্মরণ ইহা, করুন সকলে
ধীরভাবে আলোচনা সকল বিষয়।
আমাদের অভিনয়, বৈদ্যুতিক তার
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে
শিহরিয়া উঠি, ব্যক্ত করিছে নিমিষে।
হে রসিক মহাশয়, আপনি এক্ষণে
করুন আপন কার্য্য, ত্যজি অভিমান।
যজ্ঞোপকরণগুলি তন্ন তন্ন করে'
পরীক্ষা করিয়া ধীর, মতামত তব
নাহি প্রকাশিলে, কেমন এ যজ্ঞ মোরা
পারিব সাধিতে পূর্ণ যশের সহিত ?"

রাজনীতিজ্ঞ বলিলেন :—

"অনেকের ধারণা যে "সামর্থ্য সংখ্যায়,"
সেই হেতু এ প্রস্তাব নহে গ্রহণীয় !
সুধাই প্রত্যেক সভ্যে এ মহা সভায়
সপ্তকোটি জনসংখ্যা নয় কি মোদের ?

(সভাস্থলে চতুর্দ্দিক হ'তে "হাঁ।" "হাঁ।" ধ্বনি।)

কিন্তু ভূমণ্ডলে হেন আর কোন জাতি
নির্জ্জীব, দুর্ব্বল, ভণ্ড, পরশ্রীকাতর
পরাধীন গর্ব্বী আছে আমাদের মত ?

(সভা স্থলে "নাই নাই" শব্দ চতুর্দ্দিকে)
করে বৃদ্ধি দুর্ব্বলতাসংখ্যা কেনা জানে
একতা অভাবে নিত্য ? সংখ্যায় কেবল,
হয় নাই কোন জাতি কভু বলবান।
এক অশ্ব টেনে লয়ে যাইবে যে বেগে
রথখানি,—চারি অশ্ব চতুর্গুণ বেগে
টানিবে নিশ্চয় তাহা। কিন্তু একদিকে
না যোজিয়া চারি অশ্ব যোজি চারি দিকে
চালাইতে গেলে, রথ হইবে অচল।
সেইরূপ ব্যাকরণ রথখানি এবে
মোরা দশজনে যদি টানি প্রাণপণ
দশদিক হ'তে, তা'য় স্থাপিয়া ভাষায়
এগোবে না একপদ কোন দিকে কভু।
একত্বে প্রাধান্য হয়; দৃষ্টান্ত তাহার,—
ছাব্বিশ অক্ষরে ভাষা ইংরাজজাতির
—হইতে চলেছে আজি পৃথিবীর ভাষা ;
বর্ণমালা কিন্তু প্রায় দ্বিগুণ তাহার
তথাপি এ সংস্কৃত মৃত আমাদের।
তাই আমি সভ্যগণে বলি বারম্বার—
এ প্রস্তাব গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করুন—
হবে না কোনই ক্ষতি ভাষার তাহাতে
আমরা সকলে যদি হই একমত।"

দূরদর্শী বলিলেন :—

"ব্যঞ্জনের এ প্রস্তাবে এখন আমার
মতামত দিতে কুণ্ঠা হতেছে বিষম।
কারণ, বাধিবে গোল শেষে নানারূপ
এ সভায় উক্ত মত হইলে গৃহীত।

কারণ দেখুন—

করিতে হইবে যবে সন্ধির বিষয়
আলোচনা, সভ্যগণ, দু'দিবস পরে
তখনি উঠিবে গোল এ'রূপে প্রথমে :—
'বর্গের পঞ্চম বর্ণ রহিলে পশ্চাতে
বর্গের প্রথমবর্ণস্থানে সে বর্গের
হইবে পঞ্চম বর্ণ এই সূত্র এক
ভাঙ্গিয়া করিতে হ'বে সূত্র সৃষ্টি তিন।
ঙ, ঞ, লোপ যদি করিয়া এক্ষণে
বসান তা'দের স্থলে "অনুস্বর-ন"য়ে।
বাক্+ময়=বাঙ্ময় আছে, হ'বে বাংময়।
"যাচ্+না=যাচঞা" যদি নাহি করে কেহ
হ'তে পারে এ জাতির অনেক উন্নতি।
"রাজ্+নী"="রাজ্ঞী"র কিন্তু লাঞ্ছনা করিলে
রাজদ্রোহী বলে মোরা হইব গণিত।
কি হ'বে "বিজ্ঞে"র দশা ভাবি তারপর।
সেইরূপ "জ"-"ব"-লোপে, সন্ধির সময়
তৃতীয় বর্ণের হ'বে অভাব বর্গের
প্রথম বর্ণের স্থলে প্রয়োজন হ'লে।
"স-"লোপে "তৎ+কর"-আর-"তস্কর"-রবে না;
"বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি" হবে না কখন;
"প্রেয়সী"র অঙ্গচ্ছেদ করি পুনরায়
নব অঙ্গ-সংযোজিত করিতে সাহস
ক'জনের হবে আমি বলিতে পারি না,
স্বামীর সন্তোষ জন্য যদ্যপি "প্রেয়সী"
নিজে হ'তে অঙ্গত্যাগ না করেন সতী।

"শ" বিলোপে হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র এবে
অনায়াসে স্বর্গলাভ করিবেন সুখে।
"ষ"-"ড়" লোপে হ'বে ঘোর "ষাঁড়ে"র দুর্গতি
হিন্দু হয়ে সহ্য তাহা করিতে নারিব।
এবম্বিধ-সন্ধি-লিঙ্গ-প্রকৃতি-প্রত্যয়ে
বিষম বিভ্রাট বহ্নি-উঠিবে-জ্বলিয়া!
নির্ব্বাণ করিতে সাধ্য হবে না তখন
চারিদিকে প্রসর্পিনী-তীব্র-জ্বালামালা;—
এক যোগে যদি সিঞ্চে সমগ্র জগৎ
সাগরের বারি, কোটি কোটি দমকলে।
তাই আমি করিতেছি প্রস্তাব এখন
ব্যঞ্জনের আলোচনা থাকুক স্থগিত।
তদ্ধিত, কৃদন্ত, সন্ধি প্রভৃতির আগে
আলোচনা করি, শেষে দেখিব আমরা
ব্যঞ্জনের কোন্ বর্ণ থাকিবে কি যা'বে।"

সুচরিত্র বলিলেন :—

"শেষোক্ত প্রস্তাব আমি করি-সমর্থন।
অতি সমীচীন কথা। অপমান করি—
তাড়াইব আজি যারে, কালি যদি পুনঃ
আনিতে তাহারে হয় করিয়া সাধনা,—
সে বড় লজ্জার কথা। কি বলিবে লোকে
দেখিলে মোদের নিন্দনীয় ব্যবহার ?
সারা ব্যাকরণ মোরা তন্ন তন্ন করে
নিরীক্ষণ করি, করিব সে নির্দ্ধারণ

কোন ব্যঞ্জনের আছে নাই বা কাহার
প্রয়োজন এভাষায় সভ্যভ্রাতাগণ।”

তখন সকল সভ্য একমত হয়ে
কৃরিলেন গ্রাহ্য এই শেষোক্ত প্রস্তাব।
সভাপতি মহাশয়ে ধন্যবাদ দিয়া
সে দিনের সভা ভঙ্গ হ’ল তারপর।
যেমতি বিচার-প্রার্থী, অর্থী-প্রত্যর্থীর
আন্দোলিত হয় মন সন্দেহদোলায়
যতদিন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়
তেমতি ব্যঞ্জনগুলি আপন আপন
ললাটে কি আছে লেখা ভাবিয়া সম্প্রতি
অতিশয় উৎকণ্ঠায় কাটাইছে কাল।

শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক।

চুট্‌কী।

১। পাঁপরভাজা।

বিদ্রূপরসাত্মক কাব্য (Satire) সাহিত্যফলারে পাঁপরভাজা। বেশ মুখরোচক বটে, কিন্তু অধিক খাইলে পেট-গরম ও বদ-হজম হয়, রুচিবিকার ঘটে, সাধারণ খাদ্য আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, পাঁপর কাঁচা অবস্থায় অখাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাঁতে জড়াইয়া যায়; কিন্তু ঘিয়ে ভাজিয়া গরম-গরম পাতে দিলে তোফা কুড়-মুড় করে, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গবিদ্রূপ জিনিসটারও সামাজিক কদাচার, পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তিবিশেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি কদর্য্য উপকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐ সব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোকে কাণে আঙ্গুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে; কিন্তু যখন সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আর্টরূপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দারূপ কদর্য্য মাল পাঠকের পাতে দেওয়া যায়, তখন সেটা বড় উপাদেয় লাগে।

২। প্রকৃতিভেদে প্রহরণ।

নারীজাতি (অবশ্য ইতর শ্রেণীর কথা বলিতেছি) কলহকা নখদন্তের সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁহারা নরখাদক, হিংস্রজী আয়ুধব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা বিবাহকালে পি বা অন্য অভিভাবকের মস্তক ভক্ষণ ও বিবাহের পরে স্বামিনাম জীবটির মস্তক চর্ব্বণ করেন। অতএব ইঁহারা যে নরখাদক তদ্বি আর দ্বিতীয় প্রমাণ আবশ্যক নাই।

বাঙ্গালীবাবুরা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে বেশ পটু। তাই ক্রোধে উদ্রেক হইলে ইঁহারা ডান হাত তুলিয়া চড়টা-চাপড়টা মারেন (ডার্ব্বিণের শিষ্যগণ অবশ্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন।) পক্ষান্ত সাহেবেরা ঐরূপ স্থলে খামকা লাথী মারিয়া বসে, সবুট লাথির চো অনেক নেটিভের প্লীহা ফাটে। পশুদের চাঁটমারার মত কিক্‌টাই ইঁহাদের স্বাভাবিক। হাত ও পায়ের ব্যবহারের এই তফাৎটা দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতিক ও পশুপ্রকৃতিক (তা দ্বিপদই হউক আর চতুষ্প হউক) প্রাণীর প্রভেদটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আবার দেখু আমাদের মাপ হাতে, সাহেবদের মাপ পায়ে (ফুট)। এখানেই মনুষ্যপ্রকৃতিক প্রাণী ও পশুপ্রকৃতিক প্রাণীর প্রভেদ দেখা যাইতেছে তবে এক ঘোড়া মাপিবার সময় সাহেবেরা হাতের মাপ করেন (hand অবশ্য আমাদের হাত—cubit হইতে ভিন্নার্থে), তাহার কার একটু ভাবিলেই বুঝা যায়! সে সময়ে একটা নিকৃষ্ট প্রাণীর সহি সমুখাসমুখি হইয়া তাঁহারা যে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত একথাটা মনে পড়িয়া যায়।

৩। পাকা আম ও কাব্য সমালোচনা।

গল্প শুনা যায়, এক দেশের রাজা জানিতে চাহিয়াছিলেন 'আম ইতে কি রকম?' (সে দেশটা অবশ্য হনুমান্‌জির প্রসাদে বঞ্চিত।) ী বলিলেন, 'মহারাজ, একসের গুড় আর একসের তেঁতুল যোগাড় রুন। আমি আপনাকে আম খাওয়াইতেছি।' জিনিস দুইটি াগাড় হইলে মন্ত্রী নিজের লম্বা দাড়ীতে তেঁতুলগোলা ও গুড় বেশ রিয়া মাখিয়া মহারাজকে চাটিতে বলিলেন। রাজা বুঝিলেন, আমের দ অম্লমধুর আর তাহার কতকটা আঁশ আছে!

অনেক সমালোচক এইভাবে কাব্যের উপাদান বিশ্লেষণ করেন। কেন্সএর সমালোচনায় (a curious blending of humane d pathos) রসিকতা ও কারুণ্যরসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়া তিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। জলজান ও অম্লজান চাখিয়া দেখিলে জলের স্বাদুতা, স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায়?

৪। ঘোম্‌টা।

বঙ্গসুন্দরীগণের মাথায় ঘোম্‌টা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের মনে পড়ে। অনুপ্রাসের খাতিরে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দে মূল্যবান্ বাক্স, পেটরার রং পাছে উঠিয়া বা জ্বলিয়া বা ময়লা হইয়া ধূলামাটী পড়ে, সেই জন্য সৌখিন লোকে বাক্স, পেটরা ঘেরাটোপ ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও ক্যাশবাক্স বলিয়া ভ্রম রূপসীদের চাঁদমুখ পাছে ময়লা হইয়া যায়, তাই ঘোমটার মুখখানি সর্ব্বদা ঢাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ কচি চল্‌চলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে আমার বোধ বিধাতা যদি চাঁদের উপর একটা চন্দ্রাতপ গড়িয়া দিতেন, তাহা চন্দ্রে কলঙ্কের দাগ পড়িত না।

৫। রেলেটিভ প্রোনাউন।

রেলগাড়ীতে বা থিয়েটারের গ্যালারীতে সময়ে সময়ে এক লোক দেখা যায়, তাহারা হাজার অনুরোধেও নিজের জায়গা ছা একচুলও নড়িবে না, নিজের আসবাব পত্র এক ইঞ্চি সরাইবে নেহাত ধরিয়া বসিলে হয়ত নিজে একটু সরিয়া পেটরাটা সেই রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করে। ইহাদের ব্যবহার দেখিলে ইংরাজী রেলেটিভ প্রোনাউনএর কথা মনে পড়ে। রেলেটিভ প্রোনাউ জায়গাটা দখল করিয়া বসে, সেখান হইতে কোনও কারণেই ন না। তবে যদি তাহার পূর্ব্বে একটা preposition বসাইবার প্র হয়, তবে সেই জন্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া একটু হটিয়া ঠিক্ যেন নিজের আসবাব রাখিবার জন্য একটু সরিয়া বসা।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,

বঙ্গমহিলা সমাজ ও

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

তাঁহারা আর বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না। এ

তাঁহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসার তৈল, বিলাতী
রোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার অডিকলোন ও ফ্লরিডা
ব্যবহার করিয়াছেন,

তাঁহারা অনায়াসেই

দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীর

এই অর্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন, কারণ

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকলপ্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য
নিজের কারখানায়, দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয়
স্বদেশীর মহিলা ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি, তা
সুলভ তেমনই উৎকৃষ্ট,

একবার পরীক্ষা করুন

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউম

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দনা।

চির বন্দিতা অয়ি আনন্দময়ী
অন্নদায়িনী জননি,
অয়ি সুন্দর ধরণি!

উজ্জ্বল রবি-আলোকে নিত্য ভূষিতা
স্নিগ্ধ ধবল-ইন্দুকিরণ-হসিতা
চারু বিচিত্র বরণি!
নমোনমঃ মম জননি!

তব শিরে হিমাচল বৃদ্ধতাপস
যুগযুগান্ত ধরিয়া
নীরব আশীষ বরষে।

সুনীল সিন্ধু ফেনিল উর্ম্মি তুলিয়া
ছুটে অনুখন তটবন্ধন ভুলিয়া
চরণে লুটিতে হরষে।

ওই নির্ম্মল নীল অসীম আকাশ
অনিমেষ আঁখি মেলিয়া
নিশিদিন আছে চাহিয়া।

সুরধুনী-তব করুণা অমিয়বাহিনী—
বহে অবিরল, কতনা পুণ্যকাহিনী
কল্লোল রবে গাহিয়া।

সদা গুঞ্জিত তব কুঞ্জে কুঞ্জে
কতনা মঞ্জুরাগিনী!
ঝিল্লিমুখরা রজনী;

বিহগবৃন্দ গাহে শত বনসভাতে
কুসুমপুঞ্জ ফুটে প্রতি নব প্রভাতে,
গন্ধামোদিত অবনী।
নমোনমঃ মম জননি!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

মহানাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দধিমুখের প্রবেশ।

দধিমুখ।— (প্রণাম করিয়া) সুগ্রীবের জয় হোক্ !

শোনোগো সুগ্রীব ! তব প্রেরিত বানর-দল
জানকীরে চারিদিকে
করি' অন্বেষণ,
বিন্ধ্য-পরবতে উঠি', উপভোগ করিবারে
গভীর অরণ্য-মাঝে
করিয়া গমন,
বনের দেবতাগণে আরাধিয়া, তাঁহাদের
প্রীতিদত্ত ফলগুলি
করিল ভক্ষণ ॥

(হনুমানের আগমন-বার্ত্তা না জানিয়া সুগ্রীবের প্রতি রাম)

রাম।— এক মাস হল, হনু গিয়াছে লঙ্কায়,
এখনো সে প্রত্যাগত হল না হেথায়।
যদি না সে লঙ্কাধামে বদ্ধ হয়ে রয়,
দূতের বিলম্বে শুভ জানিবে নিশ্চয় ॥

(দধিমুখ-প্রমূখাৎ হনুমানের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সুগ্রীব রামের প্রতি)

গ্রীব।— আমাদের রাজাদেরি একমাত্র-ভোগ্য হেথা
আছে মধুবন ;
সাধি' নিজ কার্য্য এবে বন ভাঙি' ভুঞ্জে সেথা
পবন-নন্দন ॥

এইরূপ দুই জনে পরস্পর হইতেছে
কথোপকথন
হেনকালে স্মিতমুখে কিলকিল-রবে হনু
করে আগমন।

মরুত-চুম্বিত চারু মনোহর লোমরাজি যার,
যে প্রধান সেনাপতি সুগ্রীবের সৈন্যের মাঝার,
সেই হনুমান যবে রাম-সন্নিধানে আসি
হল উপনীত,
বিরহী রামের চক্ষে সাক্ষাৎ বসন্ত যেন
হল সমুদিত ॥

রাম।— শোনো বলি হনুমান মরুত-নন্দন !
হনু।— কি আদেশ, কহ প্রভু, করিব পালন।
রাম।— দেখিয়াছ জানকীরে ?—আছেন জীবিত ?
হনু।— জীবিত আছেন তিনি।
রাম।— করেন কি শোক আমা তরে ?
হনু।— শোকেতে কাতর তিনি।
রাম।— বিশীর্ণ কি বিচ্ছেদের ভরে ?
হনু।— দেখিনু, বড়ই কৃশ।
রাম।— কথা কিছু বলেন বিশেষ ?
হনু।— "হা ! রাম—হা লক্ষ্মণ !"
রাম।— পাঠাইলেন কোনো কি সন্দেশ ?
হনু।— পাঠাইলেন তিনি এই মনোহর চূড়ামণি, লহগো নরেশ !

(অভিজ্ঞান-চূড়ামণি রামের হস্তে অর্পণ)

মণিটি কণ্ঠেতে রাম বহুক্ষণ করেন প্রয়োগ ;
রাখি' বক্ষে, মহোল্লাসে, প্রিয়াস্পর্শ করেন সম্ভোগ।
প্রেমভরে জিজ্ঞাসেন বারম্বার সীতার কুশল ;
অশ্রুপ্লুত স্থির-নেত্রে দেখেন সে মণিটি কেবল।

হনু।— জানকীর গণ্ডস্থলে তিলক কাটিয়াছিলে
মনঃশিলা করিয়া ঘর্ষণ ;
তাঁর বক্ষস্পর্শ হেতু কাকেরে করিলে কাণ।
—এ কথা কি আছয়ে স্মরণ ?

(রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে রামের প্রতি হনুমান)

হনু।— এখনো সে অম্বুনিধি করি নাই পান,
এখনো করিনি চূর্ণ লঙ্কাপুরীখান ;
আনি নাই রাবণের মুণ্ডগুলি, অথবা সীতায় ;
আমি শুধু বার্ত্তাহর —বার্ত্তা তাঁর আনিনু হেথায়।
আলিঙ্গন-পুরস্কার —তার যোগ্য নহিগো এখনি ;
এই বাক্যে, হইলেন স্মিতানন রাম রঘুমণি॥

রাম।— হনুমান্ ! তুমি যখন লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে' এসেছ, তখন তুমি কি না করেছ ?

হনু।— প্রতাপ-অনলে তব অগ্রেই সে লঙ্কা প্রভো
হয়েছে দহন ;
উপলক্ষ হয়ে শুধু আমি পরে করিয়াছি
বহ্নি অরপণ॥

রাম।— হনুমান ! তুমি যখন এই সমুদ্র লঙ্ঘন করেছ, তখন তুমি কিনা করেছ ?

হনু।— প্রতাপ-তপনে তব ওহে নাথ, অম্ভোনিধি
হইল শোষণ।
স্থল-পথে তাই দেব লঙ্কায় অশঙ্ক হয়ে
করিনু গমন।
রাবণ-নাগরীদের অশ্রুজলে সিন্ধু যদি
পরিপূর্ণ না হ'ত আবার,
তাহলে ত স্থল-পথে আসিতাম, উল্লম্ফনে
প্রয়োজন হত না আমার॥

(দুই জনে উপবেশন করিয়া)

রাম।— কোথা এবে তব সীতা ?

হনু।— রাবণ-রক্ষিত এক
কাননেতে বসতি তাঁহার।

রাম।— বল'—সে কিরূপ পথ ?

হনু।— সাগরে বেষ্টিত উহা
—দৈবযোগে হইয়াছি পার।

(বিহ্বল ও লজ্জাভয়ে সচকিত—কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পরে)

রাম।— সীতা কি বল্লেন ?

হনু।—তিনি এই কথা বল্লেন :—
রঘুনন্দন রাম শ্রীরাম শ্রীরাম
ভরতাগ্রজ রাম শ্রীরাম শ্রীরাম
রণ-কর্কশ রাম শ্রীরাম শ্রীরাম
ভব-শরেণ্য রাম শ্রীরাম শ্রীরাম।

(সীতা কিরূপ দেখিতে রামের প্রত্যয়ার্থ বর্ণনা করত)

তাঁর কাছে—ইন্দু যেন বিলিপ্ত অঞ্জনে,
মৃগী-নেত্র সঙ্কুচিত হেন লয় মনে।
রক্তিম পল্লব নব যেন পরিম্লানা ;
সুবর্ণের আভা যেন মনে হয় শ্যামা।
কোকিল-বধূর স্বর তীব্র অতিশয়,
ময়ূরের পুচ্ছরাজি তুচ্ছ বোধ হয়॥

রাম।— বিরহে সীতার অঙ্গসৌষ্ঠব এখন কিরূপ বল দেখি হনুমান ?

হনু।— হয়েছেন এত কৃশ —প্রতিপদ-চন্দ্রকলা
স্থূল বলি হয় অনুমান ;
পাণ্ডুর-বরণ হেন —মৃণালের পাণ্ডুকান্তি
তার কাছে হয় নীল জ্ঞান।
তন্বঙ্গী স্বভাবত ;— বিচ্ছেদেতে বাড়িল ক্ষীণতা ;
প্রতিপদ-তিথি-দিনে পাঠকের বিদ্যা হয় যথা।

রাম।— তুমি সমুদ্র কি করে' উত্তীর্ণ হলে ?

হনু।— শাখায়-শাখায়, পারে শাখা-মৃগ-করিতে গমন,
তোমারি প্রভাবে প্রভু করিনু এ সাগর লঙ্ঘন।
তব রাম-নাম জপি' পাপিষ্ঠ পামর যারা
তারাও যে ভবের জলধি হয় পার ;
এ অঙ্গুলী-মুদ্রা তব চির-অঙ্গ-সঙ্গী যার,
সাগর লঙ্ঘন করা বিচিত্র কি তার !

রাম।— দেবের অজেয় যেই মহাপুরী—খ্যাত লঙ্কা নামে,
কেমনে দহিলে তাহা সেই দশানন বিদ্যমানে ?

হনু।— সীতার নিঃশ্বাস, আর হে রাজন্ ! তব কোপানল
দহিল সে লঙ্কাপুরী আমি হ'নু নিমিত্ত কেবল।

রাম।— রাবণকে জয় করে' তার পর তুমি কি করলে ?

হনু।— বহুগ্রীব বহুভুজ, বিশ-হস্ত, বহুমুখ
—দীপ্তি পায় যাহে দংষ্ট্রা ঘোর
হেন রক্ষরাজে আমি দর্শন করিনু যেই
—বধিবারে ইচ্ছা হ'ল মোর।
তব কৃপা-বলে যার বুদ্ধির বিকাশ হয়
—কি আছে অসাধ্য কাজ
তার পক্ষে এ ত্রিন ভুবনে ?
কিন্তু করিলাম মনে, —প্রভুর কর্ত্তব্য কাজ
দাসের উচিত নয়,
তাই আমি ছাড়িনু রাবণে।

রাম।— সাধু কপিবর তুমি ! ধন্য তব বীর্য্য মোর কাছে ;
ধিক্ মোর বাহুবলে— রাবণ সে আজো বেঁচে আছে।
সীতার উদ্ধার কাজে আমি নিজে সমর্পিব প্রাণ,
লঙ্কার দহনে আমি তব কাছে ঋণী হনুমান।

হনু।— আমা-সম তব ভৃত্য হে রাঘব ! আছয়ে অনেক ;
এমন গুণের স্বামী তোমা-সম নাহি মিলে এক ॥

বিজয়-দশমী তিথি, আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষ,
"দ্বিবিদ"-বানর আদি যূথনাথ কপি লক্ষ-লক্ষ
লইয়া আপন-সাথে —ব্যাপ্ত করি' দিগন্ত আকাশ,
চলিলেন রামভদ্র রাবণেরে করিতে বিনাশ।
উল্লম্ফে আবরি' নভ কিলকিলা-শব্দে দিক্
করিয়া ধ্বনিত,
ভাঙ্গিয়া কানন গিরি, সরবতঃ ধরণীরে
করিয়া কম্পিত,
সুগ্রীবের কপি-সৈন্য রামের প্রস্থান কালে
হয়ে হৃষ্টচিত,
লঙ্কাপুরী-অভিমুখে
হইল প্রস্থিত ॥
কমঠের পৃষ্ঠদেশ করিয়া নমিত,
অনন্তের দন্তাবলি করিয়া স্খলিত,
উৎকট বরাহ-দংষ্ট্রা করিয়া চালিত,
গজেন্দ্র-কুম্ভের মুক্তা করিয়া স্ফুরিত,
কুলগিরিদের সবে করিয়া টলিত,
চলিল রামের এই সৈন্য অগণিত ॥
অবনী মজ্জিত, গিরি বিচলিত,
বিক্ষুব্ধ সাগর ;
কূর্ম্ম আকুঞ্চিত, অহিপতি ভীত,
ত্রস্ত বজ্রধর ॥
হেলায় করিলা জয় যে সব নৃপতিচয়
তাহারাও চকিত অন্তরে।
লঙ্কাপুরে বিভীষণ হেরি' সৈন্য-আগমন
বাঞ্ছা করে যেতে স্থানান্তরে ॥
(সমুদ্র তীরাবস্থিত রাম স্বগত)
সিন্ধু-পারে লঙ্কাপুরী, চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী
প্রাচীর বেষ্টিত।

সিংহদ্বেষী মহাবল   কুম্ভকর্ণ আদি বীর
যথা অধিষ্ঠিত।
শাক্তিক রাবণ সে যে,   ভ্রাতা মোর শিশু অতি,
সখা মোর ক্ষুদ্র কপিগণ :—
এইরূপ ভাবি মনে   রঘুকুল-সিংহ যুবা
কোদণ্ড করে নিরীক্ষণ ॥

সুগ্রীব :—(রামকে বিষণ্ণ দেখিয়া)

আজ্ঞা কর মোরে রাজা—   রাজাদের কুলগুরু তুমি !
উৎপাটিয়া আনিব কি   শঙ্কাহীন সেই লঙ্কাভূমি ?
গিরিতট চূর্ণ করি'   বাঁধিব কি সেতু মোরা ?
—আটক হইবে তাহে সাগর তরঙ্গ।
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে   করিবে চীৎকার ঘোর
মকর-কুম্ভীর আদি জলচর-সঙ্ঘ ॥
কি করিব বল দেব ?   —সহসা সে লঙ্কাপুরী
করিব কি হেথা আনয়ন ?
অথবা সে জম্বুদ্বীপ   আনিব হেথায়, কিম্বা
করিব কি সাগর শোষণ ?
হেথায় তুলিয়া আনি'   ত্রিকুট, মন্দর, বিন্ধ্য
—পর্ব্বত সকল
নিঃক্ষেপিয়া, তাহে সেতু   বাঁধিব কি ?—বিক্ষোভিয়া
সাগরের জল ॥

সমুদ্র-বন্ধনে রাম করি' অভিলাষ,
নানা ভাবে দৃষ্টি তাঁর হইল প্রকাশ :—
প্রণয়-উন্মুখ-দৃষ্টি   কভু পড়ে সুগ্রীবের পরে ;
কভুবা নিরখে চাঁদে   চিরবদ্ধ ঈরিষার ভরে।
কভুবা দক্ষিণ দিক্   ক্রোধ-ভরে করেন দর্শন,
কভুবা উৎসাহ-ভরে   নেহারেন নিজ শরাসন।
করুণ-নয়নে কভু   নিরখেন সৌমিত্রি-আনন ॥

(অথ সমুদ্র-তীরে লঙ্কা বৃত্তান্ত)

বীরপুরী যেই লঙ্কা   তাহার হেরিয়া শঙ্কা
লঙ্কেশ রাবণ,
—বৃদ্ধ, ও তাপস, ভটে,   আনাইয়া সন্নিকটে
কহেন বচন :—
ধ্যান-জ্ঞান-পরায়ণ   মুনিগণ তোমরা সকলে,
দৈবের সূচনা কিছু   জানিতে পেরেছ ধ্যান-বলে ?
লেশমাত্র যদি কিছু   হয়ে থাকে হৃদয়ে স্ফুরিত,
বচনে ব্যকত করি   মোরে তাহা করহ বিদিত।

রাবণ-মাতা নিকষা বিভীষণকে বলিল, তুমি এই দুষ্ক্রিয়া হইতে রাবণকে বারণ কর। অনন্তর বিভীষণ মাতৃ-বাক্যানুসারে রাবণের পদে প্রণিপাত করিয়া রাবণকে বলিল :—মহারাজ, আপনি এই রাক্ষস-কাল-রাত্রি সীতাকে পরিত্যাগ করুন।

একটি বানর বার,   করিল এ লঙ্কা ছারখার,
কোন্ বুদ্ধিমান্ বল'   তার সনে যুঝিবে আবার ?
লঙ্কা দগ্ধ—বনভগ্ন   —লঙ্ঘন করিল সে যে
অপার সাগর !
এ সব করিল দুতে,   না জানি কি করিবেক
রাম অতঃপর ॥
ত্যজি' কোপ হে রাজন্   —কুল-কীর্ত্তি-বিনাশন,
কুল-কীর্ত্তি-বিবর্দ্ধন ভজ' সেইরামে।
বিবাদেতে দিয়া ক্ষান্তি,   রক্ষহ রাজ্যের শান্তি,
তুষ্ট কর দাশরথে মৈথিলী-প্রদানে ॥
যাহাদের নখায়ুধ   উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের সমান
—যাবৎনা আসে তারা,   কর রামে মৈথিলী প্রদান।
রামের প্রেরিত বাণ   বজ্র-বায়ু-সম বেগবান,
যাবৎ না রক্ষোমুণ্ড   সেই বাণে হয় খান খান্
তাবৎ সে রাম-হস্তে   জানকীরে করহ প্রদান।

রাবণ, কি মহোদর, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ আর,
কে পারে আঁটিতে তাঁরে —শত-ইন্দ্র-প্রভাব যাঁহার ॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর,
নিকুম্ভ, কি কুম্ভ, অতিকায়,
তিষ্ঠিতে সমর্থ কেবা রাঘব-আয়ুধ-মুখে
হে রাজন্! কহ' তা' আমায় ॥

কুম্ভকর্ণ-সুত।—স্ফটিক-শিখরী সেই কৈলাস পর্ব্বতে যিনি
সমূলে করিলা উৎপাটন,
যার লাগি বসুন্ধরা উঠিল চঞ্চল হয়ে
—হল পরে শিথিল-বন্ধন,
(তাইত শম্ভুর নৃত্যে আমূল কম্পিত গিরি)
—ইনি সেই লঙ্কেশ রাবণ।

রাবণ। —কত কত পূর্ব্ববীর আইল শ্রবণ-পথে
কিন্তু তারা কোথায় এখন ?
তাহাদের অনুসৃত পন্থা অতিক্রম করি'
আছে জাগি' লঙ্কায় রাবণ।
সেই আমি লঙ্কা-বীর —দোর্দ্দণ্ড-পীড়নে যার,
ধাতুদ্রব-রক্তচ্ছটা হয়ে নিষ্যন্দিত,
কৈলাস নামেতে খ্যাত শঙ্কর-গিরির বক্ষে
শঙ্কার অঙ্কুর সদা করে অঙ্কুরিত।
মাল্যকার বজ্রধর, প্রতীহার সহস্রকিরণ,
শশাঙ্ক সে ছত্রধর, সম্মার্জ্জক—বরুণ পবন,
পাচক সে হুতবহ, —মোর গৃহে অহরহ
সেবা-রত দেখনা কি সবে ?
কেন তবে এত ভীতি কেন তবে কর স্তুতি
রক্ষোভক্ষ্য নর সে রাঘবে ?

বিভীষণ।— নিজ পরাক্রমে রাম সুপ্রসিদ্ধ ভুবন-মাঝারে ;
ভাগ্য-বিপর্য্যয় গণি —যদি রাজা না জান তাঁহারে

যাঁর একবাণে বিদ্ধ সুবিশাল সপ্ত তাল
—স্থিত সারি-সারি ;
সেই সপ্ত রন্ধ্র দিয়া সপ্তস্বরে যশ গায়
পবন তাঁহারি ॥
রজনীতে সমুদিত চণ্ডরশ্মি ভানু ;
মেঘহীন নভস্তল ধরে ইন্দ্রধনু।
হায় হায়! এবে দেখি তব প্রতি বিধি হল বাম ;
সীতারে ফিরায়ে দেও, লঙ্কেশের মিত্র হোন্ রাম।
যাঁর এক কপি-শিশু, হেলায় লঙ্ঘন করি'
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর,
প্রবেশিল অনায়াসে দেব-দৈত্য-দুর্ভেদ্য
লঙ্কার ভিতর ;
দূর করি' দিয়া যত বন-রক্ষিগণ,
সীতারে দর্শন করি', ভগ্ন করি' বন,
অক্ষে বধি,' লঙ্কা দহি' গেল নিজ স্থান,
মানুষ কেমনে বল' হবে সেই রাম ?
আসন্ন মরণ নাকি— বিপরীত বুদ্ধি তব
হইল ঘটনা ;
আমি কহি হিত বাক্য,— বীর মধ্যে মোরে তুমি
না কর গণনা ॥
রাবণের পদাঘাতে প্রকৃতির বিপর্য্যয়
করিয়া দর্শন,
তখনি ত্যজিয়া তাঁরে ক্রুদ্ধমনে রাম-স্থানে
গেলা বিভীষণ ॥

বিভীষণ। মণি রত্ন বিভূষণ দিব্য বস্ত্র সাথে,
সীতারে ফিরায়ে দেও তুমি রঘুনাথে।
তাহলে করিব বাস এই লঙ্কাপুরে,
নিরাপদ হবে লঙ্কা, শঙ্কা যাবে দূরে ॥

। ।— জানি আমি, সীতা তিনি জনক-নন্দিনী,
রাম যে মধুসূদন—তাও আমি জানি।
জানি আমি নর-হস্তে লভিব নিধন,
তবু না করিব আমি সীতা-সমর্পণ ॥

বিভীষণ।— শম্ভু-মৌলি-বিহারিণী স্বর্গ কল্লোলিনী-সম
দিগঙ্গন প্রক্ষালিত
যাঁর শুভ্র যশের ধারায়,
হায় হায় ! সেই তুমি সীতা প্রাপ্তি-অভিলাষে
পুলস্তকুলের চন্দ্রে
কেন হও কলঙ্কের প্রায় ॥

শুভ অভিপ্রায় তাঁর নাহি করে রাবণ স্বীকার,
লঙ্কা সে কলঙ্কাঙ্কিতা হবে শীঘ্র—করিয়া বিচার,
ত্যজি' নিজ অগ্রজেরে, বিসর্জ্জিয়া স্বর্ণ-লঙ্কাধামে,
নগ্নবৎ বিভীষণ চলে শীঘ্র রাম-সন্নিধানে ॥
রক্ষকুল-ধূমকেতু, চারি মন্ত্রি লয়ে নিজ সাথে,
সাক্ষাৎ করিতে রামে চলিলেন গগনের পথে।
লঙ্কা-মহাতঙ্করূপে দেখা দিল যেন বিভীষণ,
শঙ্কায় আকুল চিত্ত যত সব লঙ্কাবাসি জন ॥
তপন-প্রতিম-তেজ বিভীষণ হলে উপস্থিত,
রাবণ ভাবিয়া, যত কপিকুল পলায় ত্বরিত।
রাবণ নহেন ইনি—ইনি বিভীষণ,
—হনুমান পরে ইহা করে নির্দ্ধারণ।
কেননা ভাবিল হনু—রামচন্দ্র-চরণযুগলে
আকৃষ্ট এ বিভীষণ—যথা, লুব্ধ ভ্রমর কমলে ॥

সুগ্রীব।—দ্বারে আসি উপস্থিত পঞ্চজন নিশাচর,
আকাশের পথে।
এসেছেন বিভীষণ—রাবণ-রাজার ভ্রাতা,
চারি মন্ত্রি সাথে।

অভয়-চরণে তব, তারা সবে যাচিছে শরণ,
না জানি কর্ত্তব্য মোরা—কি আদেশ—বলহ রাজন্ ॥

াম।— (হনুমানের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করায়)

নু।— রঘুনাথ ! আছে সত্য লঙ্কেশের ভ্রাতা বিভীষণ,
নিদ্রা-সিন্ধু-তিমিঙ্গিল কুম্ভকর্ণের কনিষ্ঠ যে জন ;
—দাক্ষিণ্যাদি-গুণোপেত, নিজ পিতৃকুল-চেয়ে
সুবিশুদ্ধ-মন,
রক্ষ-পুরী-প্রতিষ্ঠিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরে যিনি
করেন ধারণ।

সুগ্রীব।— স্বজনের পরে যার প্রীতি নাহি মনে,
পরজনে প্রীতি তার হইবে কেমনে ?
দূরস্থিত হইলেও এই বিভীষণ
জানিবে, সৌমিত্রে !—ইনি শঙ্কার কারণ ॥

লক্ষণ।— ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাবণ-সদন হতে
কি হেতু হইল বহির্গত ?

রাম।— সুগ্রীব, বালীর ভয়ে কি করিতে নাহি পারে ?
—বিভীষণে ভাবো তারি-মত।

লক্ষ্মণ।— গূঢ় অভিসন্ধি কোন আছে কি রাবণ অনুজেয় ?

রাম।— কি করিতে পারি মোরা যদিই বা পাই তাহা টের।
শত্রু হইলেও জেনো —ইক্ষাকু-বংশের কোনো জন
শরণাগতের প্রতি শত্রুতা না করে কদাচন ॥
সগর্ব্ব হুঙ্কারবতী কপি-সেনা হেরি' বিভীষণ,
হয়ে ভীত, সমুদ্যত প্রদর্শিতে দুর্ব্বার বিক্রম ;
কিন্তু হেরি' রামচন্দ্রে উঠিল অন্তরে তার
প্রমোদ-তরঙ্গ-মালা অতীব গম্ভীর ;
—হইল স্তম্ভিত-প্রায় ; বিক্রম হইল দূর,
না পারে চলিতে কিম্বা থাকিবারে স্থির ॥

সুগ্রীবের শৌর্য্য, আর লক্ষ্মণের সেবা-ভক্তি
করি' নিরীক্ষণ,
বিভীষণ-চিত্ত যেন দোলা-সম দোলায়িত
হয় অনুক্ষণ ॥

সগর্ব্ব হুঙ্কারবতী বানর-সেনার
প্রত্যেকেরে হেরি' সবিশেষ,
পুলস্ত্য-নন্দন সেই বিভীষণ বীর
সবিস্ময়ে করিল প্রবেশ।
সুগ্রীব-প্রমুখ যত মুখ্য কপিগণ,
পথমাঝে করে তাঁর স্তুতি, সম্বর্দ্ধন।
এইরূপে বিভীষণ আসি' রঘুনাথের নিকটে,
তাঁর পদে শির-হস্ত করে ন্যস্ত অতি অকপটে ॥

বিভীষণ।—হে নৃপতি-শিরোমণি! কপি-পদ-ভরে
ফণি-পতি-ফণা যবে
হ'ল ভারাক্রান্ত,
তব যাত্রা-স্তুতি-লিপি জরঠ কমঠ-পৃষ্ঠে
উৎকীর্ণ করি' রাখে
বসাইয়া দন্ত ॥

কোদণ্ড-মণ্ডল-হতে নিঃসৃত প্রচণ্ড তব বাণ
দশানন-বাহুদণ্ড নিশ্চয় করিবে খান খান।
আখণ্ডল-অরি সেই ইন্দ্রজিৎ—তায় কণ্ঠচ্ছেদ
করিবে মহাস্ত্র তব চন্দ্রহাস—কে করে নিষেধ?
অব্যর্থ-প্রতিজ্ঞ তুমি, খণ্ডন হবে না কোন-মতে
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা তব, —কহি শুন ওহে সীতাপতে!

বিধাতা স্বয়ং যদি হ'ন তুলাধার,
বসুধা হয়েন যদি শূর্প-পাত্র তার,
ফণিপতি সূত্র হন্, রত্নাচল—ওজন-পাষাণ,
দামোদর-গদা যদি, হয় তুলাদণ্ডের সমান,
তবু না করিতে পারে, ও-তব গুণের পরিমাণ ॥

তোমার সে বৈরিদের কোথা এবে কুতূহল
আমোদের কথা?
কোথা গীতাদির কথা? কোথা মত্ত-গজ-আদি
তুরঙ্গম-কথা?
কোথা কোদণ্ডের কথা? এক কথা এবে শুধু
পলায়ন-কথা!
শোনো ওগো রঘুনাথ! স্বপ্নেও ভাবে না তারা
এবে অন্য কথা ॥

কুপিত না হও যদি অত্যুক্তি বচনে,
মিথ্যা বলি' যদি ইহা নাহি ভাব মনে,
তাহলে করিব তব গুণের কীর্ত্তন;
—অদ্ভুত বর্ণনে ব্যগ্র কবির বচন।
তরুণ তপন-সম প্রতাপ তোমার
উত্তাপে শোষিল যত জলধি অপার।
শুধু শত্রু-পত্নীদের যুগল-নয়ন
পূরিত হইল জলে শোনো গো রাজন্।
শঙ্কর করিলা যবে "ত্রিপুর" দহন,
যুদ্ধ-রথ হ'ল তাঁর সমস্ত ভুবন।
সুমেরু হইল ধনু, গুণ—ফণিপতি,
স্মর—যোদ্ধা, স্বয়ং ব্রহ্মা হইলা সারথী।
হইলেন নারায়ণ ধনুকের বাণ;
স্বর্ণলঙ্কা করে দগ্ধ একা হনুমান ॥

রাম।— ওহে রক্ষোরাজানুজ! তোমার কুশল?
বিভীষণ।— কুশল হেরিয়া তব চরণ-কমল।
রাম।— অত্র আগমনে তব কিবা অভিপ্রায়?
বিভীষণ।— যাপিব জীবন মম ও-পদ-সেবায়।
রাম।— আজি লঙ্কাপতি তুমি—কহিনু তোমায় ॥

বিভীষণ-ভক্তি হেরি' রাম রঘুবর,
সুপ্রসন্ন হইলেন তাহার উপর।

রাজ্যে তাঁরে অভিষিক্ত করিবে লক্ষণ
—রঘুনাথ করিলেন ইহা নির্দ্ধারণ।
প্রসিদ্ধ কথাটি এই বল' কার্ নাহি·আছে শ্রুত
—মহাত্মা জনেরা হ'ন শরণাগতের বশীভূত।

রঘুপতি রামচন্দ্র হয়ে তুষ্ট অতি,
ভক্তিনম্র নতশির বিভীষণ প্রতি,
লঙ্কাপুরী-আধিপত্য করিলেন দান,
বাহুই সে রচনের প্রতিভূ-সমান॥

কপিগণ।—সত্যপ্রতিজ্ঞ তিনি—আছে কথা ত্রিলোকে প্রচার,
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্য—মোরা সবে সাক্ষী আছি তার॥

বিভীষণ-প্রতি দেখি' রামের এ আকস্মিক
প্রীতির সঞ্চার,
আনন্দ-বিস্ময়-ভরে কপিগণ স্তুতিগান
করে বারম্বার।
অতঃপর প্রাজ্ঞ হনু, বিভীষণ-গুণগ্রাম
বিধিমতে করিয়া কীর্ত্তন,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, আর জাম্বমান-সাথে তাঁর
ঘটাইল সৌহার্দ্দ-বন্ধন।
করি' নিজ শিরশ্ছেদ যে বিভূতি করে লাভ
দশানন শঙ্কর-সদনে,
সেই সে বিভূতি লাভ করিলেন বিভীষণ
শুধুমাত্র রামের দর্শনে॥

রাম।—(সমুদ্রের প্রতি)
তুমি মোর কুল-গুরু. ভক্তি-কৃতাঞ্জলি শিরে
করিয়া ধারণ,
যাচি তোমা অম্বুনিধি, —আমা-তরে মার্গ তব
কর উন্মোচন।

তোমারি বধূ সে সীতা, হরিয়া লইল তারে
দুষ্টমতি দশানন ক্রূর,
বিনাশি' তাহারে যদি উদ্ধারিতে পারি সীতা
তবেই কলঙ্ক হবে দূর॥
(সমুদ্র পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় লক্ষণের প্রতি),
দৈন্য-পরাভব-যুত যাচঞা করিতে কভু
ইক্ষাকুরা হয়নি শিক্ষিত।
রঘুকুল-মাঝে কভু সেবকের বদ্ধাঞ্জলী
শিরোদেশে হয় নাই ধৃত!
সমস্ত করিনু আমি —তথাপি জলধি, মোর
অনুরোধ না করে পালন
পথ-উদ্ঘাটন-তরে তাই চাহে পাণি মোর
করিবারে কার্ম্মুক গ্রহণ॥

আন ধনু হে লক্ষণ—আন শর কালানল-সম,
সমুদ্র শুষিব আমি—পদব্রজে যাবে কপিগণ।

অম্ভো নিধিরে আমি করিব পাংশুর নিধি
—জলেরে করিব স্থল —বজ্রতীব্র বাণে বিঁধি'।
করিব তাহারে ভস্ম —বিরচিব মরুভূমি,
মৃগতৃষ্ণা-পরিণত করিব আমি এখনি॥
ধনু হতে রঘুপতি ছাড়িলেন তীর,
দিক্ হল ধূমাচ্ছন্ন তপ্ত হল নীর।
আকুল হইয়া ভ্রমে' নক্র শত শত,
ফুটিতে লাগিল জলে শঙ্খ, মণি যত।
জলদ-মলিন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
সহসা আসিল সিন্ধু রামের সদন॥

সূর্য্য।— হে জলধি ; কেন তুমি হয়েছ চঞ্চল?
সমুদ্র। রাম-শর-পাত-ভয়ে হয়েছি বিহ্বল।

সূর্য্য।— কেন গো কম্পিত তুমি—কিসে তব ডর ?
তোমার সন্তানগণ রাম-অনুচর :—
বদনে শশাঙ্ক তাঁর, লক্ষ্মী তাঁর ঘরে,
বচনে অমৃত তাঁর, কল্পতরু—করে,
শাণিত বাণেতে তাঁর হলাহল আছে,
সাহায্য পাইবে তুমি তাঁহাদের কাছে ॥

সমুদ্র। (সানুনয়ে রামের প্রতি)
প্রলয় দহন-তীব্র অমিত যে তব বাণ-বল
কেমনে সহিব তাহা—আমি ক্ষুদ্র পারমিত জল !
ত্যজ কোপ প্রভু ওগো ! প্রস্তর আনুক কপিগণ,
আমা-পরে রচি' সেতু, সুখে তারা করুক গমন ॥
যাহা ছিল চিত্রকূট-পেটক-ভিতরে,
জানকী গলায় যাহা পরেন আদরে,
কৌশল্যা-শুক্তি-জাত সেই মুক্তাহার
শ্রীরাম-রতনে আমি করি নমস্কার।
অঞ্জনা-তনয়-আদি কপি-বীর যত,
উপাড়ি' উপাড়ি' আনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত।
আর যার মূল গেছে ভেদিয়া পাতাল
—এ হেন পর্ব্বত আনে অতীব বিশাল।
তার পর করে নল নিজ বাহুদিয়া
সেতু বন্ধ সিন্ধু-মাঝে সুদৃঢ় করিয়া ॥
সুগ্রীবের অগ্রগামী সৈন্য কপিগণ,
পৃথ্বীতল জলমগ্ন—করে নিরীক্ষণ ;
পশ্চাদ্‌গামীর দল দেখে পঙ্কময়,
"হেথা সিন্ধুছিল"—পরে, অন্য সবে কয় ॥

সুগ্রীব। নিপুণ কপীন্দ্র যত শৈল যবে করে আনয়ন,
তোমার প্রসাদে রাম গিরিগুহাবাসী করিগণ

শুণ্ড উর্দ্ধে তুলি, পিয়ে মন্দাকিনী-জল,
—সুর-করী-পেয় যাহা—অতি নিরমল ॥

জলে নিমগন হয় যে সব প্রস্তর-রাশি
ক্ষণেকের মাঝে,
দুস্তর সাগরে তাহা রক্ষ-ভীতি সেতু হয়ে
কেমনে বিরাজে ?
শৈল-গুণ নহে ইহা, নহে ইহা জলনিধি-গুণ,
কপিদেরো গুণ নহে—হইক না যতই নিপুণ ;
ইথে প্রকটিত শুধু তাঁরি সেই সহজ শকতি
সর্ব্ব-লোক পূজ্য যিনি—মহাবীর রাম দাশরথি।
দুর্জ্জনের সঙ্গ জেনো সজ্জনের বহুবিধ
অনর্থের হেতু ;
রক্ষোরাজ হরে সীতা, সিন্ধুরাজ হল বদ্ধ
—বাঁধা হয়ে সেতু ॥

যে সব প্রস্তর-রাশি আনে কপিগণ,
করেন শ্রীরাম তাহে সেতু সংগঠন ;
—নিজ চিত্ত হইতেও উচ্চ তাহা হয় ;
—সুগ্রীবের সখ্য-চেয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয় ;
—লক্ষ্মণের ভক্তি চেয়ে অধিক সংশ্লিষ্ট ;
—সীতার চরিত্র-চেয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ ;
—রাবণের মোহ-চেয়ে দীর্ঘ অতিশয়,
—রক্ষোধূম কেতুরূপে সাগরে উদয় ॥

প্রহস্ত।— (সমুদ্র বন্ধন দেখিয়া)
মহাসিন্ধু-মাঝে সেতু করিয়া বন্ধন,
তীক্ষ্ণশরে রক্ষোরাজে করিয়া নিধন,
সে তপস্বী রাম যদি, জানকীরে পারে উদ্ধারিতে,
মশা-গল-ছিদ্র দিয়া হস্তিযূথ পারিবে গলিতে ॥

প্রথমে হাসিয়াছিল রাবণ হরষে,
পরে, সেতু শেষ হলে, উদ্বেগের বশে
ছুটিল নিঝর-সম ঘর্ম্ম তার গায়,
পরে, ঝঞ্ঝাবাতাহত পর্ব্বতের প্রায়
সেই মহা পরাক্রান্ত নির্ভীক-পরাণ
রোষ-ভরে থরথর হ'ল কম্পমান ॥
গুরুভার শৈল-সব আছে সেতুরূপে
—লঙ্কাপতি দশানন শুনি' লোকমুখে,
সমুদ্রের পরে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষম
বলিতে লাগিল কত ভৎসনা বচন ;
অম্বুধি ! জলধি ! ওহে ! কি কব অধিক,
বারিধি পয়োধি আদি তব নামে ধিক্ !
ঘোর অনুরাগ-ভরে হইয়া উৎসুক,
গীত-শেষে, দশানন নিজ চারি মুখ,
মাধ্বী-মধু-মত্ত-বধূ-বিধুমুখ-পানে
ছিল ফিরাইয়া মুগ্ধ-স্থির দৃষ্টিদানে,
হেনকালে জানাইল আসি' দূতগণ
—সিন্ধুমাঝে সেতু রাম করেছে বন্ধন ;
অমনি সে দশানন অবশিষ্ট আর ছয় মুখে,
উদধি বারিধি আদি সম্বোধিয়া কহে কতরূপে ॥
অগস্ত্য-কর্ত্তৃক তুমি হয়েছিলে পীত,
দেবাসুর মিলি' তোমা করিল মথিত,
ক্ষুদ্র'রাঘব তোমা করিল বন্ধন,
শাখামৃগগণ তোমা করিল লঙ্ঘন,
তবুও ঘোষিছে লোকে—হায় হায়—তোমার মহিমা,
জলধি পয়োধি আদি কত নামে—নাহি তার সীমা ॥
সাগর-বন্ধন-কথা দশানন শুনিয়া সহসা,
ভয়বশে দশমুখে একসঙ্গে করয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

সত্য কি হইল, দুত।—বদ্ধ পয়োনিধি,
জলধি, উদধি, সিন্ধু, পায়োধি বারিধি ?
ভয়ত্রস্ত সচকিত লঙ্কাপুরবাসী
এইরূপ পরস্পর কহিছে প্রকাশিঃ—
কপি-সৈন্য-রক্ষা-মণি পবন-আত্মজ
হেথায় উঠায়েছিল নিজ পুচ্ছধ্বজ ;
কপীন্দ্র সুগ্রীব যদি করে আগমন,
নিশ্চয় আসিবে পুনঃ পবন-নন্দন।
অষ্টাদশ লক্ষ কোটি কপি সৈন্যগণ
করিতেছে সেতু-পথে হেথা আগমন ॥
যার কলকল শব্দে ত্রস্ত ত্রিভুবন
সেই মহা কপিসৈন্য করিয়া প্রেরণ,
ভগ্নারণ্য সুদুর্গম "সুবেল"-গিরিতে
শিবির স্থাপিলা রাম রাবণে নাশিতে ॥

শুক ও সারণ দুই রাবণ-প্রেরিত দুত
হয়ে সমাগত,
ধরিয়া কপির রূপ সৈন্য-সংখ্যা গণিবারে
হইলে উদ্যত,

বিভীষণ তাহাদের চিনিতে পারিয়া,
রাম-সন্নিধানে দোঁহে আনিল বাঁধিয়া ;
রাম কিন্তু তাহাদের দিয়াছেন ছাড়ি,
—সৈন্য দেখি' রামাজ্ঞায় আসিয়াছে ফিরি ॥

শুক ও শারণ।— (রাবণের নিকট নিবেদন)
নভস্তলে, দিকে দিকে, সিন্ধু-সন্নিকটে,
কাননে, গহ্বরে, আর পর্ব্বতের তটে,
এমন নাহিক স্থান—ধরে তিল-কণা ;
—কি করিয়া কপি-সৈন্য করিব গণনা ?

ভ্রাতা তব, আমাদের আনিল বাঁধিয়া,
দিলেন ছাড়িয়া রাম সৈন্য দেখাইয়া ;
এখন কর্ত্তব্য যাহা করহ রাজন্,
কহিনু তোমার কাছে সব বিবরণ ॥
প্রাসাদ শিখরে উঠি' রাজা দশানন
জিজ্ঞাসেন—কপি-সৈন্য করিয়া দর্শন :—

রাবণ।— এর মাঝে রাম কেবা—কহ-ত আমায় ;
রামেরে দেখায়ে দূত কহিল রাজায় :—

দূত।— সুগ্রীবের অঙ্কে যাঁর মস্তক স্থাপন,
হনুমান-অঙ্কে যাঁর আছয়ে চরণ,
অঙ্গদের অঙ্কে যাঁর হস্ত বিদ্যমান,
স্বর্ণ-মৃগ-চর্ম্মে যিনি আছেন শয়ান,
অপাঙ্গে হেরিয়া লঙ্কা, তবানুজ-কথা
শুনিছেন যিনি প্রভো—সেই রাম হোথা ॥

রাবণ।— যার বাহু, সুরপতি-রণকণ্ডু করিল হরণ,
ত্রিলোক-আক্রমী বীর আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ রাবণ
এবে শুনিতেছি কিনা—বদ্ধ হ'ল সেতু,
কপি-পরিবৃত লঙ্কা, মম নাশ-হেতু।
হায় হায়! বহুদিন থাকিলে জীবিত,
কি না দেখা যায়, আর, কি না হয় শ্রুত ॥

আশ্চর্য্য তাপস এই, গিরি-গুহাবাসী
কপিগণে জুটাইয়া সঙ্গে লয়ে আসি'
মম-হৃতা সীতারে সে আমার নিকট হতে
করিবে উদ্ধার ?
গজকুম্ভ-বিদারণ -সিংহ-দন্ত উপাড়িতে
স্পর্দ্ধা এ যে তার!
চন্দ্রসূর্য্য ইন্দ্র বায়ু যার পুরদ্বারে থাকি'
প্রসাদ যাচয়ে অনুক্ষণ

—সেই লঙ্কাপুরী কিনা —রোষ-বিকম্পিত-ওষ্ঠ
কপি-সৈন্য করে আক্রমণ।

(শুক সারণকে তিরস্কার করিয়া রাবণ, দূতের দ্বারা রামের নিকট এই পত্র পাঠাইতেছেন)

স্বস্তি! শ্রীরাবণ দশানন ইন্দ্রবজ্রভেদক্ষম,
ত্রিভুবন ব্যাপী যাঁর প্রতাপ-অনল,
লিখিছেন এই পত্র বনবাসী সেই রামে
—ঘোর দুঃখ-মোহে যেই বিকল বিহ্বল :—
সীতারে এনেছি সত্য ; উদ্ধারিবে তারে তুমি
সুগ্রীবের সৈন্য আনি মেলা ?
নির্ব্বোধ তাপস ওহে! কেন কর মিছামিছি
আপনার প্রাণ নিয়ে খেলা ?
ইন্দ্র-আদি দেবগণ দ্রুত করে পলায়ন
যাঁরে হেরি' রণে,
সেই রাবণের সাথে যুঝিতে স্পরধা তুই
করিস্ কেমনে ?
ওরে অজ্ঞ মূঢ় নর! করিস্ না পদার্পণ
রাক্ষস-কবলে।
সীতা-আশা ত্যাগ করি' আপন ভবনে তুই
যারে শীঘ্র চলে' ॥
ওরে রে তাপস মূঢ়! ক্ষুদ্র কপির দ্বারা
হয়ে প্রোৎসাহিত,
নিজ প্রিয়া জানকীরে উদ্ধারিতে, লঙ্কাপানে
হয়েছ ধাবিত ?
কোন্ বুদ্ধিমান লোক নিজ শ্রেয় করিয়া চিন্তন
ফণি-ফণা-হতে রত্ন লইবারে করয়ে যতন ?
যে রাবণ নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন
মহাদেবে বিধিমতে করিলা অর্পণ ;

সমস্ত অমরবৃন্দ যার বশে রয়,
মায়ার নিধান যেই —সর্ব্ব-মায়াময়,
ভুজবলে কৈলাসে যে করে উত্তোলন,
যমদর্পহন্তা যেই,— সেই দশানন ;
—তাহারে জিনিবে করি' সাগর-বন্ধন ?
প্রলয় জলদ-সম যার ঘোর বিচিত্র গর্জ্জন,
—সেই বীর কুম্ভকর্ণ যাবৎ না করে আগমন,
রণসাধ ত্যাগ করি' ছাড়ি সীতার কামনা ;
কুম্ভকর্ণ আসে যদি, তুমি আর কপি-সেনা,
প্রলয়-নিঃশ্বাসে তার যাইবে উড়িয়া,
পারিবে না দুরেতেও ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া ॥

বহুরূপী, সুচতুর বাক্য-অভিনয়ে,
—নিকুম্ভিল নামে রক্ষ, পত্রখানি লয়ে,
রঘুপতি-সন্নিধানে করিয়া গমন,
তাঁর হস্তে এই পত্র করিল অর্পণ ॥

ইতি "সাগর-বন্ধন" নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

বঙ্গ-ভাষায় উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম।

উত্তম পুরুষের একবচনে "আমি" ও "মুই" এই দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে। বহুবচন আমরা ও মোরা। অন্য বিভক্তির পূর্ব্বে [ই]হারা আমা ও মো আকার ধারণ করে। এতন্মধ্যে আমি শব্দটিই ভদ্র [স]মাজে প্রচলিত; অনেক অঞ্চলে ভদ্রলোকে মুই কথাটি মোটেই [ব্য]বহার করেন না। কিন্তু প্রাচীনকালে বোধহয় এরূপ ছিল না। [চৈ]তন্য-সম্প্রদায়ের গ্রন্থে 'মুই' 'মুঞি' আকারে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত [দৃ]ষ্ট হয়। প্রাচীন অন্যান্য গ্রন্থেও ইহা বিরল নহে!

প্রচলিত বাঙ্গালা-ব্যাকরণে "আমি" শব্দটি সম্ভ্রমার্থক, ও মুই [তু]চ্ছার্থক এই রূপ বলা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই মাত্র হইতে পারে যে, [স]াধারণতঃ ভদ্রলোকে 'আমি' ও ছোটলোকে 'মুই' শব্দ অধিক [ব্য]বহার করে। নতুবা, আমি শব্দের সহিত কিছুমাত্র সম্ভ্রমের ভাব [জ]ড়িত নাই; আর 'মুই' শব্দটি আত্মগৌরব প্রকাশের সময়ও ব্যবহৃত [হ]ইতে পারে। বর্ত্তমানসময়ে এই দুইটি শব্দের প্রয়োগসম্বন্ধে এই [ক]থা। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থে দেখা যায়, দৈন্যপ্রকাশ স্থলে ['মু]ই' বা মুঞি' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ; কখনও আমি শব্দ ব্যবহৃত [হ]ইয়াছে; আত্মগৌরব প্রকাশস্থলে 'আমি' শব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। [চৈ]তন্যদেব যখন বলিতেছেন,

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥"
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহা-প্রসাদে বিশ্বাস ॥"

তখনও এই কথায় দৈন্যের ভাব না থাকুক, কেবল আনন্দ
আত্ম-গৌরব বা অহঙ্কার প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 'মো
'মোর' প্রভৃতি পদ সকল অবস্থায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সম
'মুই' শব্দটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেই প্রধানতঃ ব্যবহার করিত বলি
বক্তার নিকৃষ্টতা প্রকাশার্থ উহা ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তা
বিবেচ্য। কবীন্দ্রকৃত মহাভারতে যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

"দেখহ সাত্যকি মুঁঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮৭ পৃঃ), তখন নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ গৌ
প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেবল উচ্চারণ-সাদৃশ্য দ্বারাই যদি শব্দের উৎপত্তি নিঃসন্দেহ-রূ
নির্ণীত হইত, তবে সহজেই বলা যাইত, সংস্কৃত 'অহম্' ও প্রা
'অহম্মি' হইতে 'আমি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু নানাকার
একথা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। (১) অন্যান্য প্রচলিত ভারতী
আর্য্য ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, হিন্দী 'হ
গুজরাটী 'অমে', মারাঠী 'আহ্মী', (আম্হী), ও নেপালী 'হা
বহুবচনান্ত। অন্যান্য ভাষার কথা জানি না, হিন্দী 'হম্' শব্দ অর্থ
একবচনও হয়। কিন্তু ইংরেজী you শব্দের ন্যায়, অন্বয়তঃ উ
সর্ব্বদাই বহুবচন। কখনও 'হম্ বোলতে' না বলিয়া 'হম্ বোল
বলা যায় না। ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, বহুবচন 'হম্' শব্দই অর্থ
একবচনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একবচন পৃথক্ 'হ
শব্দ নাই। 'আমি' শব্দের অনুরূপ কোনও শব্দ এই সকল ভাষা
একবচনে নাই। উক্ত বহুবচনান্ত শব্দগুলির মূল অনুসন্ধান করি
দেখিতে পাই, প্রাকৃত ভাষায় উত্তমপুরুষের প্রথমার বহুবচনে 'অম্
শব্দ বহুল প্রচলিত। তবে কি 'আমি'ও এই 'অম্হে' হই

সিয়াছে? (২) উড়িয়া ভাষায় প্রথমার একবচনেই 'অম্হে'
চ্চারণ 'অম্ভে') শব্দ প্রচলিত। এখানে দেখি, বর্ণবিন্যাসে প্রাকৃত
বচনের আকার ঠিক রহিয়াছে। (৩) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন,
লিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে 'আমি', 'তুমি' শব্দদ্বয় 'আহ্মি'
হ্মি' আকারে লিখিত দেখিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের
পৃষ্ঠার টীকায় তিনি বলেন, "আমি' স্থানে 'আহ্মি' ও 'তুমি' স্থানে
হ্মি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন তাবত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়রচিত
রতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল
র্ণমেন্টের কাপিতে 'আমি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি।" ইহার অনেক
ন্ত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ৮৬, ৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।
মধ্যে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) বিরাট-পত্নী সুদেষ্ণা
রিন্ধ্রী-বেশ-ধারিণী দ্রৌপদীকে বলিতেছেন,

"কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেন মত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ।"

দৃষ্টান্তটি কবীন্দ্রকৃত মহাভারতের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুঁথি হইতে
হীত। (২) পরাগলী মহাভারতে ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"সংসার উপালম্ভ সব পাইলা তুহ্মি।
তাহা হইতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আহ্মি।"

ই সকল দেখিয়া, প্রাকৃত বহুবচন 'অম্হে' হইতেই যে 'আমি' শব্দের
ৎপত্তি, এই ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। বহুবচনের পদ এক
চনে ব্যবহৃত হইবে কেন? এরূপ সন্দেহ নিতান্ত ভিত্তিহীন।
ন্দী 'হম্', 'তুম্', ইংরেজী you এক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা
কলেই অবগত আছেন। আর, উত্তমপুরুষে একবচনের অর্থে
হুবচনের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায়ও বিরল নহে; গৌরব ও বিনয় এই
ইটি বিপরীত ভাব প্রকাশার্থই বহুবচন প্রযুক্ত হয়।

এখন প্রাকৃত 'অম্হে' শব্দের মূল অনুসন্ধান করা যাউক। কাহা
কাহারও মতে, প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ভারতীয় ভ
মাত্রই, বিভক্তি ও অতি প্রচলিত শব্দগুলিকে স্ব স্ব প্রদেশের পূর্ব্ব
অনার্য্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সেই সকল অনার্য্য ভাষা কি
ছিল এখন তাহা নির্ণয় করা অনেকস্থলে একপ্রকার অসম্ভ
সুতরাং তাহার সহিত মিলাইয়া এই মতটির পরীক্ষা করা যায় ন
পক্ষান্তরে কোনও শব্দ বা বিভক্তির মূল, সংস্কৃতে আছে কি না তা
অনুসন্ধান আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু যাঁহারা উক্ত মতাবল
তাঁহারা পণ্ডশ্রম মনে করিয়া এ অনুসন্ধানের আয়াসস্বীকার করি
প্রস্তুত হন না। কেবল যে সকল শব্দের সংস্কৃত মূল বিনা অনুসন্ধানে
তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, সেই সকল শব্দকেই তাঁহারা সং
মূলক বলিয়া গ্রহণ করেন। এই কারণে আমি উক্তমতটিকে ভা
তত্ত্বানুশীলনের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। সংস্কৃত প্রথমার বহুব
'বয়ম্' পদের সহিত প্রাকৃত 'অমহে' পদের কোনই সম্বন্ধ নাই দেখি
কি বলিব, 'অম্হে' সংস্কৃতমূলক নহে? না, আর একটু অনুসন্ধ
করিলেই দেখিব উহা সংস্কৃত-মূলকই বটে।

সংস্কৃতে, উত্তমপুরুষের বহুবচনে, প্রথমায় 'বয়ম্' হয় সত্য কি
আর প্রায় সর্ব্বত্রই বহুবচনে রূপে, 'অস্ম' এই অংশ বিরাজমান
সমাসে বিভক্তি লোপ হইলে 'অস্মদ্'ও ঈয় প্রত্যয়যোগে 'অস্মদী
হয়; ২য়া বিভক্তিতে 'অস্মান্', ৩য়া 'অস্মাভি', ৪র্থী অস্মভ্যম্,
অস্মৎ, ৬ষ্ঠী 'অস্মাকম্', ৭মী 'অস্মাসু'। প্রাকৃতে এই 'অস্ম' অং
স স্থানে হ-কারাদেশ হইয়া, ও উচ্চারণ সৌকার্য্যার্থ হ-কার ও ম-কা
স্থান পরিবর্ত্তন করায় 'অম্হ' হইয়াছে। প্রাকৃত বহুবচনে সক
বিভক্তিতেই এই 'অম্হ' ভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথমা ও ২য়া 'অম্হে',
'অম্হেহিং', ৪র্থী ও ৬ষ্ঠী 'অম্হাণং', ৫মী 'অম্হাহিংতো' বা 'অম্হাসুং

'অম্হেসু'। সংস্কৃত 'স্ম' ও 'ষ্ম' স্থানে 'ম্হ' হওয়ার আরও অনেক
ন্ত আছে। যথা—বিস্ময় = বিম্হঅ, গ্রীষ্ম = গিম্হ, উষ্ম = উম্হ।
হে' পদের এ-কার বোধহয় সর্ব্বনাম মাত্রেরই বহুবচনে প্রযুক্ত
ারের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে। 'আমি' পদের ই-কার ঐ-কারেরই
ন্তরমাত্র। 'অম্হাণং', 'অম্হাহিংতো' প্রভৃতির 'অম্হা' ভাগ
তেই বোধ হয় 'আমা' আসিয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, 'অস্মি' হইতে 'আমি' আসিয়াছে।
াপদ 'অস্মি' হইতে সর্ব্বনাম 'আমি'র উৎপত্তি স্বীকার করার কোন
ণ দেখা যায় না। অব্যয় 'অস্মি'র ব্যবহার যে কখনও বিশেষ
তি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহা হইতেও
মি'র উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

'মুই' শব্দের অনুরূপ প্রথমান্ত পদ সংস্কৃতেত নাইই, বররুচিধৃত কম্ব
ার প্রাকৃতেও নাই। কিন্তু প্রথমা ভিন্ন সকল বিভক্তির এক
নেই সংস্কৃতেও অস্মদ্ শব্দের রূপ ম-কার প্রধান। যথা—২য়া মাম্,
; ৩য়া ময়া; ৪র্থী মহ্যম্, মে; ৫মী মৎ; ৬ষ্ঠী মম, মে; ৭মী ময়ি।
াসেও একার্থে অস্মদ্ শব্দ স্থানে 'মৎ' আদেশ হয়, ঈয় প্রত্যয় যোগেও
ীয়' হয়। এই রূপগুলি সমস্তই, বিশেষতঃ ৩য়া, ৪র্থী, ৬ষ্ঠী ও ৭মীর
া', 'মে' ও 'ময়ি', বাঙ্গালা 'মুই' শব্দটার বড় বেশী নিকটবর্ত্তী বলিয়া
ন হয় নাকি? প্রাকৃতের দিকে চাহিলেও দেখিব, বাঙ্গালার নিকটে
ড়া দূরে যাইনা। ২য়া মং, মমং; ৩য়া মে, মমাই, মই, মত্র; ৪র্থী ও
মে, মম, মহ, মজ্ঝ; ৫মী মত্তো, মইত্তো, মমাদো, মমাদু, মমাহি;
মই, মত্র, মমস্মি। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, 'মুই' শব্দটি
কৃত ও প্রাকৃতের অস্মদ্ শব্দের প্রথমেতর একবচনান্ত রূপগুলি
তে গৃহীত।

হিন্দীসাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা অনেক অধিক প্রাচীন।

তাহাতে এই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। চাঁদ-কবি উত্তম পুরুষে প্রথমার একবচনে ‘হোঁ’ ও ‘হোঁ’ এই দ্বিবিধ রূপ ব্যবহার করিয়াছেন; উহাই পরে ‘হুঁ’ আকারে পরিণত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের হিন্দীতে ইহাদের স্থান ‘মৈঁ’ শব্দ অধিকার করিয়াছে। চাঁদ-কবিও ‘মৈঁ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সে অতীতকালের সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে,—যেখানে হিন্দী ভাষায় সর্ব্বদাই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়। যথা—“মৈঁ সুন্যৌ সাহি বিন আঁখি কীন” (আমি শুনিয়াছি সাহা তাহাকে চক্ষুশূন্য করিয়াছে)। বর্ত্তমান হিন্দীতে ‘মৈঁ’ প্রথমান্ত সুতরাং তাহাকে তৃতীয়ান্ত করিবার জন্য ‘মৈঁ সুনা’ না বলিয়া ‘মৈঁনে সুনা’ বলিতে হয়। মরাঠী ভাষায় মী শব্দটি প্রথমা ও তৃতীয়া উভয়েরই একবচনে প্রযুক্ত হয়। গুজরাটী ও পঞ্জাবী ভাষায়ও তৃতীয়ান্ত ‘মৈঁ’ পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বতন প্রথমান্তরূপের পরিত্যাগ ও পরে অন্যান্য বিভক্তির রূপ হইতে প্রথমার একটি নূতন রূপ গ্রহণে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; বরং ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, (ক) একমাত্র প্রথমা অপেক্ষা অপর সকল বিভক্তির সমবেত প্রয়োগস্থল অনেক অধিক হইবারই কথা; তাহার উপরে অবার, (খ) কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য বহু প্রচলিত থাকায় প্রথমান্ত পদের ব্যবহার আরও অল্প হইয়াছিল, আরও বিশেষতঃ (গ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃকারক অনেক সময়ে উহ্য থাকে; যেমন, উত্তমপুরুষে ‘একথা কালি শুনিয়াছি,’ ‘কি হইয়াছে জানি না,’ ‘এ বিষয় ভাবিয়া দেখিব’, ইত্যাদি; মধ্যমপুরুষে —‘কবে আসিয়াছ?’ ‘এ কাজটি অবশ্য করিবে, ‘সেখানে যাওত তাহাকে আসিতে বলিও’ ইত্যাদি। সুতরাং অল্পব্যবহৃত রূপটি, কালে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং বহুব্যবহৃত রূপগুলির সদৃশ একটি রূপ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

হিন্দী প্রভৃতি ভাষার দৃষ্টান্তে ‘মুই’ সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত ‘ময়া’ প্রাকৃত ‘মই’ বা ‘মএ’ অপভ্রংশ প্রাকৃত মইঁ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। কিন্তু আমার বোধ হয়, এতদূর নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কারণ বাঙ্গালাভাষায় হিন্দীর ন্যায় কর্ম্মণি প্রয়োগ দেখা যায় না। বীম্‌স্ সাহেব বাঙ্গালা ‘মুই’ ও উড়িয়া ‘মু’ শব্দের অন্যরূপ উৎপত্তি অনুমান করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃত ‘অহম্’ হইতে প্রাকৃত ‘অহমং’ এবং তাহা হইতে অপভ্রংশ ‘হমুঁ’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; এই ‘হমুঁ’ শব্দের হ-কার লুপ্ত হইয়া, সম্ভবতঃ একসময় ‘অমু’ ও ‘অমুই’ রূপ উৎপন্ন হয়; পরে তাহা হইতে ‘মু’ ও ‘মুই’ পদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই হমু হইতেই হিন্দী ‘হোঁ’ ও ‘হুঁ’ শব্দ আসিয়াছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আদ্যব্যঞ্জনলোপের দৃষ্টান্ত প্রাকৃত কি কোন প্রাচীন ভাষায়ই বিরল। এমন অবস্থায় বীম্‌স্ সাহেবের ব্যুৎপত্তি কতদূর সম্ভবপর তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। তবে তিনি যে বলেন, ‘মুই’ শব্দের ই-কার inorganic অর্থাৎ অতিরিক্ত সংযোজিতাঙ্গ, তাহা উড়িয়া ভাষার ‘মু’ এবং বাঙ্গালারও প্রথমেতর বিভক্তির ‘মো’ দেখিয়া, খুব সম্ভব বোধ হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ‘মুঞি’ রূপ দেখিয়া কিন্তু একথা সন্দেহজনক বোধ হয়।

আর একটি কথা বলিয়া উত্তমপুরুষের কথা শেষ করিব। কালিদাসকৃত ‘বিক্রমোর্ব্বশী’ নাটকের কলিকাতার সংস্করণে একস্থলে দেখিতে পাই, পুরূরবা বলিতেছেন,

“এ মঞি পুহবি ভবন্তে জই পিঅ পেক্খি হিত্রি।”

অর্থাৎ আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যদি প্রিয়াকে দেখিতে পাই! এখানে ‘মঞি’ শব্দের অর্থ ‘আমি’ (১মা) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি এই পাঠ ঠিক হয়, তবে বাঙ্গালা ‘মুই’ শব্দটির প্রাকৃত প্রথমান্ত এই ‘মঞি’ হইতে উৎপত্তি অসম্ভব নহে! কিন্তু এই সিদ্ধান্তে

কয়েকটি আপত্তি মনে হইতেছে। (১) এরূপ প্রয়োগ আর কোথা দেখা যায় না, সুতরাং এই পাঠসম্বন্ধে সন্দেহ আসিতে পারে। (২) এ কথাটি রাজা পুরূরবা কর্ত্তৃক উর্ব্বশীবিরহে উন্মত্তাবস্থায় গীত সঙ্গীতে অন্তর্গত। উন্মত্তের ভাষা অনেকটা বাদ-সাদ দিয়া লইতে হয়; আর কেবল এইস্থলে নহে, রাজার ঐ সময়ে গীত সমস্ত গানগুলির ভাষা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর সহিত তুলনায় নিতান্ত অশুদ্ধ প্রাকৃত। (৩) এস্থলে 'মঞ্জি' শব্দটি ৩য়া বা ৭মী বিভক্ত্যন্ত ধরিয়াও, আমা বিবেচনায়, বেশ অর্থসঙ্গতি করা যাইতে পারে।

মধ্যমপুরুষের রূপগুলি—তুমি, তুই, তোমা-, তো-, তোমরা— উত্তমপুরুষেরই অনুরূপ। কিন্তু প্রয়োগে কিছু ভেদ আছে। তুই, তো-, প্রায় সর্ব্বদাই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়; কেবল আত্যন্তিক প্রেম-ঘনিষ্ঠতা বা ক্ষোভপ্রকাশস্থলে কখনও কখনও তুচ্ছার্থ ভিন্নও ইহা প্রয়োগ দেখা যায়. যেমন, ব্রাহ্মসঙ্গীতে "মা তুই প্রেমে উন্মাদিনা," এবং "বিধিরে, তোর কি এই বিচার?" ইত্যাদি।

তুমি, তোমা, ব্যাকরণে সম্ভ্রমার্থক বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ইহার প্রয়োগ বাস্তবিক সেইরূপ স্থলেই হইয়া থাকে, যেখানে সম্ভ্রম দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই, অথচ অবজ্ঞা প্রদর্শনও অভিপ্রেত নহে। এজন্য মান্য ব্যক্তিকে কোনও ভদ্রলোক 'তুমি' সম্বোধন করেন না। যদি বিশেষ বন্ধুতা বা বয়সের বেশী পার্থক্য না থাকে, তবে সমপদস্থ কি ন্যূনপদস্থ ভদ্রলোককেও 'তুমি' বলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল স্থলে আপনি শব্দ প্রযুক্ত হয়। সম্মান-পাত্রের মধ্যে কেবল মাতাকে অনেকে 'তুমি' সম্বোধন করেন, এবং দেবতার প্রতি 'তুমি' শব্দই ব্যবহৃত হয়। মাতাকে 'তুমি' ডাকা প্রণয়-ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক। দেবতার প্রতি তুমি শব্দের প্রয়োগে সকল সময়ে প্রণয়-ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না। বোধ হয় ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল

এজন্য তাহার মধ্যে প্রাচীন 'তুমি' শব্দের স্থান নূতন আমদানি 'আপনি' শব্দ অধিকার করিতে পারে নাই।

যে সকল যুক্তিবলে 'আমি' ও 'মুই' ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক উত্তম পুরুষের বহুবচন ও একবচনের রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, 'তুমি' ও 'তুই', এই দুইটি পদেও সেই সকল যুক্তি প্রযোজ্য। (১) হিন্দী তুম্, গুজরাটী তমে, মারাঠী তুম্হী, নেপালী তিমী বহু-বচনান্ত পদ। হিন্দী 'তুম্' কখনও একার্থে প্রযুক্ত হইলেও বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদের সহিতই অন্বিত হয়। (২) উড়িয়া 'তুম্হে' ঠিক বাঙ্গালা তুমির তুল্যার্থক, অথচ ইহার বানান প্রাকৃত মধ্যমপুরুষের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'তুম্হে' পদের ন্যায়। (৩) প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে 'তুমি' কে 'তুহ্মি' লেখার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। (৪) 'আমি' পদের সহিত অনেক বিষয়ে মিল থাকায়, 'তুমি' পদের উৎপত্তিও 'আমি'র উৎপত্তির অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। এই সকল কারণে প্রাকৃত প্রথমার একবচন 'তুমং' পদের সহিত 'তুমি'র সাদৃশ্য থাকিলেও বহুবচন 'তুম্হে' হইতেই ইহার উৎপত্তি অধিক সম্ভবপর। পক্ষান্তরে, একবচনে হিন্দী তূ, তৈঁ, গুজরাটী তুঁ, মারাঠী তূঁ নেপালী ত, ইহাদের সর্ব্বত্রই ম-কারের অভাব, সুতরাং বাঙ্গালা 'তুই' ইহাদেরই সমস্থানীয়, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, প্রাকৃত ১ বচন, ২য়া তুং, ৩য়া তই, তত্র, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠী তুহ ও ৭মী তই, তত্র পদের সহিত 'তুই' পদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'তুই' পদের 'ই'কার বোধ হয় অধিকাঙ্গ বা পশ্চাৎ-সংযোজিতাঙ্গ; কারণ (১) আর কোনও ভাষায় এই 'ই'কার নাই; হিন্দী তৈঁ পদে ইহার আভাষ আছে মাত্র, (২) প্রথমার একবচন ভিন্ন বিভক্তির রূপ 'তো' ই-কার বর্জ্জিত। 'তোমা' এই রূপটি বোধ হয় প্রাকৃত তুমাহিংতো প্রভৃতি হইতে গৃহীত। আকারের সামীপ্য বশতঃ উ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যের

তুয়া (তুআ) পদটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'তব', প্রাকৃত 'তুহ' হইতে উৎপন্ন।

সংস্কৃত বহুবচনের 'যুষ্ম' ভাগ স্থানে 'জুম্‌হ' না হইয়া 'তুম্‌হ' হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, বোধ হয় ইহা একবচনের প্রভাব ও অনুকরণের ফল।

সম্মানপ্রদর্শনস্থলে মধ্যমপুরুষের অর্থে 'আপনি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সংস্কৃত 'ভবৎ' শব্দের ন্যায় ইহার ক্রিয়া প্রথমপুরুষীয় হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত 'আত্মন্' প্রাকৃত 'অপ্পা,' 'অপ্পাণো' পদ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে এই শব্দটির মধ্যমপুরুষের অর্থে কোথাও প্রয়োগ আছে কিনা সন্দেহ। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই নাই। আর নিম্নশ্রেণীর লোকে এখনও 'আপনি' শব্দটির ব্যবহার করে না, 'তুমি' বলে। সুতরাং আমার বোধ হয় শব্দটি অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে সেই ভাষাটি হিন্দী অথবা উড়িয়া হইতে পারে, এবং উড়িয়ার মধ্য দিয়া মারাঠী ভাষার সহিতও এ বিষয়ের সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। শব্দটি হিন্দীতে আপ, উড়িয়ায় "আপে" বা "আপণ," মারাঠী আপণ। ণ-কারের দিকে চাহিলে উড়িয়া ও মারাঠীর দিকেই ঝোঁক দিতে ইচ্ছা হয়। ই-কারটি কিন্তু বাঙ্গালায়ই আছে, এবং এ বিষয়ে 'ইনি' 'উনি' 'যিনি' প্রভৃতি সম্ভ্রমার্থক পদের সহিত আপনি শব্দের সাদৃশ্য আছে। এজন্য অনুমান হয়, ঐ সকল শব্দের ন্যায় আপনি শব্দের 'নি' ভাগ বহুবচনের চিহ্ন বা বহুবচন হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীপরেশনাথ সেন।

মাতৃপূজা।

যুগযুগান্তর ধরি' চক্রনেমি ক্রমে,
শত আবর্ত্তের মাঝে, জনমে জনমে,
জনপদে শৈলসিন্ধুসরিতকান্তারে
তোমারে পূজিয়াছিনু, কি কি উপচারে,
মনে নাহি, অয়ি দেবি, জননি আমার!
আজি এই উষালোক তরুণা ধরার
বৃদ্ধবট-গিরিশির, গলিত কাঞ্চনে,
সদ্যঃ পরিস্নাত, স্নিগ্ধ, কৌষেয় বসনে
ব্রাহ্মণ বটুর মত স্থির, অবিচল;
বাপীহ্রদসরসীর স্বচ্ছ নীলজল,
তরল আনন্দসম শ্যামা প্রকৃতির;
বিচিত্র কুসুমদাম, জগৎ-লক্ষ্মীর
পূর্ণসুধাপাত্রসম, ধীর সমীরণ
জননীপরশরূপে পশিছে মরম।
লতাকিশলয়গুলি, স্নিগধ শ্যামল,
যেন তারা স্নাত পূত, পেয়ে' শান্তি জল
তপস্বিনী ধরণীর কমণ্ডলু হ'তে।
সবি পরিপূর্ণ করি' নিখিল জগতে
বিরাজিছে শরতের শান্ত নভস্তল
ভিন্নাঞ্জনসমনীল অপার, অতল।
ওই অভ্রপোতগুলি দূরনীলিমায়
বালাতপে রক্তশির, আকাশ গঙ্গায়

যেন ঐরাবতশিশু—কুম্ভদেশ'পরে
সুন্দর সিন্দুর-রাগ, পূরব অম্বরে
উষার লাবণ্য হাসি, তরল লীলায়
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছে দিগন্ত সীমায়।
বনান্ত প্লাবিয়া দূরে মধুর রাগিনী
বিহগের কলকণ্ঠে ; দিগন্ত রঙ্গিণী
বিলাসিনী দিগ্বধূরা, যেন গো উল্লাসে,
সমতান, মধুকণ্ঠে, কম্পিত উচ্ছ্বাসে,
গাহিতেছে, অয়ি মাতঃ, তোমার বোধন।
হেরি' তব পূজাতরে এত অয়োজন,
ধরণীতে, মহাকাশে, বিশ্বচরাচরে,
বড় সাধ, চিরারাধ্যে জেগেছে অন্তরে
ও রাঙ্গা চরণমূলে বসি' একবার
হেরি পূজাবিধি তব, পূজার সম্ভার।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

(২)

মালাবার ধ্বংশ করিয়া,—দগ্ধ করিয়া,—আরববণিকদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা যখন লিস্‌বন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ভারতমহাসাগরে বাণিজ্য এবং কোচিনের কুঠী সংরক্ষণের নিমিত্ত তিনি ভিন্‌সেণ্টি সোদ্রিকে রাখিয়া গেলেন। সোদ্রি কিয়দ্দূর অবধি ডা-গামার অনুবর্ত্তী হইয়া বৈদেশিক বণিক্-কুলের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন, নিমজ্জন ও দহনব্যপদেশে প্রত্যাগমন করিলেন ; ডা-গামার ইহাই আদেশ ছিল।

গামার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদিন প্রভাতে সোদ্রির সহিত কালিকাট নৌ-বহরের সাক্ষাৎ ঘটিল। সেনাপতি কোজাম্বর কালিকাটের অন্যতম নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কুড়ি খানি বৃহৎ রণ-তরী হইতে কামান গর্জ্জিয়া ফিরিঙ্গি সোদ্রির অভিনন্দন করিল। সোদ্রিও হীনবল ছিলেন না ; তাঁহারও জাহাজ হইতে একটী কামানের গোলা অব্যর্থ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত হইয়া কালিকাট সেনাপতির প্রধান জাহাজের গুণবৃক্ষ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল—জামোরিণের বিজয়-পতাকা, ভগ্ন গুণবৃক্ষসহ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া গেল। অদূরে খোজা কাসেম আরও কতকগুলি রণতরী লইয়া প্রস্তুত ছিলেন—সোদ্রি তাঁহাকেও আক্রমণ করিলেন। তখন কোজাম্বর ও কাসেমের সহিত পর্ত্তুগীজ-দিগের মহা সমর উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গিগণ অব্যর্থ-সন্ধান এবং তাঁহাদিগের রণতরীও কামানে, বারুদে সুসজ্জিত ছিল—জামোরিণের সেনাপতিদ্বয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

পলায়নপর কাশেমের একখানি জাহাজ পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ধৃত

হইল ; বিজয়ী সোড্রি সেই জাহাজ লুণ্ঠনপূর্ব্বক বহুমূল্য পণ্যসামগ্রী এবং কতকগুলি সুন্দরী কিশোরী সংগ্রহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী মুর-বণিকের স্ত্রীপুত্র-পরিবারও সেই জাহাজে ছিল, পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল ; মহম্মদের মণিমুক্তাখচিত একটী কনকমূর্ত্তি সোড্রি, বিজয়গৌরবে লাভ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। রণমত্ত পর্ত্তুগীজ-সেনাপতির রণপিপাসা তখনও তৃপ্ত হয় নাই ; তিনি অবিলম্বে পলায়নমুখী বাণিজ্য তরণীগুলি আক্রমণ করিলেন। নিরুপায় মুরগণ ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সমুদ্র-গর্ভে ঝম্প প্রদান করিল। সেই সকল পরিত্যক্ত, শূন্য তরণী-সমূহ কালিকাটের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া ফিরিঙ্গি সোড্রি প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগের অগ্নিসৎকার করিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধুমরাশি বিপুল বিক্রমে শূন্যে উত্থিত হইয়া কালিকাট সিংহাসনতলে পর্ত্তুগীজ বিজয়কাহিনী বিজ্ঞাপিত করিল ; বালুময় বেলাভূমে দাঁড়াইয়া ভীতি-বিহ্বল "নেটিভ"গণ দেখিতে লাগিল জলধিহৃদয় দাবানলে সমাচ্ছন্ন, প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে যেন এক একটী অনল-শৈল কালিকাট দগ্ধ করিবার জন্য অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাস্কো-ডা-গামা তখনও ভারতবর্ষের ছায়া পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দলবলসহ কানানোরে সোড্রির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সোড্রির নিকট রণবার্ত্তা শ্রবণে বিমুগ্ধ গামা কানানোর কুঠীর সুবন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। ডা-গামা বুঝিয়াছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ-সংস্থাপন ভিন্ন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের স্থান হইবে না। প্রকাশ্যে দুর্গনির্ম্মাণপ্রস্তাব অপ্রীতিকর হইবে মনে করিয়া নানা উপায়ে কানানোরাধিপতিকে বুঝাইয়া গামা অনেকগুলি কামান এবং তদুপযুক্ত গোলা, বারুদ কানানোর-কুঠিতে স্থাপন করিলেন—যুদ্ধোপকরণগুলি তখনকার মত ভূমিতলে প্রোথিত রহিল।

দুর্গ সুরক্ষিত করিতে হইলেই সুদৃঢ় প্রাচীর প্রয়োজন। কানানোরের কুঠীই তখন ফিরিঙ্গিদিগের দুর্গ। ভাস্কো-ডা-গামা কানানোরের অধিপতিকে কৌশলে সম্মত করাইয়া কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কানানোরের রাজা মনে করিলেন 'ইহাতে ক্ষতি কি ? কুঠীতে যে সকল পর্ত্তুগীজ বণিক বাস করিবে তাহাদিগের আত্মরক্ষা এবং ধনসম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কুঠী প্রাচীর বেষ্টিত রাখা নিতান্তই প্রয়োজন ; ইহাদিগের মনে কখনই কোন কু-অভিসন্ধি নাই—ইহারা যখন এই স্থানেই বাস করিবে তখন সকলেইত আমার-ই প্রজা'। অবিলম্বে কানানোর কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় সুদৃঢ় প্রাচীর মস্তক উত্তোলন করিল। প্রাচীর হইলেই আগম-নিগমের পথ প্রয়োজন ; সুতরাং সেই প্রাচীরগাত্রে একটা সুবৃহৎ দৃঢ় সিংহদ্বার নির্ম্মিত হইল। ডা-গামা রাজাকে বুঝাইলেন উপদ্রবকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সিংহদ্বার বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। দ্বারের চাবি আমার নিকটেই থাকিবে, আমি প্রতি রাত্রে উহা বন্ধ করিব এবং প্রভাতে আবার খুলিয়া দিব!

ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে চিরদিন থাকিতে আসেন নাই ; স্বদেশবাসী যাহারা ভারতবর্ষে থাকিল সেই সকল পর্ত্তুগীজদিগের জন্য যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিয়া ১৫০২ সালের এক সুন্দর প্রভাতে ডা-গামা সত্য-সত্যই স্বদেশ যাত্রা করিলেন—সিংহদ্বারের চাবি 'কুঠীয়াল'দিগের হস্তে রহিল। ভিন্‌সেন্টি সোড্রি কাপ্তান-মেজর পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারত-মাহাসাগরের কর্ত্তৃত্বভার (!) গ্রহণপূর্ব্বক কালিকাটরাজের যথাশক্তি অনিষ্ট করিবার এবং সুবিধা হইলে মক্কাযাত্রী মুর-জাহাজগুলি লুণ্ঠন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে-অবতীর্ণ হইলেন।

অপমানিত, পীড়িত জামোরিণ সর্ব্বদাই প্রতিশোধ লইবার অবসর

অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কোচিনরাজ ত্রিমম্পুরা ফিরিঙ্গি বণিকদিগের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রকারেই হউক কোচিনরাজ্য হইতে চিরশত্রু ফিরিঙ্গিদিগকে বিতাড়িত করিতেই হইবে। অবসর বুঝিয়া আবার বণিকসম্প্রদায়ও জামোরিণকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল,—ফিরিঙ্গি বণিকদিগের অত্যাচার তাহাদিগকে উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিমম্পুরার সভাসদ্‌গণ, এই কাল সমর হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল—কিন্তু শরণাগত, আশ্রিত ফিরিঙ্গিদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি জামোরিণের সহিত সমর শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন।

ক্রুদ্ধ জামোরিণ ৫০,০০০ সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে কোচিনের সন্নিকটবর্ত্তী রেপোলিমদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময়, সোদ্রিও কোচিনে উপস্থিত হইলেন; ফারনাণ্ডেজ, কোরিয়া প্রভৃতি পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ সহস্র অনুরোধ করা সত্ত্বেও সোদ্রি আপনার রণতরী এবং সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিলেন। কেহ বলেন জামোরিণের ভয়ে এবং কেহ বলেন লোহিত-সাগরে মুরবণিকদিগের বহুমূল্য পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণীসমূহ লুণ্ঠন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী হইবার মানসেই সোদ্রি কোচিনরাজের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন না, এমন কি তাঁহার প্রবাসী স্বদেশবাসীদিগকেও বিস্মৃত হইলেন।

জামোরিণের সহিত ত্রিমম্পুরার ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। জামোরিণের অর্থলোভে ত্রিমম্পুরার সৈন্যমধ্যে অনেকে জামোরিণের পতাকানিম্নে সমবেত হইয়া কোচিনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ডা-গামার সহিত দুইজন ইতালিয় ভারতবর্ষে আসিয়া কোচিনে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাস করিতেছিল; তাহারাও কোচিনরাজের পক্ষ

রিত্যাগপূর্ব্বক জামোরিণের পক্ষ অবলম্বন করিল। ত্রিমম্পুরা রাজিত হইয়া কোচিন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ভিপিনদ্বীপে লায়ন করিলেন—পলায়নকালে শরণাগত ফিরিঙ্গিদিগকে বিস্মৃত হইলেন না। জামোরিণ কোচিন অধিকার করিলেন বটে—কিন্তু ভিপিনদ্বীপ করায়ত্ত করিতে পারিলেন না—কোচিনে কালিকাট বিজয়-তাকা উড্ডীন হইল।

এদিকে লুব্ধ সোদ্রি স্বদেশবাসী এবং বন্ধু কোচিন-রাজের বিপদে তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া লুণ্ঠনমানসে লোহিতসাগরে গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের চক্ষে এতটা সহ্য হইল না;—পথিমধ্যে ভীষণ ঝঞ্ঝায় তাঁহার জাহাজগুলি নিমগ্ন হইল, সোদ্রি এবং তাঁহার ভ্রাতা শাল তরঙ্গাঘাতে কোথায় ভাসিয়া গেলেন কেহ জানিল না!

পর্ত্তুগাল-রাজসিংহাসনে বসিয়া ডম ম্যানুয়েল দেখিলেন, যতদিন ামোরিণ মুরবণিকদিগকে সাহায্য করিবেন, ততদিন ভারতবর্ষে র্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। জামোরিণকে পরাস্ত করিয়া দলিত রিতে না পারিলে ভাস্কো-ডা-গামার ব্যয়সাধ্য, আয়াসসাধ্য অভিযান র্থহীন ও নিস্ফল হইয়া যাইবে, পর্ত্তুগালের সকল আশা-ভরসা বিফল ইবে। তাই তাঁহার আদেশে নয়খান অতি বৃহৎ রণতরী সুসজ্জিত ইল। আফন্সো-ডা-আল্‌বুকার্ক ও তাঁহার ভাগিনেয় ফ্রান্সিস্‌কো-া-আল্‌বুকার্ক ছয়খানি জাহাজ লইয়া ভারতীয় পণ্যসংগ্রহে যাত্রা রিলেন এবং অবশিষ্ট তিনখানি জাহাজ লইয়া আণ্টোনিও-ডা-ল্‌ধানা লোহিতসাগরে মক্কার বাণিজ্য-শাসনে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধান্তে কোচিনে কতক সৈন্যসামন্ত রাখিয়া জামোরিণ, কালিকাটে ত্যাগত হইয়াছিলেন—সৈন্যগণ নিশ্চিন্তমনে কোচিনে অবস্থান রিতেছিল। ফ্রান্সিসকো-ডা-আল্‌বুকার্ক অকস্মাৎ তথায় আসিয়া নাত হইলেন। জামোরিণের সৈন্যগণ ফিরিঙ্গির ভয়ে এতই ভীত

হইয়াছিল যে পুনরায় তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা পাইবা মাত্র কোচিন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শরণাগতরক্ষক বলিয়া ফ্রান্সিস্কো, কোচিনরাজের যথেষ্ট সাধুবা করিলেন এবং ডম ম্যানুয়েলের নামে তাঁহাকে ১০,০০০ মুদ্রা (Ducat উপঢৌকন প্রদান করিলেন। কোচিনরাজ বিনা আয়াসে স্বসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ত্রিমম্পুরা সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর বিদ্রোহী-শাসনে সময় আসিল। নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপাধিপতি কোচিন-সিংহাসনচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক জামোরিণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলি ফিরিঙ্গির কঠিন শাসন-দণ্ড প্রথমে তাঁহার শিরেই নিপতিত হইল দ্বীপবাসীগণ শতে, সহস্রে হত হইয়া ফিরিঙ্গির শোণিত-তৃষা মিটাইতে লাগিল; গ্রাম, জনপদসমূহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া ফিরিঙ্গি বিক্রম ঘোষণা করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গির সুশাণিত কৃপাণ দ্বীপাধি রাজঅন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিল। রাজপুরী লুণ্ঠিত হইল রাজরক্ত ভূমিপৃষ্ঠে অত্যাচারের চিত্র লিখিল, প্রাণহীন জনপদ শ্মশান তুল্য হইয়া উঠিল।

ক সাগ দেখিতে দেখিতে রেপেলিম ফিরিঙ্গির রণকোলাহলে শিহরি ং ও উঠি [illegible]ল। সেই স্থানে একদিন জামোরিণের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছি বলিয়া [illegible] রেপেলিম-অধিবাসীগণ দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। রেপেলি রাজকুম[illegible]র বীরোচিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন; তাঁহার সৈন্যে[illegible]গণ শত্রুর কৃপাণে-কামানে, কেহবা সমুদ্রগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জ দিল। সেই [illegible] সমৃদ্ধিশালী জনপদ অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হই শিকরশীতলসমী[illegible]গ্নিস্পর্শে সাগরগর্ভে উড়িয়া গেল।

পর্ত্তুগীজদিগে[illegible]র সখ্যে ও বীরপনায় কোচিনরাজ পরম প্রীত হই ছিলেন; ফিরিঙ্গির[illegible] যে তাহা বুঝিতে না পারিয়াছিল এমন নহে

ভাস্কো-ডা-গামা একদিন যাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, আজ ফ্রান্সিস্কো-ডা-আল্বুকার্ক তাহারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিবার শুভমুহূর্ত্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সময় বুঝিয়া একদিন ত্রিমম্পুরার নিকট প্রস্তাব করিলেন, কোচিনরক্ষার্থ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত প্রয়োজন; দুর্গ নির্ম্মিত হইলে রাজারই মঙ্গল, পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল দিগেরও যে সুবিধা না হয় তাহাও নহে! কিন্তু কোচিনরাজেরই পরম মঙ্গল; কারণ জামোরিণ যদি শত্রুতাবশে আবার কোনও দিন কোচিন আক্রমণ করেন তাহা হইলেও আর আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবেনা। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের ইহাই সনাতন রীতি—ইঁহারা নিজের জন্য রাজ্য জয় করেন না, রাজ্য শাসন করেন না—ইঁহাদিগের যত আত্মত্যাগ কেবল পরের জন্য! সাধ করিয়া পরের বোঝা বহিবার কেন যে এত আকাঙ্খা তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। বুদ্ধিমান্ কোচিনরাজও তাহা বুঝিতে হার মানিয়াছিলেন।

ত্রিমম্পুরা যাঁহাদিগের অনুগ্রহে নিজরাজ্য, সিংহাসন, এমন কি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না—প্রত্যাখ্যান করিবার ইচ্ছাও তাঁহার হইল না। এমন হিতৈষী বন্ধুর উপর কোন ক্রমেই তাঁহার অবিশ্বাসের কারণ ছিলনা। ত্রিমম্পুরা হৃষ্টচিত্তে দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন এবং ব্যয়ভার সমস্তই বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন!

অবিলম্বে একটী উপযুক্ত উচ্চ স্থান ফিরিঙ্গিদিগের সহিত পরামর্শে মনোনীত হইল; রাজার আদেশে সহস্র ব্যক্তি দুর্গনির্ম্মাণের সাহায্য করিতে লাগিল, ফিরিঙ্গিগণও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না। ফিরিঙ্গিদিগের উৎসাহে এবং একাগ্র চেষ্টায় ও সর্ব্বসাধারণের এবং রাজার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম শিলাদুর্গ নির্ম্মিত হইল। ভারতে পর্ত্তুগীজ অধিকার

প্রতিষ্ঠার সেই প্রথম সোপানকে ফিরিঙ্গিগণ আশায়, আনন্দে, উদ্বেলিত হৃদয়ে দর্শন করিতে লাগিল। ভারত-মহাসাগরের সুনীল সফেন তরঙ্গভঙ্গে স্তূয়মান হইয়া সেই নবীন শিলাদুর্গ, শক্তি ও দার্ঢ্যের, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার অনলমূর্ত্তিসদৃশ ইমানুয়েলের পবিত্রনাম গ্রহণ করিয়া "ম্যানুয়েল" আখ্যায় পরিচিত হইল !

রেপেলিম অথবা এচ্ছপল্লিদ্বীপের অংশবিশেষ ধ্বংশ করিয়াও ফিরিঙ্গিগণ শান্তি লাভ করিতে পারিল না, অল্পকালমধ্যেই তাহারা রেপেলিম-রাজকুমারের অন্যান্য নগর, গ্রাম প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া শতসহস্র নিরপরাধ নাগরিকদিগকে নৃশংসরূপে নিহত করিল। এই সংবাদ যখন নেয়ারদিগের নিকট পৌঁছিল তখন ৬০০০ সহস্র নেয়ার জীবনপণ করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। নেয়ারজাতি সমরে দুর্দ্ধর্ষ; তাহারা অমিতবিক্রমে ফিরিঙ্গিদিগের সম্মুখীন হইল—সমরপটু সুদৃঢ় করে তীক্ষ্ণধার খরষাণ লইয়া নেয়ারগণ স্বদেশ ও স্বজনদিগের জন্য অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল।* ফিরিঙ্গি

* ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় ".ফরিঙ্গি বণিক্" প্রবন্ধের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেনঃ—"ফিরিঙ্গি বণিকের সেনাবল অধিক ছিলনা; পাকিও অনন্যোপায় হইয়া নায়ার-বংশীয় সিপাহীগণকে পল্টনভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে ফিরিঙ্গির বাহুবলের সহিত ভারত-বাসীর বাহুবল সংযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের পরাজয় সাধনে অগ্রসর হইল। ভারত-বর্ষের যে জাতি স্বদেশের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ফিরিঙ্গি পল্টন ভুক্ত হয়, তাহারা নায়ার নামে অদ্যাপি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।" নায়ারগণ স্বজন-স্বদেশদ্রোহী হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কোচিনের ফিরিঙ্গিবণিকের যুদ্ধবর্ণনায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—The report of this attack soon spread, and the whole country rose in arms to expel the invaders, *while above 6,000 Nairs hastened to the assistantce of this country men.* These attacked the Portuguese with so much fury that they forced them to retreat and drove them back to the river, ...in this retreat *Durtate Pacheco* had a narrow escape of being cut off, and would probably have them taken, or killed, had নহি Albuquerque gone to his aid."

বণিক বুঝিল এদেশেও যোদ্ধা আছে, এখানেও বিক্রম আছে—এ দ্বীপেও রণকৌশল আছে। তাহারা অধিকক্ষণ টিকিতে পারিলনা—নেয়ারদিগের আক্রমণে পশ্চাৎপদ হইয়া নিকটবর্ত্তী নদীর আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশেষে কোনক্রমে কোচিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবন রক্ষা করিল ! যদি আল্‌বুকার্ক সময়মত সাহায্য করিতে না পারিতেন তাহা হইলে হয়ত সকলেই নিহত হইতেন।

সেদিনের মত পর্ত্তুগীজগণ হটিয়া গেল বটে কিন্তু পরদিন রাত্রে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের পর ফিরিঙ্গিগণ অনেকগুলি গ্রাম দগ্ধ করিয়া অতি প্রত্যূষে কাম্বালাম্‌দ্বীপে উপনীত হইল। কাম্বালামে ৭০০ অধিবাসীর তপ্ত শোণিতে সাগরসলিল রঞ্জিত হইয়া উঠিল—ফিরিঙ্গিগণ তখন উন্মত্ত, একান্ত শোণিত-লোলুপ, জামোরিণের শত্রুতাসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ! কাম্বালাম ভস্ম করিয়া তাহারা উন্মুক্ত শোণিতসিক্ত কৃপাণ করে জামোরিণের রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা-কিছু সম্মুখে দেখিতে লাগিল তাহাই নিঃশেষে ধ্বংশ করিতে লাগিল।

সম্মুখসমরে অকৃতকার্য্য হইয়া জামোরিণ মুরবণিকদিগের সহিত কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন ফিরিঙ্গিরা নানাপ্রকার মসল্লা লইবার মানসেই ভারতে আসিয়াছে যদি ওই সকল সামগ্রী না পায় তাহা হইলে আপনা হইতেই মালাবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এদিকে জামোরিণ তৎকর্ত্তব্যবিধানে চেষ্টিত হইলেন কিন্তু কৌশলী আল্‌বুকার্ক, কুইলনের রাজমহিষীর রাজ্য হইতে দুইখানি জাহাজপূর্ণ মসল্লা সংগ্রহ করিয়া জাহাজ বোঝাই করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীর সচিববৃন্দ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত ও তুষ্ট করিতে লাগিল, অবশেষে কুইলনে একটী ফিরিঙ্গি কুঠী নির্ম্মাণেরও আদেশ প্রদান করিল। কুইলনে মুর অথবা অন্য

কোন বৈদেশিক বণিক ছিলনা বলিয়াই আল্বুকার্কের সর্ব্ববিষয়ে এত সুযোগ ঘটিয়াছিল।

কুইলনরাজ্য হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে বিদূরিত করিবার মানসে জামোরিণ কুইলনরাজমহিষীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইলনা। রাণী উত্তর দিলেন ফিরিঙ্গি আমার দেশে আসিয়া কোন অত্যাচার করে নাই,—আমার কোন প্রজাকেও নিগৃহীত করে নাই, সুতরাং তাহাদিগের সহিত কেন শত্রুতা করিব।' যাহাহউক, অবশেষে আল্বুকার্কের সহিত জামোরিণের একটী সন্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু ফিরিঙ্গিদিগের অন্যায় আচরণে সে সন্ধি অচিরেই ভঙ্গ হইয়াছিল।

সাগরাম্বরা সুদূর ভারতবর্ষ—একদিন যাহার অন্বেষণে বাহির হইতে কত বীরহৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগাল তথায় ধীরে ধীরে আধিপত্য লাভ করিতে লাগিল। আফন্সা-ডা-আল্বুকার্ক এবং তাঁহার ভাগিনেয় ভারতবর্ষের উপকূলে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য সংরক্ষণের ও বিস্তারের সম্পূর্ণ আয়োজন করিলেন। এদিকে এণ্টনিও-সাল্ধানা আফ্রিকার পূর্ব্বসীমা লুণ্ঠন ও দহনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া লোহিত-সাগরে মুসলমানদিগের সহিত মিসরের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ সুপরিষ্কৃত করিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্ষমতাশালী ভূস্বামীদিগের সহিত আলবুকার্কের যে সন্ধি হইল তাহাতে সেণ্ট-টমাস খ্রীষ্টানদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত সুবিধা-সুযোগগুলি সমস্তই স্থির থাকিল। কুইলনে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিধিব্যবস্থার উপর তদ্দেশবাসী খ্রীষ্টান-দিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল; কোচিনের শিলাদুর্গ ফিরিঙ্গিদিগের বিজয় ঘোষণা করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিল। ইতিপূর্ব্বে ডা-গামার শিষ্য সোদ্রিও মালাবার উপকূলে লুণ্ঠনাদি করিয়া পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

আফন্সো-ডা-আল্বুকার্ক বোধ হয়, আরও অধিকদিন ভারতবর্ষে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয়র সহিত বিবাদ হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন ভাস্কো-ডা-গামা ভারত হইতে লিসবনে উপনীত হইয়া যেরূপ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, আল্বু-কার্কও সেইরূপ সম্মানিত হইলেন। পাঁচমণ ছোট মুক্তা, অর্দ্ধমণ বড় মুক্তা, এক খণ্ড বৃহৎ হীরক, এবং একটী পারসীক ও অপরটী আরব এই দুই অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন লইয়া যখন আল্বুকার্ক লিস্বন নগরে উপস্থিত হইলেন তখন চতুর্দ্দিকে উল্লাসের কোলাহল সমুত্থিত হইল।

ফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার জামোরিণ বিস্মৃত হইলেন না। আফন্সোর ভারত পরিত্যাগের পরই তিনি মালাবারের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোচিনের ফিরিঙ্গিদিগকে দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ২৮০ খানি রণতরী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; ৩৮২টী কামান এবং সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে জামোরিণ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ফিরিঙ্গি দুরাতি পার্টেকো কোচিনরাজের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ফিরিঙ্গি ও দেশীয় সর্ব্বসমেত তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৫০০শত মাত্র ছিল।

সেই পাঁচমাসব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিব না। জামোরিণ পিত্তলের রাশি রাশি কামান প্রস্তুত করাইলেন, কিন্তু ফিরিঙ্গির যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। ফিরিঙ্গি বণিকের প্রতিষ্ঠা ভারতের অদৃষ্টলিপিতে অনলাক্ষরে লিখিত ছিল তাই মালাবারের সম্মিলিত রাজন্যশক্তিও ফিরিঙ্গি-বিক্রমের নিকট পরাজয় মানিলেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই বৃথা হইল। শত্রুমধ্যে এই একজন স্বজনদ্রোহী খলস্বভাব দুরাত্মাকে অর্থে বশ করিয়া শত্রুর আহার্য্য, পেয় প্রভৃতির সহিত তীব্র গরল মিশ্রণের চেষ্টাও অবশেষে

নিষ্ফল হইয়া গেল। পুনঃপুনঃ পরাস্ত হইয়া জামোরিণের সৈন্যদ হটিয়া গেল। শেষে ১৯০·০ সহস্র সৈন্যের জীবনপণে জামোরি কোচিন-রাজের নিকট সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

লিসবন সিংহাসনে বসিয়া পর্ত্তুগালাধীপ দেখিলেন, একজন ভারতীয় নৃপতির সহিত আর একজন ভারতীয় নৃপতির যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং একদল যুরোপীয় সৈন্য সংগঠন করিয়া তাহাদিগের অনুকরণে যুরোপীয় সেনাপতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে ভারতে ফিরিঙ্গির শক্তি চিরপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, অজেয় হইতে পারে। তাই নরপতি ম্যানুয়েল অবিলম্বে ১৩ খানি অতি বৃহৎ রণতরীসহ ১২০০ শত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লোপো-সোয়ারেজ এই সৈনিকসম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

যে বন্দরেই আরববণিকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দেখিতে লাগিলেন, সোয়ারেজ ভারতে আসিয়া সেই বন্দরই একেবারে ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। যে সকল ফিরিঙ্গি বণিক পূর্ব্ব হইতেই কালি-কাটে বন্দী ছিল এবং যে দুইজন মিলানিজ সম্প্রতি জামোরিণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সোয়ারেজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। জামোরিণ সোয়ারেজের প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে কিন্তু শরণাগত মিলানিজদ্বয়কে ফিরিঙ্গিকবলে ধরিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না।

এই প্রত্যাখ্যানে ফিরিঙ্গি সোয়ারেজের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; অনতিকালমধ্যে তিনি কালিকাটের উপর অনলবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কালিকাটের ধ্বংশকার্য্য দুই দিন ধরিয়া চলিল। কালিকাট ধ্বংশ করিয়া ফিরিঙ্গি সেনাপতি নিরপরাধ ক্রাঙ্গানোরের

উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি ক্রাঙ্গানোর এবং তাহার বন্দরস্থিত সমুদয় বাণিজ্যতরণী ভস্মসাৎ হইয়া গেল—ইহুদী এবং মুরদিগের উপাসনা-মন্দির পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল।

বুদ্ধিমান ঐশ্বর্য্যশালী আরববণিকসম্প্রদায় তখন বেশ বুঝিতে পারিল, যে ভারতবর্ষ আর তাহাদিগকে স্থান দিতে পারেনা—ভারত উপকুলের শক্তিশালী রাজন্যবর্গও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে তাহা-দিগকে রক্ষা করিতে নিতান্ত অক্ষম। তাই একদিন আপন আপন ধনরত্নাদি জাহাজে তুলিয়া তাহারা আরব ও মিসরে যাত্রা করিল। সোয়ারেজের শ্যেনদৃষ্টি পলায়নপর মুরদিগের উপর নিপতিত হইবা মাত্র তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ১৭ খানি বানিজ্যতরণী লুণ্ঠিত করিলেন—২০০০ সহস্র হতভাগ্য মুর বণিক নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়া সমুদ্রের শীতলগর্ভে স্থানলাভ করিল! চতুর্দ্দিক চিতাধুমে সমাচ্ছন্ন করিয়া লোপো-সোয়ারেজ সগৌরবে লিস্‌বনে ফিরিয়া গেলেন!

অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া, অনেক প্রাণ বলি দিয়া, বহু অর্থ নষ্ট করিয়া, শেষে মহা সমৃদ্ধিশালিনী কালিকাটনগরীর চিতাভস্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু জামোরিণ এতদিনে বুঝিতে পারিলেন, আরব বণিকদিগের প্ররোচনায় ফিরিঙ্গিবণিকের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সমরক্রীড়ায় কি ফললাভ করিয়াছিলেন। সোয়ারেজ কর্ত্তৃক সঙ্গতি-শালী মুরগণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, আর সেই সঙ্গে জামোরিণের সকল আশা, সকল ভরসা ভারতসাগরের চঞ্চল তরঙ্গমালার মত ভাসিয়া ভাসিয়া অসীমে মিলাইয়া গেল—তিনি যে তাহাদিগেরই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আশার সুবর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—তিনি যে তাহাদিগেরই সাহায্যে, তাহাদিগেরই অর্থে সমুদ্রতীরে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন—তাহাদিগেরই বাণিজ্য-গৌরবে স্বয়ং গৌরবান্বিত

হইয়া "সামুরি" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন! এতদিনে মালাবারতীরে আরব বাণিজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কনক-সিংহাসন ফিরিঙ্গির বিজয়বিক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল! কেবল শোকসন্তপ্ত বিনষ্টগৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব মালাবারের হা-হা-রোদনধ্বনি বারিধির অনন্ততরঙ্গভঙ্গরব সঙ্গে মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচারকাহিনী জাগ্রত রাখিল আর ফেনাময় বেলাভূমি সেই সকল নিষ্পিষ্ট নিহত ভারতবাসীর তপ্ত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া ফিরিঙ্গির ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিল—

"Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্যপাঠে দেশময় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে যে লর্ড কর্জ্জন ছলে বলে কৌশলে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে বঙ্গবাণীর প্রিয়সন্তান শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন যে আমাদের এখন কর্ত্তব্য দেশের শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া। তাহাতে যে সুধু আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দোষ নিকৃত হইবে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল ফলিবেনা। বিদেশী ও বিধর্ম্মী ও বিজেতা জাতির নিকট আমাদের জাতীয় প্রকৃতির

অনুকূল শিক্ষা আমরা কখনই আশা করিতে পারিনা। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে দেশীয় সভ্য (Fellow) সংখ্যার সঙ্কোচ হওয়াতে এই আশা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরে যখন পাঠশালার নিম্নশ্রেণীতে পঠিতব্য পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনও তিনি সেই কথাটা তুলিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে সরকার বাহাদুরের এই সকল নূতন নূতন প্রস্তাব হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের শিক্ষার ভার আমরা নিজে না গ্রহণ করিলে আর নিস্তার নাই। আবার যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে, তখনও তিনি সেই এক কথা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আজ স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বঙ্গের উভয় খণ্ডেই ছোটলাটবাহাদুর যে ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক নির্য্যাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দরুণ, জাতীয় শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া উচিত, এই কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে।

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন,—'পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। কার্য্যকালে ন সা বিদ্যা কার্য্যকালে ন তদ্ধনম্॥' আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিদ্যা পুস্তকস্থা ত বটেই, আবার পরহস্তগতাও।

পরের প্রসাদে বিদ্যালাভ করা অগৌরবের বিষয় বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা অনিবার্য্য। ইংরেজের নিকট বা ইউরোপের নিকট আর আমরা বিদ্যা চাহিনা, একথা বলিবার সময় আজও আসে নাই। 'স্বদেশী' সাজিব বলিয়া ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের

অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহিনা, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে আমাদের নিতান্ত মতিভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। যে জাপানের উদীয়মান প্রতিভা দেখিয়া আমরা আবার প্রাচ্যভূমির বিজয় ঘোষণা করিতেছি, সেই জাপান আজও শত শত যুবককে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে। বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান বন্ধ করিয়া যদি দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, অন্ততঃ দেশের টাকা দেশেই থাকে, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবেনা। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বাণিজ্য কি তাই বলিয়া বন্ধ করিতে হইবে? আমাদের শাস্ত্রে আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্রও অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর আর কাহাকেও মিথিলা যাইতে হয় নাই, খাস বাঙ্গলাতেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সর্ব্বকালেই প্রয়োজন হইলে বিদেশীর নিকট, এমন কি শত্রুর নিকটও, বিদ্যাগ্রহণ করার নজীর আছে। ইউরোপের কাছে, ইংরেজের কাছে, এখনও আমাদের অনেক শিখিবার আছে, যখন আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারগ হইব, তখন স্বচ্ছন্দে শিক্ষাবিষয়ে ইংরেজের সংস্পর্শ ছাড়িতে পারি। আজকাল বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধ বাঙ্গালী অধ্যাপকমণ্ডিত কলেজের অভাব নাই, তথাপি ছাত্রগণ সরকারী বা মিশনরি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে উৎসুক, ইহার কারণ কি? ইংরেজের কাছে ইংরেজী জ্ঞানবিজ্ঞান ভালরূপ শিক্ষা হইবে এই জন্যইত তাহারা তথায় যায়, স্বজাতির উপর অশ্রদ্ধা বা বিজেতৃজাতির উপর অন্ধ অনুরাগবশতঃ তাহারা কি এই পথ অবলম্বন করে? অতএব এভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিতে

হইলে এদেশে উচ্চশিক্ষার ভার এদেশীয় লোকের লওয়ার সময় এখনও আসে নাই।

আর এক কথা। যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে, সেদিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষাও অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য আছে। এখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ একটী কাজে লাগাইতে হইবে—কাপড়ের কল ও তাঁত সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সূতা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্নদেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয় এমন আর কিছুতেই নহে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবেনা, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইবে! ইংরাজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—Rome was not built in a day. আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় লাগিবে। শনৈঃ পন্থাঃ। ফরাসী বিপ্লবে বার মাসের নাম পর্য্যন্ত বদলান হইয়াছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ঢালিয়া সাজার সময় এক্ষণে আসে নাই। একেবারে সবদিক্ দেখিতে গেলে কোন দিক্ই হইবেনা। ইহাকেই ইংরাজীতে বলে too many irons on the fire। তবে অবশ্য দাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কাহারো হাত নাই। যদি কোন বাঙ্গালী কার্ণেজী কাপড়ের কলের জন্য অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেই অজস্র টাকা ঢালেন তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারি না। ভাবিবার প্রধান বিষয়, টাকা (the Sinews of war)। এক্ষেত্রে নাকি সে ভাবনা নাই। অনেক বিদ্যোৎসাহী স্বজাত্যনুরাগী ধনকুবের এই সাধু উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিতেছি।

কিন্তু এ প্রশ্নের আর একটা দিক্ আছে; ছাত্রগণ স্বদেশী

আন্দোলনে অথবা তথাকথিত রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিলে যদি তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবে নির্য্যাতন করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমরা কি আমাদের পুত্র, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়দিগকে কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে দেশহিতকর অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিব, না তাহাদিগকে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করিব ? যাঁহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বা মনুষ্যত্ব আছে, তিনি অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তরে, মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, বরং আমাদের বালক বা যুবকগণ যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়া থাকে তাহাও ভাল, তবু তাহাদিগকে দেশের কায হইতে ফিরাইব না। এই সকল নির্য্যাতন আরম্ভ হইতেই দেশের আপামরসাধারণ সেই উত্তরই দিয়াছে। এখন, দেশের ও সমাজের যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইতে না দিয়া ইহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহারই ফল এই প্রস্তাব। তবে, এখনও পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদিগের জাতক্রোধ হইবার সময় আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রনির্যাতনব্যাপারে কোনও রূপ সহায়তা করেন নাই। ভবিষ্যতে করিতে পারেন এই আশঙ্কা। সে আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক বলা যায় না। সরকারবাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়কে যাহা করিতে অনুরোধ করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই যে করিবেন তাহা এখনও ঠিক বুঝা যায় না। এখন পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরের আজ্ঞাধীন সভ্যগণ ও দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে বলপরীক্ষার কোনও সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিরূপ হওয়া একটু যেন অবিবেচনার কার্য্য হইতেছে ! তাহার পর, আসল কথা, আমাদের স্বাধীন শিক্ষাগারে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি

শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্ততঃ এইরূপ যে হইবেনা তাহার কোনও guarantee নাই, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতেছি তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি ? যখন বেসরকারী বিদ্যালয়ের উপরও কর্ত্তারা চোখ রাঙ্গাইতেছেন, তখন এ ক্ষেত্রেই বা আমাদের ভরসা কি ? স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কি আমরা নিষ্কণ্টক হইব ?

যাহাহউক, যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ আদর্শে তাহা গঠিত হইবে এপ্রশ্নের বিচার আবশ্যক। ছাত্রগণের বোধ হয় ধারণা, যেমনটি ছিল, ইহাও ঠিক তেমনটি হইবে। সেখানেও সেই এফ্‌এ, বিএ, এম্‌এ, সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া, উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সেই 'রমাকান্তকামার।' আমরা এইরূপ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রতিরূপ আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিলেই যে ছাত্রদিগের অনিষ্টের সদ্য সদ্য প্রতীকার হইবে এমনও নহে, কেননা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তুল্যমূল্য হইতে পারে না। তাহাতে দেশের ও সমাজের কোনও চিরস্থায়ী লাভ নাই। যদি এই সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয়, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ত্রুটি আছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলির সংশোধন করিতে হইবে। নিম্নে আমাদের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলাম। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে সুফলও হইবে, এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও বিরোধ বা

প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হইবে না। চাই কি, এ পথে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই উদ্যমে বাধা দিবেন না। আজকাল রাজায় প্রজায় যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একথাটাও ভাবিবার বিষয়।

আমাদের প্রথম কথা, সুধীসমাজের মতঃ—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও মৌলিক গবেষণার সহায়তা করা; ইহা অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য, যাহাকে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিলে উচ্চশিক্ষার আদর্শ খর্ব্ব হইয়া পড়ে; বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণশিক্ষাগার নহে; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার দুর্দ্দশা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধঃপতন ঘটিয়াছে। অতএব, আমরা বিবেচনা করি, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অন্যরূপ হওয়া উচিত; সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার করা, শিক্ষার্থী মাত্রেরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রশমিত করা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও প্রকৃত কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ইহা Research Institute হইবে না, অক্‌সফোর্ড কেমব্রিজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ডিগ্রী দিবে না। University Extension নামক অধিষ্ঠান ও Mechanic's Institute প্রভৃতি বিদ্যামন্দিরের ন্যায় কার্য্য করিবে। কোনও বিদ্যার্থী এখানে বঞ্চিত হইবে না; যাহার প্রতিভা নাই, সে উচ্চ শিক্ষার অধিকারী নহে বলিয়া বিতাড়িত হইবে না। যাহার যেমন শক্তি সে ততখানি বিদ্যা শিখিবে। এখানে সুধু কেতাবীবিদ্যা শিখান হইবে না, কার্য্যকরীবিদ্যা শিখাইবারও বিশিষ্ট আয়োজন থাকিবে। শিক্ষাদান ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে, পরীক্ষাগ্রহণ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র হইবে। সম্ভব হইলে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসারে এই শিক্ষা অবৈতনিক হইবে। এরূপ একটি শিক্ষাগার আমাদের দেশে নাই। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ই সাক্ষাৎভাবে উচ্চ শিক্ষার, এবং পরোক্ষ-

ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের ভার লইয়া আসিতে ছিলেন, তাহাতে কোনও উদ্দেশ্যই প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হইতে ছিলনা। হাল আইনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (উচ্চশিক্ষাদান) অনুসারেই পরিচালিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারউদ্দেশ্যে একটি নূতন শিক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। অতএব আমাদের এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার ভাবিফলও বিবেচনা করা উচিত; শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান জন্মিয়াছে, ইহার প্রভাবে তাহা দূরীভূত হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় কথা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধরিয়া বলিয়া দেওয়া আছে যে, ইংরাজীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে ও জ্ঞানপরীক্ষা করা হইবে। ছাত্রগণকে বিদেশী ভাষায় অবলালাক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। যাহারা ভবিষ্যতে সরকারী কার্য্য করিবে বা এমন ব্যবসায় (যথা ওকালতী) অবলম্বন করিবে, যাহাতে সাহেবদের সঙ্গে সর্ব্বদা মাখামাখি করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ পাকা ইংরাজীজ্ঞান দরকার বটে। কিন্তু ইংরেজের অধিকারে বাস করিতে হইলেই যে ইংরাজীতে মনের ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী Second language স্বরূপ পঠিত হইবে, শিক্ষকগণ ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষা ও পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন থাকিবে। বহুকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রচলনের প্রকৃত স্থান এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ছাত্রকে অধীতবিদ্যা

বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকাতে মুখস্থ বিদ্যার অবাধ প্রচলন ঘটিয়াছে এবং শিক্ষার সবিশে অন্তরায় হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই, বলিয়া লর্ড কর্জ্জন আক্ষেপ করিতেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থাই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। এই বাধা দূরীভূত হইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক অধিক শিখিতে পারিবে। এবং ইহাতে জাতীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। ইতিহাস, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা ত মাতৃভাষায় সাহায্যে হইবেই, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও মাতৃভাষায় হইরে। ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই। ইংরেজ যে প্রণালীতে ফরাসী, জার্ম্মান, বা ল্যাটিন গ্রীক পড়েন, আমরাও সেই ভাবে ইংরাজী পড়িব। বর্ত্তমান প্রণালীর বিড়ম্বনা—বাঙ্গালী শিক্ষক বাঙ্গালী ছাত্রকে বুঝাইতেছেন বিদেশী ভাষায়, পরের শিল পরের নোড়া দিয়া ঘরের ছেলের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতেছেন। শিক্ষক বিশদরূপে বুঝাইলেও তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে।

এদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে অবশ্য অনেক বাগ্ বিতণ্ডার পর স্থির হইয়াছিল, এদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান চলিবেনা, ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। তখন দেশের ও দেশভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে এই ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই। কিন্তু এখন বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শব্দসম্পদ্ ও ভাবপ্রকাশের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। এখন দেশভাষার সাহায্যে মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাদান অনায়াসেই চলিতে পারে। উপযুক্ত এদেশীয় শিক্ষকেরও অভাব নাই। তখনকার দিনে সাহেব শিক্ষক ভিন্ন গত্যন্তর ছিলনা, কাজেই ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষাদানও একপ্রকার অনিবার্য্য ছিল।

আমাদের তৃতীয় কথা, রাজপুরুষগণ নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি নানাসম্প্রদায় থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সার্ব্বভৌমিক ভাবে শিখান বোধ হয় অসম্ভব হইবেনা। মনস্বিনী আনিবেসাণ্ট বেণারস হিন্দু কলেজে এরূপ সার্ব্বভৌম হিন্দু-ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের একটা দোষ আছে তাহাও বলিয়া রাখি। আজকাল জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান, কি বাঙ্গলাভাষী কি হিন্দী কি উর্দ্দু ভাষী কি উড়িয়া ভাষী সমস্ত বাঙ্গালীকে এক করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তবে সেই ভয়ে ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বজাতির একীকরণমানসে এখনকার মত ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও বিদেশীভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভাষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিলে বোধ হয় এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। যাহা হউক, এই বৈষম্যের সমীকরণের ভার বিজ্ঞ নেতাদিগের উপর দিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম। ভরসা করি, উদ্যোগিগণ সত্বর একটা খসড়া খাড়া করিয়া সমালোচনার জন্য শিক্ষিতসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃণালিনী-চরিত্র।

চরিত্রের বিশেষত্ব অভিমানশূন্যতা।

মৃণালিনী চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে ইনি প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমানশূন্যা। নগেন্দ্রনাথের পরম গুণবতী ভার্য্যা "সূর্য্যমুখী"ও অভিমানিনী ছিলেন, কিন্তু মৃণালিনী-চরিত্রে আমরা অভিমানের লেশমাত্র দেখিতে পাই না। এই কারণে, মৃণালিনী-চরিত্র সূর্য্যমুখীচরিত্র হইতেও মহত্তর। যদি প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমানই জন্মিল তবে প্রেমের স্বর্গীয় ভাব রহিল কোথা? সর্ব্বস্ব দিয়া যাহাকে ভালবাসিলাম তাহার উপর আর অভিমান চলে না। সাধকহৃদয়ের প্রেমই আদর্শ প্রেম, সেই আদর্শ প্রেমের আলোকে আমরা মৃণালিনীচরিত্র উদ্ভাসিত দেখিতে পাই কিন্তু সূর্য্যমুখীচরিত্রে আমরা প্রেমের সেই সাধকভাব দেখিতে পাই না, এই কারণে মৃণালিনীচরিত্র আমরা আদর্শ চরিত্র বলিয়া পূজা করিতে পারি, মৃণালিনীকে আমরা দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে অসামান্যা পতিব্রতা রমণী ভিন্ন উচ্চতর আখ্যায় বিভূষিত করিতে পারি না।

পূর্ব্ব কাহিনী।

মৃণালিনী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরম ধনশালী এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ছিলেন, আপন চরিত্রগুণে তিনি কৈশোরে মথুরারাজ কন্যার সখিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদিন রাজকন্যা সমভিব্যাহারে তিনি যমুনায় জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রবল ঝটিকায় তরণী জলমগ্ন হইল—মৃণালিনী তরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন—তরঙ্গরাশি হইতে অজ্ঞানাবস্থায় তিনি এক রাজপুত্র কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়েন। যিনি মৃণালিনীর উদ্ধার সাধন করেন তিনিই মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে রক্ষা করিয়া আপন বাসস্থানে লইয়া গেলেন, —তিন দিবস ঝড়বৃষ্টি থামিল না—সেই তিন দিবস যুবক-যুবতী একত্র বাস করিলেন—একত্র বাস হইতে উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলেন—শুধু কুলপরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণেরও পরিচয় পাইলেন"।

তখন মৃণালিনীর বয়স পনর বৎসর মাত্র—সেই পনের বৎসর বয়সে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিলেন—হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবসে দুর্যোগের উপশম হইলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন—পরিণয়কার্য্য সমাধা হইলে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন—হেমচন্দ্রও মৃণালিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ; যখন মগধরাজ্য যবনাধিকৃত হইল, তখন মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনীর আশায় মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্বদেশহিতৈষী ও হেমচন্দ্রের পরম শুভাধ্যায়ী মাধবাচার্য্য দেখিলেন, হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। যবনাধিকার ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল—মাধবাচার্য্য ব্যথিত হইলেন। কিরূপে যবনহস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন হইবে ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন; হেমচন্দ্র একাকী এ দেবতার কার্য্যসাধনে সমর্থ, কিন্তু এ দেবতার কার্য্যে মৃণালিনী প্রবল অন্তরায়। মাধবাচার্য্য চিন্তানিবিষ্ট হইলেন, স্থির করিলেন, মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কৌশলে মৃণালিনীকে হস্তগত করিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীনিবাসী এক শিষ্যগৃহে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যে শিষ্যগৃহে মৃণালিনী অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার নাম হৃষীকেশ শর্ম্মা—হৃষীকেশের কন্যা মণিমালিনী মৃণালিনীর গুণে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। মণিমালিনী
মৃণালিনীর মধ্যে এতদূর প্রণয় জন্মিয়াছিল যে উভয়ে একত্র আ
বিহার ও শয়ন করিতেন। একদিন কক্ষ-প্রাচীরে সখীদ্বয় আলে
লিখিতে লিখিতে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে স
এক ভিখারিণীর কোমল কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি উভয়ের কর্ণকু
প্রবেশ করিল। ভিখারিণী অপূর্ব্ব গীত গাহিল—মৃণালিনী উ
হইয়া উঠিল—তিনি সেই সঙ্গীতের মধ্যে যেন তাঁহার প্রিয়তমের ক
প্রেমের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। দীর্ঘ আলাপের পর ভিখারি
গিরিজায়া আবার গাহিল—

হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ কৈনু যতন ভারি।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥

তখন সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হইল, প্রতীতিমাত্রে মৃণালি
সস্নেহে গিরিজায়াকে কহিলেন—"মৃণাল কোথায়? আমি সন্ধা

আবেগময়ী মৃণালিনী।

বলিয়া দিতে পারি তাহা মনে রাখি
পারিবে"? গিরিজায়া সম্মতি প্রকা
করিলে মৃণালিনী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অবশেষে বিদায় লইবা
কালে তিনি ভিখারিণীর কাণে কাণে কহিলেন—"আমার ধৈ
হইতেছেনা, কালি পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। তোমা
বণিক যদি আসেন আজই রাত্রে তুমি সঙ্গে আনিও"। একদি
মৃণালিনীকে লক্ষ্য করিয়া মাধবাচার্য্য কহিয়াছিলেন—"তোমার প্রণ
মন্ত্রে হেমচন্দ্র কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন তাঁহার সে ভাব দূর করা
উচিত নহে?" মৃণালিনী তদুত্তরে তাঁহারই উপযুক্ত ভাষায় কহি
ছিলেন—"আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয় তবে তি
কদাচ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।" কিন্তু আজ মৃণালিনী
মুখে একি কথা? তিনি কালি পর্য্যন্ত হেমচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতে

ারিবেন না? ইহাই কি মৃণালিনীর সদ্বুদ্ধি? তাহা হইতে পারে,
কিন্তু হৃদয়ের আবেগের সহিত বিবেক কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? প্রিয়তমের
দর্শনে হৃদয় ব্যাকুল, এতদবস্থায় মাধবাচার্য্যের উপদেশ যদি মৃণালিনী
বিস্মৃত হইয়া থাকেন সে জন্য আমাদের সহানুভূতি হইতে তিনি বিচ্যুত
হইবেন না। প্রতিভাশালী লেখক এই স্থলে মৃণালিনী-চরিত্র পাঠক-
বর্গের বড়ই হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। রমণীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক
অথচ সুন্দর ভাবটি মনুষ্য মাত্রেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে।
ণালিনী প্রথমেই যদি চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারিতেন তাহা
হইলে তাঁহার চরিত্র আমরা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতাম না।

ৃণালিনা জ্ঞানময়ী।

যে পুনঃ পুনঃ চিত্তের আবেগ দমন
করিতে পারিলনা সে দুর্ব্বলচিত্ত, কিন্তু
ণালিনী দুর্ব্বলচিত্তা নহেন; এ বিষয়ে কঠোরতর পরীক্ষায় তিনি
ত্তীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপে রত্নময়ীর কুটীরে অবস্থানকালে কুলটাপ-
দে লাঞ্ছিতা মৃণালিনী, নয়নপ্রান্তবর্ত্তী আহত এবং রক্তাক্তকলেবর
হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত
স্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।
ণালিনী আবেগময়ী, কিন্তু তিনি উন্মাদিনী নহেন—তিনি প্রেমময়ী
মণী অথচ জ্ঞানময়ী—জ্ঞান ও প্রেমের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আমরা
ঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অল্প চরিত্রেই দেখিতে পাই। মৃণালিনীগ্রন্থের
নারমাচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার দুইটী বিভিন্ন মূর্ত্তি
খিতে পাই, একটি প্রতিভাময়ী অপরটি প্রেমময়ী কিন্তু সে চরিত্রে
তিভা প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন—সে চরিত্রে প্রতিভা ও প্রেমের মিলন
ট নাই। সূর্য্যমুখী অথবা ভ্রমর চরিত্রেও জ্ঞান এবং প্রেমের সামঞ্জস্য
ক্ষিত হয় নাই—উভয় চরিত্রেই প্রেম, জ্ঞানের অল্পতায় ন্যূনাধিক
প্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের তত্ত্ব পাইয়া তাঁহার দর্শনলালসায় ব্যা হইয়া উঠিলেন। এদিকে হেমচন্দ্র গিরিজায়াপ্রমুখাৎ মৃণালি সন্ধান পাইয়াও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইলেন না—তিনি মৃণালিনীর সহি সাক্ষাৎ না করিয়াই মাধবাচার্য্যের আদেশানুক্রমে নবদ্বীপ যা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশান্বিত হৃদয়ে উপস্থি হইয়া মৃণালিনী গিরিজায়ার দর্শন পাইলেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের অদর্শ যেন "সহস্র আশাপ্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইল"। যাহাহউ নবদ্বীপযাত্রাকালে হেমচন্দ্র, মৃণালিনীর চিত্তের স্থৈর্য্যবিধানার্থ যে প লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠান্তে মৃণালিনী সহজেই আ হইলেন এবং নৈরাশ্যকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিলেন এই স্থলে মৃণালিনীচরিত্রের মহত্ত্ব এক স্তর জাগিয়া উঠিল, তাঁহা আত্মদমনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তকাল পরে গিরিজায়াকে বিদায় দিয়া মৃণালিনী যেমন গৃহম বর্ত্তিনী হইবেন, অমনি এক নূতন বিপদে তিনি আক্রান্তা হইলেন। মণি

আত্মসম্মান রক্ষা-তৎপরা মৃণালিনী।

মালিনীর দুষ্ক্রিয়াসক্ত সহোদর ব্যোমকে কর্ত্তৃক তিনি হৃষীকেশ সমীপে অভিসারি রূপে অভিযুক্তা হইলেন। হৃষীকেশ, পু প্রমুখাৎ মৃণালিনী সম্বন্ধে এবম্বিধ অভিযোগ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রু হইলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মৃণালিনীকে নির্দ্দয়রূপে তিরস্কার করি লাগিলেন। কিন্তু নিরপরাধিনী মৃণালিনী হৃষীকেশের তী তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি হৃষীকেশকে মুখর ন্যায় উত্তর করিতে লাগিলেন। একদিন, হেমচন্দ্র মৃণালিনী অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া হতাদর করিলে মৃণালিনীর মুখ হইতে বা মাত্র স্ফুরিত হয় নাই, কিন্তু আজ মৃণালিনী মুখরা, মান্যে পিতৃ হৃষীকেশের মুখের উপর সেই মৃণালিনী আজ স্পষ্ট কহিলেন—'আমা

কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।" এই স্থলে মৃণালিনীর চরিত্রের মহত্ত্ব আরও একস্তর জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ মৃণালিনীর তেজোময়ী

রৌদ্র।

প্রতিমা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে; এ প্রতিমা আমরা সমগ্র গ্রন্থে আর দ্বিতীয় বার দেখিবার অবসর পাইব না। এই তেজোময়ী দেবী আত্মসম্মানরক্ষার্থ ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিতা হয়েন নাই, কিন্তু এই আদর্শ রমণী হেমচন্দ্রের নিকট আত্মসম্মান রক্ষার্থ কতটুকু প্রয়াস পাইয়াছিলেন আপনারা তাহার পরিচয় পরে পাইবেন।

হৃষীকেশ, বিচার ও বিবেক শূন্য হইয়া মৃণালিনীকে আদেশ করিলেন—"আজই আমার গৃহ হইতে দূর হও।" কিন্তু এ আদেশ শ্রবণে মৃণালিনী কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সমগ্র পৃথিবীতে সেই মুহূর্ত্তে মৃণালিনীর দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল ছিলনা তথাপি তাঁহার চিত্ত অবিচলিত রহিল। নিষ্কলঙ্কচরিত্রা সেই হেতু নির্ভিকহৃদয়া মৃণালিনী হৃষীকেশের গৃহত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। আত্মসম্মানরক্ষাতৎপরা সেই-হেতু আশ্রয়হীনা হইলেও আশঙ্কাশূন্যা মৃণালিনী হৃষীকেশের বাক্যো-ত্তরে কহিলেন—"যে আজ্ঞা, আমি সখী মণিমালিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আজই দূর হইতেছি।" মণিমালিনী অকপট হৃদয়ে মৃণালিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ করিয়া মৃণালিনী পরগৃহবাসদুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এই কারণে আজ সহসা হৃষীকেশের গৃহত্যাগের পূর্ব্বে মৃণালিনীর স্নেহশীল হৃদয়ে অনেকখানি বেদনা জাগিয়া উঠিল। মণিমালিনীর কণ্ঠ জড়াইয়া রোদন করিবেন, অশ্রুপ্লুত নয়নে তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন, এই সাধ মৃণালিনীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ক্রোধান্ধ হৃষীকেশ অভাগিনীর সাধ পূর্ণ হইতে দিলেন না। হৃষীকেশ কহিলেন,

—"মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি ?" হৃষীকেশ দ্বিতীয়বা মৃণালিনীকে কুলটা সম্বোধন করিলেন, কিন্তু এবার মৃণালিনী আত্মসম্বর করিলেন, ক্রোধের পরিবর্ত্তে দুর্জ্জয় অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। হৃষীকেশ মৃণালিনীর প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রথমে তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, সতীত্ব তেজ তাঁহার হৃদয় হইতে স্ফুলিঙ্গাকারে নির্গত হইয়া হৃষীকেশকে দগ্ধ করিয়াছিল, মৃণালিনী হৃষীকেশের প্রতি প্রতি-দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

বৃষ্টি।

হৃষীকেশ মৃণালিনীর প্রতি পুনরায় সে কঠোর শেলসম বাক্য প্রয়োগ করিলে মৃণালিনী নীরবে তাহা সহ্য করিলেন, কেবল চক্ষের জলে তাঁহার হৃদয়ের দারুণ আঘাত ব্যক্ত হইল। প্রথমে রোষবাক্যে মৃণালিনী যে আত্মসম্মানরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন এক্ষণে নীরব অশ্রুপাতে তিনি তাহা রক্ষা করিলেন। কবি কৌশলে মৃণালিনী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও মহত্ব উভয়ই ফুটাইয়া তুলিলেন। প্রতিপালক হৃষীকেশ সহস্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেও তিনি সম্মানার্হ, সেইজন্য মৃণালিনী অন্তরের তীব্র বেদনা গোপন করিয়া প্রণামান্তর হৃষীকেশের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার আত্মসম্মানরক্ষার চেষ্টা, তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমা, তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও বয়োধিক্যের প্রতি ভক্তিপরায়ণতা এই স্থলে তাঁহার চরিত্র মহিমান্বিত করিয়াছে।

হৃষীকেশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, মৃণালিনী "পর্ব্বত সানুবা শিলাখণ্ডের ন্যায় চলিয়া গেলেন।" বাহিরে গিরিজায়া অপে করিতেছিল, মৃণালিনী গিরিজায়ার সহিত মিলিত হইলেন এ হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভাশা সুদূরপরাহত হইলেও স্থির করিলে নবদ্বীপ যাত্রা করিবেন।

একদিন সন্ধ্যার তিমিরাবরণমধ্যে মৃণালিনী গিরিজায়া সমভি

ব্যাহারে নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। তরী সংলগ্ন হইলে গিরিজায়া

নবদ্বীপে মৃণালিনী ও গিরিজায়া।

মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আজিকার দিন কটিল।" কিন্তু মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না, বীচিবিক্ষোভিত গঙ্গাহৃদয় তুল্য তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। গিরিজায়া পুনরপি কহিলেন—"কালিকার দিনও কাটিবে, পরদিনও কাটিবে কেন কাটিবে না ?" সংসারে মায়ার বন্ধন যাহার অল্প, যে কাহাকেও সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে নাই তাহার পক্ষে এরূপ উক্তি সম্ভবে, কিন্তু এরূপ উক্তি মৃণালিনীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কুলনারী শ্রেষ্ঠীকন্যা রাজপুত্রবধূ মৃণালিনী আজি আশ্রয়হীনা, কুলটাপবাদে হৃষীকেশের গৃহ হইতে তিনি বহিষ্কৃতা আর গিরিজায়া ভিখারিণী, তাহার "সর্ব্বত্র সমান", দিগ্বিজয়কে সে ভালবাসিত কিন্তু মৃণালিনীর মত বিনা দাবীতে সে তাহার হৃদয়ের এতটুকু অংশ তাহাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলনা, এরূপ অবস্থায় গিরিজায়ার পক্ষে যে উক্তি সম্ভবে মৃণালিনীর পক্ষে যে তাহা অসম্ভব একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মৃণালিনী গিরিজায়ার উক্তিতে পুনরায় নিরুত্তর রহিলেন, কেবল এক দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার অন্তস্তল হইতে বিনির্গত হইয়া সেই সন্ধ্যার তিমির রাশিকে যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

মৃণালিনী ও তৎসহচরী গিরিজায়া, নবদ্বীপে এক পাটনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তথায় গিরিজায়া একরূপ সুখে কালাতি-

রত্নময়ীর কুটীরে।

পাত করিতেছিল, পাটনীপুত্রী রত্নময়ীর সরস সখিত্বটুকু সে পরম তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু মৃণালিনী রত্নময়ীর সখিত্বে আপ্যায়িত হইলেও পরম অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তথায় হেমচন্দ্রের দর্শনলালসায় ব্যাকুলিত চিত্তে তিনি অবস্থান করিতে-

ছিলেন, লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাত হেমচন্দ্রের সাক্ষাতে বিস্মৃত হইবেন, এই আশায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সর্ব্বোপরি বিরহ কাতরতায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জন্য এ কাতরতা পরম স্বাভাবিক, সহস্র কর্ত্তব্য মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তবে নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্বামীসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আপন্না মৃণালিনী যে কাতর হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রত্নময়ীর কুটীরে একদিন প্রভাতকালে মৃণালিনী বেদনাপীড়িত হৃদয়ে গিরিজায়ার সহিত হেমচন্দ্রের আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে রত্নময়ী সহসা শশব্যস্তে সম্বাদ দিল—"এক আশ্চর্য্য পুরুষ সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছেন।" মৃণালিনী গিরিজায়া সমভিব্যাহারে কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে "সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল"—মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে দেখিলেন।

প্রিয় দর্শনে।

যখন হেমচন্দ্র-দর্শন-লালসায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের একমাত্র সম্বল, সুখের একমাত্র আধার হেমচন্দ্রকে মৃণালিনী সহসা সেই সময়ে দর্শন করিলেন। কিন্তু মৃণালিনী অসামান্যা রমণী, মৃণালিনী চিত্ত জয় করিলেন, তৃষ্ণার বারিধারা তিনি অবাধে পরিহার করিলেন, তিনি হেমচন্দ্রকে দর্শন দিলেন না। পূর্ব্ব রজনীতে শান্তশীল ও তদনুচরবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হেমচন্দ্র আহত হইয়াছিলেন সেই হেতু অঙ্গ ও বসনাদি রক্তাক্ত হইয়াছিল, মৃণালিনী সেই রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া উন্মাদিনীবৎ হেমচন্দ্রের অন্তরালে অনুবর্ত্তী হইলেন। কতযুগের পর বিপন্ন ও আহত হেমচন্দ্রের দর্শন পাইয়াও মৃণালিনী আত্মপ্রকাশ করিলেন না। আত্মপ্রকাশ করিলে হেমচন্দ্র সত্যচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত

হইতেন, মৃণালিনী কিছুতেই আপনাকে সেই ধর্ম্মচ্যুতির কারণভাগিনী করিতে পারিলেন না। মৃণালিনী যথার্থ সহধর্ম্মিণী।

মৃণালিনী গিরিজায়া সমভিব্যাহারে অলক্ষিতে হেমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া হেমচন্দ্রের গৃহমধ্যবর্ত্তিনী অপূর্ব্ব মনোরমা মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন।

মনোরমা সাক্ষাতে।

দর্শন মাত্রে মৃণালিনী কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন। হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে উপনীত হইলে মনোরমা যেরূপ আচরণ প্রদর্শন করিলেন তাহা নিতান্তই আত্মীয়ের পক্ষে সম্ভবে। মনোরমার কার্য্যকলাপে মৃণালিনীর হৃদয়স্থ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল—মৃণালিনী ভাবিলেন, "একি হেমচন্দ্রের মনোরমা ?" মুহূর্ত্তের জন্য মৃণালিনী এরূপ ভাবিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহমেঘে মৃণালিনীর নির্ম্মল হৃদয় আচ্ছন্ন হইল—মুহূর্ত্তের জন্য আমরা দেখিলাম, মৃণালিনী, সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর একই আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আমরা মৃণালিনীকে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর হইতে অনেক উচ্চতর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম—দেখিলাম স্বর্গীয় লাবণ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; তখন সেই স্বর্ণসিংহাসন হইতে স্বর্গীয় ভাষায় তিনি কহিলেন—"মনোরমা যেই হউক—হেমচন্দ্র আমারই।" মনোরমা আমার প্রাণাধিক হেমচন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী হউক আর নাই হউক—হেমচন্দ্র আমারই, আমি হেমচন্দ্রের দাসী, হেমচন্দ্র আমার প্রভু, তিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি যদি আমায় পায়ে ঠেলেন তবু তিনি আমারই। মৃণালিনীর প্রেম কত উচ্চ আদর্শের তাহার পরিচয় আমরা এখানে প্রথম পাইলাম। ইহার উজ্জ্বলতর প্রমাণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে। মৃণালিনী মনোরমার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হওয়া দূরে থাকুক তিনি বিপদকালে হেমচন্দ্রের সেবা করিলেন বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হইলেন এবং তাঁহাকে "চিরায়ুষ্মতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন। মৃণালিনী সামান্যা রমণী হইলে আশীর্ব্বচন দূরে থাকুক মনোরমার প্রতি অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিতেন।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, পল্লীর পথে লোক সমাগম হইতে লাগিল, মৃণালিনী আর বাহিরে থাকিতে পারিলেন না, তিনি কুটীরে ফিরিলেন। হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সে সম্বাদ লইয়া গিরিজায়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।

বিবিধ সম্বাদ ও সিদ্ধান্ত সমেত গিরিজায়া মৃণালিনী সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল। মৃণালিনী স্থিরচিত্তে সকলই শুনিলেন—গিরিজায়ার দুর্ব্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু সে মৃণালিনীর মথুরা যাত্রা ও বিবাহবার্ত্তা রটাইয়া যে প্রমাদ ঘটাইয়া আসিয়াছিল তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার না করিয়া ধীরভাবে তৎপ্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই ধৈর্য্যশীলতা মৃণালিনী-চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ।

উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভাশায় মৃণালিনী সকল কথা সংক্ষেপে পত্রনিবদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করিলেন।

মৃণালিনীর পত্র ও হেমচন্দ্র।

সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে পত্রবাহিকা গিরিজায়ার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। তখন হেমচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। কুলটাপবাদে মৃণালিনী হৃষীকেশ কর্ত্তৃক যে গৃহবহিস্কৃতা হইয়াছিলেন সে সম্বাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। শ্রুতিমাত্রে তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বাসমাত্রে তাঁহার হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। কোন কোন মনুষ্যের চিত্তের সহিত শুষ্কতৃণাদির তুলনা করা যাইতে পারে; তৃণাদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রে যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনি কাহারও কাহারও চিত্ত কোন প্রকার অপ্রীতিকর সম্বাদের শ্রুতিমাত্র একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তদবস্থায় তাঁহারা একেবারে বিবেচনা ও বিচারশূন্য হইয়া পড়েন, এবং অপ্রীতিকর

সম্বাদের সত্যানুসন্ধানে সহজেই যত্নহীন হন। হেমচন্দ্র এবম্বিধ প্রকৃতির মনুষ্য, তিনি সহজেই ধৈর্য্যহীন ও ক্রোধপরবশ, মৃণালিনীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। মৃণালিনীর পত্র হেমচন্দ্রের করতলগত হইলে, তিনি রোষ-প্রযুক্ত তাহা শতছিন্ন করিয়া বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, মৃণালিনীর অপঠিত পত্র হেমচন্দ্রের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। মৃণালিনী, গিরিজায়াপ্রমুখাৎ যখন শুনিলেন হেমচন্দ্র কুলটার পত্রবোধে তাঁহার পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দূতিকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন তখন তাঁহার শোকের অবধি রহিল না—তাঁহার শোক রোদনেরও অতীত হইল—তিনি মুহ্যমানা হইয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে, গিরিজায়ার কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদনাপ্লুত করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। গিরিজায়া অদূরস্থ সরোবর সোপানে উপবিষ্ট হইয়া নৈশ নিস্তব্ধতা মধ্যে মৃণালিনীর হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় মিলাইয়া গাহিতে ছিল।

প্রেমাস্পদ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা মৃণালিনী।

পরাণ না গেলো ?
যোদিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে—
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে—
ওঁহিপর পিয়সই কাহে কালোনীরে—
জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘর আইনু না কহিনু বোলি—
তিতায়িনু আঁখিনীরে আপনা আঁচলি—
রোই রোই পিয় সই কাহেলো পরাণী—
তখনই না গেলো ?

"দূরশ্রুত বীণাধ্বনিবৎ" সে সঙ্গীত মৃণালিনীর মর্ম্মে প্রবেশ করিল—প্রবেশ মাত্র মৃণালিনীর যেন চৈতন্যোদয় হইল—সহসা লয়হীন হৃদয়-যন্ত্র যেন লয়যুক্ত হইল—তখন সেই হৃদয়-যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোকগীতি

উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে লাগিল। মৃণালিনী নিঃশব্দে সঙ্গীতকারিণীর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কোমল হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন তাহার বেদনায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, জীবনে তিনি মমতাহীন হইলেন—মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় বোধ হইতে লাগিল। যিনি হেমচন্দ্রের জন্য কুলত্যাগিনী, বিনাপরাধে কুলটাবোধে হেমচন্দ্র যখন তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, তখন নারী-জীবনে আর প্রয়োজন কি? সর্ব্বস্ব দিয়াও যখন ভালবাসার বস্তুকে পাইলেন না, তখন মৃণালিনী স্থির করিলেন, মৃত্যুদ্বারা তিনি সেই ভালবাসার বস্তু লাভ করিবেন। মৃণালিনী সাধ করিয়া তরী ডুবাইতে চাহেন। কাণ্ডারী যদি তরণীর অঙ্গে পদার্পণ না করিলেন তখন প্রেমিকমাত্রে সাধ করিয়া সে তরণী জলমগ্ন করিবে; কিন্তু সাধ করিয়া যে তরী ডুবায় সে নিশ্চয়ই জলের মধ্যে রত্ন দেখিয়া থাকিবে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুদ্বারা ভালবাসার বস্তু লাভ করিতে চাহে। জীবনভার বহন করিতে পারিলাম না বলিয়া যে সে ভার ত্যাগ করে নিশ্চয়ই সে দুর্ব্বলচিত্ত কিন্তু জীবনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া যে জীবন ত্যাগ করিতে চাহে তাহাকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিতে পারা যায় না। তোমার নিমিত্ত হৃদয়ের শোণিত নির্ম্মিত কুসুম ভরিয়া যে ডালি সাজাইলাম সে ডালি যদি তুমি গ্রহণ না করিলে তবে সে ডালি কেন আমি গঙ্গার জলতরঙ্গে ভাসাইয়া দিব না?

ধৈর্য্য ও বিবেক-শালিনী মৃণালিনী।

মৃণালিনী স্থির করিলেন, তিনি জীবন-বিসর্জ্জন দিবেন—যাহাতে হেমচন্দ্রের প্রয়োজন নাই তাহা রাখিয়া কাজ কি? মৃণালিনী ভাবিলেন—জীবন, যৌবন সকলই হেমচন্দ্রের নিমিত্ত—যদি হেমচন্দ্র তাহা কলঙ্কিত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইবে—কিন্তু বিসর্জ্জন দিবার পূর্ব্বে একথা একবার হেমচন্দ্রের নিজমুখ হইতে শুনিতে হইবে। ধৈর্য্য ও বিবেক-

শালিনী মৃণালিনী এইরূপ স্থির করিয়া গিরিজায়াকে কহিলেন—"গিরিজায়া তোমাকে আবার হেমচন্দ্রসমীপে যাইতে হইবে।"

গিরিজায়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?" মৃণালিনী ব্যথিত হইলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—"পাষণ্ড বলিও না," দার্শনিক পণ্ডিতের মত কহিলেন, "হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ জগতে অভ্রান্ত কে?" এজগতে সকলেই ভ্রান্ত, পশুপতি ও হেমচন্দ্র, হৃষীকেশ ও মাধবাচার্য্য, মনোরমা ও গিরিজায়া সকলেই ভ্রান্ত,—বিচিত্র এই, মৃণালিনী একাকিনী অভ্রান্ত, এই জন্য—"এ জগতে অভ্রান্ত কে"—এ কথা মৃণালিনীরই মুখে মধুর শুনাইতেছে। গিরিজায়া মৃণালিনীর বচনে এরূপ মুগ্ধ হইল যে, যে হেমচন্দ্র তাহাকে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিয়াছিল এবং তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারই সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"আমি মৃণালিনীর দাসী, মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন * * * মৃণালিনী আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন, আপনি আসুন।" ইতিপূর্ব্বেই মৃণালিনীর পূর্ব্বচরিত্র স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্রহৃদয়ে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি গিরিজায়ার উক্তিতে অপ্রতিভ হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন। হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর সাক্ষাৎ হইল—সাক্ষাৎমাত্রে প্রেমের প্লাবনে মৃণালিনীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রেমাশ্রু তাঁহার নয়নযুগল হইতে ধারায় বিগলিত হইতে লাগিল।

মৃণালিনীর প্রেম-বিহ্বলতা।

আর বিদায়ের কথা উত্থাপন করা হইল না—হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে কত কষ্ট দিয়াছিলেন হেমচন্দ্রের দর্শনমাত্রে তিনি সে সকলই ভুলিলেন। আনন্দে অবসন্ন শরীরে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। এই

অভিমানশূন্যতা ও প্রেমবিহ্বলতায় মৃণালিনী কত সুন্দর দেখাইতেছেন? শিশিরসিক্ত সেফালীপুষ্পের ন্যায় মৃণালিনী হেমচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, হেমচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও পরম প্রণয়শালী ব্যক্তি, তিনি সস্নেহে মৃণালিনীর হস্তধারণ করিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিলেন। মৃণালিনীর অতীত পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্র সম্প্রতি মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা সন্দেহশূন্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সন্দেহ পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। এক্ষণে সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি সহজেই হৃষীকেশকর্ত্তৃক মৃণালিনীর গৃহবহিস্কৃতির কারণ জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বিচারক হেমচন্দ্রের নিকট সত্যবাদিনী মৃণালিনী কিছুই গোপন করিলেন না, তিনি স্পষ্ট কহিলেন—"হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

হেমচন্দ্র অযোগ্য বিচারক।

হেমচন্দ্র অযোগ্য বিচারক,—মৃণালিনীর বাক্য শ্রবণমাত্র তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃণালিনীকে পাপীয়সী সম্বোধন করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। হেমচন্দ্র, পদদলিতা লতার ন্যায় মৃণালিনীকে সরোবরসোপানে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হইলেন না—তথাপি এতটুকু অভিমান তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল না। তাঁহার অপরিমিত প্রেমের বিনিময়ে, হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া, নির্দ্দয়রূপে যে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিলেন সেজন্য মনেও তিনি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেন না। কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষায় মৃণালিনী উত্তীর্ণ হইলেন—প্রেম, ধৈর্য্য ও অভিমানশূন্যতার পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

প্রেমের উজ্জ্বলতম আদর্শ ও একাগ্রতা।

হেমচন্দ্র আত্মমুখে মৃণালিনীকে পাপীয়সী সম্বোধন করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলে, গিরিজায়া

মনে করিল, হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু ভিখারিণী, মৃণালিনীর প্রেমসাগরের তল কোথায় পাইবে? মৃণালিনী কহিলেন—"আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী"। একদিন হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গিরিজায়া কহিয়াছিল—"মৃণালিনী দূরে থাক্ তুমি আমারও যোগ্য নও"। সে কথার সত্যতা আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি। "আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী," একথা কত সুন্দর! মহাসমৃদ্ধিশালী মথুরানগরীতে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ও শান্তিমধ্যে লতাকুঞ্জস্থ তৃণাস্তরণে অথবা প্রস্তরবেদিকায় মৃণালিনী সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া হেমচন্দ্র যখন সহস্রমুখে আপনার অপরিমিত প্রেম ব্যক্ত করিতেন তখন মৃণালিনী আপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে করিয়া যেমন সুখী হইতেন, আজ এই স্বজনহীন প্রদেশে হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক কুলটাবোধে পরিত্যক্তা হইয়াও তিনি আপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে করিয়া তেমনই সুখী হইলেন। ইহাই প্রেমের উজ্জ্বলতম আদর্শ এবং ইহাই প্রেমের একাগ্রতা।

গিরিজায়া মৃণালিনীর উক্তিতে রাগ প্রকাশ করিলে, মৃণালিনী কহিলেন—"গিরিজায়া, যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও।" মৃণালিনী স্বামীনিন্দা শুনিতে যেমন অশক্ত, তেমনি গিরিজায়াকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেও তিনি অসম্মত। তিনি কহিলেন—"হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।" গিরিজায়ার রমণীহৃদয়, কহিল—"কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন।" তদুত্তরে দেবীহৃদয় মৃণালিনী কহিলেন,—"সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।"

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কহিল—"ঠাকুরাণী! এ সংসারে

আপনিই সুখী, কেন না আপনি রাগ করেন না।” মৃণালিনী কহিলেন

নৈরাশ্য জয়ে।

—“আমিই সুখী, কেন না হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।” এই একটি কথায় মৃণালিনীর প্রেমের গভীরতা প্রতিভাশালী লেখক যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন অন্য লেখক সহস্র কথাতেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্কন্ধে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি সহস্র দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। এই দুঃখময় জগতে সহস্র দুঃখ উপেক্ষা করিয়া মৃণালিনী যখন কহিলেন “আমিই সুখী”, তখন প্রশংসমান নেত্রে আমরা তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মৃণালিনী যথার্থই সুখী; জীবনের নিস্ফলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে মরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ সফলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি মৃত্যুর কথা মুখে আনিলেন না। হেমচন্দ্রের স্কন্ধে শির রাখিয়া মৃণালিনী নবীন বল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রেমের নবীন শক্তিতে তিনি সবল, নৈরাশ্য জয় করিয়া জীবনের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৃণালিনী তাঁহার প্রণয় ও ধৈর্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। হেমচন্দ্র ঘটনাচক্রে মৃণালিনীচরিত্রসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং আত্মব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মৃণালিনীকে গ্রহণ করিলেন। তখন হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অগ্নিপরীক্ষিতা সীতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, এবং অশোকবনাগতা সীতার ন্যায় মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন।

আমরা মৃণালিনীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে তচ্চরিত্রের সার সংকলন করিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। মৃণালিনী আদর্শ রমণী—আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ এই

যে, ইহা পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিবে—ইহা লোকশিক্ষার উপযোগী হইবে, এবং ইহা পূজা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত

আদর্শচরিত্রের লক্ষণ।

হইবে। প্রত্যেক আদর্শ চরিত্রে অন্ততঃ একটি মানসিক সুবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইতে হইবে। কবি মৃণালিনীচরিত্রে প্রেমরূপ মনোবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন। ধৈর্য্য ও অভিমান শূন্যতা এবং বিশ্বাস, প্রেমের অবলম্বনস্বরূপ, সেইজন্য কবি সতর্কতার সহিত এ সকল মনোবৃত্তিরও বিকাশ মৃণালিনীচরিত্রে সূচিত করিয়াছেন। রমণীচরিত্রে উল্লিখিত মনোবৃত্তির বিকাশই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ, এই জন্য মৃণালিনীকে আমরা জ্ঞানময়ী কহিয়াছি; তিনি জ্ঞানময়ী অথচ তিনি প্রেমময়ী অর্থাৎ তিনি স্বামীগতপ্রাণা—এই জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র গঠিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরচরিত্রে প্রেম কতকটা অবলম্বনশূন্য—এইজন্য এতদুভয় ক্ষেত্রে প্রেমলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা।

সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের কথা স্বতন্ত্র, প্রফুল্লও হিন্দুরমণী কর্ত্তৃক আদর্শরূপে গৃহীত হইবেন না। প্রফুল্লচরিত্র নিষ্কলঙ্ক, ইনি “স্বপত্নী জনে প্রিয়সখীবৃত্তি” অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং নিষ্কাম ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম

প্রফুল্ল।

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণেও যাহা অর্পণ করিতে পারেন নাই তাহা স্বামীতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা তাঁহার পক্ষে অন্য দেবতা নাই, ইহাই তাঁহার সকল শিক্ষার সার শিক্ষা। প্রকৃতি প্রদত্ত এই শিক্ষায় যিনি মহিমান্বিতা হইয়াছিলেন, তিনি সকলের ভক্তিভাজনীয়া, এবং তিনি লোকশিক্ষার উপযোগী, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও হিন্দুরমণীগণ প্রফুল্লচরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ এই, প্রফুল্লচরিত্র স্থলবিশেষে হিন্দু

রমণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম। প্রফুল্লর মল্লযুদ্ধশিক্ষাদি হিন্দুরমণীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে কখনই পারগ হইবে না। হিন্দু রমণীর হৃদয় এরূপ ভাবে গঠিত ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার এরূপ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, যে তাঁহাদের পক্ষে প্রফুল্ল-চরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব। সীতা ও সাবিত্রী যাঁহাদের আদর্শ, প্রফুল্ল তাঁহাদের আদর্শ হইতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত কল্যাণী ও শান্তিচরিত্র এস্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। শান্তিচরিত্র প্রফুল্লচরিত্র সদৃশ কিছু পরুষ-ভাবাপন্ন হইলেও ইহা যে অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল

কল্যাণী ও শান্তি।

যে কারণে, সেই কারণে শান্তিদেবীও হিন্দু-রমণী কর্ত্তৃক আদর্শরূপে গৃহীত হইবেন না। কিন্তু কল্যাণীর কল্যাণময়ী প্রতিমা, হিন্দুর গৃহে গৃহে আদর্শ-প্রতিমা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। অগ্নি-বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় কল্যাণী ও শান্তি চরিত্র ভাস্বর, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একে আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা ও অন্যে আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা স্বামীকে মহিমান্বিত করিয়া-ছেন। আলস্যের দিন অতীত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, জাগ্রত ভাবে কার্য্য করিবার সময় সমুপস্থিত, দেশের জন্য অনেককে জীবন উৎসর্গ করিতেই হইবে, এরূপ সময়ে জীবানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের চরিত্র মাহাত্ম্যে হিন্দুপুরুষবর্গকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, কল্যাণী ও শান্তির আদর্শে হিন্দুরমণীগণকে আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা শিখিতে হইবে!

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা গৃহের ও সমাজের মুখোজ্জ্বলতাসাধন দূরে থাকুক রমণীগণ দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময়ে গৃহ ও সমাজের মুখে কলঙ্ক লেপিয়া থাকেন। অনেক সময়ে রমণীর অভিমান, আত্মসর্ব্বনাশ ও গৃহ-

অশান্তির মূলে নিহিত থাকে। যাঁহারা সহজেই অভিমানিনী, স্বামীর এতটুকু লাঞ্ছনাতে যাঁহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহারা মৃণালিনীচরিত্র আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ উপকৃত হইবেন। অভিমানশূন্যতা আদর্শ প্রেমের একটি লক্ষণ। এই অভিমান-শূন্যতা আমরা মৃণালিনীচরিত্রে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছি। আদর্শ প্রেমের আর একটি লক্ষণ ধৈর্য্যশীলতা। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে হেমচন্দ্র বিচারশূন্য হইতেন, কিন্তু ধৈর্য্যশালিনী সকল অবস্থাতেই বিচার দ্বারা

বিচারশালিনী মৃণালিনী।

প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন, অবিজ্ঞের মত প্রশ্নের একদিক দেখিয়া তিনি নিরস্ত থাকিতেন না। বিনাদোষে তিনি হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা ও পরিত্যক্তা হইলে কহিয়াছিলেন—"সে আমারই দোষ, আমি গুছাইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিতে পারি নাই।" ললাটস্পর্শে বেদনানুভূত হইলে তিনি কহিলেন—বোধ হয় আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব। কথা এই, মৃণালিনী বিচার-শালিনী অথচ প্রণয়-শালিনী; প্রণয়-শালিনী বলিয়া তিনি প্রেমাস্পদের কোন অপরাধই দেখিতে পাইতেন না।

প্রত্যুত, মৃণালিনীর প্রেম অনন্যসাধারণ—সেই আম্রফল ও বৃশ্চিক-দংশনের ইতিহাস স্মরণ করিলেই মৃণালিনীপ্রেমের অসাধারণত্ব উপলব্ধি

মৃণালিনীর প্রেম।

করিতে পারা যাইবে। সাধক ঈশ্বরারা-ধনায় সর্ব্ববিধ শারীরিক কষ্টকে অক্লেশে যেমন উপেক্ষা করেন, সেইরূপ স্বামী-আরাধনায় মৃণালিনী সর্ব্ববিধ ক্লেশকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। পিতৃগৃহে, লক্ষ্মণাবতীনিবাসী হৃষীকেশ শর্ম্মার আশ্রয়ে, কিম্বা নবদ্বীপপ্রান্তবাসিনী রত্নময়ীর কুটীরে সর্ব্বত্র মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন। "বর্ষাকালের পদ্মের মত", "অশোক-ফুলের স্তবকের মত" মৃণালিনী হেমচন্দ্র-বিরহে

পরগৃহে বাস করিতেন। বিরহ-রজনী প্রভাত হইলে যেদিন মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ পাইলেন, সেদিন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যাহাহউক, প্রিয়বিরহে কাতর ও উদ্দেশ্যহীন, প্রিয়জন সাক্ষাতে আনন্দ বিহ্বলতা পরম বিস্ময়কর ব্যাপার নহে এবং ইহা স্বর্গীয় প্রেমের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ কদাচ গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু প্রেমাস্পদের সহস্র লাঞ্ছনা ও অত্যাচার যিনি নীরবে সহ্য করিতে পারেন, যিনি স্বামীর সহস্র হতাদর বিস্মৃত হইয়া এতটুকু আদর স্মরণপূর্ব্বক অনন্ত সুখ লাভ করেন তাঁহার প্রণয় যে এ-জগতের নহে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। স্বামীকর্ত্তৃক নিগৃহীতা ও পরিত্যক্তা হইয়া যিনি কহিয়াছিলেন, আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম আজিও তাঁহার দাসী, তিনি স্বর্গীয়া রমণী। স্বামী অত্যাজ্য, তিনি নরকের কীট হইলেও অত্যাজ্য, একথা সূর্য্যমুখী অথবা ভ্রমর ভাবিতে পারেন নাই, কল্যাণী অথবা শান্তি একথা ভাবিবার অবসর পান নাই, মৃণালিনী একাকিনী একথা ভাবিয়াছিলেন। স্বামীর অপরাধ শুধু যে বিস্মরণীয় এমত নহে, তাহা আশ্রাব্য ও অনালোচ্য—সূর্য্যমুখী স্বামীর অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, ভ্রমর স্বামীর অপরাধ শ্রবণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন অন্তর মধ্যে তাহা পোষণ করিয়াছিলেন।

লোকাপবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছিলেন ইহার কারণ এই, হেমচন্দ্র সহজেই

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী বিশ্বাস।

ধৈর্য্যহীন। ধৈর্য্যহীনতা হইতে বিচারশূন্যতা এবং বিচারশূন্যতা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি প্রণয়সূর্য্য আচ্ছাদন করে, প্রণয়সূর্য্য আচ্ছাদিত হইলে প্রেমাস্পদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক, ওথেলো অনর্থক ডেস্‌ডেমনাকে

সন্দেহ করিয়াছিল। শেকসপীয়র জ্বলন্ত ভাষায় সেই ভ্রান্তিমূলক সন্দেহের যে হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন মানবসমাজ চিরদিন তাহা পাঠ করিয়া এই মহৎ শিক্ষা লাভ করিবে যে—প্রেমাস্পদের প্রতি কদাচ সন্দিগ্ধ হইও না—প্রেমাস্পদের প্রতি সন্দেহের যদি কোন কারণ উপস্থিত হয় তাহা উপেক্ষা কর। মৃণালিনী প্রেমাস্পদের প্রতি সন্দেহের কারণ উপস্থিতি মাত্রে উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু হেমচন্দ্র তাহা পারেন নাই।

অভিমানশূন্যতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও প্রেম মৃণালিনীচরিত্রের প্রধান অলঙ্কার—এই সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাঁহার চরিত্র পুষ্পভারাক্রান্তা ব্রততীতুল্য বিনম্র ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার এই বিনম্রভাবে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। মণিমালিনী ও গিরিজায়া তাঁহার চরিত্রে এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য একে পিতৃবিরুদ্ধাচারিণী ও অন্যে দেশত্যাগিনী হইয়াছিলেন। স্ত্রীচরিত্রানভিজ্ঞ মাধবাচার্য্যও পরিশেষে মৃণালিনীচরিত্রে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই যেমন

স্নেহপরায়ণা মৃণালিনী।

মৃণালিনীকে স্নেহ করিতেন মৃণালিনীও তেমনি সকলকে স্নেহ করিতেন। তিনি পিতামাতার আদরিণী কন্যা ছিলেন, হেমচন্দ্রের জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া তিনি পিতামাতার স্নেহ স্মরণপূর্ব্বক ব্যথিত হইতেন। তিনি মণিমালিনীর সখিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যবনযুদ্ধের অবসানে আসামপ্রদেশে হেমচন্দ্রের নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মৃণালিনী মণিমালিনীকে স্মরণ ও আমন্ত্রণ দ্বারা অন্তঃপুরবর্ত্তি করিয়া তাঁহার সখিত্ব উপভোগ করিয়াছিলেন। গিরিজায়াকেও মৃণালিনী সবিশেষ স্নেহ করিতেন।

মৃণালিনী যেমনি স্নেহপরায়ণা তেমনি কৃতজ্ঞহৃদয়া। দুঃখের দিনে যে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ ছিল সেই গিরিজায়াকে

সুখের দিনে তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। সুখের দিনে তিনি গিরিজায়ার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তদ্‌সমীপে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন ও তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। পাটনীপুত্রী রত্নময়ীকেও তিনি সুখের দিনে বিস্মৃত হয়েন নাই; সম্পদের দিনে তিনি মণিমালিনীর স্বামীকে রাজবাটীর পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপকৃত করিয়াছিলেন।

মৃণালিনী কৃতজ্ঞহৃদয়া।

উল্লিখিত প্রধান গুণ ব্যতীত মৃণালিনী অন্যান্য গুণেরও অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার নির্ভিকতা প্রশংসনীয়,—ভয়ে তিনি কখনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। ইহার প্রমাণ অনেকস্থল হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। হৃষীকেশ ও ব্যোমকেশ উভয়েই মৃণালিনীকে শঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি ভীতির লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই! আত্মসম্মানরক্ষার্থে কখন কখন রমণীকে প্রচুর সাহসের পরিচয় দিতে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে মৃণালিনী সাহসের পরিচয় দিতে কদাচ পশ্চাৎপদ হইতেন না।

মৃণালিনীর নির্ভিকতা।

মৃণালিনীর ইন্দ্রিয় সকলও নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল—তাঁহার শ্রুতি, দৃষ্টি ও ত্বাচ শক্তির তীক্ষ্ণতার পরিচয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে মৃণালিনী ও মণিমালিনী যখন আলেখ্য লিখিতেছিলেন, তখন গিরিজায়ার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি প্রথমে মৃণালিনীর কর্ণকুহরেই প্রবেশলাভ করিয়াছিল। অশ্বারোহণে নক্ষত্রবেগে হেমচন্দ্র রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন, মৃণালিনী দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; মাধবাচার্য্যের করস্পর্শেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে হেমচন্দ্রের করস্পর্শ নহে। এই ইন্দ্রিয়তীক্ষ্ণতাও প্রণয়ী ব্যক্তির

ইন্দ্রিয়তীক্ষ্ণতা।

একটি লক্ষণ—রজনীচরিত্র স্মরণ করিলে একথা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরাজিতে Scott লিখিত Maid of Neidpath নামে একটি সুন্দর কবিতা আছে তাহাতেও একথা স্পষ্টরূপে ...ঝান আছে।

মৃণালিনীর আর একটি গুণ, তিনি কলাকুশলী—পূর্ব্বকালে ধনী, দরিদ্র সকল গৃহেই রমণীগণ কলাকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। কক্ষপ্রাচীরে, গৃহপ্রাঙ্গণে, শয্যারচনে ও রন্ধনশালায় তাঁহাদের কলাশিক্ষার সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যাইত। বেণীবন্ধনে, মাল্যগ্রন্থনে, প্রসাধনক্রিয়ায়, নৃত্যগীতে ও আলেখ্যনির্ম্মাণে তাঁহাদের কলাকৌশল প্রকটিত হইত। মৃণালিনী ধনীর কন্যা, তিনিও কয়েকটি কলাশিক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি মালা গাঁথিতে, চিত্র আঁকিতে ও কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানিতেন।

কলাকুশলী মৃণালিনী।

লেখকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ সতর্কতার সহিত তাঁহার চরিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাভাষার সেবকমাত্রেই বিদিত আছেন! উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার সতর্কহীনতার দুইটী দৃষ্টান্ত আমরা মৃণালিনীচরিত্র হইতে উল্লেখ করিব। মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী নারী পিতামাতার অগোচরে এরূপ রূপগুণসম্পন্ন রাজপুত্রকে যেরূপ ঘটনাধীনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অতীত যুগের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান যুগেও সম্ভবাতীত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। হেমচন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃণালিনী পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতামাতার আদর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন! কন্যা বয়স্থা হইয়াছিল—পিতা কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—বৌদ্ধ মধ্যে একটি

বঙ্কিমচন্দ্রের অসতর্কতা।

সুপাত্র মিলিল, বিবাহের দিন স্থির হইল, কিন্তু মৃণালিনী জ্বর করিয়া সে পাত্র তাড়াইলেন। আবার সম্বন্ধ আসিলে মৃণালিনী আবার জ্বর করিয়া বসিলেন। যাহাহউক, এ সকল কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু তিনি সম্বন্ধের ভয়ে যে কখন কখন এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া মগধে হেমচন্দ্রের নিকট পলাইতেন, একথাটা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একটি অল্পাধিক পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে পরিচারকমাত্র সমভিব্যাহারে এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া পিত্রালয় হইতে প্রিয়সন্নিধানে পলায়ন ও পিত্রালয়ে পুনঃপ্রতিগমন কতদূর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসতর্কতার ফলে মৃণালিনীচরিত্রে ক্ষণেকের জন্য আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়। দ্বিতীয় কথা এই, মৃণালিনী পিতার বিরূদ্ধচারিণী, পিতার অমতে পিতার বিরক্তিভাজনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতৃচরণে তিনি অপরাধিনী হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ না তিনি পিতৃক্ষমা লাভ করিতেছেন, অন্ততঃ পিতৃক্ষমা লাভের জন্য আকিঞ্চন প্রকাশ করিতেছেন, ততক্ষণ আমরাও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। মৃণালিনী, অনন্ত প্রেম ও অসীম ধৈর্য্যের পুরস্কারস্বরূপ হেমচন্দ্রের ভালবাসা পুনর্লাভ করিয়াছিলেন এবং মহিষীরূপে তিনি হেমচন্দ্রের পুরী আলোকিত করিয়াছিলেন। রাজমহিষী হইয়া মৃণালিনী, রত্নময়ী প্রভৃতি সকলকেই স্মরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পীড়িতহৃদয় পিতামাতাকে কি একবারও মনে পড়ে নাই? মৃণালিনীর সমগ্র চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের বোধ হয় যে, ইহা লেখকের সতর্কহীনতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

শেষ কথা—মৃণালিনীর সহিত হেমচন্দ্রের বিবাহ ও হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পুষ্পবাটিকার নির্লজ্জ ও গোপন সাক্ষাতাদি অনেকে আপত্তিকর মনে করিতে পারেন—কিন্তু তৎকালিক সামাজিক অবস্থা

যদি সকলে স্মরণ রাখেন তাহা হইলে কিছুতেই সেরূপ মনে হইবে না।

তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা ও মৃণালিনীর চরিত্র।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে কালের চরিত্র সে কালে বর্ত্তমান যুগের কঠোর অবরোধ-প্রথা সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রমণী-জাতিকে মুক্ত আকাশটুকু দেখিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই! অনেকের বিশ্বাস, পাঠানাধিকার হইতে হিন্দুসমাজে অবরোধপ্রথা প্রবেশলাভ করিয়াছে। এ বিশ্বাসের মূলে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে যুগের চিত্র, সে যুগে ভারতবর্ষে পাঠান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। পাঠান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর অন্তঃপুর ও বহির্জগতের মধ্যে যে আকাশস্পর্শী প্রাকার ধীরে ধীরে শির তুলিয়াছিল তাহা লঙ্ঘন করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীর ভাগ্যে বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু মহম্মদীয় সাম্রাজ্যের সূত্রপাতকালে হিন্দুরমণীর অবস্থা বিভিন্ন ছিল। বাল্য-বিবাহ যে তৎকালে প্রচলিত ছিল এমন নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা কন্যার জন্য পাত্র মনস্থ করিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা আপন পাত্র আপনি মনন করিয়া লইতেন। এতদ্ভিন্ন, আজই রমণীহৃদয়ের স্বাধীনতা নির্দ্দয়রূপে অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু সে যুগে সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

দিদি-হারা।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,—
মাগো আমার শোলক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?

পুকুর ধারে লেবুর তলে, থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই—
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?
সেদিন হ'তে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো ;—
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?

খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি তখন
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো—
আমি ডাকি তুমি কেন মা চুপ্‌টি করে থাকো ?
বলমা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে'
কাল যে আমার নতুন ঘ'রে পুঁতুল বিয়ে হবে।

দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !
ভুঁইচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল—
মাড়াস্‌ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল।

ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুল্‌বুলিটি লুকিয়ে থাকে
উড়িয়ে তুমি দিওনা মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল—
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বল্‌বে কি মা বল্‌।
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময় মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

লেবুর তলে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, তাইতে জেগে রই
রাত্রি হল, মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী

ঘরের কথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা গেলে রাজা হয়, বড়বাবু গেলে কি আর বড়বাবু হয় না? শিয়ালদহ আফিষেও বড়বাবু হইয়াছে ; ইহাঁরও আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, উমেদার জুটিয়াছে ; যে সকল দাদা, জ্যাঠা, খুড়ো, পিশে, শালাপো এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিল তাহারা সকলেই প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহাদের "অতি আপনার অমুকের" যে এত গুণ ছিল তাহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া হায় হায় করিতেছে। নূতন বড়বাবু ক্রমে ক্রমে গুটি আষ্টেক পুরাতন কেরাণীকে সরাইয়া ভায়রা-ভাই, শালাপোদিগকে তাহাদের কার্য্যে বসাইয়াছেন। এখন একটী পরমাত্মীয়ের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া আছেন। নূতন বড়বাবুর এক সময় "এক জায়গায়" যাওয়া-আসা ছিল ; পরমাত্মীয় যুবকটী "সেই জায়গার" বোনপো, মাইনর স্কুলের থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত বরাবর বেতন দিয়াছে—সেই "এক জায়গা" আমাদের বাবুর নূতন পদোন্নতির সংবাদ পাইবামাত্র তাহাকে ডাকাইয়া বোনপোটীকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছে ও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে যেন বাছাকে এমন একটী কর্ম্ম দেওয়া হয় যাহাতে পরিশ্রম কম ও দু'পয়সা ভাল রকম উপরি আছে। রাজচন্দ্রের ন্যায্য মত যা কিছু উপরি ছিল, আফিষের লোকে কল্পনায় তাহার উপর চুরি চড়াইয়া অন্ততঃ দশগুণ অধিক আয় আন্দাজ করিত। নূতন বড়বাবুরও তাহাই বিশ্বাস, এজন্য রাজুর কাজটী হলেই "সেই জায়গার" বোনপোর সুবিধা হয় মনে করিতেন। অবশ্য বোনপোবাবু রাজুর পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারিবেন না ইহা তিনি

জানিতেন কিন্তু "কাম আপসে চল্‌তা হ্যায়" ন্যায়-শাস্ত্রের এই সূত্রে মেশোমহাশয়ের বিশেষ আস্থা ছিল। বোনপোবাবুটী একটু মোলায়েম ধাতের ছোকরা, শরীরখানি কতক ননীর পুতুল গোছ। করুণানিধান ন্যায়বান্‌ পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ চাচার হুকুমে এই কলিকাতা সহরের একজন রাজপুত্র, ছেলেটীর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মাসে মাসে বরাবর পনের টাকা ক'রে খোরাকী যোগাইয়াছিলেন, গরবিণী গর্ভধারিণী তাই বাছাকে একটু রাজারাজড়াই তরিবতে প্রতিপালন করেন।

শৈশবে দুধের পরিবর্ত্তে রাবড়ী খাওয়ান হয়; লিভারও হয়, কিন্তু কুলীনপুত্র বলিয়াই সে সাধারণতঃ শিবের অসাধ্য রোগ হইতেও বাছা মুক্তি পায়। শরীরে এত অধিক পরিমাণ পারদ ছিল, যে বোধ হয়, বাছার অঙ্গে একখানি কাচ বসাইয়া দিলে তাহাতে অনায়াসে মুখ দেখা যাইতে পারিত। এবং সেইজন্য রসকেশর চক্ষু, কর্ণ, নাশা ত্বক প্রভৃতি ফুটিয়া এত ঘন ঘন উকি মারিত যে প্রসূতিকে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বারমেসে বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বদা কোলে কোলে থাকায় আঁধার-ঘরের-মাণিক সাত বৎসর বয়সেও হাঁটিতে গেলে ধূপ ধূপ করিয়া পড়িয়া যাইত; বাছার কটিদেশ হইতে দেহের উর্দ্ধার্দ্ধ, নিম্নার্দ্ধ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও ভারি ছিল এবং মস্তকটী তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পিতামহের স্কন্ধে স্থাপিত হইলে একটু বড় দেখাইত বটে কিন্তু বেশী বেমানান হইত না। দশ বৎসর বয়স পয্যন্ত বাছাকে লোকে কুমার বলিয়া সম্বোধন করিত ও সিংহ উপাধিতে ভূষিত করিত কিন্তু তার পরেই উপপিতা রাজামশাই এ চাকরীতে জবাব দিয়া অন্যত্র ভর্ত্তি হইলেন এবং পটুয়াখালির গুরুগোবিন্দ সাহা মহাশয় পাটের কাজে কিছু ঠাট বাড়াইয়া এবং কলিকাতায় একটু মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য দোলনচাঁপার স্কন্ধে নির্ভর করিলেন।

প্রসূতি, পুত্রকে যাদুধন বলিয়া ডাকিত, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কেহ বা যাদুবাবু কেহ বা ধনবাবু বলিয়া আদর করিত কিন্তু রাজপুত্র জনকের ইন্দ্রযোজিত বদন-ব্যথাকারী নামের অনুকরণে এবং তাঁহার একজন কবিগোছের সহচরের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ধনবাবুর সামাজিক নামকরণ হয়, রাসভেন্দ্র কুমার। নয়বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কুমার পিতার পদবী বহন করে, পরে ফরিদপুরের এক আড়তদার মহাশয় শ্রীমন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত হইলে তিনি জমীদারী ক্রয়ের সঙ্গে যখন নিজে পতিতপাবন সর্ব্বজনতারণ "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন তখন ঐ অক্ষরদ্বয় কুমারের লাঙ্গুলেও লাগাইয়া দেন। কিন্তু এখানেও যাদুধনের সংস্কারের শেষ হয় নাই; তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সকালে, প্রসূতি সাত-আনির ঘোষালবাবুদের ব্রহ্মত্রভুক্ত হইল ও "সেজো-মহাশয়" নিজে দাঁড়াইয়া মহাসমারোহে শ্রীমানের যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া দেন; এবং নূতন খরিদা বাটীর কওলাতে ব্রহ্মত্রভুক্তা প্রসূতির নামও দেবীপদবীতে ভূষিতা হয়। সুতরাং সেই অবধি আমাদের শ্যামী-ধোপানীর বোন-ঝি ভূতি, শ্রীমতী দোলন চাঁপাদেবী ও তাঁহার পিণ্ডাধিকারী, কুমার রাসভেন্দ্র কুমার ঘোষাল নামে পরিচিত হইয়াছেন। মেজো-ঘোষালমহাশয় শ্রীচরণ ধরিয়া বারম্বার অনুরোধ করাতেও দোলনচাঁপা পুত্রকে কুমার পদবী বর্জ্জিত করিতে স্বীকৃতা হন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এখন এই দোলনচাঁপার সৃষ্টিধরের চিন্তায় নূতন বড়বাবু কিছু বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং রাজচন্দ্রকেই দোলনের মনোরঞ্জনের পথের কণ্টক মনে করিয়া তাহার উপর কর্ত্তার নজরটা একটু তিক্ত রকম দাঁড়াইল। চাটুজ্যের ঈর্ষা-ঘৃণা-প্রণোদিত সতেজ চক্ষে নূতন বড়বাবুর এভাব ঢাকা থাকিল না। এ দিকে যে ম্যাজসাহেব

রাজুবাবুকে বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখিতেন ; তাহার কার্য্যসম্বন্ধে দক্ষতা, পটুতা, পরিশ্রম, অনুরাগাদি গুণ প্রথমাবধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; যাঁহার হৃদয়ে রাজচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম সততা ও নির্ম্মল চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল সেই ম্যাজ সাহেব কোন নূতন লাইনের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিবার জন্য শিয়ালদহ আফিষ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অবশ্য ম্যাজসাহেব শিয়ালদহ ত্যাগের সময় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নূতন সাহেবকে রাজুবাবুর গুণাবলির কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহার উপর একটু সুদৃষ্টি রাখিতে ও বিশ্বাস্য কার্য্য প্রভৃতির ভার তাহারই প্রতি অর্পণ করিতে ভাল করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, আফিষের মধ্যে রাজুর যে গুটিকয়েক হিংস্রক শত্রু আছে একথাও তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু নূতন সাহেবটী একে বর্ণশঙ্কর তায় পাঁচপুরুষে ভঙ্গ। তাঁর অধস্তন চারিপুরুষের মধ্যে কি পিতৃকুল কি মাতৃকুল কেহ কখনও চট্টগ্রামের সীমার বাহিরে সমুদ্রজলের কিরূপ বর্ণ তাহা দেখেন নাই। কেহ কেহ বলে যে, এই ব্যারেগাসাহেবের পিতা একবার (Undertaker) সমাধি-সহকার-কার্য্যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ছোট ব্যারেগার পক্ষী-বিপণি-রক্ষাকারিণী মাতৃস্বষার অষ্টাবক্র স্বাক্ষরটী দেড়শত টাকার একখানি চেকের উপর অবিকল নকল করেন। রাজপুরুষেরা বিলি-ব্যারেগার এই অদ্ভুত চিত্রচাতুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ট্রেজরির ব্যয়ে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের লবণাম্বুবাহী স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের জন্য প্রেরণ করেন ; তথায় তিনি কয়েকটী সংসারত্যাগী ভারত সন্তানকে রাজভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর সুরা প্রস্তুতের কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং দুই তিনটী মান্দ্রাজ মহিলার সাহায্যে একটী নবীন "বৃটিশ-বরণ"-জীবের উপনিবেশ

স্থাপনের চেষ্টা দেখেন, এই সকল বিদ্যার বলে তিনি আণ্ডামানে আমরণ বিনা রাজকরে বসবাস করিবার সনন্দ পাইয়াছেন।

বৎসর দুই-তিন হইল, উদ্যমশীল বিলি-ব্যারেগা একদিন কতকগুলি বংশদণ্ডের দ্বারা একরূপ নূতন জলযান নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর বা দক্ষিণ কোন একটা মেরু আবিষ্কারের জন্য শুভযাত্রা করেন কিন্তু দিন ক্ষণ না দেখিয়া অমাবস্যার রাত্রে যাত্রা করায় পথিমধ্যে একটা বাধা পড়ে ; গবর্ণমেণ্টের ডাক-বাহী বাষ্পীয় পোতের নাবিকগণ কোকাদ্বীপের আলোক-ঘরের (Light House) নিকট ঐ অপূর্ব্ব যান দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ বিলিকে আপনাদের জাহাজে তুলিয়া লইয়া আণ্ডামানের ধন আণ্ডামানে ফিরাইয়া আনেন।

তদবধি তথাকার কমিশনার সাহেব, বিলি-ব্যারেগার চরণে প্রেমের লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে (Permanent knight of the chain gang) শৃঙ্খল-সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী-বীর উপাধিতে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন। আণ্ডামানের পোর্টব্লেয়ার নামক বন্দী-নিবাসের একটী স্থানের নাম এবার্ডিন, ব্যারেগার খাস-মহল সেই খানেই ; তিনি বৎসরে তথা হইতে পুত্রকে কুশল লেখেন ; পুত্র—আমাদের জো ব্যারেগা—খাম গুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া পত্র-শির লিখিত "এবার্ডিন" কথাটী বন্ধু বান্ধবকে দেখান ও বলেন "Guo writes from' ome" বন্ধুরা মনে করেন পত্রগুলি স্কটলণ্ডের এবার্ডিন হইতে লেখা।

জো-ব্যারেগা কলিকাতার ফ্রি-স্কুলে বাল্যলীলা সমাপণ করিয়া ইষ্টারন-বেঙ্গল-রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়ার কারখানার পোর্টার রূপে নিযুক্ত হন। ঐ কার্য্যে জোর পূর্ব্বে বহুদিন হইতে একজন কাফ্রি "সাহেব" নিয়োজিত ছিল। একবার কাঁচড়াপাড়ায় রেলের সাহেবেরা নববর্ষ উপলক্ষে একটা খুব জমকাল রকম পার্টী দিয়াছিলেন, সুধার ভাণ্ডার কাফ্রিসাহেবের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ

আস্বাদ করিতে করিতে ভাণ্ডারী, মরাল গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া উত্তপ্ত শোণি পান করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজেরা পুরাতন গ্রীক ও রোম বীর ও পণ্ডিতগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ আপনাদে আদরের কুকুরকুলকে ও আফ্রিকাবাসী দাসগণকে সেই দেবোপ মনস্বীগণের অমর নামগুলিতে ভূষিত করেন।

কোন দাসকুলের বংশধর বলিয়া আমাদের কথিত এই কাফ্রি পোর্টাটীর নাম ছিল সিজার। কাফ্রি সিজার মদিরামোহে মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সেই পৌরাণিক রোমের জগজ্জয়ী সিজার মনে করিয়া এবং সমগ্র বৃটনবাসীকে ধ্বংস করিবার মানসে দীর্ঘ-ফলক ছুরিকা হস্তে আরক্ত লোচনে বহির্গত হইল; ভোজ-বিরাজি সাহেবগণ তাহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছিলেন; কিন্তু প্রমোদসঙ্গিনী প্রমদাচয় মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম করায় পবিত্র নাগর ধর্ম্মপালনের জন্য কঠোরকরে কোমলাগণের তুষারাঙ্গ আবরণে ব্যাপৃত হইল; ভোজ বা নৃত্যগৃহে নিজ বনিতার হস্তধারণ সভ্যতাবিরোধী ব্যবহার সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের শঙ্কাকুলা সুধাবিহ্বলা কামিনীগণকে ধীরবক্ষে রক্ষা করিয়া তাম্বুর অন্তরালে তামসী তরুতলে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে খৃষ্ট-কালের কৃষ্ণ-সিজার ছুরিকা আস্ফালন করিয়া শার্দ্দুল-লম্ফে রেল-পথের-তার-বেষ্টন উল্লঙ্ঘন করিল, এমনসময় ষ্টেসনের দিক হইতে এক খানি পাইলট এঞ্জিন রাক্ষস-অক্ষিদ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া জ্বলন্ত ধুম্র ফুৎকার করিতে করিতে বজ্রবেগে আসিতে লাগিল। সুরাসাহসোন্মত্ত সিজার বৃটিশদৈত্যবোধে হুহুঙ্কার গর্জ্জনে মুষ্টিদ্বয়ে ছুরিকা আবদ্ধ করিয়া এঞ্জিনের স্ফীত বক্ষের উপর লাফাইয়া পড়িল ও যাহা হইবার তাহা হইল। শিয়ালদহের ডাক্তারসাহেব "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" করিলেন; পিচ্-কৃষ্ণ-সিজারের কর্দ্দম-শোণিত-সিক্ত দেহপিণ্ড তাঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রে পরীক্ষীত হইয়া দরিদ্র

শানে সমাধিত হইল। ডাক্তারসাহেব কৃষ্ণচর্ম্মের মধ্যে শ্বেত দেহাভ্যন্তরসুলভ সমস্ত উপাদানই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া পাইয়াছিলেন; এ রহস্যটী সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয় নাই বটে কিন্তু সাংঘাতিক দুর্ঘটনাটীর যথার্থ ইতিহাস ব্যতীত আর অনেক কাহিনীই ভিন্ন ভিন্ন পত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে একটী হাস্যোদ্দীপক চিত্র দিয়া যৎকিঞ্চিৎ রসিক সাহিত্যের অবতারণা করেন এবং প্রকারান্তরে রেল বিস্তারের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, দাশুরায়ের পাঁচালী, কামিনীকুমার, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া তাহা সুন্দর, অবোধগম্যরূপে অপ্রাঞ্জল ভাষায় দেখাইয়া পাঠকগণকে স্ব-ধর্ম্মরক্ষার জন্য মার্কণ্ডেয় মার্কুলি ও সনাতন সালসা সেবনের ব্যবস্থা দেন।

একটী উদ্যমশীল রঙ্গ-সম্প্রদায় ঐ ঘটনাটীকে নাট্যগৌরবে মণ্ডিত বোধে রেলে-রক্ত নাম দিয়া একজন রাজ-কবির দ্বারা একখানা প্রহসন রচনা করান ও আপনাদের নাট্য-পীঠে "তালনবমী" নামক ভক্তি-রসোদ্দীপক নাটকের জয়-ডঙ্ক-নাদী অভিনয়ের পর উহা প্রায় পনের ষোল জন সর্ব্বসাধারণকে মোহিত, প্রহসিত করিয়া প্রদর্শিত করেন। এই প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া "বঙ্গ বক" লিখিয়াছিলেন যে; "এতদিন রে বাঙ্গলাভাষায় আমরা একখানি যথার্থ নাটক দেখিলাম। এই হিংসা-কলঙ্ক-কালিমা-কুজ্ঝটিকার কোকনদময় দুর্দ্দিনে, এই ধর্ম্মনাশ, াষাহ্রাস, বিজাতীয় ভাষ, ইংরাজি ঢাস, গ্যালারি ঠাস, "পিটে" পাশ প্রভৃতির প্রচেতাপূর্ণ কালে দেখিলাম একখানি নাটক। রেলে-রক্ত" যথার্থ ভক্তের আদরের ধন; প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শূন্য দর, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক সমূহ উচ্চরবে হাস্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় পূর্ণ-গর্ভ নিরেট সাধুজন মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিয়াছেন।

"তাল-নবমী" নাটকের তালে তালে আমরা যেমন অশ্রুজল ফেলিয়াছি, "রেলে-রক্তের" প্রতি উক্তিতে যখন অপরে হাসিয়াছে তখনই অমরা রোদন করিয়াছি।"

"কি জানি কি দৈব বিড়ম্বনা! যেখানে অপরে হাসে আমরা সেইখানেই রোদন করি; বোধ হয় ইহা আমাদের পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল,—সহ্য হয়না আমাদের অপরের হাসি। এই রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের ছটায় দর্শকগণকে প্রতারিত করা হয় না, পরিচ্ছদের ঘটায় সাধারণের মন ভুলান হয় না, আলোকমালার উজ্জ্বলে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেওয়া হয় না, আসনের উৎকৃষ্টতায় কাহাকেও চাতুরী জালে ফেলা হয় না, এখানে বাহ্যাড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই, ইংরাজী বিদ্যার বিজাতীয় ছায়াও এস্থান স্পর্শ করে নাই। এখানে পাইবেন কেবল—নাটক ও অভিনয়। বিকট, উৎকট নাটক আর প্রলয়কালীন বিশ্ববিলয় অভিনয়, "বঙ্গ-বকের" প্রত্যেক পাঠককে আমরা একবার "রেলে-রক্তের" অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি। এই রঙ্গ-ভূমির বিশেষ সুবিধা যে, প্রত্যেক দর্শক এক এক খানি নিজস্ব বেঞ্চে বসিয়া জলঙ্গ-বায়ু সেবন করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে অভিনয় দেখিতে পারেন; সম্মুখের কেদারা কয়খানি সর্ব্বদা আত্মীয়লোকের দ্বারা অধিকৃত থাকায় তাঁহাদের অনুরোধ করিলেই মস্তক নীচু করিবেন, আর কোন দৃষ্টি ব্যবধানের আশঙ্কা থাকিবেনা। পরিশেষে বক্তব্য যে, ম্যানেজার মহাশয় আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়া পান তামাকাদি দিয়া যথার্থ হিন্দুমতে ভদ্রতা রক্ষা করিয়াছেন, সেইখানে কবির সহিত আমাদের পরিচয় হইল; তাঁহার লেখনীতে সুবর্ণ বর্ষণ হউক, মস্যাধারে হীরকের শীলাপাত হউক, কাগজে মণিমুক্তার ঝঞ্ঝাবাত হউক, আর তাঁহার কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক!

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ভিক্ষা।

বহুদিন পরে এসেছি গো মাতা
তোমার চরণমূলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।
জননীর স্নেহ, মায়ের প্রসাদ
মাতৃআহ্বানবাণী,
কেমন মধুর কেমন কোমল
কত কাল নাহি জানি;
স্নেহের পরশ কেমন সরস
গিয়াছি সবাই ভুলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

ভীষণ কুহক গভীর স্বপন
করেছিল জ্ঞানহারা
তোমার ক্রোড়েতে দেয়নি ফিরিতে
এতদিন মাগো তারা।
মাতার আশীষে, সব গেছে টুটে
ভেঙ্গেছে মোহের ঘোর,
পেরেছি চিনিতে তোমায় জননী,
মোদের এ ঘর-দোর।

তাই আজ মোরা এসেছি সবাই
তোমার চরণমূলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

দাওমা বসন, দাওমা ভূষণ
দাওমা উত্তরীয়।
দাওমা সজ্জা, দাওমা শয্যা
সন্তানে তব প্রিয়।
দাওমা অন্ন দাওমা পণ্য
দাওমা হৃদয়ে বল।
তোমার কাননে, তোমার ভুবনে,
দাওমা ফুল ও ফল।
মায়ের করুণা, মায়ের এ দান
লইব মাথায় তুলে।
শিখাব সবায় তোমারি সন্তান
এ কথা কেহ না ভুলে
আশীষ বরষি, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

---

২৯ বর্ষ, পৌষ, ১৩১২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,

বঙ্গমহিলা সমাজ ও

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

তাঁহারা আর বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না। এ পর্য্য

তাঁহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসার তৈল, বিলাতী মিষ্ক আ

রোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার অডিকলোন ও ফ্লরিডা ওয়াটা

ব্যবহার করিয়াছেন,

তাঁহারা অনায়াসেই

দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীর

এই অর্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন, কারণ

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকলপ্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমরা নিজের কারখানায়, দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহা যেমন সুলভ তেমনই উৎকৃষ্ট,

একবার পরীক্ষা করুন।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্বোধন।

এতদিন পরে, জননীরে যবে, আজকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান, কেউ কোথা আর, থাকিস্‌নে নিরজনে ;
সবে মিলে তোরা কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসারে বোধন,
দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, মলিনতা দূর কর প্রাণপণে ;
সন্তান হয়ে, মিছে কাজ লয়ে, থাকিস্‌নে নিরজনে।

ওই শোন্ ওই মায়ের অভাব
বস্ত্র নাহিক ঘরে,
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু
রত্ন হরেছে পরে ;
কোটী পুত্র তোরা আছিস, সবাই পেয়েছিস নব প্রাণ,
এখন সকলে বলরে তোরা, কি করিবি মা'কে দান!
কি দিয়ে তাঁহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা,
সব ত দি'ছিস পরকরতলে,—কেমনে রাখিবি মান?
এখন সকলে বলরে তোরা, কি করিবি মা'কে দান?

বিদেশী বণিক শতবর্ষ ধরে,
যে ধন লয়েছে হরে,
পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ?
পারিবি কি তোরা প্রতিশোধ নিতে মায়ের এ অপমান?
সবে মিলে তবে কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসারে বোধন,
একপ্রাণ হয়ে, মনে বল নিয়ে, হ'য়ে সব আগুয়ান ;
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর্ লক্ষটী শির দান!

PAGE CONTAINS TWO COLOURS

থাকুক্ শিয়রে শাণিত কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয়, শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃকপাত।
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর, মাতৃজয়নিশান;
বিশ্বসমাজে পরিচয় দেরে, তোরা কা'র সন্তান।

ওই দেখ ওই জননী তোদের
কাতর মলিন ক্ষীণা,
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিণী প্রায়
অন্নবস্ত্রহীনা,
শতকোটী তোরা পুত্র যে তাঁর পেয়েছিস নব প্রাণ!
আর কেন বল নিরবে শুনিবি মাতৃদৈন্যগান!

সমসাময়িক ভারত।

(ফরাসী পর্য্যটক এর্নেষ্ট পিরিউ-প্রণীত)

আর্থিক অবস্থা।

১

এই আর্থিক অবস্থার প্রশ্নটি দুইভাবে আলোচিত হইতে পারে;—এক, ইংরাজের দিক্ দিয়া, আর এক, ভারতবাসীর দিক্ দিয়া। প্রথম স্থলে,—ইংরাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে খরচ খর্চ্চা বাদে যে মোট লাভ হয়, তাহার হিসাবাদি হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। যদি সরকারী তথ্য-বিবরণীতে কার্পাসের জয়ঘোষণা করা হয়, যদি কোম্পানিদিগের "শেয়ার"—খাল-কর্ত্তনের শেয়ার—এই সকল শেয়ারের মূল্য বিলাতের "ষ্টক্-এক্‌সচেঞ্জে" চড়িয়া যায়, যদি ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতের দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করে, তাহলেই জানিবে ভারত সুখী, ভারত সমৃদ্ধ, ভারত সৌভাগ্যশালী! ইহারই জন্য ভারতকে ইংরাজ শাসন-প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা করিতে হইবে! যে "ব্রিটানিকী শান্তি" স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত মহা-সমারোহে বিজয়-পথে চলিয়াছেন,—হে হিন্দু মুসলমান!—তোমাদের উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহার সেই চরণ-তলে নিঃক্ষেপ কর!...কিন্তু এই সমস্যার আর-একটা দিক্ আছে; রাজপুরুষদিগের—ধনপতিদিগের —ইঙ্গ-ভারত-রাজ্যের অথবা বিলাত-রাজধানীর ইংরাজ বণিক্‌দিগের গণ্ডির বাহিরে যে ত্রিশকোটি ভারতবাসী ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে, তাহাদের ভুলিলে চলিবে না।

ছবির একদিকে দেখ:—একটা বৃহৎ উৎসব; কতকগুলা লোক, তুলার বস্তার মধ্যে, বাইবেল-গ্রন্থরাশির মধ্যে, খাজনার দাখিলার

মধ্যে, স্ফীতোদর "বজেটের" মধ্যে, উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেছে; অন্যদিকে :—কত অসংখ্য গৃহস্থ—শীর্ণ, নগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত—কতক গুলা পীতবর্ণ দীর্ঘ মনুষ্য-কঙ্কাল দুর্ব্বল পায়ের উপর ভর দিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে...আশ্চর্য্য ব্যাপার! ছবির দুইটা দিকৃই সত্য। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের যে সকল রিপোর্ট, সুখবাদীর উজ্জ্বলতম বর্ণে রঞ্জিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পৃক্। কেননা, কে বলিতে পারে—কত আত্মবলিদানের মূল্যে—কত দুঃখ কষ্টের মূল্যে; এই ইউরোপীয় প্রণালীর চাকচিক্যময় মহার্ঘ আড়ম্বর-সকল অর্জ্জিত হইয়াছে। "শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য, রেল্-পথ নির্ম্মাণের জন্য, সৈন্যসামন্ত রক্ষণের জন্য, আমাদের অত্যন্ত ব্যয় হয়—ভয়ঙ্কর ব্যয় হয়!" ইহাই কর-দাতা প্রজাগণের অভিযোগ; কিন্তু এই অভিযোগ-বাণীর প্রতিধ্বনি নাই! যাঁহাদের উপর শাসনের ভার, তাঁহারা এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, প্রজার আবাস-কুটিরের কোন গুপ্ত কোণে, এখনও কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে;—কেননা, রমণীরা হাতে ও পায়ে চিরদিন গহনা পরিয়া থাকে। তবে আর কি!—ইস্ক্রুর আর এক প্যাঁচ্ ঘুরাইয়া দেও—ইহার বিরুদ্ধে দুঃখবাদীরাও কোন কথা বলিতে পারিবে না।

যাহারা গোড়াতেই দেশীয়দিগের ন্যায্য অধিকারের প্রতিবাদ করে, তাহাদের নিকট ইঙ্গ-ভারতীয় রাজ্যপদ্ধতি একেবারে আদর্শস্থানীয়। ইহার উপর যতটা স্তুতিবর্ষণ হয়, ততটা স্তুতিবর্ষণ মানবীয় আর কোন কার্য্যের উপর হয় কিনা সন্দেহ। এই বহু প্রশংসিত কৃতিত্ব সম্বন্ধে রাজ্যকর্ত্তারা নিজেই এক একবার বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁহারা যে অজ্ঞাতসারে এমন একটা উচ্চ ধরণের রাজ্যতন্ত্র ফাঁদিয়া বসিয়াছেন —ইহাতে বিনয়-নম্র প্রভুরা আপনাতে আপনি বিস্মিত। কিন্তু সে

যাহাই হোক্, আসলে তাঁহারা কাজের লোক;—সকলের আগে নিজের স্বার্থটি তাঁহারা দেখেন। এইরূপ উচ্চ রাজনীতির দোহাই দিয়া, একটা উচ্চ "বুলি" আওড়াইয়া, কিরূপে তাহা হইতেও নিজের একটু সুবিধা করিতে পারেন তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা। নবাগত পর্য্যটক-দিগের মনে—সমস্ত জগতের মনে, তাঁহারা এইরূপ একটা সংস্কার জন্মাইয়া দিতে চাহেন যে, এরূপ ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় নাই। আমি বলি, একথা মিথ্যা নহে;—এ শুধু নেত্রবিড়ম্বনা নহে: উপনিবেশরাজ্যস্থাপনের অর্থ যদি ধন শোষণ হয় (আমার বোধ হয়, অনেক ইংরাজও ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন) তাহা হইলে বলিতে হইবে—এই ভারতীয় উপনিবেশ-রাজ্য,—একটা অদ্ভুত ব্যাপার;—কৃতিত্বের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। কিন্তু যদি উপনিবেশ-রাজ্যস্থাপনের আর কোন অর্থ হয় (যেমন মনে কর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উদার-নৈতিকেরা যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা ইংরাজ জাতির অব্যক্ত যুঝাযুঝির ফলে রহিত হইয়া যায়) যদি সভ্যতা বিস্তার করা—দেশীয়দের হিতের জন্যই দেশ-শাসন করা উহার অর্থ হয়—উহার উদ্দেশ্য হয়,—তাহা হইলে আমি একটা ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতে চাহি—উহা সম্পূর্ণ "ফেলিয়োর";—অর্থাৎ উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তা ছাড়া, এই কেজো ইংরাজ-জাতিকে এই বলিয়াও ভৎসনা করা যাইতে পারে যে উহাদের ভবিষৎ-দৃষ্টি নাই। কাল কি খাইব সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, উহারা আনাড়ির মত—"উড়ন-চণ্ডির" মত, অপব্যায়ের পথে চলিয়াছে;—মূলধন ও সুদ উভয়ই একসঙ্গে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। উহাদের বিশ্বাস—পৃথিবী বিপুলা; ভারত-শোষণ শেষ হইয়া গেলে, আরো অনেক অকর্ষিত-পূর্ব্ব নব-নব রাজ্য আছে যেখানে গিয়া আবার উহারা এই শোষণকার্য্য আরম্ভ

করিতে পারিবে।—ইহা একপ্রকার অস্থিরবাস উড়ন্ত পঙ্গপালের দেশ-উজাড়-কারী উড্ডয়ন-উৎপাৎ!

ভারত-পর্য্যটকদের মধ্যেও নেকে, এই শোষণকার্য্যের অনুষ্ঠান- আড়ম্বরে, সাজসজ্জার চাকচিক্যে, বাহ্ জাঁকজমকে, এবং এ "প্যিউরিটান" জলদস্যুদিগের ভদ্রব্যবহারে ভুলিয়া যান। বাহিরের ঠাট্ বেশ জম্‌কালো ;—বেশ সুশৃঙ্খল ; শাসনযন্ত্রটি বেশ সুব্যবস্থিত—অ কিনা, সুব্যবস্থিত একটু বেশি মাত্রায়। যে সময়ে ইংরাজ, ভারতে জয়সাধনে নিযুক্ত ছিল,—সে সময় আর এখন নাই। সুতরাং যে কায়দাদুরস্ত, দস্তানা-পরা, "জেণ্টেলমেনগণ," শিষ্টাচারের একটা আবরণ রাখিয়া, দেশীয় ধন-প্রস্রবণের মুখগুলি গোপনে গোপনে অ দিকে ফিরাইয়া দিয়া, সেই ধন ছলক্রমে আত্মসাৎ করিতেছেন—এক্ষ সেই জেণ্টেলমেনদিগকে পূর্ব্বতন ভারতলুণ্ঠনকারী রাজ্যকর্ত্তাদিগে উত্তরাধিকারী বলিয়া চেনা দুষ্কর!...ইংরাজ শাসনাধীনে, আর্থি হিসাবে ভারতের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। কতকগুলি বৃহৎ ব্যাপার তাহার মূলীভূত কারণ ;—যথা, সুয়েজের খাল-পথ উদ্‌ঘাটন, সমু পথে বাষ্পীয় জাহাজের গতিবিধি, ও রেল-পথের সৃষ্টি ; তা ছাড়া জলসেকের জন্য ভারতে খালাদি খনন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি হইল এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ; অর্দ্ধ শতাব্দিপূর্ব্বে ইঙ্গ-ভারতী সাম্রাজ্যের গঠনকার্য্য শেষ হইয়া যায়, কেবল তখনও ব্রহ্মদেশ উহাতে সংযোজিত হয় নাই।

বিজয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, এই বিশাল রাজ্য হইতে আর্থি লভ্য নিষ্কর্ষণের (exploitation) চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংরাজ-মূলধ চারিদিক্ হইতে আসিয়া পড়িল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠি এবং এই উদ্দেশেই রেল-পথের সূত্রপাৎ হইল। ২০ বৎসর পূ

M de Lanessan, ভবিষ্যদ্‌বাণীচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, এইবার চিরকালের মত দুর্ভিক্ষ-যুগের অবসান হইল। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন—আমি ভবিষ্যদ্ বক্তা হইতে চাহি না! Darmesteter বলেন :—কোথাও যাইতে হইলে মোগল-সম্রাটের যে স্থলে তিন মাস লাগিত, সেই স্থলে এখন তিন দিন লাগে। এ কথা খুবই ঠিক্। Darmesteter লিখিয়াছেন,—তিনি ভারতে তিন্‌টি আশ্চর্য্য জিনিস দেখিয়াছেন,—রেল্-পথ, একটি চিত্তবিমোহন যুবা পুরুষ, ইত্যাদি ; এবং উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি বিস্ময়-মুগ্ধ। আমি বলি, আর একটা কথা তিনি বলিতে ভুলিয়াছেন, সেটি এই :—"বম্বের লাট রের সঙ্গে আমি খানা খাইয়াছি, ডেপুটি কমিশনারদিগের সহিত খানা খাইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি।"

সর্ব্বপ্রথমে, কতকগুলি রেল-পথ স্থাপনের ভার, (বাণিজ্যিক ও সামরিক সুবিধার জন্য) কোন-কোন অসরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হয় ; উহা সরকারের আয়ত্তাধীন থাকিবে এবং সরকারই উহার প্রতিভূ থাকিবেন,—এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। সরকার প্রতিভূ না হইলে, মূলধন আইসে না। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা গেল, এইরূপ প্রতিভূ-পদ্ধতিতে সরকারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। সরকার, সুদের জন্য দায়ী—এই মনে করিয়া, কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে ও কোন প্রকার অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড-লরেন্‌স্ সরকারী ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে কতকগুলি রেল-পথ স্থাপন করিয়া লাভের উদ্দেশে উহা খাটাইতে লাগিলেন। এই অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য রেল-জাল, দশ হাজার মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহার দরুণ সরকারী বজেটের উপর অত্যন্ত বেশি চাপ পড়িল। অনেক সপ্তাহ ধরিয়া আমি এই সকল রেল-পথে ভ্রমণ করিয়াছি ; ভ্রমণ করিবার সময় একথাটিও মনে হইয়াছে যে,

আমার এই আসনটুকুর জন্য, হিন্দু রায়তের গাঁট্ হইতে অন্ততঃ কতক "পাই" খরচ হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা কি চাহে এইসব রেল-গাড়ি রহিত হইয়া যায়?—তাহা মনেও করিও না। শ্রেণীবদ্ধ-হস্তী-বাহনের স্থান রেল-গাড়ী অধিকার করিয়াছে—ইহার জন্য দুঃখ করা নিষ্ফল।

দেশের শিক্ষিত লোকেরা মনে করে, আর্থিক লভ্য হউক বা না হউক, এইরূপ দ্রুত-গতিবিধির সুবিধা হইতে, একটা খুব নৈতিক উপকার হইয়াছে। এরূপ সুবিধা না থাকিলে, কোন প্রকার রাজ-নৈতিক কিংবা সামাজিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতেছে না। তবে, রেল থাকাতে এই টুকু উপকার হইয়াছে, কোন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে খাদ্য-সামগ্রী সহজে ও সত্বর প্রেরিত হইতে পারে। অন্যান্য দেশের ন্যায়, এই বিস্তীর্ণ ভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাও এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। যাত্রামুখে এই রেল-গাড়ি, কতশত কৃত্রিম ও স্বাভাবিক বাধার বেড়া ভাঙ্গিয়া—কত কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে! উহা যেমন একদিকে, দূর-প্রদেশগুলিকে —বিভিন্ন জাতিদিগকে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে, তেমনি আবার, গাড়ির একই কাম্‌রার মধ্যে, বিভিন্ন বর্ণের লোকদিগকেও পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। জয় হোক্ তবে রেল-গাড়ির!—সেই একতার পথোদ্ঘাটক রেল-গাড়ি—যাহা মাদ্রাজের লোককে লাহোরের লোককে, সভাসমিতিতে—কংগ্রেসে আনিয়া একত্র সমবেত করিতেছে এবং ভারতের ভবিষ্য মহাজাতির সংগঠনে কতকটা সহায়তা করিতেছে!

কেন তবে এখনও, দেশীয়দিগের মুখপাত্রগণ এই রেল-পথ-স্থাপনের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোর কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন?

দেশীয়দিগের কথাগুলি খুব ঠিক্ না হইলে, একজন ইংরাজ রাজপুরুষ* কখনই তাহাদিগের সহিত সায় দিয়া এই সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন না। প্রথমে দেখ, রেল-হইতে যে লাভ হয় তাহার প্রায় অধিকাংশই ইংরাজ-ধনপতিদিগের হস্তে যায়। রেল-সংক্রান্ত কল-উপকরণগুলি ইংরাজের খনি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের কামার-কারখানা হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আইসে। এঞ্জিন্, গাড়ি, রেল, লোহার কড়ি—সমস্তই ইংলণ্ড হইতে আইসে এবং ইংরাজ কল্-মিস্ত্রীর দ্বারাই যথাস্থানে স্থাপিত হয়। রেলের এই সব কাজকর্ম্ম ইংরাজ-জাত-ভাইদিগের জন্যই সংরক্ষিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সাইগনে এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিলাম;—সেখানে, কোন সংকল্পিত রেল-লাইনের নক্সা, যে মুহূর্ত্তে কাগজে উঠে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই, সেই লাইনের মনোনীত ষ্টেশান-মাষ্টারগণ তাহাদের উর্দ্দি পোষাক পাইয়া থাকে এবং স্বকীয়-পদের নির্দ্দিষ্ট বেতনও সম্ভোগ করে। গল্প হইলেও ইহার মূলে কতকটা সত্য আছে...সাইগন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া যাক; সেখানে রেল-পথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতেই যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদের কথা ধরা যাউক...কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মচারীগণ মোটা মোটা বেতন ভোগ করে; সরকারি বজেটে যে টাকার অপ্রতুল হয় তাহা বজেট-হিসাবে গোঁজামিল দিয়া কোন প্রকারে সারিয়া লওয়া হয়। এ প্রক্রিয়াটি অতি চমৎকার। জাতভাইদিগকে কাজকর্ম্ম দিবার এই যে পদ্ধতি, ইহার আর তুলনা নাই। যাঁহারা এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তক ও প্রতিভূ তাঁহাদিগকে ইহার জন্য বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে হয়। টাকার কোন ঝুঁকি নাই, প্রভূত লাভের বিলক্ষণ প্রলোভন আছে,—এইরূপ স্থলে, লণ্ডন-বাজারে এই সকল রেলওএ-শেয়ারের মূল্য যে চড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

* New India—Cotton.

কিন্তু এই ছবিটিতে একটি ছায়ার দিক্ আছে, এই ছায়াটি ক্রমশ বাড়িতেছে—এমন কি, বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।... রেলের মূল-উপকরণগুলি একেবারে লণ্ডন হইতে প্রস্তুত করিয়া আনা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই;—ইহা প্রায় অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান অবস্থায়, (একথা সমস্ত উপনিবেশ-রাজ্য সম্বন্ধেই খাটে)—দেশের লোক লভ্যের অংশ হইতে একেবারেই বঞ্চিত। তবে, একথা স্বীকার করিতে হইবে,—ভারতের স্বাভাবিক ভীরুতা, সাহসহীনতা ও কুসংস্কার প্রযুক্তই, ইংরাজেরা যদৃচ্ছাক্রমে অর্থশোষণ করিয়া নিজের উদরপূর্ত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহাই হউক, এক্ষণে ভারতের সমস্ত উদ্যম-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের;—ইংরাজের ধনে পরিপোষিত, ইংরাজের হস্তে পরিচালিত। ইংলণ্ড যাহা যোগাইতে পারে না, কেবল তাহাই ইংলণ্ড ভারতের নিকট চাহিয়া থাকে;—অর্থাৎ কুলি ও মজুর-মিস্ত্রি। আমার মনে হয়,—আসলে রাজনীতিসম্মত কাজ হইত (ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকা যদি রাজনীতির কাজ হয়) যদি ইংলণ্ড এই সকল লাভজনক অনুষ্ঠানে ভারতকে স্বকায় অংশভাগী করিয়া লইতেন। এস্থলে মানবহিতৈষিতার কথা আসিতেছে না,—এইরূপ করিলে অন্ততঃ ইঙ্গ-ভারতায় সাম্রাজ্য আরো দৃঢ়পত্তন ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে আমি শুধু এই কথা বলিতেছি। বিদেশী ভারত-পর্য্যটকগণ ভারতে যে অর্থ ব্যয় করে, অথবা ভারতীয় পণ্য হইতে যে লাভ হয়, আসলে তাহা দেশীয়দিগের হস্তে যায় না,—উহা ইংরাজ-ধনপতিদিগের হস্তে—এঞ্জিনিয়ারদের হস্তে—য়ূরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের হস্তে আসিয়া পৌঁছে। কেরাণীরা যে অল্প বেতন পায়, দৈনিক হিসাবে প্রত্যেক কুলিকে যে দুই আনা দিতে হয়, শুধু তাহাই এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদি ভাবিয়া দেখা যায়—পণ্যাদিবহনেরযে সকল প্রাচীন পন্থা ছিল, সেগুলি নব-প্রবর্ত্তিত পন্থার

প্রচলনে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই রেল-স্থাপন কার্য্যটি এমন একটি অর্থ-শোষণের ব্যাপার—যাহা হইতে পূর্ব্বেকার ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হয় না। একথা আমি জানি—ভারতই এক মাত্র দেশ নহে যেখানে রেল-পথাদি বিদেশীয় মূলধনে—বিদেশীয় উপকরণে নির্ম্মিত। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের কথা—অমুক অমুক য়ুরোপীয় জাতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ (হিন্দ-চীনেও শীঘ্রই এইরূপ হইবে) যেখানে এই কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মচারীই বিদেশী। ইহার সমস্ত লভ্য—বেতনের আকারে, বিদেশীয়দিগের "পকেটেই" যায়। ভারতের বিভিন্ন জাতি, প্রায় উহার কিছুই পায় না। স্বকীয় লভ্যাংশ হইতে যুক্ত-রাজ্যের লোকেরা সরকারী রেল ক্রয় করিয়া লইয়াছে। ভারত-বাসীগণ সরকারী রেল কবে ক্রয় করিবে?

এখনও আমার সব কথা শেষ হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি. সরকারী তহবিল হইতেই—প্রজাবর্গের অর্থ হইতেই—গোড়ায় রেল-স্থাপনের (সমস্ত না হউক অংশতঃ) ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার, রেল-কার্য্যের লভ্যাংশ ও প্রতিভূ-স্বীকৃত সুদ—এই উভয়ের মধ্যে হিসাব করিয়া যে ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে, সেই ক্ষতির অঙ্কও সেই প্রাথমিক ব্যয়ের হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে। আর এক কথা,—শুধু দেশীয় মালের ভাড়ার দ্বারা ও দেশীয় আরোহীদিগের টিকিট-মূল্যের দ্বারাই রেলের লভ্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে, দুই দিক দিয়া, দেশীয়দিগের অর্থব্যয় করিতে হয়। তাহার পরিবর্ত্তে উহারা পায় কি?...ভারত কেবল খরচই করে—পায় না কিছু;—ইহাইত ভারতের আরও দুর্ভাগ্য...প্রতিভূর দায়িত্বাধীন উচ্চহারের সুদ অবাধে পাইবে ভাবিয়া কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত;—সুতরাং তাহাদের খরচ-কমাইবার ব্যক্তিগত চেষ্টা ও যত্ন কিছু মাত্র থাকে না।

কটন্ বলেন ;—"ভারত যেরূপ দরিদ্র তাহাতে এরূপ ব্যয়সাধ্য রেল-প্রণালীর ও খাল-প্রণালীর ব্যয় নির্ব্বাহ করা ভারতের পক্ষে সুকঠিন। তাই ভারত, ইংলণ্ডের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। এই ঋণ ক্রমশই জমিয়া যাইতেছে ; এবং ঘটনাচক্রে ও দুর্ভাগ্যক্রমে সুদের হারও বাড়িয়া যাইতেছে"। আরও তিনি বলেন ;—রেল-স্থাপন-কার্য্য—ব্যবসার হিসাবে সফল হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত ইহার দরুণ, ভারতের উপর ৪৭,০০০০০০ পৌণ্ড ঋণ চাপিয়া গিয়াছে। হরেশ বেল (Horace Bell) তাঁহার (Railway Policy in India) গ্রন্থে বলেন, টাকার ঘাট্‌তিই এই নিষ্ফলতার হেতু। তিনি বলেন ;—"টাকার ঘাট্‌তির দরুণই প্রতিভূ-রক্ষিত ও অর্থসাহায্যগ্রাহী কোম্পানিদিগের সংগৃহীত মূল-ধনের সুদস্বরূপ—ভারত হইতে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়।" তিনি প্রতিভূ-রক্ষিত ও অর্থসাহায্যগ্রাহী কোম্পানীদিগের অসংযত অপব্যয়ের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। উহা হইতেই ভারত-বজেটের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু কে বলিতে পারে, ভারতের এই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে, কত দিক্ দিয়া, আরো কত অপ্রত্যাশিত খরচ হইয়া যায়। ভারতের এই ঐন্দ্রজালিক থলেটি, আপন ইচ্ছামত কখন পূর্ণ হয়, কখন শূন্য হয়—তাহাতে কাহার কোন প্রতিবাদ নাই, কোন বাদবিসম্বাদ নাই। কারণ, থলিয়া-মুখের রসিটি যাহাদের হাতে আছে, খরচের ভার, তাহাদের হাতে নাই।

হরেশ-বেল্-প্রণীত গ্রন্থের উপসংহার হইতে অনেক কথার আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ইংরাজ কারখানাওয়ালা ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতের যেন একটি "সংরক্ষিত মৃগয়া-ভূমি"। উহারা নূতন নূতন রেল-পথ ক্রমাগত নির্ম্মাণ করিতে চাহে ; কেননা উহাদের মালাদি বহনের পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধাজনক ; কিন্তু তাহাতে এদেশের আসলে কোন লভ্য নাই। এইরূপে, যে রেল-পথের দ্বারা

দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবার কথা, আসলে তাহার দ্বারাই উন্নতির বাধা হইতেছে। রেল-জালে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ইংরাজ কারখানাওয়ালা গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। এই দ্রুতগতি ও দূরস্পর্শী পন্থাগুলির প্রভাবে ভারতের দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত—সমস্তই ইংরাজি পণ্যদ্রব্যে প্লাবিত এবং সেই সকল দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হায়! এই লজ্জা-আবরণহীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব কেজো যুগে, দুর্ব্বলজাতি হওয়া বড়ই বিপদজনক! এই সকল লভ্যজনক অনুষ্ঠান হইতে, ভারতের হিত হওয়া দূরে থাকুক—প্রত্যুত অনিষ্টই হইতেছে ;—ভারত নির্দ্দয়রূপে লুণ্ঠিত ও শোষিত হইতেছে। যদি কল্পনা কর,—এই প্রত্যেক রেল-লাইনরূপ শোষণ-চোংএর মুখ, প্রত্যেক স্বর্ণ-খনির মধ্যে—প্রত্যেক আয়ের ঘরে বসান হইয়াছে, তাহা হইলে কতকটা অনুমান করিতে পারিবে, এই অতিপ্রশংসিত * লোহজাল হইতে, ভারতের কিরূপ লাভ হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* আমাদের কবি তাই বলিয়াছেন :—
"পর-হাতে দিয়ে, ধন-রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।"—অনুবাদক।

রমণীর স্বদেশব্রত।

গত ৩০শে আশ্বিন তারিখে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মূল মন্ত্র 'স্বদেশ সেবা' আর তাহার অভূতপূর্ব্বত্ব—'কার্য্যতৎপরতা.' সকলেই কিছু করিতে ব্যস্ত। দাসদাসী পরিবেষ্টিত ধনী, সুখশয্যা ছাড়িয়া দেশের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন—মাতার কোল ছাড়িয়া শিশু তাহাতে যোগ দিতেছে। দরিদ্র আসিয়া তাহার যথাসামর্থ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করিয়া প্রসন্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে। সকলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা, গান, উপদেশ দ্বারা সাধারণকে এই স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ, আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে। এক কথায়, কোন-না-কোন-রূপে সকলে মাতৃসেবা করিতেছেন। দীর্ঘ-অন্ধতায় আমরা মায়ের যে দুর্দ্দশা করিয়াছি আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালায়িত। আজ শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা লইয়া লোকে বসিয়া নাই, সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই যে সব কাজের উল্লেখ করা গেল তাহা অবশ্য পুরুষেরাই করিতেছেন—আর রমণীগণ কি করিতেছেন? বিলাতী বস্ত্র পরিহার করিয়া পুরুষের সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিক কি আর কিছু করিবার নাই? তাঁহাদের রাজ্য অন্তঃপুরে, গৃহধর্ম্মে কি তাঁহাদের কিছু করিবার নাই? আছে, এবং জানি যে অনেকে তাহা করিতেছেন। অন্তঃপুরের সংবাদ বাহিরে আসেনা আর না আসাই ভাল। রমণী নীরবেই আপনার কার্য্য করিবেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অরক্ষণীয়া কন্যার অকালেও বিবাহের বিধি আছে। ছেলেদের পাঠে …নিবেশ করা উচিত—

এইরূপে,

…বিষয়ে কাহারো মতদ্বৈধ না থাকিলেও দেশের এই বিশেষ মুহূর্ত্তে …য সে নিয়ম অকাট্য নয় তাহাতেও সকলে একমত। সেই নিয়মে, …মণীর অন্তঃপুরে কি ঘটিতেছে তাহাও আজ প্রকাশ্যে আলোচনা করা …াইতে পারে। কারণ, তাহা জানিলে অন্য রমণীগণও তাহা গ্রহণ …রিতে পারেন।

বিলাতী বস্ত্র যথাসাধ্য বর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটী …মণী ৩০শে আশ্বিন হইতে আরও ২।১টী বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। …ন্মধ্যে একটী শিল্পের সহিত জড়িত। যাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন …াহারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার …াগে, অন্ততঃ একখানি সাড়ীর পরিমাণ সুতা কাটিয়া, তাহার দ্বারা …ড়ী তৈয়ারি করাইয়া সেই সাড়ী পরিয়া দেবতা প্রণামে যাইবেন এই …তিজ্ঞা করিয়াছেন।—এই সাড়ী যে তাঁহাদের অঙ্গকে গৌরবান্বিত …রিবে, এই মোটা কাপড়ের মূল্য যে অনেক চেলি, বারাণসী অপেক্ষা …ধিক তাহা কি বলিতে হইবে? ভগিনীগণ! তোমরা সকলে কি এই …পরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপুত্রের চক্ষু সার্থক করিবে না?

আর কয়েক জন রমণী একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম …ায়ের কৌটা" রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছু নাই, …বল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ। তাঁহার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে …ননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটী মৃৎ-পাত্র বা যে কোন পাত্র স্থাপন …রিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃ পক্ষে একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। …টী এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে …। ঘরে ঘরে সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করুন …াই আমাদের প্রার্থনা। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা …বে তাহা নহে—ইহাতে রমণীর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য—সন্তান …ক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাঁহার শিশুসন্তানকে শিক্ষা দেন

যে, প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্ম- ভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে একমুঠা চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে শুধু তাহা হয় না তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বদেশভক্ত পরিবারে জন্মিয়া শিশু যদি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ- প্রীতি পান করে, আপনার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জননী জন্মভূমিকে চেনে, আপনার ভাইবোনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাইবোনকে ভালবাসিতে শেখে তবে সে কখন স্বদেশকে বিস্মৃত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হাজার শিক্ষার জাঁতায় পিষিয়া—শিশুদের ব্ল্যাকি, লংম্যান ও ম্যাক্‌মিলিয়ানের হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স্কগণকে Lee Warner পড়াইয়াও তাহাদের হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম দূর করিতে পারিবেন না। আজ যে বহু পুণ্যের ফলে এই স্বদেশপ্রীতির বন্যা আমাদের উপস্থিত শুষ্ক হৃদয়কে ভাসাইয়া সবল করিয়া যাইতেছে, এ দৈব ঘটনা। এ সব সময় ঘটে না। কিন্তু তটিনী তাহার কোলের জমিটী চিরকালই শ্যামল রাখে। বাল্যশিক্ষার ফলও জীবনকে চিরকাল পরিচালিত করে। মাতা যদি শিশুর মনে এ বাজের অঙ্কুর স্থাপন করেন আর গৃহে যদি তাহা পোষিত হয় তবে সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও তাহার মন বিচলিত হইবে না, বরঞ্চ বাধার আঘাতে তাহাকে নূতন শক্তিশালী করিবে। সেই জন্যই বলিতেছি, এ শিক্ষা আমাদের ঘরে হওয়া উচিত, আর এই "মায়ের কৌটা" ব্রত গ্রহণে তাহার সহায়তা হইবে। জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্বেই শিশু এই পারিবারিক অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল তাঁহারা প্রত্যেক বালক-বালিকার দ্বারা একমুঠা চাউল

দেওয়াইতে পারেন। যাঁহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে তাঁহারা স্বজনগণের মধ্যে পালা করিয়া তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা দ্বারা পুরস্কার ও শাসনের বিধিও করা যাইতে পারে। ছেলেমেয়ে কোন ভাল কাজ করিলে মা-বাপ যদি তাহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন আর সেই পুরস্কার বা তাহার অংশ হইতে কিছু এই পাত্রে অর্পণ করিতে শিক্ষা দেন তবে দেশের সেবা করিয়া আমরা নিজেই যে কৃতার্থ হই তাহা সহজে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ছেলে কোন মন্দ কাজ করিলে, তাহার একটী শাস্তি হইবে, সেদিন সে মায়ের কৌটায় কিছু দিতে পারিবে না। পশ্চিমের কোনো একটী মফঃস্বল-সহরে আমাদের এই প্রস্তাবমত অনুষ্ঠানের কিরূপ সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত একটী পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"এখানে অনেক বাঙ্গালী মেয়ে আছেন। আমাদের মনে হইল ইহাদের সঙ্গে দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হইলে শুভ ফল হইতে পারে। অনেকেই স্বদেশব্রতগ্রহণ করিতে পারেন।—ব-দিদির সহিত এখানকার অনেকেরই আলাপ পরিচয় আছে। আমাদের অনুরোধে তিনি নিজে পাড়ায় পাড়ায় গিয়া অনেককে তাঁহার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সে দিন বিকাল বেলায় আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলাম। তাঁহার বাটী গিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরের আয়তন যত তাহার চেয়ে নিমন্ত্রণ অনেক বেশি হইয়া পড়িয়াছে তবু এই অসুবিধা সত্ত্বেও ব-দিদির উৎসাহে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা আসিতে না আসিতে গান গাইতে অনুরুদ্ধ হইলাম; পুরুষের মজলিসে চাপান আছে, গম্ভীর আলোচনা আছে, চুটকী গল্প আছে, গান তাহার আনু- ষঙ্গিক একটী আমোদ মাত্র। কিন্তু এরূপ মেয়ে-মজলিসে গান আমোদনামের বাচ্য নহে। ইহা প্রীতিমিলনের সর্ব্ব প্রধান উপায়

ও অঙ্গ। শুনিলাম প্রধানতঃ এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে, এখানে এত মেয়ের সমাগম। প্রথম গান হইল "বন্দে মাতরং" এবং, এই গান হইতেই স্বদেশী বিষয়ে কথা পাড়িবার সূত্রপাত হইল। দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা যে দিকে অগ্রসর হইয়াছেন আমাদেরও সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত,—সংক্ষেপে আমরা এই বিষয়টী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম। ইহাতে তাঁহারা সকলেঃ প্রায় এক বাক্যে বলিলেন, 'এতে কি আমাদের কারও অমত হতে পারে, আমাদের পুরুষরা যা করছেন আমাদেরও তাই করা চাই।'

সত্যই সকলে কার্য্যত তাহা করেন। বিলাতি লবন, বিলাতি চিনি খান না, বিলাতি শাড়ী পরেন না কিন্তু অনেকে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝেন না, বাবুরা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিয়া চলেন মাত্র। সেখানেই তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখিলাম। "একজন আর একজনের একটি জামার লেস দেখিয়া দরদাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, জানিয়া কি ফল? আপনিত আর এ কিনতে পারছেন না, এ বিলাতী,—বাবু (তাঁর স্বামী) যে স্বদেশী হয়েছেন, তিনি কি আপনাকে আনতে দেবেন?"

উত্তর হইল, বাবুকে জানাইবনা, আমার ছেলেকে বলিব চুপি চুপি আনাইবে।"

আমরা তখন বিদেশী দ্রব্য না কিনিবার শুভ ফল কি, তাহাতে দেশের কিরূপ মঙ্গল হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম।—বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্তা রমণী লেস ক্রয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। খুব উৎসাহের স্রোত বহিলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মায়ের কাজ করা সকলেরি কর্ত্তব্য। তখন এই গানটী গাওয়া হইল।

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে কি পুলকে প্রাণ ছায়।
ফুটিল যে আজি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কায়॥ ইত্যাদি—

ইহার পর শ্রীমতী ল— একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

আমাদের ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তাহাই লেখা লইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর, রবি বাবুর একটী জাতীয় সঙ্গীত হইল। তাহার পর, মহিলারা স্বদেশব্রত গ্রহণ করিলেন। আমরা আগে হইতেই কতকগুলি টুকরা কাগজে "মায়ের কৌটা" লিখিয়া সেই কাগজগুলি স্থানীয় নির্ম্মিত একটী সুন্দর ছোট টুকরীতে করিয়া আনিয়াছিলাম। টুকরীটী তাঁহাদের নিকট ধরিয়া বলিলাম, 'সাধারণতঃ লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুল, আতর দিয়া আদর করে, আজ আমরা আপনাদের সম্মানার্থে এই প্রতিজ্ঞাপত্র উপহার ধরিতেছি। যিনি আজ হইতে স্বদেশব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি একখানি কাগজ তুলিয়া লউন। এই কাগজখানি তিনি বাড়ী গিয়া একটি পাত্রে তুলিয়া রাখিবেন সে পাত্রটিকে মায়ের কৌটা নাম দিবেন প্রতিদিন ভাঁড়ার দিবার সময় সেই পাত্রে একটী-দুইটী পয়সা বা দু এক মুষ্টি চাল রাখিয়া দিবেন এবং এইরূপে সঞ্চিত দান ১লা বৈশাখে বা বিজয়াদশমীর দিন বা মাসে মাসে জননী জন্মভূমির পূজায় জন্য দান করিবেন, আর প্রতি ব্রতধারিণীর আরও একটী মহিলাকে এই ব্রতধারণ করাইতে হইবে।'

কাগজ সকলেই উঠাইয়া লইলেন, কেহ কেহ আমার কথা শুনিতে পান নাই, তাঁহাদিগকে আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অ—বাবুর মা তখনি সে টুকরীতে একটী টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভাণ্ডার ত অনেক পরে সংগ্রহ হইবে, আজ এই যে শুভ মুহূর্ত্তের, শুভ সম্মিলন, এই আনন্দের দিনে কি কিছু দানসংগ্রহ করিলে ভাল হয় না? পারিবারিক মায়ের কৌটা আমরা গৃহে গিয়া স্থাপন করিব। এই টুকরীটী, যাহা হইতে আমরা স্বদেশব্রত গ্রহণ করিলাম, এই সহরের মায়ের কৌটা হউক। যাঁহাদের কাছে টাকা ছিল তৎক্ষণাৎ তাঁহারা টুকরীতে এক একটী টাকা ফেলিয়া দিলেন।

ব-দিদির বিশেষ বন্ধুরা তাঁহার নিকট হইতে ধার করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিশ টাকা টুকরীতে জমা হইল। ব্রত গ্রহণের পর আরও দুই একটী গান হইল। অবশেষে ক—বাবুর দুই কন্যা, যোগীন বাবুর ভারতবর্ষের মানচিত্র অভিনয় করিয়া মুখস্থ পাঠ করিলেন। বড় ভগিনী হইলেন গুরু, ছোট শিষ্য। গুরু, শিষ্যকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া তাহার কীর্ত্তিস্থলগুলির নির্দ্দেশ করিয়া ভারতের গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন—সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইল, আমরা আশাতীত আনন্দ লইয়া গৃহাগমন করিলাম। শুনিলাম কেবল আমরা নহি, সকল মহিলাই আমাদের মত আনন্দলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট সভার গল্প শুনিয়া যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহারা খুব আপশোষ করিতেছেন। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ হইল না। সেদিন যে রমণীগণ সঙ্গে টাকা না থাকায় টাকা দিতে পারেন নাই তাঁহারা টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপ ৬।৭ দিনে আর কিছু অর্থ অযাচিত ভাবে সংগৃহীত হইল। তাহার দ্বারা দুটী তাঁত কেনা হইয়াছে। এখান হইতে দুইজন ভদ্র যুবক কলিকাতায় তাঁত শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, এখানে একটী তাঁতশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় তাঁতি, জোলাদের এই তাঁতে শিক্ষা দিবেন। আর শিল্পসমিতির সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ লোক দ্বারা গৃহে গৃহে মাসান্তে লোক পাঠাইয়া মায়ের কৌটার সঞ্চয় আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই মাসিক সংগ্রহে শিল্পবিদ্যালয়ের কতকটা খরচ চলিবে।"

আমাদের ইচ্ছা বঙ্গের ঘরে ঘরে এই ব্রত গ্রহীত হউক। শুনা যায় অতীতকালে ভারত মহিলাগণ, নিজ অলঙ্কার মোচন করিয়া দেশের কার্য্যে সমর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গরমণীর নাম ব্রতপালনের জন্য বিখ্যাত। আজ যদি তাঁহারা এই কষ্টশূন্য ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হ'ন, জননী

জন্মভূমির পূজার জন্য এই যৎসামান্য দানে কুণ্ঠিত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের লজ্জার সীমাপরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে জননীর অভিশাপে আমাদের দেশ চির অভিশপ্ত হইয়া থাকিবে।

রমণীগণ ঘরে ঘরে যদি এই মায়ের কৌটা স্থাপন করেন, তবে দ্রৌপদীর হাঁড়ি যেমন কখনও শূন্য হইত না, একটী শাকান্ন হইতে সহস্র লোককে খাওয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের গৃহলক্ষ্মীর একমুঠা চাউলে দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে। যুবকগণ! তোমাদের সাহায্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া মাতৃগণকে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া মায়ের কৌটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আইস।

এই সঞ্চয়, স্থানীয় শিল্পোন্নতির সাহায্যার্থ কিংবা তাহার সুবিধা না থাকিলে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে অথবা মহিলা শিল্পসমিতিতে পাঠান যাইতে পারে। জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য সকলে অবগত আছেন, মহিলা শিল্পসমিতির উদ্দেশ্য বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

মহানাটক।

সপ্তম অঙ্ক।

রাম।—(সুগ্রীবের প্রতি)

লঙ্কাগমনের যোগ্য, সুবিদ্বান্, রাজবংশধর,
হেন বীর মহাবল আছে কেবা কহ কপীশ্বর।

সুগ্রীব। রাজকুল-সমুৎপন্ন নাহি কোন ভূপতি বা শূর ;
রাজপুত্রগুণযুক্ত মোর ভ্রাতুষ্পুত্র সুচতুর ॥

সাগর লঙ্ঘন করি, সেনা করি' সন্নিবেশ,
বসি' রাম সুবেলাদ্রি-পাশে,
ইন্দ্র-পৌত্র অঙ্গদেরে দৌত্যকার্য্য আদেশিয়া
পাঠাইলা রাবণ-সকাশে ॥
অঙ্গদ সে প্রথমেই প্রবেশিয়া পুরী
জলদ-গম্ভীর-ঘোষে পদাঘাত করি'
ভাঙ্গিল সে অভ্রভেদী রাবণ-প্রাসাদ ;
শুনি' অকস্মাৎ এই ভীষণ নিনাদ,
দশগ্রীব উদ্গ্রীব ভয়ে সচকিত,
বাহিরিয়া দ্বারে আসি' কহিল কিঞ্চিৎ।
দূত সে অঙ্গদ, তারে করি' সম্বোধন
জিজ্ঞাসয়ে তার কাছে সব বিবরণ ॥

অঙ্গদ। বল্‌রে রাক্ষস তোরা সবে,
যে রক্ষের নাম দশানন,
রাঘবের সীতা রত্ন হরি'
কোথা সে করিল পলায়ন ?
ত্রৈলোক্য-দহন-কারী শরাগ্র-শিখার-মত
করাল যে রাম
—সেই উগ্র দাবানলে রাবণ হইবে দগ্ধ
পতঙ্গ-সমান ॥

রাক্ষসগণ। যেও না, দাঁড়াও হেথা,—যাও তুমি পুরীর বাহিরে,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর যাবৎ না আসি আমি ফিরে
লয়ে রাবণের আজ্ঞা ; পাবে যেতে হইলে আদেশ।

অঙ্গদ। কোথায় যাইতে পাব ?

রাক্ষসগণ। যেথায় আছেন লঙ্কেশ ;
—যার ভুজ-পরাক্রমে ত্রিভুবন ভয়ে সচকিত ;
কে রক্ষিবে,—মৃগ-সম সিংহ-অঙ্কে হলে নিপতিত।

(রক্ষকুল-ধূমকেতু অঙ্গদ সগর্ব্বে রাবণের-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর)

রাবণ। কে তুমি ?

অঙ্গদ। বালীর-পুত্র—রঘুপতি শ্রীরামের দূত।

রাবণ। কেবা বালী কহ কপি—কেবা সেই রাম রঘুসুত ?

অঙ্গদ। বালীকে চেননা তুমি ? এ বিস্মৃতি তব সমুচিত ;
—পুচ্ছ-প্রান্তে হয়ে বদ্ধ ছিলে তুমি তখন মূর্চ্ছিত।
কেমনে ভুলিলে রামে ?—শূর্প-নখা তোমার ভগিনী,
—তার নাসাচ্ছেদে, তব দর্প চূর্ণ করিলেন যিনি।

রাবণ। কে তুই ?—কাহার পুত্র ?—দূতরূপে কে পাঠালে তোরে ?
দেবের বিজয়ী আমি— তৃণজ্ঞান করিস্ আমারে ?

অঙ্গদ। পৌলস্ত্যনন্দন ! আমি পুত্র তার—যে তব বিজেতা ;
"সুবল"-পর্ব্বত হতে — রামদূত আসিয়াছে হেথা।
এ দুয়ের এক—মূঢ় !— কর্‌রে এখন ;
—হয় সীতা-ত্যাগ, নয় প্রাণ বিসর্জ্জন ॥
এক শরে সপ্ততাল ভেদিল যে জন,
প্রসিদ্ধ সে হরধনু করিল ভঞ্জন,
মোর পিতা বালীরে যে করিলা বিনাশ
ওহে রক্ষপতি ! জেনো তাঁরি আমি দাস ;
যাঁর পাদপদ্ম-চ্যুত পরাগে নির্ম্মাণ
অঙ্গদ-ভূষণ মোর ; —সেই নামে নাম ॥

রাবণ। কোথায় থাকে সে রাম ? যমালয়-সমর-অঙ্গনে
মৃত্যু যাচে সে দুর্ম্মতি নিজ দারা পুনরুদ্ধারণে ?
বহ্নি-প্রভ, ইন্দ্র-দর্প সর্পহন্তা গরুড়ের প্রায়
দারাসক্ত সেই রাম —বনবাসী, সুগ্রীব-সহায়—
আমার সে শরাঘাতে হত হবে কহিনু তোমায়॥

রাবণ। কে রাম ?

অঙ্গদ। —পরশুরামে জিনিল যে বীর।

রাবণ। কেবা সে পরশুরাম ?

অঙ্গদ। ক্ষত্রিয়-রুধির
লিখিল যাঁহার সেই জেতৃখ্যাতি-পত্র ;
কেনা জানে তাঁর কথা— বিদিত সর্ব্বত্র।
সেই সে পরশুরাম— কার্ত্তবীর্য্য-নৃপাদি যে নাশে।

রাবণ। কেবা সেই কার্ত্তবীর্য্য ?

অঙ্গদ। যাহা হতে ক্রূর কারাবাসে
ছিলে বন্ধ বহুদিন ;—তাহা কি স্মরণে নাহি আসে ?

রাবণ। অরণ্য-পতির পুত্র ! কে তুমি, কহিছ এই মত ?
জান নাকি, ইন্দ্র-আদি মম গৃহে দাসত্বে নিরত ?
কি করিবে সেই রাম—কপীন্দ্র শিশুগণ
যাহার সহায় ;
—সিন্ধু লঙ্ঘি' আসে যদি মম দর্পানলে হবে
পতঙ্গের প্রায়।

অঙ্গদ। শুনেছি রাবণ ওরে ! আছে ভবে অনেক রাবণ,
জানি, এক রাবণেরে কার্ত্তবীর্য্য করিল দলন ;
আরো এক রাবণেরে বলি-নৃপতির শত দাসী
গিলিল অন্নের মত নর্ত্তন-কৌতুক পরকাশি' ;
অপর রাবণ এক মোর পিতৃকক্ষ হতে
পড়িল গলিয়া ;
এ সব রাবণ-মাঝে কে তুই আমায় বল্
নিশ্চয় করিয়া।

রাবণ। ওরে রে বানর শিশু ! বড় হৃষ্ট পুষ্ট দেখি
তোরে হেরে আমার সম্মুখে !
কর্ণ তোর কলুষিত রোমাবলী-আবরণে ;
শুনিস্‌নি তাই কারো মুখে
—আমা-সম তুল্য বল নাহি কেহ ...ব-মাঝে ;
শক্রগণে জিনিয়া সংগ্রামে,
স্ববল রক্ষণ করি' পরবল করি নাশ,
খ্যাত আমি রাবণের নামে।

অঙ্গদ। স্ব-কক্ষে লইয়া তোরে —কপিবংশচূড়ামণি
বালি নামে বলী,
সপ্তসিন্ধুতীর ভ্রমি', সন্ধ্যা ধ্যান অর্চ্চনাদি
করিল সকলি।
কক্ষেতে লইয়া তোরে না পারিল লজ্জাবশে
কপি-মাঝে করিতে প্রবেশ ;
তাই ছাড়ি দিয়া, তোরে পাঠাইলা নিজ পুরী ;
—বৃথা গর্ব্ব ত্যজহ লঙ্কেশ !

রাবণ। যার বলে উৎপাটিত উত্তুঙ্গ কৈলাস-গিরি
—এই মোর সেই বাহুদ্বয় ;
এই সেই দশমুখ —দশদিকে যাহা খ্যাত,
—সেই বীর্য্য মহিমা অক্ষয়।
একে-ত তাপস রিপু, কুপিত সে হইয়াছে তায়,
তাহে পুন ক প দূত,—শোচনীয় দশা অতিশয় !

অঙ্গদ। প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড যার দক্ষ-বীর-বিনাশ ক্রিয়ায়,
সেই কার্ত্তবীর্য্য-বাহু সহস্র, যে ছেদিল হেলায়,
—সেই সে পরশুরাম ; তার গর্ব্ব খর্ব্বিল যে রাম
সে রামের দূত আমি —কুমার অঙ্গদ মোর নাম।

রাবণ। ভ্রাতা মোর কুম্ভকর্ণ— সমস্ত অরাতিদের
কালান্তক যম ;

মেঘনাদ পুত্র মোর— হাসিমুখে বাসবে যে
করিল বন্ধন ;
খড়্গ মোর "চন্দ্রহাস" ; সহায় যাহার রণে
শূর রক্ষগণ,
আমি সেই দেব-শত্রু, ত্রিভুবন জয়ী রাজা
প্রখ্যাত রাবণ।

অঙ্গদ। ওরেরে রাবণ শোন্ ! কার্ত্তবীর্য্য করে খর্ব্ব
তোর অহঙ্কার ;
সেই কার্ত্তবীর্য্য-বাহু ছেদিল পরশুরাম
হানিয়া কুঠার ;

সে পরশুরাম-জেতা যাবৎ না রাম
করেন ক্ষেপণ তাঁর কালান্তক বাণ,
তাবৎ সীতারে তুই করি সমর্পণ
সন্তান সন্ততি নিজ করহ রক্ষণ।

রাবণ। কি করিল রাম তোর ?
অঙ্গদ। অরাতি বিজয়।
রাবণ। কে সেই অরাতি তার ?
অঙ্গদ। বালী মহাশয়।
রাবণ। কেবা সেই ক্ষুদ্র বালী ?
অঙ্গদ। নাহি চেনো তাঁয় ?
রাবণ। শাখামৃগে চেনে কেবা ?
অঙ্গদ। কি বিস্মৃতি হায় !
—পর্য্যঙ্কে বাঁধে যে তোমা লেজের আগায়।

রাবণ। সেই তোর পিতা বালি বীর মাঝে গণিত কি হয় ?
—সে-ত বন্যদের পতি, আর তুই শিশু বৈত নয়।
কি অলৌকিক কাজ করিল সে রাম
গাহিস্ যাহার যশ তুই অবিরাম।

অঙ্গদ। সেই তব ভগিনীর নাসার বসায়
পঙ্কিল যাঁহার খড়্গ চিনিস্ না তাঁয় ?
দূষণ-ত্রিশিরাদির শিরোরক্তে যাহার কৃপাণ
পরে হয় প্রক্ষালিত—ওরে রক্ষ !—তিনি সেই রাম।
বন্ধন করিয়া তোরে, চতুঃ সিন্ধু করায়ে ভ্রমণ
সন্ধ্যা-অর্চ্চনাদি যিনি সমস্ত করেন সমাপন,
—কেমনে ভুলিলি সেই বালি-রাজে, নিলর্জ্জ রাবণ ?

রাবণ। রে নিলর্জ্জ কপি-শিশু ! যে রাম পিতারে তোর
বিনাদোষে করিল নিধন,
দ্বেষহীন দাসবৎ ভ্রমিয়া তাহার কাজে
কেমনেরে করিস্ গর্জ্জন ?
একদা পিতারে যার প্রসন্ন হইয়া আমি
মৈত্রী মোর করিলাম দান,
তার পুত্র-পরে এবে সমুচিত দণ্ড বল্
কি করিয়া করিব বিধান ?

অঙ্গদ। সুনীতির শুভ পন্থ ধরে যেইজন
নিয়ত করয়ে সেবা তারে সাধুগণ।
সুহৃৎ হয়েও যদি দুরাচারী হয়,
সাধুজন-ত্যাজ্য সেই জানিবে নিশ্চয়।
তবানুজ তাই তোমা করিয়া বর্জ্জন
রক্ষ-অরি শ্রীরামের লয়েছে শরণ।
শোনো তবে দশানন আমি রাম-দূত,
শুনিবারে বার্ত্তা এই হওহে প্রস্তুত।
খরদূষণাদি-রক্ষ-রক্ত করি' পান
হইয়াছে পিপাসিত যে রামের বাণ
—তব শির-বিনিসৃত শোনিতের ধার
নির্ব্বাণ করিবে এবে সেই তৃষা তার॥

রাবণ। করাল সে মৃত্যু, যার পদানত ভৃত্যের সমান,
যার অগ্রে দিবাকর মন্দ মন্দ করে তাপ দান,
অষ্ট লোকপাল যার পদরেণু করয়ে বহন,
বিশ্বত্রাস "চন্দহাস" খড়্গ যার করিয়া দর্শন
সুর-নাগ বধূদের ভয়ে হয় সদ্য গর্ভপাত,
নির্ল্লজ্জ তাপস তুই কপিদলে আনি নিজ সাথ
অজেয় সে রাবণের কনক-লঙ্কায়
কেন আসি উপনীত হইল বৃথায়?

অঙ্গদ। রক্ষ-কুল সমুৎপন্ন লঙ্কাপতি ওরে দশানন!
যুগল ধনুক যবে ধরিবেন রাম ও লক্ষ্মণ
—যে ধনুক সূর্য্যতুল্য অতি-উচ্চ মহাতেজোময়—
সেই ধনুর্বাণাঘাতে শীঘ্র তব সৈন্য সমুদয়
গৃধ্রভুক্ত শ্ব-ভক্ষিত কাক-ক্ষত হইবে নিশ্চয়।

রাবণ। কটুবাক্য বলিলেও নৃপ-বধ্য নহে দূত কভু;
যথাদিষ্টবাদী দূত কহে—যা' আদেশ করে প্রভু।
দূত-পরে হলে কোপ শাস্ত্রের বিধান এইরূপ;—
কোন অঙ্গচ্ছেদ করি' তারে শুধু করিবে বিরূপ।

অঙ্গদ। পরস্ত্রী হরণ কালে ধরমশীলতা তব
কোথা ছিল ওহে দশানন?
"দূতেরে বধিতে নাই" এই ধর্ম্ম-জ্ঞান তব
সহসা যে হইল স্ফুরণ!

রাবণ। স্তাবক কপিরা যদি সাগরের বক্ষ-পরে
সেতু এক করিল নির্ম্মাণ
—আশ্চর্য্য কিবা তাহে? পিপীলিকা রচে নাকি
বল্মীক পর্ব্বত-সমান?
লঙ্কা দগ্ধ করে যদি —সে প্রভাব অনলের,
কি শকতি ধরে হনুমান?
কি শৌর্য্য আশ্চর্য্য প্রকটিল বাহুবলে
সেই ব্যক্তি যার নাম রাম?

(অপিচ)। শৈলময় সেতু দিয়া ক্ষুদ্র সিন্ধু হয়ে পার
কেন এত গর্ব্ব করে নর ও বানর?
দশানন-বাহুরূপ সীমাহীন সুদুস্তর
আছে আরো বিংশতি সাগর॥

অঙ্গদ। রাবণ শোন্‌রে তুই! শম্ভু-শৈল উত্তোলিয়া
হয়েছিস্‌ প্রখ্যাত-কীরতি;
রাম-সনে এবে তুই যুঝিতে করিস্‌ ইচ্ছা
—ইহা তোর অনুচিত অতি।
শ্রীরাম থাকুন দূরে লক্ষ্মণেরো ধনুকের
রেখামাত্র না পারিবি করিতে লঙ্ঘন;
রামের যে চর "হনু" —সেই ত লঙ্ঘিল সিন্ধু,
আর তোর লঙ্কাপুরী করিল দহন॥

রাবণ। নিরস্ত হ'লি না যেরে শুনিয়াও আমার বিক্রম,
বাহুল্য আলাপে আর কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন,
কথা কাটাকাটি করে' নাহি আর ফল,
কি করিতে চাহে তোর রঘুডিম্ব—বল্।

অঙ্গদ। আদেশিলা রঘুনাথ এই কথা বলিতে তোমায়
"অজ্ঞানে বা মদভরে হরিস যে গোপনে সীতায়,
এখনি করে সে যেন অবিলম্বে তাঁহারে মোচন;
নতুবা লক্ষ্মণ তার দশমুণ্ড করিয়া ছেদন,
উচ্ছলিত-রক্তচ্ছত্রে দিগন্ত করি' আচ্ছাদন,
কৃতান্ত-ভবনে তারে পুত্রসহ করিবে প্রেরণ॥"
কুমার লক্ষ্মণ তোমাকে এইরূপ বলেছেন—
সীতারে মোচন কর, শ্রীরামের পাদপদ্ম
করহ ভজন;
চির-রাজ্য কর ভোগ, যজ্ঞ-অংশ ভাগী হোক্
যত দেবগণ;
অক্ষত থাকুক লঙ্কা; কিন্তু যদি মোর কথা
না কর গ্রহণ,

পাবে ফল সমুচিত ;— সুগ্রীবের চড়াকিলে
হইবে নিধন।

সুগ্রীব তোমাকে এই কথা বলেছেন :—

বলবীর্য্যে যে পুরুষ অতীব গর্ব্বিত
—লঙ্কেশ, সে রামে তুমি দেখনি নিশ্চিত।
বালির নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
আত্ম-অভিমান তব কর বিসর্জ্জন।
সীতা সমর্পণ করি' রাখ রক্ষকুল,
—আর তব ইন্দ্রাধিক ঐশ্বর্য্য অতুল।
তাই বলি, দশানন! শোন কথা সার
রামের দাসত্ব তুমি করহ স্বীকার।

আর প্রধান সেনাপতিগণ এইরূপ আদেশ করেছেন :—

রে পশু রাক্ষসাধম! শীঘ্রই হইবি তুই
মগ্ন শোকার্ণবে ;
তুই কি জানিস্ নারে সমাগত হেথা তোর
শত্রুগণ সবে।
কার্ম্মুক ধারণ করি' লক্ষ্মণ ও রাম
আর তাহে জুড়ি' তীক্ষ্ণ সমুজ্জ্বল বাণ,
সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপে —জানিবি নিশ্চিত—
তব পুর দ্বারে আসি' দোঁহে উপস্থিত।

তুই পতৃবন্ধু বলে' অপৃষ্ট হয়েও আমি তোকে এই কথা বল্‌চি :—

শোন্‌রে রাবণ তুই সর্ব্ব লোক-সুবিদিত
নৃপতি প্রখ্যাত রাম-নামে,
তোরে বধিবার তরে স্বসৈন্যে সাগর বাঁধি
উপনীত তব সন্নিধানে ;
পাঠালেন মোরে তিনি ; সীতা সমর্পিয়া রামে
চরণ বন্দন কর তাঁর ;

তাহা হলে চিরকাল পারিবি করিতে ভোগ
অকণ্টকে রাজ্য আপনার॥

রাবণ। চন্দ্রহাস খড়্গ দিয়া নিজ দশ কণ্ঠ আমি
ছেদিবারে হইলে প্রবৃত্ত,
আ-স্কন্ধ কণ্ঠকাণ্ড -মহাবন ছিন্ন হয়ে
ভূমে হ'ল তখনি পতিত ;
সেই ছিন্ন শিরোমাঝে ছিলনা— জানিবে তুমি—
একটি বদন
যাহা গদগদ-ভাষী, বিকৃত-ভ্রু, কিম্বা যাহা
সজল-নয়ন ;
তার সাক্ষী ভগবান্ মহাদেব ত্রিপুরারী
শিব পঞ্চানন।

অঙ্গদ। তব দশমুণ্ড লয়ে দশানন, ক্রীড়া তুমি
কোরো নাকো আর ;
শিব-সম রাম জেনো না দিবেন ফিরাইয়া
মস্তক তোমার।
কৈলাস-তুলনা ছাড়ি' —সমুদ্র-সেতুর পরে
দেও মন আজ ;
মম পিতৃ-বিক্রমের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে তুমি
কর যে বিরাজ
—বলি তোমা হিত কথা ;— রঘুবধূ জনক-নন্দিনী
তাঁরে তুমি রাম-হস্তে সমর্পণ করহ এখনি॥

রাবণ। তব-পিতৃ বিক্রমের করিছ তুমি যে এবে
বৃথা আস্ফালন।
তব উপযুক্ত বটে সে ক্ষত্র-ডিম্বের হেন
চরিত্র কীর্ত্তন ;
ধনুর্ভঙ্গ-আদি কথা গাইছ যে তুমি বারম্বার,
তাহে তার যশোবৃদ্ধি নাহি হয়—করিলে বিচার।

অঙ্গদ। ভাঙ্গিলেন হর-ধনু ;

রাবণ। —"ঘুণ্‌-ধরা" হইবে নিশ্চয়।

অঙ্গদ। বধিলেন তাড়কারে ;
রাবণ। সে রমণী বৃদ্ধা অতিশয়।
অঙ্গদ। বধিলেন খরাদিরে ;
রাবণ। তাহারা ত অর্ব্বাচীন অতি।
অঙ্গদ। ভেদিলেন সপ্ততাল ;
রাবণ। তাল-তরু সে-ত তৃণজাতি।
অঙ্গদ। তাঁর হস্তে বালী হত ;
রাবণ। —কপি বই আর কিছু নন্।
অঙ্গদ। বাঁধিলেন অম্বুনিধি ॥

নিরুত্তর হইল রাবণ ॥

(রাবণকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার আচ্ছাদনার্থ প্রহস্ত)

প্রহস্ত। (সভাসদ্‌গণের প্রতি)
ওহে ব্রহ্মা ! শোনো বলি, ইহা নহে বেদপাঠের সময় ;
নিঃশব্দে বহির্দ্দেশে কর অবস্থান।
জড়মতি বৃহস্পতি ! বহু বাক্য করিও না ব্যয়,
এ নহে ইন্দ্রের সভা—থাকে যেন জ্ঞান।
হে নারদ ! যাও তুমি বীণাবাদ্য করগে শ্রবণ ;
হে তুম্বুর ! স্তুতিপাঠে নাহি আর কাজ।
শূল সম বিঁধিয়াছে সীতার সে নিঠুর বচন
লঙ্কেশের বপু তাই সুস্থ নহে আজ ॥

(লঙ্কেশ্বর সুস্থ নহেন—এই কথা ঢাকিবার জন্য পুনর্ব্বার)

রাবণ-প্রতাপ ভানু সহিতে অক্ষম
—করিতেছে নিরন্তর পার্শ্ব-আবর্ত্তন ;
পশ্চিম জলধি-পারে হয়ে অস্তমিত
পূর্ব্ব-পারে পুনর্ব্বার হয় সমুদিত।
আছেন শয়ান হরি সাগরের জলে,
বসতি করেন শিব গিয়া হিমাচলে।
আর সুরজেষ্ঠ-ধাতা চতুর্ম্মুখ প্রভু
আছেন ধরিয়া পদ্ম— না ছাড়েন কভু ॥

অঙ্গদ। ওরে রক্ষোরাজ শীঘ্র দেরে তুই ছাড়িয়া সীতায়,
পৌরুষ-প্রাগল্‌ভ্য কেন প্রকটিত করিস্ বৃথায় ?
সম্মুখে দেখিস্ না কি কপিপতি সুগ্রীব-সেনায়
—দোর্দ্দণ্ড-বিক্রম যার উচ্চকণ্ঠে কিন্নরেরা গায় ?
ওরে অকিঞ্চন মূঢ় ! শ্রীরাম কি নর ?
রম্ভা কি সে এই-নারী ? যে-সে যোদ্ধা স্মর ?
গঙ্গা সে কি নদী, আর ঐরাবত হাতী ?
উচ্চৈঃশ্রবা-অশ্ব সে কি এই অশ্বজাতি ?
ত্রিলোক-প্রথিত-বীর্য্য যেই হনুমান
সামান্য বানর বলি' তারে কর জ্ঞান ?
রাবণ। জানা গেছে—সে রামের বুদ্ধি চতুরতা
—তোমা-সম দূত যবে পাঠাইলা হেথা।
দূত-যোগ্য গুণ তব কিবা আছে শুনি,
তোরে ত অরণ্য-চর কপি-মধ্যে গণি।
অঙ্গদ। সন্ধি হোক্, যুদ্ধ হেক্ —আমি দূত হেথায় থাকিতে
—ক্ষত বা অক্ষত হ'স্— ক্ষিতি-পৃষ্ঠে হইবে লুটিতে ॥
রাবণ। "বড় দুষ্ট এই কপি, ধর্ তোরা ইহারে এখনি"
আদেশিলে দশানন রাক্ষসেরা ধরিল তখনি।
রক্ষোবৃন্দে নিক্ষেপিয়া, ভাঙ্গি' সৌধ পদাঘাত-বলে,
উঠিল অঙ্গদ বীর এক লম্ফে গগন-মণ্ডলে ॥

(রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া)

অঙ্গদ তব ভুজানল-মাঝে মৃত্যুকামী পতঙ্গ সমান
দর্পভরে দশানন হিতবাক্যে নাহি দেয় কান।
শ্রীচরণে, রঘুবীর ! তাই আমি করি নিবেদন
সৈন্য-চক্র লয়ে রণে মুণ্ড তার করহ ছেদন ॥

ইতি দূতাঙ্গদ নামক সপ্তম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩

নৌচালন বিদ্যা।

ইউরোপ, যে আজ এত উন্নত ও ক্ষমতাশালী তার অন্যতম কারণ জাহাজ পরিচালন-জ্ঞানের সম্যক উন্নতি। সমুদ্র পার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়াই তাঁহাদের এত জ্ঞান উপার্জ্জন ব্যবসার উন্নতি ও ক্ষমতা বিস্তার। সেই জাহাজ পরিচালন বিদ্যা সম্বন্ধেই দুই একটী কথা এই প্রবন্ধে বলিব। যে দিন দেখিলাম, জমী অদৃশ্য হইলেও জাহাজ আপনার পথ ঠিক রাখিয়া কি দিন, কি রাত্রি চলিতে লাগিল সেই দিনই আমার মনে এ প্রশ্ন প্রথম উঠিয়াছিল। কাপ্তেন প্রভৃতি জাহাজের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া ও জাহাজের সব কল কারখানার ও যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা দেখিয়া, ও পুস্তক পড়িয়া এ সম্বন্ধে যাহা শিখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

প্রথম অবস্থায় মানুষ, বৃক্ষাদি কোন হাল্কা দ্রব্য ভাসাইয়া, দাঁড় বহিয়া বা লগী ঠেলিয়া নদী পার হইত। ক্রমে পাল-তোলা নৌকাই তাহার জলযান হইল। এখন সেই স্থানে কলের জাহাজ আবিস্কৃত হওয়াতে স্রোত ও হাওয়ার গতির উপর বড় একটা নির্ভর করিতে হয় না। ইচ্ছামত গন্তব্য স্থানে সহজেই যাতায়াত করা যায়।

খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইউরোপের লোক, "আসিয়া" আদি দেশ সম্বন্ধে বড় একটা সঠিক খবর জানিতেন না। আরব প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়ার দ্রব্যাদি লইয়া ইউরোপে ব্যবসা করিতেন তাহাদের নিকট হইতেই যা'কিছু সামান্য খবর ইউরোপবাসীরা পাইতেন মাত্র, তার অনেকই অতিরঞ্জিত ও অলীক।

সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব এসিয়াতেই হইয়াছিল। মানবের প্রথম উৎপত্তিই সেখানে। সেখান হইতেই আর্য্য-জাতি চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মেরই সেখানে প্রথম আবির্ভাব, সভ্যতার প্রথম বিকাশও সেখান হইতেই হয়! এ সকল তথ্য নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পুরাণ ভাল ইতিহাস নাই বলিয়া জানা যায় না যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব ভারতেই হইয়াছিল কি না; তবে দেখা যায় যে, পারস্য ফিনিসিয় বোধলন প্রভৃতি জাতির নিকট হইতেই ইউরোপে প্রথম সভ্যতা পৌঁছায়। শুনা যায়, ইজিপ্‌ট এ হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। গ্রীকজাতি হইতে রোমান এবং তাহাদের হইতে স্পেন্, পর্ত্তুগ্যাল্, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইংরেজ ইত্যাদি জাতি ক্রমে সভ্যতা পাইয়াছেন। অর্থাৎ মোটামুটি মনে হয়, যেন সভ্যতা ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পূর্ব্ব হইতে ক্রমে পশ্চিমে হাঁটিয়া গিয়াছে। যখন ইউরোপের সঙ্গে প্রথম সুদূর এসিয়ার পরিচয় হয় তখন ইউরোপে স্পেন ও পর্ত্তুগ্যালই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারের ইচ্ছার সঙ্গে জলপথে সুদূর এসিয়াতে আসিবার পথ অন্বেষণ আরম্ভ হয়। কতক লোক উত্তর-মেরু-পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিবার রাস্তা আবিষ্কার করিতে গিয়া তুষারে মারা গেলেন। পৃথিবী গোল এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কলম্বস্ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ভারতে পৌঁছিতে গিয়া আমেরিকা আবিস্কার করিলেন—ভারতে আসিতে পারিলেন না। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্‌কোডাগামা কেপ্-অফ-গুড্‌হোপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। ও সেই সময় হইতেই স্পেন্ ও পর্ত্তুগ্যাল্‌এর সুদূর আসিয়ার সহিত ব্যাবসাবাণিজ্য জলপথেই চলিতে লাগিল। ক্রমে ওলন্দাজ আসিলেন। তারপর ফরাসী। তারপর ইংরাজ জাতি আসিয়া, ক্রমে সুয়েজপ্রণালীর পথ গমনোপযোগী হইলে এখন "আসিয়া" সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন ইউরোপের সঙ্গে আসিয়ার খুবই নিকট সম্বন্ধ, ভোক্তা ও ভোজ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আফরিকা আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের মত সমস্ত আসিয়াই ইউরোপিয়নদের মধ্যে একরূপ ভাগাভাগী হইয়া গিয়াছে। এখন সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ নিরাপদ। মানুষ বাড়িতে থাকিলে যেরূপ কোনও কিছুরই অভাব হয়না—জাহাজে থাকিবার কালেও সেইরূপ যাবতীয় আবশ্যকীয় সুখ-সম্ভোগ তাহার করতলগত থাকে।

পূর্ব্বকালে গ্রহনক্ষত্রাদির স্থান ও গতিবিধি দেখিয়াই সমুদ্রে দিক নির্ণয় ও গন্তব্য পথ নিরূপণ হইত! পরে "কম্পাস" নামক দিক্-নির্ণয় যন্ত্রের আবিস্কারের সহিত সে কাজ আরও সহজসাধ্য হইল; দিকমণ্ডল কুজ্ঝটিকাপূর্ণ বা আকাশ মেঘাবৃত হইলে আর অনন্যোপায় হইতে হয় না। জাহাজ যে দিকেই ফিরুক কম্পাসএর কাঁটা সর্ব্বদাই উত্তর-দক্ষিণ ফিরিয়া থাকিবে।

জাহাজ প্রতি মুহূর্ত্তে যে স্থানে আছে সে স্থানের লেটিটিউড্ ও লনডিটিটিউড্ কত তাহা কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। তাহা জানা যাইলেই চার্ট বা জলের মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোন মুখে জাহাজ চালাইতে হইবে বা নিকটে কোনও স্থানে চড়া বা নিমজ্জিত পাহাড় আদি বিপদসঙ্কুল স্থান আছে কি না।

সেক্স্টাণ্ট নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে সূর্য্য প্রভৃতি, গ্রহনক্ষত্রগণের কত ডিক্রি উচ্চে আছে তাহা অর্থাৎ অলটিটিউড্ নিরূপিত হয়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই কোনের পরিমাণ নিরূপণ করিলে দেখা যাইবে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময়েই কোন্ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, এবং বেলা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বাপেক্ষা বড়—অর্থাৎ যেমন চলিত ভাষায় বলা হয়—"সূর্য্য মাথার উপর থাকে।" সুতরাং, এর মধ্যে যে দিকের কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল সেই দিকটিই সেই স্থানের মেরিডিয়ান্ অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণের দিক। এবং ঠিক কয়টার সময়ে সূর্য্য এ স্থানের উপর দিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, ক্রনমিটার নামক ঘড়িতে সেই সময়টি দেখিয়া রাখিলে গ্রীনউইচ্এর মধ্যাহ্ন হইতে এই সময়টির কত তফাৎ হইল তাহা জানা যায়। এইরূপে সেই স্থানটি গ্রীনউইচ্এর সঙ্গে তুলনায় কত ডিগ্রী লনডিটিউডে আছে তাহা জানা গেল। অলটিটিউড্ ঠিক হইলে, তাহা হইতে অতি অল্প আয়াসেই হিসাব করা যায়, সে স্থানের লেটিটিউড্ কত। কেন না বিষুবরেখা হইতে সূর্য্যকে দেখিলে অলটিটিউড্ যত হইবে অন্য স্থান হইতে দেখিলে তত হইবে না; হিসাব মত হয় কম নয় বেশী হইবে।

লেটিটিউড্ ও লনডিটিউড্ ঠিক হইলেই সে স্থানটি মানচিত্রে অনায়াসেই নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং গন্তব্য পথ ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান-অস্থানেরও খবর জাহাজেই পাওয়া যায়। হিসাব এত সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে যে, এইরূপ হিসাবে যে স্থানে জাহাজ আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা খুব ঠিক, এক মাইলেরও ভুল হয় না।

যদিও লেটিটিউড্ ও লনডিটিউড্ এই দুইটি জানাই প্রধান, এ দুটি ছাড়া অন্যান্য সকল আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার উপায় আছে। এমনি সুন্দর হিসাব, এমনি সুন্দর কল কৌশল! জলের স্রোত কোন দিকে ও তার কত বেগ তাহা জানিবার উপায় আছে। জাহাজ কত বেগে চলিতেছে জানিবার জন্য লগ্ নামক একরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহা আর কিছুই নহে, কেবল ইস্কুরুবের শীর তোলার মত বড় করে শীর তোলা একটি যন্ত্র জাহাজের পিছনস্থ একটি ঘড়ি হইতে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ফেলা। যখন জাহাজ চলে তখন সেইটি ঘুরিতে থাকে এবং ঘড়ির

কাঁটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। জাহাজ জোরে চলিলে বেশী ঘুরে ও আস্তে চলিলে কম ঘুরে। এই ঘুরা দেখিলে জাহাজ কত বেগে চলিতেছে তাহা নিরূপিত হয়।

সুধু ইহা নহে—হাওয়া কোন দিকে চলিতেছে ও কত বেগে চলিতেছে তাহার অবধি হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং, সকল সংবাদই আয়ত্বর ভিতর। সকল দিক দেখিয়া বুঝিয়া চলা যায়, তবে আর ভাবনা কি! শতসহস্র যাত্রী লইয়া তাই সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানি অতি বিশাল সমুদ্রে একজনার আজ্ঞায় খেলনার মত চলে।

জাহাজের এঞ্জিনে বাষ্পের চাপ কত তাহা হইতে বুঝা যায় স্ক্রূটি কত বেগে ঘুরিতেছে ও তাহাতে জাহাজের কত গতি হওয়া উচিত। যতটা হওয়া উচিত আর যতটা হইতেছে এই প্রভেদটি জলের ও হাওয়ার গতিবশত ঘটিতেছে।

তবে এত সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বিপদ ঘঠে। সুধু ঝড়, তুফানে ভয় নাই—যদি নিকটে চড়া বা পাহাড় না থাকে, কিম্বা বাতাস ঘূর্ণী না হয়। টাইফুন্ জাহাজ সহজে ডুবেনা—যদি চড়ায় লাগিয়া কাত বা ফুটা হইয়া না যায়, কিম্বা ঘূর্ণী বাতাসে উল্টাইয়া না যায়। অনেক সময়ে জলের আলোড়নে সাফ্‌ট বা "স্ক্রূ" ঘুরিবার ডাণ্ডিটি ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিয়া গেলে আর মেরামত হওয়া সহজ নহে। তখন জাহাজ সামলান দায়—হাওয়া ও স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। সময়ে সময়ে ঘূর্ণী বাতাসের সময় জলস্তম্ভ (water spout) দেখা দেয়, সে আরও ভয়ানক। এক মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। তখন যদি ভাঙ্গিয়াও যায় ত সে আলোড়নেও জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। তবে জলস্তম্ভ আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় বলিয়া সময় থাকিতে দূর হইতে কামানের গুলি মারিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

দক্ষিণ-প্রশান্তসাগরে জলস্তম্ভ প্রায়ই দেখা যায়। চীনসমুদ্রেও কখন কখন হইয়া থাকে। চীনসমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড় ও চড়া বিস্তর, তাই এত ভয়ের কারণ। এবং শীতের প্রারম্ভে মৌসুম পরিবর্ত্তনের সময় অতিশয় ভীষণ ও তুফানময় হয়। আমি না জানিয়া ঠিক এই সময়েই গিয়াছিলাম। তাই চীনসমুদ্রে এত উপদ্রব সহিতে হইয়াছিল।

অনেক সময়ে দুর্য্যোগে জাহাজ পথ ঠিক রাখিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট হয়। সময়ে সময়ে জাহাজে বাজ পড়িয়া কম্পাস খারাপ হইয়া যায়। এ সময়ে আকাশও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে যদি জাহাজের পথ ঠিক করিবার কোনও উপায় না থাকে তবে Lost reconning অর্থাৎ হারান-হিসাব নামক এক প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা জাহাজ বাঁচান যাইতে পারে। সেস্থানের জলের গভীরতা কত, নিচে কিরূপ মাটিই বা পাওয়া যায়—কিরূপ বালি, কিরূপ পাথর খণ্ড, কিরূপ জলজপ্রাণী ও উৎভিদ ইত্যাদি আছে ঠিক করিয়া কতক পরিমাণে স্থাননির্দ্দেশ করা যায়। চার্টে এসকলেরই বিশেষ বিবরণ আছে।

জাহাজ নির্দ্দিষ্ট দিবসে বন্দরে না আসিলে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে তারের খবর লওয়া হয়। অন্য জাহাজ কেউ কোথা সে জাহাজকে পথে দেখেছে কিনা জানা হয়। সমুদ্রমাঝে অপর জাহাজ দেখিলে সকল জাহাজই সে জাহাজের নাম, ধাম ও পথে কোনও গোলমাল আছে কিনা ইতিবৃত্তান্ত খবর লইতে বাধ্য। ও সেই খবর, পরবর্ত্তী বন্দরে পৌঁছাইলেই তথায় জানাইতে বাধ্য। অপর কোনও জাহাজ পথে বিপন্ন হইলে যথাসাধ্য তার সাহায্য করিতে বাধ্য। জাহাজ চালাইবার আইনের এই বাঁধা নিয়ম। এরূপ না হইলে চলিবে কেন। অমন অকুলে ও অসহায় অবস্থায় যদি পরস্পরের সাহায্য না করা যায় তো কি করে চল্‌বে।

ইহা ছাড়া আর একটি বিপদ, জাহাজে আগুন লাগা। আগুনই লাগুক আর জাহাজ ভাঙ্গুক বা ডুবুক—সকল বিপদের সময়েই কার্য্য করিবার নিয়ম বাঁধা আছে। যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যেমন সুনিয়মে পরিচালিত হয়—জাহাজেও সেইরূপ কড়া নিয়ম। তাহার অন্যথা হইবার যো নাই। এরূপ না হইলে চলিবে কেন? সকলেই প্রাণ বাঁচাতে গোলমাল করিলে বিপদ! উদ্ধারের চেষ্টা কি করে হবে। তাই জাহাজের কর্ম্মচারীরা হাজার বিপদই হোক, কে কোথায় দাঁড়াইয়া কার্য্য করিবে, তা নির্দ্ধারিত আছে। অভ্যস্ত রাখিবার জন্য জাহাজ যখন বন্দরে আসে, সেই সব কার্য্যগুলি অভ্যাস (drill) করা হয়। অর্থাৎ ঠিক যেন আগুন লাগিল, কি ঠিক যেন জাহাজ ভাঙ্গিল—কে কি করিবে কর, অমনি তাহারা সেই সব কার্য্য অভিনয় করিতে থাকে।

ক্যাসাবিয়ান্কার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। নাইলের যুদ্ধে—লা-ওরিয়েন্ট নামক জাহাজে এক নির্দ্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিবার বা পাহারা দিবার ভার পাইয়া সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক জাহাজে আগুন লাগিলেও আপনার স্থান ছাড়িল না। যখন থেকে পড়েছি তখন থেকে আমার সে সুন্দর কবিতাটি মুখস্থ আছে। পাঠ্যাবস্থায় কত ভাল লাগিত, এখন আরও ভাল লাগে।

চারি দিকে যখন আগুন লেগেছে আর সে আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে—কষ্টে আর থাকা যায় না, তবুও বালক অবিচলিত—

'অগ্নি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া তার শিখাগুলি যেন ধ্বজার মত হেলিয়া দুলিয়া এই কর্ত্তব্যপরায়ণ নির্ভিক বালকের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল।'

বিপদ হইলে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাহাজে ছোট ছোট বোটগুলি রাখা হয় সেই গুলিতে, পলাইবার সময় প্রথম যাত্রীরা

যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী এক একজন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এক একখানি বোটে করিয়া যাইবে—ভাণ্ডারী তাহাদের আহার্য্য যথাসময়ে উঠাইয়া দিবে। অন্য সকল কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে। অমুক এঞ্জিন ঘরে থাকিবে, অমুক জাহাজের হালের তত্ত্বাবধান করিবে, অমুক চিঠিপত্র সামলাইবে ইত্যাদি। প্রথম স্ত্রীলোক ও ছেলেদের যেতে দেওয়া হয়। পরে, প্রথম শ্রেণী হইতে আরম্ভ করে পুরুষদের। কর্ম্মচারীরা শেষে যাইবেন। কাপ্তেনবেচারা সকলের শেষে। তিনি যেমন জাহাজের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তাহার ঘাড়েই তেমনি বেশী ঝক্কি; বাড়ির কর্ত্তার মত যদিও প্রথমেই তাঁহার পাতে মাছের মুড়া পড়ে বটে, কিন্তু সংসারের সকল ভারও তাঁকেই সইতে হয়।

এই সকল বাঁধা নিয়ম জাহাজেই লেখা আঁটা আছে। চীন-সমুদ্রে যখন বড় তুফান হচ্ছিল আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি দেখে নিলাম, পালাবার সময় ডাক্তার কখন পালায়। দেখলাম যাত্রীদের পরেই ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের আগে। সংবাদটি পড়ে তবুও কতক আশ্বস্ত হইলাম।

বার্কেনহেড নামক একখানি জাহাজ বিস্তর যাত্রী লইয়া দক্ষিণআফ্রিকার তুফানময় সমুদ্রকুল দিয়া যাইবার সময় নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া ফুটা হইয়া গেল। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও জাহাজ বাঁচান অসম্ভব জানিয়া Life boatএ করিয়া যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা হইলে সকল কাজই অতি সুনিয়মে চলিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা সমানে স্বস্ব স্থানে দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নিজ নিজ কাজ করিতে লাগিলেন। প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালকদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সৌভাগ্যবশতঃ জমী নিকটেই ছিল। জাহাজ হইতে যাত্রী লইয়া কিনারায় রাখিয়া নৌকাগুলি আবার অন্য যাত্রী লইতে ফিরিয়া আসিতে

লাগিল। সব যাত্রী পার হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ ডুবিয়া গেল। যাঁহারা তখনও রহিল—কাপ্তেনের আজ্ঞানুসারে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবার মত দাঁড়াইয়া—যাহাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে, তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সুনিয়মে স্থির থাকিয়া অতলজলে ডুবিয়া গেলেন।

একবারও একটু গোলমাল হইল না। সুনিয়মের ও সুঅভ্যাসের এমনই বিচিত্র মহিমা। আমি এক জনার বাড়ীতে এই সম্বন্ধে এক খানি ছবি দেখিয়াছিলাম। যদিও অবশ্য কপোলকল্পিত চিত্র বটে কিন্তু এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, মনে হয়, চোখের সামনে সে সব ঘটনা ঠিক যেন ঘটিয়া গেল।

অগ্নি-উৎপাৎ বা অন্য কোনও বিপদ ঘটিলেই প্রথমে নিশান উড়াইয়া বা রঙ্গিন বাতি জ্বালিয়া ও এলার্ম বাজাইয়া সকলকে সংবাদ দিয়া সাবধান করা হয়। কর্ম্মচারীরা নিমেষের মধ্যে যার যেখানে গন্তব্য সে সেখানে গিয়া দাঁড়ায়। নিকটে জমী বা অন্য কোনও জাহাজ থাকিলে সিটি দিয়া তাহাকে সাহায্যের জন্য সংবাদ দেওয়া হয়। যদি এত দূরে থাকে যে সিটি শুনা যায় না তাহা হইলে কামান আওয়াজ করিয়া জানান হয়। সে জাহাজ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বাধ্য—না করিলে Navigation আইনে বিষম দণ্ডনীয়।

জাহাজের যদি কোনও খবর পাওয়া না যায় ত কিছুদিন বাদে Searching vessel খুঁজিবার জন্য পাঠান হয়। অনেক সময়ে অনেক জাহাজ পথভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় অনেক দিন বাদে আবার আপনিই ফিরিয়া আসে!

পথে জাহাজ ডুবিলে যদি তাহা তোলা না যায় ত সে জাহাজে ঠেকিয়া পাছে অন্য জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয় এই ভয়ে ডিনামাইট বারুদ দিয়া সে জাহাজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

জাহাজ হইতে কোনও লোক পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ একটি পিপের মত হালকা বড় দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হয়—তার দুই উদ্দেশ্য। প্রথম, সে বিপন্ন লোকটি উহাই ধরিয়া খানিকক্ষণ প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে; দ্বিতীয়, তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তারপর লাইফ্ বোট্ করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া আনে।

জাহাজ বিপন্ন হইলে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে Life boat আছে—তার মধ্যে অনেক গুলি এত বড় যে ৫০ জনার ঠাঁই হয়। এরূপ ১০।১২ খানি বোট সচরাচর থাকে। খুব ঝড়তুফানের সময় Life boatএ যতগুলির প্রাণ বাঁচাইবার স্থান আছে সুধু ততগুলি মাত্র যাত্রী লইতে পারে আর পারেনা। তা ছাড়া কত বড় গোল গোল বয়া আছে তাহার উপর চড়িয়া অনায়াসে ভাসা যায়। ইহা ব্যতিত প্রতি লোকের কামরায় বিছানার পাশে কর্ক নির্ম্মিত ভাসিবার যন্ত্র আছে, হঠাৎ ডুবিলে সেইগুলি বুকে পড়িয়া অনায়াসে সাঁতার দেওয়া যায়। বিপদ কখন হয় তা'ত জানা নাই—তাই সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য ঠিক ঠিক সাজান আছে।

সকল বিপদসঙ্কুল স্থানেই এখন সাবধান হইবার জন্য, হয় আলোক-স্তম্ভ নয় আলোক জাহাজ আছে। তাদের উজ্জ্বল আলো গুলি সুদূর অবধি যায়। অন্য আলো হইতে পৃথক জানাইবার জন্য সেগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে, একবার জ্বলে একবার নিভে। ঘুরিবার বেগ দেখিয়া কোনটি কোথাকার সে খবর ঠিক করা যায়। নির্জ্জন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে ঐ সকল আলো জ্বলিতে দেখিলে এক অপার আনন্দ ও মনে ভয় হয় তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না! যেন পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়া আলো পথিককে ঘাড় নাড়িয়া পথ দেখাইতেছে। যেমন মরুভূমে পান্থপাদপ আপনিই পথিককে জল জোগায় সেইরূপ এখানেও যেন সমুদ্রোত্থিত ঐ আলোর গাছগুলি পথ দেখায়।

এই ত গেল আজকালকার জাহাজের ব্যবস্থা। পুরাকা
জাহাজের কিরূপ অবস্থা ছিল ও ক্রমে ক্রমে কিরূপেই বা উন্ন
হইয়াছে তাহারও অনেক খবর পাওয়া যায়। শ্রীমন্তসওদাগরের সম
সমুদ্রগামী জাহাজ কিরূপ ছিল যদিও বিশেষ জানা নাই, কিন্তু ম
হয়, অনেকটা মহাজনী নৌকার মতই ছিল; কেবল সমুদ্রযাত্রী
উপযোগী করিবার জন্য সামনে ও পিছনে চেপ্টা ধরণের ও গলুই উঁচু
পুরাণ চাইনিজ জান্‌কও অনেকটা এইরূপ। ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকদের জাহা
এবং নরওয়ে দেশে সমুদ্র-দস্যুদের ও কলম্বসের সময়কার জাহা
সবই দাঁড়-বওয়া পাল-তোলা ছিল। এমন কি নেলসনের শেষ যু
ট্রাফালগার জলযুদ্ধে কলের জাহাজের ব্যবহার ছিল না। এখনকা
রণতরী সব কলে চলে। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে তাদের পরিচালনা
কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় যখন চী
সমুদ্রে ছিলাম—সকলের মুখেই অনবরত সেই যুদ্ধের কথা শুনিতাম।
আর জাহাজেও নানা রকম সচিত্র খবরের কাগজ লওয়া হইত।
তাতে যুদ্ধের নানা প্রকার চিত্র দেখিয়া বিস্ময়ের আর অবধি থাকি
না। তার একখানিতে রণতরীর আভ্যন্তরিক সব কলকব্জা ও ভিতর
কার বন্দোবস্ত চিত্রিত ছিল। দেখে যে কত শিক্ষাই, কি অপার আনন্দ
হলো বলা যায় না। স্তরে স্তরে কত তলাই সাজান। প্রতি তলায় কত
রকম সুব্যবস্থায় কামরা গুলি নির্ম্মিত। মাস্তুলের আধপথে watch
tower—যুদ্ধাধ্যক্ষদের যুদ্ধস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার উচ্চ স্থান।
সেখান হইতে সূর্য্যরশ্মির মত প্রখরতেজ বৈদ্যুতিক আলো চারি
দিকে ঘুরিতেছে—তাতে রাত্রিকালে দিনের মত দেখা যায়। সেইখান
হইতে তারসংযোগে নিম্নে ও সম্মুখের কামান-দাগিবার-ঘরে ঠি
কোন দিকে কামান দাগিতে হইবে সে বিষয়ের খবরাখবর চলে।
নিম্নকার সকলের মধ্যস্থিত গুলিবারুদের ঘর হইতে গুলি, বারু

কলে উঠে নাবে। সবই কলে পরিচালিত হয়—মানুষ কেবল কল
চালায় মাত্র। সর্ব্বের সামনে ও পিছনে জলের ভিতরকার কামরা
হইতে টরপেডো ছোঁড়া হয়। সেগুলি অতি ভয়ানক যন্ত্র। বন্দুকের
গুলিতে একেবারে একজন দুজন জখম হয়—বম্বসেলে শতলোক এক
সঙ্গে আহত হয়—কিন্তু এই এক টরপেডোতে জাহাজ জখম হইয়া
সহস্র সহস্র লোক জলমগ্ন হয়। তার আকৃতি ঠিক একখানি মোটা
কাঁপা সাবলের মত। তার ভিতরে বারুদ ভরা। পিছনে একটি
"স্ক্রু" আছে—দম দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দিলে জলের ভিতর দিয়া
যথাস্থানে গিয়া আপনিই শত্রুর জাহাজের তলায় ফাটিয়া বিষম জখম
করে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির ত অন্ত নাই। এই বিপদের প্রতিকার
করিবার জন্য জাহাজের চারিদিকে মাছ ধরিবার জালের মত টর্পেডো
ধরিবারও জাল আছে। তাহাতে জাহাজের নিকটে আসিয়া বিপদ
ঘটাইবার পূর্ব্বেই—সে বিষম যন্ত্রটিকে ধরিয়া লওয়া যায়। আরও যে
কত রকমের রণশাস্ত্রে মানববুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় পাইলাম তা
বলা যায় না। জাপানীরা বড়ই ফন্দিবাজ—ছোট ছোট অলীক রণতরি
তৈয়ার করিয়া তাহার মাস্তুলে আলো জ্বালিয়া ছাড়িয়া দেয়—আর
শত্রুপক্ষ তাই দেখিয়া যথার্থ জাপানী যুদ্ধজাহাজ মনে করিয়া—কামান
ও টরপেডো দাগে, তাতে অনর্থক তাদের গুলিবারুদের অপচয় হয়।
ও শত্রুর বলক্ষয় করা হয়।

নিচের তলায় মাঝখানকার ঘরে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার ও
শুশ্রূষার স্থান। নিজেরও ওই পেসা বলিয়া আমার সকলের চেয়ে
ওই স্থানটি দেখিতে ভাল লাগিল। গোলাগুলির দ্বারা নানা স্থানে
আহত, অচৈতন্য ও মুমূর্ষু সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে সুদক্ষ বাহকের দ্বারা
তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার্থ নীত হইতেছে। সুব্যবস্থায় সকল কার্য্য যেমন
সুচারুরূপে চলে, এমন দারুণ গোলমালেও সেখানে সব কার্য্যগুলি যেন
আপনা আপনি কলের মত চলিতেছে।

সেখানি প্রায়ই দেখিতাম, একদিন সেই ছবির বইখানি হাতে করিয়া আহারান্তে ঠেস দিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে তন্দ্রা আসিতেছিল। আর ছবির টরপেডোর ডগটি আমার বুকের দিকে ফিরিয়া থাকায় একটু ভয়ও হইতেছিল। এমন সময় অপর ঘরে আমার চাকরটি জুতা ঝাড়িয়া অন্য জুতা মেজেতে আচড়াচ্ছিল। সেই শব্দে তন্দ্রা অবস্থা থেকে চমকে উঠলাম, মনে হলো যেন সেই ছবির টর্পেডোটি সশব্দে ফাটিয়া গেল। সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনী সহজে কি থামে।

সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সময়ে জাপানীরা যে দিন রাত্রিকালে অলক্ষিতে হঠাৎ পোর্ট আর্থারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত "ভাইরো" নামক যুদ্ধ জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে জখম করে, সেই ছবিখানি ও জলমগ্ন বিপন্ন সৈনিকদের দেখিয়া মনে কি কষ্ট হলো তা বুঝান যায় না। যেন তাদের আত্মীয় লোকের কান্নার স্বর তখনকার জোর হওয়া আমার কানে বহিয়া আনিতে লাগিল। জাপানের জয় শুনে আহ্লাদ হয় বটে। কিন্তু এই সব কথা ভাবিলে যুদ্ধের কথায় আর প্রবৃত্তি হয় না। অনেক দিন আগে, একজন কোন পুস্তক হতে উদ্ধৃত করে এই শ্লোকটি বলেছিলেন শুনেছিলাম, সেইটি আমার মনে হইল—

"আশ্রয় তরণী তুমি বিপত্তি সাগর মাঝ
কে বাঁচায় দীনহীনে তুমি বিনে রাজ রাজ।"

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

স্বদেশের প্রতি।

হে মোর স্বদেশ!
খুলিয়া দিয়াছ আজ আমাদের কল্যাণসম্পদ;
তোমার কুটিরদ্বারে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রথ;
মিলিয়াছে বহুযাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান্,
সুখের হিতের শত উপায়নে পরিপূর্ণ-প্রাণ;
তাঁদের নিশ্বাসে আজ

দিগন্তে উড়িয়া গেছে
বাঙ্গালীর ধূলিময় বহুজীর্ণ বেশ!
নমি তোমা, হে বরেণ্য, হে মোর স্বদেশ!

যুগান্ত পবনে
দিগন্তে করাল মেঘ বিস্তারিছে অন্ধকার ছায়া;
সংখ্যাতীত প্রেতযোনি প্রসারিছে শত ভীতি মায়া;
চমকে দামিনীদীপ্তি, শিহরিছে হৃদয় তরাসে
উলঙ্গ কৃপাণ লয়ে ছিন্নমস্তা নাচিছে আকাশে;
এ দুর্দ্দিনে হে স্বদেশ!

মঙ্গল ইঙ্গিতে তব,
যুগান্তের ভস্ম হ'তে কুটিরে অঙ্গনে,
হোমাগ্নি উঠেছে জ্বলি যুগান্ত পবনে!

আজ বাঙ্গালার
সাতকোটি হৃদয়ের স্নেহ প্রেম শতাব্দী-সঞ্চিত,
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত ;—
প্রতি বঙ্গগৃহে বসি' অপ্রমত্ত নরনারীগণ,
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রয়ী, অনন্যশরণ ;—
ঘাতকের কর হ'তে

স্খলিত হয়েছে যেই
শতঘৃণ্যতম স্বার্থে শাণিত কুঠার,
দেবতানির্ম্মাল্য তাহা আজ বাঙ্গালার !

জাগরণ গান
ফেণহাস্যে উঠিতেছে কোটিমুখে প্রশান্ত সাগরে,
সদ্যোজাগরণরক্ত এসিয়ার নয়নের'পরে
ভাসিতেছে লক্ষ-আশা, কল্যাণের অগণিত ব্রত,
দীপ্তিমান হইতেছে লুপ্তপ্রায় শতমুক্তি পথ ;
দূর পূর্ব্বাকাশতীরে

উষালোকে ধীরে ধীরে
খুলিয়াছে জীবনের আদর্শ মহান্,
তাই আজ কোটিকণ্ঠে জাগরণ গান !

ওগো পৌরজন !
ভয়নাই—ভয়নাই—বিধাতার দুর্জ্জেয় বিধানে,
ভেঙ্গেছে মোদের ঘুম, দৈব-বাণী জাগিয়াছে প্রাণে ;
আজি হ'তে যার যাহা মুষ্টিমেয় রয়েছে সম্বল,
সবনিয়ে প্রাণপণে জননীরে দাও দূর্ব্বাজল ;
প্রাণদীপে আজি হ'তে

রাখ উজলিয়া সবে
চির সৌম্য জননীর গৃহের প্রাঙ্গণ,
ভয় নাই—ভয় নাই—ওগো পৌরজন !

আসিয়াছে বল ;
পূর্ব্বাকাশ রশ্মিপথে এ উষায় দেবকন্যাগণ,
চকিতে মোদের নেত্রে লেপিয়াছে নির্ম্মল অঞ্জন ;
আজ হেরিতেছি তাই—চারিদিকে, অন্তরে বাহিরে,
রাজার প্রাসাদশিরে দরিদ্রের বিজন কুটিরে,
অন্নপূর্ণা জননীর

অভয় মঙ্গলরাশি
ধনধান্যে পরিপূর্ণ—প্রাঙ্গণ শ্যামল ;
প্রাণে প্রাণে তাই এত আসিয়াছে বল !

জননী আমার !
তব শিবতরা মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে জাগি ;
কাঁদিছে কাঁদিছে আজি পুত্রকন্যা তব স্তন্য লাগি ;
তোমারি কুটির দ্বারে ফিরিয়াছে সন্তান সকল,
হে মোর তাপসী দেবি ! বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল
মোদের লইয়া বুকে

প্রাণের ধমনী শত
পূর্ণ কর, পুষ্ট কর দিয়ে স্তন্যধার ;
হে অভয়া, হে শঙ্করি ! জননী আমার !
আজি হ'তে প্রাণপদ্ম তব পদে দিনু পুষ্পাঞ্জলি ;
তুমিই জননী ধাত্রী কাম্যপথে তুমিই সকলি।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

পূর্ব্ববঙ্গে, এই বাকলা প্রদেশ অবস্থিত। এককালে দ্বাদশ ভৌমিকদিগের অন্যতম প্রবলপ্রতাপ মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এই বাকলার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে বিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়া, অতুল গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। এখন আর সে রাজত্ব নাই, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ কালস্রোতের মহা ভীষণ আবর্ত্তে ধীরে ধীরে বিলীন হইতেছে।

বাকলা।

এখন যাহা আছে, তাহা অনন্ত কালসাগরের হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মাত্র। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, বাকলার অধিকাংশ স্থান লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই আজ এই ভারতের যে সমস্ত আর্য্যকীর্ত্তি পুরাণাদিতে যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই অসম্বদ্ধ, এবং বর্ত্তমান পণ্ডিত সমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত; তাই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-আলোচনাসম্বন্ধে তাদৃশ যত্নবান্ নহেন।

প্রকৃত পক্ষে, বিশেষ গবেষণা করিলে আমাদের পুরাণে, লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

যতগুলি পুরাণ আছে তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে তৎকালীন ভারতের অনেক নূতন তত্ত্ব ও ইতিহাস বিশদ্‌রূপে দেখিতে পাই। আমাদের এই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রাচীন তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহা আলোচনা

করা যাক্। গদাপর্ব্বে ভগবান্ বলরামের তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে। পুরাণ, বলরামকে মদ্যপায়ী এবং ক্রোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; মদোন্মত্তাবস্থায় তিনি জনৈক মুনির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাকে ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় এবং পরিশেষে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক্ যে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম কোথায়। আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাই যে, গঙ্গা নিম্নবঙ্গমধ্যে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম লইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন; বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানের নাম শতমুখী তাহার নিম্নভূমী অধিকাংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত।

বাখরগঞ্জের দক্ষিণ ও পূর্ব্বসীমায় এখনও নিবিড় অরণ্য বর্ত্তমান। তথায় নদী এবং শাখানদী অসংখ্য; এই সমস্ত নদী গঙ্গাস্রোত হইতে উদ্ভূত। আমাদের এই দেশের নদীগুলিকে প্রচলিত ভাষায় প্রায় "গাঙ্" বলা হয়; "গাঙ্" গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। দক্ষিণ সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গা গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম যে ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই; এবং এ তীর্থস্থানটী যে জলময় তাহাও নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ ভগবান হলায়ুধ প্রাচীন বাকৃলার পূর্ব্ব-দক্ষিণসীমায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন।*

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, যে ভগবতী গঙ্গাদেবী সাগরসঙ্গমে আসিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়া-

* বর্ত্তমানে কিন্তু গঙ্গাসাগরতীর্থ ২৪ পরগণায়। যে স্থানের কথা আমরা লিখিতেছি, তাহা এখনও গভীর অরণ্যাণীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু তথায় যে পুরাকালে জনপদ ছিল, তাহার বহু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

ছিলেন। বাথরগঞ্জের দক্ষিণসীমাস্থিত বর্ত্তমান বঙ্গসাগরের একস্থান অতলস্পর্শ।* ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে গঙ্গা এই স্থানেই পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে স্থানের নাম এবং অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই; তথাপি পুরাণ-বর্ণিত স্থানবিশেষ এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গার পাতালপ্রবেশস্থানই শাস্ত্রোক্ত গঙ্গাসাগরতীর্থ; বর্ত্তমান সময়ে ঐস্থান বাথরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ পুরাকালে ইহাই সাগরসঙ্গমতীর্থ বলিয়া খ্যাত ছিল। পরিশেষে নৈসর্গিক কারণে স্থানবিপর্য্যয় হওয়াও অসম্ভব নহে।

মহাভারতের স্থানে স্থানে আমরা "বঙ্গরাজ" এবং "বঙ্গদেশের" উল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয়পর্ব্বাধ্যায়ে বঙ্গদেশের বর্ণনা অধিকভাবে আছে। রাজসূয়যজ্ঞকালে পাণ্ডবগণ যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, সকল স্থানেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যম-পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন, মগধজয়ান্তে তৎপূর্ব্বেস্থিত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্যবর্গ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া করগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সভাপর্ব্বের সেই শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

"উজোবল বৃতোবীরা বুজৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুম্মানামাধিপঞ্চৈব যেচ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগনাংশ্চৈব বিজিগ্যেভরতর্ষভঃ॥

* ইংরেজিতে ইহাকে Swatch of No Ground বলে।

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥
সসর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতিন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানিচ॥"

(অনুবাদ)

এই দুই পরাক্রান্ত রাজাদের (পৌণ্ড্রাধিপতি ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী রাজা) সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন; এবং মহীপতি, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কর্ব্বটাধিপতি, সুমনাধিপতি নরপালকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্ব্বত্র হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া সাগরতীরবাসী (জলপ্রধান দেশবাসী) সমস্ত ম্লেচ্ছরাজগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধন, রত্ন এবং কর সংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে (ব্রহ্মপুত্রনদসমীপবর্ত্তী দেশ) উপস্থিত হইলেন।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে সমুদ্রের তীরবর্ত্তীস্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। বাকলার দক্ষিণসীমায় যে সমুদ্র আছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনেক স্থান জনমানবশূন্য অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ হইলেও পুরাকালে যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাক্, যে এই স্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল কিনা। সংস্কৃত অভিধানে আমরা দেখিতে পাই ম্লেচ্ছশব্দের অর্থ, যবন, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; এবং যাহারা অপভাষী, পাপরত এবং সর্ব্বধর্ম্মরহিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন তাহাদেরও ম্লেচ্ছ বুঝায়। আবার ম্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ আভিধানিক ভরত বলিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানাং যস্মিন দেশে নবিদ্যতে
ম্লেচ্ছদেশঃ সবিজ্ঞেয়ঃ আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরমিতি॥

যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসীগণ শিষ্টাচাররহিত এবং অসংস্কৃতভাষী অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই ম্লেচ্ছদেশ।

এসিয়াটিক সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী-সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তৎকালে এবং তৎপূর্ব্বেও তথায় নীচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল; তাহাদের লোকে "চণ্ড-ভণ্ড" বলিত। প্রতাপবাবু, এই চণ্ডভণ্ডদের মলঙ্গী, অর্থাৎ যাহারা লবণের জ্বাল দেয় তাহাদের বুঝায় এরূপ বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক লোকের মলঙ্গীপদবী দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান। পুরাকালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লবণের জ্বাল দিত বলিয়া তাহারা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মলঙ্গীউপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চণ্ডাল, অথবা বর্ত্তমানকালের নমস্শূদ্র জাতীয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন মুসলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই চণ্ড-ভণ্ডজাতির উল্লেখ আরও পাইয়াছি।* বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুত্র মহারাজা কেশবসেন প্রদত্ত এক

* There lived in this part of Bengal (Backergunge), a semi barbarous tribe, named Chanda-Bhanda, very similar to the Molongis or Salt Manufactures of the present day. Their condition was little better than slaves. In a Copper Plate Inscreption, found in Lot No 55, of Hodge's Map near Buckergunge, Madhab, evidently a brother to Keshub Sen, of the Sen Rajas of Bengal, made a grant of some villages to a Bramhin. With the villages, the king conferred on the receipient the right of punishing and employing the Chanda-Bhanda, a tribe that inhabited the place. This tribe, I belive, gave the name of the unculivated portion of the Delta, which they occupied.

Asiatic Society's Journal.
Paper on Sunderban by
PRATAP CHANDRA GHOSH.

তাম্রলিপিতে এই চণ্ড-ভণ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই তাম্রশাসনের কথা পরে বলিতেছি।

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তাহার কতক আভাষ এই তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহারা যথেচ্ছাচারী এবং দেবতা-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিল; তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা ব্রহ্মোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন মহাভারত বর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসন লিখিত "চণ্ড-ভণ্ড" এবং মলঙ্গী উপাধিধারী "চণ্ডাল" একজাতীয় কিনা, তাহা আলোচনা করা যাক্। অভিধানকার ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ "কিরাত এবং শবর" বলিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে শবর ব্যবহৃত দেখিয়াছি। ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শবর-ব্যবসা, চণ্ডালগণের জাতীয় উপজীবিকা। মাংস-আহার এবং মদ্যপান হেতু, তাহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তেজিত; সুতরাং সামান্য কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকে না; এই জন্যই সম্ভবতঃ তাহাদের নাম চণ্ডাল (চণ্ড্+অল্) অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, শিষ্টতা প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের যাহা অকরণীয়, চণ্ডালগণের তাহাই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।

এই সমস্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অন্য স্থানে বাস করিত তাহা মহাভারত এবং তাম্রশাসন হইতেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে তাহারা বাস করিত; এবং আবশ্যকমত তত্তীর-ব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। আবার কখন কখনও

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতাও করিত। বর্ত্তমান সময়ের চণ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচারব্যবহারসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও অনেকে, উদ্ধত, ক্রিয়াকাণ্ডবর্জ্জিত দুশ্চরিত্র এবং ধর্ম্মাচরণরহিত। এই জন্য, বোধ হয় যে, পুরাণবর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসনলিখিত চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্ত্তমান চণ্ডাল একই জাতি, তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণসীমাব্যাপী বঙ্গসাগরতীরে যে সুন্দরবন পরিলক্ষিত হয় পুরাকালে ঐ স্থানেই ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। এই সুন্দরবন সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পরে বলিতেছি।

মহাভারতোক্ত এক "তাম্রলিপ্তি" ব্যতীত আর কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া এখন দুরূহ। হয়ত বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে, আবার অনেক স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়াও একান্ত সম্ভব। কেননা ভূমিবৃদ্ধি এবং ভূমি-ক্ষয় সমুদ্রের এ উভয় শক্তিই বর্ত্তমান আছে।

তাম্রলিপ্তি (অধুনা তমলুকের) নিকট হইতে সমুদ্র এখন অনেক দূরে গমন করিয়াছে। মহাভারতের সময়, তমলুকের পার্শ্বেই সাগর ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া সফেণতরঙ্গরাশি তদুপকূলে প্রতিহত করিত।

ভগবান পরশুরাম মাতৃহত্যাপাপক্ষালনার্থ, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা পুরাণে দেখিতে পাই। অশোকাষ্টমী তিথিতে যে স্থানে সকলে তীর্থস্নান করেন প্রাচীন বাক্‌লার সীমা তাহা হইতেও পূর্ব্বদিকে ছিল।

পূতসলিলা জাহ্নবী এবং দেব-নদ ব্রহ্মপুত্র এখনও অতীতের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

প্রথিতনামা চীন পরিব্রাজকের* "ভারত ভ্রমণে" আমরা বাক্‌লার উল্লেখ দেখিতে পাই। তখন বাক্‌লা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। উক্ত মহাত্মা পরিব্রাজক প্রায় দশ বৎসর কাল এই দেশে ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ৬৩৬ হইতে ৬৪৬ অব্দ অবধি ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হুয়েনসান † বাক্‌লায় আসেন নাই। তৎকালে বাক্‌লার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। পরিব্রাজকমহাশয় উপযুক্ত নৌ-যানে জলপথে কামরূপ গিয়াছিলেন বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বাহিয়া কামরূপে গিয়াছিলেন, না অন্য কোন পথে গিয়াছিলেন তাহা কিছুই জানা যায় নাই; তৎকালে বাঙ্গালা দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ দস্যু-ভীতি ছিল। দেশী, বিদেশী দস্যু তখন বিনা বাধায় লুণ্ঠনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে হুয়েনসানের বাক্‌লায় না আসিবার তাহাই একটি কারণ; কেননা তিনি একবার দস্যুহস্তে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাক্‌লার প্রাচীনতত্ত্বসম্বন্ধে আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "ইণ্ডো এরিয়ান" নামক ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বিগত ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগণার রাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই ইদিলপুর বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের মধ্যে একটি বিখ্যাত পরগণা; এবং তথায় বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের বাস আছে।

এই তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে বর্ত্তমান আছে; এই তাম্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* Early Travels in India. † Elphenstone's History of India.

এই তাম্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট এক দেবমূর্ত্তি! ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, ইহা মহাদেবের মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* এই মূর্ত্তির নীচে ভগবান সবিতৃদেবের স্তুতিবাচক একটি কবিতা এবং ভগবান চন্দ্রদেবের স্তুতিবাচক কয়েকটি শ্লোক। কেননা রাজা কেশবসেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশেই উৎপন্ন। প্রথমে বিজয়সেন নামা রাজার কথা লেখা আছে। তিনি তৎকালীন সমস্ত রাজাপেক্ষা বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ। তৎপুত্র বল্লালসেন যাঁহার শুভ্র যশে দিঙ্‌মণ্ডল বিভাষিত। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন। ইনি যেমন ধার্ম্মিক, তেমন বীর ছিলেন; তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক স্থানে বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছেন। ইনি জগন্নাথতীর্থে, গদাপানি এবং মুষলধর বিগ্রহের সম্মুখে, কাশীধামের নিম্নে প্রবাহিতা গঙ্গার সঙ্গে যে স্থানে অসি এবং বরুণা মিশ্রিত হইয়াছেন, সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ধামে (কাশী) এবং ত্রিবেণীর তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলনস্থান) অনেকগুলি দেবভবন এবং চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন. এই ত্রিবেণীতে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা, সর্ব্ব প্রথমে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নরপতি লক্ষ্মণসেন স্বীয় ধর্ম্মপত্নী মহারাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। এই কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি এবং নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন। সেই মহারাজ কেশবসেন, তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে বনমালী শর্ম্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বাগুতি† (Bagutte) এবং বেতগাতা (Bettagutta) নামক গ্রামদ্বয় ব্রহ্মত্তর দান করিলে তিনি চণ্ডভণ্ডদিগকে শাসন করিয়া

* See Indo-Aryans, vol. II. Page 236

† বাঘাদি নামে একগ্রাম ইদিলপুরে আছে সম্ভবতঃ ইহাই বাগুতি, কিন্তু বেতগাত্তার কোন সন্ধান পাইলাম না।

এই ব্রহ্মত্তর ভোগ করিবেন। এখন প্রকৃত তাম্রশাসনের লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বৈধ দেখা যায়; তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে বাগুতি ও বেতগাতা গ্রাম মূল তাম্রশাসনে লতা এবং টগড়াঘাট বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমরা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

১। বন্দেহর বিন্দ বন বান্ধবমন্ধকার কারা নিবদ্ধ
ভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তং।
পর্য্যায় বিস্তৃত সিতাসিত পক্ষযুগ্মমুদ্যন্তমদ্ভুত খগং
নিগম ক্রমস্য ॥

২। পর্য্যন্ত স্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্বিমুদ্রীভবন্
মুক্তাকুদ্মলমর্দ্ধমম্বর নদীবন্যা বনদ্ধং লভঃ।
উদ্ভিন্ন স্মিতমঞ্জরীঃ পরিচিতা দিকামিনীং কল্পয়ন্
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়ক যশোজন্মান্তরশ্চন্দ্রমা ॥

৩। এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহ শিরোদর্ব্বীকর গ্রামণী
বিক্রমোৎসব দান দীক্ষিত ভুজাস্তে ভুভু জো জজ্ঞিরে।
যেষাম প্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দ্য সান্দ্র পুলকৈর্ব্যাপ্ত সদস্যৈর্দিশঃ ॥

৪। অবাতর দথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদজ্ঘ্রি নখধোর নিস্ফুরিত মৌল যষ্মাভুজাং
দশাস্য নতি বিভ্রমং (অস্পষ্টং)

৫। নীলাম্ভোরুহ সোদরোপি দল যন্মর্ম্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপ স্নিগ্ধোপিতম্বন্ভয়ং।
নির্নিক্তাঞ্জন সন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্র ক্লমং বৈরিণাং
যস্যাশেষ জনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি ॥

৬। ভাস্বন্নিস্ত্রিংশ নিদ্রা বিরহ বিলসিতৈর্ব্বৈরি ভুপাল বংশ্যা-
মুচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধিভুবমখিলাং শাসতোযস্য রাজ্ঞ
আসীত্তেজো জিগীষা সহ দিবস করে নৈব দোষ্ণস্তুলাভু-
ত্তদ্রে রাশীবিষালামজনিদিগধিপৈরেব সীম্নোর্ব্বিবাদঃ॥

৭। খেলৎখড়্গা লতাপ মার্জ্জন হৃত প্রত্যর্থি দর্প জ্বর
স্তস্মাদ প্রতিমল্ল কীর্ত্তির ভরদ্বল্লাল সেনোনৃপঃ
যস্যাযোধন সীম্নি শোণিত সবিন্দুঃ সঞ্চারা যাংহৃতাঃ
সংসক্ত দ্বিপদন্ত দণ্ড শিবিকা মারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ॥

৮। শ্রীকান্তোপিন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্য ক্ষত্রং
বক্তুং নেত্য পটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্ত দোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপিন জিহ্মগৈঃ পরিবৃত স্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত
স্তস্মাল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি রভূদ্ভুলোক কল্পদ্রুমঃ॥

৯। প্রত্যূষে নিগড় স্বরৈ নিয়মিত প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপান মুক্ত করভ প্রোদ্দোল ঘণ্টারবৈঃ।
সায়ংবেশ বিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীর মঞ্জু স্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনাবন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যংলভঃ॥

১০। নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতি না সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ বৈধব্য কৃত্যব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ॥

১১। নগগন তল এব শীত রশ্মির্ন
কনক ভূধর এব কল্পশাখী।
নবিবুধপুর এব দেব রাজো
বলিসতি যত্র ধরাবত ভাজী॥

১২। বাহূ বারণ হস্ত কান্ত সদৃশৌ বক্ষঃ শিলা সংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈ তাং সমরাঙ্গণে প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কোজানাতি কুতঃ কুতোন বহুধাচক্রেঽনুরূপোরিপুঃ॥

১৩। বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে র্মুষলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎ সঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজ পূতে
যেনো চৈচর্যজ্ঞ যূপৌ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥

১৪। যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণির ভবদ্বেধা সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্ব্বিশ্বং যযালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীভূ র্যপি বাঞ্ছিতা নিবিদধে যস্যা সপত্নৌ মহা-
রাজ্ঞীশ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূত্রিবর্গোচিতা॥

১৫। এতাভ্যাং শশিশেখর গিরিজাভ্যা মিববভূব শক্তিধরঃ
শ্রীকেশবসেন দেবোঽপ্রতিম ভূপাল মুকুটমণিঃ॥

১৬। দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাংপয়ঃ
পাত্রৈ লৌহময়ৈর্হিরণ্য পদবীপ্রাপ্তাপিকো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
ষৎপাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যান্তান্যয়োবর্ণতাং॥

১৭। আকৌমারমপার সঙ্গর ভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ—
শ্রান্তস্যাস্য নিশম্যবীর পরিষদ্বন্দ্যাপদো বিক্রমং
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহার চকিতৈর্দ্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতি ভূপ নিবহৈর্ভ্রাম্যদ্ভিরে বাস্যতে॥

১৮। আকর্ণাঞ্চল মেলকার বিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানান্তঃ কণগর্ভ দর্ভকল নৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধ বিসারণৈঃ পরিষদিত্রস্যৎ কুরঙ্গী দৃশা
মব্যাপার সুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎকরঃ॥

১৯। তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলি তেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ
নীরন্ধ্রে ব নভস্তচী মরকতৈঃ কণ্ঠাভুবঃ স্মারুহঃ
নীলগ্রীব কদম্বকৈ রবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞ হুত ভুগ্ধু মাবলী খেলতি।

২০। কল্পস্মারুহ কাননানি কনকক্ষ্মা ভৃদ্বিভাগান্নি ধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণিচ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎপাদ পয়োধর প্রণয়িনীচ্ছায়া বিতানাঞ্চলে
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্র বিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ।

২১। কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিত লোক্পালাবলী
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধন জৈত্র যাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবী মিমাং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণী
সগন্ধপবনান্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রোনৃপঃ ॥

২২। পদ্মালয়েতি যাখ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্রয়ে।
সরস্বত্য পিতাং লেভে যদান ন কৃতালয়া।

২৩। আরুহ্যাভ্রং লিহ গৃহ শিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং
পশ্যন্তীভিঃ পুরি বিহরতঃ পৌরসীমন্তিনী ভিঃ।
বার্ত্তাকুতৈর্নয়ন চলিতৈ বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণ বিঘটিতঃ প্রেমবদ্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥

২৪। এতনোন্নত বেশ্ম সঙ্কটভুজ স্রোতস্বতী সৈকত
ক্রীড়া লোল মরাল কোমল কণৎকাণ প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যা দধিরে মহীমথবতানেক প্রতিষ্ঠাভূতা
পার ক্রমশালী শালি সরল ক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ ॥
ইহখলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধা বারাৎ সমস্তস
প্রসস্ত্যাপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়
সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত স প্রশস্ত্য পেত অরিরাজ
সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লাল সেন পাদানু

ধ্যাত সমস্ত সপ্রস্ত্য পেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর
গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন পাদানুব্যাত সমস্ত
সপ্রশস্ত্য পেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি
রাজাত্রয়াধিপতি সেনকুল কমল বিকাশ
ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নু দানকর্ণ
সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র-
পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমশৌর
মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর
গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেন দেব পাদা
বিজয়িনঃ সমুপাগতা শেষরাজ রাজন্যক
রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্যমহা
পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসন্ধি বিগ্রহিক
মহা সেনাপতি মহাদৌঃ সাধিক চৌরো
দ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষা জীবিকা
দিব্যাপৃত গৌল্মীক দণ্ডপাশিক, দণ্ড
নায়ক নেয়গ পত্যাদী ন ন্যাংশ্চ সকল
রাজ্যাধিপ জীবিনোহ অধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ
চট্টভট্ট জাতিযান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ
যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিশ্চ।
বিদিত মস্তু ভবতাং ॥ যথা—
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পতি বঙ্গে বিক্রম
পূরভাগ প্রদেশে প্রশস্তলতা টঘড়া ঘাটকে
পূর্ব্বে সত্রকাধি গ্রাম সীমা, দক্ষিণে
শাঙ্কর বসা গোবিন্দ বনান্তর্ভূঃ সীমা
পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাভ্যয় সর
গ্রামসীমা, উত্তরে বাগুলীপ্তি গাতাত্তদ্য
মানভূঃ সীমা ইত্থং যথা প্রসিদ্ধ সসীমা
বচ্ছিন্ন বৃহন্নৃপতি চরণৈঃ শুভবর্ষ বৃদ্ধো দীর্ঘা

যুষ্ঠ কামনয়া সমুৎসর্গীতা, সচ্ছায়োৎ
পত্তিকা সাচ ভূমিঃ সগর্ত্তৌ ষরা
সজল স্থলখিল পলাশ গুবাক নারিকেল
চণ্ড-ভণ্ড প্রদেশাবতির্মন্তা আচন্দ্রার্ক
ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎসজল
নানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক
নারিকেলাদিকং লগ্‌গায়িত্বা পুত্র
পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপ
ভোগে লোপ ভোক্তুং। বাৎস্য সগোত্রস্য
ভার্গ চ্যবন আপ্লুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য
পঞ্চ প্রবরস্য পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্র
পৌত্রায়, বাৎস্য সগোত্রস্য, তথা পঞ্চ
প্রবরস্য গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
বাৎস্য সগোত্রস্য তথাপঞ্চ প্রবরস্য
বনমালীর্দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য
সগোত্রায়, ভার্গ্য, চ্যবণ, আপ্লুবৎ, ঔর্ব্ব
জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতি পাঠকায়
শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদা
শিবমুদ্রয়ামুদ্রয়িত্বা দ্বুতীয়াকীয়
জ্যৈষ্ঠা দিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন
চণ্ড-ভণ্ড দণ্ডা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা
যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমির্হি। ৩০০
যন্তবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং।
ভাবিভির্নৃপতিভিরপহরণে নরকপাত
ভয়াৎপালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়াঃ
ভবন্তি ; চাত্রধর্ম্মানুসংশিনঃ শ্লোকাঃ
"আস্ফোটধন্তি পিতরোবর্ণয়ন্তি পিতামহা
ভূমিদোঽস্মৎ কুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি
উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিণৌ
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভি সগরাদিভিঃ
যস্য যস্য যদাভূমি তস্য তস্য তদাফলম্।
সদত্তাংপরদত্তাংবা যোহরেত্ত্ বসুন্ধরান্
সবিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রানি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ
আক্ষেপ্তাচারমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ।
সর্ব্বেষামেবদানানামেক জন্মানুগং ফলং॥"

ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয় মনুচিন্ত্য
মনুষ্য জীবিতঞ্চ সকলমুদাহৃতঞ্চ
বুদ্ধ্যানহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা।
সচির শতমৌলিলানিত পদাম্বুজস্য
নুশাসনভূতঃ শ্রীযুত দত্তোদ্ভব গৌড়মহা
ভট্টকখ্যাত শ্রীমৎ মহনাকরণনিশ্রী
মহামদনক করণনি শ্রীমৎকরণনিসং।
ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিনে—

শ্রীরোহিনীকুমার সেনগুপ্ত।

ঘরের কথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সিজারের পরিত্যক্ত পদের জন্য চুনাগলি হইতে বিস্তর আবেদনকারী উপস্থিত হয়, কিন্তু বর্ণে অনেকটা মৃত সিজারের সাদৃশ্য থাকায় ও মেষলোম-লাঞ্ছিত কেশগুচ্ছাবলীর কল্যাণে জোসেফ ব্যারেগাই মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতনে উক্ত কর্ম্মে ব্রতী হয়েন। দুর্ভাগ্যের ন্যায় সৌভাগ্যদেবীও সখিদলসঙ্গে মানব অদৃষ্টের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে অবতীর্ণা হয়েন। জো ব্যারেগার যদি চাকরী হইল, তবে কিছুদিন পরেই বিবাহও হইল। আবার বিবাহ বলিয়া বিবাহ নয়, জোর অদৃষ্টে অতি পরিপাটী চমৎকার মেম সাহেব জুটিল।

সোফি সুন্দরী নয়, কিন্তু সুশ্রী। কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন ছিপ্ ছিপে; যৌবনের পূর্ণতায় যেন নবপত্রাবলীসুশোভিত বাসন্তী লতার ন্যায়, দল্-দল্, লক্-লক্ করিতেছে। সোফি শ্যামাঙ্গিনী; কিন্তু সে মন-মোহন শ্যাম-বরণ কাঞ্চন বা তুষার বর্ণাপেক্ষা শতগুণ সুন্দর, সহস্র গুণ মুগ্ধকর। সোফি নিজে তাহা বুঝিত; তাই সে পাউডার কিনিত না, রুজ চিনিত না। সোফির গর্ব্ব ছিল, যে তাহার মুটি-ভোর কটী খানি কর্সেটের দাসত্ব করে না। লক্কা পায়রার মত তাহার কোমলে-কঠিন বক্ষ স্বতঃই উন্নত, স্ফীত হইয়া থাকে। কিন্তু সোফির সার্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার কেশরাশির ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বিপুল ছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত, রেশমাপেক্ষা কোমল ও উজ্জ্বল, এলায়িত কেশরাশি যেন সোফির সিঁথিখানি চিত্রাকারে বেষ্টন করিয়া প্রতিমার চালের ন্যায় সুঠাম পৃষ্ঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া থাকিত। সিঁথির দুই ধারে দুইটী কুঞ্চিত ফণা অঙ্গুরী-আকারে

...ং নম্র হইয়া যেন সুচিত্র ললাটখানির মোহিনী ছটায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিত। যখন উষার স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে সেই শ্যামা কেশরাশি তরঙ্গ তুলিয়া দুলিত, তখন চুলের বিমল পরিমলে আকাশ ভাসাইয়া দিত। আহা, যে সে চুল দেখিয়াছে, ছুঁইয়াছে, দুই কর ভরিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, আপনার চুলে, চিবুকে, বুকে স্পর্শ করাইয়া শিহরিয়াছে, চুল চুয়া পরিমলে মাতাল হইয়াছে, তাহারই জীবন—কি আর বলিব! আর ছিল, আমাদের সোফির চক্ষু। ভুরু দুটী যেন আঁকা, তার কোলে ঘন কালপাখা পাতলা পাতায় ঝালর দেওয়া, তার আড়ালে যুগল কাল তারা। সোফি কখন চক্ষে কাজল দিত না; কিন্তু দেখিলেই বোধ হইত যে, অতি সুন্দর কজ্জল-লেখায় সে চক্ষু-যুগল স্বতঃ উদ্ভাসিত। সমুজ্জ্বল তারা দুটী যেন সুনীল সফরীর ন্যায় তাহাগের শান্ত সলিলে সতত চঞ্চলভাবে খেলা করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দৃষ্টিতে কষ্ট-কটাক্ষপাত নাই; কিন্তু প্রতি চাহনিই যেন এক একটী মর্ম্মস্পর্শী কটাক্ষ। সে চক্ষে কি তাপ, কি তেজ, কি ব্যাকুলতা, কি বিহ্বলতা, কি বিলাস, কি বিভ্রম, কি আলস্য, কি লালসা, কি আবেগ, কি আবেশ! সে চোখ কি চায়, কাকে চায়, কেন চায়, ছল্ ছল্ ক'রে কি বলিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, কেমন করিয়া বলিব? সে চক্ষু হাসিলে কাঁদে, কাঁদিলে হাসে। সে চাহনি যেন ভালবাসার মধুতে ঢল্ ঢল্ করিয়া জগৎ সংসারে কোন অনুরাগের হারান ধন খুঁজিয়া বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছে। সোফির সেই কুসুম-কোমল বিদ্যুদ্দীপ্তিপূর্ণ সুনীল নয়ন-...লে বায়রণের আবেগ, সেলির স্বপ্ন, জয়দেবের অমৃতময় অনুরাগের ...লীঝঙ্কার, বিদ্যাপতির গোপ-বধূ-নয়নজলপ্লাবিত যমুনালহরী, চকিত চাহনিতে সোহাগের সহস্র ভাবের ফুলের ফোয়ারা খুলিয়া দেয় ... চক্ষু, তাহার বর্ণনা কেমন করিয়া করিব? অনুভব করিলেও

কি যে অনুভব করিতেছি ঠিক বুঝা যায় না ; প্রাণের ভিতর যেন স উদাস করিয়া দিয়া, একটা ভাষাহীন গান, একটা রবহীন সুর বসিয়া, কাঁদিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়ায়। আমি যদি বৈজ্ঞানিক হইতাম, তবে হয়ত বলিতাম, সোফির চক্ষুদুটী তরলতড়িতপূরিত স্ফটিকপাত্রযুগল। তাই তাহার দীপ্তি, ব্যোমতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া হৃদয়ের রক্ত, তুমুল আন্দোলনে উথলিয়া দেয় ; তাই তাহার অঙ্গুলি মাত্র স্পর্শে পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশশেষ পর্য্যন্ত সচকিতে শিহরিয়া সুখের কাতরতায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে ; তাই সেই স্নান-ধৌত স্ফীত চাঁচর চিকুরের সান্ধ্যসমীরণসন্তরিত একটী মাত্র কেশও অঙ্গে আসিয়া পড়িলে, শরীরের সূক্ষ্মাভ্যন্তর পর্য্যন্ত হর্ষের পীড়নে রি-রি করিয়া উঠে ও বাহ্য চৈতন্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসে।

এই সোফি আবার সেই সৌন্দর্য্য সাজাইতে জানিত। বনে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু বনকে বাগান করিয়া তুলিলে, তার আর এক মধুর রমণীয়তা হয়। ফুল, গাছে গাছে ফুটিয়া, ডালে ডালে দুলিয়া রূপ ছড়ায় বটে, কিন্তু সেও জানে যে, সাজিলে তাকে আরও মানায়, তাই সে পাঁচটী অফোটা, দুইটী আধ-ফোটা কলির মাঝে গিয়া ফুটিয়া উঠে। কচি কচি সবুজ পাতাভরা নবীন শাখাটী বাছিয়া লইয়া, তার উপর ঘোমটা খুলিয়া নাচিতে থাকে। কোথাও বা ঘন পত্রদলমাঝে স্তবক বাঁধিয়া মালাকরকে তোড়া গড়িতে শিখায়। আবার কখন কলা-বিলাসিনী যুবতীর চম্পক-কলি-অঙ্গুলি হেলনে, হাররূপ ধরিয়া তার কবরীকুণ্ডল ঘিরিয়া বিহার করে। যুবতীকে সাজায় আপনি সাজে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জগদীশ্বর মানবকে আপনার অংশ দিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেই পরম সুন্দরের সুন্দর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করিবার ভার মানবের উপর

যেমন কোন মহাকবির মহাকাব্যের অংশ হইতে, অংশান্তর বাছিয়া লইয়া মন্দ কবিযশপ্রার্থীগণ নব নব কবিত্বের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, তেমনি সেই প্রেমময় নটবর জগৎ-কবির এই ভাবময় সুষমাপূর্ণ বিশ্ব-কাব্যের প্রতি চরণ হইতে, উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানব সংখ্যাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে ; সৃষ্ট পদার্থবিশেষকে সৃষ্ট পদার্থান্তরের সুচারুসহযোগে অলঙ্কৃত করিতে পারে। দেহমন-সম্পন্ন মানবকে সমগ্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের সারভূত বলিয়া মানব গর্ব্ব করিয়া থাকে। সুতরাং এই ভগবদ্দত্ত দেহমনকে মাজিয়া ঘসিয়া রূপ তুলিয়া, বসনভূষণ দিয়া অলঙ্কৃত করা প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য পালনীয় প্রথম কর্ত্তব্য। মনকে মলীনতা মাথাইয়া উলঙ্গ, নিরলঙ্কৃত রাখিলে, মানব যেমন মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া, ইতর পশুত্ব, পূতিময় প্রেতত্বের সুদূর নিম্নস্তরে পতিত হয় ; তেমনি পরমাত্মার লীলাক্ষেত্র হরিমন্দিরস্বরূপ এই দেহকেও অবহেলা করিয়া মলামাটি মাথা ব্যাধি-বিকার-আধার করিয়া রাখিলে, ইহার স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবের শ্রীবর্দ্ধন না করিলে, মানবত্বের উন্নতির স্ফূর্ত্তি হয়না।

দেহের সহিত মনের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর্য্যঋষিগণ তাহা বিলক্ষণ রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একের অবনতিতে অপরের অধোগতি, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্য, এবং উভয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তিতে আত্মার ঐশ্বর্য্যবিকাশ। সেই জন্যই এত স্নানাহ্নিকের ধুম, এত সঞ্জম উপবাসের নিয়ম, এত খাদ্যাখাদ্যের বিচার, বেশভূষারও এত বাঁধাধরা বন্দোবস্ত। সনাতন শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায়—প্রতি গ্রন্থ প্রতি অনুশাসন, প্রতি শ্লোকের সারার্থ—মুখ্য উদ্দেশ্য, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন।

যখন কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা সৌন্দর্য্য

উপলব্ধি করিতে, সুন্দরের আদর, সুন্দরের পূজা করিতে শিক্ষা করে। একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণ সেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া কবিতার স্বর্গীয় সুধারসে বসুমতী প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। জড়জগতে, জীবরাজ্যে, উদ্ভিদ্‌-উদ্যানে সলিলসম্ভারে, নক্ষত্রনিকরে, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের ঘটাছটা দেখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তাকে সুন্দরের সুন্দর পরম সুন্দররূপে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বুঝিয়াই সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে শিখিয়া, সূর্য্য সোম, বহ্নি, বৃক্ষ, গিরি, নদী প্রভৃতিকে দেবসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া কুসুমচন্দনে কবিতাময় স্তুতিগানে ইহাদের পূজা করিতেন। সুন্দরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া শ্যামসুন্দরের শিরে শিখিপাখা, গলায় বনমালা, কণ্ঠে কৌস্তুভ রতন; তাই শ্মশানবিহারী রজতবরণ, নীলকণ্ঠ ও ফণিফণা ভূষিত, ভালে শশী শোভিত, বক্ষে অক্ষমালা বিরাজিত, অপূর্ব্ব সুন্দর যোগী। সেই জন্যই জগজ্জননীর কাঞ্চন-কমল-লাঞ্ছিত অঙ্গে এত অলঙ্কার, শ্রীচরণে এত জবা চন্দন, মন্দিরে এত ধূপ দীপ।

সেই মহিমাময় আর্য্য-জাতি চলিয়া গিয়াছেন, সেই মনোরম-কান্তি, হিরণ্ময়-হৃদয় পূর্ব্বপুরুষগণ, পরমসুন্দর পুরুষোত্তমের চরণে মিলিত হইয়াছেন। কর্ত্তিত শস্য ভারতক্ষেত্রে আমরা কতকগুলা আবর্জ্জনা মাত্র পড়িয়া আছি। খনির কহিনুর রাজগৃহে গিয়াছে, শূন্য গহ্বরতল অন্ধকার করিয়া ক্ষার-অঙ্গার গড়াগড়ি যাইতেছে। সৌন্দর্য্যের আদর আমাদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছে। সুন্দরের অর্থই আমরা বিকৃত করিয়া লইয়াছি। প্রেমের পবিত্র পদে পাশব কামকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, রূপকে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী অপদেবতার সুরাপাত্র-বাহিনী সেবিকার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছি। সুতরাং মিতাচারী লোকের নিকট রূপ-চর্চ্চা এক প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এই প্রকারেই নৃত্যগীতাদি স্বর্গীয় কলাও ভদ্র পরিবারের পরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোভ ও মাৎসর্য্য আসিয়া সময়ে সময়ে সৌন্দর্য্য পূজার নামে আমাদের সেবা লইয়া থাকে। জ্ঞানশিক্ষাতে অলঙ্কারের যথাযথ বিন্যাসদ্বারা মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া, আমরা পুরুষ জাতি যেমন গ্রন্থগত সূত্র, বচনের রাশিকৃত ভারে মনের স্বাস্থ্য ও শ্রীহরণপূর্ব্বক, তাহাকে বিকৃত, দুর্ব্বল ও অবশ করিয়া পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছি; আমাদের মহিলাগণও তদ্রূপ শরীরের লাবণ্য বা সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, স্বর্ণকার বিপণি-শোভা খচিত রজতকাঞ্চনস্তূপে তাঁহাদিগের সুকোমল দেহগুলিকে ভারাক্রান্ত বিকৃতশ্রী, অপটু ও সাংঘাতিক প্রেমালিঙ্গনের উপযোগী করিয়া মাৎসর্য্যের পরিতৃপ্তি করিতেছেন।

ননীন্দ্র বাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে, তাঁহার পাণ্ডুর-মস্তিষ্কটী বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত বলটিং কাগজের ন্যায় এলজেব্রা, ট্রিগনমেট্রি, মিল, মেকলে, হক্সলি, স্পেন্সার প্রভৃতির মুদ্রিত পৃষ্ঠারাশির অস্পষ্ট প্রতিলিপিতে পরিপূর্ণ; তাঁহার সহধর্ম্মিণী ননীবালাকেও দেখিবেন, যেন সুন্দরীর ভুজমৃণালযুগলের সমস্ত অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাই বাছার বাহুমূল হইতে মণি-বন্ধ পর্য্যন্ত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলিচয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত হাত দুখানি সোণার পতর-রাশির সাহায্যে এক রকম করিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে; যেন উভয়পক্ষের প্রণয়-শৃঙ্খলাভাবের ক্ষতিপূরণার্থ সুন্দরীর কম্বুকণ্ঠ হীরামতিকাঞ্চনের শত শৃঙ্খলভাবে অবনত করা হইয়াছে। কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণকবরী, জরী, জাল, ফিতা, ফালি, ঝালর, কাঁটার আবরণে মনোহারীর পসরার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আর যেখানে সুচারু শ্রবণযুগল থাকার কথা, সেইখানে কাঞ্চনের করী-কর্ণ-দ্বয় দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে। অলঙ্কারের যাতনায়, সতর্কতার তাড়নায় শশীমুখীর শরীর আড়ষ্ট, বদন পীড়াক্লিষ্ট, শূল

ব্যথার পরিচায়ক। সুন্দরীর শরীরখানি হয় আকগাছটী, নয় চাল-কুমড়াটী; কোন ভাবেই সরুমোটা-খেলা সৌষ্ঠবের সম্পর্ক নাই।

আবার সৌন্দর্য্যের মুলোপকরণ স্বাস্থ্যের কথা যদি ধরা যায়, তবে, তাহার অভাব বা বিকারই বর্ত্তমানকালে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই সৌন্দর্য্য সৌকুমারত্ব ও সমৃদ্ধির নিদর্শন। অবলার যদি অম্বল, হিষ্টিরিয়া বা অন্য একটা রিয়া-টিয়া দেওয়া পীড়া না রহিল, তবে তাঁহার ভুজঙ্গিনী বেণী, কুরঙ্গিনী নয়ন, চন্দ্রমা বদন, জোছনা বরণ, মুক্তার সেলি কারচোপের কাঁচলি সকলই ব্যর্থ হইল। যুবতীর জন্য যদি বেতন-ভোগী ডাক্তার না রহিল; বাছা যদি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলেন তবে তাঁহার যৌবনেও ধিক, আর তাঁর স্বামীর কলেজের পাশ, তেতলায় বাস, কাছারীর শামলা, মক্কেলের মামলা, এ সকলেও শতধিক্!

বাবুদের বেলা বলিতে হইবে, যে শ্রীযুতের তেরখানি তালুক, তেত্রিশ লাখ টাকার কাগজ, তিপ্পান্ন খানি বাড়ী, তেরখানি গাড়ী, আর এই তিন বৎসরের ডাইয়েবেটিস। যখন শুনা যাইবে যে, অমুক মোহন অমুক মহাশয় জগদীশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত আহার্য্যেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন রসেই রুচি নাই, জল জীর্ণ হয় না, ছাগ-দুগ্ধের মাখনে দুইখানি মিছরীর বাতাসা ভাজিয়া, সায়াহ্নে পথ্য করেন; দুই কুক্ষিতে দুইটী থার্মোমিটার গুঁজিয়া এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয় দক্ষিণে, বামে দিবারাত্রি বসিয়া আছেন; হাকিম ও কবিরাজ প্রত্যেকে এক একখানি হস্ত লইয়া অবিরাম নাড়ী টিপিতেছেন আর দু'একখানি হস্ত থাকিলে গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য প্রভৃতিও প্রতিপালিত হইত। যখন, অপরাহ্ণ চারিটার সময়ই হিমের ভয়ে, বাবু ঘরের সমস্ত শাশী খড়খড়ি বন্ধ করিতে বলিয়া, গৃহতলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলনিকাশের পথগুলিতে ছেঁড়া মোজা গুঁজিয়া দিতে আজ্ঞা দেন; যখন দেখা যাইবে যে, দ্বাদশটী

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর্কফলা আস্ফালন করিয়া যজমানের আরোগ্য কামনায় অনবরত চণ্ডীপাঠে ভ্রম করিতেছেন;—তখনই স্থির বুঝা যাইবে যে, বাবুর ব্যাঙ্ক-বহিতে এইবার ক্রোর পূর্ণ হইয়াছে, চাঁদার খাতায় রাজাবাহাদুরের পূর্ণ মাশুল জমা পড়িয়াছে। যাঁহাদের উঠ্‌তির সময় তাঁহারাও দেখা-দেখি চিনি দেখা দিয়াছে বলিয়া, মৃদু হাস্যে বিষাদের আস্ফালন করেন। ছত্রধারী ভূপতির ন্যায় ডায়েবেটিস বিদ্বান ও ধনী উভয়কেই সমাদর করেন! আর মধ্যবিৎ ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে অম্বল বা ধাতুদৌর্ব্বল্যের দোহাই দিয়া, এক রকম তিলকাঞ্চনে কার্য্য সারিয়া লয়েন।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র।

কর্তৃপক্ষগণ পূর্ব্বে আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্য কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকে * [ভা]ল রকম করিয়াই দেখান হইয়াছে, যদিবা কাহারো তৎসত্ত্বেও কোন [স]ন্দেহ থ'কে, তবে বর্ত্তমান স্বদেশী-আন্দোলনে যেরূপ সাগ্রহ সহায়তা [পা]ওয়া গিয়াছে, লাট হইতে একজিকিউটিভ টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত যেরূপ [সহা]নুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অন্তত আশা করা [য]াইতে পারে যে, এ বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার এজন্মের মত ঘুচিয়া [গিয়া]ছে।

* Dutts' Economic History of British India.

সামদানদণ্ডভেদ ত সেকালের রাজনীতিশাস্ত্রে জানা ছিল; সুসভ্য প্রতীচ্যগণ যে তাহার উপর কিছু বাড়াইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ডিগ্‌বী সাহেব * দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের আবিষ্কৃত রাজনৈতিক অস্ত্রের মধ্যে প্রধান, পোস্ত অর্থাৎ অহিফেন। অসভ্য চীনের চিকিৎসার্থে তোপের মুখে যে অহিফেন প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহার কথা হইতেছেনা; ডিগ্‌বী সাহেবের পোস্ত রূপকমাত্র। বাংলায় তাহাকে সম্মোহনমন্ত্র বলিলে চলে।

সাম ও সম্মোহনে প্রভেদ আছে। সংযত অত্যুক্তি, সুসম্বদ্ধ মিথ্যাকথন, ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অপব্যবহার এই শেষোক্তটির উপকরণের মধ্যে গণ্য। Political Economy নামক যে অলীক শাস্ত্রটি য়ুরোপে কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হয় তাহা এই সম্মোহন কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। ইহার কাঠাম বৈজ্ঞানিক, কিন্তু বাস্তব রাজ্যের সহিত প্রকৃত যোগাযোগ অল্পই, সুতরাং ইহার বচনের দ্বারা নানা বিপরীত মতের সমর্থন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম প্রথম য়ুরোপের আসিয়া ও আফ্রিকাবিলুণ্ঠনকার্য্যকে শ্রুতিমধুর শব্দাড়ম্বরে ঢাকিবার কার্য্যে এই শাস্ত্রের বচনাবলী নিযুক্ত হয়। আত্মপ্রসাদ ভিন্ন তখন এ চেষ্টার অন্য কোন উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ছিল না, কারণ যে দুর্ব্বল জাতিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইত তাহাদের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা এমনেও ছিল না, অমনেও ছিল না; ভাল মন্দ নামে তাহাদের কি আসিবে যাইবে? ক্রমে, কিন্তু, আমরা যখন সবল ও সমজদার হইয়া উঠিতে লাগিলাম তখন সেই বুলিগুলি আমাদের সম্মোহন কার্য্যে প্রয়োগ হইতে লাগিল; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠেকিয়া শিখিবার অবসর এতবার ঘটা সত্বেও, সেই একই

* Digby's Prosperous British India.

সনাতন কৌশল ইংরেজ কর্ত্তৃক আজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজও অনেক ক্ষেত্রে সফল হইয়া থাকে।

ইংরেজের কৌশলকেও বাহবা দিতে হয়, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাকে বলিহারি যাই! বার বার যাহারা ভক্ষককে রক্ষক করিতে প্রস্তুত তাহাদের আর উপায় কি? যাহার সহিত দ্বন্দ তাহারই পরামর্শগ্রহণ একার্য্য মহাভারতের আমলে ভীষ্ম পিতামহের মত লোক সম্বন্ধে সুযুক্তি হইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালী কি কলিকালেও সত্যযুগসুলভ বালকত্ব পরিত্যাগ করিবে না?

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের উপর প্রথম কোপ পড়িয়াছিল সুতরাং সে সময়কার নিশ্চেষ্টতার জন্য নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এত দিনের ভোগের পরেও আমাদের মধ্যে অনেকে উহাদের বাঁধা গতের তালে তালে নাচিয়া বেড়ান। Demand, Supply, Export, Import, Division of labor প্রভৃতি শুনিলে আমাদের হাতপায়ে খাল ধরিয়া আসে কেন? যাহাদের দেশে খাদ্যাভাব তাহাদের free trade নইলে চলে না, আমরা তাই বলিয়া স্বদেশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দুই এক পয়সা অধিক মূল্য দিতে এত কুণ্ঠিত কেন? যাহার পরের ধন লুটিবার বল আছে তাহার নবাবী করা সাজে, অন্তত সাজুক না সাজুক কাহারো আপত্তি করিবার সাহস হয় না। কিন্তু যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে চলিল তাহারা High standard of living বলিয়া মরে কেন? যাহাদের তোপ আছে তাহারা মিলের রদ্দি মাল অনায়াসে কাটতি করাইতে পারে, আমরা কিসের জোরে এমন ভাব দেখাই যেন মিল না হইলেই জন ষ্টুয়ার্ট অশুদ্ধ হইয়া গেল?

স্বীকার করি যে, আমাদের দেশে যখন অর্থনৈতিক চিন্তা করা হয় নাই তখন কর্ম্মক্ষেত্রে য়ুরোপীয় চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিতে

হইবে। আমার বক্তব্য শুধু এই টুকু যে, উহারা আমাদের যাহা গিলাইবার জন্য ব্যস্ত থাকে তৎসম্বন্ধে যেন আমরা বিশেষ সতর্ক থাকি। নিজেদের দুরবস্থা মোচনের জন্য যে ভাবনা উহারা ভাবিতেছে তাহা হইতে বরং আমরা যথেষ্ট উপকার পাইতে পারিব।

উহাদের দুরবস্থা! এ কথাটা অনেকের হাস্যকর লাগিতে পারে। লাগিবে না কেন? যাহাদের কথা হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জনের সে সম্বন্ধে চৈতন্য আছে? জন বুলের বাচ্ছা হুইস্‌কিগেলাস হস্তে আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়া চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে কতই না সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকে। আহা! তাহার বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ খাটিয়া খুন। ভারতবর্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ ফসল পাঠাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়া কসাইখানা ও আমেরিকা কলের বাগান হইয়া উঠিল, দেশ-বিদেশ হইতে বস্ত্রের উপকরণ বর্ষণ হইতেছে। তাহার বিনিময়ে কালো কুর্ত্তার মধ্যে লুকান সভ্যতা, বন্দুকে গাদা সুশাসন ও বোতলে পোরা ধর্ম্মজ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীব্যাপী জটিল আদান-প্রদানের কি মনোহর দৃশ্য!

কিন্তু ইহা কি বারুদের উপর বসিয়া চুরুট ফোঁকা নহে! তাহার ত কিছু কিছু পরিচয় এই বারেই পাওয়া গেল। বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠের "বন্দে মাতরম্" শব্দে ম্যাঞ্চেষ্টার কাঁপিল। বাঙ্গালীর আওয়াজ আজও ক্ষীণ, কারণ সমস্বরে চীৎকার করিবার অভ্যাস নাই। কিন্তু অভ্যাসে যদি তোৎলা সুবক্তা হইতে পারে, তবে বাঙ্গালীও একদিন একতান গীত গাহিতে শিখিবে। তখন?

কর্ত্তারা এখানেই হাতে হাতে টের পাইয়াছেন যে, রেলওয়ে গার্ডদের ধর্ম্মঘট ও নিরীহ ছাপাখানাওয়ালাদের ধর্ম্মঘটে প্রভেদ কি। যখন বিলাতি কারিগরবৃন্দের পেটের জ্বালায় মাথা গরম হইবে, তখন তাহার ফল বন্দে মাতরমে অবসান হইবে না তাহা

লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের কথা পার্লামেণ্ট কাণে তোলে না, কিন্তু যাহারা কাণ টানিতে জানে তাহারা যখন আমাদের মুখের কথায় ও কলমের আঁচড়ে ক্ষেপিবে তখন পার্লামেণ্ট মাথায় তুলিয়া কুলাইতে পারিলে হয়।

শুধু আমাদের নিকট হইতে যে য়ুরোপের বিপদের আশঙ্কা তাহা নহে। উহাদের দানবিক সভ্যতার ধ্বংশের বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার অঙ্কুরও দেখা দিয়াছে। শ্রমবিভাগ (Division of labour) নামক যে ভিত্তির উপর উহাদের সমস্ত কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে শ্রমজীবিদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া তাহাদিগকে সুবৃহৎ কলের রক্তমাংসের খণ্ডাংশ করিয়া তোলে। এই সম্প্রদায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশই বিপ্লবের মুখে ছুটিতেছে।

কিন্তু এই বিপ্লব যে আকারেই আসুক না কেন, ইহা ভয়াবহ নহে। ইহা দানবিক ভৌতিক মায়ার শৃঙ্খল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে। কলির শেষের সূচনা করিয়া সাত্ত্বিক সভ্যতার বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিবে। কিন্তু সে বাঞ্ছনীয় পরিণামের পূর্ব্বে বিস্তর রাজসিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রেও তাহাই বলে, ইতিহাসে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়।

যাহাদের সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে তাহারা এ বিপ্লবকে ভয় করিবে, তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ করিবে তাহাত ধরা কথা। কিন্তু যাহাদের পক্ষে ইহা প্রাণদানস্বরূপ হইবে তাহাদের উপর উহাকে অগ্রসর করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। বিধাতার সে লিখন সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতেছে।

বঙ্গমাতার ছিন্ন কলেবরের মধ্য হইতে এবার আমারা যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছি সে বিষয়ে কি কুলাঙ্গার ব্যতীত অন্য কোন বঙ্গ সন্তানের সন্দেহ আছে? তবে সে অস্ত্রের প্রয়োগকৌশলসম্বন্ধে এখনো অনেক সাধনা আবশ্যক, তাহা গুর্খারা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। সমদমত্যাগাদি সাধনার সমগ্র ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে নেতার আঁচল ধরিয়া সাধনা হয় না, উহা প্রত্যেকের একাই করিবার বিষয়; ইহা মনে রাখিতে পারিলে

আনুসঙ্গিক এইটুকু উপকার পাওয়া যাইবে যে, কোন নেতার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে তজ্জন্য গৃহবিবাদ করিতে বসিবার প্রলোভন উপস্থিত হইবে না। ভ্রম হইলে নিজেকে ধিক্কার দেওয়াই পুরুষোচিত। তাহা হইলে সান্ত্বনার কথা এইটুকু থাকিয়া যায় যে. যে কিছুই করে না সেই ভুল করে না। আমরা যদি অর্থনীতির চর্চ্চা করিতে চাহি তাহা হইলে লাভ-লোকসানের দিকে চোখ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। আত্মগ্লানির একমাত্র লাভ দ্বিগুনিত চেষ্টা। পরের উপর রাগ করাটা সম্পূর্ণ লোকসানের মধ্যেই গণ্য।

সাময়িক আন্দোলনে চিত্ত যেরূপ উদ্ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে এ প্রবন্ধে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। শিরোদেশে মূল আলোচ্য বিষয় বলিয়া যাহা প্রকাশ, তাহা এতক্ষণে এতই সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রবন্ধের শেষভাগে আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তনের বিফল চেষ্টা করিব না। মনের আবেগে আজ নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা গিয়াছে। তন্মধ্যে উপস্থিত ক্ষেত্রে যে গুলির সার্থকতা আছে, তৎসম্বন্ধে বারান্তরে ঠাণ্ডাভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামদাস ও তাঁহার পত্নী।

নদিয়া জেলার মেটেরিগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণসন্তান রামদাসের অলৌকিক বলবীর্য্যের কথা অনেকেই বোধ হয় পরিজ্ঞাত নহেন। এই বীর্য্যবান পুরুষের সম্বন্ধে যে কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে তিনি যে একজন অসীম দৈহিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষীণদেহ শক্তিহীন বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক ভীমদেহ বলবান পুরুষের সন্ধান দুর্লভ হয় না। রামদাস সম্বন্ধীয় কয়েকটী অমানুষিক ঘটনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

রামদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার ভগ্ন অট্টালিকার অভ্যন্তরে

দ্বিতলগৃহে পিতৃপিতামহপ্রতিষ্ঠিত একটী বিশ মন ওজনের রাম-সীতা বিগ্রহ ছিল। সে দিন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি ; রামদাসের জীর্ণ বাসবাটী বায়ুবেগে পতনোন্মুখ। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কাতর স্বরে পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা বিগ্রহ রক্ষা হয় কি করিয়া ? আজ বুঝি আমার রাম-সীতা এই ভগ্ন বাটীর ইষ্টকস্তুপের মধ্যে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যান !"

দেবতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধার নয়নে দরদরধারে অশ্রু বহিল।

রামদাস চঞ্চল হইলেন, বলিলেন,—"ভয় কি মা! আমি কি করিতে রহিয়াছি ?—আমিই রাম-সাতাকে আজ রক্ষা করিব।" বলিয়াই রামদাস বিদ্যুদ্বেগে একেবারে দ্বিতলকক্ষে উপস্থিত হইলেন ; পিতা যেমন ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে লয়, রামদাস তেমনই সেই বিশ মন ওজনের বিগ্রহটী বুকে তুলিয়া ধরিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সুউচ্চ দ্বিতল কক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটীর সেই অংশ প্রবল শব্দে ভূমিসাৎ হইল।

রামদাস নিচে পৌঁছিয়া অনাহত বিগ্রহকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিলেন। তাঁহার গাত্রে এক আঁচড়ের দাগও দেখা গেল না।

রামদাস এক সময়ে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। আরোগ্যের জন্য কবিরাজ পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের সময় তিনি যেন ডুব দিবার পরিবর্ত্তে মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করেন। রামদাস জল ঢালিবার জন্য প্রত্যহ পাত্র সঙ্গে আনিতেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার ভুল হইয়াছিল। বাড়ী নিকটে ছিলনা, ব্রাহ্মণ তাই আর ফিরিলেন না। নিকটে একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাঁধা ছিল, তিনি সেইটাই দুহাতে তুলিয়া লইলেন, এবং বারম্বার তাহা পুর্ণ করিয়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা অবাক হইয়া রামদাসের এই কীর্ত্তি দেখিলেন।

এক ধনীর গৃহে শ্রাদ্ধ। নানারকম আয়োজন হইয়াছে। দানের জন্য হাতী ঘোঁড়া বাঁধা রহিয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত রামদাসও নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার অমিত বলের কথা তখন গ্রামস্থ কেহই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। সকলেই ধরিয়া

পড়িলেন, রামদাসকে তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হইবে। রামদাস অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি একজন মাহুতকে ডাকিয়া সম্মুখে বড় হাতীটা আনিতে বলিলেন। হাতী আসিলে রামদাস এক হস্তে সবলে হাতীর শুঁড় ধরিলেন, মাহুতকে বলিলেন—"তোর হাতীকে তুই ফিরিয়া নিয়ে যা!" মাহুত ইঙ্গিত করিল, হাতী নিরবনিশ্চল, এক পাও হটিতে পারিতেছে না। মাহুত তখন প্রহার করিল, বেদনায় অস্থির হইয়া হাতী নিরুপায় বশত ভয়ঙ্কর চাৎকার করিয়া উঠিল—তবু এক পাও নড়িবার সামর্থ্য হইলনা। তখন রামদাস ছাড়িয়া দিলেন।

রামদাসপত্নী স্বামীর উপযুক্তাই ছিলেন। সে দিন কোথা হইতে রামদাসের বাটীতে একটী বৃহৎ সিন্দুক আসে। আট দশ জন মুটিয়া সেটা মাথায় করিয়া আনে। যে কারণেই হউক, সিন্দুকটী আর ঘরের ভিতর তোলা হইলনা, দরজায় সামনেই পড়িয়া রহিল। রামদাস সে দিন একটু অসুস্থ ছিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সিন্দুক তুলিতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অসুখ শরীরে যাচ্ছ কোথা?" রামদাস বলিলেন, "যাই সিন্দুকটা তুলিয়া আসি।" রামদাসপত্নী তখন হাসিয়া বলিলেন—"তোমায় আর যেতে হ'বে না, আমি একলাই সেটা তুলে রেখে এয়েছি।"

এ কথা গুলি বিশ্বাসযোগ্য না অবিশ্বাস্য বলিব? আমাদের মনে হয়, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অসুরদেহ স্যাণ্ডো যে প্রকার শারীরিক বলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা চোখে দেখিয়াও যে বিশ্বাস হয় না—তাহা যখন সম্ভব, তখন রামদাস ও তাঁহার পত্নীর কার্য্যসমূহ যে সম্ভবপর নহে তাহা কেমন করিয়া বলি। যাহাহউক, বাঙ্গালী রামদাসের মত আরও কত অমানুষিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঙ্গালার চিতাস্তূপের মধ্যে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, কে তাঁহাদের সন্ধান লইবেন?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

গোরাচাঁদ বনাম শ্যামামা।

(শ্যামাবিষয়।)

ওহে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক্ ছাই।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে' লয়ে তোমার গুণের বালাই॥
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো, যে পায় সে না বাসে ভালো,
আপন জনে খোলা মনে, হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥
ভেদবুদ্ধি ভেবে সার, পাকা চাল চাল্‌লে এবার
সোণার বাংলা চুরমার, কর্‌লে তুমি হুটা হুঠাঁই॥
শেল দিয়েছ মোদের বুকে, বল হে গৌর আর কি মুখে,
সখা ভাবে ভজ্‌বো তোকে, তোমার প্রেমনীতিতে ফাই ফাই॥
তোমার মুলুকের আমদানী, বসনভূষণ চূড়ীচিরুণী,
ছড়ি জুতা চোখরাঙ্গানী, প্রেমের গৌর আর না চাই॥
চুরুট সাবান পাঙ্গা লবণ, দোবরাচিনি লোহার বাসন,
সাগর জলে দিই বিসর্জ্জন, তোমায় ভজ্‌লে ধর্ম্ম নাই॥
কালাপানির অতল জলে, চায়ের রাশি দিল ফেলে,
স্বদেশব্রতে প্রাণটা ঢেলে, মার্কিণতুল্য কীর্ত্তি চাই॥

এখন গোরাচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে, ভজ্‌বো মোদের শ্যামা মায়ে,
কালী কালী নাম জপিয়ে, মনের কালী মুছব ভাই॥
ঘুচেছে মোহ এতদিনে, সুজন কুজন লইহে চিনে,
গতি নাইরে শ্যামা বিনে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই॥
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে, সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে,
আবেগভরা চাপা সুরে, স্বদেশপ্রেমের গুণ গাই॥
লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই, মিটেছে মোদের বিলাতী বাই॥

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকা।

যাকে চিরকাল "আপনি" বলে আসছি তাকে একদিন অকস্মাৎ "তুমি" বল্‌তে বাধেনা কিন্তু একবার "তুমি" অভ্যাস হ'লে আবার "আপনি" বলা বড় কঠিন।

বিষ্ণু যখন অখণ্ড দেবতা তখন বৈকুণ্ঠে তাঁর অমর জীবনের এক মাত্র সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী, আবার তিনি যখন অখণ্ড মানব রামচন্দ্র, তখন তাঁর একমাত্র প্রণয়িনী জানকী; কেবল তিনি যখন কৃষ্ণ অবতারে কতক মানুষ, কতক দেবতা তখনি তাঁর সত্যভামা, রুক্মিনী ছেড়ে আরো অনেকগুলির আবশ্যক হয়েছিল।

নূতন আবিষ্কৃত X (rays) রশ্মি সব কাঠিন্য, দৃঢ় সন্নদ্ধ প্রাচীর, কাষ্ঠ অন্তরাল, অস্থি মাংসভেদী; কিন্তু প্রিয়জনের চক্ষে তার অপেক্ষা চতুর কুশল, ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ আলোক আছে সে একেবারে অন্তরাত্মায় পৌঁছয়।

বর্ত্তমানে যিনি প্রভূত ধনের অধিকারী আমরা তাঁকে বলি বড় মানুষ, কিন্তু কালক্রমে যখন তিনি ধনহীন হ'ন তখন তাঁর পরিচয় বনিয়াদী ঘরের ছেলে। আজ যার জীবনে অনেক সুখ, ভবিষ্যতে অনেক আশা তিনি তো জীবনের রাজা, কিন্তু যাঁর জীবনে একটি বৃহৎ সুখের স্মৃতি আছে তাঁকেও দরিদ্র বলা যায় না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নাম।

আধুনিক বঙ্গে ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরের মত নামগুলিতে বাঙ্গালীর ললিতলবঙ্গলতার মত ভাবটিই ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বতন ধীর গম্ভীর বীর্য্যব্যঞ্জক নামের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত একটা দুর্ব্বল আহ্লাদে ন্যাকা ভাবের নামের ক্রমশ বিস্তার হইতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি পরিষ্কার হইতে পারে।

আগেকার রামগঙ্গা, গঙ্গাধর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন প্রভৃতি ঠাকুর-দেবতার নামগুলি একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থল, ললিত, শিশির. কুমুদ, বিনোদ, চারু প্রভৃতি সরস নামসকল অধিকার করিয়াছে। জয়দেব সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী বঙ্গসন্তানের নামের নিকট এতদিনে হার মানিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বের কাত্যায়ণী, দাক্ষায়ণী, ক্ষেমঙ্করী, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদির পরিবর্ত্তে এক্ষণে লতিকা মুকুলা, বেলা, হেনার আমদানী হইয়াছে। আত্মারাম, বিশ্বম্ভর, জগদ্ধাত্রী, শিবশঙ্করী প্রভৃতি নাম শুনিলে আজকালকার অনেক ছেলে হাস্য সংবরণ করিতে পারে না এমনও দেখিয়াছি। আমাদের দেশের মিন্‌মিনে মেরুদণ্ডহীন নামের সহিত মহারাষ্ট্রীয়, পার্শী প্রভৃতি সকল জাতীয় নাম তুলনা করিয়া দেখিলে আমার বক্তব্য আরও একটু পরিষ্কার হইবে। রামকৃষ্ণ গোপল ভাণ্ডারকার, মহাদেও গোবিন্দ র‍্যানাড়ে, মানচারজি মানিকজি ভবনগরী, দিনসা ঈডুলজি ওয়াচ্ছা প্রভৃতি নাম শুনিতে একটী তেজস্বী ভাব যেন চোখের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়!

সকলেই জানেন—মেয়ের বিবাহের সময় নাম বড় সামান্য দরকারী জিনিষ নহে। মেয়ের নাম যদি 'রেবা' কিম্বা 'হেনা' থাকিল তবে কন্যাদায়ক্ষিপ্ত পিতার অন্ততঃ চারি পাঁচ শত টাকার সুবিধা ঘটিতে

পারে; পক্ষান্তরে যদি মেয়ের নাম 'বগলা' কি অন্নপূর্ণা হইল, তবে খেসারৎ-স্বরূপ বেচারীকে আরও পাঁচশত টাকা গণিয়া দিতে হইবে। আর মেয়ের নাম যদি জগদম্বা হয়, তবে ত কথাই নাই—সে মেয়ের আর বিবাহই হইবেনা।

কেবল মানুষের নামে কেন, সর্ব্বপ্রকার নামেই এই প্রকার একটা শিথিল অকর্ম্মণ্য ভাব প্রবেশ করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম—ষ্টার থিয়েটারে একদা 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' নামে একখানি পুস্তক অভিনীত হয়—ঐ পুস্তকের নামে কোন নূতনত্ব বা লালিত্য না থাকায় প্রথম প্রথম অভিনয়ে মোটেই লোক হইত না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাথায় হঠাৎ একটি সুবুদ্ধি আসিল; তিনি অভিনয় পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'অনলে বিজলী' বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। পরদিন আর থিয়েটারে লোক ধরে না, এতই ভিড়। অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয়া আসিল।

পূর্ব্বেকার একখানি পুস্তক খুলিলেই দেখিতে পাইবেন—লেখা আছে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ"—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত অথবা "বিধবাবিবাহ বিচার"—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, কলিকাতা রাজধানী হইতে, সংস্কৃত বা বুধোদয় বা শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত ইত্যাদি। আর এখনকার একখানি বই হাতে লইয়া প্রথম দর্শনে ত তাহার নামই পাওয়া যাইবে না। বহু অনুসন্ধান এবং বিস্তর গবেষণার পর, পুস্তকের শীর্ষদেশের বাম কোনে—অতি ছোট সোণার অক্ষরে 'বেলা' এবং নিম্নদেশে নৈঋত কোনে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অক্ষরে 'হেম' কি এই প্রকার একটা কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে। নতুবা হয়ত বাঁকা করিয়া ছবি আঁকা একটি 'কঙ্কণ' কি 'মঞ্জীর' এমনি একটা কিছু আছে, গ্রন্থকারের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা, পুস্তকের পিছন

দিকের মলাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে ছোট করিয়া 'নীরু' বা 'বিনু' বা এমনি একটা কিছু লেখা। আবার 'চেরী' অথবা 'ফ্যান্সি' প্রেসে হইতে উহা মুদ্রিত। ঐ সকল পুস্তক কামিনীজনসুলভ পারিপাট্যে কোথাও মখমলে কোথাও সাটিনে কোথাও বা কিংখাবে মণ্ডিত। পাঠকগণ সত্বরই স্বর্ণচুমকী ও সাঁচ্চার কাজও উহাতে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ নানা বিষয় হইতেই আমার বক্তব্যটি পাঠকের সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

দান।

নির্ব্বিচারে ভিক্ষা দাও শাস্ত্রের বিধান
যোগ্য পাত্র খুঁজে এনে তবে কো'র দান।

ঋণ শোধ।

আজ আমি একেবারে রিক্ত অর্থহীন
তবুও নিশ্চিন্ত প্রাণ শুধিয়াছি ঋণ।

চুটকী।

১। দেশী পণ্ডিত বনাম বিলাতী সংস্কৃতনবীশ *(savants)*।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, কেহ বা বিদ্যাসাগর কেহ বা বিদ্যাম্বুধি, বিদ্যার্ণব। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা-বারিধির এক ফোঁটাও সাধারণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেনা। আপামর সাধারণের নিকট জ্ঞানপ্রচার করা তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেননা। যদি বা সে বিষয়ে প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষা এমন কঠোর ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে যে, তাহাতে তোমার আমার দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, কিন্তু সুপেয় জল একবিন্দুও নাই; খাইতে গেলে ক্ষার জলে বমনোদ্রেক হয়, তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। 'Water, water, every-where, But not a drop to drink.' পক্ষান্তরে বিলাতী সংস্কৃত-নবীশগণের সংস্কৃতজ্ঞান অল্প, হয় তো তাহাতে ভ্রমপ্রমাদও আছে; কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহারা সাধারণ্যে বিতরণ করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল; তাঁহাদের নিকট হইতে তবু আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা জানিতে পারি। কূপের পরিধি সঙ্কীর্ণ, জলও অল্প; কিন্তু হইলে কি হয়, পশ্চিম অঞ্চলের কূয়ার জল বড় মিঠা।

২। সেকাল আর একাল।

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে কোশাকুশি, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী চন্দন থাকিত। আর একালের যুবকযুবতীরা স্নানের পরেই আয়না-চিরুণী, ব্রুস লইয়া বসেন, পাউডার, রূষ্‌, পমেটম, এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। 'একেই বলে সভ্যতা'।

৩। চোগা।

চোগাটা ঠিক যেন গিন্নিমানুষের ঘোম্‌টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। ওটুকু না দিলেও আবার কেমন স্থাড়া স্থাড়া দেখায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও ভাল দেখায়না, অথচ পরিলেও আল্‌গা ভাবে পরিতে হয়, বোতাম আঁটিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা হইবেনা।

৪। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

অনেকে যেথানে-সেথানে যথন-তথন বিদ্যা ফলান, ইহাকে ইংরাজীতে বলে pedantry (বিদ্যার জাঁক)। একজন ইংরেজ লেথক (J. S. Blackie) ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেমন তামাক-থোরের কাপড়-চোপড়ে, গায়ে-মুথে সর্ব্বদা তামাকের গন্ধ, তেম্‌নি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা বিদ্যাফলানর চেষ্টা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে তামাকের প্রচলন এত অধিক, যে ও উপমাটায় আমাদের মন উঠে না, তামাকথোর না বলিয়া পিঁয়াজ-রশুনথোর বলিলে কথাটা আমাদের কাছে আরও ঘোরালো হইত। আমার মনে হয়, বিদ্যালাভ অনেকটা তেলমাথা বা সাবানমাথার মত। তেল মাথিয়া বেশ করিয়া পা রগ্‌ড়াইয়া স্নান করিলে তেলটা উঠিয়া যায়, কিন্তু তেল মাথার ফলে চামড়াটা বেশ মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালাভ করিলে স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বেশ মোলায়েম হয়। কিন্তু চাষালোকে থানিকটা তেল জব্‌জবে করিয়া মাথে, হয়ত তার কোনও পুরুষে একটু তেল পায় নাই, তাই একদিন ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজুরী করিতে আসিয়া সে আধপোয়া তেল গায়ে ঢালিল, মাথার চুল হইতে চুঁচিয়া তেল পড়িতে লাগিল।

Pedantএর অবস্থাও ঠিক তাহাই। হয়ত বংশের মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে বা সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে তিনিই কোনও সুযোগে কিঞ্চিৎ বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাই সর্ব্বদা চালচলনে কথাবার্ত্তায় সেটুকু জাহির করিতেছেন। দণ্ডে দণ্ডে খড়্‌কেপ্রমাণ ঘৃতের ঢেঁকুর তুলিতেছেন। সাবান মাথিলে গায়ের ময়লা কাটে, চর্ম্মরোগ দূর হয়। বিদ্যা শিথিলেও মনের ময়লা কাটে, চরিত্র নির্ম্মল হয়। কিন্তু আনাড়ীতে সাবান মাথিলে থানিকটা সাবানের ফেণা কাণে, কপালে লাগিয়া থাকে, সেটা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলেনা। হয়ত লোককে দেথাইতে চায় 'আমি সাবান মাথিয়াছি'। Pedantদেরও বিদ্যার ফেণা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লাগিয়া থাকে। কাঙ্গালীরামের গোঁফে দুধের সর লাগাইয়া আঁচাইতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ কবিতা।

চাতক।

গর্জ্জিছ মেঘ নাহি বর্ষিছ জল,
আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল,
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!

গর্জ্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতক পক্ষী ব্যাকুলিতোহং।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং কচ জলপাতঃ।

পরোপাসনা।

জলদ হে, দেহ জল অথবা না দেহ,
চাতকশরণ তুমি অন্য নহে কেহ,
পিপাসায় প্রাণ যায় সেও গণে শ্রেয়,
পর উপাসনা তবু তার কাছে হেয়।

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
ত্বদেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনা॥

তুমিই শরণ।

নদে হ্রদে অন্যে করে তৃষ্ণা নিবারণ,
একমাত্র তুমি ঘন চাতক-শরণ।

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে সদা পয়ঃ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনং॥

আটক।

কেতকী ভুবন খ্যাত স্বরণ বরণে সাজে,
পদ্ম ভ্রমে দৈব ক্রমে অলি পড়ে তার মাঝে;
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, চখে লাগে ফুলধূলি,
তিষ্ঠিতে উড়িতে নারি ফাঁপরে পড়িল অলি।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকে ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তোদ্বিরেফঃ॥

হতাশ।

রাত্রি হলে অবসান প্রভাত আসিবে,
রবির উদয় দেখি কমল হাসিবে,
কোষে বদ্ধ অলি তাই ভাবে সারা রাতি;
হেন কালে পদ্ম হায়! উপড়ায় হাতি।

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার।

দৈবের বিচিত্র গতি।

ভয়াকুলা কপোতিকা কপোতেরে কয়
আসিল মোদের এবে অন্তিম সময়।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে ব্যাধ নিচুতে বিচরে,
পক্ষীরাজ বাজ দেখ উড়ে শিরোপরে;
অমনি শ্যেনেরে ব্যাধ হানিল গো বাণ;
ব্যাধ বেটা সর্পাঘাতে ত্যজিল পরাণ;
শীঘ্রই দুজনে তারা গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি কখন কি হয়।

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপসজ্জিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রমতি।
ইত্থং সত্যহিনা সংদষ্ট ইধুণা শ্যেনোঽপি তেনাহতঃ
তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুপ্রভাত।

হয়েছে রে শেষ নিবিড়-তিমির-পুঞ্জিত,
ঝঞ্ঝামুখর, ক্ষুব্ধ, সুচির যামিনী,
হের মেঘমালা—সুদূর অরুণ রঞ্জিত,
স্তব্ধ ঝটিকা; লুপ্ত আকাশে দামিনী।
এখনি কাননে উঠিবে বিহগসঙ্গীত
কুসুমগন্ধ আসিবে মন্দ পবনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

একটিও তারা ছিলনা বিশাল অম্বরে,
ক্ষীণ আলোরেখা পড়ে নাই আসি ভূতলে,
প্রহর গ'ণেছ জাগিয়া সভয় অন্তরে
আকাশের পানে চাহিয়া, বসিয়া বিরলে।
ভয় সংশয় হোক্ তবে সব অন্ত রে,
হের শুকতারা উদিত পূর্ব্ব গগনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওই আসে উষা—আনন অনবগুণ্ঠিত,
মধুরহাস্যে বিকাশি শান্ত মহিমা,
হেম-অঞ্চল চরণকমলে লুণ্ঠিত,—
তিমির প্রান্তে দীপ্ত আশার প্রতিমা।

এখনো কে আছে সুপ্ত, কে আছে কুণ্ঠিত?
উঠ উঠ বলি ডাক, ভাই, ডাক স্বজনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওগো উঠ, উঠ, ছিঁড়ি এস মোহবন্ধন,
ভাই ভাই মিলি দাঁড়াও আসিয়া বাহিরে;
কেন রে নিরাশা, কেন রে বিফল ক্রন্দন,
দুঃখ রজনী নাহি বাকি, আর নাহি রে।
আনন্দে লয়ে সুগন্ধি ফুলচন্দন
অঞ্জলি সবে দাও জননীর চরণে,
ওরে আশাহত, ওরে ভীত, নাই রজনী
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০৭	২১	পাঠাইলেন	পাঠালেন
,,	২২	পাঠাইলেন	পাঠালেন
৭০৯	১৭	রক্তিম পল্লবনব	কিশলয়-রক্তিমা
৭১৬	১২	লঙ্কা সে কলঙ্কাঙ্কিতা	লঙ্কা কলঙ্কাঙ্কিতা
৭২৮	৮	ছাড়ি সীতার কামনা	ছাড়িদেরে সীতার কামনা
	৯	তুমি আর কপিসেনা	তুমি আর তব কপি-সেনা।

২৬ বর্ষ, মাঘ, ১৩৩২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত

১৩১২ সনের

কুন্তলীন পুরস্কার।

নগদ একশত পঞ্চাশ টাকা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা ডিটেকৃটিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবল মাত্র গল্পের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেল্‌খোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। রচনা কোন ক্রমে সাধারণ চিঠির কাগজের ১০।১২ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, কাগজের এক পিঠে লিখিতে হইবে।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু নাম গোপন রাখিলে অথবা অন্য নামে রচনা পাঠাইলে তাহা পুরস্কৃত হইবে না। যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে রচয়িতা স্বীয় নাম গোপন করিয়া অন্য নামে রচনা পাঠাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে পুরস্কার উক্ত প্রমাণকারীকে দেওয়া হইবে।

৩। রচনার প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কেহ রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইবেন না, প্রাপ্তিস্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

৪। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক-লেখিকাগণের নাম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রধান প্রধান মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র লিষ্টে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত রচনাগুলি পুস্তকাকারে ভাদ্রমাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ব্যবহৃত বা লেখকের হস্তে প্রত্যর্পিত হইবে না। পুরস্কার ঘোষণার একমাস পরে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, লেখিকাগণ কর্ত্তৃপক্ষের বা আত্মীয়ের অনুমোদনপত্র দেখাইয়া টাকা লইবেন।

৫। রচনা আগামী ৩০শে মাঘের মধ্যে কুন্তলীন আফিসে পৌঁছান আবশ্যক; তৎপরে কোন রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহানাটক।

অষ্টম অঙ্ক।

যুদ্ধোপক্রম।

অঙ্গদের মুখে শুনি' রাবণের বিভব ও কুল
মুহূর্ত্তের তরে রাম ঈষৎ হইলা চিন্তাকুল।

শ্লাঘ্য বটে মোর রিপু এই দশানন;
—প্রত্যক্ষ দেখিয়াও এ মোর বিক্রম,
না করিল মোর হাতে সীতা সমর্পণ,
কিম্বা না করিল ত্যাগ গরব আপন॥
"সুবেল"-শিবিরে আছে রাম ও লক্ষ্মণ
—দূত মুখে শুনি ইহা, লঙ্কেশ রাবণ,
দশ হাতে টঙ্কারিল ধনুক গরবে;
পূর্ণ হ'ল দশদিক্ সেই ঘোর রবে;
প্রবৃত্ত হইল পরে করিতে মার্জ্জন
খরধার "চন্দ্রহাস" খড়্গ আপন।

আর দশ হস্ত দিয়া, চিত্রপটে করয়ে অভ্যাস
সীতা-কুচে, মন সুখে, পত্র লেখা-রচনা-বিন্যাস।

(পরে স্বীয় প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া দর্শন)

"ওই সেই দগ্ধপুচ্ছ কাল-সম হনুমানে হেরি,
পূর্ব্বে যে করিল হেন হতশ্রী এই লঙ্কাপুরী;
কামতুল্য রাম ওই— রহিয়াছে ধনুর্ব্বাণ ধরি"।
মঞ্চস্থিত দশানন এইরূপ বলিতে বলিতে
শত্রু সৈন্য-শিবিরের প্রতিভূবে লাগিল দেখিতে।

(অরবিন্দ ও বিরূপাক্ষ এই মন্ত্রিদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রিদ্বয়।—জয়তি জয়তি মহারাজ! ইন্দ্র-মৌলি-মুকুট-রত্ন যাঁর পাদপীঠে জিত সেই রাবণের জয় হোক্!

রাজন্ আমরা এবে বীর-স্তোত্র-পাঠে তোমা
করিব না যুদ্ধে উৎসাহিত ;
শুধু এই হিতকর বাক্যগুলি শুনাইতে
মোরা মন্ত্রি—হেথা উপস্থিত।

অরবিন্দ।— সীতার রক্ষণ-তরে লক্ষণ কাটিল রেখা
ভূমি-পরে ধনুর আগায় ;
হে রাজন্ দশানন! পারনি লঙ্ঘিতে তুমি
লক্ষণের সেই সে রেখায় ;
কিন্তু এ মহান্ রাম কপিসৈন্য লয়ে সাথে
মহাসিন্ধু লঙ্ঘিল হেলায় ॥
যাঁর বার্ত্তাবহ দূত পবন-নন্দন হনুমান,
হেলায় লঙ্ঘন করি' মহাসিন্ধু গোষ্পদ সমান,
নিজালয়-সম পশি' লঙ্কাপুরী, করিয়া সাক্ষাৎ
সীতা-সনে, ভাঙ্গি' বন, করিল এ পুরী ভস্মসাৎ
—মানব কেমনে হবে সেই রাম কহ রক্ষোনাথ।

বিরূপাক্ষ।— কাহার নহেক প্রিয় মুখ-সুখ মধুর বচন?
বিপদের কালে কিন্তু তাহা শুধু ক্লেশেরি কারণ।
প্রিয় বা মধুর বাণী স্বামিত্বেরি কালে শোভা পায় ;
কর্কশ সুনয়-বাক্য হিতকর—বিত্তের রক্ষায় ॥
বিভবে, ভোজনে, দানে, থাকে যত প্রিয়বাদিগণ ;
বিপদ আগত হলে দেখা দেয় কেবলি সজ্জন ॥
আসন্ন যাহার নাশ—তার কাছে মূকতাই প্রিয় ;
প্রভুভক্ত ভাবে' কিন্তু—একমাত্র মুখরতা শ্রেয় ॥
স্বামীদের ফ্যালে যারা স্তুতিবাক্যে বিপদের কূপে,
পরে উদ্ধারিতে নারি' শেষে তারা রহে মৌনরূপে ॥

নদী, আর খল-মৈত্রী, নীতি-দ্বেষী জনের বিভব,
আর কোমলাঙ্গী নারী—অচির-যৌবন এরা-সব ॥
যাবৎ না দেখ প্রভো দাশরথি রামের আনন,
যাবৎ না হয় এই জলধির সলিল শোষণ,
বিজিত-অলকা লঙ্কা যাবৎ না হয় ছারখার,
তবানুজ বিভীষণ যাবৎ না হয় কুলাঙ্গার,
তাবৎ আপনি তুমি কর সমর্পণ
রাম-হস্তে জানকীরে, শোনো গো রাজন্ ॥

রাবণ। (ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া)
বুদ্ধি পণ্ডিতেরি মন্ত্র, রতি-মন্ত্র জপয়ে বিলাসী,
পরাক্রম-সার মোরা —আমাদের মন্ত্র শুধু অসি ॥
যদি পুত্র কুম্ভকর্ণ বীর মহাবলী,
শুনি' তোমাদের এই শাস্ত্র কথা গুলি,
যুদ্ধে সংহারিতে পারে পবন-নন্দনে,
তাহলে পাঠাও তারে সর্ব্বপ্রথমে।

বিরূপাক্ষ।—(রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া)
নৃপেরি নিকটে শুধু নীতি কহে নীতিবেত্তাগণ,
যুবরাজাদির কাছে নাহি তারা কহে কদাচন ॥

নীতিশাস্ত্রানুসারে আপনি শুদ্ধাধিকারী,—প্রকৃত অধিকারী ; আপনি দুরধিকারী ন'ন্,—অযোগ্য রাজা ন'ন্, তবে কেন আপনাতে বিরুদ্ধভাবের লেশ মাত্র আশঙ্কা করচেন? শাস্ত্রে আছে ঃ—

সর্পমুখে, দষ্টদেহে,—রক্ত কভু নাহি দৃষ্ট হয় ;
কিবা রাজা, কিবা প্রজা,—অযোগ্যেতে ধন নাহি রয় ॥

রাবণ। (স্বগত) এই মন্ত্রিদ্বয়, ছলোক্তির দ্বারা আমাকেই দেখ্‌ছি দুরধিকারী বলচে ; তবে বোধ করি শত্রুভয় আসন্ন। শাস্ত্রে আছে ঃ—

মন্ত্রি-হস্তে যে নৃপের ন্যস্ত-রাজ্যভার,
সৌধ-বিহারই যার জীবনের সার,
বিড়ালেরে দুগ্ধ-ভাণ্ড করি' সমর্পণ
ঘুমায় নিশ্চিন্ত হয়ে সেই মূঢ় জন ॥

কিন্তু কখন কখন, রাজাদের মধ্যে এই নীতি-বিরুদ্ধভাব গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে —তার সাক্ষী শশাঙ্কশেখর মহাদেব।

পরিপাক করিয়াও উৎকট্ গরলে,
স্মরে দগ্ধ করিয়াও নয়ন-অনলে,
ভাল-নেত্রে প্রলয়াগ্নি করিলেও ধৃত,
সর্ব্ব-শকতি গুণে হলেও ভূষিত,
—শশী, গৌরী, গঙ্গা যিনি করেন ধারণ,
সেই শঙ্করের নীতি কৌতুক-জনন ॥

শিবের নীতি-বৈপরীত্য দেখে ভৃঙ্গীর যে দশা হয়েছিল, আমার নীতি-বৈপরীত দেখে আমার মন্ত্রিদ্বয়েরও সেইরূপ দশা হয়েছে দেখছি।

দিগম্বর যদি, তবে ধনুকে কি কাজ?
শস্ত্রধারী যদি, তবে কেন ভস্মসাজ?
ভস্মধারী যদি, তবে কেন লন নারী?
নারী লয়ে,কেন তবে কামের সংহারী?
—এ হেন বিরুদ্ধ কাজে রত হেরি আপন স্বামীরে
ভৃঙ্গি-বপু—শিরাপূর্ণ অস্থিসার হইল অচিরে॥

(মন্দোদরীর প্রবেশ।

(মন্দোদরী রাবণের সহিত নিভৃতভাবে মন্ত্রণা করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় মন্ত্রিদ্বয়ের প্রস্থান)।

মন্দোদরী। (স্বগত)

কৈলাসোত্তোলনকারী কুবের-অনুজ সেই
অদ্বিতীয় বীর দশানন ;
তবু জিতবালি-বীর্য্য এই রঘুবীর রাম
রাক্ষসের শঙ্কার কারণ।
রিপুদলে প্রবেশিল এবে বিভীষণ ;
মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগন ;
মহামানী দশানন পতিত কলঙ্কে ;
মগন গভীর পঙ্কে তুমিও গো লঙ্কে !

সূর্য্যবংশী এই রাম —নৃপগণ-চূড়ামণি
সর্ব্বমহীশ্বর দশরথের নন্দন ;
রক্ষণের তরে যারে আরাধনা করে সবে
—সীতাপহারীর সেই কৃতান্ত ভীষণ।
ত্রিভুবন-হিত-তরে প্রজ্জ্বলিত করিল যে জন
স্বভুজ-প্রতাপানল —জান না কি তাহারে রাজন্!
(প্রকাশ্যে) সত্য তুমি করিয়াছ উত্তোলন পর্ব্বত কৈলাস ;
সমর্থ অনুজ তব করিবারে ত্রিভুবন গ্রাস ;
পুত্র তব ইন্দ্রজয়ী, কিন্তু সেই বালী-হন্তা রাম
শক্র তব উপস্থিত ; —তারে সীতা করহ প্রদান ;
—সেই সে অবলা নারী বলে যারে করিয়া হরণ
এই লঙ্কাপুরী মাঝে করিয়াছ তুমি সংস্থাপন।
সুগ্রীবের ভৃত্য এক ক্ষুদ্র কপি আসি'
সমস্ত এ লঙ্কা যবে করে ভস্মরাশি,
কি করিল তোমার এ বীরেরা তখন?
এখন রাঘব হেথা করে আগমন
জলধি লঙ্ঘন করি' কপি-সেনা-সঙ্গে ;
—এবে ছাড়' জানকীরে ছাড়' অবিলম্বে।

রাবণ। (বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক)

অয়ি ভীরু! কেন তুমি বৃথা কর ভয়,
মোর কাছে মহা রিপু রাম কভু নয়।
নিশাচর-পতি আমি—আরম্ভিলে রণ
বাসবাদি দেবেরাও করে পলায়ন।
দেখো সতি ! সদ্য মোর ধনু-ক্ষিপ্ত বাণ
হরিবেক ক্ষুদ্র এই তপস্বীর প্রাণ।

(পরে নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া)

ভোভো মায়াবী রাক্ষসগণ! আমি আজ মায়াজাল বিস্তার করে,' মৃদু স্মিতি পীনোন্নত কুচ-কলস-শোভিত জানকীর বক্ষস্থল মনে মনে সম্ভোগ এবং তার সেই মধুর অধর-পল্লব নিরীক্ষণ করব। তোমরা প্রস্তুত হও।

অনুচরগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ! (মায়া-রচনায় প্রবৃত্ত)

রাম লক্ষণের মুণ্ড বিরচি' মায়ার বলে
পাপাত্মা রাবণ
স্থাপিল সীতার আগে; —যেন উহা হইয়াছে
কৃপাণে ছেদন,
রক্ত ঝরে অবিরল উল্টায়ে গিয়াছে নেত্র
মৃতের মতন।

(মায়া মুণ্ড দেখিয়া)

আহা ঝরে বারি-ধার —ঘন-গাঁথা-মণি-হার,
জানকীর পঙ্কজ-নয়নে॥

সীতা। রমণ-মরণ-ভীতা কেন না হইনু নীতা
এখনোগো কৃতান্ত-সদনে?
যে অনলে দহে হৃদি কেন না দহিল বিধি
আমারেও সেই-সে দহনে।

(রামের মস্তক গ্রহণ কারয়া)

হাহা জগদীশ মম! জগতের বীর অদ্বিতীয়!
অধর-পিযূষ মোর পান করি' বলিতে—"অমিয়,"
হতে যবে কেলি-রত বেতসের লতাকুঞ্জ বনে;
—হে নাথ অমৃতময়! সেকথা কি নাহি পড়ে মনে?
সূর্য্যবংশে জন্ম তব —সূর্য্য যথা নাশে অন্ধকার
তুমিও কি তার মত করিবে না শত্রুর সংহার?
স্ফুরে না মধুর বাণী কেন আর এ-মুখ-কমলে?
বিলাস-বিভ্রম কোথা এবে এই নেত্র-শতদলে!
অমর-বধূ-বল্লভ তুমি নাথ হয়েছ এখন;
পরমাত্মারূপে তোমা সীতা এবে করে আলিঙ্গন।

(সীতা রামের মস্তক আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে)।

আকাশবাণী। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না সীতা রাক্ষসের দেহ,
শ্রীরামে বধিতে রণে নাহি পারে কেহ।
এ যাহা দেখিছ মাতঃ—এ নহে প্রকৃত
—শিবভক্ত রাবনের মায়ায় রচিত॥

(রাবণ প্রস্থান করিলে, সীতা আশ্বস্ত হইয়া, সরমার প্রতি)।

সীতা। সরমে, একি অদ্ভুত কাণ্ড!

সরমা। ওই শুন সুলোচনে! নিশাচরগণ
রাম-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
ঢাক-ঢোল বাজাইয়া করে কোলাহল,
হ্রেষারব করে আর তুরঙ্গম-দল।
শান্ত হও, শান্ত হও করিও না শোক,
প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে শ্রীরামের কোপ।
পুত্র-পশু-বন্ধু-সহ দুষ্ট দশাননে
নিশ্চয়ি আজিকে রাম বধিবেন রণে।
ইন্দ্রনীলমণি-শ্যাম রামের অধর-মধু-পান
পুনঃ তুমি হে সুন্দরি! করিতে পারিবে অবিরাম॥

রাবণ। (স্বগত) মায়াধারী হয়ে পুনর্ব্বার যাওয়া যাক্।

অশ্ব-গজ-রথ-শব্দে শঙ্খ-ভেরি-নিঃস্বনন
করি' বিবর্দ্ধিত,
সৈন্য-ভুজ-আস্ফালনে যোদ্ধৃ-কোলাহলে লঙ্কা
করিয়া পূরিত,
সানন্দে রাক্ষস-ইন্দ্র কেশে ধরি দশ মুণ্ড
পাঁচ-পাঁচ করি' দুই হাতে,
শ্রীরামের মায়া-রূপ আপনি ধারণ করি'
আসে পুন সীতার সাক্ষাতে।

কুচভার-নম্রা-সীতা —কাঁচুলি ঈষৎ ছিন্ন
কুচের বিস্তারে—
সাক্ষাৎ রামেরে হেরি' ঝটিতি দাঁড়ায়ে উঠি'
কহিলা তাঁহারে :—
ধন্য হ'নু প্রাণনাথ ! রাক্ষসের ওই সব
ছিন্ন মুণ্ডগুলা তুমি করহ মোচন ;
গাঢ় আলিঙ্গন দানে ঘুচাও সকল খেদ,
বিরহ-মহাপাতক হোক্ প্রশমন।

আকাশবাণী। তুমি ত জানহ রামে ; মন্দোদরী করিবে চুম্বন
—রঘুনাথ-শরাঘাতে হত রক্ষোরাজের বদন।
ও জানিবে লঙ্কাপতি —রামভদ্র নহে কদাচন,
মায়া-রাম সাজি,' হাতে দশমুণ্ড করেছে ধারণ ॥

সীতা। (লজ্জিতা)

রাবণ। (স্বগত) রাম-রূপ ধরিবারে কৃতকার্য্য হ'লেম বা যদি,
পাপ-মূল প্রবৃত্তিতে দেবতারা হ'ল প্রতিবাদী ॥

তা হোক্, এখন আমি রণস্থলে তাপসদ্বয়কে বধ করে,' সীতা সহবাসে আমার কেলীকলা কৌতুহল নিবৃত্তি করব।

ইতি "মায়া-রাবণ" নামক অষ্টম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তেল, লুন, লকড়ি।

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশী রকমে অভ্যাস করেছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চ্চা কর্‌তে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙ্গালীভাবে, সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলো-ভাবেরি শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দলবেঁধে বিধিব্যবস্থা-পূর্ব্বক সাহেব হইনি। প্রতি জনেই নিজের খুসি কিম্বা সুবিধা অনুসারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গবঙ্গসমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষরা পহিলা-সমিতি করিনি এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্য্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমাদের নূতন ভাব কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হলে, ভাবনা-চিন্তা চাই, কি রাখ্‌ব কি ছাড়্‌ব তার বিচার চাই, পাঁচজনে একত্র হয়ে কি কর্‌তে পারব এবং কি করা উচিত তার একটা মীমাংসা করা চাই—এক কথায় ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য্য হয়েছে সেই উপায়—একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের মাথায় রোখের সহিত কাজ কর্‌তে গেলে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাকৃতে কিম্বা ফির্‌তে হলে সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেক্‌কে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিলনা, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সুসাধ্য

করতে হলে, মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাকৃতে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চ্চা কর্‌বার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্ব্বিচারে দাসত্ব স্বীকার কর্‌লেই হল; ছাড়তে হলেও দরকার নেই—নির্ব্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌লেই হল। কিন্তু ফির্‌তে হলে, মানুষ হওয়া চাই, কারণ যে ফেরে সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙ্গালী-সাহেবই হই আর খাঁটি বাঙ্গালীই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা-বাঙ্গালী-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নূতন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদবাকী সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত সেই পরিমাণে ফির্‌ব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিলনা ব'লে এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর কোন আয়াস, কোন চেষ্টা ছিলনা—এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে, সুতরাং সাঁতার কাট্‌তে হবে, শুধু এলো-মেলোভাবে, অতিবেগে হাত-পা ছুঁড়লে চল্‌বে না, তাতে পাঁচজনে হাস্‌বে, দশজনে "বহুকা কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বল্‌বে কিন্তু আমরা লাভের মধ্যে শীঘ্রই এলিয়ে পড়্‌ব এবং নাকানি-চুবুনি খাব।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমরা বাঙ্গালী মাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথায় বা শুধু টিকি,—যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই স্বদেশীয়তার

ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঙ্গবঙ্গদলের মন ভারি কর্‌বার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোন স্থায়ী সুফল লাভ করে থাকে ত সে মনে,—আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। মোটামুটি ধর্‌তে গেলে এ ব্যাপারের লাভ-লোকসানের হিসেবটা ঐরূপ দাঁড়ায়। সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট এবং জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে এমন আর অন্য কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয়নি। সকলেই অল্প-বিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরি ধরেছে। বিদেশী বস্তুর বড় বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে চলেছে। আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নামাতে পারি, তা হ'লে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন হবেনা। এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথা নয়—এ ঘরেরও কথা। বাঙ্গালী যখন নিজের সমাজ ছাড়ে তখন সেই সঙ্গে নিজের স্বভাব ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; অর্থাৎ সেখানেও অপরের পায়ের চাপ না পেলে, তার দিন চলেনা। আমাদেরও তাই। নিজের সমাজের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশী সমাজের পায়ের চাপ আমরা পিঠে তুলে নিই। বাঙ্গালিজাতকে পিটে গড়া হয়নি। আমরা ঢালাই হতে ভালবাসি। এক ছাঁচ থেকে বেরুলে আমরা অন্য ছাঁচে না পড়্‌লে ঠাণ্ডা হইনে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক। এবং অনুকরণে যে হেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না, সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেছেন যে, বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু দু একজন ছাড়া মুগ্ধ

ফুটে সে কথা বল্‌তে বড় কেহ সাহসী হননি। দেশীয় সমাজের রীতি-নীতির অধীনতার মধ্যে, কার্য্যের না হোক চিন্তার স্বাধীনতা আছে। যার মন আছে তার সামাজিক আচার-ব্যবহার স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং মতামত ব্যক্ত কর্‌বার অধিকার আছে, কিন্তু বিলাতের অনুকরণে যে বাঙ্গালী ঘর বাঁধে তার একুল ওকুল দুকুল যায়। আমাদের মধ্যে যার মন যত ঢিলে তার সাহেবি-আনার আঁটা-আঁটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায় যে বুঝতে পারেনা সে তার সর্ব্বাঙ্গে হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে একটা খোরপোষের বন্দোবস্ত কর্‌তে বিলেত যাই, সুতরাং বিলেতি সভ্যতার যে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আয়ত্ত কর্‌তে চেষ্টা করব, এর আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যে আরামের লোভে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসি, সেই আরামও আমাদের ঘোটে না। দেশীয় সমাজের চালচলন শৈশব হতে অভ্যস্ত বলে সে দিকে মন দিতে হয়না ঠিক ঠিক জিনিষটে আমরা অবলীলাক্রমে করে যাই, কিন্তু বিদেশী চালচলনসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচে গণ্ডুষ কর্‌তে হয়। একটু বয়েস হলে একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি একটি বিদেশী সমাজের হাজারো-এক খুটি-নাটি, আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করাও তেমনি কঠিন। বিলাতি সভ্যতার সুমুখে বাঙ্গালি-সাহেবের আঁচলটা টান্‌তে টান্‌তে প্রাণ যায়। খানায়, পোষাকে যাঁরা সভ্যতা খোঁজেন তাঁদের খানার, পোষাকের কায়দা কানুন কত্তে কত্তে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হতে হয়। যাঁরা মাছি-মারা নকল করতে চান তাঁদের নিত্য দেখ্‌তে পাই অক্ষরের পর অক্ষর ধরে বিদেশী হালচাল অভ্যেস কর্‌তে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যকে বানান করে পড়্‌তে শুনলে মায়াও করে বিরক্তিও ধরে, সাধারণ ইঙ্গবঙ্গের প্রতিও আমাদের ঐ মনোভাব। কারও কারও

বা বিলেতি সভ্যতার বর্ণপরিচয় হয়েছে কিন্তু অর্থবোধ হয়নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান মহিলার কোরাণপাঠের মত তাঁদের সভ্যতা-চর্চ্চার পরিশ্রমটা বৃথায় যায়। সংস্কারবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁদের প্রাণের টান আছে অথচ শিক্ষাবশতঃ, যাঁরা সংস্কারমাত্রেরই অধীন নন, যাঁদের ধারণা যে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ, যাঁরা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতক পরিমাণে অবলম্বন করেন, হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে নয় জীবনে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে,—এক কথায় যাঁরা শ্যাম এবং কুল দুই রাখবার চেষ্টা করেন তাঁরা আহেল বিলাতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট। বাদবাকি যাঁরা নিজের নিজের ব্যবসায় ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে-খরচ মনে করেন তাঁরাই বুদ্ধিমান। কেন্দ্রভ্রষ্ট ? কোথাকার কোন্ সমাজের কোন্ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট ? এ প্রশ্ন কর্‌লে সকল বুদ্ধিমানই নিরুত্তর। পড়ান কাকাতুয়ার কপচান বুলির মত যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়, যদি তাঁদের বক্তব্যের ভিতর মনের কার্য্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে ত সে মনোভাব এই—তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি কেন্দ্র, তাঁদের কাছ থেকে যে যতটা তফাৎ সে ততটা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী! বিলেতফেরত পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌর জগৎ, হয় কর্ত্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র—পরিবারের আর সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মত তারই চারিদিকে পাক খায়, এখানে-সেখানে দু একটি ধূমকেতু দেখা দেয়। আমাদের কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্ত্তিত, যুগপৎ-পরিবর্দ্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র ; কারও বা গৃহ বিলাতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউবা বিদেশীয়তার দুচার সিঁড়ি ভেঙ্গেছি, কেউবা এক লম্ফে বিলাতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর গিয়ে চড়ে বসেছেন।

সাহেবি-আনার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বে-এক্তিয়ার করে ফেল্‌তে পারে তার প্রমাণ ধর্ম্মতলার রঙ্গমন্দিরে ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ যাচ্ঞালব্ধ বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতায় Tableaux Vivant অভিধেয় বিচিত্র চিত্র অভিনয়। নেশা ধরা পড়ে তুই জিনিষে,—অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্য বিপর্য্যয়ে। এ ব্যাপারে তুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ঐ দৃশ্যকাব্যের পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি কবিত্ব আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিম্বা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ New India সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারের সাপক্ষে New Indiaর মতামত Indian না হোক্ new বটে। জষ্টিস্ অনুকুল মুখর্জ্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি, লাটিন, গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোট বড় বাছা বাছা বাক্য ও পদের অসঙ্গত সমাবেশে মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের জীবনীলেখকের রচনা ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি; জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট বড় নানা বাছা বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসঙ্গত সমাবেশে সম্পাদকমহাশয়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি—চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চ্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উল্টা। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেলা হতে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা করবার একটু

বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর উর্দ্ধে আর উঠতে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেণ্ডুলমকে ঐখান হতেই ফিরতে হবে, এবং কার্য্যতঃ ফিরতে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ এই তুয়ের ভিতর পড়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করছিলেন তাঁদের অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্য-মনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ বলে কোন জিনিষ নেই। আমরা ঝরা পাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখন একত্র জড় করে, কখনও বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ীর এবং রক্তের বন্ধন আছে—তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে অপরের প্রাণের মূলও সেখানে—দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোক ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ সমাজ ত্যাগ করলেও হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করেনি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর একটি সঙ্কীর্ণ সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম,—সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য্য হইনি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নূতন প্রাণ এসেছে, হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশীসমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য অনুভব করতে আরম্ভ করছি, এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মান। আমরা যে সমাজে ফিরছি সে সমাজ পূর্ব্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে তাও আমরা আজ ঠিক ধরতে পারিনে, তার স্বরূপ জানবারও কোন আবশ্যক নেই, শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে, সেই

শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, সেই শক্তির কার্য্য হচ্ছে, আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতি সাধন করা। জড় পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়্‌তে হলে—আগে হতেই একটা plan এবং estimate কর্‌তে হয়, কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে মানুষ তার সাহায্য করতে পারে কিম্বা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোলকল্পিত বর্ণ, গন্ধ, আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভাল করে ফোটানতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্ত্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল যোগান, আর চারপাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র রক্ষা কর্‌ব কিন্তু সে তার শাখাপ্রশাখা হয়ে—পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশী না হই সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের তন-মন-ধন দেশের পায়ে বিকুতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়। আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মান উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেলবার অধিকারী নন, সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্য্যে প্রয়োগ করতে হবে। অল্প হোক, বিস্তর হোক আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয় তার জন্য প্রথমতঃ দিক নির্ণয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজ শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারি তার হিসাব জান্‌তে হবে। অনিচ্ছাস্বত্বেও আমার বক্তব্য দেখ্‌তে পাচ্ছি ক্রমে ফালাও এবং গুরুতর হয়ে আস্‌ছে। এই স্থানেই সুতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধর্‌তে হবে। এ

প্রবন্ধে আমি কতকগুলো সাদাসিধে ছোটখাট দৈনিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা কর্‌ব অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌ছি—ধান-ভান্‌তে বসে শিবের গীত সুরু করে দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ কর্‌ব। সে কথাটি হচ্ছে এই—ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আজকের নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি—তাকেই পত্রপুষ্প-ফলমণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ কর্‌তে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তা স্বদেশী হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চ্চা করছিলুম কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জ্জন করা যায় না এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্ত্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর কালব্যবহিতপূর্ব্বে বিকারের ছট-ফটানি নয়। যে সমাজের প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ,—বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্ত্তন,—সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম ধাতু হতে উৎপন্ন, এমন গুণী আমরা কেউ নই যে জগতের ধাৎ বদলে দিতে পারি। মূল বেয়ে অনেক আশার ফুল ফুটবে, কিন্তু ফল ধর্‌বে না। দেশের মাটি ভালবাসি বলে যে মাটি নিতে হবে, মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌তে হবে, শেষটা মাটি হতে হবে এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে

রাখতে হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবান-দত্ত অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুণ নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেলব, কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় শুধুই ছাই আর কোথায় ছাইঢাকা আগুন আছে কি করে জানব? তার উত্তর,—যদি স্পর্শ করে আগুন না চিনতে পার ত, পাঁজি পুঁথির সাহায্যে তা পাবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতো হবে। বড় গোছের একটা লাফ মার্‌বার পূর্ব্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়—আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্চে। সরিসৃপের মত সমাজও ক্রমাগতঃ দেহকে আকুঞ্চন প্রসারণ ক'রে অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বল্‌তে উদ্যত হয়েছি।

(২)

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে।

"ভুল গেয়া রাগরঙ্গ ভুল গেয়া ইয়কড়ি
ইয়াদ রহ আজ খালি তেল লুন লকড়ি"

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবে দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য কতই না হাবভাব, লীলাখেলার চর্চ্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস, বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরি অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হতে যত্ন ও

পরিশ্রমের ত্রুটি করিনি। এত করেও যখন মন পেলুম না তখন মান অভিমানের পালা সুরু কল্লুম। ফল তাতে উল্টো হল, দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল লুন লকড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল-লুন-লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্য, মিথ্যা জ্ঞান কর্‌লে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে অন্ন, প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই অন্নচিন্তা হতে উদ্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল-লুন-লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।—Material prosperity সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল-লুন-লকড়ির অধীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়—তেল-লুন-লকড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে ভারতবাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্চি, কেননা দেশের রস বিদেশ টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস, নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত করতে পারি সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি তাহলে, আমাদের "রাগরঙ্গ ইয়কড়ি" ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হলে মনে রাখতে হবে, শুধু "তেল-লুন-লকড়ি"। রস্কিন্‌ তাঁর সমস্ত জীবন ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, economics এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ household management অর্থাৎ

গৃহস্থালা। প্রতি গৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন তা হলে সমগ্র জাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ তা হলে হাটেবাজারে যতই কেনা, বেচা করনা কেন, তাতে নিজে কিম্বা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখলাভে বঞ্চিত হবে। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিষ্ফল করে দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর প্রতিলোক ঘরে এসে তার উল্টো টান্ টানি—তাহলে ঘর, বার দুই নষ্ট হবে। আমি রস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই প্রচার করতে উদ্যতা হয়েছি যে, সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহ সম্মার্জ্জনা করা।

(৬)

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্ দেশীয় বলা কঠিন। বাঙ্গালার বাইরে, কি স্বদেশ কি বিদেশ, কোথায়ও তার জুড়ি দেখতে পাইনে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার সহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লী, পল্লী হতে নগর, নগর হতে সহর, ক্রম-বিকাশের এই নিয়ম। রোম, প্যারিস্ প্রভৃতি বনেদি সহরের architectureএতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। ঐ architecture-এর প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্ত্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়, প্রত্যেকেই নিজের, আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তার ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; তা হতে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদান্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে

করেন—তেমনি ইউরোপের মহদান্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, মানবজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্চে Nationalism, তাহাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্চে inter-nationalism। সে যাই হোক, কলিকাতার মত ভুঁইফোড় সহরে, শ্রীহীন, অর্থহীন, কিম্ভুত-কিমাকার ভুঁইফোড় গৃহে বাস ক'রে আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়,—চকমেলান বাড়ী হালফেসানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে দুটি, ওপাশে দুটি এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বহির্দিকের ঘর কটী হচ্ছে অন্দর। বাস-স্থানের এই উল্টো পাল্টা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মের দেশে ঘরে হাওয়াও চাই ছাওয়াও চাই,—এক সঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব বলে, এদেশের গৃহ দু ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্য্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্ম্মাণের হিসাব বাৎলে দেয়। প্রকৃতিই এদেশের গৃহ, সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন। এবং আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্য্যম্পশ্যা হবার লোভেতেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই—সেখানে সমাজেও স্ত্রী-পুরুষের সাম্য অর্থ ঐক্য এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজি-আনার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেস্তে যাবার প্রধান ফল যে, আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই

গৃহে অনেকটা সঙ্কুচিত ভাবে বাস করি। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়া-পড়সীর বৈঠকখানা হতে পরে না এবং বাড়ীর কোন অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। ইংরাজ এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখবার জন্য দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাদের অনুকরণে বাসা বাঁধলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বসমাজ হতে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে, স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐ খানেই, গৃহসূত্র হতেই মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়ীবদলানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ দিতে রাজি নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা একটা বড় গোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, এবং তার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। সাহেবী-আনার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভব রকম জটিল হয়ে পড়েছে। আস্‌বাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুস্কিল, চলে ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ত একবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটীল গতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়, সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য, গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র,—লক্ষ্মী স্বরস্বতীর মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরণের গৃহসজ্জার বর্ণনা করবার কোনও দরকার নেই, কারণ তা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, টিপয়, পিয়ানো,

আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেলসের কারপেট, চিনের পুঁতুল, ওলিওগ্রাফের ছবি, এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই সকল উপকরণ হয় Lazarus এবং Osler, নয় বৌবাজারের বিক্রাওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখ্‌তে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাব-পত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোন চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই, কোন টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে, পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কোচের নাড়ভুঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চিনের পুঁতুলের ধড় আছে কিন্তু মুণ্ডু নেই, পারিস প্লাস্টারের ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত; ওলিওগ্রাফ সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়াম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই সকল অব্যবহার্য্য, কদর্য্য আবর্জ্জনা দূর করে, তার পরিবর্ত্তে ফরাস বিছিয়ে বসি না কেন? কারণ ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি যে, দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তাহলে নিঃসন্দেহ সব দেখে শুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক্ হয়ে তাঁরাও উর্দ্ধনেত্রে চেয়ে থাক্‌বেন, নির্ব্বাক্ হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাক্‌ব। উভয় পক্ষে কোন বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশনবসন আসনভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয় তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না; কৈফিয়ৎ চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বলবার আছে, তিনি সম্ভবতঃ এই উত্তর দেবেন যে, "জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট

সঙ্কীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে। রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝতেন শুধু স্থিতি আমরা বুঝি উন্নতি, আপনাদের গুরু ছিল মনু আমাদের গুরু হার্বাট স্পেনসার, আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকুল কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকুল"। এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ নেই, কারণ যে প্রথা অবলম্বন কর্‌লে হিন্দু মুসলমান এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে আচারব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন, জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তেই হবে তার কোন প্রমাণ নেই। গতি মাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান-ভূমি আছে একটি দিক নির্দ্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্ব্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্ত্তন যেমন কালসাপেক্ষ পরিবর্দ্ধন তেমনি দেশ ও পাত্র সাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্ব্বপুরুষরা বিরাজ কর্‌ছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাজ বিরাজ কর্‌ছে। বংশপরম্পরা heredity হতে বিছিন্ন হয়ে কোন উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্ব্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানব-জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহং জ্ঞানের মূল, পূর্ব্বাপরের যোগসূত্রস্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাক্‌লে আত্মোন্নতি দূরে থাকুক কেহই আত্মার সন্ধান পেতেন না, তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহং জ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য

হয়ে কোন জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না, জাতীয় আত্মোন্নতি ত দূরে থাকুক। এবং সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্চে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞানরহিত হলে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে, ইঙ্গবঙ্গনামক খেটে-খাওয়া দলের লোক্‌কে বিরক্ত করবার কোন অভিপ্রায় নেই। এঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, আলোচনা বন্ধ করবার জন্য, আরম্ভ করবার জন্য নয়। হার্বাট স্পেন্‌সার এঁদের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন্, দীক্ষাগুরু। ইউ-রোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এঁরা কিছুই শিক্ষালাভ করেননি, শুধু দুটি একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন, যথা, সভ্যতা, উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত এই নব্যতান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্বোধ, সম্ভবতঃ যত অর্থশূন্য তার তত মাহাত্ম্য! ইউরোপীয় সভ্যতা এঁরা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চান্‌না, ভক্তি দ্বারা পেতে চান্। দাস্য ভাব পথ্যভাবের চর্চ্চাই এঁরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এঁদের যে অবস্থাটাকে দুর্দ্দশা বলে মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপ ভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক কর্‌তে প্রস্তুত তাঁরা তর্কে হার মান্‌তেও প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের মনোভাব এই, নগদ দামে না হয় ধার ক'রে দুখানা কোচ মেজ কিন্‌ব, এর মধ্যে আবার দর্শন, বিজ্ঞান কোথায়। নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত সেটা ঠিক কর্‌তে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবি-আনার স্বপক্ষে এঁরা হয় সুবিধা না হয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন beautyর দোহাই চলে না তখন utilityর দোহাই দেন, যখন utilityর দোহাই চলে না তখন beautyর দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার

ব্যবহারের utilityর ব্যাখ্যান সুরু করেন্ তখন মনে হয় এঁরা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান, আর যখন এঁরা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের beautyর ব্যাখ্যান সুরু করেন্ তখন মনে হয় Oscar Wildeর মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ এঁদের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিম্বা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ওরকম কেন, এঁরা হেসে উত্তর কর্বেন আমরা "কবি নই, কাযের লোক"। এঁদের বিশ্বাস, দো-আঁসলা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গবঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁষে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোক বাড়ে। এবং এই বিশ্বাস মিলের মতানুযায়ী। এঁদের রুচিসম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরাজি আসবাবের আবশ্যকীয়তা এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশী রকমে ঘর সাজানতে যে আমাদের কি পর্য্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ সে ত সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের পক্ষে ঠাট্ বজায় রাখতেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হয়। ধার করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে, অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচারব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকী ত বটেই সম্ভবতঃ অন্যায়ও। ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হতে লক্ষ্মীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বিদেশী বস্তুতে যদি গৃহপূর্ণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশীর পকেট পূর্ণ করতে হয়, তাহলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ান যায় জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিস্কার হয়। যদি আমার এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তাহলে তত সংগ্রহ করবার জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে, এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম

স্বীকার করতে বাধ্য সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্য চর্চ্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসিয়াবাসীদের নিকট সর্ব্বত্রই হার মান্‌ছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চিনে, জাপানি, হিন্দুস্থানী শ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসিয়াবাসিরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয়, সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ, আমাদের জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ করতুম, আমরা যদি বঞ্চিত, প্রতারিত না হতুম, তা হলে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী কর্বেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, standard of life বাড়ান, সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্ব্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবন-যাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে থাকেন, "আমার খুসি"! আমাদের দেশের রাজা, সমাজের অধি-নায়ক নন্। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা এদেশে কখন সামাজিক দলপতি হতে পারেন না—সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে, কিন্তু শাসন মানাবার কোনও উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে, যে কার্য্যে কোনও

বাইরের শাস্তি নেই সে কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে, এঁরা যে নিজেদে
বিশেষরূপে নির্ভিক্, স্বাধীনচেতা এবং পুরুষসার্দ্দূল বলে প্রমা
করেন, তার আর সন্দেহ কি ? অবশ্য একথা স্বীকার কর্‌তে হবে যে
"এঁদের খুসি" প্রভুদের খুসির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এব
সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। সেত হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ
সুতরাং পরস্পরের মিল সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি
কেহ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে চেয়ার, টেবিল, কোচ, মেজ
ইত্যাদি দেহ, আত্মা, কিম্বা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূ
সাহায্য করে তাহলে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকৃব, কারণ সত্যে
খাতিরে আমাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, চৌকি, কোচ অনেকট
আরামের জিনিস, এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত
হতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কম-জো
এবং ঈষৎ বক্র সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলে
আকাঙ্ক্ষী। এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক
যোগশাস্ত্রে বলে, সকল প্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদ
বর্ত্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা—
পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গী স্ত্রীলোকের মত, সম্মু
দিকে ঈষৎ আনমিত ; অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যা
সেলাম এবং নমস্কারচর্চ্চা বশতঃ। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী
যদি জাগ্রত কর্‌তে হয়, তাহলে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া কর্‌তে
হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ কর্‌তে হবে। সুতরাং একমা
দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী আসবাবের প্রচার এবং অবলম্ব
সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপে
কাছে যা শিখেছে আমরা তা শিখিনি, কিন্তু খুব কম লোকেই জানে
যে ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি জাপান তা শেখেনি

ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালাভ কর্‌তে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জ্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান দরকার এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে!—খাওয়া-পরা থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করেনি। বিলেতি আস্‌বাব জাপানীর ঘরে স্থান পায়নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসীন্।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

---

* জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জান্‌তে চান তাঁহাদের আমি বক্ষ্যমান গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি। K. Okakuraর Ideals of the East এবং The Awakening of Japan, Y. Okakuraর Spirit of Japan, Nitobeর Bushido, Lafcadio, Hearnএর Kokora প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কাহারও এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং তাঁর ফরাসি ভাষা জানা থাকে তাহলে তাঁকে আমি Felicien Challayeর Au Japan নামক গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। গুটি পঞ্চাশ পাতায় গ্রন্থকার আসল কথা অতি পরিস্কার করে বর্ণনা এবং ব্যাখা করেছেন। —লেঃ

পাণিনি তত্ত্ব।

(লিখন-প্রণালী)

(২)

পাণিনি-ব্যাকরণের নির্ম্মাণকৌশল, শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং রক্ষা এ গুলিও লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক। একটু প্রণিধানের সহিত সূত্রগুলি পাঠ করিলেই এই বিষয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। পাণিনি, সংস্কৃত শব্দগুলিকে বিশ্লেষ করিয়া তাহা- দিগের প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটি প্রধান অবয়ব পরিকল্পিত করিয়া প্রথম অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুশাসন শাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহার মধ্যেও তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যে সকল প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন সেগুলিও প্রকৃতি নির্ম্মাণের উপযোগী, প্রকৃতিরই এক অঙ্গ মাত্র। মূল প্রকৃতি ও প্রত্যয়যুক্ত প্রকৃতির উত্তর যথাসম্ভব সুপ ও তিঙ্ বিভক্তি যোগের, এবং ঐ সকল বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন পদের, কিরূপ আকৃতি হয় তাহা ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ক্রমে বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে পদ সন্ধি ও ষত্ব ও ণত্বের বিধান বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্বরবিষয়ক সূত্রগুলি যথা স্থানে, অর্থাৎ প্রকৃতির স্বর প্রকৃতি-প্রকরণে, প্রত্যয়ের স্বর প্রত্যয়-প্রকরণে ও পদস্বর পদ-প্রকরণে বলিয়াছেন। এই নির্ম্মাণকৌশল, প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন। এক সন্ধিসূত্রই নানাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের সন্ধি, প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সন্ধি, পদের সহিত পদের সন্ধি, প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। এইরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার এক স্থানে, প্রত্যয়ের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার অপর একস্থানে, এবং পদসান্নিধ্যে পদবিকার

অন্য এক স্থানে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপে প্রথম পরিকল্পিত প্রকৃতি ও বিকৃতি ও তাহাদের বিকৃতির কথা পর পর থাকায় কোথাও বা শব্দ-সাধন ও ধাতু-সাধনের নিয়ম একই সূত্রে বলা হইয়াছে। তদ্ধিত ও সুপ্ বিভক্তির নিয়মও ঐরূপ একই স্থানে বলা হইয়াছে। এই প্রকার সূত্রবিন্যাসের ফল এইরূপ হইয়াছে যে, সাহিত্যের ব্যবহৃত একটি পদ সাধন করিতে হইলে পাণিনি ব্যাকরণের নানা অধ্যায়ের নানা সূত্রের সাহায্য লইতে হয়। পাণিনির একাংশ অধ্যয়ন করিলে কোন বিষয়েরই সম্যক অধিকার জন্মেনা। সমগ্র পাণিনি অধ্যয়ন না করিলে সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ বুৎপত্তি জন্মেনা। মুগ্ধবোধ বা কলাপ ব্যাকরণের নির্ম্মাণপ্রণালী অন্যরূপ। সন্ধি, শব্দসাধন, ও ধাতুসাধনের সূত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত নাই, সন্ধিসূত্রগুলি একস্থানে, শব্দসাধনসূত্রগুলি একস্থানে, ধাতুসাধনসূত্রগুলি একস্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকায় একবিষয়ক সূত্র একই স্থানে সমগ্র অবস্থায় আছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই নিয়মটী বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি সর্ব্বাঙ্গীন না হওয়ায় উহাদিগকে সম্যক্ শাস্ত্রশিক্ষার উপযোগী বলা যায় না। ঐ সকল বাকরণের সাহায্যে বৈদিকসাহিত্যে প্রবেশের অধিকারই জন্মেনা, ভাষা-সাহিত্যেরও সম্যক্ জ্ঞান হয়না। পাণিনি, বাকরণ-নির্ম্মাণে কিরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন, ও কত বিষয়ে যুগপৎ লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, স্বল্পাক্ষরে তাহার পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। পাণিনিসূত্রের একটী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ বিষয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন নির্ঘণ্ট মুদ্রিত হয় নাই। প্রকৃতি প্রত্যয় ও উহাদের বিকৃতি বিষয়ক নিয়ম করিয়াই পাণিনি সহজ উপায়ে স্বল্প সংখ্যক সূত্র দ্বারা অনন্ত সংস্কৃত শব্দরাশির শাসন করিয়াছিলেন। এই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে

গিয়া যে সকল "অধিকার সূত্র" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ঐ সকল অধিকার সূত্রের কোথায়ও পূর্ণানুবৃত্তি, কোথায়ও বা আংশিক অনুবৃত্তির নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সকল অধিকারের গতি দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, এক উদ্যমেই এমন সর্ব্বতোমুখী, নিরবদ্য, স্বল্পাক্ষর, সারবান, নিরর্থক অক্ষর-বিহীন, অসন্দিগ্ধ শাস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই। প্রথম রচিত সূত্রগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার করিতে করিতে এবং তাহাদিকে নানাস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে করিতে যথাস্থানে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এবং অনেক অভাব, ক্রমে লক্ষিত হইয়া পরে তাহাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় উদাহরণ প্রদানে বিরত হইলাম। কুতূহলী পাঠক নির্ঘণ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেই সহজে বিষয়টি বোধগম্য করিতে পারিবেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পাণিনি ভাষাসুন্দরীর কেবল বহিরাকার দর্শান যথেষ্ট মনে করেন নাই; উহার অস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুগুলিও দর্শাইয়াছেন। একটী সূত্র বা তাহার একটী অক্ষরও স্থানভ্রষ্ট করিবার যোগ্য নহে। মহাবৃত্তিকার কাত্যায়ণ, এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি-প্রমুখ মনীষীগণ সূত্রগুলির তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া রচনাকৌশলের ও সম্পূর্ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। নমস্কারসূত্রই তাহার প্রমাণ।

"যেনাক্ষর সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

পাণিনির সময়ে বহু বৈয়াকরণের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, তাহাও তিনি আপন ব্যাকরণে সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে এইরূপ ব্যাকরণ রচিত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ

হয়। লিখন-প্রণালীর সাহায্য অবশ্যই গৃহীত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

মোক্ষমুলার মহোদয়ও পাণিনিসূত্রের রচনাকৌশল দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি মোক্ষমূলারের বিস্ময় কেবল বিস্ময়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি বিস্মিত না হইয়া, বিস্ময়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, পাণিনিসূত্রের নির্ম্মাণকৌশলের মধ্যেই লিপিপ্রণালীর প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। তাঁহার পক্ষ এই যে, আর্য্য জাতির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বেদ ও বৈদিক অন্যান্য শাস্ত্র বংশপরম্পরা মুখে মুখে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং পাণিনিব্যাকরণ রচনায় লিখনপ্রণালীর সাহায্যের অত্যাবশ্যকতা দেখা যায় না। কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যেই পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তটী ঠিক হইল না। কোন একটি সন্দর্ভ রচনা করা বা তাহার ব্যাখ্যা করা অথবা ঐ সন্দর্ভ ও তাহার ব্যাখ্যা বংশপরম্পরা অভ্যস্ত রাখা এক কথা; আর সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে পাণিনি ব্যাকরণরত্ন সংগ্রহ করা অপর এক কথা। দুইটা গুরুতর বিভিন্ন বিষয়। বিষয়ের সাম্যাভাবে দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। সে যাহাহউক, লিখনপ্রণালীর সাহায্য না লইয়াও পাণিনিই যেন ব্যাকরণ রচনা করিলেন। লিখনপ্রণালীর সাহায্য ব্যতীত তাহার প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য কি উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে? কেবল পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্রগুলির আবৃত্তিতে ফলোদয় হয় না। যোগ্য অধ্যাপক অথবা বৃত্তি এবং উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের সাহায্য ব্যতীত সূত্রের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাপ্তি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই ব্যাপার দীর্ঘকালসাপেক্ষ। মোক্ষমূলার মহোদয়ের মত ঠিক হইলে পাণিনির সময়ের প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিপ্রতিভাসম্পন্ন

ছিলেন একথা স্বীকার না করিলে পাণিনি-ব্যাকরণের প্রচার ও রক্ষা হওয়ার অন্য কোন উপায়ই দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লিপিকৌশল এত মহোচ্চ প্রতিভার বিজ্ঞাপক নহে যাহা আর্য্য জাতির বুদ্ধিস্থ হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং মোক্ষমূলার মহোদয়ের পক্ষ সমর্থন জন্য কোনরূপ কষ্টকল্পনা না করিয়া লিপিপ্রণালীর অস্তিত্ব স্বীকার করাই সুগম পথ।

পাণিনির সময়ে লিখনপ্রণালী প্রচলিত থাকার অনুকূলে অনেক যুক্তি পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ যুক্তিগুলি ব্যতিরেক-মুখী। পক্ষসমর্থণে ঐরূপ যুক্তি অনেকের পক্ষে যথেষ্ট না হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে অন্বয়মুখী কয়েকটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে দেখা যাইবে যে, পাণিনি-ব্যকরণেই লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব পরিচায়ক, এমন কি লিখিত বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জকও অনেক শব্দ আছে।

৩।২।২১ সূত্রে* "লিপিকর" শব্দ আছে। লিপিকর শব্দের অর্থ লেখক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লিখনপ্রণালীর প্রচলন না থাকিলে লিপিকর শব্দটীর প্রচলন হইত না। লিপিকর শব্দ চির-প্রচলিত শব্দ না হইলে পাণিনি-ব্যাকরণে স্থানও পাইতনা। পাণিনির প্রতিজ্ঞাসূত্র এই—

অথ শব্দানুশাসনং।

অর্থাৎ এক্ষণে শব্দানুশাসন শাস্ত্র বলা হইতেছে। এই শব্দ সাধু শব্দ। বেদে ও লোকে যে সকল শব্দ চিরপ্রসিদ্ধ আছে সেই গুলিই সাধু শব্দ। শব্দানুশাসন শাস্ত্রে লোকে ও বেদে যে সকল শব্দ চির-

* দিবা-বিভা-নিশা-প্রভা-ভাস্কারান্তা নন্তাদি-বহু--নান্দী--কিং--লিপি-লিবি-বলি-ভক্তি-কর্ত্তৃ-চিত্র-ক্ষেত্র-সংখ্যা-জঙ্ঘা-বাহ্ব-হর্যতদ্ধনুররুষু। ৩।২।২১

প্রসিদ্ধ আছে তাহারই যথাযথ ব্যুৎপত্তি বলা হইবে। নূতন কোন শব্দের বা নূতন কোন ব্যৎপত্তির সৃষ্টি করা হইবেনা। ইহাই পাণিনির প্রতিজ্ঞাসূত্রের অর্থ। এই অর্থই আর্য্য মনীষীগণ একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই অর্থ সমীচান বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এক "লিপি-কর" শব্দ দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পাণিনির সময়ের স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যগণের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। মোক্ষমূলার মহোদয় এই "লিপিকর" শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শব্দটী তাঁহার অভীষ্ট তর্কের অত্যন্ত প্রতি-কূল তাহাও অবশ্য বুঝিয়াছিলেন। তর্কটীও ত্যাগ করিলেন না, শব্দটীকেও উঠাইয়া দিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, এরূপ একটি শব্দদ্বারা লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয় না। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসা!

৪।১।৪৯ সূত্রে* "যবনানী" শব্দ আছে। ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"যবনাল্লিপ্যাম্" "যবনানী লিপিঃ"। "যবনানী লিপিঃ" অর্থে যবনদিগের লিপি বুঝায়। প্রসিদ্ধ বীরবর আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের পর ভারতপ্রান্তে যে একটী গ্রীক্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তত্রত্য গ্রীক্‌গণ যবন নামে অভিহিত হইয়া থাকিলেও সূত্রস্থ যবনশব্দ উহাদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। পাণিনি সূত্র গ্রীক অভিযানের বহু পূর্ব্বে রচিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদিগের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, ইহা আচার্য্যগণ জানিতেন। এমন কি লিপি-বোধক "যবনানী" শব্দ সিদ্ধ-শব্দ-পর্য্যায়-সন্নিবিষ্ট অবস্থায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আর্য্যগণমধ্যে সাধু শব্দরূপে প্রচলিত হইয়া পাণিনি

* ৪।১।৪৯ ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যবন মাতুলাচার্য্যাণা মানুক।

ব্যাকরণে স্থানলাভ করিয়াছিল। বেদপ্রাণ আর্য্যগণ লিখনপ্রণালীতে অভিজ্ঞ থাকিয়াও, প্রবল প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনাদিগের শাস্ত্র রক্ষার জন্য আপনাদিগের মধ্যে ঐ প্রণালীর প্রচলন করেন নাই, একথা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "যবনালিপি" অন্যবিধ লিপির ব্যাবর্ত্তক। সুতরাং যবনলিপিই আর্য্য লিপির অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে। এস্থলে আর এক তর্ক হইতে পারে, কোন্ জাতি সর্ব্ব প্রথমে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন? আর্য্যজাতি কি তদিতরজাতি? এ তর্কের সম্যক্ উত্তর দেওয়ার প্রমাণাবলী এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। আর্য্যজাতির বর্ণমালার সম্পূর্ণতা ও অক্ষর সমাম্নায় অর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রমপাঠ, স্বর ব্যঞ্জনবিভাগ, উচ্চারণ ভেদে বর্ণের বর্গাদি নিরূপণ ও স্থান বিভাগ, ইত্যাদি আর্য্য লিখনপ্রণালীর মৌলিকত্বের অনুকূলে প্রবল প্রমাণ বলিয়া একদিন না একদিন সকল দেশেই গৃহীত হইবে. আশা করা যাইতে পারে।

মোক্ষমূলার মহোদয়ের আর একটী তর্ক এই যে, পাণিনি ব্যাকরণে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দ নাই। লিখনপ্রণালী তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে উহাতে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দ অবশ্যই থাকিত। ইহাকে সুতর্ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করিতে হইলেই বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দের অবশ্য উল্লেখ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। বর্ত্তমানকালের কোন প্রথা, প্রাচীন প্রথার নিয়ামক হইতে পারেনা। বর্ত্তমান কালেও বর্ণের আকৃতি ব্যঞ্জক শব্দ অন্যান্য সংস্কৃত ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না। মুগ্ধবোধের "... অঃ নুবী" সূত্রে বর্ণের আকৃতির কোন কথা নাই। বৃত্তিতে আ... সে যাহাহউক পাণিনি, "শব্দানুশাসনম্" শাস্ত্রে শব্দের যথাযথ ব্যুৎ... বলিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বর্ণ বা অক্ষরের লিখনপ্র...

বলিবেন এমত কোন অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বর্ণের আকৃতি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র আপন ব্যাকরণে মুখ্যভাবে বলিতে গেলে প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ঠ হইতেন। সুতরাং, পাণিনিব্যাকরণে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দের অভাব থাকা প্রকৃত হইলেও তদ্বারা লিখনপ্রণালীর প্রতিকূলে কোন সিদ্ধান্তই করা যায়না। সৌভাগ্যক্রমে দুই একটী বর্ণের আকৃতি ব্যঞ্জক শব্দ পাণিনি-ব্যাকরণে প্রসঙ্গাধীন পাওয়া যায়। কর্ণে লক্ষণস্যা-বিষ্টাষ্ঠ পঞ্চ-মণি-ভিন্ন-ছিন্ন-চ্ছিদ্র-স্রুব-স্বস্তিকস্য ৬।৩৫। এই সূত্রে "পঞ্চকর্ণ" ও "অষ্টকর্ণ" শব্দ আছে। এই সূত্রের অর্থ এই যে "কর্ণ" শব্দ উত্তরপদে থাকিলে লক্ষণবাচি পূর্ব্বপদস্থ অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়, "পঞ্চ কর্ণ" "অষ্টকর্ণ" প্রভৃতি স্থলে হয় না। এই লক্ষণবাচি শব্দ কি? এই সূত্রে পূর্ব্বপ্রচলিত একটী প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এই, পূর্ব্বে পশুস্বামিগণ আপনাপন পশুর পরিচয় জন্য উপায়বিশেষদ্বারা পশুর কর্ণের বিশেষ বিশেষ আকৃতি করিয়া দিতেন। ঐ ঐ আকৃতি-বিশিষ্ট কর্ণই পশুর স্বামীর পরিচায়ক হইত। এই সূত্রের 'লক্ষণ' শব্দ ঐ ঐ আকৃতিকে সূচিত করিতেছে। সুতরাং "পঞ্চকর্ণ" ও "অষ্টকর্ণ" শব্দের অর্থ পঞ্চাকৃতি কর্ণ ও অষ্টাকৃতি কর্ণ। উচ্চারণে বর্ণের আকৃতির অসম্ভব। সুতরাং ঐ আকৃতিকে লিখিত পাঁচ ও আটের আকৃতি বলিতেই হইতেছে। এই এই আকৃতি দ্বারা পশুরক্ষক রাখালগণও আপনাপন স্বামীর পশু অবশ্য চিনিয়া লইত। যে দেশের রাখালগণেরও লিখনপ্রণালীর কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, সে দেশের শিক্ষিত আর্য্যগণের লিখনপ্রণালীর অভিজ্ঞতা ছিলনা, একথা বলা বক্তার বিড়ম্বনামাত্র। বেদপ্রাণ আর্য্যগণের লিখন-প্রণালীর অত্যাবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ঐ সকল কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে, মোক্ষমূলর মহোদয় এই দুইটি শব্দের কোন উল্লেখই করেন নাই। শব্দ দুইটি

তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই অথবা উহাদের সমালোচনা করা তিনি অনাবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

সমুদাংভ্যো যমোৎ গ্রন্থে।১।৩।৭৫

অধিকৃত্য কৃতেগ্রন্থে।৪।৩.৮৭

গ্রন্থান্তাধিকেচ।৬।৩।৭৯

সূত্রে “গ্রন্থ” শব্দ আছে। এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ কি? ‘গ্রন্থ’ শব্দে লিখিত পুস্তক বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। চুরাদিগণীয় ‘গ্রন্থ’ বন্ধনে, এই ধাতু হইতে পুস্তকার্থক গ্রন্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ তালপত্রে বা অন্য কোনরূপ পত্রে পুস্তক লিখিয়া পত্রগুলির মধ্যে ছিদ্র করিয়া সূত্রদ্বারা গাঁথিতেন এবং বন্ধনও করিতেন। ইহাকেই গ্রন্থ বলা হইত। বোধ হয় এই কারণেই গ্রন্থশব্দের পুস্তক অর্থ হইয়াছে। ধাতুপাঠে ‘গ্রন্থ’ শব্দের আরও ব্যুৎপত্তি ও অর্থ থাকা দৃষ্ট হয়। ‘গ্রন্থ’ সন্দর্ভে (চুরাদি), ‘গ্রন্থ’ সন্দর্ভে ক্র্যাদি। সন্দর্ভার্থক ধাতু হইতেও ‘গ্রন্থ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। সন্দর্ভ অর্থে ‘রচনা’। পাণিনি-সূত্রস্থ ‘গ্রন্থ’ শব্দ উভয়ার্থের সহিতই ঐক্য হয়। পুস্তকার্থ গ্রহণ করিলে ‘গ্রন্থ’ শব্দ লিখনপ্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক হয়। মোক্ষমুলার মহোদয় সন্দর্ভার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অপর অর্থ ত্যাগের যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করেন নাই। স্বরিতেনাধিকারঃ ১।৩।১১ সূত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে ‘স্বরিত’ দ্বারা অধিকার বুঝিতে হইবে। এই ‘স্বরিত’ কি? ইহা কি লিখিত চিহ্ন, যাহা বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টিতে যুক্ত থাকিবার কথা, অথবা ইহা সমাহারঃ স্বরিতঃ ১।৩।৩১ সূত্রের কথিত স্বরবিশেষ? ঐরূপ অনুদাত্ত ঙিত আত্মনেপদম্।১।৩।১২ সূত্রে ‘অনুদাত্তেৎ’ ধাতুর এবং স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ১।৩।৭২॥ সূত্রে ‘স্বরিতেৎ’ ধাতুর উল্লেখ আছে—এস্থলেও জিজ্ঞাস্য এই

যে এই অনুদাত্ত ও স্বরিত কি লিখিত চিহ্ন, কি উচ্চারিত স্বর, যাহা নীচৈ রনুদাত্তঃ।১।২।৩০ সূত্রে ও সমাহারঃ স্বরিতঃ।১।২।৩১ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে? বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ১।৩।১১, ১।৩।১২, ও ১।৩।৭২ সূত্রের লিখিত অনুদাত্ত ও স্বরিত লিখিত চিহ্ন, থাকার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬।১।১৬২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে। যথা পচতি, যাতি।

ধাতুর গণ পাঠে দেখা যায়, অনেক একস্বরবিশিষ্ট ধাতু আছে যাহারা উদাত্ত বা স্বরিত অথচ অনুদাত্তেৎ। এই সকল ধাতুর পারায়ণ কিপ্রকারে করা যাইবে? যদি অনুদাত্ত বা স্বরিত, লিখিত চিহ্নমাত্র হয় তাহা হইলে কোন তর্কের বিষয় থাকেনা। ধাতুর পারায়ণ কার্য্য, গণ পাঠোক্ত স্বরেই হইতে পারে। কিন্তু অনুদাত্ত বা স্বরিতকে উচ্চারণবিশেষ স্বীকার করিলে অনুদাত্তেৎ স্বরিত অথবা উদাত্ত এক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর পারায়ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভগবান্ পাণিনি ব্যাকরণে অনেক সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্বরিতেৎ বা অনুদাত্তেৎ ইত্যাদি না বলিয়া ঐ ঐ বিষয়ের পরিচায়ক এক একটী স্বতন্ত্র ইৎ সংজ্ঞক অনুবন্ধ বর্ণ মাত্র ধাতুর সহিত যোগ করিয়া দিলেই শিষ্যদিগকে এই ব্যাকুলতা হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিতেন। এক স্বরবিশিষ্ট অনুদাত্তেৎ ধাতুরও অন্ত্যস্বরবর্ণ পারায়ণ সময়ে অনুদাত্ত ও প্রয়োগ সময়ে।৬।১।১৬২ সূত্রানুসারে উদাত্ত পাঠ করার গোলযোগ হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেন। ধাতুর গণ এক্ষণে যেমন প্রচলিত আছে ভগবান্ পাণিনির সময়েও ঐরূপ গণ-পাঠ যে প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাণিনি-ব্যাকরণেই আছে, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।১।২।৩, ৪, ১২, ৭২॥২।৪।৭১।৭২, ৭৫, ৭৯॥৬।১।৬৮, ৩৯, ৭৩, ৭৭, ৭৮,৮১॥ সূত্রগুলি পাঠ করিলেই ঐ বিষয়ক যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১।৩।১১ সূত্রে যে স্বরিতদ্বারা অধিকার বুঝিবার উল্লেখ আছে, এই অধিকার কি ? অধিকৃত বর্ণ বা বর্ণসমূহ পর পর সূত্রে যুক্ত থাকিবে ইহাই অধিকার শব্দের তাৎপর্য্য। সূত্রের অবয়বের লাঘব করাই অধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য। পাণিনি-ব্যাকরণের অনেক স্থলেই এই অধিকারের আশ্রয় গৃহীত হইয়াছে। কোথাও বা সমগ্র সূত্র কোথায় বা সূত্রের একাংশের অধিকার চলিয়াছে। এক্ষণে সূত্রপাঠে তাহা সর্ব্বত্র বুঝা যায় না। বৃত্তি বা উপদেশের সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হয়। স্বরিত দ্বারা এই অধিকার বুঝিতে হইবে, একথা ভগবান পাণিনি বলিয়াছেন। যেস্থলে একটীমাত্র বর্ণের অধিকার বুঝিতে হয় সেস্থলে স্বরিতকে উচ্চারিত স্বর বলিলেও কথঞ্চিৎ চলিতে পারে, কিন্তু যেস্থলে শব্দসমূহ অধিকার সংজ্ঞার অন্তর্গত হয় সে স্থলে বড়ই কঠিন সমস্যা। এমন অনেক স্থল আছে যে, অধিকৃত শব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলির স্বরবর্ণ উদাত্ত, কতকগুলির অনুদত্ত ও কতকগুলির স্বরিত প্রকৃত উচ্চারণ। ঐ সকল স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া সকল গুলিকেই স্বরিতস্বরে উচ্চারণ করার ব্যবস্থা ছিল, একথা স্বীকার করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। তাহার শব্দ উচ্চারণ ঠিক ঠিক স্বরে হইতেই হইবে। নতুবা উচ্চারণ ফলবান হইবে না, প্রত্যুত উচ্চারকের অপরাধ হইবে ও তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। সমাস ও প্রত্যয়ের যে সকল স্বর নিরূপিত আছে অধিকৃত-সমাস-যুক্ত ও প্রত্যয় স্বরবর্ণ গুলি যুক্ত ঠিক সেই সেই স্বরে পঠিত না হইলে সূত্রের অর্থই অন্যরূপ হইবার আশঙ্কা। এতগুলি অনিষ্ট দর্শন করিয়াও ভগবান্ পাণিনি প্রকৃত উচ্চারণের পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া অধিকৃত শব্দগুলিকে একস্বরিত স্বরে পাঠ করার ব্যবস্থা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না। অনুদাত্ত ও স্বরিতকে এই এই স্থলে লিখিত সঙ্কেত গণ্য করিলে সমুদয় কষ্টকল্পনা নিবারিত হয়। কালক্রমে সূত্রগুলি

হইতে ঐ চিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে। এখনকার প্রচলিত ব্যাকরণে অধিকারের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০ সূত্রে অদর্শনের লোপ সংজ্ঞা করিয়াছেন। প্রয়োগকালে যে যে বর্ণের দর্শন হয় না তাহারই লোপ সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয়, বিকরণ, আদেশ, আগম প্রভৃতি অনেক স্থলেই অনুবন্ধযুক্ত থাকে, ঐ অনুবন্ধগুলির অন্য ফল আছে। উচ্চারণের সময়ে ঐ ঐ ফলের জন্য ঐ অনুবন্ধগুলিরও উচ্চারণ হয়। লেখার সময়েও লিখিত হয়, কিন্তু প্রয়োগকালে ঐগুলির অস্তিত্ব থাকে না, অদর্শন হয়, এজন্য অদর্শনকেই লোপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ধাতু যথা ডুকৃঞ্ করণে। প্রয়োগকালে ডুঞ্ ভাগের অদর্শন হয়, কৃ অংশমাত্র থাকে। প্রত্যয়—যথা অচ, চ্এর অদর্শন হয়। প্রয়োগকালে অকার মাত্র থাকে। বিকরণ—শপ্, শ্ ও প্এর অদর্শন হয়। প্রয়োগকালে অকার মাত্র থাকে।

আদেশ—চক্ষ্ ধাতু স্থানে খ্যাঙ্ আদেশ হইলে ঙ্এর অদর্শন হয় এবং প্রয়োগ কালে খ্যা মাত্র বিদ্যমান থাকে। আগম—নুম্, উ ও ম্এর অদর্শন হয় প্রয়োগ কালে ন্ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যে গুলির অদর্শন হয় উহাদিগের সাধারণ নাম অনুবন্ধ। উহাদিগেরও ফল আছে। ঐগুলি নিরর্থক নহে! বাহুল্য ভয়ে এস্থলে উহার বিস্তৃতি করা হইল না। এক্ষণে অদর্শন কাহাকে বলা যায়? দর্শনের অভাবকে সকলে অদর্শন বলিবেন। পূর্ব্বে দর্শন পথে ছিল পরে দর্শন পথের অতীত হইয়াছে। এই অর্থ করিলে সূত্রস্থ অনুবন্ধগুলি লিখিত বর্ণ হয় কারণ, লিখিত বর্ণ হইলেই অদর্শন ও দর্শনের বিষয় হয়, ইহাও বলা আবশ্যক যে দর্শনস্থলে শব্দেরও গৌণার্থ আছে। মুখ্যার্থের বিষয় সম্ভবপর হইলে গৌণার্থ গৃহীত হওয়ার শাস্ত্রাভাব।

৩।২।১৭৮ ॥ ৩।২।৭৫ ॥ ৩।৩।১৩০ ॥ ৩।২।১০১ ॥ ৩।৪।৬৪ ॥

সূত্রে "দৃশ্যতে" "দৃশ্যন্তে" ইত্যাদি শব্দ আছে। অন্যান্য অনেক সূত্রেও ঐ ঐ শব্দ আছে। এগুলিরও মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে পাণিনি-সূত্রগুলি কেন, ঐ ঐ সূত্রের পক্ষীভূত শাস্ত্রগুলিও লিখিত থাকা সপ্রমাণ হয়। মোক্ষমুলার মহোদয় "দৃশ্" ধাতুর গৌণার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষ কত দূর সবল সুধী পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

মান্যবর গোল্ডষ্টুকার মহোদয় "পাণিনি" শীর্ষক পুস্তকে এই প্রবন্ধোক্ত অনেক তর্ক ও অন্যান্য অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মোক্ষমুলার মহোদয়ের তর্ক খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেও মোক্ষমুলার মহোদয় আপন তর্ক ত্যাগ করেন নাই। অথচ মান্যবর গোল্ডষ্টুকার মহোদয়ের তর্কগুলির খণ্ডনেরও কোন চেষ্টা করেন নাই, মোক্ষমুলার মহোদয়ের গ্রন্থই আমাদের দেশের বিদ্যামন্দিরে সচরাচর অধীত হইয়া আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকেই বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার মতের পক্ষপাতী হইতে পারেন আশঙ্কায় এবং তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধে এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল।

শব্দশাস্ত্রঘটিত তর্কগুলি নিতান্ত নীরস। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে বিবেচনায় লিখনপ্রণালী প্রবন্ধের এইখানে শেষ করা হইল। কুতূহলী পাঠক মাহাত্মা গোল্ডষ্টুকারের পুস্তক পাঠ করিলে আরও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ঘটনা।

বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের জীবন আলোচনা আমাদের মধ্যে অনেকেই করিয়াছেন, আমিও যৎসামান্য করিয়াছি তাহাতে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখনও অনুসন্ধান করিলে সীতারাম রায় সম্বন্ধীয় ও তৎসাময়িক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয় না।

বাঙ্গলা দেশের যখন ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না তখন অনেক স্থলে কিম্বদন্তি, প্রবাদ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লিখিতে হয়। আমাদের দেশে এমন অনেক চলিত গল্প ও কিম্বদন্তি আছে যাহার মধ্য হইতে আমরা অনায়াসে কিছু না কিছু ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমি সেইরূপ একটী কিম্বদন্তির অবতারণা করিয়া সীতারাম রায়ের সমসাময়িক যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য পাঠক সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

যশোহর জেলার বুনাগাতি নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার মহাশয়ের নিকট কথাপ্রসঙ্গে একদিন যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে বলিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র সন্দিহান নহি।

তিনি বলিলেন—"আমরা এই যশোহর জেলার কায়স্থবংশের প্রধান মৌলিক। দক্ষিণরাঢ়ীসমাজে আমারা খুব মান্য গণ্য। আমাদের বংশের কৌলিক উপাধি অগ্রে দত্ত ছিল। সময়ে, রায় উপাধি হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমরা রায় নামে পরিচিত ছিলাম। আমাদের রায় বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে নিতান্ত কম ছিল না। বিষয়

সম্পত্তিতে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ, তৎকালীন অধিবাসীগণের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। বিত্তাবুদ্ধিতে বুনাগাতির রায়বংশ চিরকালই কীর্ত্তিশালী ছিলেন। একদিন একজন নবাবী চোপদার আসিয়া আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রঘুনাথ রায়কে মুরশিদাবাদ যাইতে অনুরোধ করে। তাহার হস্তে নবাবের পাঞ্জাযুক্ত পার্সি ভাষায় লিখিত একখানি পত্র ছিল। উক্ত পত্র আমাদের গৃহে অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমার পূজ্যপাদ রঘুনাথ রায়, চোপদারের সঙ্গে মুরশিদাবাদে যাইবার সময়ে অগ্রদ্বীপের নিকটে এক দরিদ্রার কন্যাকে বিবাহ করেন। বলিতে গেলে, এই পূজনীয়া মহিলার শুভাগমনে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীও সুপ্রসন্ন হন। মতিমান রঘুনাথ, নবাবীসরকারে কার্য্য পাইয়া "সরকার" নামে পরিচিত হইলেন।

এই হইতে আমাদের বংশ সরকার নামেই পরিচিত। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটকগণ রঘুনাথের পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানে সমান-ঘরে অথবা উচ্চ-ঘরে পাত্র-পাত্রী জুটাইতে পারিলেন না।

এদিকে রঘুনাথের একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারীর নাম সাধারণে "বিনোদ বীর" নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। তাহার অসাধারণ শারীরিক শক্তিসামর্থ্য দেশময় রাষ্ট্র হইল। রঘুনাথ সরকার বুনাগাতিতে এক প্রকাণ্ড গড়যুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা "একজাই" করিতে ইচ্ছুক হইলেন—কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। কেন না, বিনোদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় তাহাকে সেনাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিনোদ এবং রঘুনাথ তাহাতে অসম্মত হন। এবং এইজন্য রাজা তাহাদের একজাই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। এই সূত্রে বিনোদের সঙ্গে সীতারামের মনোমালিন্য এবং মেনাহাতী ও "ছিদে হাতীর"

সহিত পরিচয় হয়। রাজা, বিনোদের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদের বাড়ী হইতে নিজের রাজ্যান্তর্গত ভূভাগ পৃথক করিবার জন্য তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের নামে "যদু খালি" বলিয়া একটী খাল কাটাইয়া লইলেন। এই খাল অত্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বিনোদবীর, মেনাহাতী এবং ছিদেহাতীর সমকক্ষ বলিয়া অনেক সময় আপন পরিবারমধ্যে গৌরব পাইতেন—কিন্তু সাধারণে তাহা আদৌ বিশ্বাস করিত না। সরকারপরিবার এই বিনোদবীরের বাহুবলে দস্যুতস্করগণের হাত হইতে ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতেন। বিনোদ এই সব কারণে কিছু গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা একজাই করিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন—তখন রঘুনাথ সরকার সীতারামের সহিত বিপক্ষতা করিবার জন্য মুরশিদাবাদ হইতে নবাবী ফৌজ আনাইয়া তাঁহাকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে তাহার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। রঘুনাথের পরামর্শে আর দেওয়ান রঘুনন্দনের জোগাড়ে বক্স আলি খাঁ নামে একজন মোগল সেনাপতি মহম্মদপুর ধ্বংস করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সুযোগে সীতারামের, চিরবিদ্বেষী চাঁচাড়া রাজবংশের মনোহর রায় মোগলসেনার সঙ্গে মহম্মদপুর অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র সীতারাম, বক্স আলিকে সংহার করিয়া মনোহর রায়ের হালি সৈন্যগণকে তাড়াইয়া দিলেন। রঘুনাথ সরকার এই সংবাদ পাইয়া পুত্র বিনোদ-বীরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বুনাগাতিতে বাস করিতে হইলে সীতারামের সঙ্গে শত্রুতা করা উচিৎ নহে; কিন্তু ভাগ্য দোষে যখন তাহা হইয়াছে, তখন সেনাপতি মেনাহাতীর সহিত তুমি প্রীতি স্থাপন কর।

পিতার পত্র পাইয়া বিনোদ সরকার গোপনে মেনাহাতীকে অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু সীতারামগতপ্রাণ মহাবীর মেনাহাতী তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আমি রাজাকে ছাড়িব না এবং তাঁহার

কোন অনিষ্ট চিন্তাও করিতে পারিব না। তবে তোমাদের প্রতি যাহাতে তাঁহার কোন বিদ্বেষ না থাকে তাহা করিতে পারি। তুমি এক কায কর, আমার পুত্র শঙ্করকে তোমার ভগ্নী দান কর, আর তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর। তাহা হইলে আমার আত্মীয় বলিয়া রাজা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না।" বিনোদ ইহাতে সম্মত হইয়া পিতাকে ইহা জানাইলেন।

রঘুনাথ তখন ঘটক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না? ঘটক উত্তর করিল—শুনিয়াছি, মেনাহাতী বঙ্গজ কায়স্থ; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা একরূপ দক্ষিণ-রাঢ়ীর মধ্যে গণ্য, আপনার ইচ্ছা হয় বিবাহ দিতে পারেন। রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন ঘটকগণ বুনাগাতির প্রধান মৌলিক রায় (সরকার) গণের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন—

"আসমানি কুদ্‌রতী রাজা কেশব ঘোষ
রায় গাঁর শঙ্কর ডুমুর শিয়ার বোস্
খেদাপাড়া বাগডাঙ্গা চূড়ামণকাঠি
এক ঘোষ তিন ঠাঁই অমূলজ খাঁটি।"

অর্থাৎ এই স্থানগুলির ঘোষগণ এক। ইহাদের মূল নাই অথচ ইঁহারা খাঁটি। সুতরাং তখন মেনাহাতীর পুত্র শঙ্করের সঙ্গে সরকারগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির হইল। বিনোদ সরকার মেনাহাতীর কৌশলে সীতারামের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং তাঁহার আত্মীয় হইলেন বটে কিন্তু তাহাতে সীতারামের কোন ক্ষতি হইল না। কারণ মহাপ্রাণ মেনাহাতী পাণ্ডব-বীর ভীমসেনের ন্যায় কেবল "দাদা আর গদা" বুঝিয়া চলিতেন।

এদিকের কার্য্য এই ভাবে শেষ হইল। তাহার পর সীতারাম যখন ভূষনার কেল্লা দখল করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিলেন—তখন

মুর্শিদাবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। রঘুনাথ সরকার তখন কিন্তু সীতারামের বিপক্ষ নহেন। প্রত্যুত ষড়যন্ত্রীগণের কৌশলভেদকারী ছিলেন। রঘুনন্দন, মুণিরাম, রামদেব রায় এবং মনোহর রায় প্রভৃতিই এই বিষম ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন। ইহাঁদের উত্তেজনায় এবং দয়ারাম রায়ের গোয়েন্দাগিরিতে নবাব, একদল সেনা মহম্মদপুর ধ্বংস করিতে পাঠাইয়া দিলেন। দয়ারাম ফৌজ লইয়া মামুদপুরের উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ ভূষণার দক্ষিণে "বরিষাট্" গ্রামে আসিয়া ছাউনি পাতিলেন*। দয়ারাম রায় সীতারামকে দমন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু পরামর্শের পর স্থির হইল যে, হয় মেনাহাতার বিনাশ না হয় তাহার অন্যত্র অবস্থান, এই দুইয়ের একটি করিতে হইবে। তখন দয়ারাম, রঘুনাথপুত্র বিনোদবীরকে ডাকিলেন এবং তাহাকে মেনাহাতী বিষয়ে পরামর্শ দিয়া বিদায় দিলেন। বিনোদ তখন এক অলীক বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া মেনাহাতীকে রায়গ্রামে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পথে চৌকি বসিয়া গেল, মেনাহাতী মহম্মদপুর আক্রমণের সংবাদ জানিতেও পারিলেন না। মহম্মদপুর বিধ্বস্ত হইল। এই সময় সাতারামের অপর সেনাপতি ছিদেহাতার মৃত্যু হয়। সে ব্যক্তি পশ্চিমদেশবাসী বিখ্যাত মুসলমান পালওয়ান। তাহাকে মারিয়া মামুদপুরে কবরস্থ করা হয়। মেনাহাতী, সীতারামের পতনের পর মনের দুঃখে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবা করিয়া রায়গ্রামেই দেহত্যাগ করেন। একণে যে কবরটি মেনাহাতীর কবর নামে পরিচিত উহা প্রকৃতপক্ষে ছিদেহাতীর কবর।"

* পূর্ব্বে এস্থানের নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু দয়ারামের সঙ্গী সাতজন বীরের পরবর্ত্তী বাসস্থান বলিয়া পরিবর্ত্তনে বীরসাতের স্থানে বরিষাট হইয়াছে অদ্যাপি এখানে দয়ারাম বংশীয়দিগের কাছারী বাড়ী আছে।

এই গল্পটির মধ্যে যে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আছে এখন তাহার আলোচনা করিতেছি।

এই গল্প মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে, যাঁহাদের কাপুরুষতায় ও স্বার্থপরতায় জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা অপহৃত হয়। সীতারামের সহিত যে সকল বাঙ্গালী বিপক্ষতা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মুণিরাম, রঘুনন্দন, রামদেব, মনোহর, দয়ারাম আর এই রঘুনাথ সরকার অগ্রগণ্য। অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এরূপ অনেক পাষণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

বুনাগাতির নিকট "কেল্লার মাঠ" নামে একটি স্থান আছে উহা বক্সআলির অভিযানের অকুস্থান। যদুখালি খালের ইতিবৃত্ত যাহা সীতারাম-জীবন-চরিতে প্রকাশ হইয়াছে উহা সত্য কি, এই ঘটনা সত্য, তাহা প্রমাণ করা বড় কঠিন। তবে ঘটনা যাহাই হউক উহার কোনটিকেই তাচ্ছিল্য করিতে পারা যায় না—কেন না উভয় তত্ত্বই প্রবাদমূলক। আবার উক্ত খাল যে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের নামীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। বুনাগাতি ও যদুখালি এই দুইটি স্থান অষ্টাদশ শতাব্দি হইতে বিখ্যাত। তাহার পর মাগুরা মহকুমার উত্তরবর্ত্তী বরিষাট গ্রামেই সীতারামের পতন হয়। দয়ারাম রায় এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার দলস্থ সাতজন বীরের পরবর্ত্তী বাসভবন বলিয়া ইহার নাম বোধ হয় বীরসাতের স্থানে "বরিষাট" হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই স্থানে যে সকল মুসলমান বাস করিতেছে তাহারা—অধিকাংশই বীর পাঠান মোগল দিগের বংশধর।

এই দেশে এককালে যে সকল বহুবলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর পাতে জন্মভূমির পদ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের শরীর এই দেশের জল বায়ুর গুণে সুস্থ থাকিত আর আজ তাহার

পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়ার গুণে জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেশ দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে মনোহর চক্রবর্ত্তী, রূপরাম ঘোষ (মেনাহাতী) এবং সাতারামের অপর সেনাপতিগণ, বিনোদ সরকার, কাশিরাম দত্ত, হরে পাটান, কালো ধোপা, জগন্নাথ মুন্সী, হারাণ মাঝি প্রভৃতির শারীরিক কীর্ত্তির খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত। এই সকল প্রমাণসত্ত্বে পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী যে দুর্ব্বল, ভীরু, অকর্ম্মণ্য একথা কি প্রকারে স্বীকার করিব।

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, মেনাহাতী অবিবাহিত পুরুষ ছিলেন। এই গল্পে জানা গেল যে, তিনি বিবাহ করিয়া পুত্রকলত্রসহ জীবনাতিপাত করিতেন মেনাহাতীর পুত্রকন্যার কোন তালিকা পাই নাই। রায়গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের কুর্চিনামা পাইলে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতাম। পারিবারিক কার্য্যের জন্য তিনি যে মহম্মদপুর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্বাদ পান নাই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বহুদিন হইতে শুনিতেছি যে, মেনাহাতীকে গোপনে হত্যা করিয়া দয়ারাম রায় মহম্মদপুর আক্রমণ করেন, এখন শুনিলাম তাহা নহে। এখন কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা তাহা স্থির করা বড় কঠিন। যে হেতু সমস্তই শুনা কথা।

"ছিদেহাতী" নামে সীতারামের আর একজন সেনাপতি ছিল। মহম্মদপুর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে নিহত হয়, ইহার কবর এখনো মহম্মদপুরে আছে। লোকে এই কবরকে মেনাহাতীর কবর বলে। এই গল্পে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ হইতেছে। এখন কোন কথা সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই গল্পের ঘটনা কতকটা স্বাভাবিক, কেননা মেনাহাতী হিন্দু তাহার কবর হওয়া অসঙ্গত প্রত্যুত এই কবরের কাহিনী বহু লোকের নিকট শুনিয়াছি সুতরাং ইহা কি করিয়া মিথ্যা বলি।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

সম্মোহন-বিদ্যা* ।

(১)

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একবার সম্মোহন-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলাম। সেই সময় এই সংক্রান্ত কতকগুলি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এই সম্মোহন-বিদ্যার প্রক্রিয়া নানা রকমের আছে, তন্মধ্যে যেটা হউক একটী লইয়া অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে বড় বেশি বিলম্ব হয় না। অনেকেই জানেন, আজ কাল আমেরিকা-বাসীরা এই সম্মোহন-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ইহার অনুশীলন অধুনা বিশেষভাবে চলিতেছে। আমরা তাঁহাদেরই নির্দ্ধারিত প্রণালীতে সম্মোহন বিদ্যা অভ্যাস করি। বেশির ভাগ পুস্তকের সাহায্যেই আমাদের শিক্ষালাভ; কিন্তু পরে অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি, শুধু পুস্তকে চলে না, শিক্ষিত গুরুর উপদেশ এবং তাঁহার নিকট হইতে রীতিমত শিক্ষা লওয়াও আবশ্যক, নচেৎ অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা।

(২)

যাঁহাকে সম্মোহিত করিতে হইবে, তাঁহার চোখের উপর চোখ স্থির-দৃষ্টিতে রাখিয়া, তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া কয়েক দিন অসফলতার পর আমরা সত্য-সত্যই একদিন তাঁহার চৈতন্যাপহরণ করিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিকই তিনি অজ্ঞান হইয়াছেন কি না তাহার পরীক্ষার ক্রটী হইল না। চেঁচা-মেঁচি করিয়া, চিম্‌টী কাটিয়া, পায়ে সুড় সুড়ি দিয়া, আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটাইয়া এবং ছুরির

* Hypnotism.

সাহায্যে দেহের এক স্থানে রক্তপাত করিয়াও দেখা হইল, কিন্তু চৈতন্যের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না—তিনি নিশ্চল কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক, এ অবস্থায় সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর সম্পূর্ণ বশীভূত, তিনি যা বলিবেন, যা আজ্ঞা দিবেন সম্মোহিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিনা আপত্তিতে আজ্ঞাবহের ন্যায় পালন করিবেন। সে সময় স্পষ্ট বুঝা যায়, সম্মোহিত ব্যক্তির নিজের কোন রকম ইচ্ছাশক্তি থাকে না, সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায়, কৃতদাস হইয়া পড়েন। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তি দ্বারা নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লন, এমন কি খুন, প্রতারণা, চুরি পর্য্যন্তও। সে দিন একটা এই ভাবের গল্প পড়িতেছিলাম, সেটা সত্য কি না জানি না, কিন্তু একেবারে অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। বিলেতে একজন ভাল হিপনটিষ্ট ছিলেন, তাঁর এক শত্রু ছিল, তাকে তিনি মনে মনে এতই ঘৃণা করিতেন এবং সে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ক্রোধ এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে হত্যা করিলেও যেন সে ক্রোধের শান্তি হইত না। এই হিপনটিষ্টের একজন খুব ভাল মিডিয়ম* ছিল, সে একটী বালিকা। হিপনটিষ্টের মনে তাঁহার শত্রুর প্রতি যে ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে এই বালিকা তদ্‌কর্ত্তৃক বারম্বার সম্মোহিত হইয়া নিজের মনে ঐ ক্রোধের ভাব আপনা-আপনি পোষণ করিত—অর্থাৎ তাহাকে দেখিলেই বালিকার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। অজ্ঞান বালিকা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না, কেবল মনে মনে কারণ অনুসন্ধান করিত। অবশেষে একদিন হিপনটিষ্টের কৌশলে সম্মোহিত অবস্থায় এই বালিকা তাহার পিতার

* যাহাকে সম্মোহিত করা হয়।

ঘর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া আনিল, বস্ত্রমধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া সেই শত্রুর গৃহে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল এবং পিছন হইতে তাহার দিকে পিস্তল ছুঁড়িল। এই হতভাগিণী বালিকা শেষে হত্যাপরাধে ধরা পড়ে, এবং এই সম্মোহনের গুপ্ত রহস্য অবগত না থাকায় বিচারকেরা তাহাকে উন্মাদিনী স্থির করিয়া পাগলা-গারদে প্রেরণ করেন। নিরপরাধিণীকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে একদিনও মনে করিতে পারে নাই, যে সে নিজেই কাউকেও খুন করিয়াছে—এ ঘটনা তাহার নিকট জটীল রহস্যাবৃত ছিল। তবে গারদরক্ষীগণ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইত, এই পাগলিনী রাত্রে এক এক সময় স্বপ্নাবেশে চিৎকার করিয়া যেন বলিত—"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমাকে আর খুন কোর্ত্তে বোলো না।"

সম্মোহনবিদ্যারপ্রভাবে অনেকের অনেক মঙ্গলসাধনও করিতে পারা যায়। যেমন মাতালকে মদত্যাগ করান, অসুখ-বিসুখ সারান, মানসিক চঞ্চলতা বা শোকাদি অপনোদন করা ইত্যাদি। এগুলি অতি সহজেই করা যাইতে পারে। কেবল সম্মোহিত অবস্থায় তাঁহাদের মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে, তাঁহার আর মদ্যপিপাসা নাই বা শারীরিক অসুস্থতা হইতে সুস্থ হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা অনেক বার অনেক স্থানে হইয়া গিয়াছে।

এখন আমাদের কথাই বলি। সম্মোহিত ব্যক্তিকে আমরা এখন মিডিয়ম নামেই অভিহিত করিব। সম্মোহনকারী এই মিডিয়মকে বলিলেন—কেমন, তুমি এখন আমার ইচ্ছার অধীন?

মি—হাঁ।

স—আমি যা বলিব তাই করিবে, তাই শুনিবে?

মি—হাঁ।

স—আমি যা বলিব তা তোমায় শুনিতেই হইবে।

মি—আচ্ছা।

সম্মোহনকারী তখন পকেট হইতে একটী পেন্সিল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি?

মি—একটা পেন্সিল।

স—উঁহু! ওটা যে একটী খোকা।

মি—হাঁ, তাইত!

স—ওকে চুম্বন কর।

মিডিয়ম পেন্সিলটী হাতে করিয়া আগ্রহের সহিত চুম্বন করিলেন।

স—দেখ, দেখ, কি ভয়ঙ্কর স্থানে তোমায় এনেছি, রাশি রাশি গুলি ছুটছে, রক্তের সমুদ্র, চারিদিকে শুধু কামানের গর্জ্জন।

মিডিয়ম একটু আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্থান!

স—চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ—কেমন সুন্দর স্থান, উপরে নীল আকাশ নীচে নীল জল—সূর্য্য-রশ্মি কেমন তরঙ্গের সঙ্গে খেলা কচ্ছে!

—কি দেখছ?

মি—সমুদ্র! সুন্দর স্থান!

স—ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড়, এই যাঃ নৌকা ডুবলো—তুমিও ডুবলে!

মিডিয়ম এই কথা শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন, হঠাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ সম্মোহনকারী বলিলেন, তোমায় উঠিয়েছি।

মি—আঃ, বাঁচলুম।

(৩)

এই ভাবে কিছুদিন চলিল। মিডিয়মকে লইয়া এই প্রকারে যখন যা-ইচ্ছা-তাই করান যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন আমাদের মিডিয়ম

বিগড়াইয়া গেলেন। সম্মোহনকারীর কোন কথাই শুনেন না, তাঁহার কোন কথার জবাবই দেন না—কোথায় তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আর কোথায় কি! সেদিন সবই নিষ্ফল। অন্যদিন মিডিয়মের চক্ষু মুদ্রিত দেখিতাম, আজ সহজ মনুষের মত চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি শূন্য, পলকবিহীন।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। শুনা গিয়াছিল, কখন কখন না কি মিডিয়মের দেহে প্রেতাত্মার (spirit) আবির্ভাব হয়। প্রেতাত্মা বা ভুতে বিশ্বাস যে আমাদের ছিল তা বলিতে পারি না। কিন্তু পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহাতে ভুতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হউক বা না হউক ভুতের মত আর একটা কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস হইয়াছিল। যাহা হউক, শুনিয়াছিলাম মিডিয়মের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে সে সময় প্রশ্ন করিলে প্রায়ই জবাব পাওয়া যায়। তাই সম্মোহনকারী প্রশ্ন করিলেন—কে আপনি ?

অল্পক্ষণ পরে উত্তরের পরিবর্ত্তে মিডিয়মের মুখ হইতে এক বিকট হাস্যধ্বনি নির্গত হইল—হাঃ,—হাঃ,—হাঃ,—কি ভয়ঙ্কর হাসি, কি মুখভঙ্গিমা! আমরা একটু চকিত হইলাম। তার পরেই ইংরাজীতে কথা বাহির হইল, তার ভাব এইঃ—-

হাঃ হাঃ হাঃ কেমন মজা! কেমন তার বুকে ছুরি বসিয়েছি—সে যেমন তেমনি হয়েছে! কেমন—তাকেও ছুরি মেরেছি, নিজের বুকেও ছুরি বসিয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজা! হাঃ হাঃ!

এই ভাবের হাসির তরঙ্গ খানিকক্ষণ ধরিয়া চলিল, আমরা প্রশ্ন করিবার অবসরই খুঁজিয়া পাইতে ছিলাম না। একটু চুপ হইলে, প্রশ্ন করা হইল—অনুগ্রহ করে বলুন আপনার নাম কি! ইংরাজীতে উত্তর মিলিল। "কি হ'বে আমার নাম শুনে?—আমি একজন মস্ত স্ফুর্ত্তিবাজ লোক, খালি হেসে খেলেই বেড়াই—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ!"

স—আপনার সদাই আনন্দ ?

মি—হাঁ—বলিয়াই গুন্ গুন স্বরে একটী গান ধরিলেন। তার পর চুপ, কোন সাড়া শব্দ নাই।

অল্পক্ষণ পরে মুখে আবার ভাষা ফুটিল—ইংরাজীতে বলিলেন, কই মেরি রস্—কই মেরি রস ?

প্রশ্ন—মেরি রস্ কে ?—তিনি কি আপনার পত্নী।

উ—(হাঁসিয়া)—না।

প্র—আপনি বাংলা জানেন ? বাংলা কথা বলবেন ?

উ—বোল্‌বে।

তখন বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে যে কথা গুলি বলিলেন তার মর্ম্ম এই :—আমার নাম লেফ্‌টানাণ্ট্ রেনল্ড, আমার বাড়ি সাসেক্সে ছিল, লর্ড ডালহাউসির সময়ে সৈনিক জীবন লইয়া আমি ভারতবর্ষে আসি—লক্ষ্ণৌ সহরে ছিলাম, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে সেইখানে আমার মৃত্যু হয়। যুদ্ধক্ষেত্র সন্দর্শন আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, যুদ্ধের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার নাই। কোন ধর্ম্ম ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছ ?—ধর্ম্ম সবই ভাল, তবে জান আমি ক্রীশ্চান্, আমি আমার ধর্ম্মই ভাল বলিব।

মিডিয়মের বাক্যরোধ হইল।

(৪)

এখন ব্যাপারটা কি তাহা বলা উচিত। আমরা দেখিলাম, মিডিয়মের দেহে একবার প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে, এক আত্মার খানিকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটী আত্মার আগমন হয়। উপরে যে দুই এক বার মিডিয়ম চুপ করিয়াছিলেন, সেই অবসরে এক আত্মার পরিবর্ত্তে অন্য আত্মার অধিষ্ঠান হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই আত্মার আবির্ভাবের ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম যে দিন আমরা দেখিলাম সেই দিন মিডিয়মের চেতনা হইলে সর্ব্ব বিবরণ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ

করা হইল—তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আমরা এই অভূতপূর্ব্ব অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন উৎসাহে সম্মোহন কার্য্যে লাগিয়া গেলাম। প্রতিদিনই, মিডিয়ম সম্মোহিত হইয়া পড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে আত্মার আবির্ভাব হইত, বেশি সাধ্য সাধনা করিতে হইত না, কত রকম বে-রকমের আসিয়া জুটিত। এক একদিন পাঁচ সাতটার অধিক পাওয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সাহেব, মেম, জার্ম্মাণ পর্য্যন্ত সব রকমই ছিল। তাহাদের ভাষা দেখিয়া আমরা তাহাদের জাতি ঠিক করিয়া লইতে পারিতাম। আমাদের সঙ্গে অনেক কথোপকথন হইত—সব গুলি এখানে লিখিবনা তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তবে দুই একটা লিখিয়া রাখি ঃ—

আমার নাম জোসেফ ক্রোহেন, আমি একজন দীক্ষিত ক্রীশ্চান, মোকামা অঞ্চলে রেল কোম্পানির গার্ড ছিলাম, ৪৬ বৎসর বয়সে মারা যাই, মৃত্যুর তারিখ ১৮৯১, ৭ই ফেব্রুয়ারী। আত্মীয়ের মধ্যে বরাকরে আমার এক খুল্লতাত আছেন, তাঁর নাম ইসমাইল, বরাকরে তাঁর একটী মনোহারীর দোকান আছে। আমি মুসলমান ছিলাম, বাধ্য হইয়া আমাকে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়; কারণ আমি বড়ই গরীব ছিলাম, একজন সদাশয় পাদরী আমায় দীক্ষিত করেন, আমাকে লেখাপড়া শেখান এবং দয়া করিয়া ঐ চাকুরীটী জুটাইয়া দেন। মৃত্যুর পর আমার গোরের উপর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই—আর কেই বা দিবে? মোকামার এক বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে, এক বৃহৎ বৃক্ষের তলে, সুশীতল ছায়ায় আমার দেহের ধ্বংশাবেশ আজও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে।

আর একজনের কথা ঃ—

প্র—আপনার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি হইয়াছিল—বলুন ত।

উ—তা আমি বলিতে পারিবনা—সে অধিকার আমার নাই।

প্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?

উ—একটা অত্যাশ্চর্য্য অবোধ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি মাত্র।

প্র—আপনার কোন বিশেষ আকার আছে ?

উ—না।

প্র—আপনার দেহ আছে ?

উ—আছে।

প্র—কি রকম ?

উ—আমাদের দেহ কোন জড়বস্তু নির্ম্মিত নহে—কেমন করিয়া বুঝাইব ?

প্র—আপনি থাকেন কোথা ?

উ—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—অনবরত বাতাসের মত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি।

প্র—মৃত্যুর পর সকলকেই কি এই ভাবে ঘুরিতে হয় ?

উ—হাঁ, অন্তত কিছু কালের জন্য—মাপ করুন, আমায় প্রশ্ন করিবেন না, আমি আর কিছু বলিতে পারিবনা।

অপর একজনের কথা ঃ—

প্র—আপনাদের কোন্ আক্ষায় ডাকিতে পারি।

উ—ইচ্ছা করিলে, স্পিরিট বলিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক—স্পিরিট বলিলে আপনারা যা বুঝেন আমরা ঠিক তা নই। আমাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব।

প্র—আপনাদের মধ্যে পরস্পরে বাক্যালাপ করিতে পারেন ?

উ—পারি—কিন্তু শব্দ দ্বারা নয়—নানাবিধ আকার ইঙ্গিতে।

প্র—মৃত্যুর পরের অবস্থা কি রূপ ?

উ—জীবিত ব্যক্তির তাহা জানিবার অধিকার নাই।

প্র—পরজগতে পিতা, পুত্র, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ইহাদের পরস্পরে কোন সম্বন্ধ থাকে ?

উ—না—এখানে কোন বন্ধনই নাই।

প্র—আপনি সুখে আছেন? না কষ্টে?

উ—এখানে সুখ দুঃখের কোন প্রভেদজ্ঞান নাই।

প্র—আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?

উ—ভবিষ্যৎ জানিবার কাহারও আবশ্যক নাই—যাহা অদৃষ্ট তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। কর্ত্তব্য কর, বিবেকানুমোদিত পথে চল।

এই সকল প্রেতাত্মা জীবিত অবস্থার যে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা যেখানে সম্ভব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তাহা প্রায়ই মিলিয়াছিল। আমরা জনৈক ইংরাজ রেলওয়ে গার্ডের প্রেতাত্মাকে পাইয়াছিলাম, তিনি রেলগাড়ি চাপা পড়িয়া বর্দ্ধমানে মারা যান—তাঁহার নাম ইত্যাদী লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাতে সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালে ঐ নামীয় জনৈক গার্ড রেল চাপা পড়িয়া সত্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

(৫)

সব দিনের ভূত সবাই যে এক রকম তা নয়। কেউ বেশি কথা বলে, কেউ কথাই কয়না—অনেক সাধ্যসাধনার পর দুই চারিটী প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রতিদিন প্রায়ই নূতন নূতন প্রেতাত্মা পাইতাম, তাহার মধ্যে কোন কোন পুরাতন আত্মা, যিনি আগে কখনও আসিয়াছিলেন তাঁকেও পাওয়া যাইত। এসবের মধ্যে একজন আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা পাতাইয়াছিলেন—তিনি প্রায়ই আসিতেন। তাঁর নাম রামলাল চাটুয্যে, বাড়ি ছিল কাশীতে। কোন আত্মাকে অনুরোধ করিয়া যদি বলিতাম আপনি যাবার সময় রামলালকে পাঠাইয়া দিবেন, অমনি পরমুহূর্ত্তে রামলাল আসিয়া হাজির। আমাদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কইতেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর অন্য কারু কাছে পাই নাই, রামলাল তাহার অনেক জবাব দিয়াছে। রামলাল আর ২।১ জন ছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেউ বড় বলিতে চাইতেন না।

আমরা দেখিতাম, আমাদের মানুষদেরই মত নানা আত্মার নানা মত—কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কেউ করেন না, কেউ স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেউ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তবে পাপের শাস্তি সম্বন্ধে কারুর মতের অনৈক্য ছিলনা। কেউ কেউ আবার বলিতেন পুনর্জন্মও হয়। অনেক খ্রীশ্চান Last day of Judgment—এর সত্যে বিশ্বাস করেন না। এই সব জটীল বিষয়ে এঁরা যে কেউ বিশেষ অভিজ্ঞ তাহা আমাদের কারুরই ধারণা হয় নাই। তবে পরজগতে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, হিংসা প্রতিহিংসা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব নাই; এই সব বিশেষ তথ্য ছাড়া সকলেই প্রায় একমত হইতেন না। মোট কথা, পরজগতের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তার একটা স্পষ্ট ছবি কেউই ফুটিয়ে তুলিতে পারিতেন না—হয় তাঁরা অনভিজ্ঞ, না হয় এ সব কথা বলিতে চাইতেন না। যাহা হউক, রামলাল আমাদের কাছে এক অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছে। রামলালের ভবিষ্যৎ উক্তি এত দিনে অনেক মিলিয়াছে, আবার অনেক ঠিক মিলেও নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা, সে যত দূর দেশের হউক, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রামলাল তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিয়াছে—বলিয়া দিয়াছে, অমুক স্থানে এখন অমুক ঘটনা ঘটিতেছে। আমরা সংবাদ লইয়া অনেক স্থলে তাহার সত্যতা স্থির করিয়াছিলাম। কলিকাতা সহরের অনেক ঘটনা, যে মুহূর্ত্তে রামলাল আমাদের সমক্ষে উপস্থিত আছে, সেই মুহূর্ত্তে কিরূপ ঘটিতেছে তাহা সে আমাদিগকে জানাইয়াছে—আমরা তখন কলিকাতা হইতে অনেক দূরে। এই সম্বন্ধে রামলালকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মানুষের স্থুল দেহ চিন্তামাত্রেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়ার পক্ষে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক। আত্মার এইরূপ দেহ না থাকায় তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলাক্রমে সব স্থানে যাইতে পারে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

(২)

বোম্বায়ের বন্দর দিয়া যখন ভারতে প্রবেশ করা যায়, তখন একটা উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্র মনোমধ্যে গভীররূপে অঙ্কিত হয়। নগর ও বন্দরের উদ্যমশীলতা দেখিয়া মনে হয়,—বোম্বাই একটা বিপুল বাণিজ্যের স্থান। অথচ বোম্বাই-বন্দর, ইংরাজ-উদ্যমের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী, এরূপ বোধ হয় বলা যায় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা, করাচির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা খুব দ্রুত ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই বন্দরগুলির উন্নতির ইতিহাস ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতির ইতিহাস—একই কথা। শুনা যায়, ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে, এই দেশ হইতে দশ লক্ষ পৌণ্ড মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইত। ইহার ৮৫ গুণ বেশি মূল্যের মাল আজ এখান হইতে রপ্তানি হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, রপ্তানি-বাণিজ্য কি বিপুল পরিমাণে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ভারত, চীনের সহিত, জাপানের সহিত, ফ্রান্সের সহিত, ইটালির সহিত, রুসের সহিত, যুক্তরাজ্যের সহিত, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজধানী লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। লণ্ডনের "ডক্" দেখিলেই বুঝা যায়, কি বিপুল এই উদ্যমতৎপরতা—কি বিস্তীর্ণ এই বাণিজ্যব্যাপার।

এই উদ্যমতৎপরতা দেখিয়া এবং পূর্ব্বেকার সহিত এখনকার রপ্তানির তুলনা করিয়া, প্রথমেই কাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া না যায়? পূর্ব্বাপেক্ষা ৮৫ গুণ বেশী—ইহা মনে করিলে কল্পনা অভিভূত হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, আর একটু নিকটে গিয়া দেখা যাক্।

প্রথমেই দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তৈয়ারি মাল অতি অল্পই ভারত রপ্তানি করে। কার্পাস, পাট, শস্যদানা, চাম্ড়া, এই সব কাঁচা মালই ভারত বৈদেশিকের নিকট বিক্রয় করে। এই সব কাঁচা মাল হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া যে লাভ হয়, তাহা ভারত পায় না—তাহা অপরে পায়। এই কথার ভিতরে একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতের শিল্পব্যবসায়গুলি যে অঙ্কুরেই দলিত হইয়াছে তজ্জন্য ইংরাজের রাজনীতিই বিশেষরূপে দায়ী। দ্বিতীয়তঃ—তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও আলোচনার পর এদেশের বাণিজ্যের তথ্য-তালিকা হইতে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা আশানুরূপ নহে। এ দেশের বাণিজ্যিক তথ্য-তালিকা যাহা পাওয়া যায়—তাহা অতীব কৌতুকজনক ; সত্যকথা বলিতে কি—ইহা গড়া-পেটা ও ঘরগড়া হিসাব। সাবধান! এইসব হিসাবের অঙ্কপাতে ভুলিও না। শিশুরা যেরূপ অকপটে মিথ্যাকথা বলে, সেইভাবে এই অঙ্কগুলিও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এক ব্যক্তি এই অঙ্কগুলির সহিত মুখামুখি করিয়া চিরজীবন কাটাইয়াছেন। তাই, সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে ইনি কিরূপ সাক্ষ্য দেন তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হয়। ইনি দাদাভাই নওরোজি। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, "কণ্টেম্পোরারি-রিভিউ" পত্রিকায়, রপ্তানি-মালের হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে যে সকল বিভিন্ন উপাদান ইনি বাহির করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছেঃ—

১। স্বাধীন দেশীয় রাজ্য হইতে যে সব দ্রব্য বিক্রীত হয়।

২। ভারতরাজ্যের সীমান্তদেশের পরবর্ত্তী রাজ্য হইতে যে সকল দ্রব্য আইসে (তিব্বৎ প্রভৃতি)।

৩। প্ল্যাণ্টার ও য়ুরোপীয় কারখানাওয়ালা যে সকল দ্রব্য চালান করে এবং যাহা হইতে এদেশের কোন লাভ হয় না।

৪। ভারতের স্কন্ধে-চাপানো ইংলণ্ডের রাজধানী-সংক্রান্ত খর্চ্চা ;

(ইহার অন্তঃর্ভুক্ত সরকারী ঋণের সুদ যাহা ইংরাজ উত্তমর্ণকে ভারতের দিতে হয়) এবং মুদ্রা বিনিময়-জনিত ক্ষতির অঙ্ক।

৫। রেলপথ নির্ম্মাণ ও সরকারী পূতকর্ম্মের দরুন কর্জ্জ-টাকার সুদ—যাহার হিসাবনিকাশ ও পরিশোধ ইংলণ্ডেই হইয়া থাকে।

৬। য়ুরোপীয়েরা কিংবা অন্য বৈদেশিকেরা, স্বকীয় সঞ্চিত অর্থ কিংবা লভ্যাংশ, যাহা নিজ পরিবারের জন্য স্বদেশে প্রেরণ করে।

৭। প্রাগুক্ত অঙ্কগুলি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃত রপ্তানি-বাণিয্যের অঙ্ক; অর্থাৎ, বিদেশীয় রাজাদিগকে যাহা দিবার তাহা দিয়া, ভারত-বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃত রপ্তানি মালের অঙ্ক।

যখন দশ টাকার মূল্য এক পৌণ্ড ছিল (ফরাসী মুদ্রার হিসাবে এক টাকার মূল্য, ২ ফ্র্যাঙ্ক—৫০ সেন্‌টীম্) সেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, মোট রপ্তানির অঙ্ক ৮৩২০০৫২৪ পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। স্বাধীন রাজ্যের রপ্তানি মাল, কর্জ্জটাকার বিপুল পরিমাণ সুদ, পূতকর্ম্মের ব্যয়—এই সমস্ত বাদ দিয়া, দাদাভাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারতের বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য, ৩ কোটি পৌণ্ডের অধিক নহে। তিনি মনে করেন, ইহাও বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে। তাঁহার মতে, ইহা ৩ কোটি অপেক্ষা ২ কোটির বেশি কাছা-কাছি। যাই হোক্, বেশীর অঙ্কটাই ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দাঁড়াইতেছে;—ইঙ্গ-ভারতের বিশ কোটি লোকের পক্ষ হইতে ৭৫ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের রপ্তানি মাল; অর্থাৎ, মাথা-পিছু ৩ ফ্রাঙ্ক ৮০ সেন্‌টীম্। দাদাভাই বলেন, য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় ইহা কত অল্প। মনে কর, বেল্‌জিয়ম মাথা-পিছু ৪৬২ ফ্রাঙ্ক, এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ যে ইংরাজ উপনিবেশ—সেও ৩৬ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের মাল রপ্তানি করে!

"ব্লুবুকের" প্রকাণ্ড তালিকাগুলির মধ্যে এই সমস্ত কথা প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রপ্তানির হিসাব নির্ণয়ে দাদাভাই যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, শেষ-ব্লু-বুক্‌টির আলোচনায় আমরা যেন সতর্ক-ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করি। বস্তুতঃ, ভারত হইতে পণ্যের আকারে যাহা কিছু বাহির হইয়া যায় সমস্তই একযোগে রপ্তানির অঙ্কে ধৃত হয়;—অন্য বাবদের খর্চ্চা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয় না। অথচ, ঐ রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য হইতেই রাজধানীর বিপুল কর্জ্জ-টাকার সুদ পরিশোধ করা হয়। সুতরাং রপ্তানি দ্রব্য হইতে ভারত একটি কপর্দ্দকও পায় না; এবং রাজধানীয় খর্চ্চারও কিছুমাত্র লাঘব হয় না। এই একই বিষয়-সম্বন্ধে রমেশ দত্তও এইরূপ লিখিয়াছেন;—রপ্তানির বৃদ্ধির অর্থ এই;—উহা হইতে সুধু যে য়ুরোপীয় আমদানি-মালের মূল্য দেওয়া হয় তাহা নহে; তা ছাড়া রাজধানী সংক্রান্ত (Home charge) খর্চ্চার সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হয়—যে খর্চ্চার টাকা প্রতি বৎসর ২ কোটি পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠে।"

এক্ষণে রপ্তানি ছাড়িয়া আমদানি-বাণিজ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই, ভারতের অনেক মাল বিক্রয় করা আবশ্যক; কেন না, তাহা হইলে ভারত অনেক মাল ক্রয় করিতেও সমর্থ হয়। যদি ভারত অল্প মাল বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে আরও অল্প মাল খরিদ করে, তাহা হইলে ভারত ইংলণ্ডের নিকৃষ্ট মক্কেল বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। গ্রেট-ব্রিটেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৯৩০০০০পৌণ্ড মূল্যের মাল ভারতে রপ্তানি করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-রূপে উহা হইতে বাদ দিতে হইবে;—স্বাধীনরাজ্যের মাল, সীমান্ত রাজ্যের মাল, য়ুরোপীয়দিগের খরিদপত্র, রেলপথের সরঞ্জাম্, পূতকার্য্যের সরঞ্জাম্ সৈন্যাদির সরঞ্জাম। এসম্বন্ধে, ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের রিপোর্টাদি হইতে আশানুরূপ স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। যাই হউক, দাদাভাই বলেন, প্রাগুক্ত অঙ্কের অর্দ্ধেকের বেশী ভারত আসলে ক্রয় করে নাই;

মোটামুটি ধরিতে গেলে, হদ্দ ১৫০০০০০০ পৌণ্ড মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছে। ১৫০ বৎসর ইংরাজ শাসনের এই ত পরিণাম! ইংলণ্ডের বাণিজ্য সংক্রান্ত যতগুলি মক্কেল আছে, তন্মধ্যে ভারত সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কি? কারণ—ভারত সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। কর্ত্তৃপক্ষের যদি আর একটু উদারদৃষ্টি—আর একটু দূরদৃষ্টি থাকিত,—দেশকে শোষণ না করিয়া, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার পক্ষে যদি উহাদের উচ্চাকাঙ্খা থাকিত (যেমন মনে কর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের উদার নৈতিক দল যাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন) তাহা হইলে সমৃদ্ধ ভারত, অর্থব্যয়ে সমর্থ ভারত, ইংলণ্ডের আরো ভাল মক্কেল হইতে পারিত; তাহা হইলে ইংলণ্ড, ভারত হইতে এখন অপেক্ষা শতগুণ পরিমাণে অধিক লাভ করিতে পারিত সন্দেহ নাই। তাহা না হইয়া, ভারত আজ পসারহীন ঋণী,—ঋণভারে ভারাক্রান্ত। রাজপুরুষদিগের বাৎসরিক বৃত্তি পরিশোধ করিবার জন্য, ভারতের সমস্ত সঞ্চিত ধন,—সেই সব ইংরাজ মূলধনীদিগের হস্তে গিয়া পড়ে, যাহারা উচ্চাহারের সুদে ভারতকে টাকা ধার দেয়।

তাহার পর, এই সকল হিসাব-তালিকা—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গুরুতর জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করে না, এবং হিসাবও আদৌ "সঠিক্" নহে। প্রথমে যখন দাদাভাই এই সকল হিসাবের অঙ্ক প্রকাশ করেন, তখন কি ইংরাজ রাজপুরুষেরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন নাই? কিন্তু তাহার পর, তাঁহারা সেই উচ্চস্বর ক্রমশঃ নামাইয়া আনিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আরো সঠিক্ অঙ্কের অভাবে, অবশেষে দাদাভাইর অঙ্কগুলিই গ্রহণ করিলেন। আপাতত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ভারত উত্তম ঋণী,—উত্তম ক্রেতা নহে। ভারত উত্তমর্ণদিগকে যে পরিমাণ অর্থদান করে, সে পরিমাণ সওদাগরদিগকে দিতে পারে না। অতএব, বাণিজ্যের হিসাবে, ইঙ্গ-

ভারত-রাজ্য কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এরূপ যে ঘটিয়াছে ইহা শুল্কের দোষে নহে (তাহা আমি পরে দেখাইব) ইহা প্রণালীরই দোষ। ইংলণ্ডের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, মনে মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়;—ইংলণ্ড ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে,—ইহাই কি ইংরেজের বিশ্বাস? কিন্তু একদণ্ডস্থায়ী কিংবা একবর্ষস্থায়ী শাসনতন্ত্রগুলি যেরূপ অধৈর্য্যসহকারে লাভ করিবার চেষ্টা করে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কি সেই ভাবে চলিতেছেন না? বধ্যব্যক্তি যেরূপ সমস্ত ভোগ্যবস্তু তাড়াতাড়ি উপভোগ করিয়া লইতে চাহে, ইঁহারাও কি কতকটা সেই ভাবে কাজ করিতেছেন না?

ফরাসী পাঠকের মধ্যে অনেকেই, ভারত-সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়া থাকে তাহা শুধু অন্য রাজ্যের সহিত তুলনাসূত্রে। কোন তর্কচূড়ামণি যখন তাঁহার তর্কের ঢেউ, হিন্দু-চীনের পৃষ্ঠের উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিতে চাহেন, তখন তিনি ইংরাজ উপনিবেশরাজ্যের এমন একটি উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পান যাহাতে ছায়ার লেশমাত্র নাই। "অ্যাকাডেমি"র অনুমতিক্রমে আমি একটা অপশব্দ ব্যবহার করিয়া বলিতে চাহি—আমরা "Gobeur"এর জাতি;—অর্থাৎ আমরা গব্ গব্ করিয়া সম্মুখে যাহা পাই তাহাই গিলি। আমাদের উপনিবেশরাজ্যে উপনিবেশী মাত্র নাই—অতি অল্পই দেশীয় লোক, অথচ রাজপুরুষে দেশ আচ্ছন্ন! তাহার পাশে দেখ;—মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক—লোকের মত লোক—যাহারা অসংখ্য আসীয়িক জনতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ভারত দরিদ্র। বস্তুতঃ, ভারতের ক্ষীণ দেহে, এই লঘু সাজসজ্জাই উপযোগী। বৃদ্ধির মুখে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, উহারা ভারতকে দৃঢ়পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে,—যথাযথ পথে পরিচালিত করিতেছে। ছবিটি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু আর একটু কাছে গিয়া দেখা যাক্। ভারতে য়ুরোপীয়ের সংখ্যা ৭৫০০০

মাত্র। ইহা হইতে বাদ দেওয়া যাক্,খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক, সৈন্য ও সেনানায়ক, রাজপুরুষ, এঞ্জিনিয়ার, ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী (যেরূপ ধরা হয় তদপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা আরো বেশী)—এই সমস্ত বাদ দিলে, বাকি থাকে কি?—কয়েক শত সওদাগর, প্ল্যাণ্টার, ও কল-কারখানা-ওয়ালা। এই সমস্ত সাজসজ্জা দেখিতেই লঘু। খুব ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, ইহা বিলাসের সাজসজ্জা—খুব ভাস্বর, কিন্তু বিষম মহার্ঘ ও ব্যয়সাধ্য। যাহাদের ব্যয়ে এই সমস্ত সাজসজ্জা প্রস্তুত হয়, ইহা তাহাদের তেমন কাজে আইসে না,—তাহাদেরই কাজে আইসে যাহারা এই সাজসজ্জা ধারণ করে এবং নব নব জয়সাধনের উদ্দেশে ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভাল ভাল কাজ ইংরাজের জন্যই রক্ষিত। এ কথা স্বীকার করি, লণ্ডন হইতে আফিসের ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী কিংবা কেরাণী আমদানি করা হয় না। রাজপুরুষেরা মনে করে, এমন সাংঘাতিক জলবায়ুর দেশে তাহাদের যোগ্যতা ও পরিশ্রম বিপুলরূপে পুরস্কৃত হওয়া উচিত ইহা মনে করা তাহাদের পক্ষে অন্যায় নহে। আমাদের কার্পণ্য দেখিয়া উহারা হাসে। উহাদের নিকট পণ্ডিচেরীর উল্লেখ কর দেখি—অমনি উহারা ফরাসী শাসনকর্ত্তার বেতনের অঙ্কটা ঠি বলিয়া দিবে;—চাল্লিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক। এই বেতন ইঙ্গ-ভারতের উচ্চপদস্থ একজন কেরাণীও পাইয়া থাকে। এই সব বেতনের অঙ্ক বার্ষিক ১২০০০ হইতে ১২০০০০ পর্য্যন্ত। তা ছাড়া ইহা ধরা কথা যোগ্য কর্ম্মচারী পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দেওয়া চাই। ইংরাজের বলে, "ফরাসীরা এ বিষয়ে বড়ই ব্যয়কুণ্ঠ"। Sir John Strachey ফরাসী-রাজপুরুষদের বেতন তালিকার পাশা-পাশি, খুব গৌরবের সহিত ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের বেতন-তালিকা স্থাপন করিয়াছেন ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় তাহা তোমরা অনুমান করিতে পার। এক্ষ দেশীয় লোকেরা কি বলে শোনো:—"আমরা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র জাতি

আমাদের উপর যে শাসনতন্ত্র চাপানো হইয়াছে তাহা খুব চটক্দার হইলেও, আমাদের ক্ষীণ বজেটের উপর দুঃসহ বোঝার মত হইয়া রহিয়াছে। আমরা ইহা অপেক্ষা ঢের সস্তায় আমাদের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি। অমুক আফিসের জন্য, খুব মোটা বেতনের যে ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হয়, আমাদের লোকের দ্বারা তাহার স্থান,—অধিকতর যোগ্যতার সহিত ও অল্প বেতনে পূর্ণ হইতে পারে। আমরা যখন বেশী ক্ষমতা লাভের দাবী করি, তখন সেই সঙ্গে ইহাও চাহিয়া থাকি, আমাদের বজেটের ঋণ যেন কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ হয়। অধুনা আমরা এই সব হঠাৎ-নবাবদের সুখস্বচ্ছন্দতা ও বিলাসিতার উদ্দেশেই আমাদের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত করি;—এই সব হঠাৎ-নবাব, দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক; কেননা তাহাদেরই ব্যয়িত ও সঞ্চিত অর্থে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ফাঁপিয়া উঠে....।"

বজেটের তৃতীয়াংশ—প্রায় ৫০ কোটি ফ্রাঙ্ক—য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন দিতেই নিশেষিত হয়। বিশেষতঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণকে যে বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ খুব বেশী। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের জন্য ২৫০০০ ফ্র্যাঙ্ক করিয়া অবসর-বৃত্তি নির্দ্ধারিত। ইঙ্গ-ভারতীয় রাজ্যপদ্ধতির এই ব্যবস্থাটি বিশেষ চিন্তার কারণ। রবি-শোষিত নদীর জল যেরূপ শিশির ও বৃষ্টির আকারে ধরা পৃষ্ঠেই পুনর্ব্বার পতিত হয়,—মনে কর, সেইরূপ যদি ভারতের কোটি কোটি মুদ্রা, অর্থবণ্টনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, দেশীয়গণকর্ত্তৃক ক্রীত পণ্যের আকারে, পুনর্ব্বার দেশেই ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে অভিনব বণ্টনের ফলে সেই ধন রূপান্তর হয় মাত্র, কিন্তু আসলে দেশের ধনক্ষয় হয় না। কিন্তু এখনকার অবস্থা তাহার বিপরীত। অবসর-বৃত্তি লাভ করিয়া, ইঙ্গ-ভারতীয় রাজপুরুষগণ, এদেশ হইতে চিরবিদায়

গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিপুল বৃত্তি সম্ভোগ করিবার জন্য, ভূমধ্যসাগরের কিংবা ইংলণ্ডীয় খাড়িসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সেই সব স্থানে গমন করেন,—যেখানকার জলবায়ু মিঠা এবং যেখানকার জীবিকা মহার্ঘ নহে। এখন ভারত শুকাইয়া মরুক! যে সকল রাজ-পুরুষ এদেশে বাস করেন—তুমি কি মনে কর—তাঁহারা ভারত হইতে যাহা পান তাহা ভারতকেই ফিরাইয়া দেন? তাহা মনেও করিও না। পূর্ব্বতন ভারত-বিজয়িগণ, দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠন করিত বটে, কিন্তু অপব্যয়ী নবাবের ন্যায় মুক্তহস্তে টাকা ছড়াইত। অধুনা রাজ-পুরুষদের ব্যয়-সংযমই দেশের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। অবিবাহিত রাজপুরুষেরা, কর্ম্মজীবনের অবসর কালের জন্য, তাঁহাদের ধন সঞ্চিত করিয়া রাখেন। যাঁহাদের সন্তানাদি আছে এবং যাহাদের পরিবারবর্গ প্রায় য়ুরোপেই বাস করে, সেই সকল রাজপুরুষগণ স্বকীয় সঞ্চিত ধন, স্বদেশস্থ পরিবারবর্গের নিকটেই পাঠাইয়া দেন। যে সকল য়ুরোপীয় এদেশে বাস করে তাহারা এদেশের কি কি দ্রব্য ক্রয় করে? কিরূপ শ্রমজীবিদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করে—তাহারা পাঁউরুটি, "বীফের" মূল্য দেয়, বাড়ীর ভাড়া দেয়, ভৃত্যগণের বেতন দেয়। কিন্তু তাহাদের ব্যবহার্য্য প্রায় সমস্ত জিনিসই য়ুরোপ হইতে আইসে;—পনির, জমাট্-দুগ্ধ, হুইস্কি, মোরব্বা, পরিচ্ছদ, আস্‌বাব্, আয়েসের ও বিলাসের সমস্ত সরঞ্জাম। উহারা এ দেশের জিনিস পত্র যাহা কিছু সংগ্রহ করে তাহাও অধিক মূল্যের নহে কিন্তু উহারা যখন অপব্যয় করে (উহাদের মধ্যে এক এক জন "উড়ন-চণ্ডী"ও আছে) তখন সেই অপব্যয়ের ফলে প্রায় য়ুরোপীয় দোকান-দারেরাই ধনশালী হইয়া উঠে। তাছাড়া, (যদি হিন্দুদের কথায় বিশ্বাস করা যায়) আর এক ব্যক্তির উদরপূর্ত্তি হয়—অর্থাৎ, মহাজনের তাই এই মহাজন ইংরাজের শাসনতন্ত্রকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করে।

উপরে যে সকল অনিষ্টের কথা বলা হইল, উহা বিদেশীয় শাসনের অপরিহার্য্য সহচর;—উহা দূর-শাসন-দোষের (absenteism) প্রকার-ভেদ মাত্র। লুণ্ঠনার্থ কোন দেশ একবার মাত্র আক্রমণ করা এক কথা;—এস্থলে শত্রুপক্ষ লুটের দ্রব্য লইয়া সত্বর প্রস্থান করে। আক্রমণকারী দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়মিতরূপে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হওয়া—সে এক কথা; তাহারা যাহা লুট করে তাহা দেশকেই ফিরাইয়া দেয়—অর্থাৎ দেশেই তাহা খরচ করে। কিন্তু নিয়মিতরূপে, পদ্ধতিক্রমে দেশের ধনশোষণ করা—সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ স্থলে যাহা কিছু দেশ হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহার কিছুমাত্র দেশকে প্রত্যর্পণ করা হয় না।

উদার-নৈতিকেরা এই অনিষ্টের কথা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সাহসপূর্ব্বক ব্যক্তও করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে, ইংরাজের মুখ হইতেই খুব সজোরে ও স্পষ্টাক্ষরে ভর্ৎসনা-বাক্য বাহির হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষীয়গণ, চক্রান্ত করিয়া, ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক, খুব দক্ষতার সহিত, নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাদের সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া দেয়। যখন ভারত-সচিব পার্লেমেণ্টের নিকট বলিলেন, ভারত এতই দরিদ্র যে, মোটা বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা তাহার সাধ্যাতীত, তখন ইঙ্গ-ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ কাঁধ নাড়া দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলেন! ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনতন্ত্র যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, উহার সার্থকতা কি যদি উহা ভারতবাসীর প্রয়োজনোপযোগী না হয়,—যদি উহা অনাবশ্যক ভাররূপে ভারতের শুধু গলগ্রহ হইয়া থাকে;...কোন এক ব্যক্তি ঠিক্ই বলিয়াছেন—"ইহা যেন হিন্দু কৃষকের হাতী দিয়া লাঙ্গল চষা।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

নরবলি।

নরবলি অতিশয় গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। আর সেরূপ বিশ্বাস হইবার কারণেরও অভাব নাই। কাতরস্বরে শব্দায়মান ছাগমেষাদিকে বলি দিতে দেখিলে যখন চিত্তে যারপরনাই বীভৎসভাবের উদয় হয়, তখন নরবলির কথা শ্রবণ করিলে যে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে, চিত্ত আলোড়িত হইবে, অনুমোদনকারী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

ডারউইন প্রভৃতি ক্রমোন্নতিবাদিগণের মতে জীবজগতে অতিশয় নীচ জীব ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা ঠিক্ বিপরীত ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির জন্য যে কয়জন মানসপুত্রের আবির্ভাব করেন, তাঁহারা মূর্ত্তিমান জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহারা সৃষ্টিব্যাপারে উদাসীন হওয়ায় ভগবান্ ব্রহ্মাকে, স্বকার্য্যসাধনার্থ, তাঁহাদের অপেক্ষা হীন সন্ততির উৎপাদন করিতে হইয়াছিল। সেই হীনতা ক্রমাবনতি-স্রোতে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে এই মতের সত্যতা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এই ক্রমাবনতি বশতঃ শেষে এমন হইয়াছে যে, প্রাণটুকু উবিয়া গিয়াছে শবমাত্র পড়িয়া আছে, আর সেই শবই এখন পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবহারিক জগতে, বহির্বেশে, আচারব্যবহারে, চুলা-চৌকায়মাত্র ধর্ম্ম আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাও যায়—বেসি দিন নহে।

বিনা বলিতে শক্তিপূজা হয় না, এবং যাবতীয় বলির মধ্যে নরবলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে এই মহাবলি সমর্পিত হইয়া থাকে।

নরবলিতে যে শক্তি প্রীতা হইয়া মহদুদ্দেশ্য সাধন করেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। ভারতবর্ষের সাধকাগ্রণিগণই নরবলির মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। ভাগ্যদোষে তাঁহাদের ভাব দূষিত হইয়া বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং ইহা সকলেরই হেয় ও ত্যাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। অতিষ্ঠা কামনায় নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। সর্ব্বভূত অতিক্রম করিয়া যে স্থান আছে তাহার নাম অতিষ্ঠা। বাস্তবিকই, অতিষ্ঠা লাভ ভিন্ন নরমেধ-যজ্ঞের অন্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমাবনতিই সবিশেষ লক্ষিত হইতেছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কালে এই নরমেধের উদ্দেশ্য ও ভাব ক্রমে দূষিত ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং অবশেষে নরবলি, শুধু মনুষ্যকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসাদি দ্বারা হবনাদি কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন এই ভাব সকলের হেয় হইয়া উঠিল তখন কলিতে ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রাজ্ঞা ঘোষিত হইল। তান্ত্রিক নরবলি বৈদিক নরমেধের ছায়ামাত্র; বিশেষত্ব এই যে, ইহা অধিকতর বিকৃত ও দূষিত।

বিনা নরবলিতে মহাশক্তি তুষ্টা হন না এবং অতিষ্ঠাও প্রদান করেন না। ইতিহাসের প্রতি পত্র এই সত্যকে সপ্রমাণিত করিতেছে। জগতে কোথায় কবে বিনা নরবলিতে কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে? সর্ব্ববিধ হিতকর মহাযজ্ঞে নরবলি দিতে হইয়াছে, তবে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইয়াছে। কোথাও বা এক, কোথাও বা দুই, কোথাও বা বহুল নরবলি প্রদত্ত হইয়াছে, তবে যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইয়াছে।

শিবপুরাণে আছে যে অভির প্রদেশে মহা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। ভগবান্ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকে বলিলেন—"তোমরা মহা পাপ করিয়াছ, সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ এই অনাবৃষ্টি ও দুষ্কালের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কাহারও সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শুদ্ধ ও শান্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারে, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে"। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত ও বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেশের হিতার্থ, সর্ব্বজনের মঙ্গলার্থ, আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতামাতা জীবিত থাকিতে তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুত্রের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই; তাই শতমন্যু পিতামাতার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন। পিতঃ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী; সেই জন্মভূমির জন্য এ দেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। যে দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই, প্রাণান্তে যাহা হয় ভস্মসাৎ হইবে, না হয় শৃগাল কুক্কুরাদির আহার হইবে, অথবা জঘন্য ক্রুমিরাশিতে পরিণত হইবে, সেই অকিঞ্চিৎকর জড়দেহদানে যদি মাতৃভূমির হিতসাধন করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ অধিকতর নিশ্রেয়ঃ আর কি হইতে পারে।" আজ ভারতবাসী সগর্ব্বে যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা মহাত্মা শতমন্যুর মুখনিঃসৃত।

পিতা নীরব রহিলেন। তখন শতমন্যু মাতার নিকট গমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। মাতা সৎপুত্রের বহু গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন। "বাবা, আমিই অগ্নিপ্রবেশ করিতেছি, তোমার মত লোক জীবিত থাকিলে জগতের বহুল মঙ্গল হইবে"।

তখন শতমন্যুর পিতা বলিলেন "তোমরা দুই জনেই ধন্য, তোমদের কাহাকেই অগ্নিপ্রবেশ করিতে হইবে না, আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেছি"। তখন আকাশবাণী, সেই মহানুভবত্রয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের দৃঢ়নিশ্চয়তায় আবশ্যকীয় নরবলির কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।" অনন্তর সুবৃষ্টি হইয়া ধরাকে শস্যপূর্ণ করিল।

সত্যস্থাপন করিবার জন্য, ভ্রমাপনোদনপূর্ব্বক জগতে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বিস্তারকল্পে কত সর্ব্বগুণান্বিত মহাপুরুষকে কোথাও রক্তদান করিয়া, কোথাও জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়া মহাশক্তির প্রীতি সাধন করিতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহাদের গুণগ্রাম ঘোষণা করিতেছে।

শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য কত মহাপুরুষ আত্মরক্তদানে মহাশক্তির প্রীতি সাধন করিয়াছেন। কতশত নরনারীর মস্তক মহাশক্তির সম্মুখে সমর্পিত হইয়াছে, তবে দেবী মহাশক্তি প্রীত হইয়া পতিতের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, অপগত দেশকে সমুন্নত করিয়াছেন, দাসকে রাজা ও দাসীকে মহারাজ্ঞী করিয়াছেন।

নরবলিরূপে প্রদত্ত মহাপুরুষের রক্ত, রক্তবীজের রুধির। মহামতি ওয়ালেস্ মহাশক্তির নিকট হৃদয়ের রক্ত দান করেন, সেই নরবলিতে প্রীতা হইয়া মহাশক্তি, স্কটলণ্ডের মস্তকে স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল মুকুট স্থাপন করেন। শত্রুবিদলিত ইটালি আপনার উদ্ধারের জন্য এক মহা নরমেধের অনুষ্ঠান করে; তাহাতে তুষ্টা হইয়া মহাশক্তি তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিশালিনী করেন।

বাইবেলে যে মহা নরমেধের উল্লেখ আছে, তাহারই ফলে, সেই মহাপুরুষের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া মহাশক্তি, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ইউরোপে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন, জড়কে কর্ম্মঠ, ও অসভ্যকে সুসভ্য করেন।

আবার যখন ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনে সস্ত্রীক পৃথ্বীরাজ মহাশক্তির নিকট বলিরূপে সমর্পিত হইলেন, মহাশক্তি প্রীত হয়েন নাই, হইলে কি আর মুসলমান প্রবেশ লাভ করিতে পারিত?

রাণাপ্রতাপ মাতৃভূমির জন্য এক বহুদিনব্যাপী মহাযজ্ঞ করিয়া শেষে আপনাকে তাহাতে পূর্ণাহুতিস্বরূপ প্রদান করেন, তাহাতেও মহাশক্তি প্রীতা হয়েন নাই, হইলে কবে মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইত।

তাহার পর উগ্রচণ্ডাবেশে মহাকালী কত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উদরসাৎ করিয়াছেন, তবুও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। হইলে কি আজ ভারতের এ দুরবস্থা হইত?

ইহার বিশেষ কারণ আছে। শাস্ত্র মিথ্যা নয়, শাস্ত্রের ফলশ্রুতিও মিথ্যা নহে। সদস্যাদি যজ্ঞকর্ত্তাগণের দোষেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না। কোথাও বা দ্রব্য শুদ্ধির অভাবে, উপকরণের ও আয়োজনের অভাবে যজ্ঞ ভ্রষ্ট হয়। কোথাও যজ্ঞপশু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত না হওয়ায় যজ্ঞ নষ্ট হইয়াছে। সকল বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ না হইলে যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। আর সেরূপ সমাবেশ না করিয়া যজ্ঞ করা বৃথা। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, ফল একদিনে না ফলিতে পারে, এক বৎসরে না হইতে পারে কিন্তু যথাযথ প্রদত্ত নরবলি কখন বৃথা হয় না, তাহার ফল ফলিবেই; বিলম্বও হইতে পারে শীঘ্রও হইতে পারে।

নরবলিরূপে প্রদত্ত মহাপুরুষের প্রতি রক্তবিন্দু হইতে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। নরবলির কয়েকটি বিশেষ ভেদ আছে। কেবল দেহপাতেই, হৃদয়ের রক্তদানেই যে নরবলিদান সিদ্ধ হয় তাহা নহে। দেশের জন্য, জনসাধারণের হিতার্থ সর্ব্বস্ব মহাশক্তির শ্রীচরণে উৎসর্গ করা, সেও এক উচ্চ ভাবের নরবলি। যখন মহাপুরুষগণ মানবের দুঃখে কাতর হইয়া, দেশের দুর্গতি দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, আপনার সকল স্বার্থ মহাশক্তির সমক্ষে বলিদান দিয়া, কঠোর সন্ন্যাসব্রত

গ্রহণপূর্ব্বক জগতের হিতসাধনকল্পে ব্যাপৃত হন, তখন আর তাঁহাদের মনুষ্যত্ব থাকে না, তখন তাঁহারা ইহজন্মেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং সকলের শরণ্য ও পূজ্য হইয়া থাকেন।

দেশের লোকের মহাপাপেই দেশের দুর্গতি হইয়া থাকে। দুর্গতি নাশ করিতে হইলে মহাশক্তির নিকট নরবলি দান করিতে হয়। একটা মানুষকে, মুখহাতপা বাঁধিয়া, পশুর ন্যায় দেবমূর্ত্তির নিকট হত্যা করা নরবলি নহে। মহাশক্তির নিকট প্রদানের জন্য যজ্ঞপশু শতমন্যুর ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত, নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন; তাঁহার হয় বীরবেশ না হয় কাঙ্গালের বেশ হইবে, রণস্থলে স্বয়ং মহাভৈরবের মহা অসিতে তাহার মস্তক ছিন্ন হয়। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া যে এরূপ বলি প্রদত্ত হয় না এরূপ নহে, তাহাও হয়, এমনকি জীবন্ত আহুত ও দত্ত হয়। এ নরমেধে মনুষ্যকে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া তাহার মেদ ও মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয় না, এ বলির মুখে আর্ত্তনাদ বহির্গত হয় না। সে মুখ হইতে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" "সত্যমেব জয়তি" "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়" প্রভৃতি উচ্চারিত হইয়া দিক্-দিগন্তর প্রকম্পিত করে, ভীরুকে বীর করে, পাষণ্ডকে ধার্ম্মিক করে, পতিতের উদ্ধারসাধন করে, ও জড়কে কর্ম্মিষ্ঠ করে। সে বলি কোন প্রত্যক্ষ দেবতার সমক্ষে প্রদত্ত হয় না। কারণ মহাশক্তির পূজায়ই নরবলির প্রয়োজন। সেই মহাশক্তি কখন জন্মভূমিরূপে কখনবা ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং তাঁহারই সমক্ষে এ নরবলি প্রদত্ত হয়। নিহত বলির সঙ্গে সঙ্গে অতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। কারণ এ মহাযজ্ঞে যিনিই বলি, তিনিই পুরোহিত, তিনিই আপন ইষ্টমন্ত্রে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন, অপরে হত্যা করে মাত্র।

যখন এরূপ মহাবলির মস্তক মহাশক্তির নিকট প্রদত্ত হয় তখন সমগ্র জগতের মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। যখন সে নরশিরে বর্ত্তিকা প্রদত্ত হয় তখন সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যখন এই মহাবলির

শোণিত মহাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক মহাশক্তিকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, তখন মহাকালীকার শ্রীমুখ হইতে অট্ট অট্ট হাস্য বিনির্গত হইয়া দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়, ম্লান মুখে হাসি ফুটায়, শোক-তাপকে দূর করে। আর অতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেই মহাপুরুষ হাসিতে হাসি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হয়েন।

ইহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নরবলি বলে। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন, এ নরমেধযজ্ঞ কিরূপ, তাহার মন্ত্র কি? তাহার সাধন ও অনুষ্ঠান কিরূপ, এবং তাহার ফলাফলই বা কিরূপ।

দেশে কয়টা শতমন্যু জন্মগ্রহণ করে, কয়জন ওয়ালেস্ বা ওয়াসিংটন আবির্ভূত হয়? সমগ্র জগতে কয়জন বুদ্ধ, কয়জন খ্রীষ্ট, কয়জন চৈতন্য প্রকটিত হয়েন। এই এক এক মহাপুরুষ কেহ বা দেশের জন্য, কেহ বা সত্যের জন্য, কেহ বা ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় নিষ্পাপ, নির্ম্মল হৃদয়ে মহাশক্তির নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়া জগতের কতই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, এই সকল মহাপুরুষের রক্তবিন্দু হইতে কত শতসহস্র মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

দেশকালপাত্র অনুসারে এই নরবলি সুসিদ্ধ বা নিষ্ফল হয়। একেবারে নিষ্ফল হয় একথা বলা যায় না, তবে ফললাভের বিলম্ব হয়। মহাশক্তি, আপন শক্তির অংশ এইরূপে মহাপুরুষে আবির্ভূত করিয়া পুনশ্চ বলিরূপে আপনাতে প্রতিসংহার করেন। কখন বা আপনার শক্তি, সু ও কুভাবে প্রকটিত করিয়া, লোকশিক্ষার্থ প্রথমতঃ কু'র প্রভাব বিস্তার করিয়া, পরিণামে শুভদ্বারা অশুভের বলি সম্পাদন করিয়া সেই অশুভ-শক্তি আপনাতে প্রত্যাহরণ করেন; সেও নরমেধযজ্ঞ ও নরবলি।

মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রভৃতি এইরূপে মহাশক্তির নিকট বলিরূপে প্রদত্ত হওয়ায় জগতের শান্তিবিধান হইয়াছে।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

মাতৃপূজা।*

ভগিনিগণ! ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নবেশী আমরা আজ একত্র এখানে সম্মিলিত হয়ে'ছি কেন? এর উত্তর আমার সম্বোধনের মধ্যেই নিহিত আছে। দৃশ্যতঃ এত ব্যবধানসত্ত্বেও বস্তুতঃ আমরা যে এক, এক ভারতমাতার কন্যা—পরস্পরে ভগিনীসূত্রে আবদ্ধ, এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করে আমরা মাতৃপূজার জন্য একত্র সম্মিলিত হয়েছি। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও শিক্ষা আমাদের অল্পদিন ও অল্পজনের হয়েছে, আর তাঁদের মধ্যেও সকলের এখানে সম্মিলিত হবার সুবিধা নাই। আজ যাঁরা এখানে সমবেত হ'তে পেরেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবতী। সংসারের নিয়ম এই যে, যিনি যে বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান, তিনি অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহীনকে তাহার অংশ দান করেন। ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান মূর্খকে, সুস্থকায় রুগ্নকে সাহায্য দান করেন। এই করুণার ধারা সংসারে প্রবাহিত না থাকিলে সংসার চলিত না—মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ থাকিত না।

যে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ আজ মাতৃপূজার জন্য সম্মিলিত হ'তে পেরেছেন, মাতৃপূজা করে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেছেন—দূরস্থিতা ভগিনীগণকে কি তাঁদের এ সৌভাগ্যের অংশ দানের জন্য তাঁদের মন লালায়িত হচ্ছেনা?

কিন্তু বাসনা আর কার্য্য দুই এক জিনিস নহে; অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও উপায়াভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না।

---

* একবিংশ কংগ্রেসের সমসাময়িক ভারতমহিলা পরিষদে পঠিত।

পুরুষদের মধ্যে পুরুষরা যেরূপ সহজে কাজ করিতে পারেন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে মিটিং বা বক্তৃতার চলন নাই সুতরাং সে উপায়ে কায কত্তে গেলে সাধারণের মধ্যে তাহা কার্য্যকরীও হয় না। মেয়েদের মধ্যে কায করিতে গেলে, বন্ধুভাবে, ভগিনীভাবে প্রথম তাঁহাদের মিলন আবশ্যক। সেইজন্য প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ও তাঁহাদের বাটী গিয়া কথাবার্ত্তা আলাপনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের মাতৃপূজায় ব্রতী করিতে পারিলে সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমি দুইটী বিভিন্ন গ্রামে এ বিষয়ের উদ্যোগ যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা জানিতে পারিলে হয়ত এখানে উপস্থিত মহিলাদের মনেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, এই মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার উদ্দেশ্যেই আমি এই সভার সেক্রেটারী মহোদয়ায় অনুরোধ রক্ষা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সকল মহিলা এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, আর যাঁহারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া বক্তৃতা দিলেন, তাঁহাদের ন্যায় বক্তৃতাশক্তি আমার নাই—বক্তৃতা করিতে আমি আসি নাই—আমার এ কেবল একটী কাজের কাহিনী বিবৃত করা। যদি ইহা আপনাদের চিত্তাকর্ষক হয়—যদি কেহ এই উপায়ে কার্য্যের সহজ পথ লাভ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, সে আমার বিশেষ সৌভাগ্য।

ইহারই নিকটস্থ কোন গ্রামে কয়েকজন মহিলা একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমিতির কোন সভ্য নাই, কোন নাম নাই—চাঁদা নাই; কিন্তু তিনখানি খাতা আছে। একখানি খাতায় সে গ্রামের সব বাড়ীর তালিকা আছে। গ্রামস্থ মহিলাগণ সকলে 'মায়ের কৌটা' নামক একটী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য এই, প্রতিদিন বাজারের পয়সা হইতে একটী-আধটি পয়সা বা অন্ততঃ পক্ষে ভাঁড়ার

হইতে এক মুষ্টি চাউল তাহাতে রাখিতেছেন। মাসান্তে কার্য্য-কর্ত্রী সঞ্চিত দ্রব্য নিজের প্রতিবেশিনীদের ছেলেদের দ্বারা গ্রামস্থ সকল ঘর হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়েন। এটী এমন সহজ যে, এই মুষ্টিভিক্ষাদানে কেহই অস্বীকৃত হ'ননা। এতদ্ভিন্ন আর একটী উপায়ে মহিলারা সমিতির আয়বৃদ্ধির সাহায্য করেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রায় কোন-না-কোন রকম শিল্পকর্ম্ম অল্প বিস্তার জানেন। কার্য্য-কর্ত্রী প্রত্যেক মহিলাকে তাঁহার ইচ্ছামত শিল্পপ্রস্তুতার্থে উপকরণ প্রদান করেন, তাঁহারা অবসরসময়ে প্রতিদিন এক-আধঘণ্টা এই কার্য্য করেন। একটী শেষ হইলে তাহা কার্য্যকর্ত্রীকে প্রদান করিয়া আর একটি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খাতা খানিতে ইহারই হিসাব রাখা হয়। তৃতীয় খাতাখানি এককালীন দানের খাতা। যাহাতে ধনী, দরিদ্র কাহারও দিতে কষ্ট না হয় এইজন্য দৈনিক মুষ্টিভিক্ষার নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, যাঁহারা মাসিক দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এককালীন দান করেন। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোকও এই উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন! সপ্তাহে একবার করিয়া মহিলাদের সম্মিলন হয়। কখন কার্য্য-কর্ত্রীর বাটীতে কখন বা অপর কোন মহিলার বাটীতে এই সম্মিলন হয়। কিন্তু সকল মহিলা এ সম্মিলনে আসেন না। অনেকে মুষ্টিভিক্ষা ও শিল্পসাহায্য নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহ ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারেন না। যাঁহারা আসেন তাঁহারা এই সময়টা মিথ্যা নষ্ট না করিয়া এই সময়ে শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা পরস্পরের নিকট শিক্ষা লইতেন, অল্পদিন হইল দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির আয় তিন প্রকার। মাসিক মুষ্টিভিক্ষার সংগ্রহ, বিক্রীত শিল্পের মূল্য ও এককালীন সাহায্যপ্রাপ্তি। ব্যয়,—শিল্প শিক্ষয়িত্রীয় বেতন ও শিল্প উপকরণ ক্রয়। এই ব্যয়ের পর যাহা

উদ্বৃত্ত হইতেছে তাহাদ্বারা গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্য হইয়া থাকে। এই গ্রামের একটী কন্যা তাঁহার শ্বশুরালয়ে, অপর একটী গ্রামে, গিয়া এইরূপ সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আপাততঃ কেবলমাত্র এই দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা স্থাপন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন—এককালীন দানও কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু শিল্পের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই সঞ্চিত অর্থ, তাঁহার পুরুষ অভিভাবক-কদের হস্তে অর্পণ করিলে, তাঁহারা গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের পরামর্শ মত একটী তাঁতশিক্ষালয় স্থাপনে ব্যয় করিতেছেন। ইহাদ্বারা তথাকার দরিদ্র তন্তুবায়দের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি স্ত্রীলোকেরা এই মাতৃপূজার আয়োজন করিতে পারেন, তবে সে আয়োজন যতই সামান্য হউক, তাহার সুফল সামান্য হইবে না। অনেক সময় সামান্য কার্য্যের ফলও যে কত সুদূরব্যাপী হয় তাহা আগে ধারণাই করা যায় না। আজ যে শিল্পপ্রদর্শনী বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হইতেছে—ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতেছে, ইহার প্রথম সূত্রপাত মহিলার দ্বারা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কতিপয় ভদ্রমহিলা সখি-সমিতি নামক একটী মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন—সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলাশিল্পের উন্নতি করা একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে, সমিতি হইতে বর্ষে বর্ষে মহিলা শিল্প-মেলা নামক একটী বার্ষিক প্রদর্শনীর অধিবেশন হইত, তথায় মহিলাশিল্পের একটী বিশেষ বিভাগ থাকিত ও এই মহিলাশিল্পের জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কাশ্মীর, কটক, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, বহরমপুর প্রভৃতি শিল্পপ্রসিদ্ধ স্থান হইতে তথাকার বিশেষ বিশেষ শিল্প আনীত হইত। ৫।৬ বৎসর এই শিল্পমেলার অধিবেশনের পর, কলিকাতার Industrial Association হইতে সুবৃহৎ আকারে এইরূপ শিল্পমেলার অধিবেশন

হয়। এই মেলার অনুষ্ঠাতাগণ ইতিপূর্ব্বে মহিলা শিল্পমেলায় তাঁহাদের আত্মীয়াদের অভিভাবকরূপে সহায়তা করিতেন এবং Industrial Association হইতে অনুষ্ঠিত মেলার মহিলা-বিভাগে—সখি-সমিতির মহিলাগণ বিশেষ সাহায্য করেন। এই অধিবেশনের পর মহিলা শিল্পমেলার স্বতন্ত্র অধিবেশন আর হয় নাই। ক্রমে এই Industrial Association এর অনুষ্ঠিত শিল্পমেলা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া Industrial Exhibition এ পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি, সখি-সমিতি একটী মহিলা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আবশ্যক মত অর্থ সংগ্রহ হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থে ভদ্রবিধবাদের সাহায্য করা হয়।

এই যে ভারতের দুটী বিভিন্ন গ্রামের মহিলা-অনুষ্ঠিত মাতৃপূজার বিবরণ বলিলাম, এ দুটী যেমন সহজসাধ্য সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। পূজার অর্থ, উপহার। দানেই পূজার সম্যক বিকাশ। মাতার উদ্দেশ্যে ভাঁড়ার হইতে প্রতিদিন একমুষ্টি অন্ন বা অবসরসময়ের এক-আধ-ঘণ্টা সামান্য পরিশ্রম প্রদান করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু এটি উদ্যোগ করিয়া করায় কে? আজ এখানে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেকে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্র হৃদয়ে গ্রহণ করেন যে, তিনি গৃহে ফিরিয়া প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে লইয়া এইরূপ মাতৃপূজার আয়োজন করিবেন, তবে আমাদের আজিকার শুভ সম্মিলনের পুণ্য ফল ফলিবে। গ্রামের অবস্থানুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা—কোথাও কাযের আয়োজন বেশী হইতে পারে, কোথাও কম হইতে পারে; কিন্তু এর সামান্যতম অংশ, কেবল গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষা স্থাপনের ব্যবস্থা, যদি করা যায় তবে সেটীও কম নয়। ইহা দ্বারা যে কেবল সামান্য অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহা নহে, ইহা দ্বারা পরিবারে যে স্বদেশপ্রীতির বীজ স্থাপিত হইবে তাহার মূল্য অসামান্য। পারিবারিক

ধর্ম্ম অনুষ্ঠান দেখিয়া নিজের মনে যেমন ধর্ম্মের বীজ স্থাপিত হয়, সেইরূপ প্রতিদিন স্বদেশের জন্য এই মুষ্টিভিক্ষা অর্পণানুষ্ঠান দেখিয়াও শিশুর মনে স্বদেশপ্রীতির যে বীজ স্থাপিত হইবে, তাহা পরে, তাহার জীবনে ও শিক্ষায় পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ভগিনিগণ—যদি আমাদের চেষ্টায় দেশের সে সুদিন আসে, আমাদের গৃহে গৃহে তীর্থস্থান স্থাপিত হয় ; তবে সে চেষ্টা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে ? আজ কি গৃহে ফিরিবার আগে এই শুভ সম্মিলনক্ষেত্র হইতে এই মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বদেশব্রতে দীক্ষিত হইবনা ? ঈশ্বর আমাদের এই মঙ্গল ইচ্ছায় তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের বাসনা সুফলময় হইবে।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত মহিলা শিল্পসমিতি সংক্রান্ত কোন কিছু জানিতে চাহিলে, ৫৭ নং ঝাউলতলা রোড বালিগঞ্জে, আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ঢাকার কাটরা।*

এন্তেজামদ্দোলা নসিরুল্ মুল্‌ক্ সৈয়দ আলী খান বাহাদুরনসরং জং সাহেব ১৮১৭ খৃঃ অঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দ্বারা ঢাকার (জাহাঙ্গীর নগরের) সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ইংরেজদিগের আদেশ অনুসারে ঢাকার বিবরণী (তাওয়ারিখে জাহাঙ্গীর নগর) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং ঐ পুস্তকখানি "সুণ্টাস" নামে জনৈক ইংরেজকে উপহার প্রদান করেন। পুস্তকের নাম ঢাকার বিবরণী হইলেও তাহাতে তিনি সংক্ষেপে মোগল-শাসনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত পুস্তকখানির

* অট্টালিকা।

পাণ্ডুলিপি এখন এসিয়াটিক সোসাইটিতে বর্ত্তমান আছে। আমরা সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ঢাকার কাটরাগুলি সম্বন্ধে যৎসামান্য পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। অন্যান্য বিষয় বারান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।

সম্রাট আকবরের সময় সর্ব্বপ্রথম সুবাবাঙ্গলা আংশিকরূপে মোগলাধিকৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে আফগানসম্প্রদায়ের হস্তগত ছিল। মোগলসৈন্যেরা আফগানসৈন্যের নেতা ওস্‌মান্ খাঁর সহিত অনেকবার যুদ্ধ করে। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া অনেক সৈন্যসামন্তসহ আফ্‌গানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সাত বৎসর পর ১০২১ হীজ্‌রীতে এছলাম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলা অধিকার করিতে সুজাত খান্‌কে নিযুক্ত করেন। সুজাত খাঁ অনেক যুদ্ধের পর ওস্‌মান্ খান্‌কে পরাস্ত করেন। ওস্‌মান্ খাঁর পুত্র আলীখান্ ও তাঁহার ভ্রাতা মেম্‌রেজখান্, এস্‌লাম্ খাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময় বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে মোগলাধিকৃত হয়। এবং এসলাম্ সুবাদারীর সময় ঢাকা "জাহাঙ্গীর নগর" নামে অভিহিত হয়।* এস্‌লাম খাঁ বিশেষ যত্নের সহিত অনেক সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাহাঙ্গীর নগরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। ১০৫০ হিজ্‌রীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার আজিমওশ্বানের দেওয়ান মির আবুল কাসেম তদীয় আদেশ অনুসারে একটী কাটরা প্রস্তুত করেন। কিন্তু রাজকুমারের মনোমত না হওয়ায় উহা দেওয়ানকে প্রদান করেন। এই কাটরা বর্ত্তমানে "বড় কাটরা" নামে পরিচিত। আজিমওশ্বান্ ঈদের নমাজ পড়িবার জন্য "ঈদ্-গাহ" প্রস্তুত করেন। ঐ কাটরা ও ঈদ্-গাহ ...২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবুল কাসেমের উত্তরাধীকারীদিগের হস্তে ছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ আর একটী কাটরা প্রস্তুত করেন ; বর্ত্তমানে ইহা

* এই সময় চট্টগ্রামের "এছলামাবাদ" নামকরণ হয়।

ছোট-কাটরা নামে পরিচিত। আজিমওশ্বান লালবাগ প্রস্তুত করিয়া সায়েস্তা খাঁকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। জাহাঙ্গীর নগরের বিবরণ লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি সায়েস্তা খাঁর উত্তরাধিকারী মৃজার ওসন্ আলী এবং তাহার ভ্রাতা কাসেমআলীর পুত্র মজরআলীকে ছোট কাটরা ও লালবাগ ভোগ করিতে দেখিয়াছেন। আজিমওশ্বানের সময় সৈয়দ বংশোদ্ভব মির মুরাদআলী "মীর এমারতের"* কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ "হুস্নী দালান'' নির্ম্মাণ করেন। এহতেসাম্ খাঁর সুবাদারীর সময় রাজকীয় নৌকাবিভাগের দারগা মহম্মদ মকিন্ আরও একটী কাটরা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপিও উহা মকিমের কাটরা নামে পরিচিত। নবাব জাফর খাঁ নাসরী (যিনি ইতিহাসে কারতলব খাঁ ও মুর্শিদকুলী খাঁ নামে প্রসিদ্ধ) একটী মস্‌জিদ্ ও বাজার নির্ম্মাণ করান। উক্ত মস্‌জিদ্ যাফ্‌রী মস্‌জিদ্ নামে খ্যাত। উহা ১৮২০ খৃঃ অব্দে মুর্শিদ-কুলীখাঁর উত্তরাধিকারী গজনফর হুসেন খাঁর কন্যা হাজী বেগমের তত্ত্বাব-ধানে ছিল। লালবাগে যে একটী মকবেরা (সমাধি) আছে তাহা সায়েস্তা খাঁর ইরানী কন্যার সমাধি। নারায়ণগঞ্জের নিকট যে দুর্গ-চূড়া দৃষ্ট হয় উহা নবাব খান খানা ময়াজ্জেখার নির্ম্মিত।

খান, "আর-খাঙ্গিদের" উপদ্রব নিবারণ করিতে দুইটী তোপ নির্ম্মাণ করেন, উহার বড় তোপটী চক্‌বাজারে রক্ষিত আছে। ছোট তোপটী ও দুইটী গোলা নদীগর্ভে নিহিত আছে। নদীর পার্শ্বস্থ যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ দেখা যায় উহার অধিকাংশই সুবাদার এব্রাহিম খাঁর নির্ম্মিত বলিয়া ঢাকার বিবরণী লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট আলমগীরের সময় "শাহটঙ্গি" নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ (ফকির) ঢাকার উত্তরে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটী পোল নির্ম্মাণ করান উহা বর্ত্তমানে টুঙ্গির পুল নামে অভিহিত।

শ্রীআজিজর রহমান।

* মীর-এমারত Engineer, তিনি কোন কোন সময় তহশীলাদি করিতেন।

ভয় নাই।

একই সাথে মোরা শুনেছি সবাই
জননীর আহ্বান,
তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া তাই সবে মোরা—
হইয়াছি আগুয়ান।
ক্ষুব্ধ সিন্ধু কাঁপিছে দ্বিগুন,
আকাশে বজ্র ঢালিছে আগুন ;
মোরা যে ছুটেছি হাত ধরি ধরি
সপ্তটী কোটী ভাই ;
মায়ের আশীষে বুকের মাঝারে
কোন ভয় নাই, নাই।

সারাটা বিশ্ব চকিতচক্ষে
চাহিয়া মোদের পানে,
'পতিত দলিত এ জাতি কভু কি
পারিবে জিনিতে রণে ?'
লব শিরে কি গো কলঙ্কডালি !
সহিব পরের উপহাস গালি !
কভু নয়, নয়। মাঝপথ হতে
আমরা কি ফিরি ভাই !
মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত সবে
কোন ভয় নাই, নাই।

যে ভাবে ভাবুক মোদের ভিখারী,
যে ভাবে ভাবুক হীন,
মোরা নহি আর পথের কাঙ্গালী
নহি, নহি মোরা দীন।
ছেড়েছি, ছেড়েছি পরের দুয়ার,
চিনিয়া লয়েছি পথ আপনার;
বাহুতে লভেছি কোটীগুণ বল
মিলি সাতকোটী ভাই;
ফিরিয়া পেয়েছি জননীর ক্রোড়
কোন ভয় নাই, নাই।

অভ্র-চুম্বি অদ্রি যদিবা
দাঁড়ায় রোধিয়া পথ,
লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে সে যে
হ'য়ে যা'বে ধূলিবৎ।
সকল বাধারে করিয়া তুচ্ছ,
দৃঢ়তার ধ্বজা ধরিয়া উচ্চ,
অচিরে সবাই দাঁড়াইব গিয়া
মোদের লক্ষ্য ঠাঁই;
জননী যখন আছেন সহায়
কোন ভয় নাই, নাই।

ঘরের কথা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমরা যেমন আত্মীয়, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিশেষ—কোন ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতে গেলে, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য বলি—"মহাশয়কে বড় কাহিল দেখিতেছি।" যদি কোন ইংরাজকে ঐরূপ আপ্যায়িত করিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্থি-ভেদী মুষ্টাঘাতে আমাদের পৃষ্ঠের উপর তাঁহার দৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় বসাইয়া দেন। "তোমায় যে খুব সুস্থ ও সবল দেখিতেছি" ইংরাজী সমাজে পরস্পরের মধ্যে ইহাই ভদ্র আলাপ তবে মেমসাহেবদের পুরুষসমক্ষে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট, সামান্য কারণে মূর্চ্ছা যাইবার অধিকার প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে; এবং সেজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা পাখা, এসেন্স, সুবাসিত লবণের শিশি প্রভৃতি সঙ্গে প্রস্তুত রাখেন।

সোফিরও এ সকল সরঞ্জামের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্য-সুখের প্রফুল্ল গোলাপ, তাহার কপোলযুগলে সতত প্রস্ফুটিত থাকিত। নিয়মিত আহার, বিহার, শ্রম, গমন, বিরামাদির গুণে সোফির প্রতি অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সুষম সুঠাম লাবণ্যের তরীখানি সরল সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া সোফি সান্ধ্য-সমীরসেবনে বিচরণ করিত। আস্‌মানি রংটী বুঝি সোফির বড় মনের মত; তাই প্রায়ই সেই রংয়ের সুচিকন সাটিনের আঁটা-সাঁটা পোষাকে তাহার আপাদবক্ষ সজ্জিত থাকিত; সেই নয়নতৃপ্তিকর সুনীল জলদ জলনিধির উপর সোফির মুখখানি যেন হিম-ম্লান পূর্ণচন্দ্রের

ন্যায় ভাসিয়া থাকিত। সেই অবেণীবদ্ধ ঘন কেশদাম একটী সামান্যগুচ্ছে পরিণত হইয়া, শ্যামাঙ্গিনীর সুন্দর স্কন্ধদেশে শিথিলভাবে দুলিত। সিঁথির বামপাশে কখন বা একটী বাসন্তী রংএর ফুটন্ত ক্যামেলিয়া, কখন বা একটি সপত্র শুভ্র গোলাপ-কলিকা শোভা পাইত। পারিসের পটুশিল্পী-গ্রথিত কৃত্রিম মুক্তার নেকলেস, কুন্দকুসুমমালার ন্যায় তাহার হৃদয়তরঙ্গে নৃত্য করিত। তাহার কর্ণদ্বয়ে যে দুটী উজ্জ্বল দুল দুলিত, তাহা কৃত্রিম হীরার বলিয়া অল্প লোকেই বুঝিতে পারিত। হাতে দুগাছি সুন্দর রজতব্রেসলেট, তাহাও কৃত্রিম মণিমুক্তাখচিত। যখন এই সুললিত লাবণ্যের লহর তুলিয়া সোফি খরপদে রাজপথ বাহিয়া চলিয়া যাইত, তখন কে বুঝিতে পারিত যে, রেলওয়ে-পোর্টার জো-ব্যারেগা এই দেবদুর্লভ রত্নের অধিকারী? এ রূপরাশি কেন সোফি ভস্মে ঢালিয়া দিয়াছিল? কেন এ সোণার কমল সে পঙ্কিল সলিলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, এ আমূল-মুকুলিত শ্যামলতা কেন কদর্য্য মাদারবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিল! সোফির কি বর মিলে নাই? অই নবযৌবনের তরঙ্গ, অই লাবণ্যের লহর, সোহাগে হৃদয়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কি এদেশে ছিল না? অই কাঞ্চন কুরঙ্গিণীকে আনায়ে আনয়ন করিবার ব্যাধ কি কলিকাতার ফিরিঙ্গিকুমারকুলের মধ্যে এতই অপ্রতুল ছিল? অই পক্কা নৃত্য-লীলা-হাল্কা চরণযুগলে লোটাইবার লোফেরও কি সোফির নীল-লোচনপথে একটীও পতিত হয় নাই? না, সে কথা বলিলে কলিকাতার কৃষ্ণ-বুটনকুলের উপর ঘোর অরসিকতার কলঙ্ক অর্পণ করা হয়। চূণাগলির অনেক অলিই সোফির কমলকুঞ্জে গুণ গুণ ক'রে, অবশেষে ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন এই বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত কয়েকজন বরও সময়ে সময়ে সোফির নয়নবাণে চঞ্চল হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে একজন খাঁটি শ্বেতচর্ম্ম চা-বাগানের

সহকারীও ছিলেন। কেদার-টিমথি-চকার-বটি নামক একজন বাঙ্গালী রেভারেণ্ড কুমারও একবার অই কুরঙ্গলোচনা ফিরিঙ্গিবালার চাহনির চমকে পাগল হয়েন, এবং তিন মাস ধরিয়া, আনাচে কানাচে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আড়খেমটা তালে "Two lovely black eyes" (কাল কাল আঁখি দুটী) গাইয়া, অবশেষে হতাশমনে ব্যাপারীটোলাবাসিনীদিগকে প্রায়শ্চিত্তমর্ম্ম বুঝাইয়া, পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্য জর্ডন-জল-ধৌত দেহ ও মদনাহত মন উৎসর্গ করেন।

এমন স্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, এত প্রলোভনীয় কণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, সোফিসুন্দরী কেন তাহার প্রেমহার ধনহীন, রূপহীন, বংশহীন ব্যারোগাকে পরাইল! রমণীচরিত্র বুঝিতে দেবতারা অক্ষম, মনুষ্য কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? তবে সোফির আত্মীয় স্বজন সকলেই জানিত,—যে বালিকা অতি বুদ্ধিমতী। যাহাতে নিজের মন্দ হয়, আপনার সুখের হানি হয়, সোফি তাহা কখনই করিবে না। এইজন্য সোফির এই স্বয়ম্বরে কেহই আপত্তি করে নাই। সোফির পিতামাতার অবস্থা অতি সামান্য ছিল। কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সাজাইবার সঙ্গতি তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু বেশভূষাভি-লাষিনী কুমারী সর্ব্বদাই আপনার সুচারু অঙ্গ পরিপাটী বেশভূষায় সজ্জিত রাখিত। সোফি নৃত্যগীত শিখিল, গিটার বাজাইতে অভ্যাস করিল, অথচ পিতামাতাকে শিক্ষকের বেতন দিতে হইল না। পিতা-মাতার কস্মিন্‌কালে কোন ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রণ হয় নাই; কিন্তু কন্যা অল্পদিনেই নিজবাটীতে সান্ধ্যভোজ করিবার অবকাশ পাইত। একবার সোফির মার কঠিন পীড়া হয়; একজন ইংরাজডাক্তার বিনা ভিজিটে পক্ষাধিককাল তাঁহাকে দেখিয়া যান। আবার ঘরে বসিয়া ফল, ফুল, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ বিলাসের উপহার সোফি সময়ে সময়ে প্রায়ই পাইত। পিতামাতা কন্যাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, তাই তাঁহাদের

মনে হইত যে, তাঁহাদের সুহাসিনী সোফিকে যে দেখে সেই স্নেহ করে; বিশেষ সোফি অতি বুদ্ধিমতী; দরিদ্র জনকজননীকে ভারগ্রস্ত না করিয়া, সে কেমন আপনার প্রয়োজন আপনি পূরণ করিয়া লয়, আবার সময়ে সময়ে সংসারেরও সাহায্য করে! ব্যারোগার প্রকৃতিতে ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা ও দ্বেষ অতি অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল; সে লোকের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বিবাদ করিত। যাহাকে "খেতে বল্লে মাত্তে আসে" বলে, ব্যারোগা সেই প্রকৃতির দুর্জ্জন। ট্যাঁস, টোঁস, মেটিয়া, ফোঁস, সাধারণতঃ এই চারিটী শ্রেণীতে ফিরিঙ্গিকুল বিভক্ত; ব্যারোগা ফোঁস গোত্রসম্ভূত। বিবাহের প্রায় তিনমাস পরে সোফি একদিন রাত্রি একটার সময় স্যাম্পেনবিহ্বল ঢুলু-ঢুলু-নয়নে একটা নাচের মজলিস হইতে বাটী ফিরিয়া আসে; ব্যারোগা, বণিতার প্রতীক্ষায় একাকী গৃহে বসিয়া জিন পান করিতেছিল, এবং প্রতি শকট-চক্রের ঘর্ঘরে কর্ণ উন্নত করিয়া দ্বারদেশে যাইতেছিল ও গাড়ীখানি দ্বার বাহিয়া চলিয়া গেলে নৈরাশ্যে ও ক্রোধে দশনে দশনে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জিনের মাত্রা ডবল করিতেছিল। ব্যারোগার নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। গৃহমধ্যস্থ এক মাত্র কেরোসিনের আলোকে সাহেব চারি পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার দীপ্তির অবস্থান উপলব্ধি করিতেছেন। ঘড়ি আপনার পূর্ণসংখ্যা বারোটা বাজাইয়া আবার এক থেকে সুরু করিবার উদ্যোগ করিতেছে; এমন সময় পাউডার-ধবলিত মুক্তবক্ষে বড় বড় বিলাতী মতির দানা দোলাইয়া, কবরীতে ক্যামেলিয়া গুঁজিয়া, ক্ষীণাঙ্গুলিদলে একটী অর্কিড ফুলের সিল্কমণ্ডিত বিপুল তোড়া লইয়া সোফি অপ্সরা-নিন্দিত ঝলকে ব্যারোগার দীন কুটীর প্রভাসিত করিল। শকটচক্রের বা দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ এবার সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হঠাৎ গৃহ, নন্দনের সৌরভে পরিপূরিত হওয়ায়, তাঁহার অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রযুগ

বিস্ফারিত হইল। দেখিলেন, সম্মুখে অপ্সরামূর্ত্তি। প্রায় এক মিনিটকাল ব্যারোগা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই ঈর্ষার তীব্র বিষে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, সুরারক্ত চক্ষুদ্বয় অধিকতর রক্তিম হইল, সর্পের ন্যায় গর্জ্জন শব্দ করিয়া ব্যারোগা দন্তের ভিতর দিয়া বলিল; "মিসেস ব্যারোগা! খুব ভাল কাজ হইতেছে"। সোফি অধরের হাসি লুকাইয়া একটু ঘৃণাব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কি ভাল কাজ হইতেছে মিষ্টার ব্যারোগা?" 'মিষ্টার' কথাটার উপর সোফিসুন্দরী একটু অধিক শ্লেষের অন্তর্টিপ্‌নি দিয়াছিল। ব্যারোগা উত্তর দিল;—"লেডির বাড়ী ফিরিবার এইই উপযুক্ত সময় বটে"!

সোফি।—"লেডি! লেডি কে? এখানেতো কোন লেডিকে উপস্থিত দেখিতেছি না; জেণ্টলম্যানের স্ত্রীকে লেডি বলে, রেলওয়ে পোর্টার কবে হইতে জেণ্টলম্যান হইয়াছে, আমিতো জানিনা"।

বণিতার এই মর্ম্মঘাতী শ্লেষোক্তিতে জো'র বুকে বারুদ জ্বলিয়া উঠিল। সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল;—"সোফি—সোফি"।

সোফি—"ওঃ! বুঝিয়াছি তুমি আবার ঐ নিকৃষ্ট পাশব 'সরাব' পান করিতেছিলে?"

জো।—পাশব-সরাব! হাঁ অবশ্য পাশব সরাব; প্রিয়তমে! আমার স্যাম্পেন পান করাইবার তো বন্ধু নাই! ফুলের তোড়া দিবারও বন্ধু নাই; রাত্রি একটা পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া নাচিবার জন্য হাতে হাত দিবার বন্ধু নাই! সুতরাং আমার কষ্টার্জ্জিত 'পাশব সরাব'ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সোফি।—কিন্তু তোমার পতিপরায়ণা দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট মনে করেনা, সে সরলা অভাগিনী মনে করে না যে,

তাহার প্রিয়তম "জো" চিরকাল পোর্টার হইয়া থাকিবে, তাই সে এই শীতে প্রায় নগ্নদেহে এত রাত্রি জাগিয়া, পরের খোসামোদ করিয়া এই পত্রখানি আনিয়াছে ; যদি দয়া হয়, পাঠ কর।"

এই বলিয়া সোফি একখানি চৌকা লেফেফা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। "জো" সোফির মুখপানে চাহিতে চাহিতে পত্রখানি নিল, ও আলোর নিকট সরিয়া গিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল। সোফি কি কেরোসিনের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিল? না, সেতো ঐ কোনে দাঁড়াইয়া ক্যামেলিয়াটী পুষ্পাধারে রাখিয়া, নৈশ বেশের উপক্রমে গ্রীবালম্বিত সুচারু কবরী উন্মোচন করিতেছে ; তবে জো, ব্যারেগার মুখ অমন আলোকিত হইল কেন? কেন তাহার নয়নযুগলে অমন সন্তোষের দীপ্তি প্রভাসিত হইল? অমন শ্লেষঘৃণা-হিংসা-ব্যঞ্জক ঠোঁটের পাশে এ নবীন প্রফুল্লতা কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে আর আসিবে? আসিল কালীর আঁচড় হইতে। লৌহলেখনীপ্রসূত কালীর আঁচড়! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি কয়েকটী অক্রবক্র রেখা টানিয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি গহনবনকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্যপূর্ণ রাজধানী করিতে পার। আবার সেই রেখাবলীর প্রতাপেই ধনজনপূর্ণ নগরী মরুপ্রান্তরে পরিণত হইতে পারে। তোমারই কৌশলে ভিখারী রাজসিংহাসনে, রাজাধিরাজ পর্ণকুটীরে। তুমি মনে করিলে ভীরু হৃদয়কে বীর রসে জাগাইতে পার ; আবার বিশ্ববিজয়ী বীরও তোমার মোহিনীতে রমণীর ন্যায় কাঁদিয়া থাকে। প্রণয়ীর আশা, ভরসা, বিষাদ, প্রমাদ তুমিই। আর আমি বাঙ্গালী গ্রন্থকার, কালীর আঁচড় আমার এখন জাতীয় সর্ব্বস্ব। তোমায় অবলম্বন করিয়া আমি বিশ্বমন্দিরের পাশ-সোপানাবলী অধিরোহণ করি। আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতীয়ত্ব, বীরত্ব, দেশানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, শিল্প, বাণিজ্য সকলই তোমাতে নিহিত। তুমি আমাদের ঘরে ঘরে অন্ন আন। তোমার কুসুমময়

বর্ম্ম পরিধান করিয়া আমি সহাস্যবদনে বঙুষ্ট্রীটের বুটাঘাত পৃষ্ঠ পাতিয়া লই। সুশিক্ষিত বঙ্গের সমস্ত জীবন তোমাতে অর্পিত হইয়াছে।

হে হংসপুচ্ছহাত লৌহলেখনীপ্রসূত কালীর আঁচড় তোমায় আমি শত শত শতবার প্রণিপাত করি।

এই অসীম ক্ষমতাশালী কালীর আঁচড়ে জো ব্যারোগা দেখিল সে একেবারে পোর্টার হইতে লাইন-ইনস্পেক্টর হইয়াছে। আর চল্লিশ টাকা নয়, তাহার আয় এখন মাসিক আড়াই শত টাকা। কে এ ইন্দ্রজাল ঘটাইল? কাহার মোহিনী-দণ্ডে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল? আর কে? 'জো' দেখিতেছে, বুঝিতেছ ; বুঝিয়া কৃতজ্ঞতার সাগর সন্তরণ করিতেছে। তাহার গুণবতী ভার্য্যা সোফি পতির এই মঙ্গলময় দশার সৃষ্টি করিয়াছে। জানু অবনত করিয়া জো ব্যারোগা সোফির গাউনের ভূমিলুণ্ঠিত অগ্রভাগ চুম্বন করিল। বলিল; "সোফি তুমি আমার মুক্তি! সমস্ত জীবনে নির্ব্বাক দাসত্বেও এ অধীন তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। এতদিনে বুঝিলাম— আমার মঙ্গলের জন্যই তুমি দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াও ; আমার সুখের জন্যই তোমার বেশভূষা, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ, ভোজে যোগ, নৃত্যে আমোদ।"

সোফি—বুঝলে তো? আর আমায় শ্লেষ উক্তি করিয়া যন্ত্রণা দিওনা ; আমি কোথায় কখন কি করিতেছি, তাহার অনুসন্ধান লইও না। কুমারী মারি জানেন তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। তুমি আজ এই কোচেই শয়ন কর, তোমার জিনের দুর্গন্ধ মিশ্রিত নিশ্বাসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। আমি আজ একাকিনী শয়ন করিয়া তোমার মঙ্গল চিন্তা করিব। আঘ্রাত কুসুমের প্রসাদি সুরভি সেই রজনীর শেষ অংশে অদৃষ্টে ঘটিল না বলিয়া জো'র হৃদয়ে একটু ব্যথা লাগিল ; কিন্তু পতিপরায়ণা বণিতার অনুরাগবলে তাহার পদোন্নতি হইবে, অর্থাগম বৃদ্ধি হইবে, সে ভদ্র-

লোকের পদবীতে আরোহণ করিবে, এই হর্ষোৎফুল্ল চিত্তের স্বপ্ন দেখিবার জন্য সে সেই বৈঠকখানার কৌচে জানু বক্ষে সম্মিলিত করিয়া শয়ন করিল। সোফি আপনার শ্রীঅঙ্গ পর্য্যঙ্কোপরি, নৈশ-বাসে, চিকুর দাম স্খলিত কবরীতে সুবদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। একবার ঘুমঘোরে 'আর্থর আর্থর' বলিয়া শয্যা পার্শ্বে কাহার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অবলার নিদ্রার সে রাত্রিতে আর কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু

২৯ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

দেশী এসেন্সের নূতন শিশি !

আমাদের কারখানায় প্রস্তুত সকল প্রকার এসেন্স সম্পূর্ণ নূতন, সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় শিশিতে বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে দেলখোসের শিশির মনোহারিত্ব দেখিয়া যাঁহারা আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবার আমাদের অন্যান্য এসেন্সের শিশির মনোহারিত্ব ও দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। শিশিগুলি মূল্যবান্ হইলেও কোন এসেন্সেরই মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কাচের ষ্টপারযুক্ত সুন্দর শিশিতে চামেলী, মতিয়া, কামিনী, মল্লিকা, মাস্করোজ, খস্‌খস্, কুমুদিনী, হেনাকুসুম, মিশ্রকুসুম, প্রভৃতি যাবদীয় এসেন্সের প্রতি শিশি মূল্য এক টাকা। এসেন্সগুলি গন্ধের স্থায়িত্ব ও মিষ্টতায় জনসমাজে বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছে।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

অগ্নিহোত্রীর প্রার্থনা।

"স্বস্তি, স্বস্তি" বল "স্বস্তি" বল "জয়, জয়,"
আজি এই জীবনের পথে।
মোরা ক'টি শিশুযাত্রী ;—নাহি কোন ভয়
অই ত জননী স্বর্ণ রথে !

সার্থক হইব সবে। আর ভুলিব না
প্রেয় পেয়ে কারে কহে শ্রেয় ;
কিনিব না রক্ত দিয়ে অগণ্য লাঞ্ছনা ;
হ'ব মোরা অমর, অজেয় !

সাধু যাহা, সত্য যাহা নিখিল জগতে—
প্রাণ ভরি করিব সঞ্চয় ;
ছদ্মবেশী অত্যাচার আমাদের পথে
লভিবে নিয়ত পরাজয় !

সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ জননী আশীষ
শির পাতি লইনু হাসিয়া ;
অমৃত হইয়া যাবে ধরণীর বিষ—
আমাদের হৃদয় ছুঁইয়া।

কনে-বদল।

প্রহসন।

স্ত্রী ও পুরুষগণ।

শ্রীধর ও শশীনাথ	...	বিবাহযোগ্য যুবকদ্বয়
ভোলানাথ	...	শ্রীধরের দুরসম্পর্কীয় গরীব জ্ঞাতি ও মোসাহেব
মালতী ও চন্দ্রাবতী	...	বিবাহযোগ্যা কন্যাদ্বয়
ললিতা	...	শ্রীধরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ ও মালতীর সম্পর্কীয়া ভগিনী
প্রভাবতী	...	চন্দ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী

মাসীমা, ক্ষেপি, ক্ষেপির মা, দাসদাসী, ঘটকী প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অপরাহ্ন কাল।

(শ্রীধর কবিতা পাঠে মগ্ন, ভোলাদাদার কমলানেবু খাইতে খাইতে প্রবেশ)।

ভো। তুমি আমার কমলা নেবু প্রাণ।
সিলেটে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান।
যখন তুমি নৌকায় এস, অর্দ্ধেক কাঁচা অর্দ্ধেক টুঁসো
তোমার ভিতর এত রস না জানি সন্ধান।

শ্রী। বাহারে ভোলাদাদা, এ গান কোথায় শিখলে ?

ভো। দাদা হবে হবে তুমিও শিখ্‌বে; বের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই প্রাণটা রসে টুগ্‌বুকে হয়ে উঠবে।

শ্রী। বের তত্ত্ব ? কোথা থেকে ?

ভো। কেন শিশির বাবুর বাড়ী থেকে। তোমায় তারা ছাড়্‌বেনা হে ছাড়্‌বে না।

এত দিনে পেলেম দেখা আর না সখা ছাড়ব।
তোমায় প্রেমের ডোরে, হৃদ্‌পিঞ্জরে বন্দী করে রাখব।
তোমায় পিয়াইব সোহাগ মধু, অঘোর হয়ে থাকবে বঁধু,
তখন—কেমন ক'রে যাওহে দূরে, দেখ্‌ব হে শ্যাম দেখ্‌ব।

শ্রী। আর গান গাইতে হবে না, আমি মরছি আপনার জ্বালায় আর উনি এলেন কি না গান গাইতে। আমি কখনই তাকে বিয়ে করব না। এত ক'রে বৌ-দিদিকে বল্‌ছি,—কিছুতেই যদি বুঝবেন! বেশ, শেষে নিজেই ঠক্‌বেন—আমার কি।

ভো। বিয়ে কর্‌বে না কেন দাদা! যে সওগাদ দিয়েছে যদি দেখ, তা'হলে আর ওকথা বল্‌বে না। চন্দ্রপুলি ত একেবারে স্বর্গের চাঁদ মর্ত্ত্যে, দুঃখের মধ্যে কেবল পূর্ণচন্দ্র না হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র; আর মনোহরাতে একেবারে মন মাৎ! আমি বরঞ্চ দু একটা নিয়ে আসি।

তোমাতেই মজিয়াছি হে মনোহরণ,
তোমাতেই সঁপিয়াছি জীবন যৌবন;
তোমারি চরণ তলে, প্রাণ বলি দিব বলে—
আসিয়াছি ওহে মম মরণ শরণ।

[তুড়ি দিয়া গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)।

ল। ঠাকুরপো, কি হচ্ছে ? বর দেখ্‌তে এসেছে যে,—একবার দেখা দাও।

শ্রী। দেখ বৌ-দিদি, আমি হাজার বার বলেছি,—আরও না হয় হাজার বার, হাজারবার ছেড়ে লক্ষবার—কোটিবার বল্‌তে রাজি আছি যে আমি কিছুতেই তোমাদের ফরমাসী মেয়ে বিয়ে কর্‌তে পারব না ;—তা তোমার মাসতুত বোন কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মামাত বোন হলেও হবে না। লভে না পড়্‌লে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ছিনে।

বৌ। ক্ষেপালে দেখছি ! দেখা শুনা না হ'লে লভে পড়্‌বে কি করে বল দেখি। আমিও ত তোমাকে হাজার বার বলেছি তাকে দেখলেই লভে পড়বে।

শ্রী। তুমি বল্লেই হোল ! আমি জানি তা পড়্‌ব না। দুগ্ধপোষ্য মেয়ের সঙ্গে আমি অমনি লভে পড়ে গেলুম ! বল না কেন, আমার নাকে দড়ি দিলেই আমি অমনি গরু ব'নে যাব ! তোমার লজিক্ দেখ্‌ছি ঠিক ঐ রকম !

বৌ। তুমি যখন তাকে দেখেছিলে তখন সে ছোটটি ছিল বটে, কিন্তু এই ক'বছরে কি সে বাড়েনি ভাব্‌ছ ? এখন সে পনেরতে পড়্‌তে চল্লো। তোমার জন্য ব'লে ক'য়ে এতদিন পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও তার সম্বন্ধ করতে দিইনি। আর ত মাসীমা তাকে আয়বড় রাখ্‌তে পারেন না। এর চেয়ে বড় মেয়ে আমাদের মধ্যে আর কোথায় পাবে বল দেখি ?

শ্রী। তোমাদের মধ্যে নেই বলে, সংসারে ত আর বড় মেয়ের দুর্ভিক্ষ হয়নি। আমিত তোমাকে স্পষ্টই বলেছি,—আমি চাই কোর্ট-সিপ্—প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ ; আমি চাই চোখে চোখে চেয়ে বল্‌তে,—

দেখি দেখি আবার দেখি দেখিবার সাধ মেটেনাত
যত দেখি ওমুখখানি দেখিবার সাধ বাড়ে তত।

এক কথায় আমি চাই, গানে গানে প্রাণে প্রাণে মদির মিলন। ১৪।১৫ বছরের মেয়েতে এরকম প্রেম হতেই পারে না। তুমি যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জানা একটি বড় মেয়ে দিতে পার, তবেই বিয়ের কথা বল্‌তে এস, নইলে—

বৌ। অমন অবুঝ হয়ো না ঠাকুরপো। একটু ছোট মেয়ে ত ভালই। তুমি যা বল্‌বে তাই করবে ; যা শেখাবে তাই শিখ্‌বে। নিতান্ত বড় মেয়ে কি সহজে পোষ মানে ? আর সে যে লেখাপড়া জানে না তাও না ; কবিতার বই টইও পড়ে থাকে, আর ঘরকন্নার কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে, সব রকমেই তোমার মনের মত হবে, একটিবার তুমি শুধু দেখ।

শ্রী। অমন পোষ মানান আমি চাই না ; চোখে চেয়ে দেখে শুনে আমার লভে পড়্‌বে আমি তাই চাই। আর ঘরকন্নার কাজ জানে—তবেই ত আমার প্রাণটা সুশীতল হয়ে গেল ! সে তোমার ঘরকন্নার কাজ করুক আর আমি আকাশের দিকে চেয়ে কবিতা আওড়াই, এই আরকি তোমার মৎলব ! না বৌ-দিদি, এবিয়ে আমি কখনই করব না।

বৌ। দেখ ঠাকুরপো,—কতদিন থেকে মাসীমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, এখন যদি তুমি বিয়ে না কর, তাহলে আমাদের কতদূর লজ্জায় ফেল্‌বে একবার ভেবে দেখ দেখি।

শ্রী। তোমরা কথা দিয়েছ অতএব আমায় বিয়ে করতে হবে, এরকম লজিক্ ত আমি বুঝিনে। তোমরা কথা দিয়েছ বিয়ে করতে হয় তোমরাই কর, আমাকে কেন বিয়ে কর্‌তে হবে। কি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনি গো।

বৌ। (রাগিয়া) অদৃষ্টে না থাকলে অমন মেয়ে কি করে পাবে বল। তোমার ভাগ্যে একটা বুড়ধাড়ীই আছে দেখছি। কিন্তু আমি

এই তোমাকে ঠিক বলে দিচ্ছি, এখন হাতের রত্ন পায়ে ঠেলছ এর জন্য পরে আপশোষ করতে হবেই। (স্বগত) এর শোধ আমি তুলবই তুলব। [সক্রোধে প্রস্থান।

(শশীনাথের প্রবেশ)।

শ। ব্যাপার কিহে ভায়া! মুখখানা অমন লম্বা হয়ে পড়েছে কেন?

শ্রী। এই যে শশীদাদা! বস। মুখখানা যে তেড়াচে হয়ে পড়েনি এই ঢের! যে বিপদে পড়া গেছে।

শশী। বটে! তোমারও বিপদ! কি জ্বালা! আমি জানি আমিই বিপদে পড়েছি।

শ্রী। তুমিও বিপদে পড়েছ!

শ। ঘোর বিপদ ভায়া ঘোর বিপদ!

শ্রী। সত্য নাকি! তা যাই বল; আমার মত বিপদ হতেই পারে না, আমার দাদা মহা বিপদ, ভয়ঙ্কর বিপদ।

শ। অমনি বল্লেই হলো! আমার বিপদ যদি শোন!

শ্রী। তার চেয়ে আমার বিপদটাই কেন আগে শোন না?

শ। তবে তাই বল; কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র বলে যাও।

শ্রী। তুমিই ত দেরী করাচ্ছ!

শ। আমি দেরী করাচ্ছি না তুমি?

শ্রী। জ্বালালে দেখ্‌ছি, তবে আমাকেই বল্‌তে দাও।

শ। তুমি একটু চুপ কল্লেই আমি বলে যাই।

শ্রী। তা আমি কিছুতেই পার্‌ব না; আমার মাথার মধ্যে কথাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি বল দেখি দাদা, ফরমাসী মেয়ে কি বিয়ে করা যায়?

শ। কিছুতে না—কিছুতে না। তোমারো ঐ বিপদ! আমিও যে ঠিক ঐ বিপদে পড়েছি ভায়া।

শ্রী। সেকথা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। দু'জনেই তা'হলে এক ঘাটে জল খাচ্ছি বল।

[উভয়ের আলিঙ্গন]।

দুঃখের কথা বল্‌ব কি! একটি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে জুটিয়ে দাদারা বল্‌ছেন তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

শ। এই তোমার দুঃখ! হা,—হা,—হা! আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে পাষাণও গলে যায়। একটি কুড়ি বছরের বুড়িকে ধরে আমাকে গতাবার চেষ্টা। অপরাধের মধ্যে বিলাত যাওয়ার আগে আমি তাকে like কর্‌তুম আর আমার যেমন গ্রহ—সেই যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নিতান্ত কাঁচা বয়সে বলেও ফেলেছিলুম যে আমি তাকেই বিয়ে কর্‌ব। সেই কথা ধরে আমি ফির্‌তে না ফির্‌তে আমাকে পাকড়া করেছে। একেই না বলে কর্ম্মফল!

শ্রী। হা,—হা,—হা; এই তোমার দুঃখ, হা ভগবান্! বিধাতা যদি এমন দুঃখ আমার অদৃষ্টে ঘটাতেন তা'হলে ত আমি বেঁচে যেতুম। মেয়ে বড়—বেশ লেখাপড়া জানে?

শ। ভয়ানক লেখাপড়া জানে। সেইত আরো বিপদ।

শ্রী। সেক্সপিয়ার, বায়রণ, সেলি, টেনিসন্ এসব পড়্‌লে বেশ বুঝতে পারে?

শ। খুব পারে, বিএ এম্‌এরাও তার কাছে হার মেনে যায়।

শ্রী। উঃ কি বলহে! আর তুমি তাকে চাও না। আমার প্রাণের মধ্যে হুহু করে উঠছে। (ক্রন্দন) এমনতর সব মেয়ে থাকতে দাদারা কিনা আমার জন্য এক নাবালিকা মেয়ে জুটিয়ে বলেন বিয়ে কর; না জানে যে কথা কইতে, না জানে যে হেসে চাইতে,—আমার যেন আর কোন কাজকর্ম্ম নেই তাকে নিয়ে আমি এখন মানুষ করি! ঘরের কাজ বেশ জানে, কথার বেশ

বশ হবে এসব কথা শুনতে ভাল, কিন্তু তাতে ত আর প্রাণের আশা মেটে না।

শ। বল কি হে! অল্প বয়স ঘরকন্নার কাজ বেশ জানে?

শ্রী। ঘরকন্নার কাজ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব নাকি?

শ। তুমি যা বল্‌বে তাই সে মেনে নেবে? তুমি যদি বল সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে আর পূর্ব্বে অস্ত যায় তাই সে বুঝে যাবে?

শ্রী। তা যাবে বই কি? তাতেই ত আমার আপত্তি।

শ। হায় হায়! এমন মেয়েকে তুমি ছাড়ছ। ভগবান তোমাকে এমন সৌভাগ্য দিচ্ছেন আর তা তুমি বুঝছ না? দেখ ভাই চাউনিতে মজা, কবিতাতে প্রেমালাপ এসব ছেলে বয়েসেই সাজে, কিন্তু ওতে পেট ভরে না ভায়া! বিলাত গিয়ে ওসব ঢের করা গেছে। এখন আমি চাই একটি ছোট মেয়ে—উঠতে বল্লে যে উঠবে, বসতে বল্লে যে বসবে; যে আমার জন্য স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধবে, আমাকে আগে খাইয়ে পাতে খাবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমবে—

শ্রী। বটে! আমার একটা idea মনে আস্‌ছে।

শ। কি idea? আঃ আমাকে যদি এ যাত্রায় উদ্ধার কর্‌তে পার ভাই!

শ্রী। আমরা কেন কনে বদল করি না; আমার কনেটি আমি তোমাকে দিচ্ছি—তোমার কনেটি আমাকে দাও।

শ। ঠিক্ ঠিক্! Grand idea! আঃ বাঁচালে ভায়া। তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।

শ্রী। (আহ্লাদে) আমি যাই এখনি বৌদিদিকে বলি কালকেই আমি কনে দেখ্‌তে যাব। আজ হলেই হতো ভাল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই। ক'টার সময় যাবে হে?

শ। কোর্ট থেকে এসে সন্ধ্যার সময়ই ছুটব। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে আমরা ঠিক সময়ে নিজেদের বদল করে নেব; হা হা—আমি হব শ্রীধর গড়্‌গড়ি আর তুমি হবে শশীনাথ পাকড়াশি।

শ্রী। উঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে? আমি কেন আগেই যাই না।

শ। তা যাওনা, তাতে আর আমার আপত্তি কি?

শ্রী। সেই ভাল! আমি যাব ৪টের সময়। কোন বাড়ীতে?

শ। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলি, জগৎ বাবুর বাড়ী!

শ্রী। আর তুমি যাবে সন্ধ্যার সময় ২০ নম্বর আমড়াতলার গলি, শিশির বাবুর বাড়ী।

শ। যদি তারা আমাকে ধরে ফেলে?

শ্রী। তা কি করে পারবে? শর্ম্মা ৪।৫ বছর কি ওমুখো হয়েছে? কিন্তু আমাকে যদি তারা—

শ। হা,—হা,—হা! আমি কি আর বিলাত থেকে ফিরে সেখানে গেছি ভায়া! চিঠির উপর চিঠি আস্‌ছে, কিন্তু আমার এখনো সময় হয়নি। তোমাকে ঠিকই শশীনাথ ভাব্‌বে!

শ্রী। কিন্তু আমি ত তোমাদের পুরাণ ইতিহাস আওড়াতে পার্‌ব না।

শ। সে সব আমি তোমাকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব এখন।

শ্রী। বেশ বেশ কালই তবে যাওয়া যাবে। আমি বৌদিদিকে দিয়ে এখনি তাদের বলে পাঠাচ্ছি।

শ। আমাকে দেখ্‌ছি কাল সকালেই একখানা চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। আমি কিনা এই একটু আগে অন্য রকম চিঠি লিখে ডাকে দিয়ে বসে আছি। হা হা! কাল থেকে আমি শ্রীধর গড়্‌গড়ি।

শ্রী। আর আমি শশীনাথ পাকড়াশি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিশির বাবুর অন্তঃপুর।— ললিতা ও তাঁহার মাসীমা।

মা। শুন্‌ছি নাকি বাছা তোর দেওরের মন নেই! আমার ত আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছে। তোর কথাতেই এতদিন মালতীকে বড় করে রাখা, এখন যদি শ্রীধরের সঙ্গে বিয়ে না হয় ত লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

ল। একটু সবুর কর না, অত ব্যস্ত হও কেন?

মা। চিরকালইত বাছা ঐ কথা বলছিস্। কিন্তু এতদিন সম্বন্ধ হোয়েছে একদিনও ত সে এমুখো হোল না। চাকরবাকর তোদের বাড়ী গেলে একটিবার তার দেখা পর্য্যন্ত পায় না। সেই ছেলেবেলায় যা দেখেছি নইলে কানা কি খোঁড়া কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তুম না,—তবুও তুই বলিস্ হবে হবে।

ল। হবে না ত কি, তবে অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না।

মা। কি যে বলিস বাছা কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার পোড়া কপাল বলেই এত ভাবনা। আজ যদি তিনি থাকতেন তা'হলে কি আমায় এত ব্যস্ত হ'তে হোত। অভিভাবকের মধ্যে এক ওবাড়ীর বড়ঠাকুর, তিনি ত নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনায় অস্থির, আমার ভাবনা আর কে ভাবে বল?

ল। ক্ষেপির কি এখনো বিয়ে হয় নি?

মা। কি করে হবে বাছা। এত বড় মেয়ে হয়ে উঠেছে, এখনো না হ'ল জ্ঞান, না হ'ল বুদ্ধি। দেখ্‌তে ত ঢের লোক আসে কিন্তু একবার দেখ্‌লে কেউ যে আর এগোয় না। বড়ঠাকুর বলেন, আমাদের মালতীকে দেখিয়ে ক্ষেপির সম্বন্ধ করাও;—অমন অধর্ম্মে কাজ কি আমি কর্‌তে পারি বাছা?

ল। আমার এক বুদ্ধি জোগাচ্ছে মাসীমা। আমি যা বল্‌ব তোমায় কিন্তু তা কর্‌তে হবে বাছা।

মা। তা আর করব না,—তুমিই হলে আমার প্রকৃত অভিভাবক।

ল। দেখ, ঠাকুরপো এক আপত্তি তুলেছে আমাদের মালতী ছোট, সে বড় মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়েছে। আমি ক্ষেপির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কর্‌তে চাই।

মা। ওমা ওকি কথা গো!

ল। ভয় কি মাসীমা! কনে দেখলেই তার বড় মেয়ে বিয়ের সাধ মিটে যাবে। তখন বল্‌বে ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি, আর আপনি যেচে যদি মালতীকে তখন বিয়ে না করে তাহলে আমার নাম নেই।

মা। ওমা কি বল গো, শেষে কি কর্‌তে কি হবে।

ল। তুমি থাম না, আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। যদি ঠাকুরপো ক্ষেপিকে বিয়ে করেই ফেলে আমি তোমার মেয়ের অন্য ভাল বর জুটিয়ে দেব সেজন্য কিছু ভাবনা ক'রনা।

মা। তা বাছা যা ভাল বোঝ তাই কর, শেষে যেন হিতে বিপরীত না হয়। এই যে বল্‌তে বল্‌তে দিদি এসে উপস্থিত।—

(ক্ষেপির সহিত তাহার মার প্রবেশ)।

এস দিদি, তোমরা বসে গল্পগুজব কর, আমি ধোবার কাপড়-গুলো গুণে নিয়ে তুলে রেখে আসি। মালতী কদিন থেকে কি না তার পিসির বাড়ী গিয়ে আছে তাই আমার আর এক তিল ফুরসৎ নেই।

[প্রস্থান।

ক্ষে-মা। ললিতা কতক্ষণ এলি বাছা! সব ভালত?

ল। হ্যাঁ মাসিমা, তোমরা ভাল আছত?

ক্ষেপি। ভায়ো ভায়ো।

ক্ষে-মা। আর বাছা ভাল; এখনো যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য, এত বড় মেয়ে হোল এখনো বে হোল না, মনের কষ্টে মরে আছি বাছা, একটি বর জুটিয়ে দেনা মা আমার।

ক্ষে। আয়ি চাত্তে বল থাব মা, কনে বল মা কনে বল।

(সকলের হাস্য)।

ক্ষে-মা। দেথদেথি বাছা কথার শ্রী ও চাত্তে ক্যানিংবল থাবে। দূর পোড়ারমুখী, যা এখান থেকে, যা খুড়িমার কাছ থেকে পান দোক্তা চেয়ে আন।

ক্ষে। আয়ি পান থাব, আয়ি পান থাব।

[প্রস্থান।

ল। (স্বগতঃ) একে ঠাকুরপোর কনে সাজাতেই হবে। (প্রকাশ্যে) তা আমি চেষ্টা দেথ্‌ব বাছা, ঠাকুরপো বড় মেয়ে খুঁজ্‌চে, তাকে একবার বল্‌ব।

ক্ষে-মা। বাছা চিরজীবি হ, হাতের নো' ক্ষয় যাক। তুই যদি বলিস্ তোর দেওর কখনই সে কথা ঠেল্‌তে পার্‌বে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই ২৩ বছরে চলছে। সেকথা অবিশ্যি আমি আর কাউকে বলিনে। এত বড় মেয়ে বাছা তোর দেওর আর কোথায় পাবে বল। তা মালতীর সঙ্গে না তার সম্বন্ধ হয়েছিল?

ল। ঠাকুরপো অত ছোট মেয়ে বিয়ে কর্‌বে না।

ক্ষে-মা। তা বেস্ বেস্, আমার মালতীও যা ক্ষেপিও তাই, এক মেয়েকে বিয়ে কর্‌লেই হলো। কি বলিস্ বাছা?

ল। তা ত ঠিকই। তা আমি আজই ঠাকুরপোকে বল্‌ব এখন। তবে আজকা'লকার ছেলেরা ত কারো কথায় ভোলে না, নিজেরা সব যাচাই করে নিতে চায়। একথা শুন্‌লেই কিন্তু ঠাকুরপো মেয়ে দেখ্‌তে চাবে।

ক্ষে-মা। তা বাছা যখনি বলিস্ আমি কনে দেখাতে রাজি, তবে দেখ্‌লে পাছে পিছয়, এই ভয় হয়। জানিস্‌ত বাছা ওর কথার বড় একটা বাঁধুনি নেই। কনে দেখ্‌তে এলে যদি চুপ্‌ক'রে থাকে তাহলেও হয়, তা কিছুতেই ওকে চুপ্ করিয়ে রাখ্‌তে পারি না।

ল। আচ্ছা, সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক্ করে নেব এখন, সেজন্য তুমি ভেবোনা।

ক্ষে-মা। তা তুই যদি পারিস্ বাছা।. ঐ দেখ্‌না একমুখ পান ক'রে কাপড় সব পানের দাগে ভরিয়ে সং সেজে আস্‌ছে।

ল। না পার্‌লে চল্‌বে কেন বাছা, তুমি বরঞ্চ একটু ওদিকে যাও আমি ওকে এখনি শেখাই।

ক্ষে-মা। আঃ! আমার ধড়ে প্রাণ এল। বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক। শেখান হ'লেই ডাকিস্ বাছা একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির যেতে হবে।

[প্রস্থান।

(ক্ষেপির প্রবেশ)।

ল। দেথ ক্ষেপি তোর বর আস্‌ছে।

ক্ষে। (এক মুখ হাসিয়া) আমি বল ভায়ো বাসি।

ল। বর ভালবাসিস্—তা আমি তোকে দেব।

ক্ষে। চাত্তে চাত্তে বল—

ল। আচ্ছা চারটে বরই দেব—আমি যা বল্‌ব তাই কর্‌বি?

ক্ষে। কল্‌ব—কল্‌ব।

ল। দেখ তোর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি বল্‌বি বল্ দেথি?

ক্ষে। অস—মিছলি।

ল। না রসমঞ্জরী না—বল্‌বি প্রাণকান্ত আমি তোমারি।

ক্ষে। পান—পান—তোমাল পান খাব।

ল। না আমি যা বলি ঠিক বল! প্রাণকান্ত আমি তোমারি।

ক্ষে। পান কাঁদত আম্মি তোয়্যারি পান।

ল। আচ্ছা ওতেই চলবে,—তারপর তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে কি বই পড়িস্—ত কি বল্‌বি বল দেখি?

ক্ষে। পালম শাক।

ল। কেবল খেতেই জন্মেছ—প্রথম ভাগখানা তোমার পালমশাক হয়ে পড়েছে। না পালম শাক নয়; বল্‌বি, তোমা বই আমি জানিনে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে।

(ভোলাদাদার প্রবেশ)।

ল। এই যে ভোলাদাদা কি মনে করে?

ভো। আর ভাই বল্‌ব কি, শ্রীধর ভায়া তোমার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। শুন্‌লে এখানে এসেছ তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ল। কেন ব্যাপারটা কি?

ভো। ভায়া কনে দেখ্‌তে রাজি, আজ ত আর সময় হোল না, কালই সন্ধ্যার সময় মেয়ে দেখ্‌তে আসবে।

ল। কালই সন্ধ্যার সময়? (স্বগত) বিপদ ঘটালে দেখ্‌ছি, কাল ত থাক্‌তে পারব না, কাল সন্ধ্যাবেলায় আবার ছোটবৌদের খেতে বলেছি। যাহ'ক ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা যাবে।

ভো। ও মেয়েটি কে গা?

ল। ওকেই নাম জিজ্ঞাসা করনা, উত্তর পাবে।

ভো। তোমার নাম কি দেবি।

ক্ষে। অসমিছলি—

ল। (চিমটি কাটিয়া) আবার।

ক্ষে। অস অস—তোয়ারি পান—

ভো। আহা মরে যাই, এমন মিছরি মাখান কথা ত জীবনে কখনো শুনিনি। বেঁচে থাক রস—আমি রসগোল্লা দেব।

ক্ষে। (হাঁ করিয়া হাসিতে হাসিতে) আম্মি অসগোয়া খাব।

ভো। আহা কি কচি কথা গা।

ল। ভোলাদাদা জিজ্ঞাসা কর কি বই পড়েছে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে পান—

ভো। একি শুন্‌ছি, আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে?

ল। না দাদা, আমাদের ভাগ্যিতে এখনো মর্ত্ত্যেই আছ, আর তুমি স্বর্গে যেতে চাইলেও যমের সঙ্গে লাঠালাঠি করে আমরা তোমায় ধরে রাখ্‌ব। তুমি এখন ঠাকুরপোর কাছে যাও—বলগে তাঁর কনে ঠিক থাক্‌বে, কাল সন্ধ্যাবেলা যেন দেখ্‌তে আসেন। (স্বগতঃ) ভাল করে রিহার্সেল দিলে কাল নাগাদ বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব)। যাও দাদা আমি একটু পরে যাচ্ছি।

ভো। কি করে যাই, পা যে সরে না; কি কথাই শুনলুম!

ল। এই কথা ঠাকুরপোও শুন্‌বে এখন।

ভো। অ্যাঁ অ্যাঁ এ কি তার কনে! আমাকে বল্‌তে হয়। চমৎকার মেয়ে, আমি গিয়েই বল্‌ছি। একবার চার চক্ষুর মিলন হলে তখন আর জন্মে ভুল্‌তে পার্‌বে না দাদা। কি রূপ গা! চোক ঠিক্‌রে যায়।

কেগো রমণী কালবরণী, অপাঙ্গেচাহিনী নয়নধাঁধিনী,
প্রলয়-হাসিনী প্রাণ-বিনাশিনী, গজেন্দ্র-গামিনী যেনরে,
সিংহবাহিনী যেনরে।
কানে স্বর্ণ পাশা, নাকে নথ খাসা, বাউটিধারিণী ভুজ দৈত্যনাশা,
চরণ তাড়নে, নুপুর বাদনে মহিষমর্দ্দিনী যেনরে! মুণ্ডমালিনী যেনরে।

[তুড়ি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগচ্চন্দ্রের অন্তঃপুর।

(ভাণ্ডার ঘরে প্রভাবতী নিমকি প্রস্তুত করিতেছেন—নিকটে থালায় নানারকম তরকারীর ভাগ সাজান)।

প্র। (নিমকি বেলিতে বেলিতে) এত ত আয়োজন কর্‌ছি, এবার আবার নাজানি কি বলে বসে। এই ত তিন তিনবার ডাক্‌লুম, তুবার ত ওজর করে কাটালে। কি ভাগ্যি 'ইনি' তা জানেন না, জানলে রক্ষে রাখ্‌তেন না। এবার এলে হয়। এবার বোধ হয় নিশ্চয় আসবে। না এলে কালই উত্তর দিত।

(হাবীদাসীর প্রবেশ)

হাবী। উনুন ধরিয়ে এনুক্‌ মা, কি হবেক্‌ সব বলেক্‌ দাও, বামুনকে দিয়েক্‌ আসি।

প্র। (নিম্‌কি বেলা বন্ধ রাখিয়া ও তরকারীর থালা টানিয়া) দেখ্‌, এই আলু পটলগুলোর দম হবে, এইগুলো কালিয়াতে পড়্‌বে, এই ভাগটা ছোকা হবে, এই কটা যে আস্ত আলু দেখ্‌চিস্ তার চপ্‌ হবে, এই তরকারীগুলো ভাজি হবে। বুঝ্‌লিত?

দা। বুঝেছিক্‌ গো বুঝেছিক্‌, আপুনি তবুক্‌ এস।

প্র। আমি ত যাচ্ছি, এই নিমকিগুলো ঠিক করে নিয়েই যাব। তুই বাটনাগুলো সব বেটেছিস্‌ ত?

দা। বাঁটিক্‌নি ত কি? ঝাল মরিচ ঘসড়েক্‌ ঘস্‌ড়েক্‌ হাত জলেক্‌ খুন হইছুক মা।

প্র। তবে যা, বামুন্‌কে বল্‌গে কালিয়ার মাংসটা চড়াক্‌—আর দই মাছের জন্যে যে কাঁচা মাছ রেখে এসেছি সেগুলোও সিদ্ধ কর্‌তে দিক্‌—দেখিস্‌ যেন জলে সিদ্ধ না করে।

দা। ও মা বলক্‌ কি আপুনি? জলেক্‌ নাত সিদ্ধ কর্‌বেক্‌ কিসেক্‌?

প্র। জলেক্‌ না ঘোলেক্‌ সিদ্ধ হবে, বুঝলি এখন?

দা। তা বুঝেছিক্‌ গো বুঝেছিক্‌, মুই কি এতই ন্যাকা নাকি যে কথা বল্লেক্‌ বুঝতে নারবক্‌।

প্র। (হাসিয়া) তুই খুব বুদ্ধিমতী আমি জানি, নইলে বাপ মা এমন নাম দেয়? এখন চেঁচাস্‌ নে তরকারিগুলো নিয়ে যা।

দা। চেঁচাবুক্‌ না! খাটবেক্‌ যত হাবী, আর বাজারকে যাবেক্‌ ভবি!

প্র। আ ম'লো! আজ কি রান্নাবান্না হবে না? এই খানেই দাঁড়িয়ে বকাবকি কর্‌বি?

দা। মর্‌বুক্‌ কেন্নে গা? মুই হাত জ্বলেক্‌ খুন হইছুক্‌, একটু আহা-উহুক্‌ নেই, ক্যাবল্‌ মলোক্‌ মলোক্‌! মুই মরবুক্‌ কেন্নে আপুনকার ভাব্ব মরুক। (আঙ্গুল মট্‌কান)।

প্র। আহা ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস। তুই মরবি কেন, তোর বালাই নিয়ে আমি মরি। হাত জ্বলছে হাতে এখান জলের পটি বেঁধে দেব, আর কাল ভবিকে বসিয়ে তোকেই বাজারে পাঠাব; এখন যা লক্ষ্মীটি তরকারীগুলো নিয়ে যা। (হাস্য)

দা। বড্ড হাস্যি! চন্নুক্‌; আপুনিও এসক্‌।

(থালা লইয়া প্রস্থান।

প্র। জ্বালালে হাবীটা! এখন নিম্‌কিগুলো,—শেষ করে ফেলি। (নিম্‌কি কাটিতে কাটিতে) মনে ত কর্‌ছি আস্‌বে, যদিই না আসে, কি লজ্জা কি অপমান। তা'হলে কিন্তু আমি এর শোধ তুলবই, যেমন করে পারি। নিম্‌কি কাটাত হলো, যাই এবার রান্নাঘরে। বাদাম্‌ কিস্‌মিস্‌গুলো নিয়ে যাই। (উঠিয়া হাঁড়ি হইতে বাদাম্‌ লইতে লইতে) পোড়ার মুখী চন্দ্রার জন্যই এত

জ্বালা। সে তাকে যে এখনো ভালবাসে, বেস্ বুঝতে পারি। তার ১৪ বছর বয়সের সময় শশীনাথ বিলাত গেছে—এই ছ বছর সে তারই আশাপথ চেয়ে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ এলেই বলে বসে, এখন লেখাপড়া ছেড়ে সে বিয়ে কর্‌তে পারবে না। তার ভাব বুঝেইত এতদিন চুপ্ করে আছি, আর এখন এত লজ্জা অপমান সব সহ্য কর্‌ছি। কিন্তু এর পর যদি—

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

ভৃ। আজ্ঞে ডাকের চিঠি এসে ছ।

প্র। (আগ্রহে) দে। (পত্র গ্রহণ)। [ভৃত্যের প্রস্থান।

প্র। শশীনাথের চিঠি দেখ্‌ছি—আবার না জানি কি লেখে—বুকটা দুরদুর কর্‌ছে, যেন আমারি বের খবর এতে আছে। (পত্র পাঠ) "আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার অদ্যই মফঃস্বলে যাইতে হইবে। কবে ফিরিব ঠিক্ নাই। পুনঃ পুনঃ আপনার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আর এরূপ অস্বীকারের কারণ দিবেন না।" (পত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া) উঃ কি অপমান্! আরত সহ্য হয় না। এর পর সে এসে যদি চন্দ্রার পায়েও ধরে তাহলেও আম আর তার সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে দেব না। যদিই বা পরে দিই, তাকে আগে চখের জলে নাকের জলে কর্‌ব তবে ছাড়ব।

[পত্র কুড়াইয়া এবং নিম্'কর থালা উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(গৃহে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা চুল বাঁধিতেছে।)

চ। আমার ত মনে হচ্ছে সেদিন! সেই দৃষ্টি, সেই মূর্ত্তি, সেই সব কথা আমার ত মনের শিরায় শিরায় আঁকা রয়েছে। তখন বরঞ্চ অনেক কথা শুনে যেতুম্ মানে বুঝতুম্ না, এখন সেই সকল কথা প্রেমময় অর্থপূর্ণ হয়ে শতগুণ মধুমাখা স্মৃতিতে মনে জেগে ওঠে। আর সত্যই কি তিনি সে সমস্ত ভুলে গেছেন! ফিরে এসে একবার দেখ্‌তে এলেন না, দিদি এত ডাক্‌লেন তাঁর একটিবার আসার অবসর পর্য্যন্ত হয় না। উঃ পুরুষমানুষ কি নিষ্ঠুর জাত!

বেহাগ।

সারাদিন পড়ে মনে!
মধুমাখা প্রেমরাগে, চেয়েছিল সে কেমনে!
রবির কিরণ আগে, সে আলো কিরণ জাগে;
সন্ধ্যা না হইতে সন্ধ্যা সে দিঠির স্মৃতি পথে।
হাসি কাঁদি সারাদিন, সে নয়নে চিরলীন;
স্বপ্নখানি যেন তার মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে।

(একটি বিনুনি শেষ করিয়া অন্যটি বিনাইতে বিনাইতে) বেশ-বিন্যাস কর্‌ছি কার জন্য? হয়ত তিনি আজও আস্‌বেন না। আমার নিজের উপর এত রাগ ধরছে। এত চেষ্টা করছি কিছুতে ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। সত্যি আমার কি মনের একটুও তেজ নেই—একটুও গর্ব্ব নেই! প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আর তাঁকে দেখ্‌তে চাব না। ইঃ তিনি মনে করেছেন আমরা ক্রমাগত তাঁকে সাধ্‌ব আর তিনি উপেক্ষা কর্‌বেন! কখনো না। একবার যদি আসেন ত তাঁর ভুলটা দেখিয়ে দিই। (বিনুনি শেষ

করিয়া কবরী বন্ধন করিতে করিতে) কে জানে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে—

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্র। বিশ্বাস কর্‌তে পারিস্‌নে,—এই চিঠি পড়।

(পত্রপাঠে চন্দ্রার সজলনয়ন)

প্র। দেখ চন্দ্রা ওরকম করলে চল্‌বে না। ঢের হয়েছে—যতদূর অপমান সহ্য করতে হয় সওয়া গেছে! তোর যদি একটুও আত্মগর্ব্ব থাকে ত কান্নাকাটি ছাড়. মনে বল আন, তার এরূপ ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ। আমার ত রাগে অপমানে সর্ব্বশরীর জ্বলছে। এর শোধ যতক্ষণ আমি নিতে না পার্‌ছি আমার শান্তি নেই।

[ঘটকীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও চন্দ্রার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ঘ। কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা'রা,
এনেছি নতুন্ বর, গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা ;
এ নয় সাধারণ ছেলে,
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ, তাই ফেল্ বিএ এল্ এ।
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমী জমা
এ যে স্বনামধন্য, পুরুষগণ্য বিলাত ফেরা।
ওগো কনের মারা।
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোরা !
লাগ্‌বে না টাকাকড়ি, সোনাভরি ওজন করা ;
শুধু উনিশ কি বিশ যোতুকটি দিস্ কাগজ ভরা,
ওগো কাগজ ভরা।
অম্‌নি পরবে টোপর আপনি সে বর দেবে ধরা।

প্র। আর রঙ্গ ভাল লাগে না, অন্য জায়গায় যা।

ঘ। ও মা ওকি কথা গো, তুমিইত বল্লে শশীবাবুর কাছে যা, তা কাজ গুছিয়ে এনু—এখন দূর্ ছাই।

প্র। কাজ কি গোছালি—সেত আর আস্‌ছে না ?

ঘ। আস্‌ছে বই কি, আজই আস্‌ছে।

প্র। মরণ তোমার ওসব বাজে কথা ঢের শুনেছি। আমি এইমাত্র চিঠি পেয়েছি, সে আস্‌তে পার্‌বে না।

ঘ। কেন আমাকে যে চিঠি দিলেন আজই আসবেন। আমি কি তেম্‌নি পাত্র, চিঠি নিয়ে তবে ছেড়েছি।

(পত্র প্রদান ও প্রভাবতী মনেমনে পাঠ করিয়া)

প্র। সত্যিই আজ চারটের সময় আস্‌ছে। আমি আগে যে চিঠি পেয়েছি সে কাল্‌কের লেখা—আজ সেজন্য মাপ্ চেয়েছে। (স্বগতঃ) কিন্তু আমি এত সহজে তার অপমান ভুল্‌ছিনে, তাকে মাপও কর্‌ছিনে। এখন কি করা যায়, একটা ফন্দী মনে হয়েছে।

ঘ। তবে চন্নু মা এখন, আমায় আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, ৪টের সময় ঠিক্ এখানে জুট্‌তে পার্‌লে হয়।

প্র। (স্বগত) দেরীতে এলেই ভাল। (প্রকাশ্যে) তা দেরী হলেই বা ক্ষতি কি ? যখন সুবিধা হয় এস।

ঘ। তবে চন্নু মা, বিদায়টা যেন ভাল করে পাই। [প্রস্থান।

প্র। কই এখনো ত ক্ষেপির মা এলেন না। দুপুরের সময় গাড়ী পাঠিয়েছি এখন দুট। এইযে বল্‌তে বল্‌তে।

(ক্ষেপি ও ক্ষেপির মার প্রবেশ)।

প্র। মাসীমা তোমার যে এত দেরী। আমি ছানাটানা কেটে ঠিক্ ক'রে রেখেছি—আজ তোমার কাছে রসগোল্লা পান্‌তোয়াটা শিখে তবে অন্য কাজ। ক্ষেপি কোথা ?

মা। সে বাছা হাবীর কাছে গেল, তা বাছা তুইওত বেশ রসগোল্লা করিস্।

প্র। পোড়া কপাল আর কি! আমি রসগোল্লা কর্‌লেই তোমাদের ছেলে বলেন্ বাড়ীতে ত ঢিলের অভাব নেই,—এনে রসে ডোবালেই ত হয়—কেন মিছে ছানা কিনে পয়সা নষ্ট করা। তাই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আজ শিখবই শিখব।

মা। তা চল বাছা রান্নাঘরে—আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী যেতে হবে। অনেক ক'রে যেতে লিখ্‌লি গাড়ীও পাঠালি তাই এলুম, নইলে আজ অস্‌তুমই না।

প্র। কেন বাছা সেটি হবে না। আজ আমি তোমার মেয়ের জন্য বর ঠিক্ করেছি, সে চারটের সময় দেখ্‌তে আস্‌বে।

মা। (স্বগতঃ) এ হলো কি! একটা বর জোটে না—হঠাৎ দুটো দুটো বর হাজির! যেখানে যাই আমার ক্ষেপির বিয়ের জন্য সবাই ব্যস্ত, যাহক্ কোনোটাই এখন হাতছাড়া করা হবে না, যেটা লেগে যায়। (প্রকাশ্যে) সত্যি বাছা ক্ষেপির জন্য বর ঠিক্ ক'রেছিস্? কি বলে যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব ভেবে পাচ্ছিনে, জন্ম জন্ম সুখে থাক। চারটের সময় না বল্লি বর কনে দেখ্‌তে আস্‌বে?

প্র। হ্যাঁ বলেছে ত তাই।

মা। তা আমি ছটা পর্য্যন্ত থাক্‌তে পার্‌ব, ৭টাতে গেলেই হবে। তবে চল মিষ্টিগুলো সব ক'রে ফেলিগে।

প্র। হ্যাঁ আবার ক'নে সাজাতে হবে। [প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

৩

এক্ষণে সামরিক ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। আমাদের য়ুরোপীয় বজেটের ন্যায়, ভারতের সামরিক বজেট্ সময়ে-সময়ে এক-এক দমকে হুহু-করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের দরুন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় এবং ১৮৮৫ সালে রুসেরা আসিয়া-অঞ্চলে আরো বেশীদুর অগ্রসর হওয়ায়,—তাছাড়া নবরাজ্য জয় করিবারও উদ্দেশে,—ভারতের কর্তৃপক্ষ প্রথমে দুই লক্ষ—পরে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈনিক ভারতে প্রস্তুত রাখিলেন। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ দেশীয়। যদি কাশি-রাজের খেয়ালি উক্তিটা সত্য হয়—যদি এই বিশাল প্রায়দ্বীপটি জয় করিবার জন্য, চন্দননগর হইতে বহির্গত দুই পল্টন সৈন্যই যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য কিসের জন্য? শান্ত ভারতবাসীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্যই কি এই সৈন্যের প্রয়োজন?—কখনই না; ইহার প্রয়োজন,—রুসের গতিরোধ করিবার জন্য; আফ্‌গানিস্থানের সহিত, ব্রহ্মদেশের সহিত, চীনের সহিত,—এমন কি, হাপ্‌সি-দেশের সহিত যুঝিবার জন্য। ভারতের সৈন্য, ব্রিটিশ্-সাম্রাজ্যিক সৈন্যেরই অন্তর্ভুক্ত। আসিয়া অঞ্চলে, ভারতবর্ষই যে ইংলণ্ডের পরিখা-বেষ্টিত সৈন্য-শিবির, আত্মরক্ষণ ও আক্রমণের প্রধান সম্মিলন-ভূমি—এই রহস্যটি এখন আর কাহারও নিকট অবিদিত নাই। এত সৈন্য রাখা ভারতের পক্ষে যে অনাবশ্যক তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই,—ইংলণ্ড অবাধে ও যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে আত্মকার্য্যে

নিয়োগ করিতেছেন। এই ভারতীয় সৈন্য সীমান্তরাজ্যের সহিত যুদ্ধে নিয়ত ব্যাপৃত। ইহাদের এক অংশ এক সময়ে হাপ্‌সি-দেশে প্রেরিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌ ও গুর্খা সৈন্য, চীনের সহিত যুদ্ধ করে। এই ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে বলিয়া, ইংলণ্ডের যার-পর-নাই সুবিধা হইয়াছে। ইহাদের নিয়োগে ইংলণ্ডের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না। এই বেতনভোগী সৈন্যের ব্যয়ভার ভারতই বহন করিয়া থাকে; এবং সময়বিশেষে ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে, উহাদিগকে ইংলণ্ডের হস্তে সদয়ভাবে সমর্পণ করা হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হাপ্‌সি-যুদ্ধে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভারতের হিসাবে খরচ পড়ে;—নিয়মিত সামান্য খর্চ্চাগুলি ভারতের হিসাবে ও নিয়মাতিরিক্ত বিশেষ খর্চ্চাগুলি ইংলণ্ডের হিসাবে ধৃত হয়। ইংলণ্ডের মুখ্য কোষাধ্যক্ষ দেওয়ানজি-বাহাদুর ইহার সমর্থনে কিরূপ ওজর করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কেহ কল্পনাও করিতে পার?—লর্ড-স্যালস্‌-বরি বলিলেন;—"সুযোগ পাইয়া, এই ব্যাপারে ভারত যদি কিছু লাভ আদায়ের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতের অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইবে। কোষাধ্যক্ষ এস্থলে লজ্জার দোহাই দিবেন, এ কথা কি কাহারও মনে উদয় হইতে পারে? ইংলণ্ডের "বিল্‌"—পরিশোধ করে ভারত—ইহাই বরং ইংলণ্ডের পক্ষে লজ্জা সঙ্কোচের বিষয়। নানাছলে সত্য-অপলাপের চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-তহবিলের প্রকৃত বৃত্তান্ত কে না অবগত আছে? এই তহবিল হইতে আফগানযুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বজেট্‌ দুরস্ত রাখা হয়।

এই সমস্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য ভারতীয় প্রজার প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়—অথচ এই সকল যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সংস্রব নাই। পরে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল তখন—ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রজা-প্রদত্ত যে অর্থ দুর্ভিক্ষ-তহবিলে সঞ্চিত ছিল—তাহার খোঁজ পড়িল।

কিন্তু তখন দেখা গেল, সেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, বিদেশীয় যুদ্ধ-ব্যাপারের গভীর গহ্বরে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে!...এই বাবদে যে অতিরিক্ত খর্চ্চা হইয়াছিল, দাদাভাই, করনেল্‌ হানার গ্রন্থ হইতে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। (Poverty of India)। এই অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া, ১৯০০ সালের কংগ্রেসে, চন্দ্রবর্কার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে সকল সার্ব্বজনিক কাজ সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতজনক ও নিতান্ত আবশ্যক তাহা বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু যে সকল কাজ তত আবশ্যক নহে, তাহা—তহবিলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াও অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "সেদিন, আমার একজন ইঙ্গভারতীয় বন্ধুর, নিকটে একটা কথা শুনিলাম—কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও, উহার দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয়টি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার সুবিধা হইবে। আমার বন্ধুটি বলিলেন,—সর্ব্বদাই তাঁহার মনে মনে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হয়;—বোম্বাই নগরে...সৈনিকদিগের একটা সামান্য ভোজনালয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া ওরূপ একটা ব্যয়-বহুল ইমারৎ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন।"

আরও এক কথা; সমস্ত আসিয়ায় ইংরাজ-কন্‌সল্‌দিগের বাসগৃহের জন্য,—ইণ্ডিয়া আফিসের ইমারৎ-আদির জন্য, "কুপার্স-হিল্‌" বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য, কেন ভারত-তহবিল হইতে খরচ পড়ে ইহার সদুত্তর আমাকে কি কেহ দিতে পারেন? এডোয়ার্ড-রাজার অভিষেকের সময়, "Temps" নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বোধ হয় সকলেই সেই সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন;—"সকলেই জানে, অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া, ভারতের রাজা-মহারাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লণ্ডনে কিছুদিন অবস্থিতি করায়, তাহার দরুন যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ঋণভারাক্রান্ত ভারতের

তহবিল হইতে আদায় করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের খরচে, উৎসবাদি কিরূপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, "জন-বুল্" (জনপুঙ্গব) তাহার রহস্য বিলক্ষণ বুঝেন। ইহা আদৌ স্কচ্ ধরণের আতিথ্য নহে। হিন্দুরা ন্যায্যরূপেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ভারতসাম্রাজ্যের ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রাদি, এই বিষয়ে দেশীয় সংবাদপত্রাদির সহিত একত্র মিলিত হইয়াছে।"

এই রাজনীতির ফলে, ভারত এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতের পার্শ্বদেশে এমন একটি ছিদ্র হইয়াছে যেখান-দিয়া—তাহার যে কিছু রক্ত অবশিষ্ট ছিল,—তাহা নিয়মিতরূপে ও অনিবার্য্যরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। এই অতুলনীয় অস্বাভাবিক ভীষণ ব্যাপারটি—"শোষণ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমি ইতঃপূর্ব্বে দেশের ধন-শোষক যে সব ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে যে লাভ হয়, সেই লভ্যাংশ, ভারত হইতে প্রতি বৎসরে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে; তাহারই অন্তর্ভুক্ত,—সরকারী ঋণের সুদ, রেলের কাজে-খাটানো মূলধনের প্রতিভূস্বীকৃত সুদ, য়ুরোপীয় কারখানা-ওয়ালা ও য়ুরোপীয় মহাজন-দিগের লভ্যাংশ, এবং য়ুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারীদিগের সঞ্চিত অর্থ। ভারত বাধ্য হইয়া যে মূলধন ইংরাজ মহাজনদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া এখানে খাটাইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে ভারতের কোন লাভ নাই। ইংরাজ মহাজনদের লভ্যাংশের ফলভাগী —ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার, ইংরাজ হেড্-মিস্ত্রী, ও য়ুরোপীয় শ্রমজীবীগণ। অতএব, ভারত প্রতিবৎসর যে প্রভূত অর্থ, ইংরাজ প্রভুদের নিকট, ইংরাজ মহাজনদের নিকট প্রেরণ করে, তাহা ভারতের "গর্ভলোক্সান" বই আর কিছুই নয়। এই অর্থ, ভারত হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার বিনিময়ে ভারত কিছুই পায় না, ভারতে কিছুই ফিরিয়া আইসে

না;—ইহা একপ্রকার সমুদ্রে জলাঞ্জলি দেওয়া বলিলেও হয়। সরকারী হিসাবের স্বীকৃত অঙ্ক, প্রায় ৪০ কোটি ফ্রাঙ্ক; কিন্তু পুরাপুরি ধরিতে গেলে,—য়ুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক যে টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহাও ঐ অঙ্কে যোগ করা আবশ্যক। কিন্তু উক্ত অঙ্কের মধ্যে উহা ধৃত হয় না। দাদাভাই, ২০ অক্টোবর ১৮৯৮ সালে, সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—"একমাত্র ভারতেই, রপ্তানিক অঙ্ক, আম্‌দানির অঙ্ককে এতদূর ছাড়াইয়া উঠে যে তাহা ভারতের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক ও আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। (১) যাহাতে বাণিজ্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়, যাহাতে ভারত পণ্যক্রয়ের জন্য পুনর্ব্বার অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তজ্জন্য এতটা মাল ভারতে আম্‌দানি হওয়া আবশ্যক—যাহার মূল্য রপ্তানি মূল্যের সমতুল্য হইবে;—তা-ছাড়া, রপ্তানি মাল বিক্রয় করিয়া বৈধরূপে যে লাভ হইবার কথা—সেই লভ্যাংশেরও তুল্যমূল্য হইবে"। মনে কর, যদি ভারত, দুই শত কোটি মূল্যের মাল বিক্রয় করে, আর বাস্তবিক তাহার হাতে আইসে শুধু দেড় শত কোটি, তাহা হইলে এই অর্দ্ধ-শত কোটি তাহার ক্ষতি হইল বলিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-শত কোটি, শাসন-বিভাগের ও সমর-বিভাগের হিসাবে খরচ পড়িয়া পথেপথেই কাটান্ যায়। ফলতঃ এইরূপই হইতেছে। বিক্রীত পণ্যের পূরা দাম ভারত কখনই পায় না। দাদাভাই, উদাহরণস্বরূপ ১৮৯২-৯৩ হইতে ১৮৯৬-৯৭ সালের হিসাব ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছে;—আম্‌দানি অপেক্ষা রপ্তানি যে পরিমাণে বেশী হয়, সেই বেশীর অঙ্কটির পরিমাণ,—অথবা যাহা একই কথা,—যাহা ইংলণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া দেন,—তাহার পরিমাণ—বার্ষিক ৪০ কোটি টাকা।

(১) এই অতিরিক্ত রপ্তানির মূল্য ভারত পায় না।

হায়! ভারতের সমস্ত দুর্দ্দশার ইহাই প্রকৃত কারণ। ভারত এই সমস্ত অর্থদানে বিরত হউক্, অথবা কড়া লাগাম শিথিল করিবার জন্য একটু মুখ-ঝাঁকানি দিক্,—আমনি তাহার চতুষ্পার্শ্বে, কত স্বার্থের ধ্বংসাবশেষ স্তূপীকৃত হইবে! কেন না, তাহার দেহপুষ্ট কতকগুলি জীব আছে যাহারা তাহাকেই শোষণ করিয়া, বেশ আরাম ও আয়েশে জীবন যাপন করিতেছে;—সেই সব বড় বড় লাট্, সেই সব "শেয়ার"-ধারী ক্ষুদ্র মহাজন, সেই সব রাজপুরুষ ও অবসর-বৃত্তি-ভোগী কর্ম্মচারীগণ। বোধ হয়, সমস্ত ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্যে এমন একটি টাকার থোলে নাই, যাহার মধ্যে ভারত তহবিলের দুই এক মুদ্রা কোন-গতিকে আসিয়া না পড়িয়াছে। এই ঐন্দ্রজালিক তহবিল—অলৌকিক তহবিল—অফুরন্ত বাড়ন্ত তহবিল হইতে সকলেই অর্থশোষণ করিতেছে,—কেহবা মুঠা মুঠা, কেহ বা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া। ইহাতে কাহারও সঙ্কোচ নাই, অনুতাপ নাই; কেন না, একথা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না,—কত আত্মত্যাগ, কত দুঃখ কষ্ট,—এমন কি, হয়ত কত মৃত্যুর বিনিময়ে এই মুদ্রাগুলি অর্জ্জিত হইয়াছে...

যাহারা একথা জানে, তাহারাও তাচ্ছিল্য সহকারে এই প্রশ্নের আলোচনা করে। তাহারা সুললিত ভাষায়, অথচ উদ্ধত ও কঠোরভাবে একথা স্বীকার করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। লর্ড সালসবরি এইরূপ বলিয়াছিলেনঃ—"ভারতের রক্তমোক্ষণ যখন করিতেই হইবে, তখন দেহের সেই সব অংশে অস্ত্রচালনা করা আবশ্যক যেখানে রক্ত জমিয়া গিয়াছে"। দেহের কোন্ অংশে তোমার রক্তমোক্ষণ করা যাইবে?" ইঙ্গ-ভারত-সাম্রাজ্য উত্তর করিলেন;—"যে অংশেই হউক—রক্ত-মোক্ষণ আবশ্যক বটে।" তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে না; "কোন্ অংশে রক্ত মোক্ষণ করা তোমার অভিপ্রেত?"—হিন্দুরা এই সুযোগে স্যাল্সবরির কথার ছল ধরিয়া অনায়াসে

বলিতে পারে;—"হাঁ রক্ত জমিয়াছে বটে—কিন্তু মাথায়। সেই উত্তমাঙ্গে দুই চারিবার অস্ত্র চালনা করিলেই আশ্চর্য্য উপকার দর্শিবে। ভারতের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজুরি করে, তাহারা জীর্ণশীর্ণ রক্তহীন, তাহা হইতে শুধু জল অথবা পচা রক্ত বাহির হইবে।" যে পরিমাণে বৈদেশিকদিগের অবস্থা ভাল হইবে, সেই পরিমাণে দেশীয় লোকের অবস্থা শোচনীয় হইবে, ইহা ধরা কথা। কি প্রকারে ভারতের পুষ্টি-সাধন হয় তাহাই এখনকার একমাত্র সমস্যা। ভারত এখন অনাহারে মৃতপ্রায়। সকলেই জানে, ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন দেখা দিতেছে—ভীষণতর আকারে দেখা দিতেছে। গত দুই বারের দুর্ভিক্ষে যত লোক মরিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত দুর্ভিক্ষ একত্র করিলেও তাহার সমান হয় না। মহামারীর ন্যায় দুর্ভিক্ষও এখানে চিরস্থায়ী হইতে চলিল। এই ক্ষেত্রে ইঙ্গভারতীয় ইংরাজদিগের দিব্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। দুর্ভিক্ষের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব সত্ত্বেও, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের উল্লাসময়ী বীণার ঝঙ্কার একটুও মৃদুভাব ধারণ করে না। দুর্ভিক্ষ-বৎসরের রিপোর্ট, প্রায়ই সুখবাদীর উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত এবং উহাতে একপ্রকার সন্ন্যাসী-সুলভ ঔদাস্যের বিকট গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত প্রদেশকে-প্রদেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, অথচ সরকারী হিসাব-তালিকায় প্রকাশ—ভারত বেশ সমৃদ্ধ। সরকারি তালিকায় যাহাই বলুক,—ইহা নিঃসন্দেহ, ভারতের অসংখ্য লোক নিত্য-নিয়ত অনাহারে মরিতেছে। রাজপুরুষদিগের রিপোর্টে প্রকাশ—লোকদিগের ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাব ও সু-বৃষ্টির অভাব—ইহাই দুর্ভিক্ষের কারণ। আর কিছু না হউক, এই দুর্ভিক্ষের উপলক্ষে, রাজপুরুষগণ আপনাদিগের ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সমস্ত সাম্রাজ্যের বদান্যতা কীর্ত্তনের একটা সুযোগ পাইয়া থাকেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহানাটক।

নবম অঙ্ক।

নেপথ্যে। ভো ভো অঙ্গদবীর! কপি-যোদ্ধাদের বল' যেন অদ্য আত্রে সকলে সতর্ক থাকে। অদ্য রাবণ-স্থাপিত প্রাভঞ্জনী নাম্নী রাক্ষসী, শয়ান রাম লক্ষণকে বধ করবে—এইরূপ বিভীষণ বল্‌চেন।

রাত্রে প্রাভঞ্জনীর প্রবেশ।

প্রাভঞ্জনী। (স্বগত)

যেই বীর, হস্তে ধরি' নিষ্কোষিত সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
নির্ভয়ে অটবীমাঝে রাত্রিকালে আছয়ে শয়ান;
আর, সুদর্শন চক্র রক্ষা করে যারে অবিরাম
ক্ষুদ্র আমি কি-করিয়া সে রামের হরিব পরাণ॥

তবে আমি গিয়ে রাবণকে জানাই।

(রাবণের নিকট গিয়া প্রকাশ্যে)

লঙ্কানাথের জয় হোক্! রাজন্! সুদর্শন-চক্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে' রামকে রক্ষা করচে, তাই রামকে আমি রাত্রে বধ করতে পারলেম না। কাল প্রাতে, সমরাঙ্গণ-প্রণয়ী রাক্ষসেরা এই কার্য্য সাধন করুক।

রাবণ। একথা ঠিক্। তাই হোক্।

এদিকেঃ— অথ যুদ্ধোদ্যোগ।

সুগ্রীব—যাহার বপু রাজলক্ষ্মী করয়ে আশ্রয়,
গম্ভীরশ্রী অভিরাম অঙ্গদ সে বালির তনয়,
সংগ্রামে প্রবীণ বীর আর যত বানর-প্রবর,
লঙ্ঘিয়া লঙ্ঘিয়া সিন্ধু, খেদাইয়া যত নিশাচর,
প্রভূত-প্রভাব লঙ্কা ঘেরে চারি ধারে,
—জলধি-বেষ্টিত যাহা পরিখা-আকারে॥
প্রাকার-শিখরে উঠি' যত কপিগণ
রাক্ষস-নিঃক্ষিপ্ত শিলা করিয়া গ্রহণ
নিঃক্ষেপিয়া সেই সব শিলা পুনর্ব্বার
লঙ্কার সমস্ত সৌ করে চুর্‌মার্॥

বানরগণ। (পরস্পরের প্রতি)

শ্রীরাম লক্ষণ দোঁহে, আর সে সুগ্রীব কপিপতি
পরীক্ষায় অবগত যাহাদের প্রভাব শকতি
—সেই কপি-মাঝে মোরা সামর্থ্যেতে সবাই সমান;
প্রবল রাক্ষস-চয় দেখি' চক্ষে বীর হনুমান্
যে কার্য্যে গেচেন, মোরা এবে তাহা করিব সাধন,
তা ছাড়া অপর কিছু নাহি কাজ, শোনো ভ্রাতৃ-গণ!
নিশাচর-সৈন্য সবে দুর্গমধ্যে হয়েছে মিলিত,
ঘিরিয়াছে লঙ্কা এবে কপি-সৈন্য রণে উল্লসিত;
পুনর্ব্বার মিলি' যদি রাক্ষসেরা করে নিষ্ক্রমণ,
কি জানি কি হয় তবে —এখনি যুঝুক্ বীরগণ॥

অনন্তরঃ— কপিকুল-সৈন্যদের মেঘমন্দ্র গভীর গর্জ্জনে,
রাক্ষসদিগের ঘোর কোটি রণ-ঢক্কার নিস্বনে,
অদ্রিগর্ভ বিদারিয়া, দুই সৈন্য হ'ল একত্তর;
—উভয়েই শস্ত্র দক্ষ —উভয়েই সংগ্রামে তৎপর॥

রাবণ। (রামের সৈন্য দর্শনে মহোদরের প্রতি) রাম এখানে কবে এল?

মহোদর। যেই দিন ভূবলয় হ'ল অধোনীত,
মহীধর যত সবে হ'ল কম্পান্বিত;
যেই দিন সপ্তসিন্ধু হ'ল বিক্ষোভিত
রক্ষ-বধূ-বক্ষ হ'ল অশ্রুতে প্লাবিত
কপি-সৈন্য-পদক্ষেপে সূর্য্যপথ ধুলায় আবৃত
সেই জয়-যাত্রাদিন —হে রাজন্!—নহ কি বিদিত?

রাবণ। সেই রাজলক্ষ্মীচ্যুত রাম এখন কোথায়?

মহোদর। মহারাজ!

কটাক্ষেতে বাঁধিলেন সেতু যিনি জলধি-উপরে;
উপবিষ্ট যিনি তব মাতুলের দেহ-চর্ম্ম'পরে;
চারিধারে বান্দগণ স্তুতিপাঠ করয়ে যাঁহার,
বিভীষণ প্রতি যিনি দিয়াছেন সব কার্য্য-ভার,

হেরি' নিজ বাণ যিনি স্মিতমুখে দেখেন লক্ষ্মণে,
সুগ্রীবের গ্রীবা যিনি ধরেছেন বাহুর বেষ্টনে,
পদসেবা ক'রে যাঁর কুমার অঙ্গদ, হনুমান্,
—ওই সেই—হে রাজন্— মহাবীর রঘুপতি রাম ॥

রাবণ। (অসূয়া-সহকারে) আঃ! কি তুমি বল্‌চ? আজ আমার বাহুবীর্য্য তবে একবার দেখ।

(সংগ্রামে অবতরণ)

ইত্যবসরে বিভীষণঃ—(রামের প্রতি)

অনল-শিখার মত কপি-সেনা পিঙ্গল-বরণ
সাগর-তরঙ্গ সম বেগে লঙ্কা করেছে বেষ্টন।
সীতার বিরহ-ক্লেশে আছ প্রভো হেথায়, কাতর
তব সৈন্য-ঘটা হেরি' ক্লিষ্ট আজি হোথা লঙ্কেশ্বর ॥
বিশাল প্রাকারে রহে রাবণের কলেবর
আকণ্ঠ আবৃত;
শুধু তার মুণ্ডগুলা প্রাকার ছাড়ায়ে উঠি
—ঊর্দ্ধে সমুত্থিত।
বাহিরের লোক যত দেখে সবিস্ময়,
মেঘশূন্য নভে যেন রাহুর উদয় ॥

অনন্তর — রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে ধনুর্গুণ করিলা টঙ্কার,
ব্যাপ্ত হ'ল দিশি-দিশি তার সেই ভীষণ ঝঙ্কার;
কপিকণ্ঠ সারি সারি কদলীর প্রায়,
তাহে অসি-প্রান্ত যেন বিদ্যুৎ খেলায়।
সেই বজ্রানলে দগ্ধ নিশাচরগণ
ত্রস্ত হয়ে রণক্ষেত্রে করে সঞ্চরণ ॥

অপিচঃ— কাল-পাদপের যেন পরিণত পরিপক্ক ফল
—এসব পাটলমুখী কপিদের অগ্রসেনাদল,
সমস্ত রাক্ষস-সৈন্য রণমাঝে করয়ে সংহার
তপনের প্রাতঃ প্রভা নাশে' যথা ঘোর অন্ধকার ॥

(যুদ্ধে রাক্ষসেরা হত হইলে)

রাবণ। ওহে মন্ত্রিগণ! তোমরা এখন আমার অনুজ কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ কর।

মন্ত্রিগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ! (তথা করণ)

কুম্ভকর্ণ-কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালি দিয়া
মন্ত্রি পুরোহিত সবে দিল জাগাইয়া ॥

কুম্ভকর্ণ। (জাগ্রত হইয়া রাবণের সমীপে আগমন পূর্ব্বক)

মহারাজ! শ্রীচরণে প্রণাম!
সাক্ষাৎ রাজার আজ্ঞা— যদিও সর্ব্বত্র-সঞ্চারী
তথাপি সজ্জন-মতি হয় শাস্ত্র-দীপ-অনুসারী ॥
ভ্রাতৃ বাক্য শুনি পরে কহে দশানন।
বিপদে দুর্ল্ভ কিন্তু সাধুর বচন ॥

রাবণ। কৈলাসের উত্তোলনে হয় যার কেউর ঘষিত,
যার পীন-ভুজবলে সুরাসুর হয় পরাজিত,
তারি সে প্রখ্যাত বাহু জয়লাভ করিবে আবার,
কুম্ভকর্ণ! নাহি রাখি কিছু মাত্র প্রত্যাশা তোমার।
যাও তুমি পুনর্ব্বার তব নিদ্রালয়ে,
ঘুমাওগে সেথা গিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে।

কুম্ভকর্ণ। প্রখ্যাত সে হরধনু ভাঙ্গিল যে জন,
কপিরাজ বালিরে যে করিল নিধন,
সেতু রচি' করিল যে সাগর বন্ধন
রক্ষোহন্তা সেই রামে আর সে জিগীষু বিভীষণে
মুহূর্ত্তে সংহার করি, আসি' পুন বন্দিব চরণে ॥
রাক্ষসেন্দ্র তুমি দেব, তৃণবৎ শোকশল্য
ত্যজ' মহারাজ!
শত্রুবৃন্দে বিনাশিয়া, ক্ষালিব কলঙ্ক তব,
শত্রুরক্তে আজ।
কেবা রাম কে লক্ষ্মণ, কেবা সে অঙ্গদ, হনু,
কেবা কপীশ্বর,
কেবা ধাতা, কেবা কাল, কুম্ভকর্ণ হয় যদি
রণে অগ্রসর।

ওহে কপি মল্লগণ! কেন বৃথা হও কম্পমান
তোমাদের সনে কভু কুম্ভকর্ণ না করে সংগ্রাম।
কৃত্রিম বাপীর জল মেঘবৃন্দ করে কি লেহন?
মশক সমূহে কভু কেশরী কি করে নিষ্পেষণ?
ওহে রাম! নহি আমি বালি, খর, ত্রিশিরা, দূষণ;
সুবাহু, তাড়কা নহি, নহি সেতু সাগর-বন্ধন;
কিম্বা নহি হরধনু ভাঙ্গিলে যা তুমি অনায়াসে;
রুদ্রমূর্ত্তি কালানল যার তেজ ত্রিভুবন গ্রাসে,'
বীরগণ-বক্ষদেশে মহাশল্যরূপে যে বিরাজে
আমি সেই কুম্ভকর্ণ উপস্থিত আজি রণমাঝে॥

অনন্তর — বহু সেনানাশী বীর কুম্ভকর্ণ, সুগ্রীবেরে
পরিঘ-সদৃশ ভুজে করি নিপীড়ন
পূর্ব্বদিকবর্ত্তী যত কপিকুলে চূর্ণ করি'
লঙ্কার সম্মুখে শীঘ্র করিল গমন॥

(রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া)

রাবণ। মহাবল বালীবীর কক্ষাগত করি মোরে
যেই শল্য বক্ষে মোর দেয় বসাইয়া,
—মহামানী কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে ধরিয়া কক্ষে
সেই শল্য এবে যেন নিল উৎপাটিয়া।

অনন্তর — কক্ষাগত সুগ্রীবেরে কুম্ভকর্ণ, ধরি' ভুজে,
আর তারে স্থাপন করিয়া স্কন্ধদেশে,
চলিলা লঙ্কার পানে; সুগ্রীব, কূর্পরা ঘাতে
কুম্ভকর্ণ-বীরে করি আহত নিমেষে,
নাসা কর্ণ ছিঁড়ি দাঁতে, কুম্ভকর্ণ-কক্ষ হতে
এক লম্ফে স্ব-শিবিরে গেল অবশেষে॥
কুম্ভকর্ণ নিশ্বসিয়া, বাষ্পবারি করি বিসর্জ্জন
—যেন নিজ প্রেতাত্মারে, বারি দানে করিয়া তর্পণ—
সকরুণে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া লঙ্কায়
লইয়া ত্রিশূল অস্ত্র, ক্রোধে অন্ধ কালমূর্ত্তি প্রায়,
—ছিন্ননাসা হইয়াও— অবতীর্ণ হল রণাঙ্গণে;
কাল-হুতাসন যেন জ্বলিতে লাগিল দুনয়নে॥

(ক্রমশঃ)

প্রতারিত।

(১)

মানুষের অনেক অভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। হরিহরের একটীমাত্র কন্যার অভাব আর পূর্ণ হইল না। বহুকাল হইতে কন্যার জন্য যে অপত্য স্নেহটুকু সঞ্চিত ছিল, একটা কিনারা করিতে না পারিয়া, অবশেষে হরিহর তাহার সমস্তটা নিরুপমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর হরিহরের একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিরুপমা তাঁহারই কন্যা।

নিরুপমা ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও হরিহরের অযাচিত স্নেহের প্রতিদান দিতে কিছুমাত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত না। বালিকা হরিহরের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, নানাবিধ অস্ফুট আলাপে নিজের ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিত। হরিহরও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ক্রমেই নিরুপমার উপর তাঁহার একটা মায়া পড়িয়া গেল। এই ভাবে হরিহরের ইহজন্মের কন্যার অভাব পূর্ণ হইল।

নিরুপমার বর্ণ একটু কালো ছিল বটে কিন্তু সে একেবারে শ্রীহীন ছিল না। অনেকে বালিকার রূপের নিন্দা করিত, কিন্তু হরিহর নিরুপমার সৌন্দর্য্যের অভাব দেখিতে পাইতেন না; যাহারা নিরুপমাকে কালো বলিত তিনি তাহাদের দৃষ্টিশক্তির বড় প্রশংসা করিতেন না।

দিনে দিনে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসায় হরিহর যতই মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন, তাহাকে আপনার করিবার জন্য ততই তাঁহার ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠিল। বালিকাকে একটা ঘনিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার সুযোগের অভাব ছিলনা। সে সুযোগ, পুত্র রমানাথ।

নিরুপমাকে পুত্রবধূ করিবার কথাটা হরিহর একদিন বিশ্বম্ভরের নিকট পাড়িলেন। বিশ্বম্ভর হাতে স্বর্গ পাইলেন; বলিলেন, এ অপেক্ষা তাঁহার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে।

কোন দিক্ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। নিরুপমা একটু বড় হইলেই এক শুভমাসে, শুভলগ্নে রমানাথের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। হরিহর হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে পুত্রবধূকে গৃহে আনিলেন।

(২)

সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ মানুষমাত্রেরই থাকে, তবে রমানাথের একটু অধিকমাত্রায় ছিল। বিশ্বসংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত করিয়া বাল্যকাল হইতেই রমানাথ কল্পনায় একটা অনিন্দ্য সুন্দরীর ছবি আঁকিয়া তাহাকেই ভাবীপত্নীজ্ঞানে সুখস্বপ্ন দেখিত। বিবাহ-বাসরে নিরুপমাকে দেখিয়া তাহার সে স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল। দেখিল, তাহার মানসী সুন্দরীর এক কণা সৌন্দর্য্যও নিরুপমার মধ্যে নাই। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। চোখের সাম্‌নে সে যে বিবাহিত জীবনের একটা সুখশান্তিপূর্ণ-চিত্র এতদিন দেখিয়া আসিতেছিল আজ বোধ হইল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে মরুভূমির কঠোরতা নৃত্য করিতেছে।

চিকিৎসকের ঔষধের মত আমাদের দেশের যুবকদিগকে পিতা মাতার নির্ব্বাচিত পত্নী গলগ্রহ করিতে হয় তাই ভাবীপত্নী নির্ব্বাচনে রমানাথেরও কিছু মাত্র হাত ছিল না। পিতা মাতার আজ্ঞায় সামান্য ক্রীড়ণকের মত তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে।

বিবাহে রমানাথ যে বিশেষ রকম হতাশ হইয়াছে, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা শীঘ্রই এটা বুঝিতে পারিল এবং রমানাথকে শান্ত করিবার জন্য বিজ্ঞের মত বলিল—"ভবিতব্য খণ্ডান যায় না।"

রমানাথ, এতবড় সত্যটা বিশ্বাস করিল না, সে মনে মনে কেবল পিতামাতাকে অভিসম্পাত দিল।

(৩)

বিবাহের রাত্রে শুভদর্শনের সময় নিরুপমার মুখ দেখিয়া রমানাথের যে অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল আজ তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিবৃত্তি হইল না। যে রূপলালসা বাল্যকালে তাহার দিনগুলিকে স্বপ্নময় করিয়া রাখিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহা তেমনই প্রখর ছিল। কাজেই রমানাথ নিরুপমাকে আপনার পত্নী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনোমধ্যে কেমন একটা অশান্তির তুফান বহিতেছিল, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যেন জীবনটা বৃথায় গেল। পিতাই তাহার দুঃখের মূল ভাবিয়া পিতার উপর সে ভয়ঙ্কর চটিয়াছিল।

রাগে, ক্ষোভে রমানাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল, পিতামাতার খুব অবাধ্য হইল। মনে ভাবিল, ভালমানুষী দেখাইয়া সে খুব ঠকিয়াছে আর ভালমানুষটীর মত থাকিবে না। রমানাথের উৎপাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল,—সে খুব যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িল।

রমানাথ অনেক রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে, কবিতা লিখিতে লাগিল আর কিছু করিল না। হরিহর যাহা বলিতেন, ঠিক্ তাহার উল্টা করিয়া বসিত।

রমানাথ একবার অসুস্থ হইয়া পড়ে। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, রাত্রিজাগরণই পুত্রের অসুস্থতার কারণ। তাই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া রাত্রি জাগিতে নিষেধ করিলেন। রমানাথ সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আল্‌মারী হইতে পাঠ্যপুস্তকগুলি বাহির করিল, সমস্ত রাত্রি ট্রিগনমেট্রী কসিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন অসুখ খুব বাড়িয়া উঠিল—হরিহর সেই অবধি পুত্রকে আর বড় কিছু বলিতেন না।

(৪)

পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের সহস্র অনুরোধে রমানাথ কর্ণপাত করিল না। স্ত্রী নিরুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

রূপে মোহিত করিতে না পারিলেও নিরুপমা অল্পদিনের মধ্যে হরিহরের সংসারের সকলকে গুণে মোহিত করিয়াছিল। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া নিরুপমার পক্ষ লইয়া রমানাথের কাছে অনেক কথা বলিত। তাহাতে রমানাথের নিরুপমার উপর বিতৃষ্ণা বাড়িল বই কমিল না। হরিহর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বয়সবৃদ্ধিতে পুত্রের এ দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু এখন দেখিলেন, পুত্রের এ বড় বিষম ব্যাধি।

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড সে অনেক দিন কিছু বুঝিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বড় বেসি দিন আর গোপন রহিল না। নিরুপমার কোন কিছুরই অভাব ছিল না ; শ্বশুরের অপরিমেয় স্নেহ, শ্বাশুড়ির যত্ন তাহার ক্ষুদ্র জীবনটাকে সুখ-শান্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু এই দৃঢ় আচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়াও হঠাৎ একদিন এক গুরুতর অভাব নিরুপমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে একদিন স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার জীবন নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে ; তাহার হাসিখেলাময় অতীতের দিন ভবিষ্যৎ-জীবনের মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইতেছেনা। কি করিবে এই প্রশ্ন শতসহস্রবার মনে মনে উঠিল, কিন্তু হৃদয়ের একটী কোণ হইতেও তাহার উত্তরের আভাষ ব্যক্ত হইল না। একটা দারুণ অস্থিরতা হৃদয়ের মধ্যে উদ্দাম ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৫)

হরিহর বুঝিলেন, রমানাথের তাচ্ছিল্যতার কঠোর বাণ এতদিনে নিরুপমার বক্ষে বাজিয়াছে। সে আঘাতটা তাঁহারও হৃদয়ে লাগিল। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হরিহর এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন, নিরুপমার সহিত এমন ব্যবহার করিলে ত্যজ্যপুত্র করিব। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, আজকালকার ছেলে বিষয় প্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এ শাসনবাক্য রমানাথের অটল একগুঁয়েমি টলাইতে পারিল না। তিনি তখন একটু সুর নামাইলেন, পুত্রের গায়ে পিঠে হাত বুলাইলেন, কিন্তু রমানাথ তাহাতেও ভুলিল না। হরিহর তখন মনে মনে বিপদ গণিলেন।

হরিহরপত্নী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তারপর যখন নিরুপমার ব্যথাক্লিষ্ট মুখের পানে চাওয়া একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন রমানাথের মাতা মনে মনে এক কৌশল আঁটিলেন।

বিবাহের পর হইতেই রমানাথ নিরুপমা হইতে দূরে থাকিবার জন্য বৈঠকখানায় শয়ন করিত। হরিহরপত্নী নিরুপমাকে একরাত্রে সেইখানে পাঠাইতে চাহিলেন ; লজ্জার মাথা খাইয়া শিখাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া নিরুপমা রমানাথের সহিত গুছাইয়া সব কথা বলিবে। নিরুপমা রাজী হইল না, তার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু শ্বাশুড়ি যখন বুঝাইয়া দিলেন, এ না করিলে তাহার অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই তখন অগত্যা সে রাজী হইল। একটা কি অজানিত হর্ষ তার মন তোলপাড় করিয়া তুলিল।

রমানাথ অনেক রাত অবধি জাগিয়া কবিতা লিখিত, কাজেই নিরুপমা যখন তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল তখনও সে

জাগিয়াছিল। নিরুপমা একটা কোণ খুঁজিয়া, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সে কি করিবে একটা মতিস্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার মনে কেমন একটা লজ্জামিশ্রিত ভয় ক্রীড়া করিতেছিল।

কবিতার রসভঙ্গ হইবে বলিয়া রমানাথ দরজার শব্দ লক্ষ্য করিল না। কড়িকাঠ পানে চাহিয়া তখন সে ছন্দের একটা মিল খুঁজিতেছিল। উপরে চাহিয়া চাহিয়া নীরস ইটসুরকির অন্তস্তল ভেদ করিয়াও যখন একটা মনোমত মিল মিলিল না তখন তাহার হতাশ দৃষ্টি নিরুপমার উপর পড়িল; দেখিল, ঘরের যে কোনটায় একরাশ অন্ধকার জড় হইয়া আছে, সেই খানে কে দাঁড়াইয়া। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া চিনিল নিরুপমা।

নিরুপমার কথা মনে হইবা মাত্র তাহার হৃদয়ে একসঙ্গে শতবৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। সে কবিতার তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের বেদনা কতকটা চাপা দিয়াছিল, সে কতকটা আত্মহারাও হইয়াছিল, কিন্তু নিরুপমার দর্শনে তাহার কষ্টস্রোত উথলিয়া উঠিল, মনে একটা দারুণ ক্রোধের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই পরিচয় জানাইয়া রমানাথ কর্কশ স্বরে নিরুপমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তুমি আমার ঘরে কেন?"

এই কঠোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্বাশুড়ি যাহা শিখাইয়াছিলেন, নিরুপমার সব গোলমাল হইয়া গেল। স্বামীর নিকট এই তার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ! নিরুপমা নিরুত্তর হইল।

রমানাথ অধিকতর কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"যাও আমার সম্মুখ থেকে—আমার ভালবাসা তোমার প্রাপ্য নয়।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রমানাথ ভাবিল, সে আজ খুব জিতিয়াছে। নিরুপমাকে সে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিয়াছে—সে যে তাহার নিকট ন্যায্য প্রাপ্য প্রণয় দাবী করিতে আসিয়াছিল, তাহা নিরুপমার জন্য নহে।

কিন্তু রমানাথ আজ অন্ধ—তাহার সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোথা? তাই সে বুঝিল না, নিরুপমা পূজার সম্ভার লইয়া আসিয়াছিল, অশ্রুসিক্ত করে সে তাহার সাধের অর্ঘ্যডালা ফিরাইয়া লইয়া গেল!

রমানাথের কঠোর প্রত্যাখ্যান বাক্য সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও নিরুপমার অন্তরে তাহা বজ্রেরও অধিক বাজিল। এতটা কঠোর অনাদর সে স্বামীর নিকট আশা করে নাই। তাহার অন্তরস্থ পঞ্জরগুলি যেন এক এক করিয়া চূর্ণ হইতে লাগিল, হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন শত ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল। নিরুপমা বাটির ভিতর ফিরিয়া আর অশ্রু রুদ্ধ করিতে পারিল না, চক্ষু ফাটিয়া হৃদয় হইতে জলের উৎস উছলিয়া উঠিল।

পর দিন নিরুপমা আর হরিহরের বাটীতে থাকিতে চাহিল না। বিস্তর কান্নাকাটী করিল। অগত্যা হরিহর তাহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নিরুপমার যাইবার সময় হরিহরও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

(৬)

হরিহর অনেকবার আনিতে লোক পাঠাইলেও নিরুপমা আজ দুই বৎসরের মধ্যে আর একবারও শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করে নাই। নিরুপমার প্রতি স্নেহ হরিহরের বৃদ্ধি পাইয়াছিল বই কমে নাই, তাই তিনি বিশ্বম্ভরের বাটী গিয়া নিরুপমাকে প্রায়ই দেখিয়া আসিতেন। নিরুপমা দিন দিন শীর্ণ হইতেছিল। হরিহর বড়ই চিন্তিত হইলেন।

নিরুপমা চলিয়া যাইবার পর রমানাথের কাণে আর বড় স্ত্রীর কথা উঠে নাই। সে তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল।

রমানাথ বেশ স্থির হইয়া বসিয়া কবিতা লিখিত, আপনার কষ্টকে সে কতকটা শান্ত করিয়াও আনিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার

সুহৃদগণ তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ভাগ্যের দাসত্ব স্বীকার করা পুরুষের কাজ নহে, পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্যকে আপন অভিমতে পরিচালনা করাই কর্ত্তব্য। রমানাথ নিজের ভ্রম বুঝিল, দেখিল সে ইচ্ছা করিলেই আপনার জীবন নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে, অভীপ্সিত সুখশান্তিকে আবার ডাকিয়া আনিতে পারে। বুদ্ধিমান বন্ধুগণ তাহার চক্ষুদান করিয়াছে বলিয়া রমানাথ তাহাদের মনে মনে বিস্তর প্রশংসা করিল।

কন্যাদায়ক্ষিপ্ত পিতার অভাব নাই। রমানাথের ইচ্ছা প্রকাশ হইবামাত্রই অনূঢ়া কন্যার বন্যা আসিয়া দেখা দিল। রমানাথ নিজে কন্যা পসন্দ করিতে গিয়া দেখিল, তাহার সেই মানসী সুন্দরীর সন্ধান কোথাও মিলিতেছেনা। এখন তাহার অনেকটা জ্ঞান হইয়াছিল যে কল্পনার ছবিটী বাস্তবে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠে না। তাই গুটিকয়েক কন্যা দেখিবার পর একজন বালিকাকে তাহার নেহাৎ অপসন্দ হইল না। তথনও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল; অবশেষে নিরুপায় হইয়া এই ভাবিয়া প্রবোধ মানিল যে, নিরুপমার তুলনায় এ বালিকা অপ্সরা।

হরিহরের কাণে একথা উঠিল। তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একদিন না একদিন নিরুপমার অদৃষ্ট ফিরিবে, এখন তাঁহার সে আশাও ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া নিরস্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু রমানাথ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। হরিহর তখন রাগিয়া উঠিলেন;—"বলিলেন, এ বিবাহ আমি কিছুতেই হইতে দিব না।"

যেটা খুব বেগবান্, তার সমুখে একটা বাধা পড়িলেই তার বেগ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। রমানাথ পিতার মুখের উপর স্পষ্টই বলিল সে এ বিবাহ করিবেই।

হরিহর জানিতেন পুত্র ইদানী বড়ই অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাই তিনি আর কিছু না বলিয়া রাগে ক্ষোভে, বায়ুপরিবর্ত্তনের অছিলা করিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া গেলেন। পত্নীও সঙ্গিনী হইলেন।

ইহাতে রমানাথের সুবিধা বই কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। বিবাহের সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইল। রমানাথের মনে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুখবিজড়িত চিত্র প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; ভাবিল, সত্যই সে এতদিন ভ্রমান্ধকারে ডুবিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিল।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনের খপর আত্মীয়-স্বজনের কাছে কখন চাপা থাকে না। রমানাথের বিবাহের সংবাদ নিরুপমার কাণে পৌঁছিতে বড় বেশি বিলম্ব হইল না। পিতৃগৃহে আসিয়া নিরুপমার শরীরের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ হয় এতদিনে তাহা শেস সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এতবড় দুঃসংবাদটা তাহার নিকট যমদূতের মত আসিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমা এতদিন যে একটা ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল আজ তাহাও ধূলিলুণ্ঠিত হইল।

(৭)

আজ রমানাথ নববধূকে লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। ছয় বৎসর আগে সে যখন নিরুপমাকে লইয়া এমনি করিয়াই এবাটীতে বরবেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার ও নিরুপমার অভ্যর্থনার জন্য কতই না শঙ্খধ্বনি কতই হুলুধ্বনি হইয়াছিল, শত শত উন্মুখ দৃষ্টি তাহাকে নূতন করিয়া দেখিবার জন্য সাগ্রহে তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ সেখানে কেহই নাই। রমানাথের ইহাতে একটু দুঃখ হইল, অভিমানও হইল। বিনা অভ্যর্থনায় সে আপনি পাল্কী হইতে নামিয়া আসিল, একেবারে বাড়ির ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। গ্রামসম্পর্কে রমানাথের এক পিসি হন তিনিই সেখানে ছিলেন, রমানাথকে দেখিয়া তিনি একা বধূ আনিতে ছুটিলেন।

পিতামাতার স্নেহ-হীনতার কথা তখন রমানাথের মনে জাগিতে-ছিল, তাহাতে মনে একটা জ্বালা অনুভব করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, একটা কুরূপা বালিকার অভ্যর্থনায় এত লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার এই সুন্দরী পত্নীকে আহ্বান করিতে বিশ্বসংসারে কি একটা জনপ্রাণীও নাই। রমানাথের হৃদয়ে একটা আকুলতার ঝড় বহিয়া উঠিল।

পিসিমা কোলে করিয়া নববধূকে আনিলেন, রমানাথ তখনও অন্যমনস্কে ভাবিতেছিল, পিসিমার কণ্ঠস্বরে চমক্‌ ভাঙ্গিল।

নববধূকে বরণ করিবার জন্য এক পিসিমা ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। পিসিমা একাই বরণ শেষ করিলেন, বধূ দেখিবার জন্য ঘোমটা উন্মোচন করিলেন। বধূর মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়া পিসিমার গাত্র শিহরিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এ কি বউ আন্‌লি রমা!"

রমানাথ তখন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। নবপরিণীতা ভার্য্যার রূপমাধুরী যেন সহস্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আত্মহারা হইয়া সেই রূপসুধা পান করিতেছিল। হঠাৎ পিসিমার শিহরিত কণ্ঠস্বর তাহার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। রমানাথ স্ত্রীর আবরণ-মুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পিসিমা সেই মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন,—"নিরু যে আমার সোনার চাঁদ ছিল।"

রমানাথ ভাল করিয়া চোখ মুছিল। বার বার চোখ মুছিল; মনে করিল, এ স্বপ্ন না প্রহেলিকা, কোথায় তার পত্নী? এ কোন রাক্ষসী! শতবার সহস্রবার চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াও নবনীতা স্ত্রীর মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের এক অণুও খুঁজিয়া পাইল না। রমানাথ সে মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিল, সে ভয়ঙ্কর প্রতারিত হইয়াছে।

আর একবার ভাল করিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল, বুঝিল সে যে কন্যাকে দেখিয়াছিল এ সে নয়। পূর্ব্বরাত্রের শুভদর্শনের কথাটা মনে জাগিয়া উঠিল। এখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল কাল রাত্রে বধূর সমস্ত মুখটা কেন ময়ূরভূষণ দ্বারা আবৃত করা ছিল।

রমানাথের হৃদয়ের মধ্যে শ্মশানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পিসি-মার সেই বাক্য—"নিরু আমার সোণার চাঁদ!" বায়ুতরঙ্গে আলোড়িত হইতেছিল। সেই বাক্য বজ্রশব্দের মত রমানাথের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল—নিরু আমার সোণার চাঁদ!

রমানাথ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, উন্মাদের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নিরুপমার হৃদয়ে সে যে দারুণ শেল দিয়াছিল এ যেন তাহারই প্রতিশোধ বলিয়া মনে হইল; চোখের সম্মুখে যেন দেখিল, নিরুপমা তাহার ব্যাকুলতায় কঠোর বিদ্রূপ হাস্য করিতেছে। "ক্ষমা কর" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রমানাথ দৌড়িল, একেবারে নিরুপমার বাটীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য।

আকুল ক্রন্দন স্বরে বিশ্বম্ভরের বাটী তখন কম্পিত হইতেছিল। সে তাহা লক্ষ্য করিল না। একেবারে বাটীর ভিতর দৌড়িল; উন্মাদের মত আকুলকণ্ঠে "নিরু নিরু" বলিয়া এঘর ওঘর ছুটিয়া নিরুর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু কোথায় নিরু? নিরুর দেহ তখন চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত—পবন সে ধূলা উড়াইতেছে।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

বাহুবলে বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী ইতিহাসে পুরাতন নহে; কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিক শক্তিমন্ত্রে যত শীঘ্র ভারতে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিল, যত শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা সহজে মিলে না। আবিষ্কারের সম্মোহন যুগে পর্ত্তুগাল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নৃপতির আশীর্ব্বাদ ও উন্মত্ত আকাঙ্খা বহিয়া চঞ্চল চরণে চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। মুসলমান বাণিজ্য-জগৎ কেন, ভূমধ্যসাগরের বৈদেশিক বণিককুল পর্য্যন্ত একদিন বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, লোহিত সাগরের পথ অবরুদ্ধ করিয়া মহাশক্তিশালী ফিরিঙ্গি বণিক ভীষণ অগ্নি-পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে—সে পর্ব্বতের নিকট দিয়া প্রতীচ্যের সুবর্ণ-পথে অগ্রসর হওয়া আর অসম্ভব!

সেকালে ভারতের পণ্যসম্ভার বহিয়া মুরগণ ক্যাম্বে, অরমাজ, এডেন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। অরমাজ হইতে ভারতের পণ্য বোঝাই করিয়া বৈদেশিকগণ পারস্য উপসাগরের পথে বসোরা নগরে লইয়া যাইত। বসোরা তখন মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী। সেই সকল পণ্যসম্ভার বসোরা হইতে স্থলপথে আরমেনিয়া, ট্রেবিজণ্ড, তাতার, আলেপো, ডামস্কাস্ এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বেরুট-বন্দরে আনীত হইত। য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তথায় জাহাজ লইয়া অপেক্ষা করিত; কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা ভারতের পণ্য আপন আপন দেশে লইয়া যাইত। যে সকল সামগ্রী এডেনে আনীত হইত, সে সমুদয় লোহিত-সাগরের পথে টোরো কিম্বা সুয়েজের নিকট দিয়া, কাইরো নগরের পাদতল স্পর্শ করিয়া, নীল নদী বাহিয়া আলেক্-

জান্দ্রিয়ায় আসিত। আলেক্জান্দ্রিয়া তখন একটী অতি বৃহৎ বন্দর। আলেক্জান্দ্রিয়ায় তখন বৈদেশিক বণিকগণ ভারতের সুবর্ণ আহরণ করিবার জন্য মহোল্লাসে অপেক্ষা করিত; সুতরাং বেরুটের মত আলেকজান্দ্রিয়া হইতেও ভারতের পণ্যসম্ভার সুদূর য়ুরোপে নীত হইয়া উচ্চদরে বিক্রীত হইত।

কোন ফিরিঙ্গি বণিক তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে বাস করিত না। যে যখন কার্য্যভার লইয়া, সৈন্যসামন্তসহ লুণ্ঠন ব্যপদেশে ভারতে আসিত সে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়াই দুই চারি বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। স্বদেশভক্ত ফিরিঙ্গি-সর্দ্দারদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাই পুনঃ পুনঃ পর্ত্তুগাল রাজসিংহাসনতলে আবেদন জানাইত,—ভারতবর্ষে একজন স্থায়ী প্রবাসী ফিরিঙ্গি নায়েব প্রয়োজন, নতুবা সকল শ্রম পণ্ড হইবে। রাজা ইমানুয়েল তখন মালাবার তীরে যাহাতে পর্ত্তুগালের শক্তি অক্ষয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠায় ভেনেসিয়গণ সত্বরই বুঝিতে পারিল যে, প্রতিদিন তাহাদিগের বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতেছে—বহুদিন পূর্ব্বে তাহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিল এখন তাহা সত্যই ঘটিতে যাইতেছে। তাহারা আর নীরব থাকিতে পারিল না; কাইরো রাজসিংহাসনও তখন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিঙ্গির আধিপত্য ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে দেখিয়া সুলতান অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, কারণ ভারতের অর্থেই তখন মিসরের সমৃদ্ধি। ফিরিঙ্গি বণিক অকস্মাৎ সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া ভীষণ দৈত্যের ন্যায় সেই সমৃদ্ধি গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সুলতানের সিংহাসন যে নিতান্ত বিচলিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। সুলতান তাই আপন্নিবারণ-মানসে ঘোষণা করিলেন, ভারতের বাণিজ্যে তাঁহারই একমাত্র অধিকার। এ অধিকার এক দিনের নহে, ইহা চিরাগত। পর্ত্তুগাল

নিতান্ত অন্যায় করিয়া সেই চিরাগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পর্ত্তুগাল যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়,তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে প্রতিশোধ লইবেন—মিসর, সিরিয়া এবং পেলেস্তাইনবাসী যীশুসেবকের শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হইবে—সুলতান একজনকেও ক্ষমা করিবেন না! শুধু ইহাই নহে প্রতিহিংসার ভীষণ অনলে খ্রীষ্টরাজ্যের উপাসনা মন্দির ভস্মীভূত হইয়া যাইবে—জেরুজালেমের পুণ্যমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সুলতান মিসরের শক্তি, মিসরের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন!

ভীষণ প্রতিশোধের কথা শুনিয়া ধর্ম্মাচার্য্য পোপ বিচলিত হইলেন। কিন্তু ইমানুয়েল অবিচলিত চিত্তে অসংশয়ে পোপের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন—নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। তিনি আরও কহিলেন, পর্ত্তুগালের শক্তি পোপের অধিকার ও রাজ্য বিস্তারের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছে—যীশুর মহিমা প্রচারের জন্যই পর্ত্তুগাল-বীরগণ স্বজন, স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, অকূল বারিধি অতিক্রম করিয়া প্রতীচ্যে প্রাণান্তকারী অভিযানে নিযুক্ত হইয়াছেন—প্রতীচ্যে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠার আর অন্য কোন কারণ নাই; সুতরাং মুসলমানশক্তি বিলুপ্ত করিবার আয়োজন হইতে ইমানুয়েল কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না!

সুলতান বুঝিলেন, তাঁহার ভয়প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ভেনেসিয়গণ রণতরী নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করিলেন। মিসরে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠ ছিল না দেখিয়া তাহারা ডালমেটিয়া কানন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সুলতানের আদেশে বহু বৃদ্ধ দৃঢ় মহামহীরুহ-গুলি কর্ত্তিত হইয়া ডালমেটিয়ার ঘনবনশ্রেণী সুপরিস্কৃত হইয়া উঠিল। সুনিপুণ সূত্রধরগণ আসিয়া সুয়েজ-বন্দরে অস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিল, কারণ কর্ত্তিত বৃক্ষগুলি জলে ভাসাইয়া সুয়েজ-বন্দরে আনীত

হইতেছিল। অবশেষে সুদক্ষ কারিকরগণ তথায় অতি বৃহৎ দ্বাদশখানি রণতরী নির্ম্মাণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নরপতি ইমানুয়েলও সুলতান-সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অসীম উৎসাহ এবং কর্ম্ম-কুশলতা, মুসলমান বাণিজ্য চিরবিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইমানুয়েল দেখিলেন এডেন, অরমাজ এবং মালাক্কা আয়ত্ত করিতে না পারিলে মুসলমান বাণিজ্যের খরস্রোত রুদ্ধ করিবার আর অন্য উপায় নাই। কালবিলম্ব না করিয়া ডম ফ্রান্সিসকো ডা আলমিডা নামক জনৈক ফিরিঙ্গি, পর্ত্তুগাল সিংহাসনের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইলেন। অঞ্জদ্বীপ, কানানোর, কোচিন এবং কুইলনে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মানের জন্য আদিষ্ট হইয়া আলমিডা পঞ্চবিংশ অর্ণবযান এবং ১৫০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে লিসবন নগর পরিত্যাগ করিলেন।

আলমিডাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টান রাজপ্রতিনিধি। ভারতে পর্ত্তুগালের শক্তি সংস্থাপনের জন্য তিনিই স্থায়ীরূপে ভারতবর্ষে থাকিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আলমিডা কুইলোয়া দ্বীপে একটী সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, মোম্বাসার উপকূলে তদ্দেশ-বাসীদিগের বাণিজ্য তরণীগুলি বিদগ্ধ করিয়া আলমিডা মোম্বাসা আয়ত্ত করিলেন। হর্ম্ম্যাদিশোভিত সুন্দর নগর অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া আলমিডার প্রতাপ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল—ফিরিঙ্গির আক্রমণে রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভারত মহাসাগরে প্রহরী কার্য্যের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গি নিযুক্ত করিয়া, আলমিডা ফিরিঙ্গির বাণিজ্যকেন্দ্র সুরক্ষিত করিলেন এবং মালাবার তীরে ইসলামের বাণিজ্য ধ্বংশ ও ভারত মহাসাগরে ইসলামশক্তির চিরবিসর্জ্জনের জন্য অকুতোভয়ে অগ্রসর হইলেন।

অঞ্জদ্বীপে ফিরিঙ্গির দুর্গ বিনির্ম্মিত হইল। অনরে ফিরিঙ্গি পদধুলি

পড়িতে না পড়িতেই গ্রাম জনপদসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তীরস্থ বাণিজ্য তরণীগুলির অগ্নিসংকার সম্পন্ন হইল। অনরের ধ্বংশসাধন করিয়া আলমিডা কানানোরে উপস্থিত হইলেন; তথায় অবিলম্বে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ রাও তখন দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তিনি পর্ত্তুগালের প্রতিনিধি আলমিডার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নরপতি ইমানুয়েলের পুত্রের সহিত আপন দুহিতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে তুষ্ট করিলেন।

ফিরিঙ্গিগণ ক্রমে ক্রমে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতেছে দেখিয়া কালিকাটের জামোরিণ সুলতানের সহিত সম্মিলিত হইলেন, সঙ্গোপনে সমরায়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? জনৈক প্রবাসী ইংরাজ, মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে জামোরিণের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সমরের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিল—জামোরিণের কপাল পুড়িল! অবশেষে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল শক্তি জামোরিণের প্রাণপণ উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিল! ফিরিঙ্গির প্রতাপ তিন সহস্র মুসলমানের শোণিতে সাগর সলিল রঞ্জিত করিয়া বিজয় গৌরবে গর্জ্জিতে লাগিল! মালাবারে মুসলমান বাণিজ্য অচিরে বিলুপ্ত হইয়া গেল—ক্রুশ, কোরাণকে পরাজিত করিয়া অবশেষে চারি বৎসরের মধ্যে শোণিতশিক্ত ভূমিতলে আত্ম-সংস্থাপন করিল।

মূরবণিকগণ, আলমিডার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আশায়, সাহসে বুক বাঁধিয়া মালাবার তীরে বাণিজ্য করিতেছিল; পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া তাহারা হয়ত তখন পর্য্যন্তও মনে করিয়াছিল ফিরিঙ্গি দস্যু যেমন মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠনব্যপদেশে এ দেশে আসে, মধ্যে মধ্যে তেমনি আসিবে, সুতরাং দস্যুর ভয়ে চিররত্নের আকর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন নিষ্প্রয়োজন, বরং তাহাদিগের আগমন কালে কিছুদিন সতর্ক থাকিলেই

চলিবে। কিন্তু এখন তাহারা বুঝিল, ফিরিঙ্গি কেবল লুণ্ঠন করিতে চাহে না, ফিরিঙ্গি মুসলমানদিগকে উৎখাত করিতে চাহে—ফিরিঙ্গির বজ্র ক্ষণিকের নহে, উহা বিধাতার অভিশাপের মত এখন হইতে চিরদিন তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে—সে অভিশাপ-অনল হইতে মুসলমান বণিকের আর নিস্তার নাই! এখন তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল মালাবার তীর তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক—মালাবারে আর অবাধ মুসলমান বাণিজ্য বিস্তারের আশা ভরসা নাই; বরং মালাবার তীরের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে ফিরিঙ্গির হস্তে লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, বিদগ্ধ হইতে হইবে। তাই তাহারা ভারতোপকূলের বহুদূর দিয়া সুমাত্রা এবং মালাক্কায় গমনাগমন করিতে লাগিল। রাজপ্রতিনিধি আলমিডার সমুদ্র-প্রহরীগণ এই সংবাদ জানিবামাত্র রণতরী লইয়া মুরদিগকে ধ্বংশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

কমলা যখন শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন মহা বিপদের মূলে, মহা সর্ব্বনাশের মধ্যেও সৌভাগ্য নিহিত থাকে। ফিরিঙ্গিগণ যখন মুরদিগের সুমাত্রা ও মালাক্কার বাণিজ্যপথ পর্য্যন্ত চিররুদ্ধ করিবার মানসে অগ্রসর হইল, তখন অকস্মাৎ একটী বিষম ঝড় তাহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া বিপথে লইয়া গেল। তুফানে, তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরিঙ্গির তরণীসমূহ একদিন সুপ্রভাতে এক অনাবিষ্কৃত নবীন তীরে আসিয়া লাগিল। ফিরিঙ্গিরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানেও মুরবণিকের অভাব নাই।

সুদূর সিংহল পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিদস্যুর অভ্যুত্থান দেখিয়া ভীত মুরগণ কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনে তাহাদিগকে প্রীত করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সিংহলাধিপতি কাল-বিলম্ব না করিয়া ফিরিঙ্গির সহিত সখ্যতা করিলেন। এই অভিনব দৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক আবিষ্কারে উল্লসিত হইয়া আলমিডা-তনয় ডন

লরেঙ্কো কলোম্বো নগরে ক্রূশ স্থাপনপূর্ব্বক কোচিনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কুলইকান নরপতির বীরজ্ঞম্ নগর বিদগ্ধ করিয়া লরেঙ্কো ফিরিঙ্গি শোণিতপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

জামোরিণ প্রতিদিন হতবল হইতেছিলেন। তাঁহার যে অপ্রমেয় শক্তি একদিন দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য শাসন করিত, তাহা এখন প্রতিনিয়ত শিথিল ও হীনবীর্য্য হইতেছে দেখিয়া তিনি ডিউ নগরের অধিপতি মালিকআজকে ফিরিঙ্গিনিধনে নিমন্ত্রণ করিলেন। ফিরিঙ্গির সহিত শক্তিপরীক্ষায় বিজয়লাভ দুরাশা জ্ঞান করিয়া মালিকআজ জামোরিণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে আল্‌মিডার কর্ণকুহরে সেই গুপ্ত আমন্ত্রণবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ডন লরেঙ্কো অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। গন্‌কালো ভাজ্ নামক জনৈক ফিরিঙ্গি সেনাপতি রাজপ্রতিনিধি-তনয়ের সাহায্যার্থ কানানোর হইতে অগ্রসর হইল।

আল্‌মিডার কর্ম্মকুশলতায়, সেই সময়ে কোচিন এবং কানানোর প্রবাসী ফিরিঙ্গি সর্দ্দারদিগের কোনও একজনের স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র ভিন্ন এতদ্দেশবাসী কোন বণিক, জাহাজ লইয়া গমনাগমন করিতে পারিত না। কানানোর হইতে যাত্রা করিয়া গন্‌কালো দেখিলেন অদূরে সমুদ্রমধ্যে একখানি মুরবাণিজ্যতরণী পণ্য লইয়া চলিয়াছে। গন্‌কালো তাহার গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করিলেন। ভীত নাবিকগণ সসম্ভ্রমে দেখাইল, তাহারা বিনা অনুমতি-পত্রে যাইতেছে না, লরেঙ্কো ডা ব্রিটা নামক ফিরিঙ্গি সর্দ্দারের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র তাহাদিগের সহিত আছে। গন্‌কালো সেই অনুমতিপত্র দেখিলেন, দেখিয়া মনে করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই জাল—কখনই সত্য নহে! মুহূর্ত্ত মধ্যে মুরবণিকগণ বন্দীকৃত হইল। তিনি বন্দীকৃত নির্দ্দোষী মুরবণিকদিগকে অবিলম্বে জাহাজের পাল দিয়া জড়াইয়া উত্তমরূপে সেলাই করিলেন—যেন কোন প্রকারে কেহ পলাইয়া না যায়! তারপর, চলোর্ম্মিময় সাগরের অনন্ত গর্ভে হতভাগ্যদিগকে নিক্ষেপ

করিয়া আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন !! এ অত্যাচারে ফিরিঙ্গির দেবতাও বোধ হয় গন্‌কালোরদিকে চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

অন্ধ, অবিশ্বাসী এদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে, তাহাদিগের নির্য্যাতনে ফিরিঙ্গিগণ কোন দোষ দেখিতে পাইত না! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেনাপতি ক্যাব্রেল যখন ১২০০ শত সৈন্য লইয়া ভারতযাত্রা করেন, তখন ইমানুয়েল তাঁহার সহিত ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই; ফিরিঙ্গির ভারতাভিযান তখন জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধরূপে পরিচিত হইয়াছিল! পর্ত্তুগালাধাপ, ক্যাব্রেলকে বলিয়া দিয়াছিলেন—'মুসলমান এবং পৌত্তলিকদিগকে সত্য সত্য অসিহস্তে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, পুরোহিতদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক তরবারির প্রয়োগে অবিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিবার চেষ্টা করেন। যদি ধর্ম্মহীনগণ তাহাতে যীশুর সেবক হইতে না চাহে, যদি বাণিজ্যের পথ রোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে অনল ও কৃপাণের সাহায্য গ্রহণ করিও—ধর্ম্মহীনদিগের সহিত কালসমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিও।'

এখন পর্য্যন্তও সুসভ্য সুমার্জ্জিত য়ুরোপখণ্ডে "ধর্ম্মের একতায় অধিকারের সমতা" এই মন্ত্র সঞ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়; তাই ক্রূশের যাহা অধিকারভুক্ত, ক্রূশের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহারা তাহার ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পায় না। তাই ক্রূশে আস্থাশূন্য অন্ধদিগের সহিত "ধর্ম্মযুদ্ধে" প্রবৃত্ত হইয়া ফিরিঙ্গিগণ নিষ্ঠুরতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল! সংখ্যায় ফিরিঙ্গিগণ কম ছিল বলিয়া আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধার জন্য তাহারা ফিরিঙ্গিদ্রোহীদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে ক্রটী করিত না।

ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার পদার্পণের পর হইতেই ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার, ফিরিঙ্গির শাসন ও রাজ্যবিস্তার নীতির অবশ্য প্রতিপাল্য অংশস্বরূপ হইয়াছিল। তাই সেকালের ফিরিঙ্গিগণ দস্যুর মত, পিশাচের মত ঘোরতর অত্যাচার করিয়া ইতিহাসে রাক্ষস-

তুল্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল ; তাই যুদ্ধান্তে বন্দীকৃত শত্রুদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুররূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া অবশেষে হত্যা করিতে, শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের মুখে বন্দীদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিয়া শত্রুর সংবর্দ্ধনা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না—তাহাদিগের পাষাণ কঠিন হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিত না।

ফিরিঙ্গি সৈনিকগণ তাই লুণ্ঠনব্যাপৃত হইয়া, সময় সংক্ষেপ করিবার মানসে ভীতা, কম্পিতা, রোরুদ্যমানা স্খলিতবেশা আলুলায়িতকেশা প্রাণভয়ে পলায়নপরা রমণীদিগের বাহুযুগল, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি নির্ম্মম হৃদয়ে ছেদন করিয়া কাঞ্চনবলয় অথবা স্বর্ণ কর্ণাভরণ অকুণ্ঠিত চিত্তে অপহরণ করিত। একজনের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে অথবা এক-জনের অঙ্গ হইতে টানিয়া খুলিয়া লইতে যে সময় আবশ্যক, কৃপাণের সাহায্যে লইলে সেই সময়মধ্যে যে পাঁচজনের অলঙ্কার সংগৃহীত হয়!

যে ভারতের ধনরত্নলোভে সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া ফিরিঙ্গিগণ এদেশে আসিয়া প্রথমে রাজদ্বারে ও সাধারণ্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই দেশবাসীদিগের পরিচয় প্রদান কালে সেকালের ফিরিঙ্গি সর্দ্দারগণ পর্ত্তুগাল সিংহাসনতলে লিখিয়াছিলেন—'ইহারা কুক্কুর বিশেষ !! ইহাদিগের জন্য শাণিত কৃপাণ ব্যবস্থা !!'

ইতিহাস অতীতের জীবন্ত সাক্ষী। সেই ইতিহাস কম্পিত কণ্ঠে কম্পিতহৃদয়ে ফিরিঙ্গির পাশবিক অত্যাচার কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। এখন পর্য্যন্তও ডিউ উপনিবেশের সন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ মিটি "শবদ্বীপ" নামে সুপরিচিত হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচার কাহিনীর প্রমাণ দিতেছে। মিটি কি চিরদিনই শবের দ্বীপই ছিল? তাহা নহে; ১৫৩৫ সালে যখন ফিরিঙ্গিবণিক মিটিদ্বীপ অধিকার করিল তখনও সেখানে গৃহে গৃহে বালক-যুবক-রমণীর হাস্য-কোলাহল সুখসম্পদের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। বিজয়ী দস্যুগণ তথাকার সমুদয় অধিবাসীবৃন্দকে নিহত করিয়া তপ্ত শোণিত-সিক্ত ভূমিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে মহাগৌরবে মিটিদ্বীপের নামকরণ করিয়াছিল—"শবদ্বীপ" !!

ডিউ উপনিবেশের দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজিও মনে হয়, ফিরিঙ্গির রক্তরঞ্জিত উদ্যত কৃপাণ দেখিয়া কত ক্ষুদ্র শিশু প্রাণভয়ে রোদন করিতে করিতে তাহারই চরণতলে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু নির্দ্দয় ফিরিঙ্গি, শিশুর শোণিতে নিজ পাদমূল রঞ্জিত করিয়া পরক্ষণেই হয়ত তাহার জননীর হৃদয়ে সেই শাণিত কৃপাণই আমূল বসাইয়া দিয়াছিল! ডিউ উপনিবেশ অবরোধের সরকারী কাগজপত্রেই প্রকাশ—"আমরা কাহাকেও ছাড়ি নাই, এমন কি রমণী ও শিশু সকলকেই বধ করিয়াছি"।

এত শোণিতের উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে সিংহাসন একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কৃপাণাঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে হতভাগ্যেরা যখন ভগবানের দিকে শেষবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করে, তখন তাঁহার রাজসিংহাসনও টলিয়া উঠে। তাঁহার অভিসম্পাত তখন আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না—বৃশ্চিক দংশনে সহসা জাগ্রত হইয়া দুস্কৃতির পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার অদৃষ্টস্বরূপ বিনিদ্র নয়নে ফিরিতে থাকে—তাহাকে দগ্ধ না করিয়া সে অভিশাপ শিখা আর ফিরে না। ভারতের ফিরিঙ্গি-প্রতিষ্ঠাও তাই অধিক দিন টেকে নাই। ফিরিঙ্গি সুধু যে প্রতিহিংসাসাধনের নিমিত্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; ফিরিঙ্গির অত্যাচার প্রতিহিংসামূলক নহে, উহা অত্যাচারের জন্য অত্যাচার—হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই হত্যা—শোণিতের লোভেই শোণিতপাত! ঐতিহাসিক হণ্টার তাই বলিয়াছেন:—

"The Portuguese cruelties were deliberate, rather than vindictive."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

চিত হইয়াছিল ; তাই যুদ্ধান্তে বন্দীকৃত শত্রুদিগকে
প নিস্পিষ্ট করিয়া অবশেষে হত্যা করিতে, শত্রুদিগকে
মানের মুখে বন্দীদিগকে চুর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া
র্দ্ধনা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না—তাহাদিগের
য় কোন আঘাত লাগিত না।

কগণ তাই লুণ্ঠনব্যাপৃত হইয়া, সময় সংক্ষেপ করিবার
ম্পিতা, রোরুদ্যমানা স্খলিতবেশা আলুলায়িতকেশা
ণীদিগের বাহুযুগল, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি নির্ম্মম
অথবা স্বর্ণ কর্ণাভরণ অকুণ্ঠিত চিত্তে
ট হইতে চাহিয়া লইতে অথবা এক-
লইতে যে সময় আবশ্যক, কৃপাণের
াঁচজনের অলঙ্কার সংগৃহীত হয়!
সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া
ম রাজদ্বারে ও সাধারণ্যে সম্মানিত
পরিচয় প্রদান কালে সেকালের
হাসনতলে লিখিয়াছিলেন—'ইহারা
ণিত কৃপাণ ব্যবস্থা!!'
সাক্ষী। সেই ইতিহাস কম্পিত কণ্ঠে
ক অত্যাচার কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।
এখন
বেশের সন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ মিটি "শবদ্বীপ"
নামে সুপরিচ... ফিরিঙ্গির অত্যাচার কাহিনীর প্রমাণ দিতেছে।
মিটি কি চিরদি... নই শবের দ্বীপই ছিল? তাহা নহে; ১৫৩৫ সালে
যখন ফিরিঙ্গিবণি...ক মিটিদ্বীপ অধিকার করিল তখনও সেখানে গৃহে গৃহে
বালক-যুবক-রমণী...র হাস্য-কোলাহল সুখসম্পদের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান
ছিল। বিজয়ী দস্যু...গণ তথাকার সমুদয় অধিবাসীবৃন্দকে নিহত করিয়া
তপ্ত শোণিত-সিক্ত ভূ...মিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে মহাগৌরবে
মিটিদ্বীপের নামকরণ ক...রিয়াছিল—"শবদ্বীপ"!!

ডিউ উপনিবেশের দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজিও মনে হয়, ফিরিঙ্গির রক্তরঞ্জিত উদ্যত কৃপাণ দেখিয়া কত ক্ষুদ্র শিশু প্রাণভয়ে রোদন করিতে করিতে তাহারই চরণতলে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু নির্দ্দয় ফিরিঙ্গি, শিশুর শোণিতে নিজ পাদমূল রঞ্জিত করিয়া পরক্ষণেই হয়ত তাহার জননীর হৃদয়ে সেই শাণিত কৃপাণই আমূল বসাইয়া দিয়াছিল! ডিউ উপনিবেশ অবরোধের সরকারী কাগজপত্রেই প্রকাশ—"আমরা কাহাকেও ছাড়ি নাই, এমন কি রমণী ও শিশু সকলকেই বধ করিয়াছি"।

এত শোণিতের উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে সিংহাসন একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কৃপাণাঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে হতভাগ্যেরা যখন ভগবানের দিকে শেষবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করে, তখন তাঁহার রাজসিংহাসনও টলিয়া উঠে। তাঁহার অভিসম্পাত তখন আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না—বৃশ্চিক দংশনে সহসা জাগ্রত হইয়া দুস্কৃতির পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার অদৃষ্টস্বরূপ বিনিদ্র নয়নে ফিরিতে থাকে—তাহাকে দগ্ধ না করিয়া সে অভিশাপ শিখা আর ফিরে না। ভারতের ফিরিঙ্গি-প্রতিষ্ঠাও তাই অধিক দিন টেকে নাই। ফিরিঙ্গি সুধু যে প্রতিহিংসাসাধনের নিমিত্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; ফিরিঙ্গির অত্যাচার প্রতিহিংসামূলক নহে, উহা অত্যাচারের জন্য অত্যাচার—হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই হত্যা—শোণিতের লোভেই শোণিতপাত! ঐতিহাসিক হণ্টার তাই বলিয়াছেনঃ—

"The Portuguese cruelties were deliberate, rather than vindictive."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

অনন্ত জীবন।

(২)

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবদেহের এককোষিক (Unicellular) অবস্থায় মৃত্যু জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পরে, জীবদেহ বহুকোষিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন কোষসমূহের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষা হইল না; যদি তখন বংশ-রক্ষণ কার্য্যেও অত্যন্ত অধিক শক্তি ব্যয়িত হইতে আরম্ভ হইল। এই অবসরে মৃত্যু জীব রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিল।

কিন্তু জীব-কোষের স্বভাব অবগত না হইলে মৃত্যুর স্বরূপ বুঝা যাইবে না। জীব কোষ যে জীব-বস্তুতে (protoplasm) পূর্ণ থাকে, উহা অতীব ক্ষণস্থায়ী ; অম্লযান, উদযান, অঙ্গার, যবক্ষারযান প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। এই সকল উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে জীব-বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঐ সংযোগ সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে।*

জীব-বস্তু (Protoplasm) এইরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় উপাদান পদার্থে পরিণত হয়। পরে, জীবকোষ বাহ্য জগৎ হইতে যে সকল আহার্য্য বস্তু নিজ অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তাহাই উক্ত বিশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জীব-বস্তু গঠন করে। স্বভাব শক্তিতেই জীব-বস্তু বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল, আহার্য্য দ্বারা তাহা পুনর্গঠিত হইল। যদ্যপি এইরূপে পুনর্গঠিত না হইত তাহা হইলে জীব-বস্তু আর জৈব-ভাবে থাকিতে পারিত না। জীবোৎপত্তিও অসম্ভব হইত।

---

* Living matter is extremely unstable, and this is no doubt largely due to the nitrogen invariably present in considerable quantities. Davis Text book of Biology.

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে, এককোষিক জীবের কোষও যে প্রকার, বহুকোষিক জীবের দেহস্থ প্রত্যেক কোষও প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারই। কিন্তু উভয়ের কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য এই যে, এককোষিক জীবদেহের একটী কোষ ঐ জীবের আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করে ; আর বহুকোষিক জীবগণের কোষ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমে যে সকল শারীর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা সকলে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করে না ; উহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ইহার ফলে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের এবং কোষের শক্তি সমভাবে ব্যয়িত ও পুষ্ট হয় না। অর্থাৎ বহুকোষিক জীবের কোষসমূহে শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এক যন্ত্রের ক্লান্তি বা বিকৃতি বশতঃ সমষ্টি ক্রিয়ার বা জীবন ব্যাপারের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কারণ, বিভিন্ন কোষের ব্যষ্টি-শক্তি সমবেত হইয়া এক সমষ্টি-শক্তিতে পরিণত হয় ; সুতরাং ব্যষ্টি-শক্তির কোন অংশের বিকৃতিতে সমষ্টি কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এইরূপে উহাদিগের দেহে পীড়ার আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে সমষ্টি শক্তির অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের বিঘ্ন হইতে থাকে ; তখন জীব-বস্তু যে পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়, আর সেই পরিমাণে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্য মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন শক্তির অপেক্ষা ন্যূন থাকে, ততদিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ; যখন ঐ দুই শক্তি সমভাবে থাকে তখন দেহের সাম্যাবস্থা ; কিন্তু যে সময় বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন-শক্তি অপেক্ষা প্রবল হয় তখনই মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়।

এককোষিক দেহ, কোষের বিভাগ দ্বারাই বহুকোষিকে পরিণত হয়। আবার কোষস্থ জীব-বস্তু বিভাগ ও পুনর্গঠন দ্বারাই জীবন-ব্যাপার সম্পন্ন করে। এই বিভাগ-কার্য্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হওয়ায় যে ক্লান্তি উপস্থিত হয় তাহা আর কালক্রমে (বহুকোষিক জীবদেহে)

আহার গ্রহণ দ্বারা সম্যক পূরণ হয় না। জীব-দেহে মৃত্যু আসিবা ইহাই প্রথম কারণ।

কিন্তু পুনর্গঠন কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার আরও অনেক কার আছে। যেমন, বাহ্য জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটসমূহ (bacilli) ইহারা নানারূপে অপর জীব দেহের গঠনকার্য্যের বিঘ্ন এবং বিশ্লেষ কার্য্যের সাহায্য করে। তজ্জন্য অসংখ্য পীড়া জীবদেহে সমুদ্ভূত হয় ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালী চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং এস্থলে বিবেচ্য নহে। ফলতঃ জীব-বস্তু স্বভাববশে বিশ্লিষ্ট হইলে উহা পুনর্গঠন কার্য্যে যে কোন হেতুতেই বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তাহাতে মৃত্যুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্দেহ নাই। এই সকল হেতুমধ্যে একটী জীবতত্ত্বের বিশেষরূপে আলোচ্য। তাহা কতকটা এইরূপ :— বহুকোষিকে জীবগণের শারীর যন্ত্রসকল যখন বিভিন্নরূপে গঠিত হই এবং উহাদিগের কার্য্যও বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন উহাদিগে সকলের আয়তন এবং ক্রিয়া সম-অনুপাতে হইল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই অবস্থায় উহাদিগের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই কিন্তু এই বলিলেই নির্দ্দোষ হইত যে, বহুকোষিক জীবগণের দেহ যন্ত্রাদি সম-অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় না এবং উহাদিগের ক্রিয়াও স অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যদিও ইহাদিগের শারীর যন্ত্র সকলে পৃথক পৃথক শক্তিতেই সমষ্টি জীবনী-শক্তি কার্য্য পর্য্যালোচনা ক তথাপি ঐ সকল বিভিন্ন যন্ত্রের আয়তন ও কার্য্যের মধ্যে অল্লাধি অসমতা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কোন কোন য সমষ্টি-জীবনের অধিক প্রয়োজনীয়, আর কোন কোন যন্ত্র অ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই ভাবে কালক্রমে কোন কোন যন্ত্র জীব ব্যাপারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য যন্ত্র একর অনাবশ্যকীয় হয়। শেষোক্তগুলি যদিও জীবন-কার্য্যের সাহায্য ক

তথাপি উহারা অনেক সময় স্বয়ং বিকৃত হইয়া সমষ্টি-শক্তিকে (জীবনকে) উৎপীড়িত করিয়া তুলে। ইহারা মিত্ররূপী শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণই হইতেছে, শারীর যন্ত্র সকলের অসম-অনুপাতে বৃদ্ধি এবং অসম-অনুপাতে ক্রিয়া-বিকাশ। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া গতায়াত করে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, হৃৎপিণ্ডের আয়তন ও শিরা ধমনীর আয়তনের তারতম্য অনুসারে রক্তের পরিমাণের ও বেগের ন্যূনাধিক্য হইবে। শৈশবে যে আয়তনের হৃৎপিণ্ড হইতে যে আয়তনের শিরা ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, যৌবনের শেষ ভাগে হৃৎপিণ্ড, শীরা ধমনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তন হওয়ায়, এবং শীরা ধমনীর প্রণালী সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত না হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় রক্তসঞ্চালন হইতে পারে না। রক্তের পরিমাণ ও বেগ উভয়ই অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ এতদুভয়ই মন্দীভূত হয়। তজ্জন্য এই সময় হইতে দেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, এবং জরা ও অবশেষে মৃত্যু প্রবেশ লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।*

বস্তুতঃ নানা কারণে বহুকোষিক জীবদেহে কোষসকলের মধ্যে শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। উহাদিগের ক্রিয়াবস্ত সম-অনুপাত রক্ষা হয় নাই। একের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অন্যকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং, জীব-বস্তুর স্বাভাবিক বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার পর গঠনকার্য্য পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হইতেছে না। ইহার ফলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, এককোষিক জীবের বংশ-রক্ষক কোষ ভিন্ন

* ১৯০৩ সালের নেচার (Nature) নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

স্বতন্ত্র দেহ নাই ; সুতরাং মৃত্যুও নাই। আর বহুকোষিক জীবগণের পৃথক দেহ থাকায় মৃত্যু তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। দেহ মরে, যদিও মরিবার পূর্ব্বে অংশবিশেষকে পৃথকভাবে রাখিয়া গিয়া দেহ স্বীয় অমরত্ব রক্ষা করে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দেহের তিরোভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, আর উহা দেহজ কারণসম্ভূত ; অর্থাৎ দেহরক্ষক কোষের স্বভাবধর্ম্মবশতঃ। সুতরাং যতদিন দেহ আছে ততদিন মৃত্যুও অনিবার্য্য।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে দেহকে (অন্ততঃ স্থূল দেহকে) চিরস্থায়ী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। এই দেহের নাশ যেন সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মৃত্যুরও নাশ অবশ্যই হইবে। জীবদেহের এক কোষিক অবস্থায় মৃত্যু ছিলনা, বহুকোষিক অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আবার দেহের নাশ সহ মৃত্যুও পলায়ন করিবে।

কথাটা অন্যভাবে দেখা যাউক। জীবন ব্যাপার, দেহরক্ষক কোষের ও বংশরক্ষক কোষের ক্রিয়াসকলের সমষ্টি ফল। যদি ক খ রেখা সমষ্টি জীবন হয়, তবে ক গ দেহ-

রক্ষক ক্রিয়া, এবং গ খ বংশরক্ষক ক্রিয়া। কগ+গখ=কখ। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় যে ক গ যত বড় হইবে, গ খ তত ছোট হইবে ; আর ক গ যত ছোট হইবে, গ খ তত বড় হইবে। অর্থাৎ ক খ—এর সহিত গ খ—এর বিপরীত অনুপাত ; একের হ্রাসই অপরের বৃদ্ধি এবং একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস।* তবেই ক গ অত্যন্ত বৃদ্ধি

* Geddes and Thomson—The Evolution of Sex p. 288. উল্লিখিত রেখাচিত্র উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দারা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

প্রাপ্ত হইলে গ খ নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবে। যখন ক গ অনন্ত, তখন গ খ নাই।* অর্থাৎ যখন দেহ এবং তাহার ক্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত, তখন জীবে ও ব্রহ্মে অপ্রভেদ। সুতরাং জন্ম, জরা, মৃত্যুও নাই। দেহ এবং দৈহিক ক্রিয়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেহীর প্রযত্নসাধ্য। আবার পক্ষান্তরে, খ গ—এর অনন্ত বৃদ্ধিতে গ ক নাই। অর্থাৎ বংশরক্ষক ক্রিয়ার অনন্ত বৃদ্ধিতে দেহও নাই। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম জীবগণের বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক। যদি মানব দেহ (স্থূল দেহ) কালক্রমে তিরোহিত হয় তবে মানবও অনন্তে পরিণত; অনন্তে লীন হইবে। তখন মানবও ব্রহ্মের সহিত অপ্রভেদ হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি, একদিকে যেমন দেহ অনন্ত, অন্যদিকে তেমনই জৈবশক্তি অথবা জীবাত্মাও অনন্ত। উভয়েরই শেষ পরিণাম অনন্তে।

শ্রীশশধর রায়।

* If genesis vary inversely as individuation, it must be suppressed altogether if individuation becomes complete.

The Evolution of Sex p. 298.

জীবন-সঙ্গীত।*

বলোনা কাতর স্বরে না করি বিচার,
জীবন স্বপন সম, মায়ার সংসার ;
সেই আত্মা মৃতপ্রায় ঘুমায়ে যে রয়—
ভাসা ভাসা দেখ যাহা বস্তুত তা নয়।

সংসার কর্ম্মের স্থান, সত্য এ জীবন,
শেষগতি নহে তার শমন সদন ;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান,
আত্মা কিন্তু অনশ্বর নহে তাহে আন।

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বার বার,
বিষয় সম্ভোগ নহে জীবনের সার,
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর,
ধর্ম্ম পথে চলে যেই—ধন্য সেই নর!

চকিত তাড়িত সম জীবন চঞ্চল,
প্রস্তুত হইয়া থাক লইয়া সম্বল ;
ধুক্ ধুক্ করি করি চলেছে হৃদয়,
শমনের ডাকে যেন শমন-আলয়।

সংসারের রণক্ষেত্রে পূর্ণ কলকলে,
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে ;

* The Psalm of life.

হয়োনা মেষের সম নিঃসত্ত্ব পরাণ,
যুঝ রণে প্রাণপণে বীরের সমান।

ভবিষ্য সুখের আশে হয়োনা চঞ্চল,
গতানুশোচনা ছাড় নাহি তাহে ফল ;
বর্ত্তমান কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর,
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর।

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে ;
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়,
কালের সাগর তটে পদচিহ্ন চয়—

যেই চিহ্ন ধরি কোন ভগ্নতরি জন,
দুস্তর ভবসাগরে করি সন্তরণ,
ভগণ হৃদয় অতি, বিগত ভরসা,
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

উঠ তবে, লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর,
হবার যা হোক্ তাহা নাহি তাহে ডর ;
প্রাণপণে সাধ যাহা জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি—এই সার মর্ম্ম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাম্রলিপ্তী।

(আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।)

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তাম্রলিপ্তী নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। অনন্ত নীল জলরাশি কল কল নিনাদে তরঙ্গ তুলিয়া সেই রাজ্যের কূলধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এক্ষণে একটী ক্ষুদ্র উপনগরে পরিণত হইয়াছে এবং উহা এক্ষণে তমলুক নামে খ্যাত। আর সে সমুদ্র নাই, সেই উত্তাল তরঙ্গমালাও নাই, সেই কল কল নিনাদও নাই; তৎপরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী রূপনারায়ণ ইহার পদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমুদ্র তমলুকের কূলপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা এক্ষণে এই স্থান হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্রমে ক্রমে পলি পড়িয়া সমুদ্র বুজিয়া যাওয়াতে এইরূপ দূরে সমুদ্র পিছাইয়া গিয়াছে।

তমলুক পুরাকালে বহুনামে অভিহিত হইত, যথা—তমোলিপ্তী (১) তমোলিপ্ত (২), তাম্রলিপ্ত (৩), তাম্রলিপ্তী (৪), তামলিপ্তং তামলিপ্তী তমালিকা (৫), দামলিপ্তং তমালিনী (৬) আবার জে, ডবলিউ, ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবের "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে "—In the writings of the Buddhists of Ceylon, the name appears as Tamolitti, corresponding to Tamluk of the present day." (৭)

(১) ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। (২) ইতি শব্দরত্নাবলীঃ। (৩) ইতি মহাভারতম্।
(৪) ইতি ভারতকোষঃ। (৫) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। (৬) ইতি হেমচন্দ্রঃ।
(৭) Vide Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, edited by J. W. Mc.Crindle M.A., p. 138.

ইহাতে জানা যাইতেছে যে তমোলিতি নামেও বর্ত্তমান তমলুক অভিহিত হইত। কোন কোন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার নাম তন্মোলিতি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে (৮)।

তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে যে বর্ত্তমান তমলুক নাম হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ আছে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে তমোলিপ্ত ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া, (৯) পণ্ডিত-প্রবর সংস্কৃত-ভাষাবিৎ উইল্‌সন সাহেবের "Sanskrit and English Dictionary"তেও তমালিকা, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ বর্ত্তমান তমলুক বা Modern Tumlook বলিয়া (১০); ও বাচস্পত্য নামক পুস্তকে তমালিকা, তমালিনী, ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১১)। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা রাম-কমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানেও তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২)।

আরও দেখা যায় যে, ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এল্, এল্, ডি; সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রাচীন ভারত-বর্ষের মানচিত্রে তাম্রলিপ্ত অথবা তমালিকা বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাণ হইতেও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আধুনিক তমলুক পুরাকালের সমৃদ্ধিশালী পুণ্যধাম

(৮) Vide S. Beal's Si-gu-ki, vol. ii., p. 200.
(৯) শব্দকল্পদ্রুমঃ, (পুনঃ প্রকাশিত) ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃঃ দেখ।
(১০) Vide Sanskrit and English Dictionary by H. H. Wilson, pp. 382, 383, 387 and 422.
(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃঃ দেখ।
(১২) সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫৮, ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃঃ দেখ।

মহানগরী তাম্রলিপ্তীর হীন পরিণতি ;—ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

" তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধনীতটে॥" (১৩)

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা নাম্নী দেবী বিরাজমানা ছিলেন। এখনও বর্গভীমা দেবী এখানে বিরাজিতা আছেন। তমলুক ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বর্গভীমা নাম্নী দেবী নাই। সুতরাং বর্ত্তমান তমলুক যে প্রাচীন কালের তাম্রলিপ্তী নগরীর হীন পরিণতি এবং আধুনিক তমলুক নাম যে পুরাকালের দামলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও উল্লেখ আছে যে, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা নাম্নী দেবী বিরাজমানা। তাহাতে লিখিত আছে ঃ—

" গোকুলে গোমতী নামা, . তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।" (১৪)

তাম্রলিপ্তী যে কত কালের নগরী তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত ও বহু-পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় যে, ইহা বহুকালের প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

" জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতো হি চারুণঃ।
সমুদ্র প্রান্তভূমৌচ নিমগ্নশ্চাতি মোহিতঃ॥
অরুণাখ্যা সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্ত মতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ॥" (১৫)

(১৩) ভবিষ্য পুরাণম্—ব্রহ্মখণ্ডম্, দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।
(১৪) প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দ্বিতীয় খণ্ড ; ৭ ও ৩০ পৃঃ দেখ।
(১৫) দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।

বিশ্বকোষপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু উপরিলিখিত শ্লোকদ্বয়ের টীকা করিয়া লিখিয়াছেন, "যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" (১৬)

আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাম্রলিপ্ত নামক এই স্থানের কোন রাজার নামানুসারে এই স্থলের নামকরণ হইয়াছে। তাম্রলিপ্ত নামক এই স্থলে একজন যে রাজা ছিলেন তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। সেই পর্ব্বে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপংবীরঃ বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যোজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তশ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামপি পঞ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাঞ্চৈব বিজিগ্যে ভারতর্ষভ॥" (১৭)

(১৬) বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃঃ দেখ।
(১৭) মহাভারতম্, সভাপর্ব্বম্, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায়েন প্রকাশিতম্। সভাপর্ব্বানি দিগ্বিজয় পর্ব্বানি ভীম দিগ্বিজয়ে ; ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ; ৭৩ পৃঃ দেখ। এবং বাবু উমাচরণ অধিকারী কৃত "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামক পুস্তকের ৬ পৃঃ দেখ।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপে উল্লিখিত শ্লোক গুলির অনুবাদ করিয়াছেন :—"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধিশ্বরদিগকে ও সুম্ভদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর-কূলবাসী-ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (১৮)

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তাম্রলিপ্তীর রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় গিয়াছিলেন, ও তথায় তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞেও তাম্রলিপ্তীর রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠে বোধ হয় যে, পুরাকালে তাম্রলিপ্তা একটী সমৃদ্ধিশালী, বিশেষ গণনীয় স্থান ছিল। (১৯)

তাম্রলিপ্তীর চতুঃসীমার বিশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দুই একখানি সংস্কৃত ভৌগলিক পুস্তকে ইহার সীমার বিষয় কিছু কিছু লিখিত আছে। কিন্তু, কোন পুস্তকে ইহার চতুঃসীমার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

"* * তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্র তট পুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি।" (২০)

জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার "Ancient Geography of India" নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্তীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

(১৮) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব; ৪১ ও ৪২ পৃঃ দেখ।

(১৯) মহাভারতম্, আদিপর্ব্বম্;—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েন প্রকাশিতম্; ৪৮২-৮৩ পৃঃ দেখ, এবং ঐ মহাভারতের সভাপর্ব্ব, ১২৪ পৃঃ দেখ।

(২০) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায় দেখ।

"Tamralipti—Country lying to the westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north." (২১)

অর্থাৎ যে ভূভাগ হুগলী-নদীর পশ্চিমদিক হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাই তাম্রলিপ্তী দেশ।

এক্ষণে তাম্রলিপ্তীর তিনদিকের সীমা পাওয়া গেল। ক্যানিংহাম সাহেবের কথানুসারে ইহার পূর্ব্বে হুগলী নদী ও উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্না ছিল তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। আরও আমরা জানি যে ইহার দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত শ্লোকে তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ছাড়া রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়ও ইহা যে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল তাহা লিখিত আছে।

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk. (২২)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "কলিঙ্গের সীমা নিরূপণ" নামক প্রবন্ধে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে "কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যের অন্তঃর্গত ছিল" (২৩)। এতদ্দারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, তাম্রলিপ্তীর পূর্ব্বে হুগলী নদী, উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্না, পশ্চিমে কলিঙ্গদেশ ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল।

(২১). Vide General Cunningham's "Ancient Geography of India," p. 504.

(২২) Vide Journal of the Royal Asiatic Society; Vol. V., p. 135.

(২৩) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ দেখ।

Documents Geographiques নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্তী রাজ্যের পরিধির বিষয় লিখিত রহিয়াছে :—

"The kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference." (২৪)

কিন্তু, আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার "History of civilization in Ancient India" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বলেন :

"The country (*i.e.*, Tamralipti) was 300 miles in circuit." (২৫)

যাহাই হউক পুরাকালে তাম্রলিপ্তী যে বিস্তৃত রাজ্য ছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তী গঙ্গানদীর মোহনার নিকট সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সেই মোহনায় পলি পড়িয়া চর হয়; সেই চর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া প্রায় ৫০।৬০ মাইল সমুদ্র বুজাইয়া ফেলিয়া ইহাকে একটী "অন্তর্দ্দেশিক নগর" (inland town) করিয়া ফেলিয়াছে। তাই কোন সংস্কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন :—

"তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসতূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ ॥"

বিশ্বকোষে, উপরের শ্লোকের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অথবা রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।" (২৬)

(২৪) Vide Documents Geographiques, p. 450.
(২৫) Vide History of Civilization in Ancient India by R. C. Dutt, C. I. E. Vol. III., p. 105.
(২৬) বিশ্বকোষ, ৬৯০ পৃঃ দেখ।

তাম্রলিপ্তীতে কোন্ বংশীয় রাজাগণ সর্ব্বপ্রথম রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং কোন্ মহাত্মা এখানকার প্রথম রাজা ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ, বহুপূর্ব্বে ইহা কোন ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যান্তঃর্গত ছিল এবং তিনি এখানে আধিপত্য করিতেন। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে তিন বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করিয়াছেন দেখা যায়। প্রথম ময়ূরবংশীয় রাজাগণ, তৎপরে রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ?) রাজাগণ এবং ইহার পরে কৈবর্ত্তবংশীয় রাজাগণ এখানে আধিপত্য করেন। কৈবর্ত্তবংশীয় রাজাগণের উত্তরাধিকারীগণ এখনও এখানকার সামান্য ভূস্বামী। ময়ূরবংশীয় রাজা মোটে চারিজন মাত্র ছিলেন, যথা :—(১) ময়ূরধ্বজ, (২) তাম্রধ্বজ, (৩) হংসধ্বজ ও (৪) গড়ুরধ্বজ। এই চারিজন ক্রমান্বয়ে এই স্থলের রাজা হন। বোধ হয় ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্ততঃ ইহাঁদের নাম দেখিয়া সেইরূপ অনুমান হয়। ইহাদের পরই রায়বংশীয় (গঙ্গাবংশীয় ?) রাজাগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ময়ূরবংশীয় রাজা গড়ুরধ্বজের পরই বিদ্যাধর রায় এই স্থলের রাজা হন। এখানকার রাজবাটীতে যে বংশ-তালিকা আছে তৎদৃষ্টে দেখা যায় যে, বিদ্যাধর রায় ময়ূরবংশোদ্ভব এবং এখানকার বর্ত্তমান রাজাও আপনাকে সেই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। এক্ষণে ইহা সত্য কিনা দেখা যাউক।

পঞ্চম রাজা বিদ্যাধর রায়ের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই স্থলের রাজা হন :—

(৬) নীলকণ্ঠ রায়। (৭) জগদীশ রায়।
(৮) চন্দ্রশেখর রায়। (৯) বীরকিশোর রায়।
(১০) গোবিন্দদেব রায়। (১১) যাদবেন্দ্র রায়।
(১২) হরিদেব রায়। (১৩) বিশ্বেশ্বর রায়।
(১৪) নৃসিংহ রায়। (১৫) শম্ভুচন্দ্র রায়।

(১৬) দ্বীপচন্দ্র রায়। (১৭) দিব্যসিংহ রায়।
(১৮) বীরভদ্র রায়। (১৯) লক্ষ্মণসেন রায়।
(২০) রামচন্দ্র রায়। (২১) পদ্মলোচন রায়।
(২২) কৃষ্ণচন্দ্র রায়। (২৩) গোলোকনারায়ণ রায়।
(২৪) বলিনারায়ণ রায়। (২৫) কৌশিকনারায়ণ রায়।
(২৬) অজিতনারায়ণ রায়। (২৭) কৃষ্ণকিশোর রায়।
(২৮) চন্দ্রার্ক রায়। (২৯) মৌঞ্জীকিশোর রায়।
(৩০) মার্কণ্ডকিশোর রায়। (৩১) ইন্দ্রমণি রায়।
(৩২) সুধন্বা রায়। (৩৩) মৃগয়া দেই।
(৩৪) রায়ভানু রায়। (৩৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
(৩৬) চন্দ্রা দেই। (৩৭) কালুভুঞ্যা রায়।
(৩৮) ধাঙ্গড়ভুঞ্যা রায়। (৩৯) মুরারিভুঞ্যা রায়।
(৪০) হরবাবভুঞ্যা রায়। (৪১) ভাঙ্গড়ভুঞ্যা রায়।
(৪২) ধিতাইভুঞ্যা রায়। (৪৩) জগন্নাথভুঞ্যা রায়।
(৪৪) যদুনাথভুঞ্যা রায়। (৪৫) রামভুঞ্যা রায়।
(৪৬) শ্রীমন্ত রায়। (৪৭) ত্রিলোচন রায়।
(৪৮) কেশব রায়। (৪৯) হরি রায়।
(৫০) রাম রায়। (৫১) নরনারায়ণ রায়।
(৫২) কৃপানারায়ণ রায়। (৫৩) কমলনারায়ণ রায়।
(৫৪) আনন্দনারায়ণ রায়। (৫৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
(৫৬) উপেন্দ্রনারায়ণ রায়। (৫৭) নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
(৫৮) সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরধ্বজ প্রভৃতি চারি জন মাত্র রাজাকে অনেকে ময়ূরবংশীয় বলেন; এবং ইহা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। কারণ তাঁহাদের নামগুলি প্রাচীন কালের নাম। পঞ্চম রাজার নাম বিদ্যাধর

রায়; ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নাম। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, ময়ূরবংশের লোপ হইলে এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়) রাজাগণ এখানে রাজত্ব করেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভুঞ্যা; ইহা সম্পূর্ণ অনার্য্য নাম। ইহঁার পূর্ব্বে অপর কোন রাজার এইরূপ অনার্য্য নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হয় যে, ইনি কৈবর্ত্তবংশীয়, ইনিও রায় উপাধি ধারণ করেন। বোধ হয়, নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ করিবার জন্যই ইনি এইরূপ করিয়াছিলেন। কালুভুঞ্যার পর ধাঙ্গড়-ভুঞ্যা, মুরারিভুঞ্যা, হরবাবভুঞ্যা, ভাঙ্গড়ভুঞ্যা প্রভৃতি অনার্য্য নামীয় রাজাগণ এখানে রাজত্ব করেন। ইহঁারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহঁাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণও সেই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইহঁারা ভুঞ্যা পদবীটী একবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, ইহঁারা ও ইহঁাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ যে কৈবর্ত্ত এবং ইহঁাদের সহিত যে ময়ূরবংশের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা নিশ্চিত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত মহাশয় "তমোলুকের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে এইখানকার রাজাগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:

* * প্রথম চারিজন রাজার নাম প্রাচীন নাম—অর্থাৎ মহাভারতীয় কালের নাম ও তৎপরে বিদ্যাধর প্রভৃতি নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, গরুড়ধ্বজের পরে তদ্বংশের লোপ হওয়ায় এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ?) রাজাগণ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভুঞ্যা। ইনিই প্রথম কৈবর্ত্ত রাজা। কেননা—ইহঁার পূর্ব্বে এরূপ একটীও অনার্য্য নাম কোন রাজার

দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ইহার পরে ধাঙ্গড়ভুঞ্যা, ভাঙ্গড়-ভুঞ্যা প্রভৃতি নাম দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, আর্য্যবংশীয় রাজাদিগের লোপ হইলে সমুদ্রগামী-জাতীয় লোকেরা ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া এই কালুভুঞ্যাকে রাজা করেন। কালুভুঞ্যা উড়িষ্যা হইতে আসেন এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে জ্ঞাতি-কুটুম্ব চারিশত ঘর আনিয়া তাঁহাদিগকে ভূম্যাদি দিয়া এখানে বাস করান। ইহাঁদের আচার, ব্যবহার ও ভাষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বে উড়িষ্যার সহিত যে ইহাঁদের বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কতকগুলি উৎকল ভাষার ভাব (idiom) প্রচলিত আছে। ইহাঁদের পদবী দেখিলে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে উৎকলবাসী ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়; যথা—মহাপাত্র; বিহারা বা বেরা, জানা, মহান্তি বা মাইতি, পট্টনায়েক, সামন্ত, সাঁতরী ইত্যাদি। এ সমস্তই উড়িয়া পদবী।" (২৭)

কিন্তু শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে সুধন্বা রায় পর্য্যন্ত যে ৩২ জন রাজার নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেক অব্যবহিত পিতা পুত্র সম্বন্ধ।···· এই বত্রিশ জন রাজাই ময়ূরবংশীয়। ৩৩শ রাজ্ঞী মৃগয়া দেই ময়ূর বংশীয় সর্ব্বশেষ কন্যা। ইনি সুধন্বা রায়ের ভগিনী। জমিন ভঞ্জ রায়ের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁরই গর্ভে ৩৪শ সংখ্যক রাজা রায় ভানু রায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব রাজ্য এখন ময়ূর বংশের দৌহিত্র বংশে গেল। নিম্নের বংশাবলী দৃষ্টে, বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশধরগণ কোন বংশোদ্ভব, প্রতীয়মান হইবে।" (২৮)

(২৭) নব্যভারত ষোড়য খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা দেখ।
(২৮) ঐ সপ্তদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা দেখ।

রাণী মৃগয়া দেই—
(কুঙার জমিন ভঞ্জ রায় স্বামী)
|
রায় ভানু রায়...ময়ূর বংশের দৌহিত্র বংশ।
|
লক্ষ্মী নারায়ণ রায়।
|
চন্দ্রা দেই।
(নিঃশঙ্ক রায় স্বামী)
|
কালু ভুঞ্যা রায়...ময়ূর বংশের প্রদৌহিত্র বংশ।
|
ধাঙ্গড় ভুঞ্যা রায়।
|
মুরারি ভুঞ্যা রায়।
|
হরবাব ভুঞ্যা রায়।
|
ভাঙ্গড় ভুঞ্যা রায়।
|
(৮১০ সাল অর্থাৎ ১৪০৩ খৃঃ অঃ পরলোকগত)
|
ধিতাই ভুঞ্যা রায় (৮৬১ সাল পর্য্যন্ত)
|
জগন্নাথ ভুঞ্যা রায় (৯০১ সাল পর্য্যন্ত)
|
যদুনাথ ভুঞ্যা রায় (৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত)
|
রাম ভুঞ্যা রায় (৯৭০ সাল পর্য্যন্ত)

ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার প্রতিবাদকারী সুদর্শন বাবু—ইহাঁদের দুই জনের মতামত ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, ত্রৈলোক্য বাবুর কথাই (অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কৈবর্ত্ত, এই কথা) সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও যখন দেখা যায় যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও বলেন যে, ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ এইস্থলে প্রধান হইয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ত্রৈলোক্য বাবুর কথা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

"The sea-going castes asserted their supremacy, and on the extinction of the peacock dynasty placed a line of Kaibarttas on the throne." (২৯)

এখানে "Sea-going castes" বলিতে হণ্টার সাহেব যে কৈবর্ত্তগণকে বুঝিতেছেন তাহা তাঁহার "Antiquities of Orissa" নামক পুস্তক পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরন্তু ইংরাজি ১৮৯১ সালের মেদিনীপুর জেলার সেন্সস-বিবরণী পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ এখানকার রাজা হন এবং তাঁহাদেরই বংশধর এখানকার বর্ত্তমান রাজা। District Census Report এ এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"27. The Kaibarttas are probably an offshoot of a race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or Gogri, in Oudh, and there is still a caste in that part of the country known by the name of

(২৯) Vide Antiquities of Orissa, by Sir W. H. Hunter. LL. D., K. C. S. I., Vol. I., p. 310.

Kanra, the descendants of those, whom their forefathers left behind them, when they migrated southwards. When the forefathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the eastern limit of the tableland in Central India, and tradition assigns their first appearance in the District of Midnapore to Sakabda 822. They were led by five chiefs, who established as many separate chieftaincies in the district :—

1. Tamralipta or Tamluk.
2. Balisita.
3. Turka.
4. Sujamutha.
5. Kutabpur." (৩০)

উপরের প্রমাণাদি দর্শনে বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে কৈবর্ত্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এবং ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে, ইহাঁরা ময়ূরবংশোদ্ভব নহেন। ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্ত বংশীয় রাজাগণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ইহাঁদেরই বংশধর এখনও এখানে রাজা নামে অভিহিত হন।

পূর্ব্বে পঞ্চচত্বারিংশৎ রাজা রাম ভুঞ্যা রায়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহাঁর সময় হইতেই রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। রাম ভুঞ্যা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া ছোট ছোট তালুকে পরিণত করিলেন। রাজ্যেরও অবনতি আরম্ভ হইল।

(৩০) Vide Census Report of the District of Midnapur for the year 1891, p. 4.

এইরূপে রাজ্য বহু অংশে বিভক্ত হওয়াতেই তমলুক রাজগণের অবনতি হইল। প্রকৃত রাজা কেহই রহিল না; সকলেই এক এক খণ্ড জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকলহ বাধিয়া উঠিল ইহার ফল এই হইল যে, পুরাকালের তাম্রলিপ্তী রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন হইল।

পঞ্চ-চত্বারিংশৎ রাজা রামভুঞ্যা রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়। ইহার বার আনা অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ত রায় এবং চারি অংশ কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিলোচন রায় অধিকার করেন। ত্রিলোচন রায় নিঃসন্তান পরলোক গত হইলে পর, শ্রীমন্ত রায়ই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী হন। ইঁহার সাত পুত্র ছিল। শ্রীমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব রায় নামমাত্র রাজা থাকেন। ইনি মোগল বাদশাহকে নিয়ম মত কর দিতে পারিতেন না বলিয়া ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হন ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরি রায় তৎপদে অভিষিক্ত হন (৩১)। হরি রায় ১৬৫৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সাড়ে দশ আনা ভাগ তৎপুত্র রাম রায় আর সাড়ে পাঁচ আনা ভাগ তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র প্রতাপ নারায়ণ (গন্তির রায়ের পুত্র) প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে নরনারায়ণই সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। নরনারায়ণের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃপানারায়ণ, পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ১৭৫২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে মোগল সরকারকে যথারীতি কর দিতে অক্ষম হওয়াতে রাজ্যচ্যুত হন এবং খোজা মির্জা দেদার আলি

(৩১) Vide A Statistical Account of Bengal, Vol. III.

বেগ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। দেদার আলিবেগ নবাব উপাধি ধারণ করেন ও এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমান রাজবাটীর পশ্চিম পার্শ্বে এখনও তাঁহার কবর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর মহরমের সময় স্থানীয় মুসলমানগণ তথায় নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করে। পূর্ব্বে অতি বৃষ্টি হইলে চতুঃপার্শ্বের পরগণা হইতে জল আসিয়া তমলুক পরগণা ভাসাইয়া দিত, তাহাতে বহু অনিষ্ঠ হইত; তজ্জন্য নবাবসাহেব তমলুকের পশ্চিম সীমায় একটী প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। অদ্যাপি সেই বাঁধ বিদ্যমান ও "খোজার বাঁধ" বলিয়া পরিচিত।

নবাব আলিবেগের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তমলুক পরগণা মোগল সরকারের হাতে ছিল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতিতাবস্থা। ইংরাজগণ ভারতে বাণিজ্যার্থে আসিয়া ক্রমে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষ করতলগত করিতেছিলেন। তখনকার বাঙ্গালার নবাব ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কোনই ক্ষমতা ছিল না। নামমাত্র তিনি নবাব ছিলেন। রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার ইংরাজগণের হস্তে ছিল। যখন বাঙ্গালা রাজ্যের এইরূপ অবস্থা তৎকালে তমলুক এখনকার রাজবংশের হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারী নন্দকুমার রায় ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়গণ বহু চেষ্টা করিয়া জমিদারী কমলনারায়ণের দুই রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে ফিরাইয়া দেওয়ান। ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ নন্দকুমারকে ছয় খানি ও গঙ্গাগোবিন্দকে আট খানি গ্রাম লিখিয়া পড়িয়া দান করেন। নন্দকুমারের তালুক বাসুদেবপুর ও গঙ্গাগোবিন্দের তালুক গোপালপুর বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত। (৩২)

(৩২) নব্যভারত, ষোড়শ অন্ত, অষ্টম সংখ্যা, ৪৪১—৪২ পৃঃ দেখ।

সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার পর রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার পুত্র ছিল। ইঁহাদের পুত্রগণ উভয়ে ॥/০ ও ।৶০ অংশে জমিদারী ভাগ করিয়া লন। পরে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে সন্তোষপ্রিয়ার পুত্র আনন্দ নারায়ণই সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হন। আনন্দ নারায়ণের দুই স্ত্রী ছিল। ইঁহাদের কাহারও সন্তানাদি না হওয়াতে জ্যেষ্ঠা রাণী শ্রীনারায়ণকে ও কনিষ্ঠা রাণী লক্ষ্মীনারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে শ্রীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তৎপরে লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত জমিদারী নিজ দখলে আনেন। ইহাতে জ্যেষ্ঠা রাণী (লক্ষ্মীনারায়ণের বিমাতা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন ও রুদ্রনারায়ণকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত জমিদারী নিজে একাই শাসন করেন। কিন্তু তৎপরে রুদ্রনারায়ণ সেই জমিদারীর অংশ দাবী করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে সেই আদালতের হুকুম মতে অর্দ্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন।

গৃহকলহ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ প্রায় সমস্ত জমিদারী হারাইয়াছেন। তাহার অধিকাংশ ভাগ মহিষাদলের রাজা এবং বাবু ননীগোপাল ও রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা দখল করিয়াছেন। এক্ষণে যৎসামান্য জমিদারী তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করিতেছেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনারায়ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। নরেন্দ্রনারায়ণের ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। এক্ষণে তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান আছেন। (ক্রমশঃ)

তেল, নুন, লকড়ি।

(৫)

বিলেতি জিনিষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য বিচার শেষ করে, এখন তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্ট স্কুলে পাঠান হয়, এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোন দাঁড়াবার স্থান না পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনায় "আমি বিশ্বাস করি"—এ কথার উপর যেমন আর কোন কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় "আমার চোখে সুন্দর লাগে" একথার উপরও তেমনি আর কোন কথা চলেনা। সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব, যিনি আর্ট জিনিষটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন নিজে তিনি তত বেশী বোঝেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবতঃ লোক ধর্ম্মজ্ঞ হতে পারে কিন্তু রূপসম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোক সৌন্দর্য্যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনও পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয় মানুষে তাই হাতে গড়ে, সেই গঠনকার্য্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যে সকল জিনিষ জীবনযাত্রার

পক্ষে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সে সকল জিনিষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টি-প্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্ত্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কাণে নয়। আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিম্বা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ, প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে, যে আর্টিষ্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে; আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখ-দুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর, একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি তার আর্টই আমাদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশী আর্টের চর্চ্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশী দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনিনে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়্তে বাঁদর গড়ে তাদেরই হস্ত-রচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে, সুখী না হই খুসি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলাম-চোর হওয়ায়, লজ্জা পাওয়া দূরে যাক্ আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্য্যাদা না বুঝিতে পারি তাহলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চ্চাও আমাদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন দেশের লোকের ভিতর পার্থক্য যতই থাকুক, মানুষে মানুষে প্রবৃত্তির,

বাসনার, মনোভাবের মিলও যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্চে প্রধানতঃ মানবপ্রকৃতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চির-নবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্ব-মানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশ-টুকু আর্ট সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পারিনে। বিদেশী লেখকের লেখনার পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক্, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হতে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই, এসিয়া, ইউরোপ নেই, এককথায় মনো-জগতের ভুগোল নেই। কিন্তু বাহ্যজগতে ঠিক তার উল্টো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হ'তে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং, স্বদেশের অধীনতা-পাশ মোচন কর্‌বার যো নেই। বিজ্ঞানের বিষয় ও বস্তু জগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন কেন না, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভিপ্রায় বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য্য নিত্য বৈচিত্র সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই সকল কারণে Newton এবং Darwin আমাদের জ্ঞাতি, Shakespeare এবং Milton আমাদের কুটুম্ব কিন্তু Raphael এবং Beethoven আমাদের পর। এই জন্যই জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করেছে, কিন্তু নিজের

আর্ট ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেন তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আছে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের "গা" থেকে "পা"র প্রভেদ ধর্‌তে পারেন না তিনিহ Beethovenএর প্রধান সমজদার এবং যিনি রংটা নীল কিম্বা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বল্‌তে অপারগ তিনিই Titian এর চিত্রে মুগ্ধ, তখন স্বজাতির ভবিষ্যতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে পড়্‌তে হয়। সে যাই হোক্‌, উপস্থিত প্রবন্ধে যে সকল বস্তুর আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছি, যথা ছিটের পরদা, ব্রাসল্‌সের কার্‌পেট, চিনের পুঁতুল, কাঁচের ফুলদানী কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল প্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিৎ। এর দুটি কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্যজগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণগন্ধশব্দস্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম aesthetical quality অর্থাৎ "রূপ" এবং মনের সেই সুখলাভ কর্‌বার ক্ষমতার নাম aesthetic faculty অর্থাৎ "রূপজ্ঞান"। ইংরাজ বিশেষ খোসাপুরু জাত। ভগবান ইংরাজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন, তার দেহ স্থূল, বুদ্ধি স্থূল ইন্দ্রিয়ও তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরাজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপমাত্রেই ইংরাজের চোখে কিম্বা কাণে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে আমাদের দেশের সচরাচর রঙ্গরেজের চোখ রং সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জ্জিত। এই

কারণেই বিলাতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায় গলদ্‌ থাক্‌বার দরুন ইংরাজের হাতগড়া জিনিষ প্রায়ই artistic হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও অপর আর একটি কারণে ইউরোপের art এর আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একভাবে দেখে, আর্ট অন্যভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনামুঠোকে ধূলামুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধূলামুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা প্রতিপত্তি লাভ করেছে কেননা, বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় তাই নয়—আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদ বাকী সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা—মন, প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোক, আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে ভ্রম করি, তাহলে মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য, এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখলে মনেরও জড়তা এসে পড়ে। কেবল মাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম্মের সখি হয়েই কলাবিদ্যা পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্য-বন্ধন ছিন্ন করে আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং জাতির জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা এই দুটি জীবজগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাহলে "আবশ্যকতার" অর্থ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য, আত্মার জন্য আবশ্যক তা আবশ্যকীয় বলে মনে হয় না। ইউরোপে Utilityর এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুন Utility এবং Beautyর বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিষ কদর্য্য,

এবং সুন্দর জিনিষ অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে। আহার, বিহার এখন ইউরোপে প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুন যে আর্টষ্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আস্‌তে চান্ তিনি আর্টকে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী ক'রে তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির এত ছড়া-ছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য খোঁজেন অবশিষ্ট নিরনব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুসি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগ-বিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠবে তার আর অশ্চর্য্য কি?—ইউরোপের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির করবে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আয়ত্ত্ব করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা সহজেই অভ্যাস করতে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক্ থেকে দেখা, দুর্‌বিনের উল্টো দিক থেকে দেখার তুল্য,—দ্রষ্টব্য পদার্থ আরও দূরে চ'লে যায়। কর্ত্তার দিক্ থেকে দেখাটাই ঠিক্ দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি তারই মর্ম্ম, তারই মর্য্যাদা আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝতে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্ত্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চ্চা করব বলে চিৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। জাতীয় আর্ট যে শ্রেণীরই হোক্ তার চর্চ্চায় আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরম লাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিষের স্বপক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চল্‌লেও চল্‌তে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হ'লে বিলাতি ছিট-ভক্ত হওয়া যায় না। আর যিনি আদর ক'রে দুয়ারে বিলাতি পর্দ্দা ঝোলান্ তাঁর পর্দ্দা-নশিন্ হওয়া উচিত।

(৫)

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য, সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে কারণও। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলেই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপিন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট-পেণ্টুলুন ধারণ। বিলাতের বেশ যে ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী সেকথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝতে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যমনারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের ঔৎকর্ষ লাভ করা যেত, তাহলেও নয় এই বোতাম-বক্‌লসের অধীনতা এবং বল্কল একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত কর্‌বার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই "কলার" ব্যবহার করেছেন তিনিই, কোন না কোন সময়ে রাগে, দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

ভূষণ বলে কিন্‌ব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁশি ॥

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট এবং কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য-মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ মনে হয় বিলাতি সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয় এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশতঃ পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটাও অত্যন্ত বলবতী।

কাষেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে অন্য রং সব ত্যাগ করে কাপড়ে ছাই, পাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি। আমাদের ধারণা, সব চাইতে সভ্য এবং সব চাইতে পুরুষালি রং হচ্ছে কালো রং। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্র বসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করজোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে "আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও"—আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমদ্গারির পুরস্কারস্বরূপ হ্যাট নামক কিম্ভুতকিমাকার এক চিজ, শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি। কিন্তু ইংরাজি পোষাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু তা নয়। বেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ কর্‌লে মানুষকে হয় ভণ্ড নয় ধার্ম্মিক হতে হয়; সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবি-আনার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ কর্‌লেই বঙ্গসন্তান, ইংরাজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর অধিকার লাভ কর্‌বার পূর্ব্বেই অত্যাচার কর্‌তে সুরু করেন। গলায় "টাই" বাঁধিলেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নী কৃতবাস হতে হবে, এ কথা আমি মানিনে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে "টাই" যে মনকে সাহেবি-আনার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন বয়কট করাই শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এসিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকান ওদের চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা,

ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দেই ওরা সেখানে কসে। ইংরাজরা মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরাজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গী অনুসরণ করে; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে থাকে ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। লজ্জা এদেশে স্ত্রীলোকের ভূষণ এবং অস্ত্র। সেইজন্য বঙ্গমহিলারা স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে বিদেশী সজ্জা গ্রহণ করেন নি। স্ত্রী-[illegible] সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরাজি বেশ উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ত, তাহলেও বিদেশী বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেতনা। ইংরাজি বেশের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত কর্‌বা মাত্রই, অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকও বেশের পক্ষসমর্থন কর্‌তে গিয়ে অতিশয় নির্ব্বোধের মত তর্ক করেন। এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায় সে সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন করেন তাঁরা তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নিজেরা সাফাই হতে চান, অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের, এ জাতির কিছু হবার নয়, সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকূল তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজ ত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে পারে, এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর হচ্ছে, এঁরা এ চান না যে, এঁরা চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন; এঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, ইংরাজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এঁদের আশা ছিল, যে ক্রমে গঙ্গাযমুনার মত সাদায়-কালোয় একদিন মিশে

যাবে। কিন্তু আজ বোধ হয় এঁদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেছি যে, প্রয়াগ পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমাদের কাশি প্রাপ্তি হবে।—

(৬)

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীর সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয় পেটে তত সয় না। আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশে আহার্য্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি কর্‌বার কোনই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তরকারি না পাইলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না তাহলে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোন দরকার নেই, আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তাহলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

আহারসম্বন্ধে বিধিনিষেধসম্বলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র গণ্য করে অমান্য কর্‌লেই যে তৎপরিবর্ত্তে কেলনারের ক্যাটালগের চর্চ্চা কর্‌তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানতঃ আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন পরে স্বদেশী আসনে বসা এবং স্বদেশী বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোষাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে এবং সেই সঙ্গে চিনের কিম্বা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না, কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুই প্রক্ষালন কর্‌তে হয় কিন্তু ছুরি কাঁটা ব্যবহার কর্‌লে শুধু আঙ্গুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এক কথায় বল্‌তে গেলে খানায়, পোষাকে "অঙ্গ অঙ্গীর" সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে পানের বিষয় নীরব থাক্‌লে অনেকে মনে কর্‌তে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে হয় ধূম, না হয় তেজ, মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে

যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাই। গাঁজা গুলি এবং চরসের পরিবর্ত্তে ভদ্র সমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ত সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্ব্বেদনিষিদ্ধ। "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এ মনুর বচন। এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায় সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও, সুরাপানের দোষ গুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসাঙ্গিক হয়ে পড়বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাসান্ নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরাজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা তার বেশি কিছু নয়। মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র কর্‌বার ভার সমাজ নীতি এবং ধর্ম্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত করেছে।

(৭)

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, কেউ যেন মনে না করেন যে কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দা কর্‌বার জন্যই আমি এ সকল কথার অবতারণা করেছি। যে সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করি, সে সকল কম-বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেছে। আমি নিজে উপরোক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা সকলেই অভ্যস্ত আচার ব্যবহারের অধীন। ভুল করেছি এই জ্ঞান জন্মান মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ কর্‌তে পার্‌লে ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্ত্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী।

সম্মোহন-বিদ্যা।

(৬)

আমরা বার কতক স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মাও পাইয়াছিলাম—তন্মধ্যে একজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন। তিনি কিছুতেই তাঁহার নাম প্রকাশ করিলেন না, আমাদের সহিত বড় বেশি ক্ষণ কথাবার্ত্তাও কহিলেন না। মিডিয়মের দেহে আসিবার ঠিক পূর্ব্বে তিনি কোথায় ছিলেন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি উত্তরে বলেন—"আমি দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের এক বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিলাম; দার্জ্জিলিং আমার পক্ষে বড়ই মনোরম, আমি ঐ স্থানে থাকিতে বড়ই ভালবাসি। দার্জ্জিলং শৈলের স্নিগ্ধতা, ও মনোহারী দৃশ্য আমার চক্ষে চির নূতন!"

এই ইংরাজ মহিলা যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন মিডিয়মের স্বর ঠিক স্বাভাবিক ছিলনা, যেন ইংরাজ মহিলারই গলার স্বর বলিয়া বোধ হইতেছিল—একটু খোনা-খোনা বেশ মিহি আওয়াজ!

তিনি যাইবার সময় একটি ইংরাজী গান গাহিয়া গেলেন—গানটী অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। আমরা যে দুই একবার ইংরাজ রমণীকে গাহিতে শুনিয়াছি, এ ঠিক তাহারই মত বোধ হইল, গলার স্বরটি পর্য্যন্তও। গানটা এখনও আমাদের কাণের পাশে যেন ঝঙ্কার দিতেছে!

একটি বঙ্গ রমণীও আসিয়াছিলেন। মিডিয়মের দেহে আমাদের একবার হাত পড়িবামাত্রই তাঁহার দেহ কণ্টকিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের বলিলেন—"আমি স্ত্রীলোক, আপনারা আমাকে স্পর্শ করিবেন না; পরপুরুষের স্পর্শ আমাদের পাপ।"

(৭)

বেশি রকমের মেলা-মেশাতে মানুষের মধ্যে যেমন একটু হৃদ্যতা আসে, মনের একটু খোলা-খুলি ভাব হয়, অনেকদিন ক্রমাগত আত্মা-দের সংস্রবে আসিয়া আমাদের সহিত তাঁহাদেরও সেইরূপ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁরা বড় বেশি বকিতে রাজী হইতেন না, কিন্তু শেষা-শেষি তাঁহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। আগে দু পাঁচ মিনিটের অধিক কেউ থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাদিগকে তাড়াইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত।

প্রেতাত্মাদিগের সহিত যখন ক্রমে আমাদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাব আসিয়া দাঁড়াইল তখন যে সব প্রশ্নের জবাব আমরা পূর্ব্বে পাই নাই সেই সব প্রশ্ন আবার করিতে লাগিলাম। একদিন, একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আপনার মৃত্যুর পরই কি কি ঘটনা ঘটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলুন ত। তখন তিনি উত্তর করিলেন ঃ—

—"মৃত্যুর পূর্ব্বে, অসুস্থ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে সময়কার কোন কথা আমার মনে নাই। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ক্রন্দনের রোলে আমার যেন চমক ভাঙ্গিল। তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আমার মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় আমার যেমন দেহ, যেখানে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সাজান ছিল তখনও পর্য্যন্ত ঠিক্ তেমনিটি অনুভব করিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে মাতাঠাকুরাণী, তার পরে আমার স্ত্রী দুইজনেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে,—পাশে আমার ছোট ছেলেটী, সেও খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জননীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রমাগতই আকর্ষণ করিতেছে—বালকের দুই চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় গড়াইয়া পড়িতেছিল—দেখিয়াই আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সকলে কাঁদিতেছে কেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর নিকট দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম—"মা কাঁদিতেছ কেন?" প্রশ্ন করিলাম বটে

বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কোন স্বর বাহির হইল না। ভাবিলাম কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। গলাটা ভাল করিয়া সানাইয়া লইলাম। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মনে হইল ঠিক উচ্চারণ করিলাম কিন্তু একটু টুঁ-শব্দ হইল না—ভাবিলাম, আমি বধির হইয়াছি না কি: মা'র গায়ে হাত দিলাম, তাঁকে বেশ রীতিমত ঠেলিলাম, কিন্তু স্পর্শ করিয়াছি অনুভব করিতে পারিলাম না। বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। বারম্বার কথা কাহয়া ও গাত্র স্পর্শ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন চিত্ত বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষোভ উপস্থিত হইল। আমি হতাশ হইয়া আমার শয্যার দিকে ফিরিলাম। বিছানার নিকট গিয়া দেখি, আমার দেহ কাষ্ঠের মত বিছানার উপর পড়িয়া আছে! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এতদূর বিস্মিত হইলাম যে জীবনে কখনও হই নাই। জীবিত আবস্থায় মৃত্যু বলিয়া যে একটা সংস্কার ছিল, ছাঁৎ করিয়া তাহাই মনে উদিত হইল—সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম আমি মরিয়াছি। এই কথা মনে হইবামাত্র আমার যে কতদূর কষ্ট হইল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই, এ কষ্ট যার না হইয়াছে সে বুঝিতে পারে না। মনে মনে যেন জ্বলিতে লাগিলাম। তখনও জননী ও স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ছুটা-ছুটি করিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল, যদি কণ্ঠে একবার স্বর ফুটে ত স্ত্রী ও জননীকে একটু প্রবোধ দিই,—জানাই আমি এখানেই আছি। কিন্তু তা কিছুতেই হইল না। জীবিত ও মৃতের পার্থক্য এইখানে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিলাম। যথাসময়ে আমার শব আত্মীয়-বন্ধুরা উঠাইয়া লইয়া গেল, আমি তাহাদের সহিত একটুখানি এগাইয়া গেলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলাম। কি যেন একটা আমার পথরোধ করিল—মন কিছুতেই বাটী ত্যাগ করিতে চাহিল না—কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া যাই! মায়া এমনই।"

"আমি আমার বাটীর মধ্যেই কিছু দিন রহিয়া গেলাম। মনে ক্রমাগতই ইচ্ছা হইতেছিল, পুত্রটীকে একটু আদর করি, জননীকে একটু প্রবোধ দিই, স্ত্রীর সহিত একটু কথাবার্ত্তা কই। কিন্তু হায়! আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। কথা কহি, কিন্তু স্ত্রী তাহা শুনিতে পায় না, জননীকে প্রবোধ দিই, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছায় না, পুত্রকে

আদর করি সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কই? এর চেয়েও আর কি কষ্ট আছে? অবশেষে নিরস্ত হইলাম, কিন্তু বাটী ত্যাগ করিতে খনও মন চাহিতেছিল না—আহা! যতক্ষণ পুত্রটীকে দেখিতে পাই। বুঝিতেছ, মৃত্যুর পর কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা!"

এইখানে প্রেতাত্মা একটু চুপ্ করিলেন। আমরা বলিতে আবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিলাম তখন তিনি বলিলেন,—

"তার পর আর কি? ক্রমেই মনটা একটু নরম হইয়া আসিল, তখন মনে হইল, বাটীর ভিতর থাকিয়া লাভ কি?—তৃপ্তি ত নাই! তখন সেখান হইতে বাহির হইলাম, এক অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলাম। ক্রমেই পৃথিবীর পথ, ঘাট, মাঠ, গাছপালা আর কিছুই চোখে ঠেকিল না—খানিকক্ষণ পরে দেখি, কোথায় এসে পড়েছি, সে যেন অন্ধকারের রাজত্ব—চারিদিকে খালি অন্ধকার, ঘন অন্ধকার অত অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রেও নেই। বাপরে! সে অন্ধকারের কথা মনে হ'লে শরীর এখনও শিহরিয়া উঠে। তোমরা সে অন্ধকার ধারণায় আনিতে পার না। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, কাজেই কোন্ দিকে যাই তার একটা ঠিকানা পাইতেছিলাম না—আর ঠিক্ করাও অসম্ভব। তখন অন্ধকারের ভিতর যেদিক হউক্ একদিকে যাইতে লাগিলাম, ক্রমাগতই সেই অন্ধকারের ভিতর ঘুরিতে লাগিলাম, সে কত দিন কত বৎসর তার কিছুরই ঠিক নাই।"

প্রেতাত্মা হঠাৎ চলিয়া গেলেন—মৃত্যুর পরের ঘটনা শোনা আমাদের অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

(৮)

একবার এক প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহারা মিডিয়মের দেহে প্রবেশ করেন কেন? কি উদ্দেশ্যে?

উত্তরে তিনি বলেন—"জীবিত অবস্থায় আমাদের যে সকল ভোগ-তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং যাহা পূর্ণও হয় না, মৃত্যুর পর দেহ-ত্যাগের সঙ্গে আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে পারি না। পৃথিবীতে সে সমস্ত কখন-না-কখন পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এখানে তাহা কখনও পূর্ণ হয় না। ভোগের আশা তৃপ্তি করিবার সহস্র উপকরণের

অভাব নাই, কিন্তু জড়দেহ না থাকায় সে সমস্ত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের স্পর্শে অনুভূতি নাই, আহার করিলে স্বাদ পাই না। তোমরা যে উপায়ে নিজেদের অভিলাস পূর্ণ করিতে পার, আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, আমরা তাহা পারি। ভোগের বাসনা খুবই প্রবল, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি করিবার উপায় নাই—অন্তরে প্রবল তৃষ্ণা, সম্মুখে সুশীতল বারি, পানও করিতেছি কিন্তু তৃপ্তি নাই, জলপান করি আর না করি তফাৎ কিছু বুঝিতে পারি না। সব তাতেই অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির জ্বালায় আমরা জ্বলিয়া মরিতেছি। যার যত কম ভোগ-তৃষ্ণা সেই আমাদের মধ্যে তত সুখী। এই আমাদের নরক যন্ত্রনা—নরক বলিয়া আর কি কিছু আছে? নরক ইহা অপেক্ষা আর কি যন্ত্রনা দিবে?"

"আমাদের ভোগের ইচ্ছা মিটাইবার জন্য সর্ব্বদাই আমরা পাগলের মত বেড়াইতেছি। হিপনটাইস্ করিয়া তোমরা একজনের চৈতন্য অপহরণ করিলে তাহার দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ ঘটে, আমরা একটা জড়দেহের আশ্রয় পাই তাহাতে আমাদের বাসনার একটু তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা হয়, সেই জন্য আমরা মিডিয়মের দেহে প্রবেশ করি। তাহাতে আমাদের কতকটা তৃপ্তি হয়, কিন্তু এই সামান্য তৃপ্তির জন্য আমাদের শাস্তি অতি কঠোর। তবুও এ প্রলোভন আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

এক দিন এক প্রেতাত্মা আসিয়া বলিলেন—"আমাকে একটু তামাক খাওয়াইতে পারেন? বহুদিন আমি তামাক খাই নাই। তামাক খাইবার ইচ্ছাটা অনেক দিন হইতে বড়ই হইয়াছে, একটু খাওয়াবেন কি?"

আমরা তামাক সাজাইয়া বেশ করিয়া খাওয়াইলাম।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

---

২৯ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

দেশী এসেন্সের নূতন শিশি !

আমাদের কারখানায় প্রস্তুত সকল প্রকার এসেন্স সম্পূর্ণ নূতন, সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় শিশিতে বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে দেলখোসের শিশির মনোহারিত্ব দেখিয়া যাঁহারা আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবার আমাদের অন্যান্য এসেন্সের শিশির মনোহারিত্ব ও দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। শিশিগুলি মূল্যবান্ হইলেও কোন এসেন্সেরই মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কাচের ষ্টপারযুক্ত সুন্দর শিশিতে চামেলী, মতিয়া, কামিনী, মল্লিকা, মাস্করোজ, খস্‌খস্, কুমুদিনী, হেনাকুসুম, মিশ্রকুসুম, প্রভৃতি যাবদীয় এসেন্সের প্রতি শিশি মূল্য এক টাকা। এসেন্সগুলি গন্ধের স্থায়িত্ব ও মিষ্টতায় জনসমাজে বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছে।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

অত্যাচারীর প্রতি।

(পৌরাণিক গাথা)

হিমালয় শৈল প্রস্থে যবে দৈত্যরাজ
প্রাণপণে ছিল রত ব্রহ্মার সাধনে ;
সহস্র শতাব্দী-সতী শতরঙ্গে আসি
বসন্ত শরৎ আদি অযুত কুসুমে
দিতেছিল পুষ্পাঞ্জলি চরণে তাহার ;
তখন মহিমা তার ছিল দেখিবার !

যুগব্যাপী সমাধির পূর্ণতা বহিয়া
তাহার মানসরাজ্যে প্রথম যে দিন,
পরিতুষ্ট পরমেষ্ঠী—বরাভয় করে
দেখা দিল যেন এক সবিতা নবীন,—
তপঃকৃশ নেত্রপুটে বহি অশ্রুভার
ব্রহ্মারে হৃদয় ভরি' হেরে বার বার !

"হে কশিপু" কহে বেধা, "তব সাধনায়
হইয়াছি পরিতুষ্ট ; মেগে লও বর ;
দৈত্যপতি দেহবলে উন্মত্ত স্বাধীন
ভাবে মনে—"হব আমি অজর, অমর ;
বিনাশের শতরন্ধ্র রোধ করি দিয়া,—
স্বর্গমর্ত্ত্য করতলে লইব পীড়িয়া !"

তাহার জাগর-স্বপ্নে করিয়া আঘাত,
"বর চাও ?" পদ্মযোনি কহে পুনর্ব্বার।
পুলকে, আনন্দবেগে শিহরি,' শিহরি'
হিরণ্য-কশিপু লুটে চরণে ব্রহ্মার।
"তুষ্ট তুমি যদি দেব ! দাও এই বর
হব আমি ত্রিলোকের অখণ্ড ঈশ্বর !"

বাঙ্‌লায় বল্‌তে হবে। তা সেজন্য ভাবনা কি, আজকাল ত বাঙ্‌লায় এ রকম কবিতার কিছু অভাব নেই। দেব-কৌতুকের এ লাইন গুলো বেশ খাটতে পারে—

একি কারে দেখি!
অমৃত-রূপিণী বালা, ভারতীর বীণা
রতি সুখে ঝঙ্কারি উঠিল যেন মরি!
মুহূর্ত্তে হৃদয় কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া তুলি
অস্ফুট আশার কলি পরিমলাকুল,
গুঞ্জরিত করি মত্ত মন মধুকর।

কিন্তু কই এখনোত কেউ ডাকৃতে আস্‌ছে না—কতক্ষণ এমন করে বসিয়ে রাখ্‌বে!

এমনে কেমনে রব না দেখে তাহায় রে!
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে!
শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া,
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে।

(টেবিল বাজাইয়া গান, ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—বাড়ীর ভিতরে ডাক্‌ছেন।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও অন্তঃপুরে প্রবেশ)

ভৃ। আপনি এইখানে বসুন আমি খবর দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

(প্রভাবতীর ও ক্ষেপির মার দুই পাশের পরদার আড়ালে অবস্থিতি। প্রভাবতীর ক্ষেপিকে লইয়া প্রবেশ। শ্রীধরের চৌকি হইতে উত্থান।)

চ। (স্বগতঃ) পাশ থেকে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—তব ঢের বদল মনে হচ্ছে। (প্রভাবতীর ধীরে ধীরে ক্ষেপির অবগুণ্ঠন মোচন ও

চন্দ্রা হাসিয়া) নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন—আমি নই। একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আমাকে এখনো তাহলে ভোলেননি দেখ্‌ছি। এ ছলনা আর ভাল লাগছেনা, ইচ্ছা কর্‌ছে এখনি কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

শ্রী। (সবিস্ময়ে) ইনি কে?

প্র। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) চিন্‌তে পারনা! এই কবছরের মধ্যেই ভুলে গেলে?

শ্রী। ইনিই কি চন্দ্রা?

ক্ষে। আম্মি তোয়ারি—অস,—পান।—

শ্রী। ইনি বলেন কি? (স্বগত) কথাগুলো যে চেহারার চেয়ে আরো ভয়ানক!

প্র (মৃদুস্বরে) চুপ কর!

ক্ষে। আম্মি তোয়া বই আম্মিনে।

শ্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এই প্রেমালাপ! এ যে বিছার কামড়? দোহাই আপনাদের—আমি শশীদাদা নই—আমার নাম শ্রীধর, ভুল করে এ বাড়ীতে এসে পড়েছি।

(ক্ষেপির মার প্রবেশ)

মা। তা যেই হও বাছা আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু তোমায় পাকা করে যেতে হবে।

প্র। (হাসিয়া) আবার এ একটা নতুন চাতুরী দেখ্‌ছি!

শ্রী। আজ্ঞে না আমি ঠিক বল্‌ছি, আমি শশীনাথ নই,—আমি শ্রীধর। আমি গিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থানোদ্যত)।

মা। সে যদি না আসে তাহলে আমি কিন্তু বাছা তোমাকে ছাড়ব না।

শ্রীধর। কি গ্রহ! আমি চল্লুম। [দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(শশীনাথের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ)

শ। কি সর্ব্বনাশ! ঐ শ্রীধরের মালতী! দেখে ত নয়ন জুড়িয়ে গেল। আঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে তবে দম ছেড়ে বাঁচি। রাতটা তবুও দুঃস্বপ্নেই কেটেছে। নিশ্চয়ই শ্রীধর সব জেনে শুনে মতলব করে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। হাঃ হাঃ হাঃ আমি কিনা অমনি কচি খোকাটি, যা হাতে দেবে তাই মুখে পূরে ফেলব। দাঁড়াওনা ভায়াকে একবার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে সয়তানের নাম করতে সয়তান এসে হাজির।

(শ্রীধরের প্রবেশ)

শ্রী। দেখ শশী দাদা,—এই রকম কাজটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?

শ। কি সেয়ানা ছেলে গা, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা! আমাকে তেমন বোকা পাওনি ভায়া, যে আমি তোমার বোঝাটি অমনি ধাঁ করে ঘাড়ে চড়িয়ে নেব।

শ্রী। বটে! তুমি নিজে যেচে ছোট মেয়ে চাইলে, আমি তোমাকে পথ বাৎলে দিলুম মাত্র, আমি ত আর তোমাকে সাধতে যাইনি।

শ। ঐ তোমার ছোট মেয়ে! গড় করি তোমার ছোট মেয়ের পায়! তাহলে আমার চন্দ্রা কি অপরাধ করলে? এত এত চেহারা দেখেছি এমন চেহারা কারো দেখিনি!

শ্রী। আর ঐ তোমার রূপবতী বিদ্যাবতী সুযুবতী চন্দ্রাবতী! মূর্ত্তি দেখেই ত চক্ষুস্থির! নিজে বিয়ে করবেনা করবেনা, কেউ ত গলায় বেঁধে দিত না, আমাকে কেন বিপদে ফেলা!

শ। দেখ্ আর যা বলবার বল্ কিন্তু এরকম মিথ্যা অপবাদ দিলে আমি তোর গলা টিপে ধরব। চন্দ্রা রূপবতী নাত কি? আমি তাকে ৫।৬ বছর আগে দেখে গেছি পরমাসুন্দরী মেয়েটি, আর দুদিনে তোর কথাতেই সে বদলে যাবে?

শ্রী। (ঘুসি বাগাইয়া) শর্ম্মা ভয় পাবার পাত্র নন, ঘুসি বিদ্যায় স্বয়ং দ্রোণাচার্য্যের ছাত্র! এসনা কে কার গলা টিপে দেয় দেখা যাক। আমিও মালতীকে ছেলেবেলায় দেখেছি; তখন ত ভালই দেখ্‌তে ছিল। এই কবছরে সে যদি বদলে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার চন্দ্রা আর বদলাতে পারে না? তোমার চন্দ্রাবতী একশবার, হাজারবার, লক্ষবার কুরূপা কদাকারা।

শ। মিথ্যাবাদী, ব্ল্যাগার্ড, দাঁড়াও না দেখিয়ে দিচ্ছি—

(উভয়ের ঘুসাঘুসি।)

শ। কেমন—এইবার।

শ্রী। কেমন, এখন!

শ। এই দেখ্‌না, কেমন টের পাইয়ে দিচ্ছি। (শ্রীধরকে দেয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়া) কেমন আর মিথ্যা বল্‌বি? বল চন্দ্রা সুন্দরী— তবে তোকে ছাড়ব।

শ্রী। এই চোখে দেখে এসেছি দাদা, প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবু তোমার চন্দ্রাকে চন্দ্রবদনী বল্‌তে পারব না। চন্দ্রা একশবার খ্যাঁদা নাকী টেরা নয়নী।

শ। (শ্রীধরকে ছাড়িয়া)। আর তোমার মালতী, চঞ্চুনাসা, মৃগনয়নী—কেমন?

শ্রী। চঞ্চুনাসা নয়, ছেলেবেলায় সুনাসা, সুনয়নী, ফুল্লাধরী ছিল বটে—কিন্তু—

শ। একি তুমি চন্দ্রার কথাই বলছ নাকি?

শ্রী। না আমি মালতীর কথাই বল্‌ছিলুম, চন্দ্রা কোটরচোখী চিল-কপালী, পেঁচামুখী।

শ। হাঃ হাঃ ভায়া আমি মালতীর যে রকম চেহারা দেখে এসেছি তুমি দেখ্‌চি ঠিক সেই রকম বর্ণনা করছ। চন্দ্রাকে দেখ্‌তে গিয়ে তুমি মালতীকেই দেখেছ; নিশ্চয়ই তুমি ভুল বাড়ীতে গিয়েছিলে।

শ্রী। তুমি যে বাড়ীতে বলেছিলে আমি ঠিক সেই বাড়ীতেই গিয়েছিলুম। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলি ত?

শ। হ্যাঁ ঠিক ঐ নম্বরইত বটে। তবে চন্দ্রাকে দেখনি আর কাউকে দেখে থাকবে।

শ্রী। নিশ্চয়ই চন্দ্রা। তাঁর দিদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তোমাকে ভেবে নানা কথা কইলেন। মেয়েও বড় বটে—দেখা হতেই প্রেমালাপ—

শ। তা হতেই পারেনা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারিনে। চন্দ্রা লাজুক, নম্র, সুশীলা, এ ত আর তোমার মালতী নয়, যে দেখা হতেই আকর্ণ বিস্তার করে হাসবে। তার সেই বদনব্যাদানীরূপ দেখেই ত আমি দে ছুট্‌।

শ্রী। অত কথায় কাজ কি, এখনি চল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হোক্‌।

শ। সে ভাল কথা, চল। তোমার সমস্ত কথাই আমার ধাঁধাঁ বলে মনে হচ্ছে। চন্দ্রা কি এই কবছরে স'ত্যই এত বদল হয়েছে।

শ্রী। আশ্চর্য্য কি! যদি মালতী বদলে থাকে ত চন্দ্রাও বদ্‌লাতে পারে না। অমন ডাক্তারি কেস্‌ ত দু একটা শোনা গেছে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও কিছু পরে পুনঃপ্রবেশ)

শ্রী। এই বাড়ী ত?

শ। হাঁ, এই বাড়ীই বটে! আচ্ছা তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি ধাঁ করে ভিতরে গিয়ে একবার রহস্যখানা ভেদ করে আসি। [প্রস্থান।

শ্রী। আমিও কেন এই তক্কায় শিশির বাবুর বাড়ীটা একবার ঘুরে আসিনা। একবার নিজের চোখে না দেখ্‌লে শশীদাদার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিনে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(শিশির বাবুর বহির্বাটীর একটি কক্ষে একখানি চৌকিতে মালতী আসীন, তাহার সন্মুখে টেবিলের উপর একখানি খোলা বই।)

মা। (পড়িতে পড়িতে মুখ উঠাইয়া) কই এখনো ত মেম এলেন না, আমার ত এ গল্পটা পড়া শেষ হয়ে গেল, যে যে জায়গাগুলির মানে বুঝতে পারিনি, তিনি এসে বুঝিয়ে দেবেন। এইবার বুঝি আসছেন,—পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন।)

(শ্রীধরের প্রবেশ।)

শ্রী। এইকি শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। (স্বগতঃ) একি! ইনি কে?

শ্রী। এইকি শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রী। (স্বগতঃ) দিব্যি মেয়েটি, এটি কিন্তু মালতী হলে মন্দ হয় না। ফন্দী করে জেনে নিতে হচ্ছে মেয়েটি কে। (প্রকাশ্যে) আমি বৌদিদির তল্লাসে এখানে এসেছি তাঁর আজ এখানে আসার কথা ছিল, এসেছেন কি?

মা। বৌদিদি !

শ্রী। শ্রীমতী ললিতাদেবী, আমার দাদার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছে। অনেক দিন আসিনি তাই চিন্‌তে পারছ না দেখছি।

মা। (সলজ্জে) ওঃ দিদি ! কই তিনি ত আজ আসেন্ নি।

শ্রী। (স্বগতঃ) আমার অনুমানটা দেখ্‌ছি ঠিক্ হয়েছে। মালতীই বটে। আমি ভেবে ছিলুম্ ১৪।১৫ বছরের মেয়ে নিতান্ত ছোট হবে কিন্তু তেমন ছোটত মোটেই নয়, আর বড় হয়ে কি সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে। (প্রকাশ্যে) তবে কি তাঁর জন্যে একটু অপেক্ষা কর্‌ব ? তিনি আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন।

মা। (অবনত মস্তকে পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তাহলে বসুন্, আমি মাকে খবর্ দিয়ে আসি।

শ্রী। তোমায় খবর্ দিতে হবে না, আমি নীচে থেকেই তোমাদের চাকরকে দিয়ে তাঁকে খবর্ পাঠিয়েছি। তোমার হাতে ও বই-খানি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

মা। ল্যাম্‌শ্ টেল।

শ্রী। ইংরাজিও পড় ? ইংরাজি কোন কবিতার বই পড়েছ ?

মা! মুরের একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম,—ভাল বুঝতে পারিনে।

শ্রী। যদি বল, আমি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমাকে নিতান্ত পর বলে মনে হচ্ছে কি ? ছেলেবেলায় ত কত এসেছি।

(মালতীর নীরবে সলজ্জ মৃদুহাস্য।)

শ্রী। (স্বগতঃ) এই লজ্জার হাসিটি কি মনোহর। যত দেখ্‌ছি একটি কবিতা যেন মূর্ত্তিমতী বলে মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাঙ্গলা কবিতা কি বেশী পড় ?

মা। উপন্যাস, কবিতা আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রী। বল দেখি, এ কবিতাটি কোথায় আছে ?—

হেরিলে ও সুধাময়ী প্রতিমার রূপ
চাঁদের আলোক স্নিগ্ধ ঝরে আঁখি পরে
উঠিলেন পদ্মাসনা সমুদ্রমন্থনে
যে মোহিনীরূপে,—আজি তাহাই নেহারি।

মা। (লজ্জিতভাবে) যাই আমি মাকে খবর দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

শ্রী। উঃ কি ভুলই করেছিলুম ! আমি ত কিছুতেই আর একে শশী দাদাকে দিতে পারব না।

(মালতীর মাতার প্রবেশ)।

শ্রী। নমস্কার।

মা। বেঁচে থাক বাছা, চল বাড়ী ভিতরে। তোমাকে দেখে কত যে আহ্লাদ হচ্ছে। কাল তোমার আসার কথা ছিল ?

শ্রী। আস্‌তে পারিনি।

মা। তোমার শশীদাদাকে পাঠিয়েছিলে ?

শ্রী। (স্বগতঃ) সত্যি তাহলে শশীদাদা কাল এসেছিলেন। (প্রকাশ্যে) হাঁা আমার হয়ে তাঁকে দেখে যেতে বলেছিলুম।

মা। বাছা সে কথা আর কি বল্‌ব ? তোমার বৌদিদি মালতীর বদলে ক্ষেপিকে দেখিয়েছিলেন।

শ্রী। তাই বুঝি ? ওঃ এখন সব বুঝ্‌ছি।

মা। তা এস বাছা বাড়ীর ভিতরে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

ভৃ। বাবুকে এখানে আস্‌তে দেখে ও বাড়ীর কানাই এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

শ্রী। দেখি।

[চিঠি দিয়া ভৃত্যের প্রস্থান।

শ্রী। (পত্র পাঠ) একি ব্যাপার! এযে উকীলের চিঠি!

মা। চিঠিখানা পড়ে যে মুখ শুকিয়ে গেল; কি চিঠি বাবা!

শ্রী। কি সর্ব্বনাশ। হরিহর বাবুর মেয়েকে পাকা দেখা দেখেছি এখন যদি বিয়ে না করি ত তিনি মকদ্দমা আনবেন এই হচ্ছে নোটিস।

মা। ওমা কোথায় যাব গো! বড়ঠাকুরের কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে? তোমার বৌদিদির বুদ্ধির দোষেই কিন্তু এটি ঘটলো।

শ্রী। কিন্তু আমি ত সে মেয়েকে মোটেই দেখিনি—দেখেছেন শশীদাদা। তাহলে এ নোটিস ত আমার হতে পারে না, আ বাঁচা গেল! আমি একবার এখনি তাঁর কাছে যাই, আবার কাল আস্‌ব। নমস্কার।

মা। কি গেরো! যদি বা অনেক সাধ্যসাধনায় বাছা এল, আস্‌তে ন আস্‌তে আবার এই বিপদ। যাই একবার ক্ষেপির মার কাছে

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

(জগচ্চন্দ্রের বাড়ীর দ্বারদেশে শশীনাথের প্রবেশ।)

শ। যেতে লজ্জা কর্‌ছে। নাঃ যেন কিছুই হয়নি,—এমনি ভা যাওয়াই ভাল। খবর্ না দিয়েই হঠাৎ যাই গিয়ে পড়িগে।

[নিষ্ক্রমণ

(গৃহমধ্যে হারমোনিয়ম বাজাইয়া চন্দ্রাবতীর ধীরে ধীরে গান। শশীনাথ গৃহের পরদার আড়ালে আসিয়া দণ্ডায়মান।)

শ। চন্দ্রা গান গাচ্ছে, এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি।

।— গান।

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে!
সুখ বা দুখ দিতে, কে আছে ধরণীতে
একেলা পড়ে আছি এ মরুস্থলে!
আমারো আঁখি ভাসে কেন গো জলে।
আমি ও কোন ভুলে মালিকা গাঁথি ফুলে
পরাতে মধু রাতে কাহার গলে!
আমি ও রচি গান, ললিত নব তান
নিভৃতে গাহি মরি, কিসের ছলে!
আমি ও কি আশায়, বিজনে সাজি হায়!
বাসনা ব্যথা বহি মরম তলে!
আমি ও কাঁদি হাসি, কাহারে ভালবাসি!
মোরে কে মনে করে আপনা বলে!
আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে!

শ। সত্যিই কি আমি এতদিন ভুলে ছিলুম্! ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। (চন্দ্রার নিকট আগমন।)

চ। (সবিস্ময়ে গান বন্ধ করিয়া)—একি?

শ। থামলে কেন?

চ। আপনি এতদিন পরে!

শ। এতদিন! আমার ত মোটেই এতদিন ব'লে মনে হচ্ছে না। যেন এই কাল তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছি আর আজ ফিরে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমিত বিশেষ বদল হওনি।

চ। আপনি ত বদ্‌লেছেন।

শ। (গোঁপে তা দিয়া) গোঁপটা বুঝি বেড়েছে। কিন্তু আমিত ছেঁটে ছুটে ঠিক্ সমানটিই রাখতে চেষ্টা করি। যা হক্ তবুত চিনেছ !

চ। আমার চেনা আশ্চর্য্য কি ! আপনি যে চিনেছেন সেই ঢের! বসুন্ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আমি যাই দিদিকে ডেকে আনি।

শ। না না এখন্ যেয়োনা ; একটু বস, তোমার কাছে আমার মাপ চাইবার ঢের আছে।

চ। সে সব হবে এখন আমি যাই দিদিকে ডেকে আনি। আর আপনার জন্য চা গুছিয়ে আনি। আপনিত আগের মত চা ভাল বাসেন ? [প্রস্থান।

শ। আতিথ্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি। সর্ব্বগুণে গুণবতী। আমি দেখ্‌ছি নিতান্তই বাঁদর, তাই ভেবে নিয়েছিলুম্ আমাদের দেশে বড় মেয়ে আর শিক্ষিতা মেয়ে হলে ভারী অকর্ম্মা হয় এমন রত্ন কি না আমি শ্রীধরকে দিতে যাচ্ছিলুম্। কি ভুল করেছি। ভাগ্যিস্ আজ এলুম্।

(প্রভাবতীর প্রবেশ।)

প্র। এই যাঃ আগেই চন্দ্রাকে দেখে ফেলেছ, খবর্ দিয়ে এলে আর দেখ্‌তে দিতুম্ না।

শ। মাপ কর্‌তে আজ্ঞা হোক্।

প্র। কাল তোমার বন্ধুর উপর দিয়েই চোট্‌টা গেছে, আর আজ তোমাকে দেখে রাগটাও পড়ে গেল।

শ। বটে ! বন্ধুকে কাকে দেখিয়েছেন্ ?

প্র। একটি অখণ্ডে অবধ্যে মেয়ে আছে, যাকে কেউ নিতে চায় না দেখ্‌ছিলুম্ যদি তাকে তোমাকেই গতাতে পারি। বড় মেয়ে

শিক্ষিতা মেয়ে চাও না, বিলাত গিয়ে নতুন রুচি নিয়ে এসেছ, ভাবলুম্ রুচির দৌড়টা এক বার দেখা যাক্।

শ। তাই বটে ! মেয়ে দেখে সে ত আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। আজ্ঞে শ্রীধর বাবু আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।

শ। ওঃ শ্রীধর ! (স্বগতঃ) তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এসেছি সেটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম্। এতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা কর্‌ছে চলে যায় নি ? কি গের ! (প্রকাশ্যে) বল আমি এখনি যাচ্ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

(চন্দ্রার চায়ের থালা হস্তে প্রবেশ ও থালা টেবিলে রাখিয়া এক পেয়ালা চা শশীর হস্তে প্রদান।)

শ। (চা খাইতে খাইতে) এতদিন পরে চা খেয়ে আরাম হোল !

(চন্দ্রাবতী ও প্রভাবতীর হাস্য।)

প্র। এতদিন যেন কেউ এখানে এসে চা খেতে বারণ করেছিল !

শ। (স্বগতঃ) যেতেও ইচ্ছা কর্‌ছে না ; কিন্তু না গেলে যদি সে এসে পড়ে আর চন্দ্রাকে দেখে ফেলে, ভয়ও কর্‌ছে।

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃ। শ্রীধর বাবু বল্লেন, আপনি যদি এখন তাঁর সঙ্গে নীচে গিয়ে দেখা কর্‌তে না পারেন—ত তিনি এই খানেই এসে দেখা কর্‌তে চান।

শ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ ! সেটি হচ্চে না। (চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া) আমি চল্লেম্—দিদি, তাকে বিদেয় করে এখনি আস্‌ছি।

প্র। সে কি কথা, চাটা খেয়ে যাও।

শ। এসে থাব, আমি এখনি আস্‌ছি। [দ্রুতবেগে প্রস্থান।

প্র। আমরা চল্ ছাতে বসিগে—চাকরকে বলে দিই শশী এলে বল্‌বে আমরা ছাতে আছি। [প্রস্থান।

(শ্রীধর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পায়চারি করিতেছে, শশীর প্রবেশ)

শ। ভায়া, তুমি যা বলেছিলে, একেবারে সত্যি! খাঁদানাকী, কোটর-চোখি, ঢিলকপালি, পেঁচামুখী একেবারে হুবহু ঠিক! আমিত দেখে অবাক, চন্দ্রা এমন বদলাবে তা আমি স্বপ্নেও মনে কর্‌তে পারিনি, সেইজন্য এতক্ষণ লজ্জায় তোমার কাছে আসতে পারিনি।

শ্রী। (স্বগতঃ) তাত আমি আগেই জানতুম—নইলে আমাকে গছাবার চেষ্টা! এখন মালতীর দিকে যে দৃষ্টি না দিলে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) সে কথা এখন থাক, একটা—

শ। সে কথা থাক্‌লে চলে কই। আমাকে মাপ কর ভাই, আমার কর্ম্মফল আমিই বহন কর্‌ব—তোমাকে আর সেজন্য ভীত হতে হবেনা।

শ্রী। সেজন্য আমি ভীত হচ্ছিনে দাদা,—একবার এই নোটিস খানা দেখ দেখি।—

শ। (নোটিস পাঠ করিয়া) পড়লুম—হরিহর বাবু তোমার নামে মকদ্দামা—

শ্রী। আমার নামে? তোমার নামে বল? আমিত আর সেদিন শিশির বাবুর বাড়ি যাইনি—আর হরিহর বাবুর মেয়ে যে কেমন তা এ চর্ম্মচক্ষে দেখিও নি।

শ। তাতে কি এল গেল! আমিত তোমার হয়েই দেখেছি, তারা ত আমাকে তুমি বলেই জানে।

শ্রী। তা জানলে কি হবে? যে মেয়ে দেখেছে সে যে শ্রীধর নয়, জলজ্যান্ত শশীনাথ; তার ত অকাট্য প্রমাণ পড়ে রয়েছে।

শ। এ আইনের কথা ভায়া—অকাট্য প্রমাণ বলে অত আস্ফালন কর্‌লে চলবেনা,—আমি তোমার হয়ে act করেছি মাত্র—অতএব এ নোটিস আমাতে বর্ত্তাতে পারেইনা, তুমি বল্লেই ত আইন উল্টে যাবেনা।

(একজন চাপরাশির প্রবেশ)

চা। সেলাম, আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

শ। চিঠি! কই দেখি!

[চাপরাশি পত্র দিয়া সেলামপূর্ব্বক প্রস্থান।

শ। একি ব্যাপার! আমার নামেও যে ঐ নোটিস!

শ্রী। (মহা হর্ষে) দেখি দেখি! তা বেশ হয়েছে? দুজনকে দিয়েছে তবু ভাল! এখন ব্যারিষ্টার সাহেব এর প্রতিবিধান?

শ। কিন্তু দুজনকেই কেন দিলে—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

শ্রী। আমি পেরেছি—হো হো হো!

শ। আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে—আর তোমার এখন হাসি কি বুঝেছ শুনি।

শ্রী। তুমি যে মেয়েকে দেখেছ—আমিও তাকেই দেখেছি। এ যাত্রাতেও আমরা দুজনে এক ঘাটেই জল খেয়েছি।

শ। তাই নাকি! আমাকে জব্দ করার জন্য দিদিমণি সেদিন এক কুরূপার অবতারণা করেছিলেন বটে!

শ্রী। আর আমাকে জব্দ করার জন্য বৌদিদিও ঐ একই কার্য্য করেছিলেন। অমন মেয়ে দুটি আর কে কোথায় পাবে—বেশ বোঝা যাচ্ছে দুজনে ঐ একটি টোপেই বঁড়শিতে গেঁথেছিলেন।

শ। ঠিক ঠিক! এইটেই প্রকৃত রহস্য। এখন কি করা যায়? এজন্য যদি কোর্টে দাঁড়াতে হয়—

শ্রী। হো হো হো!

শ। আবার হাসি! এই বিপদে তোমার এত হাসি আসে কোথা থেকে তাও ত বুঝতে পারিনে।

শ্রী। আমার একটা উপায় মনে এসেছে—হো হো হো!

শ। হাসিটা রেখে এখন উপায়টা বলবে?

শ্রী। ভোলাদাদাকে বর জুটিয়ে দেওয়া যাক। যেমন দেবা তেমনি দেবী মিলবে—তারাও বর পেয়ে খুসী হবে—আর আমরাও রেহাই পাব। (উভয়ের হাস্য)

শ। বেশ বেশ! অতি উত্তম—অতি উত্তম! আঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! যাও হে তবে এখন শীঘ্র যাও সব বন্দোবস্ত করগে।

শ্রী। আর তুমি সেই প্যাঁচামুখোর কোটরে বন্দী হবে, বুঝেছি দাদা, সব বুঝেছি। (হাস্য)

শ। (স্বগতঃ) মজালে দেখ্‌ছি, চন্দ্রাকে যদি দেখতে চায় তবেইত মুস্কিল! তাহলেই আমাদের দুজনে আবার চুলোচুলি বাধবে। তার চেয়ে ওর যাতে মালতীর দিকে মন যায় সেইটে কর্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) দেথ শ্রীধর, মালতী আগে ভাল দেখতে ছিল বলছ—তা তাকে একবার দেখইনা। তোমার যদি একলা যেতে লজ্জা করে—আমিও সঙ্গে যাব।

শ্রী। (স্বগতঃ) সেটি হচ্চেনা দাদা,—আমার মালতীকে আমি তোমাকে দেখাচ্ছিনে। তোমার চন্দ্রা কেন যতই রূপবতী হোননা,—মালতীকে একবার দেখলে সে রূপ চোখে লাগবেনা। (প্রকাশ্যে) যাও দাদা, তুমি চন্দ্রাকে ভাল করে দেখগে। আমার এখন মালতীকে দেখতে যাবার সময় নেই, আমি যাই—ভোলাদাদার বিয়ের বন্দোবস্ত করিগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(ললিতা ও শ্রীধর)

শ্রী। তুমিই ত এটি ঘটালে!

ল। ঘটিয়েছি ঘটিয়েছি তোমার সেজন্য ভাবনা কি? ভোলাদাদার উপর চালান দিলেই ত হোল।

শ্রী। তাদের তাতে মন উঠবে ত?

ল। না উঠবে না! ঐত মেয়ের শ্রী! ভোলাদাকে পেলে তারা বত্তে যাবে। মেয়ে পার করতে পারলেই ভাগ্যি বলে মানবে। এই যে ভোলাদাদা।

(হুঁকা হস্তে গান গাইতে গাইতে ভোলাদাদার প্রবেশ)

ব্রাদার হে তোমার
যদি উর্দ্ধে উঠতে ইচ্ছা হয় একবার
তবে গঞ্জিকা রঞ্জিকা পিয়ে তার সঙ্গে ভাং মিশিয়ে
খেয়ো একবার, দাদা, খেয়ো একবার।
বেজায় গাঁজায় ধূম চড়িয়ে, দম কষিয়ে ভোঁ হইয়ে
যাবে তুমি হিমালয়,
কৈলাস হবে তোমার আলয়
বাসা ছেড়ে ব্যোম ভোলানাথ কর্‌বে হাহাকার।

শ্রী। বড় যে স্ফূর্ত্তি দাদা! পরের সর্ব্বনাশ করে এখন গাঁজায় দম টানবে ত কি?

ভো। সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ, অ্যাঁ সর্ব্বনাশ!

শ্রী। মহা সর্ব্বনাশ! আমার কনেটিকে আগে থাকৃতে দেখে তাকে এমন মোহিত করে এসেছ যে সে আর—

বৌ। তোমা বই কাকে আনে না।

ভো। (নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সত্যি নাকি? তা আমার কি দোষ ভায়া! সেটা বিধাতার দোষ!

বৌ। তাত সত্যি! এখন কলকেটা নামাও।

ভো। কলকেটা নামাব? কেন—কেন?

শ্রী। কেন আবার কি? বর সাজতে হবে, গোঁপটা কামাতে হবে।

ভো। বর সাজব! হাঃ হাঃ সেত উত্তম কথা! রাগ কর্‌বে না ত?

শ। না দাদা আমি Martyr হয়ে আমিই তোমাদের হাতে হাতে বেঁধে দেব। যাই ক্ষুরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

বৌ। এখন কলকেটা রাখ্‌বে?

ভো। সেটি পারছিনে, দিদি তাহলে প্রাণটি যাবে!

বৌ। সেত আগেই গেছে, যেদিন তাকে দেখেছ সেই দিনই।

ভো। হ্যা, হ্যা, হ্যা!

প্রাণ ত অন্ত হোল আজ আমার, কমল আঁখি
একবার হৃদ্‌কমলে দাঁড়াও দেখি

(শ্রীধরের ক্ষুর লইয়া প্রবেশ)

শ্রী। এখন আগেত গোঁপটার অন্ত হোক। (জোর করিয়া হুঁকা কাড়িয়া লইয়া তাহা গৃহকোণে রাখিয়া ভোলাদাদাকে কামাইতে উদ্যত।)

ভো। অ্যাঁ অ্যাঁ কর কি দাদা, কর কি?

শ্রী। এই চৌকিতে বস বল্‌ছি—নইলে এই ক্ষুর গলায় বসিয়ে দেব।

ভো। ও কি কথা, এ'কেই কি বলে বর সাজা—আগেই গলায় ফাঁশ।

শ্রী। ফাঁশ নয়, একেবারে ক্ষুর দাদা ক্ষুর।

বৌ। আমি যাই আল্‌তা পাউডার আনি।

ভো। আল্‌তা পাউডার? কেন দাদা? [প্রস্থান।

শ্রী। দেখ্‌তেই পাবে।

(ললিতার পুনঃ প্রবেশ)

শ্রী। আমার হয়েছে, বৌদিদি এবার সাজাও।

ভো। আল্‌তা পাউডার! হ্যাঃ হ্যাঃ বিবি সাজ্‌তে হবে?

বৌ। (আল্‌তা পাউডার মাথাইতে মাথাইতে) বিবি-বর দেখ্‌লে কনের চোখের পাতা আর বুজ্‌বে না, একবার চেহারাখানি দেখ দেখি দাদা। (হস্তে আয়না প্রদান)।

আয়না হস্তে করিয়া ভোলানাথের গান ও নৃত্য—

তোম তোম তানা না না; আহা মরি কি কার্‌খানা
চতুরঙ্গে বিবিয়ানা, বাজারে গা!
শিরেতে সিঁদুর ছি ছি—কেবা পরে মিছি মিছি
ছাঁটা কেশে আঁটা থর সা সা নি নি সা!
নাকে নাই নথ মুক্তা, মুখে নাই পান দোক্তা
বাঁকা হাসি ফাঁকা ঠোঁটে বাহা কিরে বা!
ঢাকা শান্তিপুরে ফেল, ঘরে ঘরে লেশ ভেল
দিলমাৎ গসনেলে, তেরে কেটে তা।
পায়ের আল্‌তা গালে ঠোঁটে, মল নীরব জুতার চোটে
করে বাজে পিয়ানোতে ঠুং ঠাং ঠা!
কলিকালের এম্‌নি মেয়ে হার মেনে যায়, বি এ এম এ
বিয়ের তক্কা কেবল ফক্কা বলীহারী যা!

শ্রী। বৌদিদি তোমাকে গাল দিচ্ছে।

বৌ। আমরা কেন বিবি হব—তোমার বৌ বিবি হোক্‌। আমার সিঁথিতে দেখ সিঁদুর টক্‌ টক্‌ করছে—আমি লেশও পরিনে, গশনেলও মাখিনে,—তোমার বিয়ের দিন কনেকে ভেল পরিয়ে ঐ গান গেয়ে নৃত্য করো এখন। এখন চল তারা বরের অপেক্ষায় হা হুতাশ করছে।

[তুড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে ভোলার প্রস্থান।

(সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর ও ললিতার গমন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(স্ত্রী-আচারস্থল, মালতীর পার্শ্বে শ্রীধর এবং চন্দ্রাবতীর পার্শ্বে শশীনাথ দণ্ডায়মান। বরণডালা প্রভৃতি হস্তে লইয়া প্রভাবতী, ললিতা এবং অন্যান্য যুবতীগণের প্রবেশ এবং গান গাহিতে গাহিতে বরকন্যাদিগকে প্রদক্ষিণ)

প্রভা ও ললিতা। যে তোমারে চায় ওগো আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়।

যুবতীগণ। ওগো সেই ফুটাবে হৃদয়কুঞ্জে সুগন্ধফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
মনো অলি উঠ্‌বে গুঞ্জে মধুর মলয় বায়।

প্রভা ও ললিতা। যে তোমারে চায় ওগো আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে শেষে হায় হায়।

সকলে। তারি চোখে জ্বল্‌বে তারা, অধর পাতায় পুলকধারা,
ভূলোক হবে দ্যুলোক পারা প্রেমের মহিমায়।
যে তোমারে চায় আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়!

(গান গাহিতে গাহিতে পটক্ষেপ, ও রঙ্গমঞ্চে ভোলাদাদার প্রবেশ। বাঁশরীর তান উত্থিত)

ভো। তারা এখন ফুলের মালা পরুক, আর শুভদৃষ্টি করুক আমি এইবার পাত সাজানর বন্দোবস্তটা কি হচ্চে দেখে আসি। (তুড়ি দিয়া)

বাজারে বাঁশরী বাজা!
বরকন্যা পরে কুসুমের মালা, কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এইবেলা
বরযাত্র তরে বেশ ভাল করে পাতগুলো সব সাজা।

এই যে নাচওয়ালীরা আস্‌ছে—

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকী। কি দাদাঠাকুর কি গান হচ্চে?

ভো। তোমরা বুঝি বরকন্যার মজ্‌লিসে বাড়ী ভিতরে নাচতে যাচ্ছ? তা এইখানেই একবার আরম্ভ করনা।

নর্ত্তকী। তোমার গানটি গাও দাদাঠাকুর আমরা নাচি।

দ্বি, নর্ত্তকী। গানটি শিখে নিয়ে বরকন্যার কাছে গাব।

ভো। হ্যা হ্যা—তা হোল ভাল, আমাকে যে তারা বাড়ীর ভিতরে যেতে দিলেনা নইলে আমিই গেয়ে দিতুম। যেদিন আমার বিয়ে হবে সেদিন ত আর আমাকে বাড়ী ভিতরে না নিয়ে গেলে চল্‌বে না। হ্যা হ্যা হ্যা।

নর্ত্তকী। তোমার বিয়ে হবে নাকি? কবে দাদাঠাকুর?

ভো। এই পোষ মাসের পিটে পার্ব্বণের দিনে।

নর্ত্তকী। কি বল দাদাঠাকুর! সে দিন কি কারো বিয়ে হয়?

ভো। তবে বুঝি চড়ক্ সংক্রান্তির দিনে?

নর্ত্তকী। দাদাঠাকুরের কথার শ্রী শোন! তাও নাকি হয়।

ভো। হয় গো হয়। মেয়ে অরক্ষিতা হলে সব কালেই বিয়ে হয়। আমি ঠিক্ শুনে এসেছি একটা কোন পরবের দিনে আমার বিয়ে হবে। তোমরা বল্লেইত আর আমার বিয়ের দিন ওল্টাবে না।

ন। তা দাদাঠাকুর, তোমার বিয়েতে যেন আমরা ফাঁকে না পড়ি।

ভো। অবিশ্যি, অবিশ্যি। তোমরা না এলে আমার নৃত্যটা দেখ্‌বে কে? মনের ইচ্ছাটা এই রকম যে, গিন্নিকে যদি রাজি করতে পারি ত তাকে শুদ্ধ নিয়ে নাচব। গজেন্দ্রগামিনী গো গজেন্দ্র-গামিনী, নাচ্‌লে বেশ দেখাবে [সকলের হাস্য।]

(ভোলার গান, নর্ত্তকীদের নৃত্য।)

ভো। বাজারে বাঁশরী বাজা !
বরকন্যা পরে সুমঙ্গল মালা।—
সমস্বরে। কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এই বেলা,
বরযাত্র তরে বেশ ভাল করে, পাতাগুলি সব সাজা।
ভো। উহারা করুক্ সুমঙ্গল দৃষ্টি,
সমস্বরে। মোরা চাহি সবে সরাভরা মিষ্টি,
মেঠাই সন্দেশ, রসগোল্লা বেশ, পানতুয়া খাসা খাজা।
ভো। বাজা ঢাক্ ঢোল বাজা,
উহারা দেখুক্ আননের আলো
মোর পাতে দাদা ভাল করে ঢালো—
সমস্বরে। কালিয়া পোলাও, লুচি কোপ্তা চপ, গরম্ গরম্ ভাজা।
ভো। বাজা ঢাক ঢোল বাজা।
ওরা পান করে সৌন্দর্য্যের সুধা—
আমার তাহাতে আরো বাড়ে ক্ষুধা
আস্ত-রুই-মুড়ো, আন হেথা খুড়ো, বুড়োটিরে দিও ন্যাজা।
সমস্বরে। বাজারে নহবৎ বাজা
খুরীতে হবে না আন দাদা হাঁড়ি
রয়ে বসে ঢাল নাহি তাড়াতাড়ি
দই ক্ষীর আর ছানার পায়েস দেখেই প্রাণটা তাজা।

নৃত্যগীতে পটক্ষেপ।

ইতি সমাপ্ত।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।*

(২)

প্রথম প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে) বলিয়াছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরেই বিষয়শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় না দিয়া দেশভাষার সাহায্যে দেওয়া উচিত এবং ইংরাজীভাষা দ্বিতীয়-ভাষাস্বরূপ পঠিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। বাঙ্গালী প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' এই গৌরবান্বিত নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কল্পনা হইতেছে, তথায় এই দুই জাতির নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্য (হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত, ও মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পার্শী) কিভাবে স্থান পাইবে, এই প্রশ্ন সমাধান করা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। †

সরকারী বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে, এক এফ্‌এ পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায়ই প্রাচীন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (compulsory) নহে, এফ্‌এ পরিক্ষায়ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষা লওয়া চলে। প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে (ছাত্রীদিগের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র) মাতৃভাষা লইতে দেওয়া হয়না।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† এই প্রবন্ধে হিন্দুজাতির দিক্ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুসলমান জাতির দিক্ হইতে আরবী, পার্শী শিক্ষা সম্বন্ধে সেই সব কথা বলা যায়। সংস্কৃতভাষার সহিত বাঙ্গালা (হিন্দি, উড়িয়া) ভাষার যে সম্পর্ক, আরবী ও পার্শী ভাষার সহিত উর্দ্দূর সেই সম্পর্ক।

নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিধিব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও নাকি ভারতীয় প্রাচীন ভাষার আদর বিশেষ বাড়ে নাই, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীন ভাষার ত এই হাল। ভবিষ্যতের আশাস্থল আধুনিক ছাত্রগণের হৃদয়ে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য, জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে, জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, এখন যাঁহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে বসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র সমাজ ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। সুধু সরকারী সাহায্য বর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিলেই তাহা 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য নহে, তথায় জাতীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্রগঠনের অনুকূল শিক্ষা দিলেই ঐ নাম সার্থক হইবে। এ কথাটা যেন ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ স্মরণ রাখেন।

ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য ভারতবাসিগণকর্ত্তৃক স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় (compulsory) হওয়া উচিত। কথাটা এত সহজ যে, কথাটা পড়িবামাত্র সকলেরই ত ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়, প্রমাণ প্রয়োগ চাহিতে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সহজ কথাটাও আমাদের কাছে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে কথাটার মীমাংসা করিতে বেগ পাইতে হইতনা। কিন্তু আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-ভব্যতার মালমসলা বিদেশ হইতে আহরণ করিতে হইতেছে। এ অবস্থায় সুসভ্য ইংরাজের ভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, অনেকের এইরূপ মত। এ কথাটার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের শেষাংশে করিব। আপাততঃ, কি কি কারণে হিন্দুর পক্ষে

সংস্কৃতশিক্ষা (ও মুসলমানের পক্ষে আর্‌বী ও পার্শীশিক্ষা) প্রয়োজনীয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি।*

প্রথম, এই এই ভাষায় উভয় জাতীর ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত। জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় সমাজ, জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা ধর্ম্মসাধনের সহায়, প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মজ্ঞান উন্মেষিত করিবার জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, ইহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে ধর্ম্মাচারের ও সমাজতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম নিহিত আছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থিগণের পরিচয় স্থাপন না করিলে, তাহারা কিরূপে ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে? প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিলে কৃতবিদ্য ছাত্রগণ নিজের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে যত্নশীল হইবেন এবং সনাতন আচার পদ্ধতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। অবিচারিতভাবে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড মানিয়া লইতে হইবে ও জড়ভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এরূপ জবরদস্তির কথা এখনকার দিনে চালিবেনা; এরূপ জবরদস্তির ফলে হয় অসাড়তা, না হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, না হয় কপটাচার (hypocricy), উপস্থিত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্তে আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিশেষতঃ এখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার হিড়িকে সমাজে নানা রূপে আচারভ্রংশ ঘটিতেছে এবং বিলাতী রীতি নীতি আচারঅনুষ্ঠানের অনুকরণ সবেগে চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুসন্তানের সংস্কৃতশিক্ষা, এই অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার

* গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ফলে প্রকৃত জাতীয়তার ভাব বিকসিত হইবে এবং নিজের জাতির প্রাচীন গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আত্মসম্মান বোধ জন্মিবে ও তাহার ফলে বিলাতী সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ঘুচিবে। অতএব জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে সংস্কৃত (বা আরবী, পার্শী) ভাষা ও সাহিত্য ছাড়িলে চলিবেনা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনে গবেষণা, প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যসৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষিত ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এ যাবৎ এ সকল কার্য্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণই করিয়া আসিতেছেন; দুই চারিজন মাত্র ভারতবাসী সামান্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীনভাষা শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় প্রাচীনভাষা অনুশীলনের কেন্দ্রস্বরূপ হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে Theodore Morison সাহেব যাহা বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণের সে কথা গুলি যেন মনে থাকে।

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অঙ্গের পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতে হইলে, মাতৃভাষার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষাজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন না, দেশভাষাগুলি প্রাচীন ভাষার নিকট শব্দসম্পত্তির জন্য পদে পদে ঋণী। এমন কি, সাধুভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিতে হইলে, অথবা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের এবং অপভ্রষ্ট শব্দের বর্ণবিন্যাসের নিয়ম আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাঙ্গালা ভাষার ও সংস্কৃতভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের

মধ্যে যে পরিমাণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, স্বধু 'খাঁটি বাংলা'র সেবা করিলে কিছুতেই চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজীনবীশেরা একটা ভ্রান্ত সংস্কার মন হইতে দূর করিবেন। ভাষা হিসাবে আধুনিক ইংরাজীভাষার সহিত অ্যাংলোস্যাক্সন্ এবং ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদপেক্ষা অনেক নিকট সম্বন্ধ। আর ইংরাজেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা এবং সভ্যতা যেমন য়িহুদী, গ্রীক, রোমক, অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতি হইতে পাইয়াছেন, আমরা সেরূপ সর্ব্বদ্বারী নহি।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদি পাঠকবর্গ সমীচীন বলিয়া মনে করেন, তবে প্রাচানভাষা শিক্ষা যে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহা প্রমাণ হইল।

যাঁহারা কাযের লোক, sentimentএর ধার ধারেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন—'সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে; ইহার উপর যদি ভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটাও, তাহা হইলে যে ছাত্রদিগের জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে।' কথাটা খুব চটকদার (plausible) বটে; কিন্তু ইহার উত্তরটাও অত্যন্ত সোজা। সকলকেই যে সব বিষয় শিখিতে হইবে এমন কোনও 'মাথার দিব্য' দেওয়া নাই, যে শিল্প শিখিবে তাহার দর্শন শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে ইতিহাস শিখিবে তাহার বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে গণিত শিখিবে তাহার ইতিহাস শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রমাত্রেরই স্বজাতির প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কেন আছে, তাহার উত্তর প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে দিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ ভুলিবেন না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই বিলাতী

শিক্ষার অঙ্গ, কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীনভাষাই আমাদের বিশেষভাবে নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব জাতীয় শিক্ষার হিসাবে, অন্য সমস্ত বিষয় একত্র করিয়া তাহাদের যে গুরুত্ব, একা প্রাচীনভাষার সেই গুরুত্ব, অথবা তদপেক্ষা বেশী গুরুত্ব। সুতরাং, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বরং অপর পাল্লা (scale) হইতে দুই একটা বিষয় সরাইয়া হাল্কা করা চলে, তথাপি ভারতীয় প্রাচীনভাষার দিক্‌টা কমান চলে না।

যাহাহউক, তিনটি ভাষা শিক্ষা যখন অপরিহার্য্য, তখন অনর্থক তাহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, কি প্রকারে তিনটীরই স্থান হইতে পারে অথচ প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে বিচার করা সঙ্গত। তিনটি ভাষা শিখিতে হইলে তিনটিই যে সমপরিমাণে ও একই প্রণালীতে শিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) বাঙ্গালা* ভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষা দেওয়া ও ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। এমন কি, ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষার পঠন পাঠনাও মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; ইংরাজেরা যে ভাবে ফরাসী, ল্যাটিন বা অপর কোনও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেন, এস্থলে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকালে মাতৃভাষা হইতে তত্তৎ ভাষায় ও তত্তৎভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সকল উপায়ে মাতৃভাষার প্রসার খুব বাড়িবে। ইহার উপর মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। এই পর্য্যন্ত গেল ভাষা শিক্ষা। বাঙ্গালা

* প্রবন্ধের এই অংশে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

সাহিত্যপাঠেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। সচরাচর যে সকল বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক নিম্নশ্রেণীতে পঠিত হইয়া আসিতেছে (যথা কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চারুপাঠ, নীতিবোধ ইত্যাদি) সেগুলি ইংরাজীর অনুবাদ এবং বিদেশী দৃষ্টান্তে ও বিলাতীভাবে পরিপূর্ণ। ইহার ফলে, প্রথম হইতেই স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা ও বিদেশীর উপর ভক্তি জন্মে; জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা, স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের উপর শ্রদ্ধা, সমাজসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে না। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার-সঙ্কোচ অপেক্ষাও ইহা বিষম। জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিতে হইলে এ সকল পুস্তকে চলিবে না। (আজকাল বিজ্ঞান-রিডার নামধেয় সে সমস্ত পুস্তক চলিতেছে, সে সকল ত খাঁটি সাহিত্যই নহে, কাযেই সে গুলির স্বতন্ত্র নির্দ্দেশেরও প্রয়োজন নাই)। জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সংক্ষিপ্ত করিয়া, বাল্যাবস্থার অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া, পাঠনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও সঙ্গত ব্যবস্থা হইতে পারে না। বালকগণের গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশী অনুরক্তি দেখা যায়, কবির উক্তি হৃদয়ে গভীরভাবে উচ্চভাবগুলি মুদ্রিত করে, অতএব এইরূপ ব্যবস্থাই উপযুক্ত। গদ্য পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইলেও চরিতমালা, চরিতাষ্টক, আর্য্যকীর্ত্তি প্রভৃতি স্বজাতীয় মহাপুরুষগণের জীবনীসম্বলিত আখ্যানগুলিই লইতে হইবে, নতুবা স্বজাতিপ্রেম জাগিবে না; গ্রন্থকারগণ উৎসাহ পাইলে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিবেন।

(২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নশিক্ষা (primary education) মধ্যশিক্ষা (secondary education) ও উচ্চশিক্ষা (high education) এই

তিনটি স্তর থাকিবে, আশা করা যায়। নিম্নস্তরে কেবলমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যেরই ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার স্তরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান করিতে হইবে। যতই উচ্চদিকে উঠিবে, ততই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ কমাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইহাতেই পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিক উপকার হইবে, কেন না উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সাধারণ লোকে অবশ্য আবহমানকাল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া এবং যাত্রা, কীর্ত্তন, পাঁচালী, কথকতা শুনিয়া ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া আসিতেছে। (Mass education) লোকশিক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। মনে রাখিতে হইবে, এই কৃতবিদ্য যুবকেরাই এক কালে সমাজের নেতা হইবে। সমাজের উচ্চস্তরে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্টভাবের আধিপত্য না হইলে, সংস্কৃত শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যবস্থা রাখিলে, সমাজের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে।

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনও জন।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণ॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণিত ধর্ম্মের ঐরূপ বিকৃত আদর্শ প্রচলিত হইবে। ভাবী সাহিত্যেরও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে।

অতএব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার, সংস্কৃত ভাষা শুধু ভাষা-হিসাবে পড়িলে চলিবে না, সাহিত্য-

হিসাবে পড়িতে হইবে; ব্যাকরণ-বিচারে উদ্যম পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না। সাহিত্যপাঠে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত উপকার পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আদায় করিতে হইবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া কাব্য-কলা (literary art), রচনাশিল্প বুঝিতে হইবে, ধর্ম্ম ও নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতি বুঝিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে। নিজেদের সাহিত্য অবলম্বনে এই ভাবে শিক্ষালাভই সহজ, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালীও কতকটা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে; তাহা কার্য্যতঃ এক্ষণেও হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নিয়ম। উপরন্তু মাতৃভাষার প্রকৃতির সঙ্গে পদে পদে তুলনা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যে সুধু দুরূহ ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে; এই উপায়ে মাতৃভাষার সঙ্গেও সম্যক্ পরিচয় ঘটিবে। সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগরীতির সঙ্গে মাতৃ-ভাষার প্রয়োগরীতির কতটা মিল ও কতটা অমিল, কোন্ সংস্কৃত শব্দটির বাঙ্গালায় কি অপভ্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাদি সন্ধান দিতে হইবে। এই প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ, অভিধান সঙ্কলন ও ভাষাবিজ্ঞান প্রণয়ন যে কতদূর সুগম হইবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই প্রণালীতে শিক্ষাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা।

(৩) ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

দুইটি কারণে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রথম, ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা, রাজভাষায় অল্প-বিস্তর দখল না থাকিলে বিষয়কর্ম্ম চালানর অসুবিধা হইবে এবং বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের নানা প্রদেশের অধিবাসিগণের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে অন্তরায় ঘটিবে।

দ্বিতীয়তঃ, কালচক্রের আবর্ত্তনে জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ সভ্য য়ুরোপের নিকট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিক্ষার্থী, এ অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারস্বরূপ ইংরাজী (বা তত্তুল্য অপর কোনও য়ুরোপীয় ভাষা) না জানিলে জ্ঞানলাভের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। এ দুইটা কথার কোনওটাই চাপা দিয়া 'স্বদেশী' গোঁড়ামি করিতে গেলে বাতুলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত দুই কারণে ইংরাজী শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিখিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ, ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ এই দ্বিবিধ প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজীতে চিঠীপত্র লেখা, বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন, (abstracts, summaries, precis-writing) বড় জোর প্রবন্ধ রচনা পর্য্যন্ত শিখিলেই এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপ শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মূলগ্রন্থগুলি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহার জন্য সাহিত্য হিসাবে ইংরাজী পাঠনার তত প্রয়োজন দেখি না।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে ইংরাজী সাহিত্য পাঠনার ব্যবস্থা আছে, অনেকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, সাহিত্যে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় ও তাহার ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ (ইহাকেই কি culture বলিব?) ঘটে। ইংরাজী সাহিত্য আমাদের সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে নানারূপ কু-সংস্কার ও কদাচার, অপধর্ম্ম ও বিকৃত রুচি তিরোহিত হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছে। এ কথা কেহই

অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার 'সু' ও 'কু' দুইটা দিক্ আছে। আমাদের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম ইংরাজের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; প্রত্যেক জাতির কাব্যনাটকাদি খাঁটি সাহিত্য, (pure literature) সেই সেই জাতির জাতিগত, সমাজগত, নীতিগত ও ধর্ম্মগত প্রকৃতির পরিপূর্ণ ছায়া। প্রথম বয়সে মনোবৃত্তিসকল এত কোমল ও নমনীয় (plastic) থাকে যে তৎকালে যে সমস্ত ভাব ও আদর্শ মনে অঙ্কিত হয়, তাহা কস্মিন্ কালেও বিলীন হয় না। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, কিশোরবয়স্ক ছাত্রগণকে নির্ব্বিচারে ইংরাজী কাব্যনাটকাদি পাঠ করিতে দেওয়া কি সুসঙ্গত? এই সকল বিজাতীয় আদর্শ দ্বারা যে আমাদের সামাজিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক আদর্শ কলুষিত ও বিকৃত হয় নাই, ইহা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন? এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িল। Craik's Pursuit of Knowledge under Difficulties কি এইরূপ একখানা ইংরাজী কেতাবে লেখা আছে যে, এক দরিদ্র বালক বিড়াল মারিয়া সেই চামড়া বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিত। ইংরাজ গ্রন্থকার এই দৃষ্টান্ত দিয়া কিশোরবয়স্ক পাঠককে কত উৎসাহ দিয়াছেন এবং প্রবল জ্ঞানলিপ্সার জন্য বালকটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বকীয় বালক-পুত্রটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই গল্পটি পড়িতে শুনিয়া সেই দিনই তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন; এরূপ অপকর্ম্ম দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহার এতই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানে এতই আঘাত লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান লেখক সম্প্রতি তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় আত্মজকে Sweet Portia র speechless messages of love বুঝাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক, গুরুজনের অনভিপ্রেত পূর্ব্বরাগ ও বিবাহ, নরহত্যাদ্বারা গৌরব লাভের উৎকট অভিলাষ, প্রভৃতি জিনিস খাঁটি ইংরাজী সাহিত্যে আক্‌সার মেলে। ইংরাজী বালকের রাজসিক চরিত্রগঠনে ইহাই উৎকৃষ্ট উপাদান সন্দেহ নাই।

কিন্তু সত্ত্বপ্রধান হিন্দুর পুত্রকন্যাদিগের পক্ষেও কি এইগুলি কল্যাণকর ? অবশ্য ইংরাজী উপাখ্যানাদিতে বিশুদ্ধ আদর্শেরও অভাব নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে সংশিক্ষা লাভ করিলে তাহাতেও দোষ আছে। তাহার দরুন ভিন্ন জাতির উপর শ্রদ্ধাভক্তি এবং স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মে, নিজের সমাজের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিতে পায় না, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হয়না। মানসিক দাসত্বশৃঙ্খল হাড়ে হাড়ে বসিয়া যায়, এসব কথা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি কথাগ্রন্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত নরনারী-চরিত্রের আদর্শ বর্ত্তমান, যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক মত (যথা, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, জন্মান্তর রহস্য), ধর্ম্মানুষ্ঠান (দানধর্ম্ম, আতিথিসৎকার, আর্ত্তত্রাণ, প্রভুভক্তি) ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সেগুলি যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বিশেষভাবে অনুকূল, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও ধীরবিবেচক ব্যক্তিই দ্বিরুক্তি করিবেন না। Addison, Johnson, Goldsmith, Campbell প্রভৃতি যে সমস্ত সুলেখকগণের এবং যে সমস্ত অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লেখকগণের রচনা প্রবেশিকা ও এফ্ এ পরীক্ষার্থিদিগকে সচরাচর সাহিত্যস্বরূপ পড়িতে হয়, তাহাতে এমন কোনও উচ্চ বা মহৎভাব অথবা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলা বা রচনাকৌশল নাই, যাহার সমতুল্য জিনিস হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে মেলেনা, ইহা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির ত কথাই নাই। তবে কিজন্য মনুষ্যত্বলাভ বা উন্নত আদর্শলাভের জন্য বৈদেশিক সাহিত্যের সেবা করিব ? কৈশোরে সকলেই হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র পড়িয়াছেন, কিন্তু তখন সকলেই দুরূহভাষা আয়ত্ত করিবার ব্যাকুলতায় ও ব্যাকরণের দৌরাত্ম্যে, ভাবের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এবং রচনার সরসতার দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধলেখকের অনুরোধে এখন একবার নূতন করিয়া পড়িয়া দেখিবেন কি ?

ইহা অবশ্য স্বীকার করি, স্বদেশী বিদেশী সকল সাহিত্যেই, উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া, একটা বিরাট, সার্ব্বভৌম ভাব আছে। ইহাও স্বীকার করি, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়না। কিন্তু সে (broad catholicity) বসুধাব্যাপিনী কুটুম্বিতা স্থাপনের সময় কিশোর বয়স নহে। আগে জাতীয় ভাবে বনিয়াদটা গড়িয়া লইয়া পরে ভিন্ন জাতির, ভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন হইলে ভয়ের কারণ থাকেনা, নতুবা আদর্শবিকৃতি ও চরিত্রস্খলন অবশ্যম্ভাবী। স্থপতি-বিদ্যায় পিরামিড গঠনে যেমন নীচেটা চওড়া এবং উপরটা ক্রমে ক্রমে ছুঁচ্‌লো হইয়া উঠে, চরিত্রগঠনের বেলায় সেরূপ প্রথম বয়সে সার্ব্বভৌম ভাব ও পরিণত বয়সে সঙ্কীর্ণতা আনিলে চলিবেনা। ইংরাজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে সাহিত্যকলার নূতন নূতন রীতি দেখা যায়, যাহা কালিদাসাদির অগোচর ছিল। সেগুলিও শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়, কেননা তাহাতে ভাবী বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি হইবে। আশৈশব ইংরাজী চর্চ্চা করিয়া এবং পঞ্চদশবর্ষকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইংরাজীবিদ্বেষের ভাব পোষণ করা সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে। তবে এ কথা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানী নব নব রীতির পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যকলার (Art) যে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট রীতি বর্ত্তমান তাহা আগে বুঝিতে হইবে, কেননা তাহাই সহজ, স্বাভাবিক এবং কল্যাণকর। উচ্চশিক্ষার স্তরে, যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বা শিল্পবাণিজ্যের দিকে না ঝুঁকিয়া Arts Course লইবে, তাহারা বিএ, এম্‌এর ন্যায় উচ্চ পরীক্ষায় স্বজাতির প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানাটক।

নবম অঙ্কের অনুবৃত্তি।

অবতীর্ণ হলে পুনঃ   কুম্ভকর্ণ রণ ভূমিপরে
হেরি' ত্রাসে কপীন্দ্রেরা   প্রবেশিল গিরি-গহবরে।
কুম্ভকর্ণ পদাঘাতে   কেহ হ'ল সুদূরে নিঃক্ষিপ্ত,
দন্তের আঘাতে তার   কারো দেহ হ'ল বিচলিত।
নিঃশ্বাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে   নভে কেহ করে বিচরণ,
ভ্রমন্ত দোর্দ্দণ্ডাঘাতে   কেহ করে রুধির বমন।
নিঃশ্বাস হইয়া রুদ্ধ   ফুৎকারের ভরে,
অতি কষ্টে কোন কপি   প্রাণত্যাগ করে॥
অযুত তড়িৎ-দীপ্ত   কৃতান্তের কেতু-সম
উজ্জ্বল অজেয় সেই
শম্ভুর ত্রিশূল।
কুম্ভকর্ণ উত্তোলিয়া   হানিল সুগ্রীব-বক্ষে ;
বাণে কাটি' রাম তাহা
করিলা নির্ম্মূল॥
কুম্ভকর্ণ অতঃপর   করি' এক মুদ্গর গ্রহণ,
বানর-শিবিরে পশি,'   কপিদের করিয়া ভক্ষণ,
ক্রোধ-অগ্নি জঠরাগ্নি   —একত্র করিল প্রশমন।
পিষ্ট হ'ল কত কপি   কুম্ভকর্ণ-চরণ-আঘাতে ;
বাহিরিল যারা তার   শ্রুতিরন্ধ্র দিয়া বায়ু পথে,
তাদের ধরিয়া পুনঃ   ধীরে রক্ষ লাগিল চিবাতে।
মত্তকরীকর সম   বাম করে ঝাঁকায়ে শিবির,
ধরিল সে মহাবল   সুগ্রীবেরে—কুম্ভকর্ণ বীর।
অঙ্গদ পিতৃব্যে হেরি'   নিপতিত শত্রুর করলে,
গরুড়াস্ত্র-পাশ দিয়া   কুম্ভকর্ণে পাড়িল ভূতলে।

সুগ্রীব হইয়া মুক্ত   নিঃশ্বাস না ছাড়িতে ছাড়িতে,
সিংহ-পাশে কুম্ভকর্ণ,   অঙ্গদেরে বাঁধিল চকিতে।
অগ্নির তনয় নীল   —অঙ্গদ-সুগ্রীব-দোঁহে
দেখিয়া বিজিত,
নিজ অগ্নিমূর্ত্তি ধরি'   আক্রমিল কুম্ভকর্ণে
হইয়া কুপিত।
স্কন্ধে শিরে কর্ণে বক্ষে   নাসা মুখোদরে, তীব্র
পাইয়া আঘাত,
আকুল হইল রক্ষ ;   —কপিদ্বয় গাত্রোত্থান
করে তৎক্ষণাৎ।

(লঙ্কাশিখরস্থ রাবণ)

কাদম্বিনী-সহচর লঙ্কেশ রাবণ
দেখি' রণে কুম্ভকর্ণে সন্তপ্ত অতি,
অমৃত-সলিল তূর্ণ করিলা মোচন ;
সংজ্ঞা লভি' কুম্ভকর্ণ, কৃতান্ত যেমতি
নীল নলে পুনর্ব্বায় করিতে ভক্ষণ
ধেয়ে গেল রণস্থলে তাহাদের প্রতি॥

উগ্ররোষ জাম্ববান   রণে পশি,—বজ্র-সম বলে
গিরিসম মহাবাহু   কুম্ভকর্ণে পাড়িল ভূতলে,
সজোরে ধরিয়া কণ্ঠ,   আর বাঁধি' জানুর বন্ধনে।
মুক্ত হ'ল নল নীল   —পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ;
কিন্তু সে রাক্ষস-বীর করি' শূলাঘাত
নিবারিয়া জাম্ববানে উঠে তৎক্ষণাৎ॥
কালান্তক সম রিপু   কুম্ভকর্ণ রাক্ষসের ভয়ে
রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে   অতিশয় শঙ্কাকুল হয়ে
করেন কটাক্ষপাত   মহাবীর হনুমান প্রতি ;
অমনি সে হনুমান   অরুণাক্ষ—হয়ে রুষ্ট অতি

রণস্থলে অবতীর্ণ হ'ল তৎক্ষণাৎ
উগ্রমূর্ত্তি নরসিংহ যেন সে সাক্ষাৎ ॥
সুমেরু-পর্ব্বত-শৃঙ্গে মৈনাক যেমন
করে ধরে গিরি এক পবন-নন্দন
কল্লান্তে অঞ্জন যথা মন্দর-শিখরে,
তেমতি মুদ্গার এক কুম্ভকর্ণ ধরে।
পর্ব্বত নিঃক্ষেপ যবে করে হনুমান,
মুদ্গারে তা' কুম্ভকর্ণ করে খান্ খান্!
মহারুষ্ট হ'য়ে এবে কপি-বীরবর,
ঝটিতি টানিয়া লেজে লইল মুদ্গার।

অনন্তর ঃ— কুম্ভকর্ণ, বাঁধি ছলে হনু বীরবরে,
দিলা উপহার নিজ ভ্রাতায় আদরে।

রাবণ। (কুম্ভকর্ণ-আনীত হনুমানকে অশোক-বনে
সীতার নিকটে লইয়া গিয়া।)

সীতা! দেখ দেখ ঃ—
স্ত্রীবিরহে করে রাম প্রাণ বিসর্জ্জন,
লক্ষ্মণো তাহারি শোকে ত্যজিল জীবন।
সুগ্রীব অঙ্গদ-সৈন্য বিন্ধ্যাচলে পলাইল ভয়ে;
কেবা গণে বিভীষণে? সে ত হীন কৃপাপ্রার্থী হয়ে
শত্রুর অতিথি এবে; লঙ্কাদ্বার ভাঙ্গিতে যে পারে,
আছে এক মাত্র কপি,— আনিয়াছি বাঁধিয়া তাহারে।

সুন্দরি! মলিন * "ত্রি"দশ-মুখ হবে অবিলম্বে,
তিষ্ঠিতে পারিবে "না", রণে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে;
অধুনা লঙ্কার "বি"পদ বড় বানর-সেনার,

সীতা। সপ্তম অক্ষর লোপি' প্রতি পংক্তি পড়' পুনর্ব্বার।

* ত্রিদশ-মুখ=দেবতাদের মুখ, সপ্তম অক্ষর "ত্রি" লোপ করিলে, দশ মুখ অর্থাৎ রাবণ এই অর্থ হয়।

অনন্তর ঃ— রাবণের বক্ষদেশে পদদ্বয় করিয়া স্থাপন,
খরকর-নখাগ্রে কর্ণ তার করি' উৎপাটন।
করাতি-কঠিন দন্তে নাসা তার করিয়া ছেদন,
আকাশে উঠিল বেগে উগ্রকর্ম্মা পবন-নন্দন ॥
মহারোষে কুম্ভকর্ণ রণস্থলে আসি' পুনর্ব্বার,
মন্ত্রপূত অস্ত্রজাল চতুর্দ্দিকে করিল বিস্তার।
অসংখ্য শানিত-শর নিঃক্ষেপিয়া রঘুর নন্দন,
রাক্ষসের প্রতি অঙ্গ একে একে করিলা ছেদন ॥

(এই অবসরে বানরগণ)

বানরগণ।— ভয় প্রদর্শন তরে তোমার এ বীরদর্প
অন্যপ্রতি শোভা পায় বটে;
কিন্তু জেনো কুম্ভকর্ণ, —বীর মোরা—এসমস্ত
নিরর্থক মোদের নিকটে।
অন্যের বিক্রম তুমি দেখিয়াও নাহি দেখ
আঁখি মেলি' জন্মান্ধের মত;
ভিক্ষুক কি মহাদেব? মানুষ কি রামচন্দ্র?
বানর কি—মোরা বীর যত?
হেনকালে রঘুপতি কুম্ভকর্ণে বধিবার তরে
ইন্দ্রদত্ত শর দুটি করিলা মোচন;
এক শর বক্ষ ভেদি' পশিল ধরার মাঝে
অন্য শর মুণ্ড তার করিল ছেদন ॥

হনুমান। (কুম্ভকর্ণের ছিন্ন মুণ্ড পতনে)
ওহে কূর্ম্মরাজ তুমি ফণিপতি-সহ মিলি'
ধরণীরে ধর' দৃঢ় করি';
দিগ্‌গজ! তোমাদের সমুন্নত উগ্রদন্তে
স্থির রাখো সপ্ত কুলগিরি;
রাম-বাণে ছিন্ন হয়ে পড়ে কুম্ভকর্ণ-মুণ্ড
—ঝরঝর রক্ত পড়ে ঝরি' ॥

রামের ভল্লাস্ত্র-ছিন্ন কুম্ভকর্ণ রাক্ষসের
প্রকাণ্ড মুণ্ড ঘোর দংষ্ট্রাপ্রকটিত,
আছে পড়ে ভূমিতলে, আর তার গুরুভারে
সমস্ত বানর সৈন্য হয় বিচূর্ণিত;
হনুমান্ তাড়াতাড়ি শূন্যেতে লুফিয়া লয়ে
নিঃক্ষেপ করিলা মহার্ণবে ;
আর যত দেবগণ মহা উৎসুক্যভরে
দেখিবারে আইলেন সবে।

হনুমান্। দেবগণ! তোমাদের বিমান সরায়ে লও,
সূর্য্য রথ লয়ে দূরে করুক গমন ;
কপীন্দ্র রাক্ষস সবে! অবিলম্বে তোমরাও
কর পরিত্যাগ এবে সমর-প্রাঙ্গণ ;
অদ্ভুত পদার্থ মাঝে চূড়ান্ত অদ্ভুত যাহা,
—এ লঙ্কার একমাত্র আতঙ্ক কারণ,
চ্যুত-অঞ্জনাদ্রি সম সেই কুম্ভকর্ণ-মুণ্ড
বেগে ধরাতলে দেখ হতেছে পতন!

কুম্ভকর্ণের কথা বর্ণনা কি করিব আর :—
দেহ হতে উৎক্রান্ত হ'ল যবে পরাণ তাহার,
অমনি স্বরগ হতে রথ এক নীচে আসে নামি ;
সুর-বধুগণসবে নিতে তারে করে টানাটানি,
মৃদুল মুরজ-রবে নারদাদি করে স্তুতি গান,
তথাপি সে কুম্ভকর্ণ বাঁচাইতে অগ্রজের প্রাণ
সমরের প্রতীক্ষায়, রথে না করিল আরোহণ,
রণধীর রক্ষোবীর ত্যজিল না সমর-প্রাঙ্গণ॥

(ক্রমশঃ)

তাম্রলিপ্তী।

(ঐতিহাসিক ভাণ্ডার)।

তাম্রলিপ্তী বা আধুনিক তমলুক এক মহা তীর্থস্থান। এইস্থলে বহু দেবদেবী বিরাজিত। পুরাকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি হয়। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, তাম্রলিপ্তী অপেক্ষা তাঁহার প্রীতিকর স্থান আর নাই। এইখানে তিনি যুগে যুগে অবস্থান করিবেন এইরূপও বলেন।

"পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠী মধ্যে গতোহর্জ্জুনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ! ভূতলমধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্র মে প্রীতিরুত্তমা॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্মা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং হি ন ত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্ব তীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥

অর্থাৎ—পুরাকালে অর্জ্জুন দ্বারাবতীর (দ্বারকার) সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আদরে ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রভো "আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং সেই বিষয় শুনিতে আমার বিশেষ প্রীতি হয়।" কমললোচন কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরি-

ত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত তমোলুকমাহাত্ম্যনামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মব্যাথা প্রাপ্ত হন ও দুঃখে কলেবর ত্যাগ করেন। ইহাতে দেবাদিদেব মহাদেব কোপান্বিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের মস্তকচ্ছেদন করেন। ব্রহ্মবধপাপ বশতঃ সেই ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইল না। তৎপরে মহাদেব এই মহাপাপমুক্ত হইবার মানসে পৃথিবীর সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দেবদেবাদি দর্শন করিলেন। কিন্তু, তাহাতেও ছিন্নমুণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইলনা। শোক, দুঃখ ও সন্তাপে অভিভূত হইয়া একদিন ধূর্জ্জটী নির্জ্জন গিরিগুহায় শয়ন করিয়া স্বীয় পাপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান নারায়ণ তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলেন। তদনন্তর ভূতভাবন ভূতেশ সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকটে বর্ণনা করিলেন। কমললোচন নারায়ণ ধূর্জ্জটীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে তাম্রলিপ্তী নগরে গমন করিয়া কপাল মোচন নামক পাপনাশক সরোবরের জলে স্নান করিয়া বর্গভীমা নাম্নী দেবীকে দর্শন করিতে বলেন। ঐ পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"কপালমোচনং নাম যৎসরঃ পরিকীর্ত্তিতং।
তদম্বু স্পর্শনান্মুক্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্টা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ কপালমোচন নামক যে সরোবর আছে, তাহার জল স্পর্শ

মাত্রেই মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে পাপ পুণ্যের কোন বিচার নাই। এই কপালমোচনে স্নানান্তর জগৎপতির মুখ দর্শন করিয়া বর্গভীমাদেবীকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাশনাথ তাম্রলিপ্তী নগরে আগমন করেন ও কপালমোচনে স্নান করিয়া দেব ও দেবী সন্দর্শন করেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ও সেই ছিন্ন মুণ্ড হস্ত হইতে মুক্ত হয়।

এই কপালমোচন সরোবরের নামকরণ বিষয়ে দুইটী কিম্বদন্তী আছে। প্রথমটী এই যে, ভূতভাবন মহাদেব উক্ত সরোবরে স্নান করিলে তাঁহার হস্ত হইতে নৃমুণ্ড স্খলিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কপালমোচন নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণস্থ উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুরাকালে এখানে কপাল-মোচন নামে একটী সরোবর ছিল। বহুকাল হইল সেই সরোবরের অস্তিত্বলোপ পাইয়াছে। বোধ হয়, রূপনারায়ণ নদ কোন সময়ে স্বীয় কলেবর বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এখনও প্রতি বর্ষে মকর ও মহাবিষুব সংক্রান্তি ও অন্যান্য তীর্থযোগে অসংখ্য নরনারী, সরোবরের সন্ধান করিতে না পারিয়া বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের পাদদেশস্থ নদসলিলে অবগাহনাদি পূণ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই ত গেল প্রথম কিম্বদন্তী। কিন্তু, দ্বিতীয় কিম্বদন্তীটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এই রূপ শুনা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জ্ঞাতিবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইলে, তিনি পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণকে সেই অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। সেই যজ্ঞাশ্ব ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরীর

নিকটবর্ত্তী হইলে তৎকালের রাজা তাম্রধ্বজের পুত্রগণ সেই অশ্বকে আবদ্ধ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরও অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধশ্রমে অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কপোলদেশ হইতে বিন্দুমাত্র স্বেদবারি ভূপতিত হইয়া নদীসলিলাকারে প্রবাহিত হয়। কপোল দেশ হইতে স্বেদ পতিত হইয়া নদী উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সেই প্রবাহ কপালমোচন নামে অভিহিত ও পৃথিবীর পবিত্র নদীগণ মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাণ্ডববীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাম্রধ্বজ ও তাঁহার পুত্রগণকে পরাজিত করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "অর্জ্জুন্! তুমি যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তিনি পরম বৈষ্ণব। তাঁহার নিকট জয়লাভ আশা তোমার দুরাশা মাত্র। অতএব এক্ষণে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইয়া কৌশল দ্বারা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ।"

তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে ব্রাহ্মণবেশে তাম্রধ্বজের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাম্রধ্বজের ঈশ্বর-পরায়ণতার বহু নিদর্শন দেখাইয়া, উভয়ে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেন। ইহাতে সভাস্থ সকলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। নরপতি তাম্রধ্বজ স্তবস্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহু আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাম্রধ্বজ প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন প্রতিদিন স্বীয় ভবনে, কৃষ্ণার্জ্জুনের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পান। ভগবান্ তাঁহার বরপূর্ণ করিলে তাম্রধ্বজ যজ্ঞাশ্ব মোচন করিলেন ও নানাবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া প্রস্থান করিলেন। * * তাম্রধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং স্বীয় রাজভবন মধ্যে সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ও সেই মূর্ত্তিদ্বয় জিষ্ণুহরি নামে আজও বিরাজমান।

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বর্গ-ভীমা নাম্নী দেবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। কাহার দ্বারা যে বর্গভীমা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। এতৎসম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী আছে। "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"নরপতি তাম্রধ্বজের নিয়োজিত ধীবর-পত্নী প্রত্যহ রাজসংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত; সে একদা একটী বনমধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটী বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটী দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

এইত গেল এক কিম্বদন্তী। কিন্তু, Statistical Account of Bengal নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের কিম্বদন্তী লিখিত রহিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ধনপতি নামক কোন বিখ্যাত সওদাগর বাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন এইস্থলে আগমন করেন। তিনি এইস্থলে অবস্থানকালে কোন লোকের হস্তে

স্বর্ণের ভৃঙ্গার দৃষ্টি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে সেই লোকটী বলে যে, নগর নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে একটী কুণ্ড আছে তাহাতে পিত্তলের ভৃঙ্গার ডুবাইতে স্বর্ণময় হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে ধনপতি এইস্থলের বাজারের সমস্ত পিত্তল কাংসাদির দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই কুণ্ডের জলে ডুবাইয়া রাখেন; তাহাতে তৎসমুদয় সোণার হইয়া যায়। বণিক সেই সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া সিংহল গমন করেন ও তথায় সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। বাটী প্রত্যাগমন কালে বণিক এইস্থলে পুনরায় আসিয়া দেবী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

এই মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব। সাধারণ লোকে আজও ইহা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এইরূপ বলিয়া থাকে। ইহার গঠনপ্রণালী বৌদ্ধদিগের মঠ-গঠন-প্রণালীর অনুরূপ। সমতল ভূমির উপর উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বোধ হয়। বেদীর উচ্চতা বড় কম নহে। ন্যূনকল্পে ৯০ ফিট্। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে ইহা একখানি প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তৎপরে চারিপার্শ্বে ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ভিতরের প্রস্তর-মন্দিরের শোভা অতি মনোহর। খাঁজকাটা প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত বলিয়া শোভা আরও খুলিয়াছে।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব এ মন্দিরকে হিন্দুদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক বলিয়া বলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Among the objects of note at Tamluk is a temple of great sanctity and of much architectural interest, dedicated to Barga Bhima."

এই দেবীমন্দিরের ঠিক সম্মুখে "যজ্ঞমন্দির" নামে আর একটী মন্দির আছে। সেইটী পূর্ব্বমন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ইহা অল্পদিন হইল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বোধ হয়। কথিত আছে যে একটী পতিপুত্রবিহীনা বৃদ্ধা সূতা প্রস্তুত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্দারাই ইহা প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত দুই মন্দির একটী খিলান দ্বারা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই খিলানটীকে "জগমোহন" বলে। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি হইবার জন্য একটী ছাদবিশিষ্ট দালান আছে। ইহারই সম্মুখে দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা। মন্দিরের দক্ষিণদিকে ভোগরান্নার ও অধিকারী (পাণ্ডা) মহাশয়দিগের থাকিবার গৃহাদি আছে এবং উত্তর দিকে কুণ্ড আছে, তাহার জলে স্নানাদি করিলে লোকে পূর্ণমনোরথ হয়। বর্গভীমার বেদীর নিম্নে মহাদেব ও তাঁহার মন্দির আছে।

যখন (খ্রীঃ ১৫৬৭-৬৮) দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিবার জন্য অগণিত যবনসৈন্য সমভিব্যাহারে এই জনপদে আগমন করেন, তখন তিনিও দেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন ও পারসিক (পার্শি) ভাষায় একখানি দলিল লিখিয়া দিয়া যান। সেই দলিল এখনও দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট আছে। তাঁহারা উহাকে "বাদসাহীপঞ্জ" বলিয়া থাকেন।

এমন কি নরপিশাচ বর্গীসৈন্যও এই দেবী দর্শন করিয়া ভীত হয় এবং কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া এই জনপদ পরিত্যাগ করে। লিখিত আছে যে, "যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ (বর্গী) নিম্নবঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নর-পিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর, শান্তিপ্রিয়-জনগণসমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্যশোভিত ক্ষেত্র, এবং ফল-কুসুম-শোভিত

উদ্যান প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অনুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। সেই হৃদয়বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তমোলুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোন প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল।”

এই দেবী ব্যতীত এখানে জিষ্ণুহরি, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রামচন্দ্র, জগন্নাথদেব প্রভৃতি দেবতা বিরাজিত আছেন। জিষ্ণুহরির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহা আর এখানে পুনরায় বলিবার আবশ্যক নাই। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক কীর্ত্তনিয়া কর্ত্তৃক ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বাসুদেব তদীয় শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে মহাপ্রভুর সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া দেশপর্য্যটনে বাহির হন। তিনি আর এখানে ফিরেন নাই; বিদেশেই প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর তমলুক, সুজামুঠা, কাশীজোড়া, দোরো প্রভৃতি স্থানের ভূস্বামিগণ ইঁহার সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপসত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

এখানকার ষট্‌চত্বারিংশৎ রাজা শ্রীমন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী হরিপ্রিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইঁহার সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। আর, জগন্নাথদেবকে স্বয়ং রাজা শ্রীমন্ত রায় স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারও সেবাদি রাজগণপ্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপসত্ব হইতে নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্তীই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সুবর্ণগ্রামও

বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছিল বটে, কিন্তু তাম্রলিপ্তী অপেক্ষা তাহার খ্যাতি অধিক ছিল বোধ হয় না। তৎকালে বহু অর্ণবতরী তাম্রলিপ্তী হইতে ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপসমূহে ও আরব, চীন প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করিত। বৌদ্ধদিগের সময় হইতে তাম্রলিপ্তী একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এতদ্‌সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

“Even at this day the ancient Buddhist port (Tamluk) bears traces of its origin. In 1781 an English official reported to Government, that Tamluk was originally a Buddhist town and a large emporium of eastern trades and had many fine monasteries.”

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও বলেন যে, “It is a Buddhist port that Tamluk emerges upon history.”

ভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। প্রসিদ্ধ গ্রীকঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস (ইনি মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক সম্রাট্ সেলিউকাস্ কর্ত্তৃক দূত স্বরূপ প্রেরিত হন) কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ পাঠে তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বহু বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মেগাস্থেনিস্ ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার ইতিহাস হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠেও আমরা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি। গ্রীকগণের পরই বোধ হয় চৈনিকগণ এই দেশে আগমন করেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের সভ্যতা, শাস্ত্রবিদ্যা ও বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার সময় ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তে

আগমন করেন। তিনি এখানে দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন ও নানাবিধ শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ও দেবদেবীর মূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া হিন্দুদিগের একখানি বৃহৎ বাণিজ্যপোতে সিংহল গমন করেন। তথা হইতে তিনি আর একখানি পোতে চীন দেশে ফিরিয়া যান। ফা-হিয়ানের সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

"Going further eastward and southward Fa-Hian came to Tamralipti which was then the great seaport at the mouth of the Ganges. There were 24 sangharamas in this country; all of them had resident priests, and the law of Buddha was generally respected. Fa-Hian remained for two years, writing out copies of the sacred books and drawing image-pictures. He then shipped himself on board a great merchant vessel. Putting to sea, they proceeded in a south-westerly direction, catching the first wind of the winter season. They sailed for fourteen days and nights, and arrived at the 'country of the lions' (Sinhala, Ceylon)."

ফা-হিয়ানের পর হুয়েন সাঙ্ নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণকালে এইস্থানে আসেন ও কিছুদিন অবস্থান করিয়া উড়িষ্যা, কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই স্থানের নানা বিবরণ লিখিয়াছেন। পণ্ডিত-প্রবর মাননীয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

"He (Houen Tsang) next goes to Samatata (in the Sundarbans), and thence to the port of Tamralipti (Tamluk). He finds in the latter place 10 convents and 50 temples; and he mentions the immense quantity of rare and precious merchandise which was brought to it by land and sea. Here he inquired about Ceylon (Sinhala), and he learned that ships often sailed thither from this port * * *."

উপরের বিবরণ পাঠে জানা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে তমলুক একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং এখানে বহু বণিক নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ রত্নাদি বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। ইহা পাঠে আরও জানা যায় যে এইখান হইতে সিংহল প্রভৃতি দেশে অর্ণবযানাদি গমনাগমন করিত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মে ম্যাক্রিণ্ডেল্ সাহেব লিখিয়াছেন :—"It (*i. e.*, Tamralipti) was in old times the main emporium of the trade carried on between Gangetic India and Ceylon."

এই সমস্ত বিবরণ পাঠে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে তাম্রলিপ্তী একটী বৃহৎ বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। বঙ্গদর্শনেও লিখিত আছে যে "তাম্রলিপ্তী ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল।"

আরও পোটলেমির বিবরণ পাঠে ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। পোটলেমি বলিয়াছেন :—"As is proved historically by the mention of Tamralipta 600 years before our era, as one of the most frequented ports of Eastern India."

হুয়েন সাঙ্ প্রাচীন বাঙ্গালাতে পাঁচটী সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাজ্য ছিল

বলেন। যথা :—(১) কর্ণ সুবর্ণ (অথবা ভাগলপুর প্রদেশ প্রভৃতি); (২) পুণ্ড্র (অথবা দিনাজপুর প্রদেশ প্রভৃতি); (৩) কামরূপ (অথবা আসাম প্রদেশ প্রভৃতি); (৪) সমতট (অথবা ঢাকা প্রদেশ প্রভৃতি); (৫) তাম্রলিপ্তী (অথবা তমলুক প্রদেশ প্রভৃতি)।

ফা-হিয়ান ও হুয়েন সাঙ্‌ প্রভৃতি পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে আমরা জনিতে পারি যে, পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তী একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং এইখান হইতে বাণিজ্যপোতাদি সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশ সমুহে যাতায়াত করিত। তৎকালে অন্য কোন জাতীয় নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইত না। চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি যে দেশ আছে তাহাই তাহারা জানিতনা। কেবল ভারতবর্ষীয় নাবিকগণ অসমসাহসে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানে সমুদ্র পার হইয়া নানা দিগ্দেশে গমন করিত।

"Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, across Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malacca and to Sumatra. No Greek nor Roman ship visited those places. No Arab settlers were found there prior to the birth of Mahamed The earth in these quarters was unknown to them."

দোললীলা।

"রঙ্গ রাখ রসময় রাখ রঙ্গ ওগো শ্যামরায়,
হারি মানিলাম হরি কুঙ্কুম-রাঙ্গান দুটী পায়।
নির্দ্দয়, নাহিক দয়া, আজি এই অঙ্গপানে চেয়ে,
হেরিছনা হোরিধারা দরদরি পড়িতেছে বেয়ে।
দেহে, বস্ত্রে, কেশপাশে ঝর্ঝরিয়া সর্জ্জরস সম,
কুঙ্কুমের পঙ্কে দেখ অন্ধ হ'ল দুটি আঁখি মম।
তোমার কি হবে বল কাল অঙ্গে যত দিই ফাগ,
ততই বাড়ে যে শোভা নাহি লাগে কুঙ্কুমের দাগ।
সুচিক্কন শ্যাম অঙ্গে রঙ্গ মম পিছলিয়া যায়,
তাই হারি মানি হরি দেহ ছাড়ি ধরি দুটি পায়।"
—এক নেত্রে মৃদু হাসি' অন্যনেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি,
শঠশিরোমণি পদে নিবেদিলা রাধিকা সুন্দরী।
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট করে ভরি' পূর্ণ পিচিকারী,
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্যি মারিলেন রঙ্গে গিরিধারী।

—একদিন এই চিত্র, মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত উজ্জ্বল,
করেছিল বঙ্গদেশ হাস্যে লাস্যে উন্মত্ত চঞ্চল।
আজি তাহা নামে মাত্র,—তবু আজি কি উৎসাহভরে,
মাতিয়াছে পুরবাসী—কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
চির সুন্দরীর সাথে চির সুন্দরের হোলীখেলা,—
মধুর বসন্তে আজি বসায়েছে কৌতুকের মেলা।

আজি তাই ভাবিতেছি বসি একা আকুল অন্তরে,—
সহসা চাহিয়া দেখি পশ্চিমের উন্মুক্ত অম্বরে,
প্রাবৃটের ঘনঘটা অন্ধকার আসিয়াছে নামি,
চলিছে জলদ মন্দ্র দিক্ হ'তে দিগন্তর গামী।
আনন্দের ডম্বরু বাজায়ে—ক্ষুব্ধ ঝটিকার সনে,
সহসা নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে।

ভুলে গেনু সত্য মিথ্যা, গেনু ভুলে তুচ্ছ কাল দেশ,
উদ্‌ভ্রান্ত আঁখির আগে হেরিতে লাগিনু নিনিমেষ—
বিশ্বের সে হোলী খেলা,—বৃষ্টিছলে কৃষ্ণ মেঘ রাজি,
পুলকিত ধরা অঙ্গে পিচিকারী মারিতেছে আজি
মহারঙ্গে ;—কলহাস্যে দিগঙ্গনা হুড়াহুড়ি করে,—
তারি দ্রুত পদধ্বনি শুনা যায় সুদূর অম্বরে।

—তখন পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যদেব আসছেন নেমে,
শান্ত হ'ল বৃষ্টিধারা, ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে।
রাগরক্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ কুঙ্কুমে,
রাগরক্ত গঙ্গাবারি তারি সেই রক্তরাগ চুমে।
রঞ্জিয়া দিগন্ত কান্তি সান্ধ্য-সূর্য্য অস্তে গেলা ধীরে—
মাখিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লালে লাল আবিরে আবিরে।
—চৈত্রপূর্ণিমার নিশি, অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা—
আমার বিমুগ্ধ নেত্র ঊর্দ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিলা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

৩

এখানে যতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের পরেই এক একটা অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে। প্রথম সমিতি নির্দ্ধারণ করিলেন,—দেশ দরিদ্র, কৃষিযোগ্য যথেষ্ট ভূমি নাই, মজুরীর হার নিতান্ত অল্প। একটা কথা তাঁহাদের অনুসন্ধানে স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে ;—বাস্তবিক পক্ষে এ দুর্ভিক্ষ শস্যের দুর্ভিক্ষ নহে, ইহা অর্থের দুর্ভিক্ষ। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, দুর্ভিক্ষের কঠোরতা নিয়মিত-রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি ?—কারণ আর কিছুই নহে, হিন্দু কৃষক ও হিন্দু মজুরের দৈহিক প্রতিরোধিনী শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এখানে কখন হয় নাই।

প্রতিবারে নূতন নূতন প্রদেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতেছে ; পূর্ব্বে যে সব প্রদেশ অব্যাহতি পাইয়াছিল, গুজরাটের ন্যায় সেই সব প্রদেশও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইতেছে, দুর্ভিক্ষের শ্মশান-পরিধি ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু তথাপি এদেশ হইতে য়ুরোপে শস্যের রপ্তানি কখনই বন্ধ হয় নাই। ইহা কুৎসা-রটনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটা সত্য। দেখা যায়, এদেশের সকল স্থানে একই সময়ে অজন্মা হয় না—শস্যের অভাব হয় না। অভাব হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। অতএব, এই আংশিক অজন্মা হইতে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, অর্থের অভাবই তাহার কারণ। যদি রায়তের কিছু অর্থ সংস্থান থাকে, তাহা হইলে,

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতে নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে কি কোন বাধা হয়? দ্রব্যাদি চালান করিবার উপায়ের কোন অভাব নাই; অভাব কেবল সঞ্চিত অর্থের—আগাম-খরচ করিবার সামর্থ্যের। তাই, ফসলের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলেই রায়তের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; কাজেই, সুজন্মা ও সুবৃষ্টির উপর তাহাকে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়।

দ্বিতীয় অনুসন্ধান-সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে,—শ্রম-শিল্পের উচ্ছেদ বশতঃই কৃষিরও ঘোর দুরবস্থা ঘটিয়াছে। Baines (British Empire Series—1 Vol—India—p. 27) এইরূপ বলেন ঃ—"ভারতের অন্নসংস্থানের সমস্যাটি সেই পুরাতন সমস্যা—যাহা Brobdingnag এর রাজা উপস্থিত করিয়াছিলেন;—"পূর্ব্বে যেখানে ধানের একটি শিষ্ গজাইত সেখানে কি-করিয়া দুইটি শিষ্ গজানো যাইতে পারে"—এই সমস্যা। না,—ইহাই সমস্ত সমস্যা নহে। আমি বিস্মিত হইলাম যে একজন ইংরাজ আসল কথাটা ভুলিয়া যাইবেন। বস্ত্র-বয়নাদি ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিকে প্রকাণ্ড ভীষণ প্রতিযোগিতার সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া, কি-করিয়া উহাদিগকে বিদলিত করা হইয়াছে, তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন?

ইহারই দরুণ অনেক তাঁতি বেকার অবস্থায় পড়িয়া লাঙ্গল ধরিতে বাধ্য হয়। তাহারি অব্যবহিত ফলে মজুরীর হার—এমনিই ত কম ছিল—আরও কমিয়া গেল। ভূমিও, এত অসংখ্য লোকের অন্ন যোগাইয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই একদল মজুরের সৃষ্টি হইল—যাহাদের অনিশ্চিত সামান্য মজুরী ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। এবং সর্ব্বাগ্রে ইহারাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইল।

ভারত নিতান্তই কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। ভূমিই উহার একমাত্র জীবিকা। এই জন্য অজন্মা হইলেই চূড়ান্ত বিপদ,—তাহার আর কোন প্রতীকার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুখবাদী-সুলভ আশা-প্রবণতা (optimism) ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের এক প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বরাবরই এদেশের দুর্ভিক্ষকে এরূপভাবে দেখেন যেন উহা শুধু একটা নাভসিক উৎপাৎ—এমন-একটা প্রাকৃতিক উপদ্রব যাহা নিবারণ করা যায় না—যাহার পূর্ব্ব হইতে কোন প্রতিবিধান হয় না। যাঁহারা ভাবী সুজন্মার প্রতীক্ষায় হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যাই সুবিধা-জনক। তাই, তাঁহারা অনুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধান্তগুলি, অকেজো-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বেও তাঁহারাই দাদাভাইর ভয়সূচক হিসাবাদি হাসিয়া উড়াইয়াছিলেন। এই অনর্থের গভীর-নিহিত মূলগুলা সর্ব্বাগ্রে দাদাভাইরই চক্ষে পড়ে। এবং তদবধি এই কথা, তিনি কতকগুলি বধিরের কাণে অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন—সেই সব লোকের কাণে যাহারা বধির অপেক্ষাও অধম,—কেন না তাহারা শুনিয়াও শুনিবে না। সেই দাদাভাই চখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রায়তের ভীষণ দারিদ্র্যই এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ।

ভারত-সরকার নিজের দফ্‌তর-ডেস্কোর দেরাজ খালি করিতে নিতান্ত নারাজ্। ৩০ বৎসর হইল, যখন দাদাভাই কলিকাতার হিসাব-সমিতির নিকট এই বিষয়ের হিসাব-তালিকাদি চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, কতকগুলা হিসাবের অঙ্ক তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সেই টুক্‌রা-টাক্‌রা হিসাবের অঙ্কগুলা নিতান্ত অসম্পূর্ণ—বিজ্ঞান-পদ্ধতির একান্ত বিরুদ্ধ। তাই দাদাভাই সেগুলা ছাড়িয়া নিজেই দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং ১৮৭৬ সালে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল—লণ্ডনের (বোম্বাই-শাখা) "ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিএশান"—সভার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার হিসাব একেবারে সঠিক্‌ না হইলেও—বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি। সেই হিসাব হইতে তি ন প্রতিপন্ন করিলেন যে,—সহজ-সচ্ছল বৎসরে, মাথা-পিছু ২০৲ টাকা করিয়া ভারতবাসীর আয়। তাহার পর, তিনি সখের খরচ বাদ দিয়া—বিভিন্ন প্রদেশের শুধু জীবন যাত্রার ব্যয়—অশন বসন বাড়ী ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়—উক্ত হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইলেন। শুধু জীবনধারণের জন্য একজন চাষার খরচ হয়, আহমেদাবাদে—৬২৲ টাকা; বোম্বায়ে ৪৮৲ টাকা; পুনায় ৮০৲ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে কতকগুলি প্রদেশে, এই ২০৲ টাকা জীবনধারণোপযোগী ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র; এবং অন্য কতকগুলি প্রদেশে, অর্দ্ধাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সুতরাং সহজ-সচ্ছল বৎসরেও রায়ৎ বাধ্য হইয়া টাকা ধার করে, অথবা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে। দাদাভাই এই স্থলে যে একটা তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রসঙ্গে নূতন কথার একটু আভাস (suggestive) পাওয়া যায়;—তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—সুবৎসরেও চাষার যে বার্ষিক আয় হয়, তাহা অপেক্ষা একজন জেল্‌খানার কয়েদীও বেশী পায়। বেশ বুঝা যাইতেছে—তাঁহার হিসাব গড়-পড়তার হিসাব। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের আয় যদি এই ২০৲ টাকা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে, জনসাধারণের আয় সেই পরিমাণে আরো কত কম হইবে। • • • একজন মজুর-চাষার কত মজুরী—তুমি কি জানিতে চাহ?—দেড় আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত; গড়ে দৈনিক দুই আনা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হিসাব লইয়া দাদাভাইকে কেহ কেহ উপহাস করিতে ছাড়েন নাই। একজন ইঙ্গভারতীয় রাজপুরুষ, বেশ-একটু ভঙ্গীসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—"ইহা যদি সত্য হয়, হিন্দু চাষা এখনও কি করিয়া বাঁচিয়া আছে?" তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, উহাদের মধ্যে অনেকেই অনশনে মরিয়াছে। যে ইঙ্গ-

ভারতীয় রাজপুরুষকে কোনক্রমে অবিশ্বাস করা যায় না, সেই হণ্টারের সাক্ষ্যের কথাও তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন? হণ্টার এইরূপ বলিয়াছেন:—"৪০ কোটী ভারতবাসী শুধু একবেলা আহার করিতে পায়।" এই সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। আমি নিজে দাদাভাইয়ের হিসাবের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, Sir Evelin Baring—অধুনা Lord Cromer—কিয়ৎ বৎসর পরে ভারতবাসীর আয়, গড়ে ২৮৲ টাকা নির্দ্ধারিত করেন; এবং তিনি বলেন,—এ আয়ের অঙ্কও, বড়একটা আশ্বাসজনক নহে। ৪ বৎসর পরে, বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি-বাহাদুর লর্ড কর্জ্জনও এই ২০৲ টাকার অঙ্কই স্থির রাখেন। কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে, এখনকার হারে এই ২০৲ টাকা ৩৪ ফ্র্যাঙ্কের তুল্য মূল্য; তাহার পর, ইহা হইতে রাজকর তিন ফ্রাঙ্ক বাদ দিলে দাঁড়ায়—২৮ ফ্রাঙ্ক—৯০ সেন্টিম্‌; পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এইরূপ আয়ে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু সরকারি-হিসাব-দক্ষ বিশেষজ্ঞেরা, গোঁজামিল দিয়া কিরূপে হিসাব প্রস্তুত করিতে হয় তাহার কৌশল বিলক্ষণ জানেন।

এই অতুলনীয় দারিদ্র্যের পরিণাম কি?—ক্ষুদ্র চাষা-ভূম্যধিকারি-গণের উচ্ছেদ সাধন। গ্রাম-শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার ভূসম্পত্তি কত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডগুলি সহজ-সচ্ছল বৎসরেও, স্বীয় ভূস্বামীর আহার যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে;—সমস্তই করভারে ভারাক্রান্ত; সরকারী তহবিলের দুর্নিবার তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত কখন কি প্রয়োজন সহসা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সরকারের সতর্ক দৃষ্টি উহার উপর সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কাজেই রায়ৎ জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। সুবৎসরে অর্থ সঞ্চিত করিয়া সেই অর্থে বন্ধকী জমি যে খালাস

করিবে, কিংবা সেই জমি পুনঃক্রয় করিবে, চাষা তাহাও পারে না। মহাজন যদি ঐ জমি বাঁধা রাখিয়া তাহার সত্ত্বাধিকারটুকু বজায় রাখে তাহা হইলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু কে এই মহাজন? সে ঐ গ্রামের লুব্ধ সুদ-খোর বেণিয়া,—প্রায়ই মারোয়ারী, কিংবা গ্রামের শেঠ (চেটি)। সেই মহাজন আসিয়া সমস্ত গ্রামগুলা আত্মসাৎ করিয়া লয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিহ্বল কর্ত্তৃপক্ষের চোখের সামনেই, জমির প্রকৃত মালিকদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা হয়। আজ বলিয়া নহে, বহুকাল হইতেই, কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী ইঙ্গভারতীয় ইংরাজ এই চিরন্তন ক্ষতস্থানের উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। হণ্টার বলেন ঃ—"আর একটা দ্বিতীয় আয়র্লণ্ড আমরা ঘাড়ে করিয়া লইতেছি যাহার ভার আয়র্লণ্ড অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ অধিক।" হাঁ, একটা সমস্ত জাতি মজুর বনিয়া যাইতেছে; এখন সেই অসংখ্য মজুরের গুরুভার বহন করিতে হইবে।

ক্ষতস্থানের বহির্ভাগটাই সকলে দেখিতে পায়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য—যাহা সহজ-চখে পড়ে না সেই সকল মুল-কারণ আবিষ্কার করা—আমূল প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা। কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইল, এইজন্য প্রথমেই মহাজনকে ধরা আবশ্যক। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ "রায়তের ঋণভার লাঘবের আইন" প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই আইনের দ্বারা মারোয়ারীর দাবী-দাওয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং বন্ধকী ভূমি রায়ৎকে ফেরৎ দিবারও উপায় বিধান করা হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ভূমির দরুণ রায়তের যে প্রভূত পরিমাণ ঋণ হয়, তাহা কমাইয়া দেওয়া জজের ইচ্ছা। কিন্তু বিচারকালে জজ দেখিতে পান্, সুদ জমিয়া গিয়াই এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। হয়-ত রায়ৎ উহার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়াছে—কৃষিজাত দ্রব্য দিয়া। জজ যে ধার-দেওয়া

টাকার উপর কাঁচি চালাইবেন, মহাজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই আঁচিয়া, যাহা বাস্তবিক তাহার খরচ হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য অনেকটা কমাইয়া হিসাব দাখিল করে। হতভাগ্য রায়তের না-আছে দাখিলা, না-আছে কোন হিসাবপত্র। আদালত, প্রতিবাদীর ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেন; কিন্তু বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও রায়তের পক্ষে দুঃসহ। এই আইনের যে এইরূপ আশ্চর্য্য পরিণাম হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। একজন মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, রায়ৎ প্রায়ই অন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়। ১৯০০ সালের জাতীয় কংগ্রেস সভায় চন্দ্রবর্কার বলেন ঃ—"আমার ন্যায় যাঁহারা ওকালতি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাঁহারা প্রায়ই দেখিতে পান, রায়ৎ শুধু সাক্ষীগোপাল; তাহার পশ্চাতে এমন একটি লোক থাকে যে তাহার হইয়া বাদবিসম্বাদ করে, অর্থব্যয় করে, মোকদ্দমা চালায়, এবং যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই সে আত্মসাৎ করে। ইহার প্রতিবিধানার্থ, কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে মনে করিতেছেন, রায়ৎকে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করিতে না দিয়া, তাহাকে শুধু তাহার ভূমিতে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার স্বত্বাধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু ইহার ফলে রায়ৎ খুব-সম্ভব মহাজনের নিকট হইতে আর ধার পাইবে না, অনাহারে মরিবে; কিন্তু তাহা হইলেও, ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকিয়াই ত মরিবে! ইহা উপস্থিত মত কাজ চালাইবার নীতি—ফিকির ফন্দির নীতি—রোগ চাপা দিবার নীতি—অভাবপক্ষের নীতি! কি করিয়া এই অনিষ্ট সাক্ষাৎভাবে নিবারিত হইতে পারে, চন্দ্রবর্কার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলেন,—কৃতকর্ম্মা বহুদর্শী নিখলসন্ সাহেবের সুচিন্তিত প্রস্তাব-অনুযায়ী কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক—এবং সর্ব্বাগ্রে ভূমির সেই কর-ভার লাঘব করা আবশ্যক যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া রায়ৎকে ক্রমেই পিষিয়া ফেলিতেছে—যাহা নানাপ্রকার

ফিকির ফন্দি অবলম্বন করিতে রায়তকে বাধ্য করিতেছে এবং তাহাকে মহাজনের করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছে।

এই কথাই কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখেন নাই। না ভাবিবার কারণ আছে। ইহাই তাঁহাদের ধ্রুববিশ্বাস যে, করদাতা হিন্দুকে আরো দুই এক বার খাজ্‌নার যাঁতায় পেষা যাইতে পারে। অমুক ইংরাজ কোষাধ্যক্ষ একথা বলিতে সংকুচিত হন নাই যে, ভারতের কর-ভার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। একজন ইংরাজ কিংবা ফরাসী অপেক্ষা, একজন ভারতবাসীকে কম খাজ্‌না দিতে হয় সত্য; কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, ইংরাজ ও ফরাসী, ভারতবাসী অপেক্ষা বহুপরিমাণে ধনশালী। করদাতার অর্থ-সম্বল ও তাহার দেয় রাজকর —এই দুয়ের তুলনাসূত্রেই রাজকরের গুরুলঘুত্ব নির্ণীত হইতে পারে; ধনীর অনাবশ্যক বাহুল্য অনেকটা ছাঁটিয়া দিলেও তাহার পক্ষে তেমন দুঃসহ নহে; কিন্তু দরিদ্রের নিতান্ত আবশ্যক সম্বল হইতে স্বল্পপরিমাণ কমাইলেও তাহার পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। গড়পড়তা ২০৲ টাকা আয় হইতে হিন্দু রায়ৎ ৩৲ টাকা রাজকোষে দেয়—অর্থাৎ শতকরা ১৫৲ টাকা; পক্ষান্তরে, একজন ইংরাজকে দিতে হয় শতকরা ৮৲ টাকা। মনে রাখিও হিন্দু রায়তের ঐ ৩৲ টাকা তাহার নিতান্ত আবশ্যক সম্বল হইতে ছাঁটা যায়। পক্ষান্তরে, এইরূপে সংগৃহীত রাজস্ব হয়-ত পরিশেষে কোন একটা নিষ্ফল যুদ্ধে খরচ হইয়া যায়। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি রাজকর দেয়, সেই রাজকর, বিবিধ সুবিধার সমষ্টিরূপে আবার তাহারি নিকটে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু, ভারতবর্ষে,—সেই রাজকর হইতেই অবসর-বৃত্তি দেওয়া হয়, ইংরাজ রাজপুরুষদের মোটা-মোটা বেতন দেওয়া হয়, রেলপথের ক্ষতিপূরণ করা হয়, সরকারী ঋণের সুদ দেওয়া হয়, এসিয়ার কন্‌সল্‌দিগের ব্যয়ভার বহন করা হয়, আবিসিনিয়ার (হাপ্‌সি দেশে) যুদ্ধ চালানো হয়। তিব্বতে সৈন্য

পাঠান হয়, ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য খরচ করা হয়, এডোয়ার্ড রাজার অভিষেকের ব্যয়নির্ব্বাহ করা হয়,—কে জানে আরো কত কি হয়। বিশেষ কোন আবশ্যক মুহূর্ত্তে, কর্ত্তৃপক্ষ যখন রাজকোষ শূন্য দেখেন, তখন তাঁহারা দুর্ভিক্ষ-তহবিল হইতেই সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। এত জিনিষের জন্য যখন তাঁহাদের খরচ করিতে হয়, তখন তাঁহারা যে কৃষি-বিদ্যালয়ের জন্য, কৃষি-ব্যাঙ্কের জন্য, খরচ করিতে পারিবেন না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রায়তের এই দুঃখ যে, যাহা জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক সেই সব দ্রব্যের উপর সরকার ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করেন;—যেমন মনে কর লবণের উপর। আরও তাহাদের দুঃখের কথা এই যে, সরকার প্রতি ত্রিশ বৎসরে, নির্দ্দিষ্ট ভূমি-করের পুনর্নির্দ্ধারণ করেন—বলা বাহুল্য প্রজার করভার লাঘবের জন্য নহে। লোহপথ, ও খালাদির সুবিধার জন্য, জমির মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু রেলপথ খালাদির জন্য রায়ৎ যে পূর্ব্বেই দিয়া চুকিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—বোম্বাই প্রদেশে তরিতরকারীর চাষ কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ বলেন—চাষার স্বাভাবিক আলস্য জড়তা, অথবা ভূমিকরের পুনর্নির্দ্ধারণ-কালের নিকটবর্ত্তিতা। আর একজন বলেন,—কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে চাষা, সরকারী তহবিলের উন্নতিকল্পে না খাটিয়া, হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে।

আমি বলি, ভেড়ার লোম এমন করিয়া কাটো, যাহাতে তাহার চামড়া-শুদ্ধ উঠিয়া না আইসে। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ যখন এমন একটা ভাল উৎস পাইয়াছেন—এটা কি নিতান্ত গোড়ার কথা নহে যে, এই উৎসটি যাহাতে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য তাঁহাদের সতর্ক-দৃষ্টি থাকা আবশ্যক? রাজসরকারের স্বার্থই এই—দেশের প্রাকৃতিক সম্বল প্রথমে নিজ হস্তে লইয়া তাহার সুব্যবস্থা করা; পরে শিক্ষার

দ্বারা, মূলধনের দ্বারা, যন্ত্রাদি দ্বারা প্রজাবর্গকে সাহায্য করিয়া সেই প্রাকৃতিক সম্বলের বৃদ্ধি করা। আসল কথা, দেশীয় লোকের স্বার্থ রক্ষা করিয়া, কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ রাজনীতির অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষেও অধিক ফলদায়ী হইত। কিন্তু যতই চেষ্টা কর, শুধু কৃষির দ্বারা ২৮ কোটি ভারতবাসীর কথনই উদর-পূর্ত্তি হইতে পারে না। ইহার জন্য দেশের শ্রমশিল্প সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার আটঘাট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেন না, ম্যাঞ্চেষ্টার তাহা কিছুতেই হইতে দিবে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনন্ত-জীবন।

(৩)

আমরা বলিলাম "যদি স্থূলদেহ কালক্রমে তিরোহিত হয়, তবে মানবও অনন্তে লীন হইবে।" কিন্তু তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিছুরই ত নাশ সম্ভবে না। যাহা আছে, তাহা থাকিবেই; তবে, একরূপে না থাকিয়া অন্যরূপে থাকিবে, এই মাত্র। এস্থলে তিরোহিত শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম যে, দেহ স্থূলভাব পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এক অচিন্তনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অনুমানের মূল কি? মূল আছে। দেহের প্রত্যেক অংশ পৃথকরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে যে উহারা ধ্বংশের পথে অনেক দূর অগ্রসর

হইয়াছে।* সে আলোচনা বহুবিস্তৃত হয়; সুতরাং সংক্ষেপে একটী মাত্র কথাই উল্লেখ করিব। কিন্তু তদগ্রে পৃথিবীর অতীত অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। এই অবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) অজীবাবস্থা; (২) উদ্ভিদযুগ; (৩) জন্তুযুগ। বলা বাহুল্য যে উদ্ভিদযুগেও জন্তু ছিল, এবং জন্তুযুগেও উদ্ভিদ আছে। তবে গরিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা গেল। এক্ষণে, অতীত ভু-তত্ত্ব অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, জন্তুযুগের মধ্যাবস্থায় (Miocene-যুগ) জীবদেহ একরূপ চরম উপযোগীতা লাভ করিয়াছিল; দেহও বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকলের পর আর দেহের অধিকতর পরিবর্ত্তনে কিম্বা পরিবর্দ্ধনে তৎকালীয় জীবগণের এই ধরাপৃষ্ঠে বাস করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইত, এমত বোধ হয় না।† সুতরাং এই সময় হইতে জীবদেহের বিবর্দ্ধন স্থগিত হইয়া আসিতেছে; এবং উত্তরোত্তর দেহ জীবের প্রয়োজন সাধনে অপটু হইতেছে। এই অবস্থার শেষ পরিণামে দেহের দশা কি হইবে, তাহা কল্পনার অবিষয় নহে। যেমন এই সময় (Miocene—যুগ) হইতে দেহের অবনতি আরম্ভ হইল, তেমনি মস্তিষ্কের উন্নতি হইতে লাগিল। এখন হইতে মস্তিষ্ক যে কেবল আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তাহা নহে, উহার ক্রিয়াশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল।‡

---

* সাহিত্য ১৩১১, ৭২৫ পৃষ্ঠা ও ১৩১২, ৯৯ পৃষ্ঠা। এই দুই প্রবন্ধে হস্ত ও পদ, এবং অঙ্গুলি সকলের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সমস্ত মানবদেহ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ঐ পত্রিকায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

† "It seems that we have to imagine that the adaptation of mammalian form to the various conditions of life had in Miocene times reached a point when further alteration and elaboration of the various types, which we know then existed, could lead to no advantage."—Ray Lankester, *Nature and Man*, p. 19.

‡ "It is a very striking fact that it was not in the ancestor of man alone that this increase in the size of the brain took place at the same period, *viz.* the Miocene. * * * Other great mammals of the Tertiary period were in the same case."—*Nature and Man*, p. 18.

কিন্তু কিছুকাল এইরূপ হইবার পর মস্তিষ্কের আয়তন আর বৰ্দ্ধিত হয় নাই। যখন মানব সেই প্রাথমিক অবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিল, তখন হইতেই মস্তিষ্কের আয়তন আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না; কেবল উহার ক্রিয়া শক্তিই ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে।* তবেই দেখা যাইতেছে যে জন্তুযুগের মধ্য ভাগ হইতেই জীবদেহের পতন ও মস্তিষ্ক শক্তির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মানবের স্থূলদেহের নাশ সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভবপর ঘটনা। যদি সেই সুসময় সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানব আর মানব পদ-বাচ্য থাকিবে না। যাহা হউক, এই সময়ে চিৎ-শক্তি† যে অতীব উন্নত ভাবাপন্ন হইবে, তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ এই শক্তির যে উৎকর্ষতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিবৃত্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; বরং উত্তরোত্তর মানবের জ্ঞানোন্নতির সহিত ইহারও উন্নতি অনিবার্য্য।

স্থূলদেহ, অর্থাৎ অন্নময়-কোষ তিরোহিত হইবে। তখন জীব-শক্তি (অর্থাৎ জীবাত্মা) অনেকাংশ বাধা-বিমুক্ত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কোষ আশ্রয় করিবে। সেই উন্নত চিৎ-শক্তির পক্ষে স্থূলদেহ বিসদৃশ এবং অনুপযোগী হইবে। চিৎ-শক্তির বিকাশ অসীম, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং চিৎ-শক্তি উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে, তাহার কোষও ততই সূক্ষ্ম হইয়া তাহার কার্য্য সাধনের উপযোগী হইবে। অবশেষে চিৎ-শক্তি অনন্তে লীন হইবে, তখন

* "Man, it would seem, at a very remote period attained the extraordinary development of brain which marked him off from the rest of the animal-world, but has ever since been developing the powers and qualities of this organ without increasing its size."—*Nature and Man*, p. 20.

† এতদ্বারা মস্তিষ্কের ক্রিয়া শক্তিকেই বোধ করিলাম।

উহা কোষশূন্য, অরূপ, অবিষয়। তখন জীবব্রহ্মে অপ্রভেদ, তখন জীবব্রহ্ম এক। স্থূল দেহের লোপই ব্যাপ্তি; এবং তখনই জীবাত্মার বন্ধ-মুক্তি। দেহের নাশ নৈসর্গিক কারণেই হইতেছে। তথাপি মানব-প্রযত্নে সেই দীর্ঘ সময়কে নিকটস্থ করা অসম্ভব নহে। ফল এক-ই। যে জীবাত্মা আদিতে দেহ গড়িয়া লইয়া ছিল, যে অসীম স্বেচ্ছায় দেহ-বদ্ধ হইয়াছিল, দেহনাশে সে পুনরায় মুক্ত হইল। প্রথমে পৃথক্ দেহ গ্রহণ করে নাই, তখনও তাহার গতি অনন্তের দিকে; এবং পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সীমাবদ্ধ থাকিবার পর দেহমুক্ত হইয়া আবারও গতি অনন্তে। অনন্ত-জীবনের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত রহস্য।

শ্রীশশধর রায়।

সম্মোহন-বিদ্যা।

(৯)

সেদিন একজনকে সম্মোহিত করিবার পরমুহূর্ত্তেই মিডিয়ম অতিশয় চঞ্চল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া এক একবার নিজের বক্ষের উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, একস্থানে স্থির হইয়া শুইয়া রহিল না, গড়াইয়া গড়াইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিল। মাথার চুল ছেঁড়া, হাত কামড়ান, মাটীতে হাত-পা ঠোকা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, মন্দ-আত্মার

(evil spirit) আবির্ভাব হইলে, মিডিয়মের প্রতি এইরূপ অত্যাচার হয়।

একবার ঘুঁসিটা মুখের উপর আসিয়া পড়িল, দাঁতে ও ঠোঁটে লাগিয়া রক্তপাত হইয়া গেল। মিডিয়মের এই রকম অবস্থা দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। জোর করিয়া দুজনে দুখানা হাত ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু এক ঝাঁকানিতে আমরা দুজনেই পড়িয়া গেলাম; শেষে চারি জনেও কিছুই করিতে পারিলাম না। ধরিয়া রাখে কার সাধ্য! যেন মত্ত হস্তীর বল তখন মিডিয়মের দেহে আসিয়াছিল!

মন্দ-আত্মাকে শান্ত করিতে হইলে গান গাহিবার নিয়ম আছে। আমাদের মধ্যে একজন সুগায়ক ছিলেন, তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইল, তিনি

"গাও হে তাঁহারি নাম,
রচিত যাঁর বিশ্বধাম" ইত্যাদি।

এই গানটী গাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ গাহিবার পর মিডিয়ম একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

আমরা ভাবিলাম, বুঝি প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাই মিডিয়মের নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিয়া, ঠেলিয়া তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মিডিয়ম কোন সাড়াও দিল না, উঠিয়াও বসিল না। তখনও প্রেতাত্মা তাহার দেহে অবস্থান করিতেছিলেন।

আমরা তখন তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরও পাইলাম। আবার প্রশ্ন করিলাম—"কিসের জন্য আপনি মিডিয়মের দেহে এত দৌরাত্ম্য করিলেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"আপনাদের মিডিয়ম আমার পুত্র; সে গয়ায় পিণ্ডদান না করায় আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি; সে পুত্রের মত

ব্যবহার করে নাই, তাই তাহার উপর আমার রাগ হইয়াছিল, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ওরূপ কষ্ট দিয়াছি; ও পুত্র আমার কুলাঙ্গার। পুত্র হইয়া পিতার প্রতি কর্ত্তব্য করেনা। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ওকে আমার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে বলিবেন, অতি অবশ্য বলিবেন, নিশ্চয়ই বলিবেন।"

আমরা উত্তর করিলাম—"আচ্ছা বলিব।"

"ত্রিসত্য করুন।"

আমরা চলিলাম, "বলিব, বলিব, বলিব।"

প্রেতাত্মা চলিয়া গেলেন।

মিডিয়মের জ্ঞান হইলে, সে সমস্ত শরীরে বড় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া বড়ই অভিযোগ করিল, বলিল—"এ আপনাদের ভারি অন্যায়, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার দেহ যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছেন!"

আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম যে, তাহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নাই।

মিডিয়মের সেদিন একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিল। সে কেবলই বলিতে লাগিল—"আমার শরীরটা আজ বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে, খালি ঘুম পাচ্ছে, সমস্ত শরীর টাটাইয়া আড়ষ্ট হইয়াছে!"

আমরা তাহাকে গোটাকতক "পাস" দিতে সে কতকটা সুস্থ হইল, তখন তাহার নিকট পিণ্ডদানের কথাটা উত্থাপন করিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, সেদিনকার মিডিয়ম আমাদের বিশেষ পরিচিত ছিলনা, কাজেই তাহার পরিচয়, বা পিতার নাম ইত্যাদি জানিতাম না; প্রেতাত্মা যখন তাঁহার নাম বলেন নাই তাই চিনিতে পারি নাই।

(১০)

ইহার পর মন্দ-আত্মার আবির্ভাব প্রায়ই হইতে লাগিল। আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম। সম্মোহন-বিদ্যায় এতদিন যে স্ফূর্ত্তিটুকু পাইতেছিলাম এখন ক্রমশঃই তাহা কষ্টে পরিণত হইয়া উঠিল। আর প্রশ্ন করিবার অবসর কোথা? মিডিয়মকে শান্ত করিবার জন্য কেবলই গান চলিতে লাগিল, তাহার অস্থিরতা ক্রমেই যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, যখনই গান হয়, তখনই মিডিয়ম স্থির হইয়া থাকে, আবার গান বন্ধ হইলে সে যেমন অস্থির তেমনই। এ অবস্থায় আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতনা।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন রামলাল আসিয়া হাজির হইল। সেদিন রামলালেরও একটু উগ্রমূর্ত্তি, বেশ চড়া চড়া কথা। আসিয়াই বলিল—"তোমরা এখনও এ সব ছাড়নি, তোমাদের কি কোন কায-কর্ম্ম নাই, রাত্রিদিন বসিয়া কেবলই এই হিপনটিসমের চর্চ্চা করিতেছ, তোমরা বড়ই ছেলেমানুষ দেখিতেছি জগতে ঢের কাজ আছে, তাই করগেনা, এ সব কাজে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন? এতে লাভ কি? এ আর কোরোনা—ছেড়ে দাও।"

আমরা বলিলাম—"কই এতদিন ত তুমি বারণ করনি—এখন বারণ করিতেছ কেন?"

রা—আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের দুদিন খেয়াল চাপিয়াছিল তাই করিতেছিলে, শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবে।

আমরা বলিলাম—"এই হিপনটিসমের চর্চ্চা করাতে যখন কাহারো কোন ক্ষতি হইতেছেনা, তখন ইহা করিতে আপত্তি কি?"

রা—ক্ষতি হইতেছে না কি করিয়া জানিলে—ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, তোমরা নিজেদেরই খুব অনিষ্ট করিতেছ—যাক্, সে যব এখন

বলিব না। আর একটা কথা, এ সব কায ভাল করিয়া শিক্ষা না করিয়া করা উচিত নহে।

আ—আমাদের কি সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ হয় নাই?

রামলাল হাসিয়া বলিল—"সম্পূর্ণ কি—কিছুই হয় নাই, অতি সামান্যই শিখিয়াছ; তোমাদের যে শিক্ষা-গুরু আমেরিকাবাসী তাহারাই এ বিষয়টা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আর পারিবেও না, তাহারা একটা ভুল পথ ধরিয়াছে। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এটা ছাড়িয়া দাও।"

আ—আমাদের কি শিক্ষা করিবার কোন উপায় নাই?

রা—তোমাদের শিক্ষা করিবার দরকার নাই—আর তোমাদের মত লোক যে কখন কৃতকার্য্য হ'বে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই ভারতবর্ষেই এখনও এমন লোক আছেন, যাঁরা এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ—এ হচ্ছে যোগের একটা নিম্নস্তর, সে রকম লোকের কাছ থেকে যদি শিক্ষা নিতে পার, তা হ'লে হ'বে, তবে তাঁদের পাওয়া দুর্লভ।

আ—আচ্ছা, আমরা যদি হিপনটিসমের চর্চ্চা না ছাড়ি?

রা—তাহ'লে এর বিষময় ফল অচিরেই ভোগ কোর্ত্তে হ'বে। তোমরা এ জিনিসটাকে একটা ছেলে-খেলার মত করে যাচ্ছ, যে শক্তি তোমরা অর্জ্জন করে এ বিষয়ে একটু কৃতকার্য্য হয়েছ তা তোমাদের দিন দিন ক্ষয় হ'চ্ছে, তোমরা তা রাখ্‌তে পাচ্ছনা, এই শক্তি যখন আরো হীন হয়ে পড়বে, দেখ তখন কি হয়!

আ—কি হ'বে?

রা—কোন আত্মাকে আর বশীভূত রাখতে পারবেনা, তখন মহা মুস্কিলে পড়্‌বে।

আ—সে শক্তিটা কি বাড়ান যায় না?

রা—যায়, কিন্তু সে এরকম ক'রে ছেলে-খেলা কল্লে হবেনা।

আ—শক্তি বাড়ানর উপায় কি?

রা—তা আমি ঠিক জানিনা। যেখান থেকে, যে উপায়ে তোমরা এই বিদ্যা শিক্ষা করেছ, সেখানেই সন্ধান কর।

আ—যদি আত্মাকে বশীভূত রাখিতে পারি তাহা হইলে ক্ষতি কি?

রা—ক্ষতি গুরুতর, মিডিয়মের প্রাণসংশয়।

রামলাল আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা ছেড়ে দেবেত?" আমরা কোন উত্তর করিলাম না। রামলাল তখন বলিল—"দেখ, আজ তোমরা প্রেতাত্মা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছ, অনেককে তোমরা শাস্তির ভাগী করিতেছ, যখন তোমাদের মৃত্যু হইবে, তখন সেই সব আত্মা তোমাদের উত্যক্ত করিবে, তোমাদের লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিবে।"

আমরা সে কথায় বড় কাণ দিলাম না।

(১১)

রামলালের কথা লইয়া সেদিন আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, আর ওসব করিয়া কায নাই; কেহ বলিলেন, আর কিছুদিন দেখাই যাক্ না কি হয়। আমরা পশ্চাৎপদ্ হইলাম না।

রামলাল আসিবার কিছুদিন পরেই আমরা একজনকে সম্মোহিত করিলাম। প্রথম হইতেই উৎপাৎ, সেই হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি! অনেক কষ্টে স্থির করান গেল। আমরা প্রশ্ন করিলাম, প্রেতাত্মা কোন জবাব দিলেন না। আমরা ক্রমাগতই যখন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন একটু কড়াভাবে বলিলেন—"আমার নাম বলিব না।"

সেদিন ক্রমাগত ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে আমাদেরও মেজাজ একটু চড়া হইয়াছিল, আমরা বলিলাম,—"তবে আপনি বিদায় নিন্, আমরা আপনাকে চাইনা, অন্য আত্মাকে আসিতে দিন।"

প্রেতাত্মা দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"যাইব না।" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—হাত-পা ছোঁড়া তখন বন্ধ ছিল।

তখন বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছিল, কোন কথাবার্ত্তা নাই, চুপ্-চাপ করিয়া মিছা-মিছি একজনকে অজ্ঞান করিয়া রাখাতে আমরা বড়ই বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে আবার বলিলাম—"আপনি যান্, আমরা মিডিয়মের জ্ঞান-সঞ্চার করিব।"

আবার সেই এক উত্তর—"যাইব না।"

আমরা বলিলাম—"যাইতেই হইবে।"

প্রে—"কখনই না—আমি সাতদিন এখানে থাকিব।"

সাত দিন থাকিবার কথা শুনিয়া আমরা একটু ভীত হইলাম। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—"আপনাকে থাকিতে দিব না, যে উপায়ে পারি তাড়াইব।"

প্রে—"ক্ষমতা থাকে, তাড়ান।"

সেই মুহূর্ত্তে দর্শকদিগকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলা হইল—ঘরে মিডিয়ম লইয়া আমরা তিন জন মাত্র রহিলাম।

ইহারই মধ্যে, মিডিয়মকে অজ্ঞান করিবার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল।

প্রেতাত্মাকে তাড়ান নিয়মবহির্ভূত হইলেও সেদিন তাহা না করা ভিন্ন উপায় রহিলনা। প্রেতাত্মাকে তাড়ানর একটা উপায় আছে আমরা দুইজনে তাহাই অবলম্বন করিলাম। একে একে আরো দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আমরা কৃতকার্য্য হইলাম না। তখন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, একপ্রকার হতাশও হইলাম তখন প্রেতাত্মা বলিলেন—"তাঁড়াও আমাকে, কেমন বেগ পাইতে হইতেছে!" আমরা বলিলাম—"আপনাকে আর বেশীক্ষণ থাকিতে দিতেছিনা।"

আমাদের কার্য্য আবার আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ পরেই প্রেতাত্মা

অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি শীঘ্রই যাইতেছি, আমাকে আর পাঁচ মিনিট থাকিতে দিন।"

আমরা বলিলাম—"আচ্ছা।"

ঠিক পাঁচ মিনিট্ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার একটা প্রধান উপায় ইচ্ছা-শক্তির (will force) প্রয়োগ।

প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার জন্য এত কষ্ট পাওয়ায় সেদিন হইতে আমরা একটু দমিয়া গেলাম, মনে একটা সংশয় হইল যদি ভবিষ্যতে তাড়াইতে না পারি।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

বসন্তের উদয়।

মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে কিম্বা পহেলা ফাল্গুনে,—
সংবৎটা মনে নাই—কাজ্ (ই) বা কি কাল্ গুণে ?
রতি বল্লেন মদনকে, "প্রিয় পতি আমার,
ষড়্ঋতুর মধ্যে কর বসন্তটা খামার।
আছে ফুল, আছে পাখী, রাখি ওটা নিজেরা ;
প্রতি বছর নাইবা দিলে কবির হাতে ইজেরা।
কাজ কিবা খাজনায় ; কিবা ছাই লভ্য ?
দিক্ করে গো লিরিক্ দিয়ে যত কবি নব্য।"

মদন কহেন রতিকে প্রিয়া বলে ডাকি,
"মোরা বরং গ্রীষ্মটাকে খামার ক'রে রাখি।
সাঁঝ সকালে বাতাস ভাল, পাখীগুলোও ডাকে ;
বিশেষতঃ জানইত যে আম কাঁঠাল পাকে।
ঘনদুধের সঙ্গে সেটা উপাদেয় খাসা।
দুপুরেতে গরম হলে খেল্‌ব তাস ও পাশা।"
শুনে খুসী রতি দেবী ; ঠোঁটে ফুট্‌ল হাসি।
সেই হাসিতে উদয় হলেন বসন্তটি আসি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঘুঘু।

আমরা ঘুঘু বলি কপোতকে। ঐ কবিপ্রিয় পাখীর নামে ভিটেয় ঘুঘুচরা প্রবাদ হইয়াছে কি ? মহারাষ্ট্রে, মধ্যভারতে এবং বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে হুতুম্ পেঁচাকে ঘুঘু বলে। হুতুম্ পেঁচা ঘরে বসিলে যে অমঙ্গল হয়, এবিশ্বাস সকল প্রদেশেই দেখিতে পাই। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বকালে হুতুম্ পেঁচার নাম ঘুঘু ছিল না ত ? মনে হয় যেন হুতুম্ পেঁচার নামেই ভিটেয় ঘুঘুচরা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব।

কেহ কেহ বলেন, যে জাতি সমতল ভূমিতে বাস করে তাহারা অন্য জাতি অপেক্ষা অধিক ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হয়। সমভূমি ইংলণ্ডদেশ-নিবাসী লোকদিগের অপেক্ষা পার্ব্বত্য স্কটলাণ্ডদেশনিবাসী লোকদিগের মধ্যে অধিক ন্যায়-শাস্ত্রবিৎ দার্শনিক পণ্ডিত জন্মিয়াছে—যথা, Sir William Hunter, Reid, Brown, ইত্যাদি—পক্ষান্তরে Bacon, Newton প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত সমভূমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত মতটী কি করিয়া টিঁকিতে পারে ? পার্ব্বত্যদেশ অপেক্ষাকৃত বিজন ও কোলাহল বিরহিত ; এই প্রকার প্রদেশ কি ধ্যান, চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির অনুকূল নহে ? এই ভাবে দেখিতে গেলে পার্ব্বত্যপ্রদেশই বিশেষরূপে ন্যায়-শাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতিরিক্ত বাধা অনেক

সময়ে সভ্যতা ও উন্নতির বিরোধী—সামান্য জীবিকার জন্য পর্ব্বতবাসিদিগের এতটা পরিশ্রম করিতে হয় ও বাধা অতিক্রম করিতে হয় যে তাহারা আর কোন দিকে চিন্তাপ্রয়োগ করিবার অবসর পায় না। অতএব পর্ব্বতবাসিদিগের সভ্যতার প্রথম অবস্থা ন্যায়-শাস্ত্র অনুশীলনের প্রতিকূল—কিন্তু যদি নানাপ্রকার ঘটনাচক্রে পর্ব্বতবাসিরা একবার সভ্য হইয়া উঠে তখন তাহাদিগের বহির্দৃষ্টি বরং তাহাদিগের অন্তর্দৃষ্টির অনুকূল হয়। এই জন্য সভ্য স্কটলণ্ডে এত দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব।

বঙ্গদেশ সমভূমি বলিয়াই কি ন্যায়-শাস্ত্রের প্রতি বাঙ্গালিদের এত অনুরাগ? বঙ্গভূমি যদি সমভূমি "সাহারা" হইত তাহা হইলে বাঙ্গালিরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা করিতে পারিত? চিন্তার জন্য অবসর চাই—প্রাচুর্য্য ও ভূমির উর্ব্বরতা হইতে অবসর উৎপন্ন হয়। যে সকল বিদ্যার আলোচনায় অপেক্ষাকৃত শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয় সেই সকল বিদ্যার আলোচনায় কেন এই অবসর তবে নিয়োজিত হয় নাই? তাহার কারণ বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু—তাহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর আলস্য ও জড়তা উপস্থিত হয়—কাজেই ন্যায়-শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহারা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই।

চুট্‌কী।

(১) বিলাতী ওক্ ও দেশী বটবৃক্ষ।

ওক্‌গাছ ইংলণ্ডের গৌরবের সামগ্রী, বিলাতী পার্কের বিরাট্ বনস্পতি। এ কাঠ বড় মজবুত, ইহা হইতে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি গৃহসজ্জার আসবাব প্রস্তুত হয়, আর এই কাঠে জাহাজ গড়িয়া ইংরেজ বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্যবিস্তার করেন। গৃহসজ্জা, বাণিজ্যপ্রসার ও রাজ্যসমৃদ্ধি ইংরেজ ওক্‌গাছের প্রসাদেই লাভ করেন। অতএব ওক্‌গাছ ইংরেজের শ্রীসম্পদের একমাত্র নিদান ও নিদর্শন। আর ভারতের গৌরব বিরাট্ বটপাদপ। ইহার তক্তায় গৃহসজ্জার আসবাব বা বাণিজ্যপোত, যুদ্ধপোত গড়া যায় না। কিন্তু রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে অযত্নসংবর্দ্ধিত এই বিরাট্ বনস্পতি ছায়াদানে শ্রান্তপথিকের ক্লেশ দূর করে, ফলদানে পশুপক্ষীর ক্ষুধা প্রশমন করে, ইহার ঘনপল্লবে অসংখ্য জীব আশ্রয় লাভ করে, এবং ইহা হইতে শত শত নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হয়। ভোগবিলাস বা পার্থিব ঐশ্বর্য্য কখনও ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার আদর্শ ছিল না। ইহা ফলচ্ছায়াদানে বিশ্বমানবের ক্ষুধাশ্রান্তি দূর করিয়াছে, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, গীতাউপনিষদ্ কত যুগ ধরিয়া মনুষ্যহৃদয়ে দুঃখযন্ত্রণার অপনোদন করিয়া সুখশান্তিবিধান করিয়াছে ও অমৃতফলদানে চিরদিনের তরে মানবাত্মার ক্ষুধা দূর করিয়াছে; আর ভারতের পূত, শান্ত সভ্যতা হইতে 'তিব্বতচীনে ব্রহ্মতাতারে' নব নব সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বটবৃক্ষই ভারতীয় প্রকৃতির পবিত্র আদর্শ ও নিদর্শন।

(২) Mobile equilibrium of intelligence.

মাষ্টারী করিলে লোকে ক্রমশঃ বোকা হইয়া যায়, এইরূপ একটা অপবাদ আছে। দশ বৎসর মাষ্টারী করিলে তাহাকে আর কোনও

ঝুঁকির কাজের ভার দেওয়া হয় না, কোন্ সভ্যমুলুকে নাকি এইরূপ নিয়ম। কথাটা নিতান্ত অন্যায় নহে। মাষ্টারেরা সারাজীবন নিজেদের চেয়ে অল্পবুদ্ধি ও অল্পবিদ্য বালকদিগের সঙ্গে মেশেন, নিজেদের চেয়ে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের সঙ্গে মিশিবার কোনও সুযোগ পান না। সুতরাং তাঁহাদের আত্মোন্নতির কোনও উপায় থাকে না। তাঁহারা মূর্খকে পণ্ডিত করিতে গিয়া নিজেরা দিন দিন মূর্খ হইয়া পড়েন। ছাত্রদিগের Exercise সংশোধন করিয়া তাহাদের বানান দোরস্ত করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরা বানান ভুলিতে থাকেন। 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে,' কথাটা কবিকল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই ব্যাপার দেখিলে পদার্থবিজ্ঞানের mobile equilibrium of temperature নিয়মের কথা মনে পড়ে। ঘরে পাঁচটা জিনিসের মধ্যে একটা খুব গরম জিনিস রাখিলে খানিক পরে দেখা যাইবে, গরম জিনিসটা কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু ঘরের অন্য জিনিসগুলা কতকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। তপ্ত জিনিসের তাপ অন্য জিনিসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ তাপবিকীরণ খানিকক্ষণ চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে, ঘরের সব জিনিসগুলিতেই সমান পরিমাণ তাপ আছে, ঠাণ্ডা জিনিসটা গরম হইয়াছে, গরম জিনিসটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, ইহাকেই বলে mobile equilibrium of temperature. এক্ষেত্রেও দেখা যাইবে, ছাত্রদিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে মাষ্টার মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সেই পরিমাণে কমিয়াছে। শেষে বহুদর্শী মাষ্টারের ও সর্দ্দারপড়ুয়ার বিদ্যাবুদ্ধি সমান হইয়া দাঁড়ায়।

(৩) মৃণ্ময়পাত্র ও কাংশময় পাত্র।

অনেক স্ত্রীলোকের রূপ নাই, কিন্তু কেমন একটা মধুর আকর্ষণী-শক্তি আছে; সেইগুণে তাহাদের সাহচর্য্যে শান্তি ও প্রীতিলাভ হয়,

হৃদয় স্নিগ্ধ ও সরস হয়। এগুলি মাটীর নাগরী, কিন্তু ইহাদের প্রেমরস মধুর ও শীতল। আর অনেক রমণীর রূপযৌবন সবই আছে, কিন্তু সে উদ্দামসৌন্দর্য্যে আকর্ষণী-শক্তি নাই, তাহাতে মন মজেনা, প্রাণ টানে না। এগুলি পিতলের ঘড়া, বাহিরে মাজাঘষা তকতকে ঝকঝকে, কিন্তু ভিতরে বন্যার ঘোলা জলে পরিপূর্ণ। প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য 'স্বচ্ছঃ সুগন্ধিঃ তুষারা বারিধারা' উছলিয়া পড়ে না।

(৪) ন পুং স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি,' স্ত্রীলোক কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। সেকালে এইরূপই ছিল বটে। কিন্তু 'কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ' অর্থাৎ কলিতে সবই উল্টা। এখনকার দিনে পুরুষ কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। বাল্যে মাতার বা পিসিমার, যৌবনে পত্নী (বা তৎসদৃশী অন্য কাহারও), আর প্রৌঢ়াবস্থায় কন্যার অধীন অর্থাৎ কন্যাদায়গ্রস্ত। অতএব শাস্ত্রীয় বচনটি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন :—

মাতা রক্ষতি কৌমারে পত্নী রক্ষতি যৌবনে।
ভক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্র্যঃ ন পুং স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

(৫) আধুনিক প্রেমের কবিতা।

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছা করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিলনা; কবিতাও এখন হাটে ঘাটে। আগে লোকে মুড়ি ও ঝুণা নারিকেল খাইত, খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুক্না গোছের কিন্তু বড় পুষ্টিকর; এখন মুটে মজুরও গজাজেলাপী খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তন শুনিত; তখনকার চণ্ডীর গান, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গই থাকিত;

জিনিসটায় তত রসকস ছিল না, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত; আর তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত থিয়েটারী-ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত। খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অম্বল হয়, বুক জ্বলে, গলা জ্বলে, দুই এক ঝলক বমি হইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নানা ভঙ্গীর নানা কবি কবিতার পশরা সাজাইয়া বসিয়া আছেন; সে সব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই কিন্তু হৃদয়ে জ্বালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু ঝরিতে থাকে। টাট্‌কাভাজা কচুরি নিম্‌কি জেলাপি বেশ মুচ্‌মুচে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায়; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয়া গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও মাসিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার সময়, বেশ মোহকর—বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়; কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্‌টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য শোধ্‌রাইবে না।

(৬) Absolute value ও Local value.

স্ত্রীজাতি সংখ্যাতত্ত্বে শূন্যজাতীয়। ইহাদের নিজের কোন মূল্য নাই; যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার জোরে ইহাদের মূল্য হয়। যথা, মুন্‌সেফ বাবুর গৃহিণী বলিয়া এক নারীর আদর, জমীদারের ঘরণী বলিয়া আর এক নারীর আদর, ইত্যাদি। আবার ইহারাই যদি পূজারি-ব্রাহ্মণ বা নাঙ্গ্‌লা-কায়েতের ঘরে যাইতেন, তাহা হইলে

ইহাদের কেহ পুঁছিত না! শুধু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এই ইতরবিশেষ। Absolute value এবং Local valueর প্রভেদ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

আবার দেখুন, শূন্য যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার মূল্য দশ গুণ বাড়াইয়া দেয়। যে পুরুষের সদ্‌গৃহিণী যোটে, তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন, তাঁহার এক আড়ি ধনে দশ আড়ি হয়, তাঁহার ধূলা মুঠাটা সোণামুঠা হইয়া যায়। তবে যে সকল নারী সদ্‌গৃহিণীও নহেন, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণীও নহেন, তাঁহারা কেহ ডাহিনে যেতে বাঁয়ে যান, তাহাতে স্বামীর আয়পয় দেখেন না, তাঁহারা যে শূন্য সেই শূন্যই থাকিয়া যান।

(৭) Maximum density.

অনেক ছাত্র পড়াশুনা যত করুক আর না করুক টায়ে টোয়ে পাশটা হয়। আবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলেও তাহারা ফলে বড় বেশী সুবিধা করিতে পারে না, সেই সমানই দাঁড়ায়। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া maximum density of water at 4° centigrade এর কথাটা মনে পড়ে।

(৮) বালির পিণ্ডি।

কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক বেসরকারী স্কুল কলেজে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দেওয়ার কোনও সরঞ্জাম নাই; ভাল পুস্তকাগার নাই, ভাল শিক্ষক নাই, কলেজ বা স্কুলগৃহটি পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নোঙরা। ঢাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার! এইরূপ বিনা-আয়োজনে ছাত্রদিগকে যোগেযাগে পাশ করানর বন্দোবস্ত ঠিক যেন দরিদ্রসন্তানের পিতৃপ্রেতকৃত্যে বালির পিণ্ডির ব্যবস্থা;—পিতৃপুরুষের পেট ভরে না, কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখা মাত্র।

(৯) যাত্রার দল না কলেজ ?

কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলি এক একটী যাত্রার দল। প্রোফেসারেরা যুড়ী, এক এক বিষয় যোড়া যোড়া প্রোফেসার আছেন। তাঁহারা যুড়ীর গানের ধরণে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা (বা কথকতা) করেন নতুবা সকল শ্রোতার মন রাখা যায় না। যাঁহার বক্তৃতা জমিয়া যায়, তাঁহারই জয় জয়কার ; সে কলেজে ছেলের ভিড় জমে। আবার পাকা যুড়ীরা কখনও কখনও চটিয়া বাহির হইয়া নূতন দল খোলেন। কোনও কোনও কলেজ স্থাপনার ইতিহাসও ঠিক এইরূপ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয়, যদি হাল আইনের ফলে এ সকল কলেজ উঠিয়া যায়, তবে কলেজওয়ালারা স্বচ্ছন্দে এক একটা থিয়েটার বা যাত্রার দল খুলিতে পারেন। তাঁহারাও বোধ হয় আখেরের কথা ভাবিয়া আগে হইতেই ছেলেদের তালিম করিতেছেন ; সেই জন্যই প্রত্যেক কলেজেই এক একটা সখের থিয়েটারের আখ্‌ড়া দেখা যায়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকা।

ভাল ছিদ্রহীন নৌকাখানি পারঘাটে বাঁধা থাকে, স্রোতের জল তার নীচ দিয়ে তর্ তর্ করে বহে যায়, তরঙ্গেরা এসে তাকে আদর করে দুলিয়ে দিয়ে যায়, এক পারে যাত্রী সব তারি উপর আরোহী হয় অপর পারে তারি অপেক্ষায় বসে থাকে, পারাণী মহানন্দে নৌকা খুলে দেয়। আর ভাঙ্গা ফুটো নৌকাখানি তার বুকের সবগুলি পাঁজর বার করে কাৎ হয়ে শুক্‌নো ডাঙ্গার উপর পড়ে থাকে, তাকে কেউ ফিরেও পোঁছেনা। অথচ সেই সম্পূর্ণ নৌকাখানি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, ভগ্ন তরীখানিও আপন হতভাগ্য বিষয়ে ঠিক তেমনি অচেতন।

যেদিন লিখ্‌বার ঝোঁক চাপে সে দিন অকস্মাৎ একেবারে এত ছন্দ, এত কথা, এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়। একসঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চাতক, কলহংস সবগুলি ডাকতে আরম্ভ করে। একত্রে বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ সবগুলি ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয় তো অনেক পড়ে থাকে—একলা একটু খানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন ? এত বড় পৃথিবী এমন বিশাল তাতেও পর্য্যায়-ক্রমে ঋতুগুলি দেখা দেয়, একে একে কোকিল, দয়েল, চাতক, কল-হংস গান গাইবার অবসর পায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিবিধ কবিতা।

পরস্পর গুণগান।

উটে উটে বিবাহেতে গাধা গীত গায়,
কিবা রূপ, কিবা ধ্বনি ! এ ওরে বাড়ায়।

উষ্ট্রাণাংচ বিবাহেষু গীতং গায়ন্তি গর্দ্দভাঃ।
পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ।

মন্ত্র ভেদ।

ছয় কাণে মন্ত্রভেদ, চার কাণে স্থিরতর,
দুই কাণে বদ্ধমন্ত্র, ব্রহ্মারও সে অগোচর।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণঃ স্থিরো ভবেৎ।
দ্বিকর্ণস্থ তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি॥

ইস্‌পার কি উস্‌পার।

কেশব নহে ত শিব—একই ঈশ্বর;
দরী বা সুন্দরী নারী—কি তাহে অন্তর?
ভূপতি অথবা যতী,—মিত্র সে সমান,
নগরে অরণ্যে কিবা—একই বাসস্থান।

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একা নারী সুন্দরী বা দরী বা।
একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা॥

ভয়।

পবনে বৃক্ষের ভয়, হিম-ভয়ে নলিনী শুকায়,
পর্ব্বতের ভয় বজ্রে, সাধুজন দুর্জ্জনে ডরায়।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং॥

অসম্ভাব্য।

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে,
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অব্যবস্থিত চিত্ত।

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট বার বার,
যে চিত্ত অব্যবস্থিত প্রসাদও ভীষণ তার।

ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট স্তুষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

সজ্ঘর্ষণ।

যতীরে হেরিলে যতী, বৈদ্যে বৈদ্য, নট বা নটেরে,
ভিক্ষুরে হেরিলে ভিক্ষু কুকুরের মত গর্জ্জি ফেরে।

দৃষ্ট্বা যতির্যতিং সদ্যো বৈদ্যো বৈদ্যং নটং নটঃ।
যাচকো যাচকং দৃষ্ট্বা শ্বানবৎ গুরগুরায়তে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক কথা।

কাশ্মীর হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন ঃ—"স্বদেশী আন্দোলনের গুণে কাশ্মীরে পশমী কাপড়ের ব্যবসায় খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাটতি খুব বেশী হওয়াতে দামও অনেক চড়িয়াছে। গত বৎসর যে কাপড় ৬৲ টাকায় অনায়াসে পাওয়া গিয়াছে তাহা এবার ৭৷৷০ টাকায় ও পাওয়া যায় না। তথাপি বঙ্গদেশে এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে।

"বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনে কাশ্মীরের লাভ।"

বন্দে মাতরম্! যে বাঙ্গালীরা সর্ব্বদা বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিত এবং স্বদেশী কাপড়চোপড় ঘৃণার চক্ষে দেখিত এখন কিনা সেই বাঙ্গালীরাই সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থানীয় হইয়াছে। এখানকার পশমী কাপড় পূর্ব্বে যেরূপ মোটা ছিল এখন আর সেরূপ নাই। ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং বিদেশী কাপড় অপেক্ষা কোন অংশ নিকৃষ্ট নহে বরং শ্রেষ্ঠ। যদিও কাশ্মীরের তাঁতিরা বিদেশীয় তাঁতিদের অপেক্ষা অনেক কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিয়া কাজ করে তথাপি তাহাদের তৈয়ারী—"পশমীনা"র সৌন্দর্য্য এবং টেঁকসই গুণে পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন কাপড় তাহার সমকক্ষ নহে। তারপর "পট্টি এবং রাফাল" বিদেশীয় গরম কাপড় —যে গুলিকে লোকে বিলাতীকাশ্মীরা বলে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ —বিদেশী কাপড়গুলি—এক বৎসর ব্যবহার করিলেই রঙ্গ উঠিয়া যায় এবং অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু দেশী কাপড়ের কোনদিনও রঙ্গ উঠে না এবং উহা খুব টেঁকসই। যাহা হউক ইহা খুব সুখের বিষয়, এত কাল পর ভারতের উন্নতিইচ্ছুকেরা এরূপ আবশ্যকীয় অথচ বহুকাল পরিত্যক্ত বিষয়ে মনোযো দিয়াছেন। ছোট ছোট অনেক মহাজন এই সকল কাপড়ের কারবার করিতেছেন কিন্তু যদি দুই একজন খুব বড় মহাজন এই ব্যবসায়ে হাত দিতেন এবং ভারতে সর্ব্বত্র এই কাপড় সরবরাহ করিতেন তবে এই গরীব তাঁতিদের এবং দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইত। এই তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছিল। য উৎসাহ পায় তবে তাহাদের প্রাণে নববল সঞ্চার হইবে। কাশ্মীর অং

পশমের উৎপত্তিস্থান। আমি এবিষয় নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ভালরূপে কাজ চালাইতে পারিলে কেহ লাভবান্ ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না, অথচ দেশের এবং দশের উপকার করিবেন।

বিগত ২২শে জানুয়ারী রাত্রিতে অনেক ভারতবাসী কয়েকজন ইউরোপবাসী-সমভিব্যাহারে কুইন্ ষ্ট্রীটস্থ সেণ্ট কেপ্রিয়ান হলে প্রফেসর ভাই পরমানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন। ইনি একজন আর্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি নেটাল এবং ট্রেন্সভাল হইতে কেপ-কলনীতে পৌছিয়াছিলেন। মিঃ আর, আর, নাইডু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি পি, এ, মুদালিয়ার ও ভি, এন্, এম, পিলে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের রীতি অনুসারে ভাই পরমানন্দকে মাল্যদানের পর একটী সুন্দর রচনা পাঠ করা হইল এবং সেটী তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইল। তৎপর ভাই পরমানন্দ তাঁহার এরূপ সাদর অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এবং "পুরাতন ভারত" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদিও আজকাল ভারতবর্ষ কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ নহে তথাপি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ একটী উন্নত দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। আজকালকার যে সকল সভ্যজাতি আছেন তাঁহাদের জন্মের অনেক পূর্ব্বে ভারতবাসীরা কেবল যে সভ্য ছিল তাহা নহে কিন্তু অন্যান্য জাতিকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল। জার্ম্মানী প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাতে বিজ্ঞ হইয়া এবিষয় অনেকটা সভ্যজগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তারপর হইতেই অনেকে সে বিষয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছেন। সংস্কৃতভাষাতেই বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীক্ এবং ইউরোপের অন্যান্য ভাষা হইতে বেশ সপ্রমাণ হয় যে, এই সমস্ত জাতি—যাহারা এখন পরস্পরকে বিজাতি বলিয়া ঘৃণা করে—সকলেই এক আর্য্যজাতি হইতেই উৎপন্ন। ইহারও বেশ প্রমাণ আছে যে ভারতবাসীরা সেই আর্য্যজাতির প্রধান অংশ এবং টিউটন, স্লেভনিয়ন্ এবং পারসীক প্রভৃতি অন্যান্য জাতি তাহাদের শাখামাত্র, এবং তাহাদের সেই সংস্কৃতভাষা যদিও সমস্ত জাতির মাতৃভাষা না হইয়া থাকে তথাপি সংস্কৃতভাষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট এবং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ভারতবাসীদের পূর্ব্বে যেরূপ সভ্যতা ছিল অন্য

"প্রফেসার ভাই পরমানন্দ এম, এ।"

কোন জাতি আজও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রথম মনো
বিষয় ছিল ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে বেদ প্রথম মানুষের জ্ঞানচক্ষু উ
করে। এবং সমস্ত জাতিই বেদকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ ব
স্বীকার করেন। মূক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে বেদই
"ঈশ্বর এবং আত্মা" সম্বন্ধে মানুষের প্রতীতি জন্মায়, এবং ধর্ম্ম বিষয়েও অ
শিক্ষা দেয়। তাহার পর শত শত বৎসর পরে উপনিষদ ইত্যাদি রচিত হয়।
সকল গ্রন্থকে জর্ম্মান পণ্ডিত "সোপেন হায়ার" তাঁহার "জীবনের এবং মর
সান্ত্বনাদায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ প্রকাশিত হওয়ার অ
অনেক পরে "দর্শনশাস্ত্র" শিক্ষার জন্য ছয়টী স্কুল স্থাপিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের
তখন ভারত এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিল যে, "পাইথেগোরাস" (Pythago
প্রভৃতি অনেক গ্রীক পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার জন্য এদেশে আ
করিয়াছিলেন। ভৈষজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রধান গ্রন্থই সংস্কৃতভাষাতে লি
ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব্বে তাহারা যথেষ্ট বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন ইতিহাসে য
প্রমাণ আছে যে গ্রীক্ এবং আরবেরা ভারতবাসিদের নিকট হইতে ভৈষজ্য
শিক্ষা করেন। ইহা ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্র
এবং কবিত্ব প্রভৃতি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ স্বাধীন
সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পূর্ব্বকালে যে তাঁহারা চারিটী সামাজিক বি
করিয়াছিলেন তাহা তখন আবশ্যকীয় ছিল; কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ বি
করিয়াছিলেন। মৃতদেহ দগ্ধ করায়ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয়
তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় গ্রীক্ এবং চীনবাসী অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন যে ভা
বাসীরা সত্যবাদী, অপায়ী এবং স্ত্রীলোকেরা সতী ছিলেন। তাঁহারা ইহকাল অ
পরকালে সুখভোগ করার জন্য যত্ন করিতেন। তৎপর ভাই পরমানন্দ তাঁহার স্ব
বাসিদিগকে পূর্ব্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে এবং তাঁহারা জ্ঞানলাভের নি
যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশে
উপস্থিত ইউরোপবাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হয়ত আবার এরূপ
আসিবে যে পূর্ব্বকালের ন্যায় তাঁহারা সকলে একবংশগত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হ
পারিবেন।" তামিল ভাষায় বক্তৃতাটি বুঝাইয়া দেওয়া হয়।